আবুল ফজল রচনাবলী

আবুল ফজল রচনাবলী

আবুল ফজল রচনাবলী

প্রথম খণ্ড

বইঘর ॥ চট্টগ্রাম

প্রারম্ভিক বক্তব্য

যেখানে জীবন সেখানে ক্রম-বিকাশ আর ক্রম-পরিণতির লক্ষণ থাকা চাই। লেখকের বেলায় এর প্রয়োজন আরো বেশী। কালের সঙ্গে সঙ্গে তাঁকেও এগুতে হয়। তা না হলে বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছিন্নতা অনিবার্য। সমাজ, সময়, ইতিহাস সব কিছুই গতিশীল আর এ সবের সঙ্গে লেখকের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। বহির্জগতের তুচ্ছতম ঘটনাও অনেক সময় লেখকের মনকে আন্দোলিত করে, ঘটনা প্রবাহের তরঙ্গাঘাতে তাঁর মন-মানসে ক্রমাগতই পালা-বদল ঘটে। মানস-জীবনের প্রতিফলনেরই এক নাম সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদি যাবতীয় মননশীল ক্রিয়াকর্ম।

দর্পণের মতো লেখকের মন-মানসেও ছায়া ফেলে চার পাশের জীবনের ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য, সুন্দর-কুৎসিৎ সব কিছু। তার সঙ্গে অবশ্য মিশে লেখকের কল্পনা, চিন্তা, ধ্যান-ধারণা-মননশীলতার সঙ্গে সম্পৃক্ত এমন আরো অনেক কিছু। এ কারণে লেখাই লেখক, সাহিত্যই সাহিত্যিক কথাগুলি মোটেই অর্থহীন নয়। অর্থাৎ লেখকের পরিচয় লেখাতেই। এ কারণে 'রচনাবলী' প্রকাশের একটা বিশেষ সার্থকতা রয়েছে। যে কোন লেখকের পরিচয় তাঁর সমগ্র রচনাতেই ছড়িয়ে, ছিটিয়ে, বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। সে সবকে এক যায়গায় গ্রথিত করা না হলে লেখকের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় কিম্বা তাঁর রচনার সার্বিক মূল্যায়ণ সহজ হয় না। লেখকের পরিণতির ধাপগুলির অনুধাবনও তখন হয় সহজসাধ্য।

বিশেষ করে যে লেখক সব সময় চারদিকের মানুষ আর সমাজের দিকে চোখ আর মন রেখে লিখেছে তার লেখায় সমাজ-বিবর্তনেরও কিছুটা

ইতিহাস হয়তো খুঁজে পাওয়া যায়। সমাজ-বিজ্ঞানী বন্ধুদের মুখে শুনেছি আমার লেখার তেমন একটা মূল্যও নাকি আছে। সাহিত্য যেমন একদিকে লেখকের মনের দর্পণ তেমনি অন্যদিকে দেশ-কালেরও। লেখায় শুধু লেখককে পাওয়া যায় না, যতই খণ্ডিতাকারে হোক পাওয়া যায় তাঁর দেশ আর কালকেও।

ইতিহাসের এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে আমাদের জন্ম। দেশ আর সমাজের ক্রম-রূপান্তর, ভাঙ্গা-গড়া আর উত্থান-পতন ছায়া-ছবির মতো আমাদের চোখের সামনে ঘটে গেছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। তার অনেক কিছু অবিশ্বাস্য, অনেক কিছু অনিবার্য যা না ঘটে যেন পারেই না। এ পালা-বদলে মনুষ্যত্বের অত্যুচ্চ মহিমা যেমন দেখেছি তেমনি দেখেছি তার চরম অপমৃত্যুও। স্বসমাজের দারিদ্র-লাঞ্ছিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, হতশ্রী জীবন দেখে বারে বারে বিক্ষুব্ধ হয়েছি। ফলে শৈল্পিক পরিমিতিবোধ আর সংযমের বাঁধ রক্ষিত হয়নি আমার অনেক লেখায়। কোন কোন লেখায় মাত্রাধিক সোচ্চার হয়ে উঠেছে আমার বক্তব্য। তেমন রচনার নমুনাও দেখতে পাওয়া যাবে এ খণ্ডে।

অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে দেশের রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন ঘটেছে বার বার। রাজনীতির প্রভাব এত সর্বব্যাপক যে, লেখকদের পক্ষেও নির্লিপ্ত বা উদাসীন থাকা আদৌ সম্ভব নয় এ যুগে। সব পরিবর্তন লেখকদের জন্য সব সময় শুভ আর সুসহ হয়েছে তা বলা যায় না। তবু সব অবস্থায় এ লেখক নিজের কথা প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছে। কারণ আমার বিশ্বাস, 'নীরব কবি' যেমন কবি নয়, তেমনি 'নীরব লেখক'ও লেখক নয়। তথাকথিত 'নীরব জ্ঞানী'কেও জ্ঞানী বলে মানতে আমি নারাজ। কারণ প্রকারান্তরে তা এক রকম সমাজ ঔদাসিন্যই। লেখককে প্রকাশ করতেই হয় ঐ ছাড়া তাঁর পক্ষে লেখক হওয়া বা লেখক থাকা সম্ভব নয়। তিনি সমাজের সন্তান, সমাজের অঙ্গ।

লেখকের বয়স আর কাল অনেকখানি সমতালে চলে, সে সাথে লেখকের লেখা আর চিন্তা-ভাবনাও। রচনায় তার স্বাক্ষর থাকা চাই, তার সন্ধান মেলে তাঁর সমগ্র রচনাবলীতে। তাই 'রচনাবলী' প্রকাশে আমি

নিরুৎ-সাহিত নই। এ ছাড়া পাঠক আর সমালোচকরা লেখকের বিচার কিম্বা মূল্যায়ন করবেন কি করে? লেখক হিসেবে আমার বিচারের একমাত্র মাপকাঠি আমার লেখা, আমার রচনাবলী। এ গ্রন্থ সে মাপকাঠির এক খণ্ডাংশ।

প্রথম খণ্ডে যেহেতু প্রথম বয়সের রচনাই বেশী করে স্থান পেয়েছে ফলে এ সব রচনায় যথেষ্ট ত্রুটি, বিচ্যুতি, দুর্বলতা ও অনভিজ্ঞতার পরিচয় থাকা মোটেও অস্বাভাবিক নয়। আমার বিশ্বাস কোন লেখকই এ পথ-পরিক্রমা এড়াতে পারে না। এভাবেই লেখক, লেখক হয়ে ওঠে। বহু পথ-পরিক্রমের পর, জীবনের বহু ধাপ পেরিয়ে লেখক পৌঁছেন একটা পরিণতিতে। এগিয়ে যান এক এক পা করে পরিণতির দিকে। এ খণ্ডের রচনাবলীতেও লক্ষ্য করা যাবে আমার মন বিচিত্র পথে বিচরণ করতে চেয়েছে। কোন একটা নির্দিষ্ট বিষয়ে আটকা থাকেনি। অবশ্য সব বিচরণই যে সার্থক শৈল্পিক রূপ নিয়েছে তা বলা যাবে না। পরিপূর্ণ রূপ নেয়নি এমন বহু রচনাও এ খণ্ডে স্থান পেয়েছে। আমার মন কিছুটা তার্কিকও। সব কিছু বিনা বাক্যে মেনে নেওয়া এ মনের স্বভাব নয়। সময় সময় আপত্তি জানিয়েছি অনেক ব্যাপারে। প্রতিবাদ জানাতে দ্বিধা করিনি যা অযৌক্তিক মনে হয়েছে তার বিরুদ্ধে। এ সবেরও কিছু নিদর্শন দেখতে পাওয়া যাবে পরিশিষ্টে 'বিতর্কিকা' অংশে। সব লেখকেরই একটা অখণ্ড পরিচয় রয়েছে, সে পরিচয়ের একটা বৃত্ত-রেখা একমাত্র রচনাবলীতেই ধরা থাকে। এমন কি প্রাথমিক রচনাতেও সে পরিচয় একেবারে অস্পষ্ট থাকে না।

শেষ পর্যন্ত আমি লেখক হয়ে উঠবো, সূচনায় তেমন কোন আশা বা সাহস দেখা দেয়নি মনে। একদিন আমাদের রচনাও যে ইতিহাসের উপকরণ হয়ে উঠবে তেমন বিশ্বাস মনে স্থান পায়নি কখনো। তাই অধিকাংশ রচনার গায়ে সন-তারিখ খুঁজে পাওয়া যাবে না। সে ভুল অত্যন্ত দেরীতে উপলব্ধ হয়েছে বলে সংশোধন করাও সম্ভব হয়নি।

অনেক রচনার সন-তারিখ বিস্মৃতির আড়ালে হারিয়ে গেছে। সব লেখায় সন-তারিখ দেওয়া থাকলে তার ঐতিহাসিক মূল্য যেমন বাড়তো

তেমনি লেখকের ক্রম-পরিণতির ধাপ গুলির সঠিক অনুসরণও তখন সহজ হতো। ইতিহাসের বহু আবর্তন-বিবর্তন পার হয়ে, বহু মোড় ঘুরে আজ আমরা আমাদের কাম্য ধামে পৌঁচেছি। কিন্তু সব ক্ষেত্রে আজো স্বাভাবিকতা ফিরে আসেনি। হয়তো আরো সময় নেবে। লেখা আর প্রকাশনা হাত ধরাধরি করে না চল্লে সাহিত্যের সমৃদ্ধি ঘটে না। এ দুয়ের সমন্বয়ের উপর সাহিত্যের সামগ্রিক বিকাশ আর অগ্রগতি নির্ভরশীল। ঘরে বসে লিখে লিখে খাতার পর খাতা হয়তো ভর্তি করা যায় কিন্তু প্রকাশিত না হলে তা সাহিত্যের মর্যাদা পায় না।

এখন গ্রন্থ-প্রকাশনা এত ব্যয়বহুল আর কঠিন হয়ে পড়েছে যে অচিরে আমাদের সাহিত্য, আর সামগ্রিকভাবে জাতির মননশীল ক্রিয়াকর্ম এক চরম বন্ধ্যাত্বের সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এ দুঃসময়ে এত বড় বই প্রকাশের ঝুঁকি নেওয়া কম দুঃসাহসের কথা নয়। স্নেহভাজন সৈয়দ মোহাম্মদ শফির আন্তরিক সাহিত্য-প্রীতির জন্যই এ সম্ভব হয়েছে। পাঠকদের কাছে এ খণ্ড রচনাবলী আশানুরূপ সমাদর পেলে তিনি হয়তো আরো দুঃসাহসের পরিচয় দিয়ে বাকি খণ্ডগুলি প্রকাশেও তৎপর হয়ে উঠবেন।

১৯৭৪-এর ৭ই ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আমাকে একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দিতে হয়েছিল তার থেকে একটি অনুচ্ছেদ উদ্‌ধৃত করে এ প্রারম্ভিক কথা শেষ করছিঃ "মানুষের জীবনে, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সাহিত্যের একটি প্রধান ভূমিকা রয়েছে। সে ভূমিকা আমি কখনো বিস্মৃত হই নি। তাই দেশের মানুষ আর সমাজের বিচিত্র সমস্যা বার বার আমার লেখায় ছায়াপাত করেছে। এমন কি সময় সময় আমার লেখাকে তা যে কণ্টকিতও করেনি তা নয়। ভয়ে বা প্রলোভনে আমি কখনো আমার লেখাকে সাহিত্যের তথা সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হতে দিইনি। দেশ ও সমাজের কথা ভেবে যখনই আমার মন আলোড়িত হয়েছে তখন তা আমি নির্ভয়ে ও অসংকোচে প্রকাশ করেছি। আমার কণ্ঠস্বর কখনো চাপা থাকেনি। চেষ্টা করেছি লেখায় যথাসম্ভব যুক্তি ও বুদ্ধিনির্ভর

হতে এবং বজায় রাখতে সততা আর আন্তরিকতা। যা তার খেলাপ তার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে দ্বিধা করিনি। লেখকের আত্মপ্রকাশের একমাত্র মাধ্যম লেখা, লেখার ভিতর দিয়েই তিনি তোলেন আওয়াজ। আমার আওয়াজও শুনতে পাওয়া যাবে আমার লেখায়।"

'গ্রন্থ পরিচয়ে'র মতো শ্রম-সাধ্য কাজটি করে দিয়েছেন স্নেহভাজন ভূঁইয়া ইকবাল।

সাহিত্য নিকেতন : চট্টগ্রাম। **আবুল ফজল**
অগ্রহায়ণ, ১৩৮২

সূচী

উপন্যাস

গল্প

নাটিকা

জীবন-কথা

প্রবন্ধ (বিচিত্র-কথা)

ধর্ম

বিতর্কিকা

পরিশিষ্ট

আবুল ফজল রচনাবলী

উপন্যাস

চৌচির

আবুল ফজল একমাত্র মুসলমান গল্পী, যাঁকে বর্তমান বাঙলার শক্তিশালী গল্প লিখিয়েদের মধ্যে সম-আসন দেওয়া যায়।……এই তরুণ শিল্পীর মাঝে যে-বিপুল সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখছি, "চৌচির" তারি অগ্রদূত।

—নজরুল ইসলাম

প্রথম সংস্করণ (১৯৩৪) ভূমিকা :

১৯২৪—২৫-এর দিকে এই গল্পটি লেখা হয়। এই গল্পের নামকরণ করেছেন 'হারামণি'র মণিকার বন্ধু মনসুরউদ্দীন; নায়ক তার নামের জন্য আমার অন্যতম বন্ধু সুসাহিত্যিক কামালউদ্দীন খাঁর কাছে ঋণী। লেখাটি সবচেয়ে প্রিয় ছিল প্রতিভাবান সাহিত্যিক মরহুম দিদারুল আলমের;—দিদার ছিল আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু। শক্তি ও প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশের পূর্বেই মাত্র ছাব্বিশ বৎসরে তার সংগ্রামশীল বিচিত্র সুন্দর জীবন অকস্মাৎ দাঁড়ি টেনেছে। বইটি তার প্রিয় ও আমার প্রথম ব'লেই তার স্মৃতি স্মরণ ক'রে উৎসর্গ করলাম।

তস্‌লীম তখন বালক মাত্র—তৃতীয় কি চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে। পিতার অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না বলিয়া, চকবাজারের মিঞা-বাড়ীতে বলিয়া কহিয়া তাহার থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। সেই হইতে সে-বাড়ীতে থাকিয়া তস্‌লীম ম্যাট্রিক. আই-এ. ও বি-এ পাশ করিয়া মাত্র গত বৎসর ল' পড়িবার জন্য কলিকাতা গিয়াছে। কবে কোন্ তারিখে সে মিঞা-বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিল সে-কথা তাহার মনেও নাই---এই দীর্ঘ দশ এগার বৎসর ধরিয়া সে বেগম সাহেবার স্নেহে মানুষ হইয়াছে। নূতন চাকর চাকরাণীরা সবাই জানে: সেও এ-বাড়ীর ছেলে। আত্মীয়-স্বজনেরা মনে করেঃ সেও তাহাদের একজন।

বেগম সাহেবার বড় দুই মেয়ের বিবাহ হইয়াছে। বাড়ীতে আছে দুইটি ছেলে আর সর্বকনিষ্ঠা মেয়ে রওশন। তস্‌লীম যখন প্রথম এ বাড়ীতে আসে তখন রওশনের বয়স চার পাঁচ বৎসরের বেশী নয়। প্রথম দর্শনেই এই সুদর্শন ছেলেটির উপর যেন বেগম সাহেবার লোভ হইয়াছিল। সেই হইতে তাঁহার মনে কল্পনা জল্পনা চলিতেছিল—এ দুইটিকে একদিন মিলাইয়া দিয়া তামাশা দেখিতে হইবে। তাই বোধহয় এ পরের ছেলেটিকেও তিনি ধীরে ধীরে নিজের করিয়া লইতেছিলেন।

কয়েক বৎসর পরের কথা---বেগম সাহেবা হঠাৎ অসুখে আক্রান্ত হইলেন, একেবারে যায়-যায় অবস্থা। বালিকা রওশন ও কিশোর তস্‌লীমের মুখের দিকে তাকাইতেই অশ্রুধারায় তাঁহার মুখমণ্ডল ভাসিয়া যাইত। তাঁহার বড় সাধের আশা, তাঁহার প্রাণের ঐকান্তিক আকাঙ্খা পূরণ দেখিয়া যাইতে পারিলেন না—এই ভাবিয়া তাঁহার বুক ভাঙ্গিয়া চৌচির হইয়া যাইতেছিল।

বাইশ তারিখ তস্‌লীমের কলেজ খুলিবে, তাহাকে ত আর রাখা যায় না। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার এ আশা এরা ফলবতী করিবে কিনা, কে জানে?

সন্ধ্যায় যখন কেহই কাছে ছিল না, তিনি তস্‌লীমকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তস্‌লীম জুতা টিপিয়া টিপিয়া আসিতেছিল—এর ভিতর রহস্য আছে মন্দ নয়। এ-সব ব্যাপারে যাহারা অনভিজ্ঞ তাহাদের এটাও একটু চুপিচুপি বলিতে হইতেছে। ছোটকাল হইতে রওশন শুনিয়া আসিতেছিল তস্‌লীম ভাইয়ের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইবে। শিশুকাল ত এ নিয়া বিশেষ আনন্দের সঙ্গে তাহার কাটিল, কিন্তু সাত আট বৎসর বয়স হইতেই কোথা হইতে অপরিসীম লজ্জা আসিয়া তাহাকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলিল। সেই হইতে তস্‌লীমকে দেখিলে সে যেদিকে পারিত ছুটিয়া পলাইত। এ পলায়নের ছুটাছুটিতেও যেন তাহার প্রতি অঙ্গ হইতে পথে পথে আনন্দ ঝরিয়া পড়িত। ওদিকে তস্‌লীমের বড় ইচ্ছা ঐ সুকুমার নিপুণ শিল্পীর অঙ্কিত সুন্দর মুখচ্ছবিখানি একবার দেখিয়া লয়। পাছে তাহার জুতার শব্দে বালিকা দৌড়িয়া পলায়, তাই সে আঙুলের উপর ভর দিয়া অন্দরে ঢুকিত—পলাইতে পলাইতেও হয়ত একনজর দেখিয়া লওয়া যাইবে।

এ-সব পাকা গৃহিণী বেগম সাহেবার দৃষ্টি এড়াইত না—তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিতেন 'তস্‌লীম হাঁটলে পিঁপড়ায়ও খবর পায় না'। তস্‌লীমও লজ্জাজড়িত কণ্ঠে অতি সঙ্কোচের সহিত বলিত: বেশী টাকার জুতো মা আওয়াজ হয় না।

রোগশয্যায় এ-সব কথা একটার পর একটা ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহার মনে পড়িতেছিল—আর তাঁহার দুই পাণ্ডুর গণ্ড বহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িয়া বালিশ ভিজিয়া যাইতেছিল।

তস্‌লীম ঘরে ঢুকিতেই রওশন তাড়াতাড়ি পাখা ফেলিয়া দৌড়িয়া পলাইবার জন্য উঠিয়া পড়িল—হঠাৎ একখানি রুগ্ন দুর্বল হস্ত তাহার হাত ধরিয়া টানিল: বোস মা, আমার মাথায় একটু হাত দাও। তাহার লজ্জাধারকে সম্মুখে দেখিয়া সেও যেন আজ মন্ত্রাকর্ষিতার মতো নড়িতে

পারিল না---নীরবে জড়সড় হইয়া বিছানার কোণ ঘেসিয়া বসিয়া পড়িল। তস্‌লীমকে ইঙ্গিত করিতেই সেও রোগীর কাছে আসিয়া বসিল।

'বাবা, আমাকে একটু তুলে বসাও'।

তস্‌লীম তাঁহাকে তুলিয়া বসাইল। তিনি উভয়ের মাঝখানে লাগিয়া দুই শীর্ণ হাত দুইজনের কাঁধের উপর রাখিলেন। তাঁহার দুই চোখ বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল। মুখে শুধু বলিলেন: এই ত আমার বেহেশ্‌ত। তস্‌লীমের সমস্ত দেহের ভিতর প্রতিধ্বনি হইতেছিল, মহানবী যাঁহার চরণতলে স্বর্গ বলিয়াছেন এইত তিনি।

ধীরে ধীরে রওশনের হাতখানি তস্‌লীমের হাতে তুলিয়া দিয়া তিনি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন: 'আমার এ দান প্রত্যাখ্যান করিস্ না বাপ্'।

লজ্জাশরমে অভিভূত রওশন যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছিল, কিন্তু মুখে কিছু বলিতে রা ফুটিতেছিল না। তস্‌লীম তাহার আবাল্য-বাঞ্ছিত ক্ষুদ্র হাতখানি নিজের হাতের ভিতর পাইয়া কি করিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না, মা না থাকিলে হয়ত চুম্বনের পর চুম্বন দিয়া সে ছোট্ট ফুলের মতো হাতখানিকে ভরিয়া দিত। এখন ছাড়িয়া দিবে কি ধরিয়া রাখিবে ঠিক পাইতেছিল না। অনেকক্ষণ পরে বালিকা নিজেই হাতখানি টানিয়া লইয়া এক দৌড়ে পলাইয়া বাঁচিল।

তারপর অনেকদিন গত হইয়াছে। বেগম সাহেবাও অনেক ভুগিয়া অনেকের মতো রেহাই পাইয়াছেন। তস্‌লীম ছুটিতে আসিত, কিছুদিন এখানে, কিছুদিন নিজ বাড়ী ঘুরিয়া কলিকাতা ফিরিয়া যাইত। কবে দিন আসিবে এ অপেক্ষা।

বালিকা রওশন এখন জীবনের এমন সন্ধিক্ষণে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, যখন অনাগত জীবনের সব কিছু মানুষের শিরায় শিরায় কানাকানি করিতে থাকে। একটা রঙিন স্বপ্নে সারা অঙ্গ মশ্‌গুল হইয়া ওঠে---যেন 'কুঁড়ির ভিতর কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে'---।

রওশনের ইচ্ছা হয় তস্‌লীমকে দুই চোখ ভরিয়া দেখে, শৈশবের মতো হাত ধরিয়া আবার কাছে কাছে ঘোরে; কিন্তু পারা যায় না, দৌড়িয়াই পলাইতে হয়। কেমন একটা অজানা শক্তি আসিয়া তাহাকে পলায়নের পথে ঠেলিয়া দেয়।

বেগম সাহেবার ইচ্ছা: তাহারা মিশুক, এখন হইতে জানা শোনা শুরু হউক। ছুটিতে তস্‌লীম আসিলেই তিনি তাহার কাছে রওশনের পড়ার ব্যবস্থা করিতেন। বালিকার মনের ভিতর তস্‌লীমের কাছে পড়িবার অদম্য ইচ্ছা থাকিলেও পা কিছুতেই সরিতে চাহিত না। আজকাল তস্‌লীমের চোখের সামনে তাহার পা অচল হইয়া যাইত, হঠাৎ তস্‌লীমের সামনে পড়িয়া গেলে কিছু ধরিয়া কোণঠাসা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। তস্‌লীমটাও দুষ্ট কম ছিল না, কেহ নাই দেখিলে বালিকার পিঠের উপর একটা ছোট কিল্ অথবা একটা চিম্‌টি কাটিয়া চলিয়া যাইত। একদিন দুপুর বেলা তস্‌লীম ঘরে ঢুকিয়া দেখে---কেহ নাই, সব অন্দরের পুকুরে স্নান করিতে গিয়াছে। রওশন ভাত খাইতেছিল, তাহাকে ঢুকিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি ভাতের থালা ফেলিয়া এক কোণায় গুঁজিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তস্‌লীমের মাথায় দুষ্টামির খেয়াল চাপিল, কাছে একটা ভরা লোটা ছিল তাহাই নির্বিবাদে বালিকার মাথার উপর ঢালিয়া দিল—শাড়ী ফুঁড়িয়া কালো চুলের গোছা অধিকতর কালো হইয়া ফুটিয়া বাহির হইল। তস্‌লীমের বড় ইচ্ছা হইতেছিল ঐ কালো চুলগুলি স্পর্শ করে। কিন্তু বা-মাল ধরা পড়িবার ভয়ে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া পলাইতে হইল।

বালিকা শরমে মরিয়া হইয়া অচল পদার্থের মতো দাঁড়াইয়া রহিল। ঐ জলের ভিতর দিয়া কোন্ অজানা স্পর্শ তাহার সর্বাঙ্গে এক পুলক রোমাঞ্চ তুলিয়াছিল তাহা সে জানে না।

মা আসিয়া---কে রে?---বলিতেই বালিকা অসঙ্কোচে বলিয়া ফেলিল, জালাল। জালাল তাহার ছোট চাচাতো ভাই। 'বাঁদরটা আসুখ'---বলিয়া গৃহিণী ভাত বাড়িতে বসিয়া গেলেন।

অনেক ঠেলাঠেলি ও পীড়াপীড়ি করিয়াও যখন রওশনকে তস্‌লীমের সম্মুখে আনান গেল না, তখন অগত্যা তস্‌লীমকেই রওশনের

সম্মুখে আনার ব্যবস্থা হইল। রওশনকে খালি ঘরে আগে বসাইয়া তস্‌লীমকে ডাকা হইত। তস্‌লীম ঢুকিয়া দেখে একটি কাপড়ের ঘোঁচ্‌কার সম্মুখে একখানা দ্বিতীয় পাঠ।

প্রত্যেক দিন এই দেড় হাত ঘোমটা লইয়া টানাটানি করিতে করিতে এবং ছোট্ট ছোট্ট কিল চাপড় ও চিম্‌টির সদ্ব্যবহারে লজ্জার গাঙে যেন একটু একটু করিয়া ভাটা পড়িতে লাগিল। বইটা তাহার সম্মুখে খুলিয়া রাখিত মাত্র, বাহিরে কাহারও পদধ্বনি শুনিলে তস্‌লীম একটু জোরে জোরে বলিত, পড়, পড়, এবং নিজেই আগে আগে---'ভল্লুক দেখিয়া এক বন্ধু লাফাইয়া গাছে চড়িয়া বসিল'—ইত্যাদি পড়িয়া যাইত।

তস্‌লীম কত কথা বলিত, বালিকা প্রথম চুপ করিয়া থাকিত, শেষে হুঁ হাঁ না ইত্যাদি উত্তর দিয়াই ক্ষান্ত থাকিত। তস্‌লীমের ব্যাকুল মন আরও দীর্ঘ উত্তর শুনিবার জন্য অধিকতর ব্যাকুল হইয়া উঠিত। বহু সাধ্য-সাধনায়-বাহির করা এক একটি শব্দ যেন তাহার কানে সুধাবৃষ্টি করিত।

লেখা শিখাইবার নামে তস্‌লীম অবলীলাক্রমে শ্লেটে নিজের মনের কথাই লিখিয়া যাইত। সে-সব কথার আদিও নাই, অন্তও নাই; লেখকের লিখিয়া পরিতৃপ্তিও নাই এবং পাঠিকার পড়িবার উৎসাহেরও শেষ নাই। এ যেন যত চলে ততই লাভ।

তস্‌লীম তাহার স্বাভাবিক নিয়মে লিখিত না; ধীরে ধীরে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া পরিষ্কারভাবে, পড়িতে যেন শিশুরও না ঠেকে এমনি ভাবে, অনেকক্ষণ ধরিয়া লিখিত। বালিকা রওশনের বিদ্যার দৌড় কতদূর জানিয়াই তাহার এ কষ্ট-স্বীকার। প্রথম প্রথম রওশন শুধু পড়িয়াই চুপ থাকিত, বহু সাধ্য-সাধনায়ও নিজে কিছু লিখিত না। পরে 'হাঁটি-হাঁটি পা পা' গোছ আরম্ভ হইল---প্রথম শব্দ, তারপর বাক্য তারপর আরও বাড়িয়া চলিল। এখন লেখা-পড়া ঐ পর্য্যন্তই। পড়িতে বসিলে শ্লেটে লেখালেখি করিতে করিতে কখন যে দশটা বাজিয়া যায় তাহা তাহারা টেরও পায় না। অগত্যা ঘড়িটা যে খুব ফাষ্ট্ চলে এবং শীঘ্রই যে ইহার মেরামতের দরকার আছে, এ মন্তব্য করিয়া বড় অনিচ্ছার সঙ্গে তস্‌লীমকে উঠিয়া পড়িতে হইত। না হয় এখনই খাওয়ার জন্য ডাকিতে বেগম-মা নিজেই আসিয়া পড়িবেন।

যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই নাকি সন্ধ্যা হয়।

বেগম সাহেবা যে-ভয়টা মনে মনে পুষিতেছিলেন, শেষকালে সেই ভয়টাই প্রতিবন্ধক হইয়া উঠিল। তাঁহার স্বামী বাঁকিয়া বসিলেন।

রওশনের বাপের সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক পরিচয় দিতে গেলে বইয়ের চাইতে ভূমিকা বড় হওয়ার মতো ব্যাপার হইয়া পড়িবে। অথচ না বলিলেও যে-ইতিহাসটা বলিতে বসিয়াছি তাহা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। তাই যথাসম্ভব সংক্ষিপ্তভাবেই বলিতেছি।

সে অনেক দিনের কথা, মানুষের স্মৃতি ততদূর সঠিক যাইয়া পৌঁছে না। রওশনের মাতামহ অর্থাৎ চকবাজারের বিখ্যাত মিঞা-পরিবারের শেষ বংশধর সৈয়দ আবদুল করিম মিঞা পরলোক গমন করিয়াছেন, সে প্রায় চল্লিশ বৎসর। তাহারও পূর্বে তাঁহার ষ্টেটে তহশীলদারদের তদারক করিবার জন্য বাঁশবাড়িয়া গ্রামের ফকীর মোহাম্মদ নামে এক ব্যক্তি ম্যানেজার স্বরূপ নিযুক্ত ছিলেন। লোকটির পেটে বিদ্যা বেশী না থাকিলেও মগজে বুদ্ধি বেশ ছিল। তদুপরি অটুট স্বাস্থ্য এবং সুন্দর চেহারা তাঁহার সহায় ছিল। করিম সাহেব মৃত্যুর সময় এক স্ত্রী, দুইটি শিশু-কন্যা ও একটি শিশু-পুত্র রাখিয়া যান। এখন এ অসহায় পরিবারের ভার নিমক-হালাল্ চাকর ফকীর স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিলেন। তিনি সব সময় বলিতেন: "কী আর করি। খোদা আমার উপর এ বা'লা নাজেল করিয়াছেন। হাদীছ-শরীফে নাকি আছে: যে ব্যক্তি বিধবার নেগাহ্‌বানী করে না, হাশরের দিন হজরত তাহার জন্য সুপারিশ করিবেন না; হজরতের নিজের মা ও তাঁহার প্রথম প্রিয়তমাও ছিলেন বিধবা। আর খোদা সব গোণাহ মাফ করিবেন, কিন্তু আফ্‌সোস্ ঐ ব্যক্তির জন্য—যে নিজের মনিবের এতিম বাচচাকে বে-অছিলায় ছাড়িয়া যায়।"...কাজেই তাঁহার না থাকিয়া উপায় নাই। বিধবা বেগমের নামে জমিদারী শাসিত হইতে লাগিল।

দিনের পর দিন গড়াইয়া যায়---পুরাতন স্মৃতিও ধীরে ধীরে মন্দীভূত হইয়া আসে।

ফকীর মোহাম্মদ লোকটি পরহেজগার। তাই লোকে যথার্থই বলিত, খোদাপরস্ত্ লোক না হইলে মৃত মনিবের জন্য এত করে! তিনি এখন হইতে সকালে ফজরের নমাজের পর এক পারা কোর্‌আন-শরীফ ও হাজত-কবুলের অজীফা-টা শেষ না করিয়া কোনদিন মসজিদের বাহির হন না। একদিন রাত্রিতে এশা'র নমাজের পর তিনি সুরা য়াসিন বার কয়েক পড়িয়া নির্দিষ্ট নফল্ নমাজের উপর আরও চারি রাকাৎ পড়িলেন। নির্দিষ্ট তেলাওতের উপর আরও বেশী তেলাওৎ অজীফা পড়িয়া তবে বাহির হইলেন। মসজিদের পার্শ্বেই কবরস্থান। আজ তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া মরহুম সৈয়দ করিম সাহেবের কবর জেয়ারত করিলেন। তারপর আসিয়া বাড়ীর এক বর্ষীয়সী চাকরাণীকে ডাকিয়া লইয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

পুরাতন চাকরাণী মনিবের মেজাজ বুঝে---কল্কি লইয়া বসিল।

ফকীর সাহেব মুখ টিপিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: কি খবর?

ফুলির মা বলিল: কিছুই বলে না, শেষে বল্‌ছে কিছুদিন পরে জওয়াব দিবেন।

তারপর বৃদ্ধ ফকীর সাহেব দাড়ির ভিতর আঙুল চালাইতে চালাইতে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতায় ফুলীর মা'কে রিহার্সাল দিতে লাগিলেন—সে কেমন করিয়া বেগম সাহেবাকে বুঝাইয়া দিবে: উপরে এক খোদা আর নীচে ফকীর সাহেব ছাড়া তাহাদের আর দ্বিতীয় কেহ নাই, তাঁহার সাহায্য না হইলে যে এ সম্পত্তি চোর-ডাকাতে লুটিয়া লইবে, আর এ এতিম ছেলে-মেয়েগুলিকেই বা কে মানুষ করিবে, ইত্যাদি।---ফুলীর মা'র কিছু মনে থাকে, চৌদ্দ আনা থাকে না।

বিধবা বেগম সাহেবার ভাবনার অন্ত নাই---অতীত জীবনের স্মৃতি একে একে মনের কোণে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল---পিতামাতা দেবতুল্য স্বামীর হাতে সমর্পণ করিয়া স্বর্গগত হইয়াছেন সে অনেকদিন। এমন রূপ-গুণ সম্পন্ন স্বামী কয়জনের ভাগ্যে জোটে? অতুল সম্পত্তি, পুত্রকন্যা সবই তাঁহার আছে। মানুষ যাহা কিছু পাইলে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করে সে-সবের তাঁহার অভাব ছিল না, এখনো নাই।

তবে আজ এমন হইল কেন? একজনের অভাবে সব সুখ-শান্তি কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল? সম্পত্তি শাসনের জন্য—নিজের পুত্র-কন্যার আদর-আব্‌দার পূরণের জন্য তাঁহাকে এখন পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। রাগ হয়, যিনি তাঁহাকে এ অবলা নারী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার উপর। এ যে বাড়ীর চতুর্দিকের ঘেরা দেওয়াল, তাহার বাহিরে যাইবার, তহ্‌শীলদার কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলিবার, টাকা-পয়সার হিসাব লইবার অধিকার পর্যন্ত তাঁহার নাই। কেন এ অবিচার?

মনে পড়ে পাশের পাড়ার উকীল বরদাবাবুর এক কন্যা বিধবা হইয়াছে। এক ছেলের মা মাত্র, তথাপি কি নির্ভীকভাবে সে নিজের স্বামীর সম্পত্তি শাসন করিতেছে। নিজের চোখে সমস্ত হিসাব-পত্র দেখে নিজেই তহ্‌শীলদার ম্যানেজার প্রভৃতির সঙ্গে পরামর্শ করে, আদেশ উপদেশ দেয়। তাহার পিতামাতা তাহাকে স্কুলে পাঠাইয়া ইংরাজী বাংলায় ভালো করিয়া শিক্ষিতা করিয়াছেন।—এ চিন্তার সূত্র ধরিয়া বেগম সাহেবার রাগ যাইয়া পড়িল মৃত মাতাপিতার উপর। কেন তাঁহারা তাঁহাকে শিক্ষা দীক্ষা দেন নাই? এ পিঁজরার পাখী করিয়া রাখিয়াছিলেন? আজ তিনি তাঁহার স্বামীর সম্পত্তি, এতিম বাচচাগণের হক্ রক্ষা করিতে পারিতেছেন না! পর ত পর—তাহারা যে সব নষ্ট করিতেছে না তাহা কে জানে?

তাহার বেতনভোগী চাকর, একদিন তাঁহার একটুখানি মেহেরবাণীর ভিক্ যাহাকে স্বর্গসুখ দিত, আজ সে তাঁহার এ অসহায় জীবনের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া তাঁহার কাছে স্বামীত্বের আর্‌জী পেশ করিয়াছে! রাগে এবং ঘৃণায় তাঁহার চোখ ফাটিয়া জল আসিল। এ নিস্তব্ধ নিশীতে নিঝুম গৃহতলে বসিয়া তাঁহার সমস্ত অন্তর ধুকিয়া ফরিয়াদ করিয়া ফিরিতেছিল, সে সুপ্ত নিশার যিনি মালিক তাঁহার চরণতলে—।

পালঙ্কের উপর সুপ্ত শিশু পুত্র-কন্যার মুখের দিকে চাহিতেই তাঁহার মনে যেন আবার নূতন চিন্তার উদ্রেক হইল। মনে হইল: ফুলীর মা ত মিথ্যা বলে নাই; আমাদের দারুণ দুর্দিনের সময় যখন কাছে আসিয়া

দাঁড়াইবার কোন লোক ছিল না, তখন চাকর হইলেও ফকীরই ত সমস্ত বিপদ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছে; আজিও ত তাহারই চেষ্টায় সম্পত্তি শাসিত হইতেছে; আজ তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলে সে যদি বাঁকিয়া বসে---সে যদি শত্রুতা করিতে লাগিয়া যায়, তখন তাঁহার স্বামীর সম্পত্তি কে দেখিবে, কে তাঁহার এতিমদের হক্ রক্ষা করিবে? সারা রাত তাঁহার ঘুম হইল না। হতভাগিনী নারী কাঁদিয়া কাঁদিয়াই সারাটা রাত কাটাইলেন।

ফকীর মুনশীর এবাদতের পরিমাণ বাড়িয়া গেল। বেলা নয়টায়ও এখন তিনি মস্জিদ হইতে বাহির হন না; আর ঐদিকে রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত মস্জিদে তাঁহার আওয়াজ শুনা যায়। এবাদতে নাকি মানুষের দিলের ময়লা কাটিয়া যায়। বাতেনী কথা বলা মুশকিল কিন্তু জাহেরী ময়লা যে কাটিয়া যায় একথা মুন্শী সাহেবের মধ্যে দেখা গিয়াছে। দিন দিন তাঁহার কাপড় চোপড় পরিষ্কার হইয়া উঠিতে লাগিল। দুই একটা কাপড় ধোপার বাড়ী ঘুরিয়াও আসিতে লাগিল। একজোড়া নূতন জুতাও কিনিলেন। আগে সারা জীবন তিনি চার পয়সা দামের কিশ্তী-টুপি মাথায় দিতেন—এখন আট আনা দিয়া এক গোলগাল ভদ্রগোছের টুপিও কিনিয়া ফেলিলেন। তাঁহার এ পরিবর্তনে বেকুবেরা হাসিল, বুদ্ধিমানেরা মনে করিল পৃথিবী পরিবর্তনশীল।

সেদিন জুমা-বা'দ মুন্শী সাহেব মোয়াজ্জেনকে ডাকিয়া বলিলেন। দেখুন মোয়াজ্জেন সাহেব, রবিবার দিন আমার দশজন মোল্লার দরকার, এই একটু কবর জেয়ারৎ আর দাওতে-মক্বুল পড়াতে চাই।

তারপর হাঁকিলেন: এ কালু, একটু তামাক দে।

---তা'রা খুব সকালে আস্বে, এসেই সুলতান বায়েজীদ বোস্তামীর দরগায় জেয়ারতে যাবে, সেখান থেকে এসে খেয়ে দেয়ে জোহরের নমাজের পর বদর শাহে'র দরগা, আমানত শাহে'র দরগা, মেহেরুল্লা শাহের দরগা, কদম মোবারক---এমনি শহরের সব দরগাগুলি জেয়ারৎ করবে, তারপর

এসে দাউয়াৎ পড়বে। হাঁ, বড় মৌলবী সাহেবকেও ব'লে আসবেন—রাত্রে খাওয়ার পর মৌলুদ হবে।

মোয়াজ্জেন সাহেবের মুখ হাস্যোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি আরামের সঙ্গে নিশ্বাস নিয়া বলিলেন: আচ্ছা, খয়রাৎ কত ক'রে দিবেন? খয়রাতের কথা আগে না বল্লে আজকাল ওরা আসতে চায় না কি না। সবাই ঠকায় যে।

ফকীর সাহেব বলিলেন: তা ব'লে আমিও ঠকাবো নাকি? একটা বিবেচনা ক'রে দেবো আর কি।

দুনিয়ার সব আদালতে ঘুষ চলে—সব হাকিমের যিনি বড় হাকিম তাঁহার আদালতে আরও বেশী চলিবারই কথা।

বেগম সাহেবাকে জানান হইল, রবিবার দিন মরহুম সৈয়দ সাহেবের ওফাতের দিন; ঐদিন তাঁহার আত্মার কল্যাণার্থে মৌলুদ ও জেয়ারৎ হইবে। তাঁহার স্বর্গগত স্বামীর এ স্মৃতিপূজায় বেগম সাহেবার দেহ-মন উন্মুখ হইয়া উঠিল—তিনি প্রাণ ঢালিয়া যোগাড়-যন্ত্রে লাগিয়া গেলেন। আজ তাঁহার দেহ-মনে যেন জোয়ার আসিল সব যেন তিনি ভাসাইয়া দিবেন। দাস-দাসীদের ডাক-হাঁক নাই, সবদিকে নিজেই ছুটিয়া যান, নিজ হাতেই সবকিছু করিতে চান। সকালে ছেলেমেয়েগুলিকে গোসল করাইয়া ভালো জামা-কাপড় পরাইয়া দিয়াছেন—আজ যেন কিসের উৎসব। নিজেও গোসল করিয়া আসিলেন—কিসের এক পুলকানন্দে তাঁহার সারা দেহ যেন রোমাঞ্চিত হইতেছিল। আজিকার আলো-বাতাসে যেন তিনি তাঁহার স্বর্গগত স্বামীর ছোঁওয়া অনুভব করিতেছিলেন। মনে পড়িতেছিল তাঁহার প্রথম বিবাহ-দিনের কথা; তখনো স্বামীর সঙ্গে পরিচয় হয় নাই, তথাপি কোন্ অজানা স্পর্শসুখে তাঁহার অঙ্গ কাঁপিয়া উঠিত, কোন্ অদৃশ্য সুন্দরের পরশ-সুখে তাঁহার সারা দেহে রোমাঞ্চ খেলিয়া যাইত।

আজও মনে হইতেছে যেন তাঁহার স্বামী অদৃশ্যলোকে থাকিয়া সব কিছু দেখিতেছেন—তাঁহার দৃষ্টি-ছোঁয়া আসিয়া যেন তাঁহার শরীরে রোমাঞ্চ তুলিতেছে। নিজের ময়লা অঙ্গবাসের প্রতি চাহিয়া তাঁহার লজ্জা হইতেছিল, ফুলীর মা'কে ডাকাইয়া তিনি মাথা আঁচড়াইতে বসিলেন—দুই

বৎসর পরে আজ প্রথম তাঁহার মাথায় তৈল-চিরুণী উঠিল। বেশ পরিবর্তন করিয়া ভালো কাপড় পরিলেন।

ভিতরের কথা এক ফুলীর মা ছাড়া আর কেহ জানিত না। ফুলীর মা মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিল এবং নিজে একা হাসিয়া যেন তাহার পরিতৃপ্তি হইল না। বেগম সাহেবার কেশ-বিন্যাস করিয়াই তাড়াতাড়ি বাহির-বাড়ীতে ফকীর সাহেবকে সংবাদ দিল: কাজ ফতে।

ফকীর সাহেব একগাল হাসিয়া বলিলেন: দূর্, তাও কি হয়?

—আপনি নিজেই দেখে আসুন্ না। আজ বাহিরের উঠানেই পাক হইতেছে, সেখানে বিবি সাহেবা আছেন।—অপেক্ষাকৃত চাপা স্বরে বলিল: বাগানের কাছে বেড়ার ছিদ্র দিয়ে দেখতে পাবেন।

ফকীর সাহেব একটা দা লইয়া ধীরে ধীরে সেদিকে চলিলেন—যেন কিছু কাটিতে যাইতেছেন।

বেড়ার ছিদ্র-পথে সুসজ্জিতা বেগম সাহেবাকে দেখিয়া তাঁহার মুখ আনন্দোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—আনন্দাতিশয্যে মানুষের মুখ যে কত সুন্দর হয় তাহা দেখিবার জিনিষ। ফুলীর মা'কে জিজ্ঞাসা করিলেন: তিনি কি আমাদের উদ্দেশ্যের কথা জানেন? তাঁকে ত অন্য রকম বলা গিয়েছে।

ফুলীর মা হাত দেড়েক পরিমাণ মাথা হেলাইয়া বলিল: তা আর জানেন না? মেয়েলোক বাবা, পিঁপড়ার পেট-কামড়ী এবং চিনাজোঁকের হাসি বোঝে, আর একটা ঘরের মানুষের পেটের কথা—!

ফকীর সাহেব উপরের দিকে চাহিয়া বলিলেন: শোকর্ আল্হাম্-দুলিল্লাহ্...।

সকালে মোল্লারা আসিল। ফকীর সাহেব তাঁহাদিগকে আট আনা পয়সা দিলেন, হজরত বায়জীদ বোস্তামীর মাজারে বাতি এবং সম্মুখস্থ পুকুরের গজাল মাছ ও বড় বড় কচ্ছপগুলিকে কলা ও মুড়ী কিনিয়া খাওয়াইবার জন্য।

সকালেই তাহারা রওয়ানা হইয়া গেল এবং প্রায় বেলা আটটা পর্য্যন্ত হাঁটিয়া তিনমুখো রাস্তায় আসিয়া পৌঁছিল। বটগাছের ছায়ায় একটু বিশ্রাম করিতে সকলে বসিয়া পড়িল।

হামদু মিঞাজি বলিল: চল, দোকানেই বসি গে।

কথাটা কাহারও মনে অযৌক্তিক ঠেকিল না—ওখানে হুঁকার মাথায় কল্কি হইতে ধূম ত নির্গত হইতেছেই।

সফিউল্লা বলিল: চা না খেলে সে এতগুলি লোককে তামাক দেবে কেন?

তখন দুই চারিজন এক সঙ্গেই বলিয়া উঠিল: বেজায় ক্ষিধে পেয়েছে।

হিসাব করিয়া দেখা গেল আট আনায় হয়। সকলের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। তারপর চা, পান, তামাক ও বিড়ির সাথে সাথে গল্প শুরু হইল এবং তাহা বেলা এগারটার এদিকে আর থামিল না।

তখন গরীবুল্লা মিঞাজী বলিল: চল—

সকলে প্রায় একসঙ্গে প্রশ্ন করিয়া উঠিল—কোথায়?

—ফেরৎ, আর কোথায়?—সকলের নাসারন্ধ্র দিয়া আরামের নিঃশ্বাস বাহির হইয়া পড়িল, বুকটাও একটু হালকা বোধ হইল। এবং সঙ্গে সঙ্গে সকলের মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল।

আবদুল জব্বার মোল্লাজী বিড়িতে শেষ দম্‌টি খেঁচিয়া লইয়া বলিল: কেন ফেরৎ যাব না? পয়সা যা দিবে তা ত জানাই আছে, যতদূর আস্‌ছি ততদূরের ওজনেও দেবে না। বড়লোকেরা খয়রাতের বেলায় যে মুচী!

জোহরের পর তাহারা সহরের অন্যান্য দরগায় জেয়ারৎ করিয়া আসিল। তিনটার সময় ফিরিয়া আসিয়া 'দাউতে-মকবুল' পড়িতে বসিল—সম্মুখে একথালা বিচি লইয়া সব গোল হইয়া ঘিরিয়া বসিল। মুখে খৈ ফুটিতে লাগিল। হাত হইতে অনর্গল বিচি পড়িতে লাগিল। সেকেণ্ডে

কত শব্দ পড়িতে পারা যায় হিসাব করিয়া দেখি নাই, কিন্তু শতাধিক খিচি মুঠে মুঠে পড়িতে লাগিল।

রাত্রে খাওয়ার পর মৌলুদ,—মওলানা জুলফিকর আলী সাহেব বিছানার পশ্চিম প্রান্তে বিরাট তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়াছেন। তাঁহার আশে-পাশে মোল্লাগণ। তারপর সুদীর্ঘ বিছানা ব্যাপী ছেলে বুড়ো স্থানীয় লোক বসিয়া পড়িয়াছে। উঠানের এক প্রান্তে বড় 'ডেকে' শির্নী পাকানো হইতেছে—অধিকাংশের দৃষ্টি সেই দিকে। মওলানা সাহেব এল্‌হান্‌ করিয়া প্রথমে কোরাণ শরীফের একটা আয়েৎ পড়িলেন, তারপর উর্দ্দু তর্‌জমায় শ্রোতৃবর্গকে তাহার অর্থ বুঝাইয়া দিলেন। তারপর নমরুদ ফেরাউন শাদ্দাদের বেহেস্ত, হারুৎ মারুৎ কারুণ ইত্যাদি হইতে বেহেস্তের হুর পরিদের সৌন্দর্য্য, দোজখের আগুনের সত্তর গুণ উত্তাপ, মায় সুদ এবং দাড়ির ফজিলৎ পর্য্যন্ত উর্দ্দুতে বয়ান করিলেন। অধিকাংশ শ্রোতা ঘুমে ঢুলিতে লাগিল। বৃদ্ধেরা কোনো প্রকারে মওলানা সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বোধ হয় বেহেস্তের আর বেশী দেরী নাই এ ভরসার জোরে ঘুমকে ঠেলিয়া রাখিয়াছিলেন। যুবকদের দৃষ্টি ডেকের দিকে নিবদ্ধ।

হঠাৎ কোথা হইতে তুর্কী টুপী মাথায় একটি ছেলে দাঁড়াইয়া বলিল: হুজুর, উর্দ্দু ত এখানে কেউ বোঝে না, বাঙলায় বল্লে সুবিধা হয়।

হুজুর ত কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তাঁহার মুখের উপর কথা! বিস্ময়ের ভাব কাটিয়া যাইবার পর গর্জিয়া বলিলেন: বস মিঞা, ওয়াজের সময় বেয়াদবী কর?—তারপর ফকীর সাহেবের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন: ছেলেটি ইংরাজী পড়ে, না?

ফকীর সাহেব মাথা নাড়িয়া জানাইলেন: হাঁ।

—দেখুন ত কেমন ধরে ফেলেছি। ঐ নচ্ছারগুলিকে দেখলেই চিনা যায়। দাড়ি নাই, সাম্‌নে এক হাত চুল, ইস্‌লামী আদব-কায়দার বো নাই, মুরুব্বীর সাথে বেয়াদবী করবে। আরে মিঞা, তোমার বাপের সমান আমার বয়স, আর তুমি আস আমাকে উপদেশ দিতে।

এ অভদ্রোচিত ও অপ্রাসঙ্গিক উত্তরে রহিমের সমস্ত শরীর রিরিরিরি করিতে লাগিল। তথাপি নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল: হুজুর, উপদেশ নয়, এ ত সত্য কথাই বলছি।

—আরে মিঞা, সত্য কথা! তুমি আমারে ইস্‌লামী জবান্, যার এক এক লফ্‌জে দশ দশ নেকী—তা ছেড়ে কাফেরী জবানে ওয়াজ করতে বল?

রহিম আর থাকিতে পারিল না, এক রকম রাগিয়াই বলিতে যাইতেছিল: 'আপনি বাড়ীতে কোন্ জবানে—?' কথা শেষ হইতে পারিল না, মওলানা সাহেব গর্জিয়া উঠিলেন। আশে-পাশের সবাই রহিমকে জোর করিয়া চাপিয়া দিল: হুজুরের বদ্-দোওয়া পড়িবে।

আবার ওয়াজ শুরু হইল।

কিছুক্ষণ পর রহিম আবার দাঁড়াইয়া পড়িল, পার্শ্ববর্তী সকলে তাহার কাপড়ের কোঁচা ধরিয়া টানিতে লাগিল। সে কিন্তু বসিল না, বলিল: 'হুজুর, আমার একটা সওয়াল, সেই কথা নয়, আমি একটা কথা বুঝ্‌তে পারছি না—'

হুজুর চোখ তুলিয়া চাহিয়া বলিলেন: 'আচ্ছা বলো।'

—'হুজুর, এ-ত মৌলুদ শরীফ, হজরতের বেলাদৎ অর্থাৎ তাঁর জন্মের স্মৃতি-উৎসব, এতে তাঁর জীবনের শিক্ষা ও সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে কিছু না ব'লে আপনি ত শুধু বেহেস্ত দোজখ এবং সুদ দাড়ি দিয়েই শেষ কর্‌ছেন—'

—'আবার তুমি উল্টা কথা শুরু করলা মিঞা। এ সব কি হজরতের কথা নয়? ইসলামের কথা নয়? হজরত এসব না শিখালে আমরা কোথা থেকে জানতাম?'

অবান্তর কথা শুনিলে মানুষের রাগ না হইয়া পারে না; রহিমের রক্ত গরম হইয়া উঠিল: 'মওলানা আপনি কিচ্ছু জানেন না—'

—'কি, আমি কিছু জানি না ?' মওলানা ক্ষুধিত শার্দ্দুলের মতো গর্জিয়া উঠিলেন: 'আমি কিছু জানি না ? সওয়াল কর্ দেখি, বাপ-কা বেটা হ'লে ?'

এই রকম অবস্থায় পড়িলে সওয়াল না করিয়া আর উপায় থাকে না। রহিমের কথাও যেন এবার শ্রোতাদের মনে লাগিয়াছে, তাহারা এবার হৈ চৈ না করিয়া চুপ করিয়াই রহিল।

রহিম বলিল: 'আচ্ছা বলুন ত, হজরত কত সনে জন্মেছিলেন ?

'কেন, কেন, এ এ,' চক্ষু তাহার কপালে উঠিল,—'এ সাত শত হিজরীতে।'

রহিম শুষ্ক হাসি হাসিল, কিন্তু তাহার চোখ দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল,—'হাঁ, সাত শত! তার উপর হিজরীও—সালাম আলায়কুম জনাব!' এই বলিয়া সে হন্ হন্ করিয়া মজলিস্ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

ফকীর সাহেব হাত নাড়িয়া বলিলেন: 'বলুন আপনি, ওই ছোঁড়াটা ইংরেজী পড়ে একেবারে গোল্লায় গেছে।'

মওলানা সাহেব এবার সা'দী এবং রুমীর বয়েৎ টানিয়া শুরু করিলেন।

কিছুক্ষণ পর—তখন শির্নির ডেক্‌চী চুলার উপর হইতে নামান হইয়াছে, মওলানা সাহেব ফকীর সাহেবের দিকে ফিরিয়া কহিলেন: 'আজ তবিয়েৎ বিশেষ ভালো নয়, মোখতছর করিয়া দিই।'

ফকীর সাহেব বলিলেন: 'আচ্ছা, আচ্ছা, হুজুরের যা-মর্জি।'

মওলানা সাহেব মোনাজাতের জন্য হাত তুলিতে যাইবেন এমন সময় ফকীর সাহেব মওলানা সাহেবের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া কি যেন বলিলেন। উভয়ের চোখ-মুখ হাস্যোৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

চিকের অন্তরালে বেগম সাহেবা অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন। মওলানা সাহেবের উর্দ্দু তক্‌রির্ কিছুই বোঝা যাইতেছিল না, শুধু ক্ষুধাকে দমন করিয়া কতক্ষণ বা বসিয়া থাকা যায়। কিন্তু মোনাজাতের

জন্য হাত তুলিতেই তিনি আবার সুস্থির হইয়া বসিলেন। সমস্ত হৃদয় তাঁহার উন্মুখ হইয়া উঠিল। ভাবিলেন তাঁহার স্বামীর পারলৌকিক আত্মার মঙ্গল কামনা করা হইতেছে। তিনি একাগ্রচিত্তে অতিশয় ভক্তির সহিত এ প্রার্থনায় যোগ দিলেন। সমস্ত হৃদয় দিয়া তাঁহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছিল: আমীন। আমীন।

বেগম সাহেবা নিজের কামরায় আসিয়া দেখিলেন শিশু ছেলেমেয়েরা বিছানায় পড়িয়া অকাতরে ঘুমাইতেছে। তাহাদের দিকে চাহিয়া তাঁহার মন আবার উতলা হইয়া উঠিল; অতীতের সমস্ত সুখ-স্মৃতি আসিয়া যেন তাঁহাকে বিঁধিতে লাগিল। ধীরে ধীরে ট্রাঙ্ক খুলিলেন, সমস্ত কাপড় চোপড় নামাইয়া একেবারে তলা হইতে বহু দিনের বাঁধানো একখানি ছবি বাহির করিলেন। নব-বিবাহিত দম্পতির ছবি। স্বামী তখন বেজায় সৌখিন ছিলেন, একদিন সকলের অজ্ঞাতে তাঁহাকে বাগান বাড়ীতে লইয়া গিয়া এক রকম জোর করিয়াই এই ছবি তোলা হইয়াছিল। সে সব স্মৃতি আজ ব্যথার মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার সমস্ত চিত্তকে হাতুড়ি-পিটা করিতে লাগিল। তিনি উন্মনা হইয়া গেলেন, বহুক্ষণ এমনি ভাবেই কাটিল—হঠাৎ তাঁহার শিথিল হস্ত হইতে ছবিটি মেঝেতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। ঝন্ ঝন্ শব্দে তিনি চমকিয়া উঠিলেন। কিন্তু সুপ্ত শিশু-পুত্রের মুখের উপর চোখ পড়িতেই তাঁহার হৃদয়ে নূতন ভাবের সঞ্চার হইল। তিনি বিছানায় উঠিয়া দুই হাতে ছেলেকে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিলেন, আর চুম্বনের উপর চুম্বন দিয়া তাহার ঘুমন্ত চোখ-মুখ ভরিয়া দিলেন। তারপর শিশুর শীতল গালখানি নিজের গালের উপর রাখিয়া তিনিও চোখ বুজিলেন।

মোল্লা সাহেবরা রাস্তায় উঠিয়াই দিয়াশলাই জ্বালাইয়া পয়সা গণিয়া দেখিল, মাত্র চার আনা করিয়া মিলিয়াছে। রোগীর মুখে হঠাৎ তিক্ত ঔষধ ঢালিয়া দিলে যেমন তাহার চেহারা হয় তাহাদের চেহারাও মুহূর্তে তেমন হইয়া উঠিল। মওলানা সাহেব বলিলেন: 'বেটা আমাকেও আট আনার বেশী দিত না। শেষে মোনাজাতের সময় যখন কানে কানে বললু—বেগম

সাহেবার সঙ্গে তার নিকাহ্ যাতে হয় দোওয়া করবার জন্য, তখন ব'লে ঠিক ক'রে নিয়েছিলাম এক টাকা খয়রাৎ দিতে হবে—তাইতে এক টাকা, না-হয় আট আনার বেশী কিছুই মিলত না।'

তখন গরীবুল্লা মিঞাজী সফিউল্লার কানে কানে বলিল দেখ, বায়জীদ বোস্তাম না গিয়ে, ফিরে এসে আর চা খেয়ে কি বুদ্ধিমানের কাজই করেছি। দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে আবার বলিল: 'জান হে শুধু বাতাসে দাড়ি পাকে নি....।'

হামদু মিঞাজী বলিল: আচ্ছা মানুষের আক্কেলটা কেমন দেখ ত ভাই? বেটাদের হায়াতে মউতে আমরা না হ'লে হয় না—কেউ মরুক অম্‌নি ডাক মোল্লা, কারও ছেলে হোক অম্‌নি ডাক মোল্লা, অথচ পয়সা দেবার বেলা টো টো।'—তারপর দুই হাতের বৃদ্ধ অঙ্গুলি নাড়িয়া তাহার বাস্তব চিত্রও দেখাইয়া দিল।

অথচ বাঙাল চাষারা দিন্ মজুরী ক'রেও কমপক্ষে আট আনা পায়, দুত্তোর—

আবদুল গলা সাফ করিয়া লইয়া বলিল: আমরা ইস্‌লামের জন্য কী না কর্‌ছি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়্‌ছি, রোজা রাখছি, দাড়ি রাখছি, লম্বা কোর্তা পর্‌ছি, কোনদিন ধুতি তক্ পরি না—অথচ আমাদের এ হাল। আর তা'রা কোঁচা মেরে ধুতি পরে, দাড়ি চাঁছে, নমাজ নেই, রোজা নেই অথচ তাদের এক একটা ভুঁড়ি যেন এক একটা জাহাজের বয়া। এই ত খোদার বিচার।'

গরীবুল্লা: 'তৌবা-তৌবা নাউজুবিল্লা বলো, পা'ক তিনি, তাঁর দোষ দিচ্ছো কেন, কমবক্ত!'

পারিপার্শ্বিক ঘটনার আবর্তে পড়িয়া এমন অনেক কাজ করিতে হয় যাহা সর্বান্তঃকরণে কখনও গ্রহণ করা যায় না।

নিজের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া বেগম সাহেবাকেও শেষকালে আত্মসমর্পণ করিতে হইল।

শেষ বয়সের বিবাহ, দেরী করিবার কোন দরকার নাই; একদিন একজন মৌলবী ডাকিয়া পরিণয়-ক্রিয়া শেষ হইয়া গেল।

ফকীর মোহাম্মদের পৈতৃক গ্রাম বাঁশবেড়িয়াতে, তাঁহার প্রথমা স্ত্রী এবং তাঁহার গর্ভের দুইটি শিশু-সন্তানসহ ওখানে থাকেন।

ফকীর সাহেব মধ্যে মধ্যে যান, আসেন।

এ বিবাহের পর হইতে তাঁহার পৈতৃক বাড়ী সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে লাগিল---বাঁশের ঘরের জায়গায় মাটির ঘর, তারপর পাকা---।

জায়গা জমিও বাড়িতে লাগিল। পাড়ার লোকেরা দেখিয়া বলে: 'খোদা যিছ্‌কো দেতা হে ছপ্পর ফাড়্‌কে দেতা হে!'

এবার পুত্র দুইটিকেও সহরে লইয়া আসিলেন---বেগম সাহেবা আদরের সঙ্গেই তাহাদিগকে নিজের স্নেহচ্ছায়াতলে আশ্রয় দিলেন।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব বাড়িয়া চলিল---ফকীর সাহেব ও বেগম সাহেবার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। বেগম সাহেবার বড় মেয়েটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার বয়সে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহার দিকে চাহিলে ফকীরের দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে, আবার নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্র হামীদের দিকে চাহিয়া তাহার নাক-মুখ কুঞ্চিত হইয়া ওঠে। ভাবটা এই: 'কী ছেলে হ'ল, মোটেই বাড়ছে না।'

বেগম সাহেবা কন্যার বিবাহের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। চারিদিক হইতে প্রস্তাব আসে, কিন্তু ফকীর কোন না কোন ওজর দেখাইয়া তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দেন। কি মতলব, কে জানে।

একদিন হঠাৎ বড় মেয়েটির অসুখ হইয়া পড়িল। ফকীর সাহেব নিজেই ঔষধ-পত্রের ব্যবস্থা করিলেন।

বেগম সাহেবা ডাক্তার আনিতে বলিলে ফকীর যুক্তিসঙ্গত কথাই বলিলেন: 'ডাক্তার এনে লাভ কি? ডাক্তারকে ত আর দেখান হবে না, অনর্থক পয়সা খরচ! আমি ডাক্তারকে ব'লে ঔষধ নিয়ে আসছি।'

ঔষধ লইয়া আসা হইল, খাওয়ানোও হইল, পরদিন রোগিণী চিরতরেই রোগ ও ঔষধ হইতে মুক্তি পাইল।

বৎসর শেষ হইতে না হইতেই মাত্র দুই একদিনের জ্বরে বেগম সাহেবার একমাত্র পুত্রটিও মারা গেল। ডাক্তার ডাকিবার আগে ফকীর সাহেব একটা কি টোট্‌কা ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে এমন ফল হইল যে ডাক্তার আর ডাকিতে হইল না। ফকীর সাহেব দরবিগলিত ধারায় অশ্রু বিসর্জন করিলেন। আর অনাথিনী বেগম; তাঁহার কি চোখে পানি আছে যে কাঁদিবেন?—বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া গেলেন। পরদিনও তাঁহাকে ভূশয্যা হইতে উঠানো গেল না। ফকীর সাহেব কাঁদিয়াই বলিলেন: 'হায়াৎ মউৎ খোদার হাত--কী করা যায়?'

বেগম সাহেবা নিহত-শাবক বাঘিনী যেমন করিয়া শিকারীর দিকে তাকায় তেমনি করিয়া একবার মাত্র তাকাইলেন—ভিতরের অত্যধিক উত্তেজনা সহ্য হইল না, পরক্ষণেই তিনি বেহুঁশ হইয়া ঢলিয়া পড়িয়া গেলেন।

বাহিরে কিছু বলিবার উপায় নাই; কিন্তু বাড়ীর এবং আশেপাশের সকলের মনে সন্দেহ-দ্বন্দ্ব চলিতেছে—এ সব মোটেও স্বাভাবিক মৃত্যু নয়!

বেগম সাহেবা যেন নূতন করিয়া বিধবা হইলেন। স্বামীর সঙ্গে দেখাশোনা ছাড়িয়া দিলেন, নিজের কনিষ্ঠা কন্যা জাহানারাকে লইয়া তিনি আলাদা ঘরে বাস করিতে লাগিলেন। সে-কামরা হইতে বড় একটা বাহির হন না। জাহানারাকেও বাহির হইতে দেন না। অলঙ্কারপত্র সাজসজ্জা ছাড়িয়া দিলেন। প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর যেমনটি ছিলেন ঠিক আবার তেমনটি হইয়া গেলেন।

কন্যা জাহানারার দিকে চাহিলে তাঁহার চোখ-মুখ অশ্রুপ্লাবিত হইয়া ওঠে, তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া পড়িয়া থাকেন। কোন প্রকারে দিন গণিয়া গণিয়া কাটাইতে পারিলেই যেন বাঁচেন।

দুর্বিসহ শোকযন্ত্রণা, না পারিল সময়কে ধরিয়া রাখিতে, না পারিল শরীরের বাড়ন্তিকে ঠেকাইয়া রাখিতে।

দেখিতে দেখিতে জাহানারার বিবাহের বয়স হইয়া পড়িল। চতুর্দিক হইতে ঘটকেরা হাঁটাহাঁটি করিতে লাগিল। কিন্তু ফকীর সাহেব 'এখন

নয়' বলিয়া তাহাদিগকে একে একে বিদায় করিয়া দিলেন। বেগম সাহেবা মনের আগুন মনেই চাপিয়া রাখিলেন—স্বামীকে কিছু বলিতে সাহস এবং প্রবৃত্তি তাঁহার হইল না। জাহানারার বয়স সতর আঠার হইতে চলিল, তথাপি তাহার বিবাহের কোন কথা নাই। ভিতরে ভিতরে তাঁহার শরীর জ্বলিয়া যাইতেছিল।

বৎসরের পর বৎসর গড়াইয়া চলিল।

একদিন কথায় কথায় ফকীর সাহেব বাড়ীর বাজার-মুন্সীকে বলিলেন: 'হামীদের সঙ্গে জাহানারার বিয়ে হলে কেমন হয়?'

বাজার-মুন্সী ত হা করিয়া রহিল। তাহার মুখে কোন উত্তরই যোগাইল না। হামীদ ফকীর সাহেবের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

শেষকালে বাজার-মুন্সী আমতা আমতা করিয়া বলিল: 'সে ত জাহানারার তিন চার বৎসরের ছোট হবে।'

—'ও-তে কি, মুন্‌শী সাহেব। আপনারা হাদীস পড়েন নি, তাই এমন কথা বলছেন। এ ত সুন্নত আঁ-হজ্‌রত পঁচিশ বৎসর বয়সে বিয়ে করেছিলেন চল্লিশ বৎসরের বিবি খোদেজাকে।'

মুন্‌শী সাহেবের মন যেন সুন্নতের দোহাই শুনিয়াও সায় দিতেছিল না। সে চুপ করিয়া রহিল।

কথা আর আগুন চাপা থাকে না।

ধীরে ধীরে সব বেগম সাহেবার কানে গেল। কিন্তু কন্যার জন্য দীর্ঘনিশ্বাস এবং অশ্রু ছাড়া তাঁহার আর অন্য সম্বল ছিল না। তাঁহার সারা দেহ-মন কাঁপিয়া উঠিল। ভাবিলেন: না, কিছুতেই হ'তে পারে না; আমি আমার মেয়ে দেব না।—কিন্তু নিজের মৃত পুত্র-কন্যার কথা মনে হইতেই তিনি শিহরিয়া উঠিলেন—যদি....! আর ভাবিতে পারিলেন না। —না, আমি বাধা দেব না, মা আমার বাঁচিয়া থাক।—সব অনর্থের গোড়া কোথায়, তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না। সম্পত্তি, সম্পত্তি, হায়! স্বামী যদি সম্পত্তি রাখিয়া না যাইতেন তাহা হইলে

আমার পুত্র-কন্যারা বাঁচিয়া থাকিত, আমি ভিখারিণী হইয়াও রাজরাণীর মতো সুখে থাকিতাম।

তাঁহার কাছে প্রস্তাব আসিতেই তিনি সম্মতি দিলেন: হামীদের সঙ্গে জাহানারার বিবাহ হউক।

ফকীর সাহেব বড় ধুমধামের সঙ্গে আয়োজন সুরু করিলেন।

একদিন, শুভদিন এবং শুভক্ষণে কিনা জানি না, বাইশ বৎসরের জাহানারার সঙ্গে আঠার বৎসরের হামীদের বিবাহ হইয়া গেল। এই নব-দম্পতিই আমাদের রওশনের জনক জননী। ইহাদের দাম্পত্য-জীবনের কাহিনী এ গল্পের বিষয়ভুক্ত নহে।

হামীদ সাহেব তসলীমের সঙ্গে রওশনের বিবাহ হইতে পারে না বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। জাহানারা যখন রাগ করিয়াই বলিলেন, হইতে পারে এবং হইতে হইবেই, তখন তিনি অপেক্ষাকৃত শান্তস্বরে বলিলেন: "দেখ, এ রাগের কথা নয়, ইজ্জতের কথা, বংশের সম্মানের কথা। তসলীমের বাপ আমাদের ষ্টেটে খাজানা দেয়, তা'রা আমাদের প্রজা, কাজেই প্রজার সঙ্গে জমিদার-কন্যার বিবাহ হ'লে লোকের কাছে আর আমাদের মুখ দেখাবার পথ থাকবে না। এ ত' গেল প্রথম কথা, তারপর হ'ল এ রশীদের সঙ্গে রওশনের বিবাহ হলে মানাবে ভালো। মেয়েটিও ঘরে রইল, অথচ রশীদের বিয়ের জন্য টাকাও খরচ হ'ল না। এ সব ত মেয়ে-মানুষের বুদ্ধিতে আসে না!"—বলিয়াই বিজ্ঞতার হাসি হাসিয়া তিনি বাহিরের কাজে চলিয়া গেলেন।

গৃহিণীর মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহার এতদিনের সাধ, বহুদিনের বাসনা, সব কি আকাশকুসুমে পরিণত হইবে? রশীদ তাঁহার দেবর-পুত্র—শিক্ষা-দীক্ষা টো টো। গত বৎসর রেঙ্গুনে পলাইয়া তাঁহারই পৈতৃক সম্পত্তির হাজার খানিক টাকা নষ্ট করিয়া আসিয়াছে। এ চরিত্রহীন অকর্মন্য যুবকের সঙ্গে রওশনের বিবাহ, অসম্ভব! এ ঘরে

বিবাহিত হইয়া তাঁহারা মাতা-কন্যায় যে লাঞ্ছনা ও অত্যাচার সহ্য করিয়া আসিয়াছে তাহা ত স্মৃতিফলক হইতে আজিও মুছিয়া যায় নাই। তিনি মা হইয়া কোন্ প্রাণে তাঁহার স্নেহের পুত্তলি কন্যা-রত্নকে সে অত্যাচার-লাঞ্ছনার উত্তরাধিকারিণী করিয়া যাইবেন? তিনি মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন, তাঁহাকে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে হইলেও তিনি রশীদের সঙ্গে রওশনের বিবাহ দিবেন না।

হামীদ সাহেব বার বার স্ত্রীর কাছে এ বিবাহের কথা উঠাইয়া তাঁহার মত লইবার চেষ্টা করিলেন—কিন্তু জাহানারা স্পষ্টভাবে 'না' করিয়া দিলেন।

হামীদ সাহেব স্ত্রীর কাছে হারিবেন, এত বড় অপমান, মরদ হইয়া আওরতের কাছে পরাজয়! না, তা হইতে পারে না।—তিনি দৃঢ়কণ্ঠে জানাইয়া দিলেন: তিনি এ বিবাহ দিবেনই।

নারী শুধু কুসুমকোমলা নয়, সময়ে লৌহকঠিনও বটে।

বেগম সাহেবার রাগও চরমে উঠিল; তিনিও স্পষ্টকণ্ঠে জানাইয়া দিলেন: তাঁহারই পৈতৃক সম্পত্তিতে দেহপুষ্ট করিয়া তাঁহারই পৈতৃক ভিটায় দাঁড়াইয়া তাঁহার উপর জোর খাটাইবার অধিকার কাহারও নাই। তাঁহার নিজের কন্যা তাঁহারই টাকায় লালিত পালিত—আজ বিবাহের সময় তিনি কাহাকেও পিতৃত্বের ক্ষমতায় কর্তৃত্ব খাটাইয়া তাহার সর্বনাশ করিতে দিবেন না। তিনি তসলীমের সাথে রওশনের বিবাহ দিবেনই।

হামিদ সাহেবও গর্জিয়া উঠিলেন। 'দেখে নেব শরীয়ৎ আমাকেই অলি করেছে, আমার এজেন্ ছাড়া তার বিয়ে হতেই পারে না।'

বেগম সাহেবাও ঝাড়িয়া বলিলেন: 'না হয় না হউক; বছর ছ'মাস পরে মেয়ে ত সাবালেগ্ হবেই, তখন কারও এজেনের দরকার হবে না, তার নিজের সম্মতিতেই বিয়ে হবে'।

—'ছি, ছি, তুমি এত বড় কেলেঙ্কারী করবে!'

—'কিসের কেলেঙ্কারী! তুমিই ত করছ। যখন বয়স কম ছিল তোমাদের সব অত্যাচার সহ্য করেছি, মা আমার!' অশ্রু আসিয়া তাঁহার

কণ্ঠরোধ করিয়া দাঁড়াইল ; অকথিত বেদনা অশ্রুরূপেই গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

'---আচ্ছা', বলিয়া স্বামী গরগর করিতে করিতে বাহির হইয়া গেলেন।

ফাল্গুন মাস আসিতেই হামিদ সাহেব বিবাহের যোগাড়-যন্ত্রে লাগিয়া গেলেন। বেগম সাহেবাকে পুনরায় কিছু জিজ্ঞাসা করা তিনি দরকার মনে করিলেন না।

বেগম সাহেবা স্বামীকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন: 'দেখ, অনর্থক কেলেঙ্কারী করো না ; এর ফল ভালো হবে না।'

তিনি চোখ লাল করিয়াই বলিলেন: 'কিসের ফল ?'

—'রওশনের সঙ্গে রশীদের বিয়ে হ'তে পারে না।'

---বিয়ের কথা বুঝা আওরতের কাজ নয়। আমি বলছি পারে এবং কেমন ক'রে পারে তাও আমি দেখাচ্ছি,'---জোরের সঙ্গে মাথা নাড়িয়া কথা কয়টি বলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন। যাইবার সময় উঠানের মাঝে দাঁড়াইয়া আবার বলিলেন: বাঁদরকে নাই দিলে মাথায় চড়তে চায় !'

বাহিরে বিবাহের আয়োজন জোরে চলিতে লাগিল। বেগম সাহেবাও আর নিজকে সামলাইতে পারিলেন না। ছেলেরা এখন ছোট। তিনি জামাইদের ডাকিয়া আনাইয়া সব বিস্তারিত ভাবে জানাইলেন। শাশুড়ীর নিপীড়িত জীবনের কথা জামাইদের অজ্ঞাত ছিল না—কিন্তু শ্বশুর শাশুড়ীর ব্যাপারে তাহারা কী বলিতে পারে ! ছোট জামাই ত নতুন জামাই, কাছেও আসে না---পর্ব উৎসবে দুই এক দিনের জন্য আসিয়া বেড়াইয়া যায় মাত্র।

বড় জামাই এখন শাশুড়ীর আদেশ ঠেলিতে পারিল না। যাহাই হউক, ঠিক হইল, হামীদ সাহেব বাধ্য না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে ষ্টেটের ম্যানেজারী হইতে বরখাস্ত করিয়া বেগম সাহেবা নিজেই জমিদারী শাসন করিবেন।

হামীদ সাহেব শুনিয়াই তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন : এত দূর, দেখি তবে। এবং এই লইয়া সকলকে খুব গালাগালি করিয়া তিনি এ বাড়ীর সব তাল্লক ছাড়িয়া দিয়া বাঁশবেড়িয়া গ্রামে তাঁহার পৈতৃক বাড়ীতে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। মনে করিলেন, দুঃখ-কষ্টে পড়িলে আপনিই তাঁহাকে হাতে পায়ে ধরিয়া নিতে আসিবে। এই অবসরে তিনিও নিশ্চিন্ত থাকিবেন না, তাঁহার কাজ তিনি করিবেন।

তস্‌লীম সব শুনিয়াছে। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এ গৃহযুদ্ধের অভিনয় হইতেছে, তাহাতে সে খুব লজ্জিত। কিন্তু তাহার করিবার কিছুই নাই। রূঢ়-প্রকৃতি উদ্ধত স্বভাব হামীদ সাহেবকে সে খুবই চিনিত। তাহার আজীবন-বাঞ্ছিতাকে এ নির্মম আন্দোলনে হারাইয়া ফেলিবার ভয়ে সে একেবারে মুষড়িয়া পড়িল। পাশ করিয়া আসিয়াছে সে, কিন্তু ব্যবসায় ফাঁদিয়া বসিবার প্রবৃত্তি হইতেছে না। বাড়ীতেই বসিয়া আছে। এ ঘটনা তাহার কানে আসার পর হইতে মিঞা বাড়ীতে যাওয়া সে এক রকম বন্ধ করিয়া দিয়াছে—সময়-সুযোগে বেগম সাহেবাকে মাঝে মাঝে দেখা দিয়া আসে মাত্র, না হয় তিনি রাগ করেন।

গ্রাম শত কুসংস্কারে জর্জরিত হইলেও নিজের জন্মভূমি ত—জন্মভূমির প্রতি প্রত্যেকের একটা কর্তব্য আছে নিশ্চয়ই। এ শিক্ষা, কি করিয়া জানি না, তস্‌লীমের ছিল। তস্‌লীম দেখিল, নায়েবে-রছুল মোল্লা মৌলবীর দল গ্রামে এক একটা নায়েবে-খোদা হইয়া বসিয়া আছে; তাহারাই ধর্ম, তাহারাই শরীয়েৎ। একদিন শুক্রবার জুম্‌আ পড়িতে যাইয়া সে দেখে, মসজিদে হুলস্থূল ব্যাপার, এক্ষণি সালিস হইবে; তাহারা কেহই কলিমউদ্দীনকে লইয়া নমাজ পড়িবে না। সে হট্টগোলের মধ্যে বহু সাধ্য-সাধনায় ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল—কয়েকদিন হইতে কলিমউদ্দীনের স্ত্রী প্রসব-বেদনায় ভুগিতেছিল, গ্রাম্য ধাইরা তাহাদের বিদ্যা শেষ করিয়া দেখিয়াছে কিন্তু কিছুতেই প্রসব করাইতে পারে নাই;

মরণোন্মুখ স্ত্রীর দারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া কলিমউদ্দীন পুরুষ ডাক্তার আনিয়া তাহার প্রসব করাইয়াছে---এই তাহার অপরাধ। স্থির হইল তাহারা কলিমউদ্দীনের সঙ্গে নমাজ পড়িবে না—বা'দ জুম্আ, তাহার কী শাস্তির ব্যবস্থা করা যাইতে পারে তাহার সালিস হইবে। কলিমউদ্দীনকে মসজিদের বাহির করিয়া দেওয়া হইল। মরণোন্মুখ স্ত্রী-পুত্রকে ফিরিয়ে-পাওয়া ভক্তের কৃতজ্ঞতায় ভরপুর চিত্ত মসজিদের দুয়ারে দুয়ারে ফরিয়াদ করিয়া ফিরিয়া গেল। ভক্ত বৎসল দয়ার সাগর কি সে চারি দেওয়ালের ভিতর বাঁধা ছিলেন?

তস্‌লীম অবাক্ হইয়া গেল---এ কী কাণ্ড! তাহার পিতাও একজন মাতব্বর, অবস্থার গতিক না বুঝিয়া হঠাৎ পিতার বিরুদ্ধাচরণ করিতেও সাহস হইল না। জুম্আর শেষে সালিস বসিল। বিচারে ঠিক হইল, এমন কুফরী কাজ যে করিতে পারে তাহার সঙ্গে কাহারও সম্বন্ধ রাখা হইবে না, তাহাকে একঘরে করিতে হইবে। শরীয়তের কাজে মতান্তর করিতে নাই, সকলে একমত হইল।

তস্‌লীমের আর সহ্য হইল না। সে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল: 'দেখুন, এতে কলিমউদ্দীনের এমন কী অপরাধ হয়েছে বলুন ত? চার পাঁচ দিনের প্রসব-যন্ত্রণায় স্ত্রী মরে যাচ্ছে, গ্রামে লেডী ডাক্তার নেই, এমন অবস্থায় সে বেচারা করে কী? স্ত্রী পুত্রকে বাঁচান কি ফরজ্ নয়? ধরে নিলাম পুরুষ ডাক্তার দিয়ে প্রসব করানোতে তার পাপ হয়েছে; কিন্তু ঐ পাপের চাইতেও প্রসূতি এবং তার ছেলের জীবনের মূল্য কি অনেক বেশী নয়?'

'নাউজুবিল্লাহ্',---সকলের মুখ হইতে একরকম ফাটিয়াই পড়িল শব্দটা।

তস্‌লীমের বাপ গর্জিয়া উঠিলেন: 'বসে পড়্ তুই, ইংরেজী পড়ে' বড় কাবেল হয়ে গেছিস।'

মৌলবী সা'ব বলিলেন: 'দেখুন তস্‌লীম মিঞা, ধর্ম হয়েছে গোখ্‌রো সাপ, ঐ নিয়ে খেলা করবেন না। নিজেরা ত শরীয়েৎ পালন করেন না, না দাড়ি আছে, না সুন্নত-মোতাবেক লেবাছ আছে আপনাদের, অথচ মানুষকে শরীয়তের বরখেলাপ কাজে উৎসাহ দিচ্ছেন। শুনুন তবে বলি, এই যে জীবনের মূল্যের কথা বলছেন,---জীবন কয়দিনের? সামান্য কয়েকটি নিঃশ্বাসের সমষ্টি ত, আজ আছে কাল নাই। আর শরীয়েৎ পালন ক'রে মরে' বেহেস্তে যাওয়া কি শরীয়তের খেলাপ কাজ পাপ ক'রে বেঁচে থেকে জীবনের মূল্য বাড়ানর চাইতে হাজারো লাখো গুণে ভালো নয়?'—ডান দিকে ফিরিয়া বলিলেন: 'দেখুন নুরীর বাপ, আগের জমানার আলেমরা ইংরাজী পড়তে যে নিষেধ করেছিলেন, তা কি সাধে?'

নুরীর বাপ মাথা নাড়িয়া জানাইল: 'সাধে মোটেও নয়।'

তস্‌লীম দেখিয়া শুনিয়া বুঝিল, শিক্ষা ছাড়া ইহাদের অন্য কোনো উপায় নাই। ভাবের ঘরে মুক্তি না আসিলে বাহিরের বন্ধন ঘুচিবে না। সেখানে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না জাগিলে বাহিরে ভাঙ্গন অসম্ভব।

প্রতিবাদ করিয়া কাজ হয় না। সে ধীরে ধীরে গ্রামবাসীদের সঙ্গে মিল্‌ দিতে লাগিল। তাহাদিগকে শিক্ষার উপকারিতা, মূর্খতার পরিণাম বুঝাইতে লাগিল---ছোয়াবের লোভ, চাকরীর লালসাও দেখাইতে হইল। মুষ্টিভিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া আর কিছু কিছু চাঁদা উঠাইয়া মসজিদের পার্শ্বে একটা প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করিল। কর্তাদের সঙ্গে লেখালেখি করিয়া কিছু সরকারী সাহায্যেরও ব্যবস্থা হইল।

দিন সুখেই কাটিতেছিল। কিন্তু মধ্যে মধ্যে সহরের সংবাদ শুনিয়া তস্‌লীমের মন ব্যাকুল হইয়া উঠিত। তবে নিজেকে কাজের ভিতর ডুবাইয়া রাখিয়া সে সব চিন্তা যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তি পাইবার প্রয়াস পাইত।

গ্রামের পানীয় জলের পুকুরে স্নান হইতে কাপড় কাচা, ময়লা ধোওয়া, গরু ছাগলের গা ধোওয়া সব হইতেছে। গ্রামে সংক্রামক রোগ

হইবে না কেন? সে সকলকে জুম্‌আর দিন পরিষ্কার পানির উপকারিতা বুঝাইয়া দিল, আর গ্রামের দুই মাথায় দুইটা পুকুর শুধু পানীয় জলের জন্য আলাদা করিয়া রাখিবার উপদেশ ও ব্যবস্থা করিয়া দিল। প্রতি শুক্রবারেই জুম্‌আর পর সে গ্রামবাসীদের উন্নতির জন্য, গ্রামের সংস্কারের জন্য কিছু কিছু বক্তৃতাও দিত।

প্রতি শুক্রবারে মসজিদে খোৎবা পড়া হয়---আরবিতেই পড়া হয়, কাজেই কাহারও বুঝিবার জো নাই। মোল্লা সাহেব পড়িয়া যাইতেছেন, আর মুসল্লীদের কেউ হা করিয়া আছে, কেউ ঘুমে ঢুলিয়া পড়িতেছে, কাহারও ঘন ঘন হাই উঠিতেছে ধর্মবিধানের প্রতি এ-সব অজ্ঞতার অবিচার দেখিয়া তস্‌লীমের সত্যই দুঃখ হইল। একদিন বক্তৃতা করিতে যাইয়া বলিয়া ফেলিল: 'দেখুন, খোৎবার অর্থ বক্তৃতা, তার উদ্দেশ্য মানুষকে উপদেশ দেওয়া---তার ধর্মনীতি, সমাজনীতি, অর্থাৎ তার সব রকম প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচনা করা। কাজেই সেই আলোচনা যাতে লোকের বোধগম্য হয় তারই ব্যবস্থা করা উচিত। আরবদের মাতৃভাষা আরবী, তা'রা সেটা ভালো করেই বোঝে, তাই হজরত সে দেশে খোৎবা পড়তেন আরবীতে। সেজন্য যে-দেশের ভাষা আরবী নয়, যারা আরবীর অ-ও বোঝে না তাদেরকেও আরবীতে পড়তে হবে এমন কোনো কথা নেই। কথা না বুঝলে তার কি কোন তাছীর হয়?'

ইমাম সাহেব বলিয়া উঠিলেন: এ যে সুন্নত।

'আরে সা'ব, সুন্নত সবই। হজরত বাড়ীতে আরবীতে কথা বল্‌তেন, আপনিও কেন বাড়ীতে আরবীতে কথা ব'লে সুন্নত পালন করেন না?

মৌলবী সাহেব ত লা-জওয়াব। প্রকাশ্যে কিছু না বলিলেও তিনি ভিতরে ভিতরে তস্‌লীমের উপর চটিয়া রহিলেন। সব তাঁর ভাত মারার কথা। খোৎবার যদি বাংলা মানে করিতে হয় তবে তাঁর চাকরীর আশাই যে ত্যাগ করিতে হয়। সেই হইতে তিনি তলে তলে তস্‌লীমের বদ্‌নাম করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। দুঃখ, সুযোগ জুটিয়া ওঠে না ছোকরাকে জব্দ করিবার।

কয়েক সপ্তাহ পর এক জমআতে তস্‌লীম সুদ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিল। তাহার বক্তৃতার যে অংশটুকুর উপর ভর দিয়া তাহার উপর কুফরী ফৎওয়া জারী করা হইয়াছিল তাহা এই :

'দেখুন, শরীয়েৎ সুদ দেওয়া নেওয়া হারাম করেছে, অথচ আমরা মুসলমানেরা সুদ না দিয়ে পারছি না; অবস্থা আমাদের বাধ্য করছে, এতে আমরা দিন দিন দেউলিয়া হচ্ছি। এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। একটা ভরা কলস থেকে যদি ক্রমাগত শুধু জল ঢালতেই থাকা হয় তবে সেটা শীঘ্র শূন্য হয়ে যায়; আর যদি জল ঢালা-ও হয় এবং ভরা-ও হয় তা হ'লেই সেটা শূন্য হতে পারে না। আমাদের মৌলবী সাহেবেরা মুসলমানকে শুধু সুদ খেতে নিষেধ করছেন, সুদ দিতে বারণ করছেন না; অথবা এ-রকম কোনো উপায় বাৎলাচ্ছেন না, যাতে মুসলমান সুদের লেন-দেন না করে পারে। যে সুদ খাচ্ছে তার বাড়ীতে তাঁ'রা ভাত খাচ্ছেন না—যে সুদ দিতে দিতে উজাড় হয়ে যাচ্ছে তার বাড়ীতে খেয়ে তা'কে আরও শূন্য ক'রে দিচ্ছেন। আমরা যে জমানায় এবং দেশে বাস করছি তাতে সুদের লেন-দেন না ক'রে আমাদের উপায় নেই। আজকালকার যত বড় বড় ব্যবসায়ী আছেন তাঁদের ব্যবসা করতে হয় বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বিভিন্ন জাতির সঙ্গে এবং এ সব ব্যবসা চল্‌ছে ব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায়; অথচ ব্যাঙ্কের গোড়াই হ'ল সুদ। কাজেই বলছিলাম : এ হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ খৃষ্টান-অধ্যুষিত দেশে আমাদের বেঁচে থাকতে হ'লে, উন্নতি করতে হ'লে সুদ দিতে এবং নিতে হবে।' ইত্যাদি।

মৌলভী সাহেব খোদার শোকর করিলেন—খোদা এতদিনে তাঁহার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। মসজিদে বাদ-প্রতিবাদ না করিয়া তিনি সেইদিন রাতারাতি ফখরুল-মুহাদ্দেসিন মওলানা জমীরউদ্দীন সাহেবের কাছে যাইয়া দুই টাকা দিয়া ফৎওয়া লেখাইয়া আনিলেন : তস্‌লীম কাফের হইয়া গিয়াছে। দেশের সমস্ত মৌলবী মওলানাদের দস্তখত লওয়া হইল,—কোরাণ হাদীসের খেলাপ কথায় কাহারও দ্বিরুক্তি করিবার নাই। গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল : তস্‌লীম কাফের হইয়া গিয়াছে।

তস্‌লীমকে যাহারা প্রকৃতই ভালবাসিত তাহারা সহানুভূতি করিয়া বলিল: আহা কপাল ভালো, ছেলেটি বিয়ে করে নাই। বিয়ে করলে বিবিও তালাক হ'ত।

কথায় আছে: ঢোলের আওয়াজ কাপড়ের ভিতর চাপা থাকে না। হামিদ সাহেব শুনিয়াই ব্যঙ্গ করিয়া বেগম সাহেবাকে লিখিয়া জানাইলেন: এখনও কি সাধ হয়? মেয়েটিকেও কাফের করতে পার কি না চেষ্টা ক'রে দেখিও---তাহা হলে তোমার জন্য বেহেস্ত্ খাস করা হবে। আমার মুখের কথা নয়---কুড়িজন বড় বড় মৌলবীর দস্তখৎ আছে। গরীবের কথা বাসি হলেই ফলে।' ইত্যাদি।

বেগম সাহেবাও উত্তরে জানাইয়া দিলেন: সেজন্য তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই। আমি চিরদিন বিশ্বাস ক'রে এসেছি, এখনও বিশ্বাস করি, ভবিষ্যতেও করব: যারা তস্‌লীমকে কাফের ব'লে ফৎওয়া দিয়েছে, তস্‌লীম তাদের চেয়ে ঢের বড় মুসলমান।

তস্‌লীম দেখিল, ইহাদের সঙ্গে তর্ক করা আর হাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করা একই কথা। আর তর্ক যদি করেই, তাহা শীঘ্রই মুখ হইতে হাতে আসিয়া পৌঁছিবে। দেখা যাউক, কোথাকার জল কোথায় গিয়া গড়ায়। এই ভাবিয়া সে কিছুদিনের জন্য সহরে বেড়াইতে বাহির হইয়া পড়িল।

দিন পনর পরে তস্‌লীম সহর হইতে ফিরিয়া আসিল। সারাদিন তাহার পিতা একটি বার তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করাও দরকার মনে করিলেন না। তস্‌লীম দেখিল, তিনি অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া আছেন। মনে করিল, তাহার প্রতি মৌলবীদের ফৎওয়ার জন্য এবং তাহার শরিয়েৎ-বিরুদ্ধ চলা-ফেরার জন্যই হয়ত পিতার এ মনোকষ্ট। তাহাকে বুঝাইয়া বলিলে তিনি হয়ত বুঝিতে পারিবেন---এ ভাবিয়া তস্‌লীম সন্ধ্যার সময় তাঁহার ঘরে যাইয়া উপস্থিত হইল। পিতা বিনা-ভূমিকায় গম্ভীর এবং দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন: 'তুই মিঞা বাড়ীর অন্দরে থাকিস কেন?'

পিতার এ বিসদৃশ প্রশ্ন শুনিয়া সে অবাক্ হইয়া গেল। সে ত শৈশবাবস্থা হইতে সে বাড়ীতে মানুষ হইয়াছে---তাহাকে ত কেহ কোনদিন

এ-রকম প্রশ্ন করে নাই। শান্তভাবে উত্তর দিল—বেগম-মা যে বাহিরে থাক্‌তে দেন না।

পিতা গর্জিয়া বলিলেন: তাই ত বল্‌ছি, মেয়ে দিবার নামে ছেলের এ সর্বনাশ করা।

—বাবা, কী বল্‌ছেন আপনি?

—কী বল্‌ছি! একেবারে ছোট্ট কিনা নাক টিপ্‌লে দুধ গলে! কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া আবার বলিলেন: আমি বারণ করছি তুই আর ওখানে যাবি না। আমি বিশ্বস্তসূত্রে জেনেছি—বেগম সাহেবার স্বভাব ভালো নয়।

তস্‌লীমের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল—পিতার এই ঘৃণিত ও কুৎসিত ইঙ্গিত তাহাকে পাগল করিয়া তুলিল! তাহার সমস্ত রক্ত মাথায় টগবগ করিয়া ফুটিতে লাগিল। সে উন্মাদের মতো চীৎকার করিয়া উঠিল: বাবা!—আর বলিতে পারিল না, উন্মাদের মতো দৌড়াইয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেল।

তাহার সমস্ত রক্তে রক্তে কাঁদন ছুটিয়াছিল: মা আমার মা আমার! অন্তরের অন্তস্থল ভেদিয়া প্রতিধ্বনি উঠিতেছিল, মা আমার!—নয় দশ বৎসর বয়স হইতে যিনি নিজের পরিপূর্ণ মাতৃত্ব দিয়া তাহাকে এত বড় করিয়া তুলিয়াছেন, যাঁহার মধ্যে ভোগাতীত মাতৃত্বের পরিপূর্ণ কল্যাণী মূর্তি দেখিয়া সে মা বলিয়া নিজেকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছে, তাঁহার প্রতি এরূপ কুৎসিত ইঙ্গিত! সন্তানকে কেন্দ্র করিয়া মায়ের প্রতি সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত দোষারোপ!—তাহার সমস্ত অন্তর-বাহির জ্বলিয়া উঠিল। আবার, সে কুৎসিত ইঙ্গিতকারী তাহার পিতা, জন্মদাতা! রাগে ঘৃণায় এক একবার তাহার চোখ ফাটিয়া কান্না আসিতেছিল।

আবার পরক্ষণেই তাহার চোখ-মুখ ক্ষুধিত শার্দ্দুলের মতো জ্বল্‌জ্বল্‌ করিয়া উঠিল। তাহার শিরায় শিরায় মানুষের আদিম প্রবৃত্তি কোলাহল করিয়া উঠিল: ক্ষমা নাই, ক্ষমা নাই। পিতা হউক, জন্মদাতা হউক, ক্ষমা নাই এ অপরাধের। সারা রাত্রি তাহার ঘুম হইল না। ভিতর বাহির পায়চারি করিয়াই সে রাত্রি শেষ করিল।

সকালে তস্‌লীম দেউড়ী-ঘরের বারান্দায় গালে হাত দিয়া বসিয়া আছে। পার্শ্বের বাড়ীর চাকরটি মাঠ হইতে ফিরিয়া আসিয়া হুঁকা টানিতেছে। সে হাসিয়া বলিল: 'তস্‌লীম মিঞা, জানেন আপনার শ্বশুর এসেছিলেন।

সহরে তাহার বিবাহের কথা সকলে জানিত। সে একটু বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করিল: কবে?

---এ আপনি ফিরবার কয়েকদিন আগে।

---কী কয়ে গেলেন?

---তা আমরা শুনিনি, বড় মিঞার সঙ্গে চুপি চুপি কইলেন সব। এত ঢং কেন বাবা, বিয়ের কথা কে যেন শুনেনি! সে একটু বাঁকা হাসি হাসিল।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো তস্‌লীম চমকিয়া উঠিল। এই অনর্থের গোড়া কোথায় বুঝিতে আর তাহার বাকী রহিল না। এতখানি নীচ যিনি তাহার মেয়েকে বিবাহ করিতে পারবো না।---দুত্তুর।' তার দেহ-মন বিষাক্ত হইয়া উঠিল।

রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে সে বাহির হইয়া পড়িল। পিতার এত বড় কুৎসিত দোষারোপের পর এ বাড়ীতে থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব। কেমন করিয়া সে সকলকে মুখ দেখাইবে, বিশেষত তাহার স্নেহময়ী জননীকে। রাগে, দুঃখে, ঘৃণায় সে সেই রাত্রেই নিরুদ্দেশ বাহির হইয়া পড়িল।

কিছুদিন এদিক-সেদিক ঘুরিয়া ফিরিয়াও তাহার মন ঠাণ্ডা হইল না---জীবন যেন দুর্বিসহ হইয়া উঠিল। মনে পড়ে চির-স্নেহময়ী বেগম-মাতার কথা, আর কুসুম-সদৃশা ক্ষুদ্র বালিকা রওশনের ব্রীড়াশ্রীমণ্ডিত মুখচ্ছবি। আবার তাহার ভাবের গতি ফিরিয়া যায়: দোষ করিয়াছেন হামিদ সাহেব অথবা তাহার পিতা, কিন্তু তার প্রতিশোধের আঘাত ত সম্পূর্ণ যাইয়া লাগিবে বেগম সাহেবা এবং রওশনের বুকে। যাঁহাদের স্নেহ-মমতায় সে লালিত-পালিত ও বর্দ্ধিত, আজ অমূলক দোষারোপের জন্য নির্দয়ভাবে সে শাস্তি দিতে যাইতেছে তাহাদিগকে। বেগম সাহেবা বা রওশন ত কোনো অপরাধ করে নাই। আজ যদি সে তাঁহাদের

দুর্দিনের সুযোগ লইয়া এ বিবাহ না করে, তবে ঘরে-বাহিরে বেগম সাহেবার মাথা হেট হইয়া যাইবে। হামীদ সাহেবও বিজয়গর্ভে ফুলিয়া উঠিবেন, আর বেগম সাহেবাকে খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া বিরক্ত করিয়া তুলিবেন। আর পিতার কুৎসিৎ ইঙ্গিত ত এমনি করিয়া চিরদিন মাথা-উঁচু করিয়া থাকিয়া যাইবে। না, এ অমূলক সন্দেহকে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়া বেগম সাহেবার অমল-ধবল আভিজাত্য-শ্রীমণ্ডিত মহান্ চরিত্রকে তুলিয়া ধরিতে হইবে। সে সঙ্কল্প করিলঃ পিতামাতার অনুমতি ছাড়াই সে রওশনকে বিবাহ করিবে।

এ দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া সে বেগম সাহেবার কাছে উপস্থিত হইল।

বেগম সাহেবার দূরদর্শিতা অসাধারণ। তিনি এরকম ভাবে বিবাহ হইতে পারে না বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। তস্‌লীম ত অবাক্ঃ কেন?

---তোমার পিতামাতার উপস্থিতি, অন্ততঃপক্ষে তাঁদের অনুমতি ছাড়া বিয়ে কেমন ক'রে হতে পারে?

---তা হলে কী করা যায়? আমি জানি ওরা অনুমতি দিবেন না।

---তোমরা ছেলেমানুষ, বুঝছ না। আজ যদি কা'কেও না জানিয়ে বিয়ে হয়, দেখবে কাল দেশময় টি টি পড়ে যাবে। এদেশের মেয়েদের সম্মান অত্যন্ত ক্ষণভঙ্গুর; কাল সবাই বলবে এমন কিছু অস্বাভাবিক কাজ নিশ্চয়ই ঘটেছিল যার জন্যে ছেলের অভিভাবকদের না জানিয়ে বিয়ে দিতে হয়েছে---তখন....?

তস্‌লীম দেখিল কথাটা নেহাৎ মিথ্যা নয়, এবং এ রকম একটা কুৎসিৎ আলোচনা লোকের মুখে জাহির হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। সে জিজ্ঞাসা করিলঃ তবে কী করা যায়?

---কিছু করতে হবে না। আমি জানি তুমি পিতামাতার একমাত্র ছেলে, তোমাকে তাঁরা ছেড়ে দিতে পারে না। আজ অনুমতি না দিন, দু'দশ দিন পরে নিশ্চয়ই দেবেন। মুরব্বিদের দোওয়া না নিয়ে এত বড় কাজ করা ভালো নয়। তুমি এক কাজ কর, আমি খরচ দিচ্ছি, কলিকাতা যাও; এবার এম-এ'টা দিয়ে দাও। ইত্যবসরে ওঁদের রাগও ঠাণ্ডা হয়ে আসুক।

কলিকাতা আসিয়া কিছুদিন পর সে পিতাকে এক সুদীর্ঘ পত্র দিয়া সব জানাইল। তাহার বিবাহ ব্যাপার, হামীদ সাহেবের প্রতিবন্ধকতা, বেগম সাহেবার সঙ্গে ঝগড়া ইত্যাদি হইতে হামীদ সাহেবের মিঞা-বাড়ী ত্যাগ, তারপর বেগম সাহেবাকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিবার ঘৃণিত চেষ্টা—একটার পর একটা বর্ণনা করিয়া সমস্ত ঘটনা আগাগোড়া বুঝাইয়া বলিল; তারপর তাহার কঠিন ব্যবহারের জন্য এবং তাঁহাকে না বলিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পত্র উপসংহার করিল।

পত্র পাঠ তস্‌লীমের পিতার কাছে সব কিছুই দিবালোকের মতো স্পষ্ট হইয়া গেল। তিনি নিজের অন্যায় সন্দেহ এবং পুত্রের প্রতি রূঢ় ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত হইলেন এবং বিবাহে সম্পূর্ণ সম্মতি জানাইয়া পুত্রকে চিঠি লিখিলেন। ঠিক হইল: এম-এ পরীক্ষার পর বিবাহ হইবে।

বছর দুই নির্বিবাদে কাটিয়া গেল।

আগষ্টে তস্‌লীম পরীক্ষা দিয়া ফিরিয়া আসিল। আনন্দে তাহার হৃদয় কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিয়াছে—আজীবনের আশা তাহার আজ ফলবতী হইবে।

রওশন এখন গৃহের নিভৃততম স্থানে আশ্রয় লইয়াছে। তস্‌লীমের চক্ষু আনাচে কানাচে ঘোরে, কিন্তু তাহা প্রাচীরে ও শূন্যে ব্যর্থ আঘাত খাইয়া ফিরিয়া আসে। রওশন কেমনটি হইয়াছে একটিবার দেখিতে বড় সাধ হয়। দিনে দিনে তাহার দেহ এখন বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, হয়ত তাহার দেহে যৌবন-ময়ূর পেখম মেলিয়া ধরিয়াছে। সেই সৌন্দর্য্য-কল্পনায় তস্‌লীম তন্ময় হইয়া যায়।

হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইল।

কথায় কথায় একদিন মিঞা বাড়ীর বাজার মুন্সী বলিয়া ফেলিল: 'তস্‌লীম মিঞা, এবার বেগম সাহেবারা খুব বেড়িয়ে আসলেন। আপনি

যেতে পারলেন না। পশ্চিমপুর গেছ্লেন জমিদারী দেখতে, সেখান থেকে বাদামতলী, তাহের মিঞাদের বাড়ীতেও গেছ্লেন, সেখানে দিন দুই ছিলেন।

—বেশ ত, থাক্‌লে আমিও যেতে পারতাম, খুব ফুর্তি হত। তার মুখ ঈষৎ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

— বেশ ত বলছেন, কিন্তু যে বদনামী হয়েছে তা আর কানে শুনবার নয়।

---কি বদনামী? মুখ তার কালো হইয়া উঠিল।

তা শুনবেন, আমি বল্‌তে পারব না।

তস্‌লীম আর কথা-কাটাকাটি না করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

বেগম সাহেবার কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা শুনিল, তাহা শোনার চাইতে বজ্রাঘাত হয় ত তাহার পক্ষে ঢের ভালো ছিল।

গত বৈশাখে বেগম সাহেবা মফঃস্বলে গিয়াছিলেন। বাড়ীতে দাসী-বাঁদী ছাড়া মেয়েলোক বলিতে আর কেহ নাই, কাজেই রওশনকে সঙ্গে নেওয়া ছাড়া আর গতি ছিল না। পশ্চিমপুর তাঁহার বড় জামাইর বাড়ী। সেখানে যাইয়া উঠিলেন। জামাইয়ের মধ্যস্থতায় তিনি সেখানকার প্রজাদের হাল-অবস্থা দেখিতে লাগিলেন।

পশ্চিমপুর হইতে বাদামতলী মাত্র ক্রোশ দুইয়ের পথ। তস্‌লীমের কলিকাতা যাওয়ার পর হইতে বেগম সাহেবাদের বাড়ীতে বাদামতলী গ্রামের তাহেরউদ্দীন নামক একটি ছেলে জায়গীর থাকে। সেও বেগম সাহেবাকে মা বলিয়া ডাকে। গ্রীষ্মের বন্ধে সে বাড়ী আসিয়াছিল। যখন লোকমুখে শুনিতে পাইল বেগম সাহেবা পশ্চিমপুর আসিয়াছেন, সে যাইয়া ধন্না দিয়া পড়িল: তাহাদের বাড়ীতে একবার পদধূলি দিতেই হইবে। বেগম সাহেবা তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন: যাওয়া সম্ভব নয় এবং উচিতও নয়। বাদামতলীর পাশাপাশিই বাঁশবাড়িয়া গ্রাম—তিনি বাদামতলী গেলেই স্বামী এবং শ্বশুর কুলের লোকেরা শুনিতে পাইবে, পাশাপাশি গ্রামে যাইয়া তাহাদের সেখানে না গেলে তাহারাই

বা কী মনে করিবে, লোকেই বা কী বলিবে ; অথচ বর্তমানে রওশনের বিবাহ ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়া যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, সে-বাড়ীতে যাওয়া তাঁহার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। সেখানে না যাইয়া তাহাদের বাড়ীতে গেলে নিতান্ত বেখাপ্পা ও বিশ্রী দেখায়।---কিন্তু তাহের নাছোড়বান্দা, এ সুযোগ হারাইলে তাহার জীবনে নাকি এ পদধূলির সৌভাগ্য আর হইবে না। সে বলিল: সে গোপনে লইয়া যাইবে, তাঁহার যাওয়া গোপন রাখিবে এবং পরদিন গোপনেই তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়া যাইবে। একদিনের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ পথ কে বা এদিকে আসে, কে বা দেখে।

তাহার কাকুতি-মিনতিতে দয়ার্দ্র-হৃদয়া বেগম সাহেবার হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি শেষকালে রাজী হইলেন।

পরদিন চলিয়া আসার জন্য উদ্যোগ করিতেই তাহেরের মা ও বাড়ীর সবাই চাপিয়া ধরিলেন,: না, বুবু, আজকের দিনটা থাকিয়া যাইতে হইবে।

এতগুলি লোকের অনুরোধ ঠেলা যায় না ; আর একটা দিন বৈ ত নয়।

এ-সব অপরিচিতাদের মাঝে পড়িয়া রওশনের নিঃশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। সে অনবরত মাকে খোঁচাইতে লাগিল 'চল।'

---ছিঃ, মা, এতগুলি লোকের কথা ঠেলে চলে গেলে কী বল্‌বে ওঁরা, একটা দিন ত মাত্র।—তিনি তাহাকে বুঝাইয়া সুজাইয়া কোনো প্রকারে চুপ করাইলেন।

পরদিন সকালে বারান্দায় বসিয়া বেগম সাহেবা তাহেরের মা'র সঙ্গে আলাপ করিতেছিলেন। হঠাৎ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলিয়া এক ভিখারিণী আসিয়া হাজির হইল। ভিখারিণী কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া থাকিয়া ভিক্ষা না লইয়াই চলিয়া গেল। ইহাতে আশ্চর্য্য হইয়া তাহেরের মা অনুচ্চস্বরে ভিখারিণীর উদ্দেশ্যে ডাক দিলেন, কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। বেগম সাহেবাও আশ্চর্য্য হইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইল, এই রকম কোনো একটি মেয়ে মানুষ যেন কিছুদিনের জন্য তাঁহার বাড়ীতে চাকরাণী ছিল। হইতেও পারে। বাঁশবাড়িয়ার

কত মেয়েই ত তাঁহার এখানে কাজ করিয়া আসিয়াছে, এখনও ত দুই এক জন আছে। তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াই হয়ত ভিখারিণী চলিয়া গিয়াছে--এখনই হয়ত সে তাঁহার শ্বশুর-বাড়ীতে সংবাদ দিবে। নানা অনর্থের সম্ভাবনায় তাঁহার চোখ-মুখ কালো হইয়া উঠিল। তিনি তাহাদিগকে সব কথা খুলিয়া বলিয়া তখনই বিদায়ের ব্যবস্থা করিলেন।

কিন্তু তাঁহার বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশময় ঢি ঢি পড়িয়া গেল। আত্মীয় অনাত্মীয় অনেকেই কষ্ট করিয়া তাহেরদের বাড়ী পর্য্যন্ত খবর লইতে আসিল। শ্বশুরকুলের লোকেরা পশ্চিমপুর পর্য্যন্ত সন্ধান লইয়া গেল।

বাঁশবাড়িয়া, বাদামতলী প্রভৃতি গ্রামের ঘরে ঘরে আলোড়ন পড়িয়া গেল। শ্বশুর-বাড়ীতে ত মরার শোক---তাঁহারা লোকের সম্মুখে আর বাহির হইতে পারেন না। পলাশীর যুদ্ধের পর এত বড় অপমান তাঁহাদের পরিবারে না-কি আর হয় নাই! যাহাদের সঙ্গে তাহারা সম্বন্ধ করে না, একাসনে বসিয়া খায় না, তাহাদের বাড়ীতে আসিয়া তাহাদের বৌ ও মেয়ে দুই দিন থাকিয়া গেল! পাড়ার লোকদের কাছে লজ্জায় তাহাদের মাথা হেট হইবারই ত কথা।

শ্বশুর-বাড়ীতে না উঠিয়া তাহাদিগকে না জানাইয়া বেগানা বাড়ীতে যাইয়া উঠিবার কারণ কি?

এত বড় একটা কাণ্ডের কোনো সিদ্ধান্ত না করিলে পাড়াপ্রতিবেশী-দের পেটের ভাত হজম হয় না, বুড়াবুড়ীদেরও রাত্রে সুনিদ্রা আসে না। নানা জনে নানা কথা বলিল: বেগম সাহেবার চরিত্র ভালো নয়---বুড়ী মাগী তলে তলে এত ও---মা আর ছেলে না হলে কি এত অসঙ্কোচে পারে---ইত্যাদি।

গ্রামে বুদ্ধিমান লোকের অভাব নাই---তাহারা বয়সের বাহিরের কথা বিশ্বাস করিবে কেন?

শেষকালে এ বিরাট আলোড়নকে মন্থন করিয়া যে যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত হইল, তাহা এই:

মেয়ের সঙ্গে বহুদিন হইতে তাহেরের প্রেম ছিল, পরে মেয়ে তাহেরের সঙ্গে বাহির হইয়া আসে। অনন্যোপায় হইয়া বেগম সাহেবা

মেয়েকে ফুস্‌লাইয়া লইয়া যাইতে অথবা তাহাদের বিবাহের বন্দোবস্ত করিতে আসিয়াছিল।

এই রকম যুক্তিসঙ্গত কথা বিশ্বাস না করিবার গ্রামবাসীদের কোনো হেতু নাই।

আগাগোড়া শুনিয়া তস্‌লীম স্তম্ভিত হইয়া গেল: এও কী সম্ভব? তাহার সমস্ত দেহের ভিতর বারুদ পুড়িয়া কে যেন আগুন ধরাইয়া দিল। তাহার শিরায় উপশিরায় উষ্ণ রক্ত টগবগ করিয়া ফুটিতে লাগিল; ইচ্ছা হইতেছিল গোটা গ্রামটা জ্বালাইয়া পোড়াইয়া এ নিদারুণ হিংস্রবৃত্তির প্রতিশোধ নেয়! কী অপরাধ করিয়াছিল এ নিরপরাধা কুসুমকোমলা বালিকা? তাহাদের কি সুখের কণ্টক হইয়াছিল? দুই দিনের জন্য একটি গৃহকোণে আশ্রয় লইয়াছিল---দুইদিন পরেই সে চলিয়া গিয়াছে। ইহাতে তাহাদের সুখনিদ্রার কেন ব্যাঘাত হইল?

তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। চিন্তার পর চিন্তা আসিয়া সেখানে জটলা পাকাইয়া তাহাকে নেশাখোরের মতো করিয়া তুলিল। সারারাত্রি তাহার নিদ্রা হইল না, কী যেন সম্ভব-অসম্ভব চিন্তা আসিয়া তাহার মাথার ভিতর ঘুরপাক খাইতে লাগিল।

সকালে বেগম সাহেবা তাহার বিকৃত চোখ-মুখ দেখিয়া বুঝিলেন---তাহার ভিতর চিন্তার দ্বন্দ্ব চলিতেছে।

তিনি তস্‌লীমকে নিভৃতে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: 'তুই এ সব বিশ্বাস করিস্?'

---'না, মা, পশ্চিমে সূর্য্যোদয় বিশ্বাস করতে পারি কিন্তু এ কেমন ক'রে বিশ্বাস করি?'---মুখের গাম্ভীর্য্য ও কালোপনা দূর করিয়া সে হাসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সে হাসি অশ্রুর চাইতেও ব্যথাপূর্ণ।

বেগম সাহেবা তাহার মুখের দিকে আর তাকাইতে পারিলেন না। চিন্তাক্লিষ্ট মুখে তিনিও অন্য ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন।

তস্‌লীম কিছুতেই চিন্তামুক্ত হইতে পারিল না। এক একবার মনে হইল: রওশনকে ডাকিয়া সব জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু রওশন

কোথায়? তস্‌লীম এবার আসিয়া অবধি আর রওশনের দেখা পায় নাই। তাহার বড় ইচ্ছা হইতেছিল: এ জঘন্য দুর্নাম তাহার উপর কেমন প্রতিবিম্বিত হইয়াছে একবার দেখিতে।

কিন্তু রওশন কি জানি কেন সেই হইতে মন-মরা হইয়া গিয়াছে। সে এখন কাহারো সম্মুখে বড় একটা বাহির হয় না। সে ভিতরে ভিতরে জানিত এবং বুঝিত: এ মিথ্যা দুর্নামে মুষড়িয়া পড়া মানে তাহাকে স্বীকার করিয়া লওয়া। তথাপি কি জানি কেন, এ ঘটনার পর হইতে কাহারও সম্মুখে পড়িলে তাহার চোখ-মুখ ম্লান হইয়া উঠিত। কাজেই এখন সে গৃহের নিভৃততম স্থানটি আশ্রয় করিয়া আছে। যতক্ষণ সম্ভব বই পড়িয়া কাটায়। সময় সময় চিন্তাস্রোত অন্যদিকে ফিরিয়া তাহাকে বিমনা করিয়া তোলে। মধ্যে মধ্যে দারুণ অভিমানে তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসে।

একটু পরিবর্তনে মনের অবস্থা হয়ত কিছু ভালো হইতে পারে, এই ভাবিয়া তস্‌লীম কয়েকদিন পরে বাড়ী যাইতে চাহিল। বেগম সাহেবাও এ অবস্থায় তাহাকে আটকাইয়া রাখা সমীচীন মনে করিলেন না। মা-বাপ আত্মীয়দের সঙ্গে মিশিয়া তাহার মন হয়ত একটু চাঙ্গা হইয়া উঠিতে পারে। ধীরে ধীরে এসব চিন্তা হয়ত তলাইয়া যাইতেও পারে।

বাড়ী পৌঁছিয়া কিন্তু তাহার মনের অবস্থা আরও খারাপ হইয়া পড়িল। সহরে ইচ্ছা করিলে বিভিন্ন ভাবে, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে নানা অনুষ্ঠানে সময় কাটান যাইত। কিন্তু বাড়ীতে একা নিঃসঙ্গ জীবন---চিন্তাই তাহার একমাত্র সাথী হইয়া পড়িল। মনের দুশ্চিন্তা বল্‌গা-হারা অশ্বের মতো দিগ্বিদিক্ ছুটিতে লাগিল: 'রওশন---আবাল্য যাহাকে আকাশের চাঁদের মতো নিষ্কলঙ্ক জানিতাম—যাহার চরিত্র আমার কাছে শুভ্র পুষ্পের চাইতেও নির্মল, তাহার সম্বন্ধে এ অভিযোগ। এক বৎসর নয়, আজ প্রায় দশ বার বৎসর হইতেই ত তাহাকে জানি, কোনদিন আচারে-ব্যবহারে-ইঙ্গিতে তাহার ত এ দুর্বলতা প্রকাশ পায় নাই। আজ

এসব কেমন করিয়া বিশ্বাস করি? পরক্ষণে চিন্তা অন্যদিকে ফিরিয়া যায়: 'মানুষের ভুল হওয়া কি অসম্ভব? মহাগ্রন্থ কোরআনই ত বলিয়াছে: মানুষ ভুলের অধীন। কত মহাপুরুষের জীবনে পদস্খলন হইয়াছে, হয়ত মুহূর্তের ভুল, শয়তানের প্ররোচনায় তাহারও পদস্খলন হইতে পারে না কি? কিছু ব্যতিক্রম না হইলে এ অভিযোগের উৎপত্তি হইবে কেন? তাহাদের সঙ্গে ত আর গ্রামবাসীদের দুষ্মনী নাই! আবার মনে হইত: 'না, না, রওশন এ-সবের অতীত।' আবার কোথা হইতে মনের তলা ফুঁড়িয়া যেন বাহির হয়: 'মানুষ ত।' এ-সব চিন্তা করিতে করিতে সে উন্মাদের মতো বিছানা হইতে দুপুর রাতে লাফাইয়া উঠিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

আহার করিতে বসে, খাইতে খাইতে আবার অন্যমনস্ক হইয়া বসিয়া থাকে। মা এ হাল্ দেখিয়া অবাক্ হইয়া যান—তাড়া করিতেই সে আবার তাড়াহুড়া করিয়া খাইতে শুরু করিয়া দেয়, কয় গ্রাস খাইয়াই ঝটপট উঠিয়া যায়। মায়ের অনুরোধ উপরোধের দিকে তাহার মন যায় না—বেশী বাড়াবাড়ি করিলে ঝাঁজের সহিত উত্তর দেয়: 'পেটে যায়গা নেই, কোথায় খাব?'

বৃদ্ধা জননী মনে মনে ভাবেন: এ সব রোগের একমাত্র ঔষধ—বৌ!

ভাই বহুদিন পরে বাড়ী আসিয়াছে শুনিয়া তস্‌লীমের বড় ভগ্নি তাহাকে বেড়াইতে যাইবার জন্য সংবাদ পাঠাইয়াছেন। তস্‌লীম প্রথমে মনে করিল, যে-গ্রামের লোকেরা তাহার চিরবাঞ্ছিতা প্রেয়সীর নামে এত বড় মিথ্যা দুর্নামের সৃষ্টি করিতে পারে, সে-গ্রামে যাওয়া তাহার দ্বারা আর হইবে না। বলা বাহুল্য, বাদামতলীতেই তস্‌লীমের বড় ভগ্নির বাড়ী।

কয়েকদিন পরে আবার তাহার খেয়াল ফিরিয়া গেল; মনে হইল: সেখানে গেলে হয়ত সব সংবাদের গোড়া পাওয়া যাইবে। কেমন করিয়া এ দুর্নামের সৃষ্টি হইল, কে বা কাহারা এর জন্য দায়ী, আর এ-সব কথার কতখানিই বা সত্য—গ্রামবাসীদের সঙ্গে আলাপে অন্তত এটুকু আন্দাজ করা যাইবে। এই ভাবিয়া সে গেল।

যাইতেই চেনা পরিচিত সবাই তাহাকে ছাঁকিয়া ধরিল। সকলের মুখে গোপন হাসি, চোখে বাঁকা চাহনি। এ দৃষ্টিজালের মধ্যে পড়িয়া তস্‌লীম মাথা তুলিতে পারিতেছিল না। কেন ইহারা আজ এত অস্বাভাবিক ব্যস্ততার সঙ্গে তাহাকে ছাঁকিয়া ধরিয়াছে তাহা বুঝিতে তাহার বাকি নাই; কাজেই লজ্জা-সরমে তাহার মাথা নুইয়া পড়িল।

ভগ্নি ও ভগ্নিপতি ভূমিকা না করিয়াই বলিলেনঃ সহরের বিয়ে কিছুতেই হতে পারে না।' তারপর একে একে সবিস্তারে বলিল, কেমন করিয়া তাহাদের গ্রামের জলুর মা, রমজানির নানী ভিক্ষা করিতে যাইয়া যে সব বিশ্রী কাণ্ড-কারখানা দেখিয়া আসিয়াছে---তাহাদের পাশের বাড়ীর হালীমনের দাদী ত নিজের চোখে মেয়েকে তাদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করিতে দেখিয়া আসিয়াছে। ভগ্নি নাস্তার বন্দোবস্ত করিতে কিছুক্ষণের জন্য উঠিয়া গেলে ভগ্নিপতি তস্‌লীমের আরও কাছে ভিড়িয়া আসিয়া অপেক্ষাকৃত চাপাস্বরে বলিলেনঃ 'তাহের মিঞাদের পাশের বাড়ীর আজমোল্ল মিঞাজী নিজে আমাকে ডেকে বলেছে, তার বৌ রাত্রে বেড়ার ছিদ্রপথে উঁকি মেরে দেখেছে সেই মেয়েকে তাহেরের সঙ্গে এক ঘরে এমনকি এক মশারীতে---। সে কসম করেই কথাগুলি বলেছে। মিঞাজী সাহেব ফরেজগার দীনদার লোক—একদম মিথ্যা হ'লে অনর্থক কসম খেয়ে তাঁর এ-সব বলবার কী দরকার ছিল?'

তস্‌লীম আর নিজেকে সামলাইয়া রাখিতে পারিল না। তাহার ভিতরে বোমার মতো ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইলেও সে নির্বিকারভাবে বলিলঃ 'দেখুন, কেউ যদি আমার সামনে কোরাণ মাথায় নিয়ে এ-সব কথা বলে অথবা স্বয়ং জিব্রাইল যদি আসমান থেকে নেমে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দেন, তবুও ও-সব আমার বিশ্বাস হবে না।'

বিনা কারণেই সকলের মুখ কালো হইয়া উঠিল।

তাহাদিগকে নাস্তায় বসাইয়া দিয়া ভগ্নি আবার কথাটা পাড়িলেন। এবার প্রথমে সৈয়দ বাড়ী হইতে চৌধুরী বাড়ী পর্য্যন্ত দেশের আরো বড় বড় বাড়ীর বহু সুপাত্রীর তালিকা দাখিল করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রূপে-গুণে ইহাদের সমান সহরে কেন খোদার তামাম সৃষ্টির মধ্যে যে

আর দ্বিতীয়টি নাই তাহা খুব জোরে-সোরে বলিয়া শেষকালে বলিলেন : 'সত্যি যদি না হয়, গ্রামবাসীদের কী স্বার্থ আছে যে তা'রা এ-সব মিথ্যা কথা বানিয়ে বলবে ? আর দেখ, বদনাম যদি সত্য না-ও হয় তথাপি যে-মেয়ে সম্বন্ধে এত বড় বদনামী উঠেছে সে মেয়েকে কেমন ক'রে বৌ ক'রে আনা যায়, বল ?'

তস্‌লীম এবার জোর করিয়াই উত্তর দিল : 'সে-মিথ্যাকে মিথ্যা ব'লে প্রমাণ করার জন্যই এ বিয়ে করতে হবে। অন্য কারণে এ বিয়ে বন্ধ হ'লে বিশেষ কিছু এসে যেত না। কিন্তু এ মিথ্যা বদনামীকে আশ্রয় ক'রে বিয়ে বন্ধ করা মানে সে-মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেওয়া, সে-মেয়েটির জীবনকে ধ্বংস করা। কাজেই সে মেয়েটিকে বিয়ে ক'রে সে মিথ্যাকে ধূলিসাৎ করতে হবে।'—বেশ বক্তৃতার সুরে এই সব বলিয়া ফেলিয়াই তাহার যেন লজ্জা বোধ হইল; তাহার মুখ-কান লাল হইয়া উঠিল।

বাড়ীতে আসিয়া তস্‌লীমের চিন্তা আবার মাথার ভিতর নানা মূর্তিতে ঘুরপাক খাইতে লাগিল। ঘুম তাহার ছিল না—কোন প্রকারে একটু তন্দ্রার মতো আসিতেই তাহার চিরবিরহী আত্মা কাঁদিয়া উঠিয়া তাহাকে উতলা করিয়া তুলিত। নানা এলোমেলো চিন্তা আসিয়া তোষক-শয্যাকে কণ্টকাকীর্ণ করিয়া তুলিত। এমনি রাত্রির পর রাত্রি ভোর হইতে লাগিল—দিনের পর দিন সন্ধ্যা হইতে লাগিল। চিন্তা কিছুতেই শেষ হয় না। একবার এদিকে আর একবার ওদিকে চিন্তা-স্রোত ছোটে। তাহার প্রতি রক্তবিন্দুতে যেন প্রতিধ্বনিত হইতেছিল : সব মিথ্যা। কিন্তু আবার পরক্ষণে মনে হয় : হইলেও ত হইতে পারে—মানুষের পক্ষে এ দুর্বলতা কি অসম্ভব ? নিজের জীবনের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই তাহার এ সন্দেহ আরো দৃঢ় হয়।—লোকের কাছে আমার যে স্বরূপ, সেই কি প্রকৃত স্বরূপ ? লোকে আমাকে ত নিষ্কলঙ্ক আদর্শ সাধু যুবক বলিয়াই জানে; কিন্তু নিজের অন্তরের অন্তরতলে এ কথা বেশ ভাল করিয়াই জানি, জীবনে আমিও ভুল করিয়াছি, পদস্খলন আমারও হইয়াছে; জানালায় সুন্দর মুখ দেখিয়া চোখ তুলিয়াও চাহিয়াছি, লোভ হয় নাই একথা বাহিরের জিজ্ঞাসার উত্তরে যদি

বলি তবে মিথ্যা কাপট্যের লজ্জার পীড়া হইতে মুক্তি পাইব কি? চিন্তার এ স্রোত ধরিয়া ভাবনা চলিতে লাগিল: 'আমার মতো সবল পুরুষের, নানা ভাষা ও সাহিত্যের উচচশিক্ষার ভিতর দিয়া, নানা চরিত্রের নর-নারীর সংস্পর্শে যাহার চরিত্র গঠিত তাহার পদস্খলন যদি সম্ভব হয়, তবে স্বল্পশিক্ষিতা, জীবনে অনভিজ্ঞা, খাঁচায় চিরাবদ্ধা চরিত্রের স্খলন ত সহজেই সম্ভব। ঝড়-ঝঞ্ঝায় বর্দ্ধিত গাছ যদি তুফানে ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে, তবে আলো-বাতাস হইতে বঞ্চিত ছায়ার আবেষ্টনে বর্দ্ধিত নরম গাছটি যে এক ধাক্কায় ভাঙ্গিয়া পড়িবে, তাহাতে বিচিত্র কি।' ইত্যাদি, ইত্যাদি।

চিন্তা করিতে করিতে সে একেবারে উন্মাদের মতো হইয়া পড়িল। শেষকালে রওশনের উপর যাইয়া তাহার সমস্ত রাগ পড়িল: 'আমার এত বৎসরের ভালবাসার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিলে! আমার এতখানি স্নেহ-ভালবাসা, এত বৎসরের পূজা পদাঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিলে! এত ভালবাসার অভিনয় করিবার কী দরকার ছিল, নারী বিশ্বাসঘাতিনী! Frailty thy name is woman!' তাহার হাড়-মাংস শক্ত হইয়া ওঠে; চোখ ফাটিয়া যেন আগুন ছুটিতে চায়।

দেশের আলো-বাতাস পর্য্যন্ত তাহার পক্ষে বিষাক্ত হইয়া উঠিল। বহু ভাবনা-চিন্তায়ও তাহার মনের আগুন নিভিল না—এ সন্দেহ-দ্বন্দ্বের কোনো কূল-কিনারা হইল না। শেষে তিক্তবিরক্ত হইয়া সে ঠিক করিল: না দেশত্যাগী হইব। কয়েক বৎসর দেশবিদেশ ঘুরিয়া হয়ত শান্তি পাওয়া যাইতে পারে। এই ভাবিয়া সপ্তাহ খানেকের মধ্যে সত্য-সত্যই সে একদিন খানকয়েক কাপড় বগলদাবা বাহির হইয়া পড়িল।

তস্‌লীম কলিকাতা আসিয়া পৌঁছিল। পুরাতন বন্ধুদের তালাসে এ-মেস্ ও-মেস্ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। থিয়েটার বায়স্কোপও বাদ দিল না কিন্তু কিছুতেই তাহার মনের আগুন নিভিল না।

কলিকাতার নিত্য হটগোলের মধ্যে নিজকে সে ডুবাইয়া রাখিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিল, কিন্তু আগুন আর কতক্ষণ ছাইচাপা থাকে?

একদিন সিগারেট ফুঁকিতে ফুঁকিতে সে কলেজ স্কোয়ারের এদিক সেদিক ঘুরিয়া ফিরিতেছিল। সিগারেট আগে তাহার অভ্যাস ছিল না; কিন্তু এ যেন তাহার আগুন দিয়া আগুন চাপিবার চেষ্টা, তাই সিগারেট এখন তাহার ঠোঁট-ছাড়া হয় না। সিগারেটে খুব জোরে শেষ টান দিয়া চোখ তুলিতেই কে একটি ছোক্‌রা তাহার হাতের ভিতর এক বিজ্ঞাপন গুঁজিয়া দিয়া গেল। কলিকাতার চিরাচরিত ব্যাপার, রাস্তায় বাহির হইলেই ত এই রকম কত নোটিশ-বিজ্ঞাপন কোথা হইতে আপনাআপনি হাতের ভিতর গাদা হইয়া ওঠে। হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড, বিনামূল্যে হাজার টাকা পুরস্কার, সেল্ সেল্ ইত্যাদি কিছু হইবে নিশ্চয়; ফেলিয়া দিতেছিল আবার কি জানি কেন লোভ হইল, এক মিনিট সময়ও যদি কাটে তাহাও ত পরম লাভ। পড়িয়া দেখিল —সন্ধ্যায় বিরাট সভা, স্থান—'আলবার্ট হল', বক্তা—'সুরেন বাড়ুয্যে', বিষয় 'বংগবাহিনী'।

যখনকার কথা বলিতে বসিয়াছি তখন পৃথিবীময় হুলুস্থূল—ইউরোপের সব জাতি মিলিয়া মানুষ-মারা বিদ্যায় কার কত হাত-যশ তাহার পরীক্ষায় লাগিয়া গিয়াছে। ইংরাজের ইজ্জত লইয়া টানাটানি পড়িতেই ইংরেজ প্রধান মন্ত্রী ভারতবর্ষের বীরত্ব ও বদান্যতার প্রতি আবেদন করিলেন। দেড়শত বৎসর পরে আবার বাংগালীর অস্ত্রগ্রহণের অনুমতি মিলিয়াছে—তাই নেতারা দেশের তরুণদের প্রতি ফিরিয়া বলিলেন: 'তোমরা বাংগালীর মুখ রক্ষা করো।'

যুদ্ধে যাক্ বা না যাক্ সুরেন বাড়ুয্যের বক্তৃতা. তাহাতে গেলে পৈতৃক প্রাণ বিপন্ন হইবার কোনো হেতু নাই. এতটুকু সকল বাংগালীই বোঝে, কাজেই সভাগৃহ একেবারে টইটম্বুর। চিন্তাযুক্ত হইবার যে সুযোগটুকু হাতের কাছে আসে তাহা হারাইয়া ঠকিতে তস্‌লীমের ইচ্ছা নাই; ধীরে ধীরে সেও জনসমুদ্রে যাইয়া ভিড়িয়া পড়িল।

বক্তৃতার তুফান ছুটিয়াছে—বাংলার আদি ইতিহাস হইতে পলাশীর যুদ্ধ পর্য্যন্ত কিছু বাকি রহিল না। সে বক্তৃতায় মরাগাঙে বান ডাকিল—বাংগালীর শিরায় শিরায় উষ্ণ শোণিত প্রবাহিত হইল। অপূর্ব আবেগের সহিত যখন বাংলার তদানীন্তন জননায়ক প্রশ্ন করিলেন: 'কাপুরুষ বাংগালী, এ বদনাম কি চিরদিন বাংলার ভালে লেখা থাকিবে?'

তখন দলে দলে বাংগালী যুবক তাহার যথাযোগ্য উত্তর দিল। 'বংগবাহিনী' গঠিত হইল।

তস্‌লীমের মনও তোলপাড় করিয়া উঠিল---'জীবনটা ত বৃথাই নষ্ট করিলাম; দেশের, সমাজের, মানুষের কত কাজ করিব, কত উচচ আশা নিয়াই না জীবন আরম্ভ করিয়াছিলাম; কিন্তু আজ এক কণা আগুনে সব পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। এ চিন্তার দাবদাহে পুড়িয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া জীবন রক্ষায় লাভ কি? ঘরে বাহিরে তাহার শান্তি ত কোথাও নাই। জন্মিয়াছে যখন রোগে শোকে ভুগিয়া গৃহকোণে, হয়ত বা রাস্তায় ঘাটে পড়িয়া অথবা দাতব্য চিকিৎসালয়ে বেতনভোগী সেবকদের অবজ্ঞার সম্মুখে শৃগাল-কুকুরের মতো একদিন ত মরিতে হইবেই---তার চাইতে দেশের মুখ রক্ষায় জীবনটা উৎসর্গ করি না কেন?' না, সেও যুদ্ধে যাইবে। পরদিন সে 'বংগবাহিনীতে' নাম লিখাইয়া দিল।

কিছুদিন কুচ্‌কাওয়াজের পর বধ্যভূমিতে যাত্রার পূর্বে আত্মীয়-স্বজন হইতে শেষ বিদায় লইবার জন্য তাহাদিগকে পনর দিনের সময় দেওয়া হইল।

দেশে আসিয়া তাহার যুদ্ধযাত্রার সংবাদ দেওয়া মাত্র সকলে অবাক্ হইয়া গেল। এমন কাণ্ড ত তাহারা কখনো শোনে নাই! নিজের একমাত্র প্রাণটি নিজের হাতে করিয়া মৃত্যুর হাতে সঁপিয়া দিতে যায় এমন বেয়াকুব দুনিয়ায় আছে এ তাহারা জীবনে ত দেখে নাই, কোনদিন তাহাদের পূর্বপুরুষের কাছে গল্প শুনিয়াছে বলিয়াও মনে পড়ে না। কাজেই দেশে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল মৃত্যুপথ-যাত্রীকে একবার শেষ দেখা দেখিয়া পুণ্য অর্জনের। তস্‌লীমও দেশবাসী এবং সকল আত্মীয়-স্বজন হইতে বিদায় লইতে লাগিল।

তাহার ভগ্নি হইতে বিদায় লইবার জন্য বাদামতলী আসিতেই তাহার মনের পুরাতন ক্ষতে কে যেন আবার হঠাৎ খোঁচা দিয়া বসিল--- ছাই-চাপা আগুন আবার অনুকূল বাতাসে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। আবার চতুর্দিকে হইতে রওশনের চিন্তা তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল। বিদায়-বেলায় যদি এ আগুনকে সাথী করিয়া লইয়া যাইতে হয়, তাহা হইলে ত কর্তব্যকাজে ত্রুটি অবশ্যম্ভাবী। সামরিক জীবনের কঠোর নিয়মবদ্ধ

জীবন-যাত্রায় প্রাত্যহিক কর্তব্য পালনে যদি ব্যথার আগুন অবহেলা জন্মায়, তাহা হইলে ত বড় লজ্জায় পড়িতে হইবে। এই সব সাত-পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে তাহার মনে হইল: 'ঘটনাটা আর একবার ভালো করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখি না কেন? ঐবার ত শুধু বুবু আর তাঁর স্বামীর কথা শুনিয়াই গিয়াছি।'

তারপর সকালে উঠিয়া ভগ্নিপতিকে গোপনে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া লইল, কে বা কাহারা সেই অপকর্মের চাক্ষুষ সাক্ষী। তারপর একটা ছোক্‌রা দিয়া তাহাদিগকে ডাকাইয়া আনিয়া সবিস্তারে জিজ্ঞাসা করিল। জলুর মা বলিল: 'আমি না, আমার জা দেখিয়াছে।' জাকে ডাকাইয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করা হইলে সে বলিল: সে দেখে নাই, দক্ষিণপাড়ার ফতুনীর মা তাহাকে বলিয়াছে।—এ রকমে সব চাক্ষুষ সাক্ষী যে সাক্ষ্য দিল তাহা মোটামুটি এই দাঁড়াইল: তাহারা কেহ স্বচক্ষে কিছু দেখে নাই, এমন কি মেয়েকেও দেখে নাই, তাহারা অমুকের কাছে শুনিয়াছে। অমুকের সূত্র ধরিয়া বহু তল্লাসেও শেষ অমুককে আর পাওয়া গেল না। তখন তস্‌লীমের বুঝিতে বাকী রহিল না সমস্ত ঘটনাটা এই রকমই নির্জলা সত্য! একটা মিথ্যা সন্দেহের আগুনে সে জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইতেছে, আর একটি সুকুমার কুসুম দগ্ধিয়া দগ্ধিয়া মরিতেছে। সেই গ্রামবাসীদের প্রতি আবার তাহার নতুন করিয়া রাগ হইল। তাহার শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্ত রি রি করিয়া ফিরিতে লাগিল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল সমস্ত গ্রামটিকে গলা টিপিয়া হত্যা করে।

রাগ একটু পড়িতেই রওশনের অম্লান-মধুর মূর্তি তাহার কল্পনায় ভাসিয়া উঠিল। পুরাতন স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। শৈশবকাল হইতে তাহাদের বিবাহের প্রতিবন্ধকতা পর্য্যন্ত একে একে সব কথা জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে উতলা করিয়া তুলিল। একটা মিথ্যা কাল্পনিক সন্দেহে বিশ্বাস করিয়া কী দারুণ অন্যায়ই না সে করিয়াছে! দারুণ অনুশোচনায় তাহার মন আবার ধুঁকিয়া মরিতে লাগিল।

কলিকাতা হইতে আসিবার সময়ে মনে করিয়াছিল রওশনের সঙ্গে আর তাহার দেখা করা হইবে না, বাড়ী হইতে ফিরিবার সময় শুধু বেগম সাহেবাকে একবার সালাম জানাইয়া আসিবে। কিন্তু এখন তাহার

অন্তরপুরুষ ফরিয়াদ করিয়া উঠিল—না, রওশনের সঙ্গে যে কোন প্রকারে দেখা করিতেই হইবে, তাহার পরিপূর্ণ ক্ষমা এবং অনুমতি লইয়া না গেলে তাহার যাত্রা শুভ হইবে না, তাহার জীবনে শান্তি ফিরিয়া আসিবে না।

বাড়ী হইতে বিদায় লইয়া সে সহরে মিঞা-বাড়ীতে আসিল। বেগম সাহেবা শুনিতেই তাঁহার চোখ-মুখ বিষাদক্লিষ্ট হইয়া উঠিল। তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, সেই সন্দেহের আগুনই তাহাকে মৃত্যুপথের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে, না হয় পরিবারের একমাত্র ছেলে, সে ভার গ্রহণ তাহার কর্তব্যের মধ্যে ছিল না। তাঁহার নারী-চিত্তে দারুণ আঘাত লাগিল। তিনি বুঝিলেন তস্‌লীম তাঁহাকে বিশ্বাস করে নাই। এতদিন শুধু মুখে মা ডাকিয়া অপমান করিয়াছে মাত্র। তিনি তখন বিশেষ কিছু বলিলেন না, শুধু কুশল জিজ্ঞাসার পর তাহার খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্তের জন্য অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন।

মায়ের এ অকারণ নিরুৎসাহ ভাব দেখিয়া তাহার মনও বিষাদিত হইয়া উঠিল। আজ তিনি তাহার সঙ্গে একটু ভালো করিয়া আলাপও করিলেন না, তাহার যুদ্ধ যাওয়া সম্বন্ধে কোনো কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন না—চিরাচরিত মেয়েদের বারণ করাটাও করিলেন না! তাহার মন চিন্তান্বিত হইয়া উঠিল। নানা এলোমেলো ভাব আসিয়া মনের ভিতর ঘুরিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল—এখন হয়ত তাঁহার মন অন্যদিকে ফিরিয়া গিয়াছে, হয়ত বা রওশনের সঙ্গে বিয়ে না হওয়াতেই তাহার উপর হইতে তাঁহার মন উঠিয়া গিয়াছে। 'তবে কি শুধু তাঁর মেয়েটির উদ্ধারের জন্যই আমাকে স্নেহ করিতেন? সেই স্বার্থ-কলুষিত স্নেহ লইয়া তিনি আমাকে পুত্র বলিতেন?' ব্যথায় তাহার চোখ ফাটিয়া পানি আসিবার উপক্রম হইল। যাক্‌, তবে বিয়ে হয় নাই ভালোই হইয়াছে।

রাত্রে শুইয়া শুইয়া এই সব চিন্তাই সে করিতেছিল। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সব কল্পনা আজ তাহাকে পাইয়া বসিল। অতীতের কত মধুর স্মৃতি তাহার মানসপটে উদয় হইয়া তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিল। সেই শৈশবের হাসি-তামাসা, রওশনকে পড়াইতে বসিয়া শ্লেটে চিঠি লেখালেখি, হাস্য-কৌতুক, মান-অভিমান, সেই চপল ভালবাসাবাসি নিবেদন, এই সব চিন্তা আবার তাহাকে রওশনের জন্য উন্মুখ করিয়া তুলিল।

তাহার যেন বার বার মনে হইতেছিল সে তাহার প্রতি অন্যায় করিতেছে—রওশনের কোনো দোষ নাই।

ভাবনার বিরাম নাই---বেগম সাহেবার স্নেহে হয়ত কৃত্রিমতা ছিল কিন্তু রওশনের মধ্যে ত কোনদিন এতটুকু কৃত্রিমতা সে দেখে নাই। সে তাহার পরিপূর্ণ কুমারীচিত্ত লইয়াই তাহাকে ভালবাসিয়াছে, সে ভালবাসা কোনদিন বাহিরে প্রকাশ না পাইলেও তাহার ত অজানা ছিল না। তাহারা একে অন্যকে প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিয়াছে। সেই ভালবাসাকে সে ত কোনদিন ক্ষুন্ন করে নাই! বাহিরের দুনিয়ার মিথ্যা নিন্দা ও প্রতিবন্ধকতার প্রতিফল সে কেন একা ভোগ করিবে?

তাহার অন্যায় সন্দেহের জন্য তাহার ক্ষমা চাহিয়া লইতে হইবে। কিন্তু কেমন করিয়া একবার রওশনের সঙ্গে দেখা করা যায়—বিদায়-কালের শেষ দেখা। আকাশ-পাতাল ভাবিয়া সে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। একবার মনে করিল, কোনো দাসীকে দিয়ে গোপনে সাক্ষাৎ করিবার জন্য ডাকিয়া পাঠায়। আবার মনে হইল, এইরকম ভাবে সে না আসিতেও পারে আসিলেও নিরাপদ নয়; এই সব ব্যাপারে তৃতীয়ের, বিশেষতঃ তৃতীয়ার উদয় ভালো নয়। কাল সে চলিয়া গেলে লোকের কানে কানে টি টি পড়িয়া যাইবে। তখন হতভাগিণী নারী—এক আঘাতেই যে অর্দ্ধমৃতা হইয়া রহিয়াছে, আর এক আঘাত কি সে সহিতে পারিবে? সাত-পাঁচ ভাবিয়া ঠিক করিল: না, বেগম সাহেবাকেই বলিব। কিন্তু অপরিসীম লজ্জা আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। সে বিছানা হইতে উঠিয়া আবার শুইয়া পড়িল। ভাবিতে ভাবিতে কখন যে তন্দ্রা আসিয়া পড়িল, তাহার খবরও রহিল না।

রাত্রি প্রায় বারটার সময় বাড়ীর এক পুরাতন চাক্‌রাণী আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া তুলিল। তারপর বুড়ী কাপড়ের খুঁট খুলিয়া এক টুকরা কাগজ তাহার হাতে গুঁজিয়া দিল। কাগজ খুলিয়া পড়িতেই আসীমের দেহ-মন কাঁপিয়া উঠিল। অপূর্ব পুলক-রোমাঞ্চের মধ্যে সে কাগজখানি পাঁচ সাত বার পড়িয়া দেখিল। কাগজখানিতে একটি মাত্র কথা লিখা ছিল, তাহা এই---'রাত্রি একটা বাজিতেই আমাদের ভিতর-বাড়ীর উঠানে আমার সঙ্গে দেখা করিবেন, কথা আছে---রওশন।'

কী কথা আছে?---নানা সম্ভাব্য চিন্তা আসিয়া তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিল। কী কী কথা বলিবে, কী বলিয়া তাহার নিকট হইতে বিদায় লইবে, সে বা কী বলিবে, সে আজ দেখিতে কেমন হইয়াছে, তাহাকে দেখিতে পারিবে, এ সব আনন্দ চিন্তায় রাত্রি একটা হইয়া গেল।

খুব সন্ত্রস্ততার সহিত ঘর হইতে বাহির হইয়া ধীর পদবিক্ষেপে তস্‌লীম ভিতরের উঠানে যাইয়া দাঁড়াইল। ভিতর-বাড়ীর দুয়ার জুড়িয়া কুকুর শুইয়াছিল, তাহার সাড়া পাইতেই ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল---তাড়াতাড়ি কাছে যাইয়া কুকুরের মাথায় হাত বুলাইতেই কুকুর চুপ করিল। সঙ্গে সঙ্গে কপাট খুলিয়া ধীরে ধীরে আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃতা রওশন বাহির হইয়া আসিল। তস্‌লীমকে সালাম করিয়া তাহার ও বাড়ীর কুশল জিজ্ঞাসা করিল। তাহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল---তাহা সামলাইয়া লইয়া সে নিজেকে দৃঢ় করিবার চেষ্টা করিল। অবলীলাক্রমে তস্‌লীমের যুদ্ধযাত্রা ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিল। তস্‌লীম স্বপ্নাবিষ্টের মতো শুধু উত্তর দিয়া যাইতেছিল। আর সে আধো-আঁধার নিশীতে তাহার আশৈশবের বাঞ্ছিতাকে যেন দুই চোখ ভরিয়া পান করিতে লাগিল। শেষে রওশন জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল: 'আপনার সন্দেহ এখনো যায়নি, না?'

অভিভূত তস্‌লীম আম্‌তা আম্‌তা করিয়াই জবাব দিল: 'না, আমার কোনো সন্দেহ নাই।'

—'ঐ 'না'-ই ত বল্‌ছে 'হাঁ', মনের গোপন তলে সন্দেহ আছে। আচ্ছা, যদি একটি কথা রাখেন আমি সব খুলে বলতে পারি।'

তস্‌লীম স্বীকৃত হইল।

—'ওয়াদা করতে হবে, আমার কথা শুনে বিশ্বাস করুন বা না-ই করুন আমাদের বিয়ের কথা আর ওঠাতে পারবেন না।'

তস্‌লীম বলিল: 'তা কেন, আরও ত বহু ওয়াদা হতে পারে।'

রওশন জানাইল: তা না হলে সে সব কথা খুলে বল্‌তে পারে না।

সেই রহস্য ঘেরা কথা, যাহা এতদিন তাহাকে জ্বালাইয়া পোড়াইয়া মারিয়াছে, আজও যার সম্বন্ধে তাহার হৃদয়ের নিভৃততম স্থানে একটু

গুপ্তপুঁতি রহিয়া গিয়াছে, সে সব জানিবার জন্য তাহার চিত্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। সেই রহস্যের দ্বারোদঘাটন হইবে, তার জন্য যে কোনো ওয়াদা সে করিতে পারে। তার উপর সে জানে তাহারই রওশন, সে যখন চাহিবে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে না, ইত্যাদি ভাবিয়া সে বলিল : আচ্ছা।

'তবে আসুন'—বলিয়া রওশন আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিল। বাহিরে দেউড়ী ঘরের সম্মুখেই পুকুর-পাড়ে মসজিদ, অবিচলিত পদবিক্ষেপে রওশন মসজিদের উঠানের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। তস্‌লীম যন্ত্রচালিতের মতো তাহার অনুসরণ করিতেছিল। মসজিদের দুয়ারে দাঁড়াইয়া রওশন আঁচলের ভিতর হইতে একখানা মোটা কী বই বাহির করিল; তারপর তস্‌লীমের দিকে তাকাইয়া বলিল : 'সাম্‌নে মসজিদ আর হাতে এই কোরাণ, এই নিয়ে বল্‌ছি আমার উপর যে-সব দোষারোপের গুজব উঠেছিল সব মিথ্যা। সব বানানো কথা।' তারপর একটু ঢোক গিলিয়া রওশন বলিল : আমি জানি এ-রকম ভাবে এ-সব কথা বলাতে আমার নিজেকে অপমান করছি। এ-রকমভাবে ব'লে বিশ্বাস উৎপাদনের কোনো দরকার ছিল না এবং তার কোনো মূল্যও নেই; তথাপি দেখলাম আপনি অনর্থক একটা মিথ্যা আগুনে জলে-পুড়ে খাক্ হচ্ছেন, অহরহ আপনার ভিতর একটা আগুন জ্বলছে। আমার বোধ হচ্ছে সে-আগুনকে চাপা দেবার জন্যই আপনি আপনার দেহকেও আগুনের মধ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। যাক্, মনে করছিলাম বিশ্বাস করতে পারলে আপনি একটু শান্তি পাবেন। আচ্ছা, মাপ করবেন, আসি।'—এই বলিয়া ছোট্ট একটি সালাম করিয়া ধীরে ধীরে সে ভিতর বাড়ীতে চলিয়া গেল।

তস্‌লীম স্তব্ধ হইয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার যে কিছুই বলা হয় নাই! কত কথাই না মনে করিয়াছিল। বহুদিন পর দেখা, আবার বহুদিনের জন্য, হয়ত জন্মের জন্য ছাড়াছাড়ি। শত প্রকারে তাহাকে কষ্ট দিয়াছে, অন্যায় সন্দেহকে মনে স্থান দিয়া সেই দেবী-প্রতিমাকে অপমান করিয়াছে। একটু ক্ষমা চাহিবার অবসরও পাইল না। আহাম্মক বেকুব সে, তাই কথা বলে নাই, ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে সে

বিছানায় আসিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল। আর আত্মধিক্কারে এবং অনুশোচনায় তাহার ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কান্না আসিল।

পরদিন নানা চিন্তা আসিয়া তস্‌লীমকে ভাবাইয়া তুলিল। তবে এ-ভাবনায় দাহ নাই। গত রাত্রির পর হইতে তাহার মনের জ্বালা জুড়াইয়াছে---সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বহুদিন পরে একটু আরাম বোধ করিল।

বঙ্গ-ভূমির মুখ উজ্জ্বল করার চাইতে এখন যেন সে আর একটি মুখের ঔজ্জ্বল্যে আবার নতুন করিয়া বাঁধা পড়িল।

আজ তাহার বিদায়ের দিন ছিল; কিন্তু কী ভাবিয়া সে আজ যাইবার জন্য কোনো তাড়াহুড়া করিল না! তাহার চেহারা দেখিলে মনে হয়, সে যেন হাঁ করিয়া আছে কেহ আজ তাহাকে থাকিয়া যাইতে বলে কিনা তাহা শুনিবার জন্য।

বেগম সাহেবা মনে করিয়াছিলেন—সে কিছুতেই থাকিবে না। তথাপি তিনি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: আজকের দিনটা থাকিয়া গেলে হয় না?

সে একটু অনাবশ্যক রকম চিন্তা করিয়া লইয়া বলিল: 'রেজিমেণ্ট কলিকাতা থেকে পঁচিশে রওনা হওয়ার কথা—আজ ত বিশ।' মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে আবার বলিল: 'আচ্ছা, আপনি যখন বলছেন—একদিনে কী আর এসে যাবে?'

সারাদিন ভাবিয়া ভাবিয়া সে ঠিক করিল, কী কী বলিবে। মনের ভিতর এক একটা কথা শতবার করিয়া রিহার্শাল দিতে লাগিল।

সন্ধ্যার সময় বুড়ি দাসীকে ডাকিয়া তাহার হাতে একটা সিকি এবং এক টুক্‌রা কাগজ গুঁজিয়া দিল। এ সব বুড়ীদের বেশী কথা বলিতে হয় না, তাহারা যৌবনের রঙীন স্মৃতি টানিয়া আনিয়া ইঙ্গিতেই সব বুঝিয়া লয়।

রাত্রি একটায় আবার উঠানে দেখা হইল।

রওশন ভিতরে ভিতরে শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার মুখ দিয়া আজ আর কথা সরিতেছিল না।

তস্‌লীম কিন্তু আজ দৃঢ়। উঠানে দাঁড়াইয়া কথা বলা যায় না—কাজেই তস্‌লীম ভিতরের পুকুর-পাড়ে যাইবার ইঙ্গিত করিতেই রওশনও একটু কী ভাবিয়া লইয়া বিনা দ্বিধায় তাহার অনুসরণ করিল। ভিতরে ভিতরে তাহার মনে অজ্ঞাত শঙ্কা হইলেও তস্‌লীমকে শঙ্কা করিবার তাহার কিছুই ছিল না। সুযোগ সময়কে আজ কোন প্রকারে গলিয়া যাইতে দিবে না। এই দৃঢ়সঙ্কল্প লইয়া তস্‌লীম বিনা ভূমিকায় তাহার অন্যায় অবহেলা ও সন্দেহের জন্য রওশনের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিল। রওশন ত প্রথমে নির্বাক্‌ তারপর ধীরে ধীরে অভিমান-ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল: 'ক্ষমা করবার কী আছে। দশজনে যা বিশ্বাস করেছে আপনিও ত মাত্র তাই বিশ্বাস করেছেন, তার বেশী ত কিছু করেন নি!' এই বলিয়া সে একটুখানি হাসিল। সে হাসি অশ্রুর নামান্তর মাত্র।

এ-সব বিষয়ে পীড়াপীড়ি করিয়া তাহার এই অমূল্য সময় নষ্ট করিতে তস্‌লীমের আদৌ ইচ্ছা নাই; সে তাড়াতাড়ি তাহার মনের আসল কথাই বলিয়া ফেলিল: 'আমি কাল মাকে বলব, আমাদের বিয়ে হয়ে যা'ক। আমার মা বাবাও রাজী হবেন।'

রওশন লজ্জায় অধোবদন হইয়া গেল, পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়া মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে বলিল: 'কাল আপনি কী ওয়াদা করলেন—'

—'সে ওয়াদা খেলাপের জন্য যত পাপই হউক তার জন্য আমিই দায়ী। তার জন্য হাজার বছর জাহান্নম-বাসও আমি কবুল করব।

—'না, আপনি যুদ্ধে যাচ্ছেন, যান্‌।

—'না, আমি মেডিক্যাল্‌ সার্টিফিকেট দেব, যাব না—আর নেহাৎ যেতে হলেও পরের ব্যাচ্‌-এ যাব।'

—'না, আমি আপনাকে ওয়াদা খেলাপ করতে দেব না।' রওশনের কণ্ঠ এবার দৃঢ়।—'এ-শপথের পর যদি বিয়ে হয়, এটা কিছুতেই অসম্ভব নয় যে, আপনার বা যারা জানবে তাদের মনে এ-রকম একটা ধারণা জাগতে পারে যে, এ-বিয়ের জন্যই আমি কোর্‌আন ও মস্‌জিদ নিয়ে মিথ্যা শপথের ভান করেছি। সেদিন যে অসহনীয় লজ্জা আমাকে পীড়া দেবে তা সহ্য করতে আমি পারব না। তাই আমি আপনার কাছ থেকে

ওয়াদা করিয়ে নিয়েছিলাম, বিয়ের কথা আর তুলতে পারবেন না।'

—'না, রওশন—'

তাহার কথা শেষ হইতে পারিল না, রওশন একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল: 'আপনার কাছেই ত কতবার শুনেছি প্রকৃত ভালবাসা মনে, দেহে নয়। আর দুইটি মনের একান্ত যে ভালবাসা তা বিয়ের বাহ্যিক অনুষ্ঠানের চাইতে অনেক বড়! আজ সে কথা আপনি নিজেই ভুলে যাচ্ছেন!' তারপর আবার হাসিল, সে হাসিও মেঘে-ঢাকা চাঁদের মতো। 'আচ্ছা, আপনি কি আমায় ভালবাসেন মনে করেন? আমার ত মনে হয় না। আর ভাল যদি বাসেন তাও আর দশজনের মতোই; দশজনকে ছাড়িয়ে যখন উঠ্তে পারেন নি, তখন অনর্থক একটা বাইরের অনুষ্ঠান পালন তথা আত্মবঞ্চনা ক'রে কী লাভ?' অভিমানে তাহার ঠোঁট কাঁপিয়া উঠিল, কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া গেল। 'আমার নামে বদ্‌নামী উঠেছিল তা' ত আপনি অস্বীকার করতে পারেন নি। আমার মধ্যে যদি গুণ থাকে সে গুণের জন্য করিম রহিম যে কেউ আমাকে ভালবাস্‌তে পারে। আমার কলঙ্ককে ভালবাসা —সে অমূলক হউক বা সমূলক হউক, সে শুধু একজনের কাছেই আশা করেছিলাম—।' সে আর বলিতে পারিল না।

উভয়ে নির্বাক্। সেই নিস্তব্ধ নিশীথ-প্রকৃতির নীরবতা ভঙ্গ করিয়া পুকুরের মধ্যে এক সঙ্গে দুইটি ডাহুক কোয়া কোয়া করিয়া উঠিল।

রওশন নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল: 'তবে আসি—'

তস্‌লীমের দেহ-মন কাঁপিতে লাগিল, কম্পিতকণ্ঠে বলিল: 'তা হলে এতদিনের আশা ভরসা সব---!' কথাগুলি যেন ব্যথার গলিতগ্রাব। ব্যথায় তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

রওশনের পা কাঁপিতে লাগিল, সে একটি চারাগাছ্ ধরিয়া লইয়া বলিল: 'আপনি এক মহৎ কাজে যাচ্ছেন, তা' থেকে মন ফিরাবেন না; সমস্ত দেশ আপনাদের বিজয়ীবেশে ফেরা পথের দিকে চেয়ে থাকবে....।' তারপর একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিল।....আমার যা পাওয়ার আমি পেয়ে গেছি, তাই আমার আর বেশী গরজ নেই। আচ্ছা, বিয়েটাই কি

একজনের একজনকে পাওয়ার সব চাইতে বড় উপায় ? বিয়ে না হয় হ'ল : আমি আপনার ভাত-রাঁধুনী হলাম, হয়ত বা দু' একটি সন্তানের জননীও; আপনিও বাবা হলেন, আমার খোরপোষ জোগালেন ; এইটিই কি সব চাইতে বড় পাওয়া ?' ....তারপর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল : 'আর আপনি যদি নেহাৎ নাছোড়বান্দা হ'ন, ফিরে আসুন, তারপর দেখা যাবে.... ।'

সেই গভীর নিশীতে এই দুইটি প্রাণীর বিদায়-বেলার দৃশ্য এতই করুণ ও মর্ম্মন্তুদ যে, তাহা দিনের আলোয় অসহ্য।

তস্‌লীম যখন যুদ্ধে চলিয়া গেল, তখন বেগম সাহেবা তাহার সঙ্গে রওশনের বিবাহের কথা এক রকম ছাড়িয়া দিলেন। 'বাবা আমার হায়াৎ-মউতের পথে গিয়াছে, খোদা তাহাকে ছহিসালামতে ফিরাইয়া আনুন্ ; কিন্তু যাইবার সময় তাহার ইচ্ছা কী সে ত কিছুই বলিয়া গেল না ! তবে কি তাহার সন্দেহ এখনো যায় নাই ?' ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে বেগম সাহেবা মনে করিলেন : 'এই রকম ভাবে রওশনকে আর কতকাল রাখিয়া দিব, তাহার জীবনটা আমিই নষ্ট করিলাম'। এমনি চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার চোখ-মুখ অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া ওঠে।

অন্যের দ্বারা কথা বলা সব সময় নিরাপদ নহে, বিশেষত মেয়েদের দ্বারা ; তাহারা পেটের কথা অন্যকে না বলিয়া থাকিতে পারে এ কেহ শপথ করিয়া বলিলেও বিশ্বাস করা যায় না। বেগম সাহেবা একদিন রওশনকে ডাকিয়া নিজেই তাহার মাথা আঁচড়াতে বসিলেন---তারপর ধীরে ধীরে কথা পাড়িলেন। সে সুর বড় করুণ, শ্রোতার অন্তরে গিয়া বিঁধে।---'মা, তোমার ত কোনো সুরাহা ক'রে দিতে পারলাম না ; শরীর আমার দিন দিন যে রকম ভেঙ্গে পড়ছে, কোন্ দিন খোদার শেষ পরওয়ানা এসে পৌঁছে....মরণেও যে আমার মনে দাগ থেকে যাবে ।'

মায়ের ব্যথাক্লিষ্ট অন্তরের ছোঁওয়া কন্যার মন গলাইয়া দিল। কোনো লজ্জাই আজ তাহার মনে স্থান নিতে পারিল না। সেও অসঙ্কোচে উত্তর করিল : না, মা, আমার জন্য আর কিছু করতে হবে না, তুমি দাদাদের বৌ আন, আমি তাদের নিয়ে সুখে থাক্‌তে পারব।'

মা আর অশ্রু রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিলেন না---তাঁহার চোখ ফাটিয়া জল আসিল। কত বড় ব্যথায় আজ তাঁহার কন্যা পাষাণে বুক বাঁধিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার বুক ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল---তিনি কন্যার অর্দ্ধসমাপ্ত কথা রাখিয়াই উঠিয়া গেলেন।

তস্‌লীম মধ্যে মধ্যে চিঠি লেখে। সে সব চিঠিতে যুদ্ধের এবং তাহার সৈনিক জীবনের বর্ণনা ছাড়া অন্য কথা বিশেষ কিছু থাকে না। তাহাদের সৈনিক জীবনের ভয়াবহ কাহিনী শুনিয়া বেগম সাহেবার চোখ মুখ কালো হইয়া ওঠে, তাঁহার অন্তরের অন্তস্থলে প্রার্থনা জাগে: খোদা তাকে বাঁচিয়ে রাখুন। রওশনের অস্বাভাবিক ব্রীড়া এখন কাটিয়া গিয়াছে; সে নিজেই এখন তস্‌লীমের কাছে চিঠিপত্র লেখে, তাহাতে সে এখন আর লজ্জা বোধ করে না। এ যেন তাহার পূর্বেকার তস্‌লীম ভাই।

বেগম সাহেবা নিজের মেয়েকে ভাল করিয়াই জানিতেন। তিনি চেষ্টা করিয়া যখন রওশনকে বিবাহে সম্মত করাইতে পারিলেন না তখন তিনি হাল ছাড়িয়া দিলেন, বুঝিলেন কিছুতেই তাহাকে রাজী করানো যাইবে না। এইবার তিনি পুত্রদের বিবাহের দিকে মনোযোগ দিলেন।

তাহার মনের যে অবস্থা, এ অবস্থায় বেশী হৈ চৈ করিয়া বিবাহনুষ্ঠান করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। এ শুধু কর্ত্তব্য পালন। তিনি দুইটি পুত্রেরই বিবাহ ঠিক করিলেন। ইতিপূর্ব্বে বড় পুত্রটি বি-এ পাশ করিয়া আসিতেই তাহাকে সম্পত্তির ম্যানেজার করিয়া দিয়াছেন। স্বামীকে ম্যানেজারী লইতে ডাকিয়াছিলেন, তিনি মান করিয়া আসেন নাই। পুত্রদের বিবাহে স্বামীকে আসিতে লিখিলেন; তিনি আসিবেন না জানাইলেন। পরিশেষে পুত্রদের লইয়া তিনি বাঁশবাড়িয়ায় গিয়া হাজির হইলেন, হাতে ধরিয়া মাফ্‌ চাহিলেন---কিন্তু স্বামীর রাগ কিছুতেই পড়িল না।

অল্পদিন আগে মাত্র তিনি একটি বিবাহ করিয়াছেন। তিনি নিজে এখন বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, কাজেই একটু কাঁচা বয়স দেখিয়া বৌটি

আনিতে হইয়াছে, কেননা বুড়ীতে বুড়ার খেদমত চলে না।—তিনি অনেক মান-অভিমানের কথা বলিলেন বটে। আসল কথা, এমন অনবসরতার মধ্যে তাঁহার যাইবার অবসর কোথায়!

অগত্যা বেগম সাহেবা আসিয়া নিজেই সমস্ত জোগাড়যন্ত্রে লাগিয়া গেলেন। বিবাহের দিন বরযাত্রীদের যাত্রার সময় হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে হামীদ সাহেব আসিয়া পেঁাছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলে তাজ্জব হইয়া গেল। তিনি হাসিয়া বলিলেন: 'আমার ছেলেদের মন ছোট হবে, তাই জরুরী কাজ ফেলে চলে আস্‌লাম।'

রওশনের দিন আর কাটে না। নতুন ভাবীদের লইয়া কিছুদিন বেশ স্ফুর্ত্তিতে কাটিল বটে, কিন্তু পরে বুঝা গেল তাঁহারা রওশন অপেক্ষা স্ব স্ব স্বামী লইয়া মশগুল থাকিতেই বেশী লাভজনক মনে করেন। বড় ঘরের মেয়ে, কাজকর্ম্মও বেশী করিতে হয় না--করিতে চাহিলেও দাসদাসীর জন্য পারা যায় না। শুধু বই পড়িয়া দিন আর কত কাটে! কাজেই সে মাকে ধরিয়া বলিল: তাহার জন্য একটি মেয়ে-শিল্পী ঠিক করিয়া দিতে; সে পেন্টিং শিখিবে।—

মা ছেলেদের বলিয়া একজন ভালো মেয়ে-শিল্পী ঠিক করিয়া দিলেন।

নানা দিকের ব্যথায় বেগম সাহেবার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। তিনি আর বেশীদিন টিকিয়া থাকিবেন না, এ কথা তিনি যেমন বুঝিয়াছিলেন বাহিরের লোকও তাঁহার শরীর দেখিয়া তাহা ধারণা করিয়া লইয়াছিল। কাজেই তিনি পুত্র ও পুত্রবধূদের ডাকিয়া রওশনকে দেখিবার জন্য এবং তাহার যাহাতে কোনো অভাব না হয় তার জন্য আদেশ, উপদেশ ও অছিয়েত করিয়া গেলেন।

সত্য সত্যই একদিন শেষ পরওয়ানা আসিয়া হাজির হইল। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি একদিন, মাত্র কয়েক দিনের জ্বরে, কন্যা রওশনের মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে তিনি অশ্রুজলের মধ্যে চিরতরে ডুবিয়া গেলেন।

রওশন এখন সারাদিন তুলি লইয়াই দিন কাটায়---তাহার নিজের ঘর অর্গলবদ্ধ করিয়া উপুড় হইয়া বসিয়া বসিয়া সে সারাদিন ছবি আঁকে। কী ছবি আঁকে কাহারও দেখিবার যো নাই। তাহার ভাইরা, ভাবীরা কতবার চেষ্টা করিয়াছে সে কী ছবি আঁকে দেখিবার জন্য, কিন্তু সে কাহাকেও দেখিতে দেয় না---আঁকা হইলেই সব বন্ধ করিয়া রাখে। দুঃখিনী বোনটি পাছে মনে ব্যথা পায় ভাবিয়া তাহারা কেহ বেশী জোর জবরদস্তিও করে না।

তস্‌লীম বেগম সাহেবার মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া মর্ম্মাহত হইল। তাঁহার অকাল-মৃত্যুর জন্য সে নিজে যে অনেকখানি দায়ী সে-চিন্তা আসিতেই তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিল। তাহার জন্য এ মহিমময়ী নারী কি না করিয়াছেন! পুত্রনির্বিশেষে তাহাকে চৌদ্দ পনর বৎসর ধরিয়া পালন করিয়াছেন, তাহার মতো সামান্য গৃহস্থ-সন্তানের সঙ্গে জমিদার-কন্যার বিবাহ দিতে চাহিয়াছেন, তাহার জন্য নিজের স্বামীর সঙ্গে চিরতরে ভাঙ্গাভাঙ্গি করিয়াছেন, নিজের আদুরে কন্যার জীবনটি নষ্ট করিয়াছেন। এ-সব ভাবিতে ভাবিতে সে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল তাহার মন কাঁদিয়া উঠিল। আগামী মাসে যুদ্ধ-বিরতি সন্ধি---armistice হইবে, তখন তাহারা দেশে ফিরিবার অনুমতি পাইবে। হায়, মাত্র এক মাসের জন্য সে বেগম সাহেবাকে দেখিতে পাইল না! তাহার অন্যায় অপরাধের জন্য তাঁহার নিকট ক্ষমা চাওয়া হইল না! এ-সব চিন্তা আসিয়া তাহার মনে প্রবল আত্মধিক্কারের সৃষ্টি করিল।

কিন্তু armistice যখন হইল, তখন তস্‌লীমের দেশে ফিরিবার ইচ্ছাই হইল না। এতদিন ইউরোপের রণক্ষেত্রে ঘুরিয়াছে শুধু; কিন্তু ইউরোপকে ত কিছুই জানা হইল না। এমন কি, নাম-করা সহরগুলিও ত দেখা হইল না। কাজেই তাহার ইচ্ছা হইল, ইউরোপে কিছুদিন বেড়ায়---ঘুরিয়া ফিরিয়া তারপর দেশে ফিরিবে।

ইউরোপ ভোগের রাজধানী। এতদিন কঠোর সৈনিক জীবনে থাকিয়া তস্‌লীম তাহা পুরোপুরি উপলব্ধি করিতে পারে নাই। এখন ইউরোপীয় সমাজ-জীবনে মিশিয়া দেখিল এখানে ভোগের উৎসব খুব

বেশী। পশ্চিমের ভিতরের জীবনের সঙ্গে মিশিবার তাহার খুব সুযোগ জুটিয়াছিল, কারণ তখন যুদ্ধ-ফেরৎ সৈনিকদের রাজ সম্মান, যেখানে সেখানে সাদর নিমন্ত্রণ, মেয়ে মহলে ত কথাই নাই।

চতুর্দিকে ভোগ-লালসার বহ্নিশিখা, তার মধ্যে দাঁড়াইয়া তাহারও ক্ষুধিত দেহমন যে মধ্যে মধ্যে চঞ্চল হইয়া উঠে নাই তাহা নহে; কিন্তু যখনই মনে পড়িয়াছে আর একটি প্রাণী সারাজীবন দেহ-মনে তাহারই জন্য রোজা রাখিয়াছে তখনই তাহার দেহ-মন শান্ত সমাহিত হইয়া পূজারীর মতো হইয়া উঠিয়াছে। তখনি চোখ ফিরাইয়া সে অন্যদিকে ছুট্ দিয়াছে।

ঘুরিতে ঘুরিতে শেষকালে তস্‌লীম ইতালীতে আসিয়া পৌঁছিল। ইতালীর মিউজিয়মে রাফেল হইতে আরম্ভ করিয়া ইতালীর অতীত ও বর্তমানের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীদের চিত্রকলা দেখিতে দেখিতে তাহার মনে আবার নূতন খেয়াল চাপিল।

মানুষের চিন্তা, অনুভূতি ও ভাবধারা প্রকাশের চিত্রশিল্প এমন উত্তম বাহন তাহা কি মানুষের ধর্ম ইসলাম হারাম করিতে পারে? মানুষের ভাবধারার ইতিহাসে মানব-চিত্তের জ্ঞানের অভিযানের এ অখণ্ড বিকাশ, ইহার চর্চা ইসলাম নিষেধ করিতে পারে, এই কথা সে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। তাহার যেন কেন মনে হইতেছিল, এ আমাদের ইসলামকে বুঝিবার ও বুঝাইবার ভুল। রাফেলের মেডোনা মাতৃচিত্রের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সে তন্ময় হইয়া গেল। বাস্তব মূর্তিতে মাতৃত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ দেখিয়া সে স্তম্ভিত হইল—যিনি মানুষকে তাহার একটি সর্বোত্তম অনুভূতির বাস্তব চিত্র আঁকিবার এমন ক্ষমতা দিয়াছেন তাঁহার উদ্দেশ্যে তাহার মাথা বার বার নুইয়া পড়িতেছিল।

এটা হারাম, ওটা না-জায়েজ, এই করিয়া বিশ্বের এ জ্ঞানের অভিযানে আধুনিক মুসলমান তাহার হক্ আদায় করিতেছে না, এই জন্য একদিন তাহাকে পস্তাইতে হইবে; এই ভাবিয়া তাহার দুঃখ ও আফ্‌সোস হইতেছিল। নানা ঝড় ঝঞ্ঝায় তাহার নিজের জীবন বিড়ম্বিত, তথাপি এদিক দিয়া কিছু করিতে পারে কি না ভাবিয়া সে একদিন ইতালীর এক বিখ্যাত চিত্রশিল্পীর শিষ্য হইয়া পড়িল।

নানা বই পড়িয়া, ছবি আঁকিয়া একা নিঃসঙ্গ জীবনে চিন্তা করিতে করিতে রওশনের মনে মানব-জীবন, মানুষের ভবিষ্যৎ, নর-নারীর সম্বন্ধ ইত্যাদি জটিল বিষয়ে এলোমেলো চিন্তা ঘুরপাক খাইতে লাগিল। অথচ এ-সব বিষয়ে আলোচনা করিবার লোক না থাকাতে সে ভয়ানক অসুবিধা ও নিরানন্দ বোধ করিতেছিল। যতক্ষণ তুলি লইয়া থাকে, বেশ; কিন্তু তুলি ছাড়িয়া উঠিলেই ইচ্ছা হয় এ-সব বিষয় লইয়া কাহারও সঙ্গে আলোচনা করে, তর্ক করে, সিদ্ধান্ত করে।

তস্‌লীমের কাছে সে এখন অসঙ্কোচে পত্র লেখে। তাহার কৌতূহল, চিন্তা, জিজ্ঞাসা ইত্যাদি অন্য কোন রকমে প্রকাশ না পাইয়া ধীরে ধীরে এ-সব চিঠির মধ্যে কিছু কিছু প্রকাশিত হইয়া পড়িতে লাগিল।

রওশনের চিঠি পড়িয়া পড়িয়া তস্‌লীমের মনেও সে-সব চিন্তা নানাভাবে উদয় হইতে লাগিল। রওশনের সঙ্গে তাহার বিবাহ হয় নাই বটে, কিন্তু সত্যই সে কি রওশনকে পায় নাই? তাহারা কোনদিন পরস্পর একটিবার চুম্বন বিনিময় করে নাই; রওশন বড় হইয়াছে অবধি কোনদিন তাহাকে স্পর্শ করে নাই সত্য; তথাপি সে কি তাহাকে পায় নাই বলিতে পারে? বিবাহ ত অনেকেই করিয়াছে, তাহারা কয়জন নিজেদের স্ত্রীকে এমনভাবে পাইয়াছে? সেই কৈশোরের ভালবাসার উন্মেষ হইতে আজ পর্যন্ত সে কি এক মুহূর্তের জন্যও রওশনকে ভুলিতে পারিয়াছে? এই না পাওয়ায় পাওয়ার উন্মুখ প্রতীক্ষা যে কত মধুর, কত আনন্দদায়ক, তাহা ত বলিয়া বুঝাইবার নয়।

কাজেই তস্‌লীমও খুব আগ্রহের সহিত পত্র-মারফৎ এ-সব বিষয়ের আলোচনায় লাগিয়া গেল। প্রতি সপ্তাহে পত্র দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইতে লাগিল। নূতন নূতন আলোচনা, জিজ্ঞাসা, সমাধান যেন আর শেষ হইতে চাহে না।

তস্‌লীম বাড়ী যাইবে না বলিয়াই ঠিক করিল, পাছে তাহার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়, না পাওয়ার উন্মুখ প্রতীক্ষার আনন্দ পাওয়ার অবসাদ-বিষাদে ভরিয়া ওঠে। বেগম সাহেবা নাই বটে, তথাপি কে জানে কোন্ শক্তি আবার তাহাদিগকে মিলনের পথে ঠেলিয়া দেয়!

সোমবার সকালে উঠিয়া তস্‌লীম সবেমাত্র চা খাইয়া সিগার ফুঁকিতেছে, এমন সময় পিওন টেবিলের উপর এক টেলিগ্রাম আনিয়া দিল।

আজ কয়েকদিন হয় তাহার মা মারা গিয়াছেন, তাহার পিতা আগামী মাসে হজ্বে যাইবেন, সে যেন শীঘ্র বাড়ী আসে—টেলিগ্রামের মর্ম এই।

কাজেই আর দেরী করা যায় না—তাহার ল্যাটা ত কিছুই নাই। কালই যাত্রা করা যাইবে ঠিক হইল।

সন্ধ্যার ডাকে আবার সে রওশনের এক চিঠি পাইল। মা'র মৃত্যু সংবাদে তাহার মন আজ মোটেই ভাল নয়—না হয় রওশনের চিঠি তাহাকে অসামান্য ক্ষিপ্র ও উদ্যমশীল করিয়া তুলিত; এতক্ষণ চিঠিখানি পাঁচ সাত বার পড়িয়া ফেলিত। তাহাদের চির রহস্যময় আলোচনার লোভও আজ তাহাকে বেশী উৎসাহিত করিতে পারিল না।

স্বইচ্ টিপিয়া দিয়া চিঠি খুলিয়া দেখিল প্রায় পৃষ্ঠা দশেক হইবে—সেই নরনারীর চির-রহস্যময় সম্বন্ধের আলোচনা। চিঠিখানি বার কয়েক পড়িল। রওশন শেষকালে নিজেদের জীবনের উদাহরণ দেখাইয়া লিখিয়াছে: 'আমরা কি পরস্পরকে কোনো বিবাহিত নরনারীর চেয়ে কম পেয়েছি? আমরা হয়ত বলতে পারি না, কিন্তু আমার কথা বল্‌তে পারি। আমার চেয়ে কোনো বিবাহিতা নারী তার স্বামীকে বেশী পেয়েছে এ আমি ধারণা করতে পারি না। এই রকম বলাতে হয়ত পাপ হচ্ছে; কিন্তু সত্যকে নিরুদ্ধ করার জন্য অন্তরে যে পীড়া তা এ পাপের শাস্তির চাইতেও কঠোর। এমন মুহূর্তের কথা বল্‌তে পারি না, যখন ভুল্‌তে পারি না, যখন ভুল্‌তে পেরেছি। এমন মুহূর্ত দিয়ে কোন্ স্ত্রী তার স্বামীকে পেয়েছে? অথচ পাওয়ার অবসাদের পীড়ায় তাদের স্বামী-স্ত্রীর জীবনে যে নিত্য কেলেঙ্কারী ঘটছে তা ত আমাদের জীবনে এক মুহূর্তের জন্যও ঘটেনি। আমাদের এ নিঃস্বার্থ ভালবাসা বড়, না তাদের ব্যবসায় বড়? ব্যবসায় নয় ত কি? একজন ভাত রাঁধবে, সন্তান ধারণ করবে, আর একজন খোরপোষ যোগাবে, কোনো দিকে একটু অন্যায় হলে নালিশ করে' যে যার হক্ আদায় করে' নেবে, এর চাইতে আর বড় ব্যবসা কি হতে পারে?' ইত্যাদি, ইত্যাদি।

পরদিন ষ্টিমারে উঠিবার আগে তস্‌লীম নিজ বাড়ী ও মিঞা বাড়ীতে টেলিগ্রাম করিয়া দিল: সে যাত্রা করিয়াছে, ৩রা আগষ্ট দেশে পৌঁছিবে।

পথে নানা চিন্তায় তাহার মন ওলট-পালট হইতে লাগিল। তাহার দুইটি মা ছিল, সে যাইয়া একটিকেও দেখিতে পাইবে না,---তাহার হৃদয় মোচড় দিয়া উঠিল। রওশন কেমন হইয়াছে, তাহার সঙ্গে দেখা হইবে নিশ্চয়ই, কেহ বিবাহের কথা উত্থাপন করিলে কি করা যাইবে। এ-সব হর্ষ-বিষাদের চিন্তার মধ্যে তাহার পথ ফুরাইয়া গেল।

৩রা আগষ্ট ষ্টিমার-ঘাটে নামিয়া দেখিল বড় একটা কেহ আসে নাই---কয়েকজন বাহিরের লোক আসিয়াছে যুদ্ধ-ফেরৎ বীরকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য। মিঞা বাড়ী হইতেও কেহ আসে নাই ; তাহারা সোপারকে দিয়া শুধু গাড়ীখানি পাঠাইয়া দিয়াছে। সোপারের কাছে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা শুনিল তাহাতে তাহার মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়িল। সে স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

একজন ছোক্‌রা 'আল্লাহো আক্‌বর' বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, সে ধ্বনি তস্‌লীমের অন্তরে গিয়া বিঁধিল, তাহার অন্তরের অন্তস্থল হইতেও যেন প্রতিধ্বনি জাগিল: 'হাঁ, তুমিই বড়।'

সে গাড়ীতে উঠিতেই জনৈক অভ্যর্থনাকারী বন্ধু তাহার গলায় একটি ফুলের মালা পরাইয়া দিয়া হাততালি দিয়া উঠিল। যাহারা উপস্থিত ছিল তাহারা সে সাথে যোগ দিয়া স্থানটিকে সরগরম করিয়া তুলিল।

এই বিসদৃশ কাণ্ড-কারখানায় তাহার মন বিষাক্ত হইয়া উঠিল ; অথচ কিছু বলিতেও সঙ্কোচ হইতেছিল। সে ধীরে ধীরে মালাটি গলা হইতে নামাইয়া রাখিয়া অধোবদনে বসিয়া পড়িল। সারা পথ সে একটি কথাও বলিতে পারিল না---সঙ্গে দুই একজন যাহারা গাড়ীতে উঠিয়াছিল তাহারা অবাক্ হইয়া গেল।

মিঞা-বাড়ীর দেউড়ীর সামনে গাড়ী থামিতেই দেখিল---পাড়ার লোকেরা খাটিয়ার জন্য বাঁশ গাছ কাটিতেছে। তস্‌লীমের মন ছ্যাঁৎ

করিয়া উঠিল। তাহাদের দা'র এক একটি কোপ যেন তাহার কলিজায় যাইয়া পড়িতেছিল। বিষাদক্লিষ্ট অন্তরে সে ভিতরে যাইয়া ঢুকিল—রওশনের ভাইরা তাহাকে দেখিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল। সেও আর অশ্রু রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না। যাহাকে জীবনের বহুবর্ণে দেখিবে ভাবিয়াছিল, আজ তাহাকে মরণের শ্বেতবর্ণে দেখিতে হইল।

গাড়ীর ভদ্রলোকেরা সন্ধ্যায় একটা মিটিং করিবে বলিয়া এত কষ্ট স্বীকার করিয়া এ পর্যন্ত আসিয়াছিল। কিন্তু এখানকার হালচাল দেখিয়া তাহারা ত একেবারে থ। জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা জানিল তাহাতে তাহাদের সব উৎসাহ কর্পূরের মতো উবিয়া গেল।---কাল রাত্রে এ-বাড়ীর একটি মেয়ে হার্ট ফেল করিয়া মারা গিয়াছে। অগত্যা তাহারা মুখ কালো করিয়া চলিয়া গেল।

রওশনকে কবর দিয়া আসিয়া সন্ধ্যায় তসলীম তাহার ঘরে যাইয়া বসিল। চতুর্দ্দিকের আলো বাতাসে সে যেন রওশনের ছোঁওয়া অনুভব করিতেছিল। টেবিল, চেয়ার, আলমারী, সব জিনিষেই যেন তাহার গন্ধ লাগিয়া আছে। তস্‌লীম তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়া তাহাই যেন তৃষিতের মতো পান করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পর রওশনের বড় ভাই আসিয়া বলিল: 'সে আজ কয় বৎসর ধরে শুধু ছবি এঁকেছে। ছবি এঁকেছে বটে কিন্তু কি ছবি এঁকেছে কা'কেও একদিনের জন্যও তা দেখায় নি। ঐ আলমারীটা খুলুন, আমি দেউড়ি থেকে আসছি।' ---এই বলিয়া চাবির গোছাটা তস্‌লীমের হাতে দিয়া সে চলিয়া গেল।

তস্‌লীম অতি কৌতূহলের সঙ্গে আলমারী খুলিল। তাহার প্রাণ দুরু দুরু করিতেছিল।....চোখ পড়িতেই সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। কত বিচিত্র ভাব ও বেদনার অভিব্যক্তি এই ছবিগুলি! কয়েকখানি তার নিজেরই প্রতিকৃতি, শিল্পীর বেদনা-সুন্দর তুলিকায় সে-সব কী অপরূপ হইয়াই না উঠিয়াছে! তার নিজের এই অভিনব ভাব-সুন্দর প্রতিকৃতিগুলি দেখিয়া তস্‌লীম অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিল।

এ ছবির প্রতি রেখায় রেখায় সে ত মিশিয়া আছে—তাহার দৃষ্টি, তাহার ছোঁওয়া, তাহার অনুভূতি, প্রেরণা সবই ত মূর্ত্তিমান ছবি।

তস্‌লীমের উদগ্র ইন্দ্রিয় তাহাই যেন বুভুক্ষুর ন্যায় গিলিতে লাগিল।

রাত্রে বিছানায় পড়িয়া তাহার ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কান্না আসিল। কেন এই কান্না, সে নিজেও ভাবিয়া অবাক্ হইয়া গেল। যাহাকে বাহিরে পাই নাই তাহাকে বাহিরে হারাইয়া এত ক্ষোভ কেন? যাহাকে মনের ভিতর পাইয়াছিলাম, সে ত আজও মনের ভিতর অম্লান ভাবেই আছে। তবে কি তাহার তিরোধানে তাহার স্থান শূন্য দেখিতেছি বলিয়া এ দুঃখ? না, তাহার জন্য উন্মুখ-প্রতীক্ষার অবসান হইল বলিয়াই মনের এ কান্না? মানব-মনের এ-অভিব্যক্তি সে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। তথাপি সে মনকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিল; না, মানুষের দেহ মাত্র নশ্বর, আত্মা অবিনশ্বর, অমর—তাহার এ জীবন শেষ নহে, আরও জীবন আছে; তাহার দেহ গিয়াছে, আমার ভালবাসা ত দেহাতীত ছিল; কাজেই কিসের দুঃখ? প্রতীক্ষা কর, জীবন হইতে জীবনান্তরে প্রতীক্ষা কর, খোঁজ—তোমার প্রতীক্ষার এ আনন্দাভিযান যেন কোথাও শেষ না হয়; শেষ হইলেই কিন্তু তোমার মরণ, তোমার প্রেমের সমাধি।

পরদিন বাড়ী পৌঁছিয়া দেখিল, তাহার পিতা তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। তিনি তাহাকে বিবাহ করিয়া সংসারী হইতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু সে সংসারী হইতে কিছুতেই রাজী হইল না—সেও তাঁহার সঙ্গে হজ্জে যাইবে।

কাজেই জায়গা-জমীন কিছু কিছু বিক্রয় করা হইল। তস্‌লীমের ইচ্ছা: ভগ্নিদের অংশ দিয়া আর সব বিক্রয় করিয়া ফেলা; কিন্তু দূরদর্শী পিতা মনে করিলেন; ঘুরিয়া ফিরিয়া যখন জীবনে অবসাদ আসিবে তখন হয়ত তস্‌লীম দেশে ফিরিয়া আসিতে পারে, তখন তাহার কী অবস্থা হইবে? —এই ভাবিয়া তিনি বাকী জায়গা-জমীনগুলি জামাইদের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া দিলেন।

মক্কা পবিত্র ভূমি। হজ্জ শেষে দলে দলে লোক ঘরমুখো ছুটিয়াছে। তস্‌লীম পিতার সঙ্গে কয়েকদিন থাকিয়া গেল।

তাহার ঘুম কি হয়? চোখ বন্ধ করিয়া ভাবে: মানুষের জীবন-মরণ, মানুষ মরিয়া কোথায় যায়!......

হঠাৎ চোখ খুলিতেই দেখিল---বাহিরে নিঃসীম জ্যোৎস্নার সমুদ্র। সে তাবুর বাহির হইয়া পড়িল ---মুক্ত আকাশ, মুক্ত প্রকৃতি, সে যেন আলোর সমুদ্রে ডুবিয়া আছে। সুদূর আকাশে নিঃসঙ্গ শশী গালভরিয়া হাসিতেছে, সে হাসির আলোকে সারা ভুবন ডুবিয়া গিয়াছে। তাহার মনে হইল: মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা নাকি পরমাত্মার সঙ্গে মিশিয়া যায়, পরমাত্মার ত কোনো নির্দ্দিষ্ট সিংহাসন নাই, সে ত এ-বিপুল সৃষ্টির মধ্যে মিশিয়া আছে,--তবে তাহার প্রিয়াও ত এ-আলোর সঙ্গে মিশিয়া আছে, সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে ছড়াইয়া আছে! তবে ত শুধু এ তীর্থ-ভূমি তা'র তীর্থস্থান নহে, সারা বিশ্বই যে তা'র তীর্থভূমি। অনন্ত সন্ধানী, অনন্ত পথের পথিক মানুষ, তাহা হইলে ত বাহির হইয়া পড়িতে হয়।

তারপর ধীরে ধীরে তস্‌লীম কা'বার দুয়ারে মাথা রাখিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল। কিসের এ কান্না?

তারপর সেই নিস্তব্ধ নিশীথে তাহার অন্তর মথিত করিয়া ধ্বনিত হইল: 'প্রভো! জন্মান্তর, পরলোক, মানুষের আরও জীবন আছে কি না জানি না। যদি থাকে, নব-জীবনে, জন্ম-জন্মান্তরে আমাকে পাওয়ার অবসাদ থেকে মুক্তি দিয়ো! না-পাওয়ার উন্মুখ প্রতীক্ষার ক্ষুধাই যেন আমার সহায় হয়।......আমীন! এয়া রব্বুল আলামীন!'

প্রাতে তস্‌লীম পিতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই তিনি বলিলেন: দেখ, আমি বলছি তুমি ঘুরে ফিরে দেশে চলে যাও, সংসারী হও। ভিটায় বাতি দেবার কেউ যে নেই! মধ্যে মধ্যে তোমার মা'র কবরটি জেয়ারৎ করিও এই আমার শেষ অনুরোধ। তিনি কাদিয়া ফেলিলেন: আমি ত বাকী হায়াৎটুকু এখানেই কাটাবো ব'লে নিয়ৎ ক'রে এসেছি, এই পুণ্য ভূমিতেই যেন আমার মৃত্যু হয়।

---না বাবা আমি এখন কিছুদিন দেশে দেশে ঘুরব। খোদার বান্দা হ'লাম সার, খোদার সৃষ্টিটাই ত কিছু দেখলাম না। সামান্য কতটুকু

দেখে আমরা পরিপূর্ণ স্রষ্টাকে ত উপলব্ধি করতে পারি না। তাঁর পরিপূর্ণ সৃষ্টিকে দেখবার ক্ষমতা আমাদের না থাকতে পারে, কিন্তু যতদূর ক্ষমতা আছে ততদূর দেখবার চেষ্টা থেকে বিরত হ'ব কেন? আমরা তাঁকে দেখি সীমাবদ্ধ দৃষ্টিতে, তাই আমাদের ভক্তিও সীমাবদ্ধ। বহুরূপে এবং সৃষ্টির বহু-ভঙ্গিমায় স্রষ্টার যে পরিচয় তাহাই ত পরিপূর্ণ পরিচয়, তা' হতে যে ভক্তির জন্ম তাহাই ত পরিপূর্ণ ভক্তি। তাই আমার মনে হয়, এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাই মানুষের অসীম তীর্থভূমি।

তাহার পিতা এ-সব কিছু বড় একটা বুঝিলেন না, তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। তস্‌লীম ইহা বুঝিয়া আবার বলিল: আজ দিকে দিকে পৃথিবীব্যাপী মানব সমাজে যে নবজীবনের সঞ্চার হয়েছে তার জন্য আমাদের হক্ ত অনাদায় রয়ে গেছে---অন্তত তা নিজের চোখে দেখে হলেও জীবনটা সার্থক করতে চাই। তারপর বেঁচে থাকলে হয়ত দেশে যাব।

পিতা-পুত্রের চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। উভয়ের গণ্ড বাহিয়া দরবিগলিত ধারে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল---ঊষর মরুভূমির বুকে!

বিদায়-বেলাকে যতই দীর্ঘ ও বিলম্বিত করিবে ততই পিতার কষ্ট। তস্‌লীম তাড়াতাড়ি পিতার পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইয়া বিশ্বের অনন্ত নিরুদ্দেশ পথে বাহির হইয়া পড়িল।

সাহসিকা

এক

জাফরকে এক কথায় 'নতুন-কিছু কর রে ভাই নতুন কিছু কর'-পন্থী ছেলে বলা যায়। নতুন কিছু করার যৌক্তিকতা সে সর্বান্তকরণে স্বীকার করে, কিন্তু যথাযোগ্য সাহায্য ও সহযোগিতার অভাবে এখনো কিছু-একটা স্থায়ী 'নতুন' করতে পারেনি ব'লে তার দুঃখ ও আফ্‌সোসের অন্ত নেই। সে মনে করে, সে অসামান্য সাহিত্য-প্রতিভার অধিকারী—কাজেই সাহিত্য-চর্চা না করা তার পক্ষে শোভা পায় না; এবং তার সাংসারিক অনুন্নতির অর্থাৎ আই-সি-এস্‌ ও আই-পি-এস-এ অকৃত-কার্য্যতার কারণও সে নির্বিবাদে সাহিত্যের ঘাড়ে আরোপ ক'রে সান্ত্বনা পায়। সাহিত্যে নতুনত্ব করার চেষ্টা সে করে দেখেছে; ফলে এটুকু সে বুঝতে পেরেছে, রবীন্দ্রনাথ যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন গতানুগতিক বাংলা সাহিত্যিকের দল রবির দিক থেকে অন্য কোনো দিকে চোখ ফিরিয়েও দেখবে না। কাজেই সাহিত্যের পথে নতুন-কিছু করার সঙ্কল্প আপাতত বাধ্য হয়েই তাকে রবি অস্ত যাওয়া পর্য্যন্ত মুলতুবী রাখতে হয়েছে। ঘরের দে'য়ালে এমিয়েলের এই চমৎকার বাক্যটী তার মটো হিসেবে সে বাঁধিয়ে রেখেছে:

"He who is silent is forgotten; he who does not advance, falls back; he who ceases to become greater, becomes smaller."

কাজেই তার চেষ্টা চুপ ক'রে না-থাকার, তার সাধনা আগে চলার, তার সঙ্কল্প বড় হওয়ার। সে জানে, এক লাফে কেউ গিরি লঙ্ঘন করতে পারে না—এক এক পা করেই উঠ্‌তে হয়। খ্যাতি ও বড়ত্বের গিরি-শৃঙ্গে সেও আরোহণ করবে এক এক ধাপ করেই। অত ব্যস্ত হলে চলবে কেন?

স্কুলে পড়বার সময় সে কিন্তু বডড লাজুক ছিল—এমন কি, আই, এ-তেও তাকে স্বল্পভাষীই বলা যেত। কিন্তু বি, এ-তে পা দিয়েই, কি করে কে জানে, সে হঠাৎ আবিষ্কার করে বস্‌লে—লজ্জা করলে খ্যাতিও তাকে লজ্জা করবে, পেছনে পড়ে থাক্‌লে চিরকাল সকলের পেছনেই

তাকে জীবন যাপন করতে হবে এবং বড় হওয়ার চেষ্টা না করলে যারা চেষ্টা করবে তাদের কাছে তাকে সব সময় ছোট হয়েই থাক্‌তে হবে—এবং নিজে চেষ্টা না করলে কেউ তার জন্য চেষ্টা করবে না, নিজে কথা না বল্লে কেউ তার পক্ষ হয়ে কথা বলবে না, নিজে অগ্রসর না হ'লে কেউ তাকে ঠেলে এগিয়ে দেবে না। এ-সংসারে কারও কাজ কেউ করে না, নিজের ঢাক নিজেকেই পিটাতে হয়, নিজের প্রশংসা নিজেকেই গেয়ে বেড়াতে হয়। সংসার সম্বন্ধে অন্তত এইটুকু অভিজ্ঞতা তার হয়েছে বলে এখন প্রায়ই এই নিয়ে সে গর্ব করে বেড়ায়।

এখন তার এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে, কথা থাক্ বা না থাক্, কথা না বলে থাকাই তার পক্ষে মুশ্‌কিল। এখন সে বাসায় থাক্‌লে বাইরে থেকে কেউ তার সন্ধানে এসে, জাফর বাসায় আছে কিনা এ প্রশ্ন আর করতে হয় না। এই তেতলা বাড়ীর তেতলারই একটি ঘরে সে থাকে, তবুও সে থাক্‌লে গেটের বাইরে থেকেই লোকে জান্‌তে পারে যে সে বাসায় আছে। কথা বলার সময় সে জোরে কথা বলে, পড়ার সময় জোরে পড়ে, লেখার সময় যা লেখে জোরে জোরে তা আবৃত্তি করে, খাওয়ার সময় সশব্দে খায়, শোন্‌বার সময় সশব্দে শোনে, ঘুমোবার সময় সে সশব্দে ঘুমোয়। তার ভয়, পাছে কেউ তার অস্তিত্ব ভুলে যায়। সভা হচ্ছে——বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে তার কোন জ্ঞানও নেই, তবু বক্তৃতা দেবার জন্যে সে দাঁড়াবেই; কিছু হউক বা না হউক, চেঁচিয়ে তার অস্তিত্ব সে প্রমাণ করবেই। যে-সব বড় বড় সভায় তার মত লোকের বক্তা হওয়ার সম্ভাবনা নেই, শুধু শ্রোতা হওয়ারই অধিকার, সে-সব সভায়ও শ্রোতার দলে বসে সে এমন জোরে গল্প করতে আর চেঁচাতে থাকে যে, সে যে উপস্থিত সে-বিষয়ে কারও কোনও সন্দেহই থাকতে পারে না। কতবার এ-রকম সভা থেকে তাকে বের করে দেওয়া হয়েছে; দিলে কি হবে, বরং বাসায় এসে সে সকলকে জিজ্ঞেস্ করেঃ তোরা যে সভায় গিয়েছিলি বল্‌ছিস্, তার প্রমাণ কি? আর আমি যে গিয়েছিলাম, সভাপতি থেকে দূরতম গ্যালারীর মেয়ে-শ্রোতা পর্যন্ত তার সাক্ষী।

লিখ্‌বার কিছু-একটা থাক্ বা না থাক্, যে-কোন বিষয়ে কিছু-একটা লিখে সে দৈনিকে, সাপ্তাহিকে, মাসিকে পাঠাবেই—কোনটা ছাপা হয়,

কোনটা হয় না। কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, এমন কি উপন্যাস পর্য্যন্ত তার হাত থেকে রেহাই পায় নি। যেগুলি ছাপা হয় না, সেগুলিকেও সে মনে করে অন্য পরিচিত লেখকদের যে-সব লেখা ছাপা হয় তার চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ। সম্পাদকদের গুণগ্রাহিতার অভাব দেখে সে এদেশের পত্রিকা সম্পাদনার ভবিষ্যৎ ভেবে মাঝে মাঝে খুবই হতাশ হয়ে পড়ে। তবু দমবার পাত্র সে নয়—চাকরীর সন্ধানে দিল্লী, সিমলা, বোম্বে, করাচী যাওয়ার বায়না করে মাঝে মাঝে বাপের কাছ থেকে যে-টাকা আনে তা দিয়ে সে তার লেখা পুস্তকাকারে ছাপিয়ে ফেলে এবং বেনামীতে নিজেই তার সমালোচনা অর্থাৎ নির্জলা প্রশংসানামা লিখে কাগজে কাগজে পাঠায়।

তার ধারণা, 'অগ্রসর'-ধাপেরও অনেকখানি তার আয়ত্ত হয়েছে। ক্লাসে সকলের আগের সীট ছাত্রীদের, লেডীজ সীটে বসা নিষেধ, কিন্তু লেডীজ সীটের নিকটতম সীট কেউ তো কোনদিন তার আগে দখল করতে পারেনি। ক্লাস থেকে বেরুতেও মেয়েদের পায়ের গোড়ায় গোড়ায় সে বের হয়। সভা-সমিতিতেও মেয়েদের রিজার্ভ সীটের পরই সর্বাগ্রে সে সীট নেয়। ট্রামে বাসে ঠেলাঠেলি করে হলেও প্রায়ই লেডীজ সীটের নিকটতম সীটে গিয়ে সে বসে—এমন কি, সাম্নের রিজার্ভ সীটে মেয়েরা না থাক্লে, সে-সীটেই বসে পড়তে দ্বিধা করে না। খাবার ব্যাপারেও সে কারো পশ্চাদ্পদ নয়, হোষ্টেলে মেসে খাবার বেল্ পড়ার আগেই সে ডাইনিং হলের দিকে হাঁটা আরম্ভ করে। আর ঘুমোবার বেলায় সে চিরকালই অগ্রসর। হোষ্টেলে মেসে কেন, বাড়ীতেও তার আগে কারও বিছানাপ্রাপ্তি ঘটে না। এ ব্যাপারে সে আজন্মই ফার্ষ্ট। কাজেই অগ্রসর যে সে খুব আশানুরূপ গতিতেই হচ্ছে, এই বিষয়ে তার মনে কোন সন্দেহই নেই।

সেদিন কি একটা পর্ব উপলক্ষে কলেজ ছুটি ছিল। জাফর বসে বসে ভাব্ছিল, (ভাবনাও তার সশব্দে হয় কি না)—বড়লোক হ'তে হ'লে অগ্রসর হ'তে হবে, অগ্রসর হ'তে হ'লে, আমরা যে অগ্রসর হচ্ছি এ-কথা পৃথিবীকে জানাতে হবে, নিজেকে প্রকাশ করতে হবে। ধরতে গেলে প্রকাশটাই তো আসল—এটাই ত সব কিছুর ভিত্তি-ভূমি। নতুবা আমি অগ্রসর হলেও কেউ তা জানতে পারবে না, আমি বড় হলে কেউ

তার খবরও পাবে না। তাতে কী লাভ? যদি নিজের কীর্তিকাহিনী দশজনে না জানল, দশজনে বলাবলি না কর্‌ল, কর্ণ থেকে কর্ণান্তরে না উঠল, সে-রকম অগ্রসর হয়ে কোন লাভ নেই, সে-রকম ঘর-কুণো বড়লোক হয়েও কোন সুখ নেই। কিন্তু নিজেকে প্রকাশ করতে হলে, দশজনকে নিজের সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল করাতে হলে, অন্যেরা যাতে আমাদের ভুলে যাবার সুযোগ না পায় তারি ব্যবস্থা করতে হ'লে—সঙ্ঘ চাই, সাপ্তাহিক মাসিক বার্ষিক সভা চাই, সভাপতি চাই, বক্তৃতা চাই, কাগজে কাগজে তার বিবরণী চাই, মুখপত্র চাই, আন্দোলন ও প্রোপাগাণ্ডা চাই। দেশের স্মৃতিশক্তির যে-রকম শোচনীয় দুরবস্থা, একদিন চুপ করলেই পরদিন সকলে বেমালুম ভুলে বস্‌বে। সঙ্ঘ করতে হলেই তো আর একা হয় না—সভ্য চাই।

ভাবনা কিছুক্ষণের জন্যে মুলতুবী রেখে, সে তাড়াতাড়ি 'অগ্রসর সঙ্ঘে'র জরুরী মিটিং ব'লে এক নোটিশ লিখে ফেল্লে এবং তার সইর নীচে "ফাউণ্ডার-প্রেসিডেণ্ড—'অগ্রসর-সঙ্ঘ'।" লিখে মেসের বয়কে ডেকে তক্ষুণি সকলকে তা দেখাতে বলে দিলে। সকলেই তো তাকে ভাল করেই চেনে, কাজেই বেশীর ভাগ সভ্যই পাগলের পাগলামী মনে করে স্ব স্ব কাজে মনঃসংযোগ করলে। কেউ কেউ মজা দেখ্‌বার লোভ সাম্‌লাতে না পেরে তার ঘরে এসে জুটল।

মনির ঢুক্‌তে ঢুক্‌তেই বল্লেঃ কি হে, অগ্রসর-সঙ্ঘ আবার কবে থেকে হল?

জাফর--আজকেই হবে, সেজন্যেই তো তোমাদের ডাকা হল।

মনির—রাম না হতেই রামায়ণ? কে তোমায় সভাপতি নির্বাচিত করেছে?

জাফর—নির্বাচন পরে হবে, এখন কাজ চালাবার, মিটিং ইত্যাদি ডাকবার লোক চাই তো?

ওয়াহেদ—তা' হলে বল তুমি নিজেই নিজকে নির্বাচন করে নিয়েছ।

মনির—তা' হলে শিগ্‌গির চায়ের অর্ডার দাও, না হয়—এক্ষুণি আমরা 'নো কন্‌ফিডেন্স' পাশ করব।

উপস্থিত সবাই চীৎকার করে উঠল : আলবৎ, আলবৎ! এক পেয়ালা চা' পর্য্যন্ত খরচ না করেই ফাউণ্ডার-প্রেসিডেণ্ট, তা আর হয় না।

জাফর—এখন ও-সব কথা থাক্ না বাপু! চা'র না হয় অর্ডার দিচ্ছি। ততক্ষণ না হয়, যে জন্যে ডেকেছি, তারি জবাব দাও।

মনির—বেশ, বল! কোন আপত্তি নেই।

জাফর—জিজ্ঞেস্ করি, তোমরা কি সব মড়ার মত চুপ করে থাক্‌বে?

জলিল—তোমার এক জনের শব্দেই মেসে তিষ্ঠান দায় হয়ে পড়েছে আর আমরা সবাই মিলে যদি চীৎকার করি, তা' হলে এটা যে পাগলা-গারদ হয়ে উঠ্‌বে!

জাফর—বিদেশে থেকে টাকা পয়সা খরচ করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এই যে কৃচ্ছ্র সাধনা, এ-সবের একমাত্র লক্ষ্য তো বড় হওয়া? সেই বড়-হওয়ার একমাত্র উপায়, একমাত্র 'সিসেম্-খোল্' ঐ—ব'লে অঙ্গুলির দ্বারা নির্দেশ করে সে তার মটোটাই দেখিয়ে দিলে।

মনির—ও তো আমরা বহুবার পড়েছি।

জাফর—শুধু পড়লে কি হবে, যদি সেই লেখানুযায়ী কাজ না কর। কাজ করলেই বড় হতে পারবে।

মনির—তা' হলে বল, কি করলে বড় হওয়া যায়; তা স্বচ্ছন্দে করতে রাজী আছি। ত ব ডার্বির টিকিট আর কিনব না, এবার শুদ্ধ পাঁচ বার....

জাফর--আরে ডার্বি টার্বি চুলোয় দাও। বৌবাজারের ক্রোড়পতি মাড়ওয়ারীকে কয়জনে চেনে, পান্নালাল আর ওয়াছেল মোল্লার পরিচয় স্রেফ বিজ্ঞাপন পড়ুয়াদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মনে রেখো, চুপ করে থাকার দিন গত হয়েছে। আজকের দুনিয়ায় যে যত জোরে চেঁচাতে পারবে, সেই তত বড় হতে পারবে।

মনির—তা' হলে চল আমরাও একসঙ্গে চেঁচাই--

বল্‌তে না বল্‌তেই জাফর ছাড়া ঘরের আর সবাই—এ, এ, এ, ও, ও, ও, আ, আ, আ, বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল।

জাফর—দূর পাগল সব। ও করে কি হয়—সঙঘবদ্ধভাবে চেঁচাতে হবে—।

মনির—তবে সবাই মিলে বল—থি চিয়ার্স্‌ ফর্‌ আছ হিপ্‌ হিপ্‌ হুররে....।

জাফর—তোমাদের us লোকে শুনবে ass —কাজেই তারা মনে করবে থি চিয়ার্স্‌ ফর্‌ গাধা। তার চেয়ে বল, থি চিয়ার্স্‌ ফর্‌ 'অগ্রসর সঙঘ'।

সকলে সমস্বরে তাই কতক্ষণ ধরে চেঁচিয়ে তবে থাম্‌লে।

ধপ্‌ করে জাফরের বিছানার উপর বসে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে মনির বল্লেঃ খুব যে চেঁচিয়েছি এখন তা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারবে না। এখন বল দেখি, কতটুকু বড়ই বা আমরা হ'লাম আর কতখানি অগ্রসরই বা হতে পারলাম?

জাফর—নিজের ঘরের কোণে বসে ষাঁড়ের মত চেঁচালে এক কানাকড়ি ফায়দাও হবে না। সব কিছু আইনানুগভাবে করতে হবে, সঙঘ করতে হবে, সভা ডাক্‌তে হবে, বক্তৃতা দিতে হবে। আর সে সব বক্তৃতা ও সভার বিবরণ কাগজে কাগজে ছাপাতে হবে। তারপর দেখবে, কেউ হয়ত, অল্‌-বেঙ্গল, আর কেউ হয়ত অল্‌-ইণ্ডিয়ায় পৌঁছে গেছি। বাইরে রিপোর্ট পাঠাবার ও ছাপাবার বন্দোবস্ত করতে পারলে চাইকি কন্টিনেণ্টেও নাম পড়ে যাবে।

আরও কিছুক্ষণ বাক্‌-বিতণ্ডার পর 'অগ্রসর-সঙঘ' করাই ঠিক হল। সর্বসম্মতিক্রমে জাফর ফাউণ্ডার-প্রেসিডেণ্ট, মনির সেক্রেটারী, ওয়াহেদ ভাইস-প্রেসিডেণ্ট, অর্থাৎ যারা সেখানে উপস্থিত ছিল, কেউ আর বাদ গেল না। কেউ জয়েণ্ট, কেউ এসিস্‌টেণ্ট, বাদবাকী সব কার্য্যসংসদের সদস্য নির্বাচিত হল।

শুধু সদস্যপদে হাকিম বোধহয় সন্তুষ্ট হতে পারল না। সে পেছন থেকে বলে উঠলঃ আচ্ছা, সংঘ-ফংঘ অত হাঙ্গাম করে কি লাভ? বড়

হওয়াই যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, আগে প্রমাণ কর, আমরা ছোট কিসে? বড়লোকের কোন্ লক্ষণ আমাদের ভিতরে নেই? বেলা আটটার আগে আমরা কেউ ঘুম থেকে উঠি? ডিস্‌পেপ্‌সিয়া আমাদের সকলেরই তো আছে, ব্লাডপ্রেসার তো এরি মধ্যে কারও কারও দেখা দিয়েছে, ভুড়িও....

তার বক্তব্য শেষ না হতেই জাফর বলে উঠল: আমরা শুধু বড় হতে চাই না, বিখ্যাত হতেও চাই।

হাকিম—তা হলে টাকা-দুই খরচ করে বড় বড় টাইপে "বিখ্যাত অগ্রসর জাফর এণ্ড কোং" ছাপিয়ে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় বিলি করলেই তো পার।

জাফর—শুধু তা দেখে লোকে বিশ্বাস করবে কেন? সেই সব করার আগে রীতিমত একটা সঙ্ঘ চাই, বক্তৃতা চাই, তার প্রোগ্রাম চাই, সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারার মত একটা আদর্শ চাই—।

হাকিম—তোমাদের এ সব সঙ্ঘ ফঙ্ঘে আমার কিছুমাত্র বিশ্বাস নেই, আমি তোমাদের সদস্যপদ ত্যাগ করলাম এবং প্রতিবাদ স্বরূপ আমি 'ওয়াক-আউট' করছি।

এই বলে সত্যসত্যই হাকিম বেরিয়ে গেল।

ওয়াহেদ রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ করে বলল: "বড় হওয়ার পথের দুঃখ এখন হতেই স্রুরু হল।"

জাফর—কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না। এই সামান্য আঘাতে দমলে চলবে কেন?

ওয়াহেদ—আচ্ছা, আদর্শটা কি হবে তা না হয় ঠিক করে ফেলা যাক্।

অজ্ঞাতে জাফরও মাথাটা একবার চুলকিয়ে নিল, তারপর ঢোক গিলে বল্লে: আমাদের আদর্শ হবে, এক কথায়—আগে চল্, আগে চল্।....

করিম—জাফর, ভুলে যাচ্ছ, পৃথিবীটা গোল। আগে চলার কোন মানেই হয় না। যে-দিকেই চলা আরম্ভ কর না কেন, শেষমেশ ঘুরে

ফিরে একই জায়গায় ফিরে আসতেই হবে। গোলাকার পৃথিবীর আগ্‌পিছ্‌ কিছু নেই।

জাফর—দেখ, তোমার মত স্থূলবুদ্ধি লোক নিয়ে অগ্রসর-আন্দোলন হয় না। আমরা অগ্রসর হতে চাচ্ছি—আইডিয়ায়, ভাবে, মতামতে—।

মনির—আইডিয়া ও মতামতে আমরা কার চেয়ে অনগ্রসর, জিজ্ঞাসা করি?

ওয়াহেদ—কোন সংস্কার আমাদের নেই, কারও মতামতের ধার আমরা ধারি না, খাদ্যাখাদ্য বিচার করি না,—তবু আমাদের অনগ্রসর বল্‌তে চাও?

জাফর—আমি বলতে চাই না, কিন্তু আমরা যে অগ্রসর এ-কথা পৃথিবীকে জানাতে হবে তো? আর জানাতে হলে একটা সঙঘ চাই সঙেঘর মুখপত্র চাই? আপাতত সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি না হলে অথবা কিছু মোটা চাঁদা পাওয়া না গেলে তো মুখপত্র হতে পারে না। কিন্তু সঙঘ হতে তো কোন আপত্তি নেই?

মনির—সঙঘ হলেই তার একটা উদ্দেশ্য চাই তো? উদ্দেশ্যটা একটু অভিনব ও নূতন হওয়া চাই, তা হলেই সহজে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে। মুশ্‌কিল এই যে, পৃথিবীতে এত সঙঘ, এত সভা-সমিতি ও প্রতিষ্ঠান হয়ে পড়েছে যে কোন নতুন উদ্দেশ্যই খুঁজে বের করা দুষ্কর।

ওয়াহেদ তার স্থূল দেহটার নীচে বালিশটা রেখে তার উপর ঠেস দিয়ে বল্লেঃ নতুন কোন উদ্দেশ্য যদি না পাওয়া যায়, ফরাসী বিপ্লবের সেই আদর্শটাই আমরা নিই না কেন? তা পুরানো হলেও তার প্রতি আমাদের যুবকদের মনে এখনো যথেষ্ট মোহ আছে। কাজেই ওতে আমাদের সঙেঘর সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধিরও একটা ভাল উপায় হবে।

জাফর—অগত্যা মন্দের ভাল হিসেবে তাই না হয় নেয়া যাক্।

মনির—কোন্‌টা? সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার কথাই বল্‌ছ তো?

ওয়াহেদ—হাঁ।

মনির—বেশ, কিন্তু জেলে যেতে কে কে রাজি আছ, আগে শুনি।

—কেন? চক্ষু ছানাবড়া করে জাফর জিজ্ঞেস করল।

মনির—কেন? সাম্য প্রচার করলে তুমি যে সাম্যবাদী, কর্তৃপক্ষের এই বিষয়ে কোন সন্দেহই থাক্‌বে না, ফলে জেলে না গেলেও চাক্‌রীর আশা ত্যাগ করতেই হবে। আর স্বাধীনতা লাভ করতে গেলে কালাপানি পার যে হতে হবে এ তো জানা কথাই। এই সবে যদি রাজী থাক বেশ, স্বচ্ছন্দে সাম্যও করতে পার, স্বাধীনতাও করতে পার, কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আগেই বলে রাখছি, আমার দ্বারা এ সব হবে-টবে না।

উপস্থিত সবাই মনিরকেই সমর্থন করলে। ফলে কেউই ঐ উদ্দেশ্য গ্রহণে সম্মত হল না।

জাফর—আচ্ছা, মৈত্রীতে তো কোন আপত্তি হ'তে পারে না।

মনির—না, উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে ঐটিই একমাত্র নিরীহ, নির্দ্দোষ ও নিরাপদ।

জাফর—তা হ'লে সাম্য ও স্বাধীনতাকে বাদ দিয়ে আমরা শুধু মৈত্রীকে আমাদের উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করি না কেন। পৃথিবীব্যাপী দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যে মারামারি ও ঝগড়া-কোন্দল চল্‌ছে তাতে এই উদ্দেশ্যটা হয়ত অনেকের মনঃপূত হবে।

এই আদর্শে কারুরই আপত্তি থাকার কথা নয়—কাজেই সর্বসম্মতিক্রমে এই আদর্শই গৃহীত হ'ল।

সন্ধ্যার মধ্যে জাফর সভার বিবরণ, কার্য্যনির্বাহক সংসদের তালিকা, উদ্দেশ্য ইত্যাদি লিখে কয়েকটি কাগজের আফিসে স্বয়ংই গিয়ে দিয়ে আস্‌লে।

দুই

পরের রবিবার, জাফর নিজের থেকে টাকা দিয়ে, একেবারে আলবার্ট হলেই, তার নিজের সভাপতিত্বে এক সাধারণ সভার বিজ্ঞাপন দিয়ে বস্‌লে। বিজ্ঞাপন অবশ্য ছাপা হ'ল সম্পাদক মনিরের নামেই। যথাসময়ে হ্যাট-কোট্‌ পরে' জাফর সবান্ধবে সভায় উপস্থিত হয়ে দেখে, তাদের মেসের দশ পনর জন আর বাইরের জন চার-পাঁচেক ছেলে-ছোক্‌রা ছাড়া আর কেউই আসে নি। এত কম শ্রোতার সামনে উৎসাহের উষ্ণ প্রেরণা আশা করা যায় না। কাজেই যে সব চরম কথা সে গরম করে বলবে বলে ভেবে এসেছিল তা শ্রোতার হাততালির অভাবে আর উত্তপ্তই হ'তে পারল না। তবুও পরদিন "জনাকীর্ণ আলবার্ট হলে তিলধারণের স্থান ছিল না" ইত্যাদি-পূর্ণ দীর্ঘ বিবরণ ও তার কথিত ও অকথিত "ওজস্বিনী" বক্তৃতা সভাপতির হাফটোন ছবিসহ কাগজে কাগজে প্রেরিত হ'ল। এতেও যেন জাফর তৃপ্ত হ'তে পারল না। পরদিন সন্ধ্যায় সে আবার কর্ম-সংসদের সভা ডেকে বল্লেঃ দেখ কাল থেকে কিন্তু আমাদের সংঘ সম্বন্ধে আমাকে এক নূতন ভাবনায় ধরেছে। ভেবে ভেবে কাল সভায় শ্রোতার অভাবের কারণও আমি আবিষ্কার কর্‌তে সক্ষম হয়েছি। আমার মনে হয়, শুধু সভ্যের দ্বারা কোন সংঘই কৃতকার্য্য হতে পারে না, দু'চারজন সভ্যাও চাই। যে সব বড় বড় প্রতিষ্ঠান আমরা দেখ্‌ছি, তা শুধু সভ্য-সংখ্যার দ্বারা গড়ে ওঠেনি--সভ্যাদের উপস্থিতিও তার মূলে চুম্বকের কাজ করেছে।

মনির---কথাটার পেছনে যুক্তিও আছে, ঐতিহাসিক সত্যও আছে স্বীকার করি, কিন্তু আমরা মেয়ে সভ্য কোথায় পাব? মুসলমান মেয়েরা ত প্রকাশ্যে আসবেই না, আর হিন্দু মেয়েরা মুসলমান পরিচালিত সংঘে যোগ দেবে কেন?

জাফর—মুসলমান মেয়ে দু'চারজন যা পাস্‌ টাস্‌ করে বেরিয়েছে তাদের একবার অনুরোধ করে দেখলে হয় না? না হয় বলব—আপনারা

সভায় রীতিমত না আসুন, অন্তত আপনাদের নামে আমরা যেন আমাদের সংঘের বিজ্ঞাপন দিতে পারি—এইটুকু সম্মতিও যদি তাঁরা দেন, আমাদের মনে হয়, অনেকটা কাজ হবে। আজ আমি কলেজ-কমন-রুম থেকে অনেকগুলো পুরোণো গেজেট নিয়ে এসেছি—তাতে গত ম্যাট্রিক, আই-এ ও বি-এ'র রেজাল্ট্ আছে। তা দেখে, তাদের পুরোণো স্কুল কলেজের ঠিকানায় চিঠি লিখে দেখি। দু'চারজনও কি রাজী হবে না?

সংঘের উন্নতির জন্য জাফরের এই উৎসাহ ও পরিশ্রম দেখে সকলেই বেশ খুশী হ'ল। অনেক রাত পর্য্যন্ত বসে বসে জাফর গেজেট কয়টি তন্ন তন্ন করে ঘাট্‌ল এবং অনেকগুলি মেয়ের নাম সংগ্রহ করে তাঁদের নামে চিঠির খসড়াও রাত্রেই করে ফেল্লে।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস নির্বিবাদে গত হয়ে গেল, কিন্তু কোথাও থেকে কোন সাড়াই পাওয়া গেল না। মেয়েরা চিরকাল ঘরকুণো, 'ব্যাক-ওয়ার্ড', হুতোম পেঁচার গুষ্ঠি ইত্যাদি বহু দুর্বাক্য প্রয়োগের পর, সে আবার প্রত্যেকের নামে একখানা করে 'রিমাইণ্ডার' পাঠালে। কিন্তু এবারও কোন সাড়া পাওয়া গেল না। জাফরের ধারণা, এ সব অভিভাবকদের কারসাজি ছাড়া আর কিছুই নয়—চিঠিগুলো নিশ্চয় মেয়েদের হাত পর্য্যন্ত পৌঁছতে পারেনি।

স্থূলবুদ্ধি ঘরকুণো অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে এক পসলা গালিবর্ষণ করে নিয়ে অগত্যা একদিন জাফর কর্ম-সংসদের সভা ডেকে সভ্যদের জানালে, মেয়েদের কোন বিষয়েই initiative নেই, সব কাজেই তাদের উপর জোর খাটাতে হয়। জোর করে লাগিয়ে দিতে পারলে যে কোন কাজে তারা লেগে যেতে পারে। তবে পরের বৌ-ঝিয়ের উপর জোর খাটাবার কোন অধিকার ত আমাদের নেই। তাই আমার অনুরোধ, যে-সব সভ্যের মনে এই সংঘকে সফল করে তুলবার আন্তরিক আগ্রহ আছে, তাঁরা যেন যথাসম্ভব শীঘ্র বিয়ে করে ফেলেন এবং স্ব স্ব স্ত্রীকে এই সংঘের সভ্যা-শ্রেণীভুক্ত করে দেন।

মনির—Example is better than precept. আশা করি, সভাপতি সাহেব স্বয়ং এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেখিয়ে আমাদের পথ প্রদর্শন করবেন।

সকলে---অবশ্য, অবশ্য, আলবৎ, আলবৎ।

জাফর---আপনাদের (inspired মুহূর্তে সে সবাইকে 'আপনি' বলে) অনুরোধ পালন করার যথাসাধ্য চেষ্টা আমি করব। তবে আপনারাও নিশ্চেষ্ট থাকবেন না।

সকলে সমস্বরে---আমরা নিশ্চয়ই আপনার পদাঙ্কানুসরণ করব।

জাফর---তবে এই বিষয়ে আমার আর একটী মাত্র অনুরোধঃ কন্যা পছন্দের ভার, আপনারা আশা করি, আপনাদের অভিভাবকদের উপর ছেড়ে দেবেন না, নিজের স্ত্রী নিজেই পছন্দ করে ঠিক করবেন---আর দেখবেন অগ্রসর-সংঘের সভ্যা হওয়ার যোগ্যতা যেন তাঁর থাকে।

এমন সর্বাঙ্গসুন্দর প্রস্তাবে রাজী না হওয়ার দুর্বুদ্ধি কারও নিকট থেকে আশা করা যায় না। কাজেই 'তথাস্তু' বলে সকলে সম্মতি জ্ঞাপন করে, স্ব স্ব সিটে ফিরে গিয়ে আইন ও বি-সি-এস-এর পড়ায় মনঃসংযোগ করলে।

জাফর কিন্তু অন্য কিছুতেই মনঃসংযোগ করতে পারলে না---অগ্রসর-সংঘের সভ্যা-সংগ্রহ তথা বিয়ে তাকে যে কোন প্রকারে করতেই হবে। এখন এই তার একমাত্র সঙ্কল্প হয়ে দাঁড়াল।

আজিকার ব্যস্ত পৃথিবীতে সপ্তাহের মধ্যে রবিবারটাকে মানব-মনের তীর্থদিবস বলা যেতে পারে। আফিসের দশটা-পাঁচটার কেরাণী থেকে কলেজের তরুণ-তরুণী পর্য্যন্ত, গ্র্যাণ্ড-হোটেলের ম্যানেজার থেকে বাসার রাঁধুনি ঝি পর্য্যন্ত এ-দিনটার দিকে সারা সপ্তাহ ধরে হা করে তাকিয়ে থাকে। এ-দিন মনের, হয়তো দেহেরও, অভিসারের দিন। এই দিনে গল্প লেখা যায়, গল্প বলা যায়, হয়তো গল্পের নায়ক নায়িকাও হওয়া যায়। চাকুরীজীবী আধুনিক কবির কবিতার জন্মও এই দিনে। প্রেমের মরুভূমি বাংলাদেশে হয়তো এই পুণ্য দিনেই সিনেমা-সিটে, বোটানিক্যাল গার্ডেনে, গড়ের মাঠে ও পার্কে পার্কে এক-আধটু প্রেমের ওয়েসিস্ রচিত হয়। হয়তো এই দিনটি কিউপিডেরও জন্ম-দিবস---অন্তত আধুনিক কিউপিডের জন্মোৎসব এই দিনেই হওয়া উচিত। কাজেই এই অবকাশের

দিনটিতেই যদি জাফরও তার ভাবনাকে মেয়েদের সন্ধানে ছুটায়, তা হলে তার বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না।

রবিবার থেকেই জাফরের ভাবনা শুরু হ'ল---কন্যা বাছাইর ভাবনা। এটা, ওটা, সেটা করে দেশের, বিদেশের, প্রতিবেশীর ও আত্মীয়ের কন্যা, নাম-জানা ও অজানা কত মেয়ের প্রতিই যে তার মন বল্গাহারা অশ্বের মত ধাবিত হ'ল তার আর ইয়ত্তা নেই। এমন কি, বাপের নাম শুনেও কোন কোন মেয়ের প্রতি সে রীতিমত আকৃষ্ট হয়ে পড়ল---শুধু মেয়ের আত্মীয়ের নাম শুনেও কোনো কোনো মেয়ের প্রতি সে প্রগাঢ় ভালবাসা অনুভব করতে লাগ্‌ল। গেজেট থেকে চিঠি লেখার জন্য যে-সব মেয়ের নাম খুঁজে বের করেছিল, ভেবে দেখ্‌লে, সে-সব মেয়ের প্রত্যেককেই সে ভালবাসে। মাঝে মাঝে যে-সব অজ্ঞাতনামা মেয়েদের নাম মাসিকের পাতায় দেখেছিল, এখন তার মনে হ'তে লাগল, সে সব মেয়ের প্রতিও তার ভালবাসা একেবারে অকৃত্রিম। কিন্তু অত ভালবাসা ও প্রেম দিয়ে বিয়ে হয় না---ভালবাস বা না বাস বিয়ের জন্যে একটি নির্দিষ্ট মেয়ে বেছে নিতে না পারলে বিয়ের পথে কিছুতেই অগ্রসর হওয়া চলবে না---এইটুকু অন্তত জাফর যেন এখন বুঝলে।

কাজেই ভাব্‌তে ভাব্‌তে এক শুভ মুহূর্তে জাফর আবিষ্কার করে বস্‌লে যে, তাহেরাকেই সে সব চেয়ে বেশী ভালবাসে---তাকে ছাড়া অন্যান্যদের সে যে ভালবাসে না তা নয়, তবে বিয়ের পরিমাণ ভালবাসা একমাত্র তাহেরাকেই সে বাসে। সেই থেকে প্রচুর অনিদ্রা ও অশান্তির মধ্যে জাফরের দিন আর রাত কাটতে লাগ্‌ল। সত্যিই তার কাছে এ এক অভূতপূর্ব বিস্ময় মনে হ'ল যে, তাহেরাকে যে সে এমন কায়মনোপ্রাণে ভালবাসে একথা এতদিন সে বিস্মৃত হয়েছিল কি করে? রাত্রে তন্দ্রার ঘোরেও সে ভাবে তাহেরা। তন্দ্রা ভাঙ্‌লেও তার চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠে তাহেরা। কবে, কোন্ বিস্মৃত দিবসে বালিকা তাহেরাকে সে দেখেছিল---কল্পনানেত্রে তাহেরার সেই বালিকা-মূর্তি দেখতে দেখ্‌তে সে এখন রীতিমত তন্ময় হয়ে যায়। সেই দিনের সেই বালিকাটি নিশ্চয়ই এতদিনে কৈশোরের সীমারেখা ছাড়িয়ে যৌবনে পা দিয়েছে---যৌবনের যাদুস্পর্শে তার দেহ-মন অপূর্ব রূপমাধুর্য্যে ভরে উঠেছে, দীর্ঘ কেশদাম

অধিকতর দীর্ঘ হয়েছে, হয়তো উজ্জ্বল চক্ষু-তারকা দু'টি অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে চিক্‌চিক্ কর্‌ছে। তাহেরার বর্ণ কালোই ছিল, তবুও জাফর কল্পনা-নেত্রে দেখ্‌তে পেল---সেই কালো বর্ণকে ফুঁড়ে মেঘাবৃত সূর্যকিরণের মতই যৌবন-রশ্মি দীপ্ত হয়ে উঠেছে।

এক কালে অনুন্নত ও অনগ্রসর বাংলার তরুণদের প্রথম প্রেমের প্রথম নজর পড়ত Cousin দের উপর। সুখের বিষয়, পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের তরুণদের মন অপেক্ষাকৃত প্রসারিত ও উদার হয়েছে—এখন তাদের শুভদৃষ্টি Cousin-দের সীমা-রেখা ছাড়িয়ে পিতৃবন্ধু-কন্যা ও স্ব-বন্ধু-ভগ্নীদের দিকে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। তাহেরার পিতা জাহেদুল ইস্‌লাম সাহেবও জাফরের পিতৃবন্ধু---কাজেই স্বীকার করতেই হবে, তাহেরাকে বিয়ে করতে চেয়ে জাফর আধুনিক তরুণদের মর্য্যাদা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন করেনি। বি-এ পড়বার সময় সে কিছুদিন জাহেদ সাহেবের বাসায় ছিল। তাহেরার বয়স তখন অল্প ছিল, কাজেই তাহেরার সঙ্গে দেখা-শোনায় তখন তার বিশেষ অসুবিধা ছিল না। জাহেদ সাহেব অন্যত্র বদলী হয়ে যাওয়ার পর তাঁদের সঙ্গে জাফরের সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ একরকম ছিন্ন হয়ে যায়। তবে মাঝে মাঝে চিঠি সে লিখত, এবং প্রথম প্রথম দু'এক ছুটীতে জাহেদ সাহেবের কর্মস্থানে বেড়াতেও সে গিয়েছিল। কিন্তু কালক্রমে আসা-যাওয়া ও চিঠিপত্র দুই তরফ থেকে কমতে কমেত এখন একেবারে শূন্যে এসে ঠেকেছে। কাজেই তাহেরার মনের ভাব জাফর কিছুই জানে না—বলতে গেলে, তাহেরার চেহারাও সে এখন ভাল করে মনে করতে পারে না। তবুও তাহেরার এক অস্পষ্ট ছায়া-মূর্তি তার মনের সাম্‌নে ভেসে উঠে—যা সে কিছুতেই ভুলতে পার্‌ছে না। পাঁচ বছর পরে, দুনিয়ায় এত মেয়ে থাকতে একমাত্র তাহেরার প্রতিই তার মনে এমন প্রবল আকর্ষণের সৃষ্টি কেন হ'ল, এ সে কিছুতেই বুঝতে পারে না। এমন অদম্য আকর্ষণ জীবনে সে কিছুর জন্যে কোনো দিন অনুভব করে নি। সে ভাবলে, হয়ত মানুষের জীবনে এম্‌নিই ঘটে। জীবনে কখন কি বন্যা এসে মানুষকে কোন্‌দিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তা হয়ত মানুষ পূর্বাহ্নে আন্দাজও করতে পারে না। তার দৃঢ় বিশ্বাস, তাহেরাই তার একমাত্র জীবন-সঙ্গিনী, তাকে বিয়ে করতে পারলেই সে জীবনে সুখী হতে পারবে। তার জীবনের

আশা-আকাংখা, কল্পনা ও স্বপ্ন-বিলাসকে একমাত্র তাহেরাই বুঝতে পারবে। কাজেই তার সঙ্কল্পিত বিয়ে যদি করতে হয়, তবে তাহেরাকেই সে করবে।

তিন

যে-কোনো কাজে অনাবশ্যক ইতস্তত করলেই সে কাজ ফস্‌কে যায়---এ জাফরের বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা। তাহেরা বাঙ্গালী ঘরের মেয়ে---বাঙ্গালী পিতামাতা ছেলেমেয়ের, বিশেষত মেয়ের বিয়েকে ফরজ কাজ ব'লেই মনে করেন। কাজেই সুযোগ পেলেই পাত্রাপাত্র বিচার না ক'রে, তাহেরার পিতামাতাও মেয়ের বিয়ে দিয়ে ফরজ পালনের পুণ্যসঞ্চয় করতে এতটুকু দেরী করবে না। অতএব যা-কিছু করার, যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সঙ্গেই তাকে করতে হবে। বিশেষত অগ্রসর-দলের নেতা সে, সে যদি সর্বব্যাপারে ফরওয়ার্ড না হয় তা'হলে তা যে দারুণ লজ্জার বিষয় হবে।

বিয়ে ব্যক্তিগত ব্যাপার। তার ধারণা, ছেলে মেয়ের বিয়েতে অভিভাবকদের হস্তক্ষেপ করা শুধু অন্যায় নয়, অনধিকারচর্চাও বটে। তাই সে মনে মনে স্থির করলে, যা থাকে কপালে, জাহেদ সাহেবের কাছে সে নিজেই চিঠি লিখে প্রস্তাব ক'রে বস্‌বে। তারপর, ঘরের দরজায় খিল্ দিয়ে, ঘণ্টা দুই ধরে বসে, চিঠি একটা লিখেও ফেল্লে। চিঠিখানা পড়ে তার নিজের এত ভাল লাগলো যে, কর্ম-সংসদের সভ্যদের না শুনিয়ে সেটা ডাকে দিতে তার প্রবৃত্তিই হ'ল না। কাজেই উপস্থিত যাদেরে মেসে পাওয়া গেল, সবাইকে সে ডেকে পাঠালে। তারা তার ঘরে ঢুকতেই সে বিনা ভূমিকায় ব'লে বস্‌লে: কেন ডেকেছি, বলতে পারিস্?

মনির উত্তর দিল: বোধ করি, চা খাওয়াবে ব'লেই ডেকেছ, কেমন---না?

জাফর---উঁহু, ঠিক হয়নি।

ওয়াহেদ---তবে ভীমনাগের সন্দেশ খাওয়াবে ব'লেই ডেকেছ! কেমন---ঠিক না?

জাফর---নেই হুয়া।---ব'লে সে ডানে বাঁয়ে ঘাড় দোলাতে লাগল।

মনির—আলবৎ হুয়া। এতদিন Thought-Reading চর্চা করলাম—ঠিক না হয়ে যায়?

জাফর—বিয়ে করব হে, বিয়ে করব—সব ঠিক।

ওয়াহেদ—তাহ'লে আমাদের Thought-Reading বেঠিক হ'ল কোথায়? বিয়ে মানেই ত খাওয়া,—সে তোমার চা-সন্দেশই হউক আর কোর্মা-পোলাওই হউক।

মনির—বাড়ীর চিঠি পেয়েছিস্ বুঝি?

জাফর যেন আকাশ থেকে পড়ল! বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠল: বাড়ীর চিঠি কেন? জানিস্ বাড়ীর চিঠি ভরসা ক'রে অগ্রসর-সংঘের সভাপতি বিয়ে করে না।

ওয়াহেদ—তা হলে তোমার যে বিয়ে, সেই কথা আজকে হঠাৎ কি ক'রে আবিষ্কার করলে?

জাফর—কেন? আমাদের গত সভায় কী ঠিক হয়েছিল তা এরি মধ্যে ভুলে গেলে! অগ্রসর-সংঘকে টিকিয়ে রাখতে হ'লে যে-কোন প্রকারে সভ্যা আমাদের সংগ্রহ করতেই হবে।

মনির—জীবনের এত বড় একটা সমস্যা, তুমি আজ এক মুহূর্তেই তা ঠিক ক'রে ফেল্লে? তোমাকে ত মহাপুরুষ, অর্থাৎ সোজা কথায় যাকে great man বলে, তাই আখ্যা দেওয়া যায়!

জাফর—জীবনের যত সব মহৎ কাজ,—যেমন ধর কবিতা লেখা, অনশন করা, সন্ন্যাসী হওয়া, Masterpiece স্থষ্টি করা, সবই মুহূর্তের inspirationএ-ই হয়ে থাকে। Inspired মুহূর্তে যাঁরা মহৎ কাজ করতে সক্ষম, তাঁদেরই ত বলা হয় মহাপুরুষ। আমিও আজ বিয়ের inspiration অনুভব কর্‌ছি।

ওয়াহেদ—তা হলে তোমারও মহাপুরুষ হতে আর বেশী বাকী নেই—না? আশা করি, এটাই তোমার জীবনের Master-piece হবে।

জাফর—সত্যিই, যে-pieceটি আন্‌তে সঙ্কল্প করেছি, সেটা স্রষ্টার মেয়ে-স্থষ্টির মধ্যে Master-pieceই বটে।

মনির---সেই Master-piece-টির নাম ও পরিচয় আমরা জানতে পারি কি?

জাফর---কেন পারবে না? তার নাম হচ্ছে তাহেরা---তাহেরা।

ওয়াহেদ---তাহেরা? ইতিপূর্বে ঐ নাম ত কোনো দিন শুনিনি।

জাফর---জাহেদুল ইস্‌লাম সাহেবের মেয়ে, যাঁর বাসায় থার্ড ইয়ারে মাস দুই আমি ছিলাম---মনে নেই?

মনির---ওঃ, সে মেয়ে ত কালো বলেছিলে যেন।

জাফর---এখনো কালোই বল্‌ছি।

ওয়াহেদ---শেষকালে একটি কালো মেয়েই Master-piece-এর সার্টিফিকেট পেয়ে গেল!

জাফর---মেয়ের গুণাগুণ ও যোগ্যতা বিচারের ভার আমার উপর, সে নিয়ে তোমাদের কিছুমাত্র মাথা ঘামাতে হবে না। মেয়েটিকে বিয়ে আমি করবই। অন্তত অগ্রসর-সংঘের মুখ চেয়ে' আমাকে করতে হবেই।

মমতাজ এতক্ষণ দৈনিক কাগজের উপর চোখ বুলাচ্ছিল, এবার কাগজ ছুড়ে ফেলে বল্লেঃ মেয়ের গুণাগুণ বিচার আলবৎ আমাদের করতেই হবে, তিনি তোমার শুধু বৌ-ই হ'বেন, আর আমাদের হবেন সভানেত্রী, কাজেই তোমার মতামতে চেয়ে তাঁর সম্বন্ধে আমাদের মতামতই বেশী গ্রাহ্য হওয়া উচিত। ব্যক্তির দাবীর চেয়ে সমষ্টির দাবী অনেক বড়।

মনির আর একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে বল্লেঃ পাত্রীপক্ষের সম্মতি পাওয়া গেছে ত?

জাফর---তাঁদের আমিও আমার সম্মতি এখনো জানাই নি।

ওয়াহেদ---তোমার অভিভাবকরা রাজী আছেন?

জাফর---তাঁদের রাজী-অরাজীতে আমার কি যায় আসে, শুনি?

মনির---কিছুই এসে যায় না। আশা করি, এ-মাসের মনিঅর্ডারটা গ্রহণ না ক'রে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছ?

ওয়াহেদ---যাকে বলে গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল! মনির, একটা মৌলবী সাহেব ডেকে নিয়ে আয়, জাফরের inspiration থাক্‌তে

থাক্‌তেই বিয়েটা হয়ে যাক্‌। জাফর, শিগ্‌গির টাকা বের কর্‌, হালিম গিয়ে সন্দেশ ইত্যাদি নিয়ে আসুক।

মমতাজ---মেয়ে না হ'লে বিয়ে কার সঙ্গে হবে হে?

মনির---এ রকম inspired হ'লে মেয়ে উপস্থিত না থাকলেও উপস্থিত আছে মনে করে বিয়ে সহজে ক'রে ফেলা যায়।

ওয়াহেদ---সত্যিই বেশ হবে! জাফর বিয়ের জন্যে যেরকম মরিয়া হয়ে উঠেছে, নিজেকে বর মনে করতে তার কিছুমাত্র বেগ পেতে হবে না। জাফর, স্যুটকেস থেকে আসকান পা'জামা বের ক'রে পরে বর সেজে বস দিকিন্‌। আর চোখ বন্ধ ক'রে মনে কর, তোমার সামনে কনে অর্থাৎ সেই Master Piece-টি বেশ সেজেগুজে বসে আছেন। বিয়েটা আরব্যোপন্যাসের বার্মেসাইড ভোজের মত হবে বটে, কিন্তু আমাদের ভোজটি বার্মেসাইড ধরনের হ'লে চল্‌বে না---সে আগেই ব'লে রাখলাম।

মনির---পরদিন এসোসিয়েটেড-প্রেসকে জানিয়ে দিতে হবে, অগ্রসর-দলের তরুণ নেতা শ্রীল শ্রীযুক্ত অমুকের সঙ্গে আধুনিকতম আধুনিকা শ্রীমতী অমুকার শুভ-পরিণয়ক্রিয়া বিনা খরচায়, বিনা শাড়ী ও বিনা গহনায় অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই দারুণ বেকার-সমস্যা ও দারুণতম অর্থনৈতিক দুর্দিনে ইহাই আধুনিকতম আদর্শ বিবাহ---ইত্যাদি ইত্যাদি।

জাফর---দেখ মনির, ফাজ্‌লামী রাখ্‌। ফাজ্‌লামী করার জন্যে আজ তোদের ডাকিনি। যদি কোন সুপরামর্শ দিতে পারিস তবে ভাল, নয় তো চলে যা---আমার বিয়ে আমি একাই করতে পারব।

ওয়াহেদ কপট গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে তর্জ্জন ক'রে উঠল: মনির তুই থাম্‌! বিয়ে ইত্যাদি Serious ব্যাপার তুই কি বুঝিস্‌ যে অনর্থক বক্‌বক্‌ করছিস্‌? তোর বড় ভাই এখনো বিয়ে করেনি আর তুই আসিস্‌ বিয়ে সম্বন্ধে পরামর্শ দিতে। আর আমি ছাত্রজীবন শেষ না হতেই এক বৌ সাবাড় ক'রে আর এক বৌ-এ পা দিয়েছি। বিয়ে সম্বন্ধে মতামত দিতে হয় আমিই দেব, কি বলিস্‌ জাফর?

জাফর বুক-পকেট থেকে একখানা চিঠি বের ক'রে বল্লেঃ ফাজ্‌লামী রেখে মনোযোগ দিয়ে শোন দেখি একবার চিঠিখানা কেমন হ'ল!

ওয়াহেদ---কা'কে লিখছ?

জাফর---ভাবী শ্বশুরকে। এই ব'লে সে পড়তে আরম্ভ করল।

সবিনয় নিবেদন,

কোনো প্রয়োজন ছিল না ব'লেই এতদিন আপনাকে চিঠি লিখিনি। আজ বিশেষ প্রয়োজনে পড়ে আপনাকে এই চিঠি লিখ্‌ছি। বোধ করি, আপনার অজানা নেই, আমি এবার এম, এ, আর ল' পড়ছি। আমাদের পারিবারিক অনেক বিষয় আপনি জানেন। যেগুলি জানেন না তাও যদি জানা দরকার মনে করেন, বাবাকে লিখলেই সহজে জানতে পারবেন। তবে এইটুকু আমি ব'লে দিতে পারি যে লেখাপড়ায় ও আধুনিকতায় আমরা আপনাদের পরিবারের চেয়ে অনগ্রসর নই। সম্প্রতি আমার ধারণা হয়েছে যে---বলা বাহুল্য, বিশেষ বিবেচনার পর আমি এই ধারণায় উপনীত হয়েছি---আপনার কন্যা তাহেরার সঙ্গে আমার বিয়ে হ'লে আমাদের উভয়ের জীবন বিশেষ সুখের হ'বে। এ বিষয়ে তাহেরার মতামত জেনে (অবশ্য তাহেরার মতামত আমি নিজে এখনো কিছুই জানি না, শুধু আমার দৃঢ় প্রতীতি যা তাই আপনাকে জানালাম) আপনি নিঃসন্দেহ হতে পারেন। বোধ করি, বিয়ে সম্বন্ধে মতামত দিতে পারার শিক্ষা এবং বয়স দুই-ই এখন তাহেরার হয়েছে, কাজেই তার মতামত নিতে হবে বই কি। তাহেরার জন্য বিত্তশালী বরের অভাব হবে না জানি, কিন্তু আপনি জানেন, বিত্তের কিছুটা অভাব আমার থাক্‌লেও চিত্তের অভাব আমার নেই। আর এ তো জানা কথা, দাম্পত্য সম্পর্ককে মধুর করতে বিত্তের চেয়ে চিত্তেরই বেশী প্রয়োজন। তাহেরার রূপ নেই, পিতা হলেও একথা আপনাকে স্বীকার করতেই হবে; কিন্তু পিতা হলেও একথা আপনাকে স্বীকার করতেই হবে যে সে বুদ্ধিমতী ও মধুর-স্বভাবা। আপনাকে কথা দিতে পারি, তার গুণের অমর্য্যাদা আমার কাছে কোনো দিন হবে না। তাকে আমি শুধু ভালবাসি না, তার বুদ্ধি ও স্বভাবকে আমি শ্রদ্ধাও করি। কাজেই ভ্রমর-ধর্মী বিত্তশালী স্বামীর চেয়ে আমার মত চিত্তধর্মী ও বুদ্ধিবাদী স্বামীই কি অধিকতর কাম্য নয়? দাম্পত্য জীবনের সুখ

ও সফলতা নির্ভর করে এমন যা দু'একটী ব্যক্তিগত বিষয় তাও আপনাকে লিখে জানাচ্ছি।

(ক) আধুনিক মানুষের আদর্শ নাকি সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা। এই আদর্শ আমিও গ্রহণ করেছি। স্বীকার করতেই হবে, তাহেরা ও আমি সমান ঘরের ছেলে-মেয়ে, জীবন-যাত্রার মান আমাদের সমানই। আর এ তো বুঝতেই পারছেন, তাহেরার প্রতি মিত্রভাব পোষণ করি ব'লেই মৈত্রীবন্ধনকে স্থায়ী করার উদ্দেশ্যেই আজ আপনাকে এই চিঠি লিখতে বসেছি। স্বাধীন এখনো হতে পারিনি সত্য, কিন্তু তার আর বেশী দেরীও নেই। বি-সি-এস দিচ্ছি, ডেপুটি না হই অন্তত সাব্‌ডেপুটি ত হতে পারবই। নতুবা হাতের পাঁচ ল' তো আছেই। আর তাহেরাকে যেমন এখনও আপনার অধীনে বাস করতে হচ্ছে, সে-রকম এখনো আমাকেও যা এক-আধটু অধীনতা স্বীকার করতে হয় সে তো আমার আইন-সঙ্গত অভিভাবকদের কাছেই।

(খ) বিয়ের সফলতার জন্যে স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক উপযোগিতা সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন। আমার দৈহিক উপযোগিতার প্রমাণ স্বরূপ, বি-সি-এস-এর জন্যে ডাক্তারের কাছ থেকে যে ফিট্ সার্টিফিকেট নিয়েছিলাম, এই সঙ্গে তার ট্রু কপি দিলাম।

(গ) উক্ত পরীক্ষার প্রয়োজনেই আমার ভূতপূর্ব প্রিন্সিপাল ও দু'জন গেজেটেড্ অফিসারের কাছ থেকে চরিত্র-সার্টিফিকেট নিয়েছিলাম। তারও কপি এই সঙ্গে পাঠানো গেল।

(ঘ) Public activity ও Organizing capacity-র প্রমাণ স্বরূপ বল্‌তে পারি, আমি নিখিল-ভারত অগ্রসর সংঘের স্থাপয়িতা ও সভাপতি, অল-বেঙ্গল ব্যয়হীন বিবাহ-সমিতির ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট। এ ছাড়া আরও কিছু যদি জান্‌তে চান লিখবেন---ফেরৎ ডাকেই লিখে পাঠাবো।

আপনি নিশ্চয়ই তাহেরার হিতাকাঙক্ষী। তাই আপনাকে আমার শেষ অনুরোধ, তাহেরার বিবাহিত জীবন সুখ-শান্তিময় হউক এ যদি আপনি কামনা করেন--পিতা হয়ে এ-কামনা যে কেন করবেন না তাও ত বুঝতে

পারছি না—তা হলে তাকে যে ভালবাসে তার হাতেই সমর্পণ ক'রে তাকে সুখী হওয়ার সুযোগ দিন। ইতি—

পুনশ্চঃ আশা করি, চিঠিখানি তাহেরাকে দেখাবেন। তার ব্যক্তিগত জীবনের যা কিছু জানাবার সে যেন আমাকে লিখে জানায়। তার স্বাস্থ্য ও চরিত্র-সার্টিফিকেট যদি সঙ্গে পাঠায়, আরও ভাল হয়।

পাঠ শেষ ক'রে, নিঃশ্বাস নিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলেঃ কেমন লাগল তোমাদের?

মনির অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠে বল্লেঃ নিখুঁত ও অনবদ্য! যে-কোনো প্রথম শ্রেণীর মাসিকে স্থান পাওয়ার যোগ্য।

মমতাজ—আধুনিক গল্পের আধুনিক নায়করাই একমাত্র এ-রকম চিঠি লিখ্‌তে পারে, আর কার সাধ্য এ রকম চিঠি লেখে!

ওয়াহেদ—চিঠিখানি কি মাসিকে পাঠাবে ব'লেই লিখেছ, না, সত্যি সত্যিই মেয়ের বাবাকে পাঠাবে বলে . . . .

জাফর—দেখ্‌, বিয়ে টিয়ে ইত্যাদি জটিল ব্যাপার নিয়ে কারও সঙ্গে ফাজ্‌লামী করবার প্রবৃত্তি আমার নেই—ঐ স্বভাবই আমার নয়। এই ব'লে সে উঠে স্যুটকেস থেকে খাম বের ক'রে তার উপর জাহেদুল ইসলাম সাহেবের নাম ঠিকানা লিখে চিঠিখানা পুরে খাম বন্ধ ক'রে ফেল্লে। এখন কারও মনে সন্দেহ রইল না যে এ-চিঠি পোষ্ট না ক'রে সে ছাড়বে না। কে জানে, হয়ত একটা কেলেঙ্কারীই হয়ে পড়বে।

এই দলে ওয়াহেদই যা একটু বয়স্ক। ব্যাপার বেগতিক দেখে সে ব'লে উঠলঃ বিয়ে করার যদি তোমার এতই সখ হয়ে থাকে, এ-রকম পাগলামী করার কি মানে হয়? তোমার মা-বাবাকে লিখলেই ত পার। মেয়ের বাবা ত শুনেছি, তোমার বাবার পরিচিত ও বন্ধু, তাঁকে বল্লে তিনি ত বেশ সহজে এর একটা মীমাংসা ক'রে দিতে পারেন।

জাফর এবার উত্তেজিত কণ্ঠে ব'লে উঠলঃ তোমরা একটা যা-ইচ্ছে তা, কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান যদি তোমাদের থাক্‌ত! এতদিন ধরে এত Forward movement করলাম, 'অগ্রসর' বলে, 'আধুনিক' বলে, 'মডার্ণ' বলে কত কীই না আমরা দাবী করে থাকি—আর বিয়ের ব্যাপারে

পুনর্মূষিকোভব। মামুলী ধরণে সেই পিতামাতার মুখের দিকে হা করে তাকিয়ে থাকবো, তৃতীয় পক্ষের মারফৎ তাঁদেরে আমার মৎলব জানাবো, পিতা শুনে হয়তো গোড়াতেই না করে দেবেন অথবা কন্যাপক্ষের দুয়ারে গিয়ে করযোড়ে দাঁড়াবেন, তাঁরা হয় ত হাজার তিনেক টাকার অলঙ্কার ও হাজার দশেক টাকার কাবিন চেয়ে বসবেন,—শুনে পিতা হয়ত ম্লানমুখে বাড়ী ফিরে আসবেন! নতুবা দীর্ঘকালব্যাপী দর-কষাকষি চল্‌তে থাকবে। শিকে ছিঁড়লে ছিঁড়তেও পারে, না ছিঁড়িলেও না ছিঁড়তে পারে। বাবাকে বল্লে এই ত হবে! চিরকাল ধরে এই ত হয়ে এসেছে। মেয়েকে যে আমি ভালবাসি, তাকে যে আমি বিয়ে করতে চাই, এ খবর হয় ত মেয়ের কান পর্য্যন্ত পৌঁছলই না—বাইর থেকেই পত্রপাঠ বিদায় হয়ে আসতে হ'ল। যারা Forward ও আধুনিক বলে দাবী করে, তারা অন্তত এ-রকম হৃদয়হীন ব্যাপার কিছুতেই সমর্থন করতে পারে না। যাকে বিয়ে করার সঙ্কল্প করেছি, তাকে পাবার শেষ চেষ্টা পর্য্যন্ত না দেখে আমি অন্তত ফিরব না—অতখানি Coward, অতখানি ভীরু আমি নই। এই ব'লে, আর কারুর কথায় কর্ণপাত না ক'রে সত্য সত্যই সে চিঠি পোষ্ট করতে বেরিয়ে গেল। উপস্থিত সবাই পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ী করতে লাগল। কেউ কেউ মনে মনে একটা মানহানির মোকদ্দমার প্রত্যাশা ক'রে কিছুটা পুলকিত হয়েও উঠল।

চার

চিঠির উত্তর আশা অবধারিত এবং কি উত্তর আস্তে পারে তাও প্রত্যাশিত। ঐ রকম চিঠি পেয়ে কোন মেয়ের বাপের পক্ষেই চুপ করে থাকা সম্ভব নয়। ঐ চিঠি দ্বাদশ অচলা কন্যা-বেষ্টিত পিতার মাথায়ও আগুন ধরিয়ে দিতে পারে। ভাগ্যে জাহেদ সাহেব শরীফ---অভিজাত, তাই রক্ষে; না হয় তাঁর সমস্ত উত্তেজনা ও ক্রোধাগ্নি তিনি শুধু একখণ্ড সংক্ষিপ্ত পত্রাংশে নিঃশেষ করতেন না। মেয়েদের, বিশেষত বিবাহযোগ্যা অবিবাহিতা মেয়েদের ভাল-মন্দ কোনো বিষয়েই উচচবাচ্য করা আভি-জাত্যের খেলাপ। এমন কি, ঐ বয়সের মেয়ে সম্বন্ধে প্রকাশ্যে সাধারণ আলাপ করতেও মেয়েদের অভিভাবকরা সঙ্কোচানুভব করেন। তাই মেয়েদের উপর কেউ কোন অন্যায় করলেও তা চেপে যেতে হয়,---নীরবে মেয়েকে ও মেয়ের পিতামাতাকেও কিল খেয়ে কিল হজম করতে হয়। জাফরের চিঠি পেয়ে আধুনিক জাহেদ সাহেব যতই অপমানিত মনে করুন না কেন, মজা এই যে, কিছুমাত্র প্রতিকার করার শক্তি তাঁর নেই। যদিও তাঁর মাথার কেশাগ্রভাগ থেকে পায়ের নখ-কণা পর্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, অদৃষ্টের পরিহাসই বলতে হবে, তবুও সেই উত্তপ্ত দেহ ও মন নিয়েই তাঁকে লিখ্‌তে হ'ল জীবনের সবচেয়ে মোলায়েম চিঠি। যাকে পারলে চাবুক মারা উচিৎ ব'লে তিনি মনে করেন, বিধাতার পরিহাস, তার উপর তাঁকে করতে হচ্ছে পুষ্পবৃষ্টি! সত্যই জাফরের চিঠির চেয়েও এই দুঃখই তাঁর সব চেয়ে বেশী অসহ্য হয়ে উঠল। উপায় নেই, সে যে রকম মরিয়া হয়ে চিঠি লিখেছে, কখন কি করে বসে তার ঠিক নেই, তখন হয়ত তাঁর মেয়েকে নিয়ে পরিচিত মহলে কত কানাকানিই না সৃষ্টি হবে! মান ইজ্জৎ! যে কোনো প্রকারেই হউক মান ইজ্জৎ রাখতেই হবে।

এ দেশে কন্যার পিতা বিধাতার অভিশপ্ত জীব, তাই আজ জাফরের মতো লোককেও বার কয়েক বাবা সম্বোধন ক'রে, দোওয়া জানিয়ে, তার মা-বাপকে সালাম, ছোট ভাই বোন্‌কে আশীর্বাদ করে, পড়াশোনার

জন্যে উপদেশ দিয়ে, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করে, ভবিষ্যতের উচচাশার সফলতা কামনা করে, তাঁর মেয়ে যে তার যোগ্য নয় জানিয়ে, মেয়ে যে তাকে বড় ভাইয়ের মত ভক্তি করে ইত্যাদি বহু বিনয়-বাক্য দিয়ে জাহেদ সাহেবকে জাফরের চিঠির উত্তর দিতে হল!

চিঠি লিখেই তিনি নিশ্চিন্ত হলেন না। সহসা যাতে মেয়েকে পাত্রস্থ করতে পারেন তার জন্যও উঠে পড়ে লাগলেন। আগে সঙ্কল্প ছিল,---তাহেরা এবার আই.এ. দেবে, আর দু'বছরের জন্যে তার বি.এ-টা তিনি নষ্ট করবেন না। একেবারে বি.এ'র পরই তার বিয়ে দেবেন। জাফরের চিঠি কিন্তু সব ওলটপালট করে দিলে। তিনি ভাবলেন এ সব মাসিকী-পড়া আর মাসিকে-লেখা ছেলে, কখন কি কাণ্ড করে বসে ঠিক নেই, হয়ত হা-হুতাশ করে কবিতাই লিখে বসবে, হয়ত মেয়েকে নিয়ে গল্প লিখে মাসিকে ছাপাবে, হয়ত মেয়েকেই চিঠি লিখে ফেল্‌বে। হয়ত বা লোকের কাছে গল্প করে বেড়াবে, তখন হয়ত মুখে মুখে কত বিশ্রী আলাপই চল্‌তে থাক্‌বে, খামাখা ইজ্জতের হানি, বি.এ. যদি মেয়ের কপালে থাকে বিয়ের পরও সে তা পাশ করতে পারবে। তাই তিনি মেয়ের বিয়ের আর দেরী করা সঙ্গত মনে করলেন না।

জাফর জাহেদ সাহেবের অপ্রত্যাশিত মোলায়েম চিঠি পেয়ে কিন্তু কিছু মাত্র মোলায়েম হ'ল না। নিরুদ্ধ জলস্রোতের মতো তাহেরার প্রতি তার আকর্ষণ যেন আরও অদম্য হয়ে উঠল।

পাশের রুম থেকে মনিরকে সে ডাক দিলে। মনির এক গালে সাবান আর এক গালে অর্দ্ধসেভ্‌-করা অবস্থায় ক্ষুর হাতে আবির্ভূত হ'তেই জাফর ব'লে উঠল : দেখ, তোরা জানিস রাজনীতি থেকে গার্হস্থ্য নীতি পর্য্যন্ত কোথাও আমি 'আবেদন আর নিবেদনের থালায়' বিশ্বাস করি না।

মনির---আবার কোথায় আবেদন পাঠালে?

জাফর---সেই যে সেদিন আমার ভাবী শ্বশুর সাহেবের কাছে পাঠিয়েছিলাম।

মনির---দু'খানা ছেঁড়া জুতো খামে ভরে পাঠিয়ে দেয় নি ত?

জাফর---তিনি মনে করেছেন আমি নাবালক খোকা, পিঠে হাত বুলিয়েই তিনি আমাকে বিদায় করতে চান।

মনির---অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দাও যে তিনি তোমার নামে মানহানির মোকর্দ্দমা করেননি।

জাফর---দেখ্, আমি চিরদিন সব ব্যাপারে বামপন্থী, leftwinger।

মনির---বামপন্থী তুমি নও, বামাপন্থী বল্লেই ঠিক বলা হয়।

জাফর---শুধু ভদ্রলোকের তথাকথিত ইজ্জতের খাতিরেই আমি তাহেরাকে চিঠি না লিখে তাঁকে লিখেছিলাম। না হয় আমার বিয়েতে যেমন আমার পিতামাতার মতামতের কোনো মূল্য নেই, তেমনি আমি জানি তাহেরার বিয়েতেও তার মাতাপিতার মতামতের এক কানাকড়ি মূল্যও নেই।

মনির---ভদ্র মহিলার সম্মতির বয়েস হয়েছে ত? না হয় বিপদে পড়বে।

জাফর-- তা ঠিক আছে, অত কাঁচা ছেলে পেয়েছ আমাকে? ঐত আমার একমাত্র অস্ত্র। আজই তাহেরাকে চিঠি লিখব, সে রাজী থাকে ত' স্বয়ং আজরাইলেরও সাধ্য নেই আমাকে রুখে রাখে, সে রাজী না থাকে, ব্যস্ এখানেই শেষ।

সারাদিন ধরে জাফর তাহেরাকে উদ্দেশ ক'রে যে দীর্ঘ চিঠিখানি লিখ্‌লে তার সবটা উদ্ধৃত করার স্থানাভাব। তবে তার মনোজগতের পরিচয় লাভের জন্য তার চিঠিখানির কিছু কিছু অসংলগ্ন অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে।---

রাণী!

সেই মামুলী রাণী ব'লেই তোমাকে সম্বোধন করা যাক্। রাণী তুমি নও, দূরতম ভবিষ্যতেও তোমার রাণী হওয়ার সম্ভাবনা নেই; তবুও এদেশের মা'র আর প্রেমিকের প্রিয়তম শব্দ এইটি, উপরন্তু এই শব্দে তোমাকে সম্বোধন করাতে তোমারও সুবিধা অনেক---তোমাকে আমি ভালবাসি, এই কথা যাদের কাছে প্রকাশ পেলে তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত

অর্থাৎ যে সব সমাজহিতৈষী ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা কোনো কুমারী মেয়ে ভালবাসায় পড়েছে শুন্‌লে লজ্জায় লাল হয়ে উঠেন, তাঁরা মোটেও টের পাবেন না। এই নাম যে-কোনো মেয়ের কপালে টাঙিয়ে দেওয়া যায়।

রাণী, ভালবাসা এমনি জিনিষ, ভালবাসি ভালবাসি ব'লে ত ফর্‌ ফর্‌ করে ফিরতে হয় না। মিথ্যাকে প্রচার করতে বিজ্ঞাপনের ভেরীতুরী বাজাতে হয়, ভেরীতুরীর আওয়াজে সত্যের মুখের জ্যোতি ম্লান হয়ে যায়। তোমাকে আমি ভালবাসি এ কথা এতদিন প্রকাশ করা দূরে থাক, কোনো দিন মনের ভিতরও উচচারণ করেছি বলে ত মনে পড়ে না; অথচ আমার শিরা-উপশিরা থেকে আমার বিছানার বালিশগুলি পর্য্যন্ত জানে যে আমি তোমাকে ভালবাসি। . . .

*

. . .মানুষের জীবনে দৈবের প্রভাব আছে কিনা জানি না। কিন্তু তোমার সম্বন্ধে আমার মনোভাব মনে হচ্ছে যেন দৈবের চেয়েও দৈব; কয়দিনই বা তোমার সঙ্গে দেখা, কিই বা আলাপ, আজ স্মরণ করতে বসে বিশেষ কিছুই ত স্মরণ করতে পারছি না। সমস্ত বিস্মৃতির মাঝে একটু গ্রীবাভঙ্গি, একটু চাহনি, এক আধখানা মাত্র কথা আমার জীবনের মানসলোকে অক্ষয় স্বর্গের মত বিচরণ করে ফিরছে। তোমার কিশোরী জীবনের সেই চাহনি, সেই অপরূপ গ্রীবাভঙ্গি আমার নিভৃত অন্তরের নীরবতার মাঝে এখনো অমৃত প্রস্রবণধারার মত সঞ্চরণ করে ফিরছে।

*

. . .জীবনের দুর্লভ সম্পদ এই প্রেমকে অবহেলা করো না, লক্ষ্মীটি। এই প্রেমের ফলেই হয়ত একদিন তোমার জীবনে সোনা ফল্‌তে পারে। যে ফুল কোনো নারীর জীবনে ফোটেনি, এই প্রেমের স্পর্শে তোমার জীবনে হয়ত সেই ফুল ফুটে উঠ্‌বে। এমন দুর্লভ সৌভাগ্য এদেশের কয়জন নারীর ভাগ্যে জোটে? তোমাদের আত্মীয় ও জানাশোনা পরিবারে এমন কয়জন নারীকে জান যারা ভালবেসে বিয়ে করতে পেরেছেন এবং প্রতিদানে এমন দুর্লভ ভালবাসা পেয়েছেন? কলেজে তোমার প্রত্যেক সঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করে দেখো, কেহ কি স্বপ্নেও এমন দুর্লভ ভালবাসা

আশা করতে পেরেছে? এ দেশে নারীর জীবনে ভালবেসে ভালবাসা পাওয়ার ক্ষেত্রে তুমিই হবে Pioneer রেকর্ড-প্রতিষ্ঠাত্রী, কাজেই এই গৌরব থেকে তোমার নিজেকে ও তোমার দেশকে বঞ্চিত করো না।

*

...তোমার সঙ্গিনীদের প্রশ্নের উত্তরে তোমার একটুও লজ্জিত হতে হবে না, এমন কি এমন একটি বিখ্যাত নাম (অগ্রসর-সংঘের এবং তার সভাপতির নাম কে শোনে নি বল?) তুমি শুনিয়ে দিতে পারবে, যে নাম তারাও হয়ত ধ্যান করেছে, যে নামকে নিয়ে তারাও হয়ত বহু স্বপ্ন রচনা করেছে।

*

...তোমার বাবা লিখেছেন তুমি নাকি আজকাল আমাকে বড় ভায়ের মতো ভক্তি কর। শুনে প্রাণ খুলে এক চোট আগে হেসে নিলাম। এই তৃতীয় শ্রেণীর ভাবালুতা তোমাকেও পেয়ে বসেছে? অতি সাধারণ দুর্বল চিত্ত মেয়েরা কোনো পুরুষের সংস্পর্শে আসলেই অমনি ভাই-ভগ্নি সম্বন্ধ পাতিয়ে গদগদ হয়ে উঠে। বিবাহযোগ্যা মেয়েরাও এমন কি বর হওয়ার যোগ্যতম পাত্রকে পর্য্যন্ত লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে হয়ত কাকা মেসো সম্বোধন করে বস্‌লে। কারো সঙ্গে সম্বন্ধ যদি নেহাৎ পাতাতে হয় তবে এমন সম্বন্ধ পাতাবে যাতে পূর্ব সম্বন্ধ ভবিষ্যতের কোনো মধুরতর সম্বন্ধের বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। আশা করি, এই বোকামী তুমি অন্তত করবে না।

*

...তোমাদের বাড়ীতে বসে আমার বিয়ে সম্বন্ধে কতদিনই ত আলোচনা হয়েছে, তোমার বিয়ের কথাও যে ওঠেনি তা নয়। কিন্তু কোনো দিন এই দুটি নাম জোড়া লাগ্‌তে পারে কিনা এমন প্রশ্ন সেদিন কেউ উত্থাপন করেন নি সকলের এই এড়িয়ে চলা দেখে আমার মনে মনে এই দুরাশার সঞ্চারও কম হয় নি যে, হয়ত সকলের আশা আছে বলেই সকলেই সেই প্রশ্নটিকে আপাতত এড়িয়ে চলেছেন।

সময়ে সকলেই সায় দিয়ে বস্‌বেন। সেই দুরাশার স্বপ্ন সেইদিন থেকেই আমার মনেও বাসা বেঁধেছে।

*

...এই মর-জীবনে মানুষকে অমরতা প্রাপ্তির সাধনা করতে হয়। সত্যিই তোমার মনে কি মৃত্যুকে জয় ক'রে অমরতা প্রাপ্তির লোভ একটুও জাগে না? তুমিও কি সাধারণের মতো তোমার দেহের সাথে সাথেই মরে যেতে চাও? নিরানব্বই জন দেহ-প্রাণে মরে, চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়—তুমিও কি সেই নিরানব্বই জনের মধ্যে মিশে যাবে? তাই যদি হয় তা হ'লে পৃথিবীতে এর চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি আর কি হতে পারে? দোহাই, এত সাধারণের মতো মরে ভূত হয়ে যেয়োনা,—আমি জানি তুমি অসাধারণ, প্রভূত শক্তি তোমার মধ্যে ঘুমিয়ে আছে, আমাদের অগ্রসর-সংঘের প্রেরণায় সেই সুপ্ত শক্তি হয়ত পুষ্পের মতো বিকশিত হয়ে উঠ্‌বে, বীণার মতো বেজে উঠ্‌বে। অগ্রসর-সংঘের সভানেত্রীর আসন তোমার অপেক্ষায় শূণ্য পড়ে আছে। এনি বেশান্ত, সরোজিনী নাইডু, খালেদা খানম ইত্যাদির নাম কি শোননি? তাঁদের তালিকায় তোমারও নাম স্থান পাবে। সত্যিই তুমি যদি আমার পাশে এসে দাঁড়াও আমি পৃথিবীতে অঘটন ঘটাতে পারি। যে-স্বপ্ন, যে-আদর্শ আমার কল্পলোকে বিচরণ করে ফিরছে, তোমার চোখের জ্যোতিতে, ঠোঁটের হাসিতে তা'রা হয়ত নেমে আস্‌বে এই মর্তভূমিতে—ধরা দেবে আমার দুই করপুটে—এই মৃত্যুজয়ের সাধনায় আমরা হয়ত জয়ী হ'ব। পৃথিবীর আর কিছুর লোভে না হউক অন্তত এই লোভটুকু কী উপেক্ষনীয়, হে প্রিয়ে?"

পাঁচ

জাহেদ সাহেব কয়েকদিনের জন্য সরকারী কার্য্যোপলক্ষে মফঃস্বলে গিয়েছেন। ফিরতে হয়ত তাঁর দিন কয়েক দেরী হবে। যাবার দিন তিনি তাহেরার গৃহশিক্ষককে সেই কয়দিনের ছুটী দিয়ে বলেছেন,—অনেক দিন ত বাড়ী যান্ না, বাড়ী থেকে ঘুরে আসুন, এই ত মাত্র বছরের প্রথম, এ'তে ওর বিশেষ কোনো ক্ষতি হবে না।

জাহেদ সাহেবের অফিস-ঘরের সঙ্গে লাগানো ছোট্ট রুমটীই তাহেরার পড়ার ঘর। মাষ্টার যতক্ষণ তাহেরাকে পড়ান, জাহেদ সাহেবও ততক্ষণ তাঁর অফিস-ঘরেই থাকেন। কাজ না থাকলেও তাহেরার পড়ার সময়টুকুতে তিনি কোথাও যান্ না, বেরুন্ না।

তাহেরার মা জোহ্‌রা, প্রায় পঁচিশ বছর পূর্বে এক নৈরাশ্য নিয়েই দাম্পত্য জীবনে পদক্ষেপ করেছিলেন। জাফরের পিতা মোরশেদ সাহেবের সঙ্গে তাঁর বিয়ের আলাপ চল্‌ছিল। কিন্তু চাক্‌রীর ঘৃতসিক্ত পিচ্ছিল বর্ত্মে মোরশেদ পিছিয়ে পড়ে হ'ল সাব্‌ডেপুটি, আর জাহেদ সাহেব এগিয়ে এসে হলেন পুরা ডেপুটি। কাজেই, জোহরার পিতার চোখ এবার মোরশেদের উপর থেকে গিয়ে পড়ল জাহেদের উপর।

কালক্রমে, অন্যান্য মেয়েদের মতো, জোহরাও হয়ত নৈরাশ্য ভুলে গিয়ে সংসারে জড়িয়ে গিয়েছিলেন। অভিজাত বংশের ভালো মেয়েদের এই ছাড়া আর কি গতি আছে? সমস্ত অনিচ্ছা নিয়েও তাকে বাসর-ঘরে ঢুক্‌তে হয়, সমস্ত বিরুদ্ধতা নিয়েও তাঁকে সন্তানের মা হতে হয়, স্বামীর স্বামীত্ব স্বীকার ক'রে চল্‌তে হয়; চরম নিষ্ঠুরতা হচ্ছে, জোর করে ঠোঁটে হাসিও টেনে আনতে হয়। কালক্রমে এ সব-ই হয়ত মেয়েদের জীবনে সয়ে যায়, সহজ হয়ে পড়ে, ভিতরের নারীত্বই হয়ত তার মনে মাতৃত্বের তাগীদ এনে দেয়, স্ত্রীত্বই হয়ত শেষ পর্য্যন্ত তার ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে তোলে। জোহরার জীবনেও এ-সবের ব্যতিক্রম হয় নি, তবুও কন্যা তাহেরার জন্য তিনি একটি প্রেম-প্রীতিময় জীবন কামনা করেন।

তাহেরা ভালবেসে বিয়ে করুক এ তিনি চান্। জাফর যখন কিছুদিনের জন্যে এ বাড়ীতে ছিল তখন তাহেরার বয়স বার তের. কাজেই তাঁর পক্ষে তখন জাফর সম্বন্ধে কোন মতামত ঠিক করা সম্ভব ছিলোনা। কিন্তু জোহরার জাফরকে বেশ ভালো লেগেছিল। এই ভালো লাগার মূলে, সুদূর অতীতের এক আবছা ছিন্ন সূত্রের অস্পষ্ট আকর্ষণ ছিলো কিনা কে জানে। কিন্তু জাফর চ'লে যাওয়ার পরও তিনি মাঝে মাঝে জাফরের খোঁজ নেবার চেষ্টা ক'রতেন। স্বামী জাহেদুল ইস্‌লাম সাহেব কিন্তু পরের ছেলে সম্বন্ধে অত খোঁজ-খবর বিশেষ পছন্দ ক'রতেন না। কাজেই জাফর সম্বন্ধে তাঁর সমস্ত আলাপ-আলোচনা তাহেরার সঙ্গেই সীমাবদ্ধ থাকতো।

তাহেরা কলেজের ঠিকানায় জাফরের চিঠি পেয়েছে। মানব-দেহের শিরা-উপশিরা যে এমন ক'রে উন্মাদ হ'য়ে উঠতে পারে, এই অভিজ্ঞতা তাহেরার এই প্রথম। কলেজে সেদিন যে তিন ঘণ্টা ক্লাস ছিল সেই তিন ঘণ্টার বেলের ক্ষীণ ধ্বনি ছাড়া তার কানে আর কিছুই প্রবেশ করে নি। বাসায় ফিরে হাতের বইগুলি টেবিলের দিকে ছুঁড়ে ফেলে সে ফর্ ফর্ ক'রতে ক'রতে একবার আয়নার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে দু'পাশের দোদুল্যমান কেশগুচ্ছকে কানের উপর তুলে দিয়ে, এক লাফে বিছানায় উঠে ঘুমন্ত ছোট ভাইটিকে এক ঝট্‌কায় তুলে নিলে কোলে। এই অপ্রত্যাশিত হেঁচকা টানে ঘুমন্ত শিশুর কাঁচা ঘুম গেল টুটে—সে ভ্যাঁ ক'রে জুড়ে দিলে গগনবিদারী কান্না। বাইরের বারান্দায় ব'সে তার মা তরকারী কুটছিলেন, কান্না শুনে তিনি চীৎকার দিয়ে উঠলেন---কে রে?

তাহেরা তার ললিত দেহের প্রতি গতিভঙ্গিকে লীলায়িত করে আনন্দচটুল কণ্ঠে উত্তর দিলে—আমি গো আমি, একটু কোলে নিলাম, দেখ না মা, কেমন কান্না জুড়ে দিয়েছে, যেন তার গায়ে আমি আল্‌পিন ফুটিয়ে দিচ্ছি আর কি।

বল্‌তে বল্‌তে প্রতি অঙ্গভঙ্গিতে এক অনির্বচনীয় পুলক ছড়াতে ছড়াতে সে বারান্দায় এসে, মার কোলে ভাইকে ফেলে দিয়ে বল্লে—নাও, আমি আর ওকে কোলে নেব না, বাবা, ষাঁড়ের মতো গলা ছেড়ে দিয়ে

ব'সেছিল! সর তুমি, আমিই কুটে দিচ্ছি, ব'লে সে বঁটিটা টেনে নিয়ে ব'সে পড়ল।

মা তার আজকের এই অপ্রত্যাশিত আচরণে বিস্মিত হয়ে বল্লেন—ও কি, কাপড় ছাড়বি না! হাত মুখ ধুবি না? কিছু খেয়ে নে আগে।

তাহেরা আনন্দোৎফুল্ল মুখে ব'ল্লে---এখন খাব না মা, আজ ক্ষিদে পায় নি, ব'লে ক্ষিপ্র হাতে সে বাঁধা কপি কুট্‌তে লাগলো। ভাইটির গোঁঙানি কিন্তু তখনো শেষ হয় নি। হাস্যোজ্জ্বল চোখে তার দিকে তাকিয়ে তাহেরা ধমক দিয়ে বল্লে---চুপ্, না হয় এক্ষুণি গলা টিপে দেবো। তাহেরার আজকের এই অপূর্ব প্রসন্ন ব্যবহার ও চলচঞ্চল ভঙ্গিমা জোহরার মনে অত্যন্ত আনন্দের সঞ্চার করলো, তিনি আনন্দোৎফুল্ল চোখে মেয়ের হাস্যপুলকিত অঙ্গ-ভঙ্গিমার দিকে চেয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পর ব্রীড়াবনত চক্ষু দু'টী বঁটির উপর ন্যস্ত ক'রে তাহেরা বল্লে---মা, বাপ্‌জান আসেন্ নি?

---না, কেন বল ত?

---আজ জাফর ভাই এক চিঠি লিখেছেন।

---জাফর! কতদিন ত সে চিঠি লিখেনি। তোমাকেই লিখেছে?

—হাঁ।

—কি লিখেছে?

কিছুক্ষণ নীরব থেকে তাহেরা লজ্জাবনত মুখে বল্লে---অ-নে-ক ক-থা। লজ্জাসঙ্কোচে তার মাথা আরও নুইয়ে পড়লো।

মা বল্লেন—তা, তোর মনে আছে জাফরের কথা? সে ত আমাদের বাসায় মাত্র অল্পদিন ছিল। বেশ ছেলেটি।

—বেশ মনে আছে। বাপজান যেতে পারলেন না ব'লে তিনিই ত ভর্ত্তি করার জন্যে প্রথম দিন সঙ্গে ক'রে আমায় স্কুলে নিয়ে গিয়েছিলেন।

—হাঁ, ঠিক, আমারও মনে পড়ছে,—জরুরী ক্লাশ ছিল ব'লে সে দশটায় কলেজে চলে গেল, বলেছিল গাড়ী ক'রে তোমায় সেখান দিয়ে পাঠিয়ে ক্লাশ থেকে তাকে ডেকে নিতে, না ?

—হাঁ, মন্নু ভাই আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি ক্লাশ থেকে বেরুতে বড্ড দেরী ক'রেছিলেন ব'লে, আমি তাঁকে সেদিন খুব ব'কেছিলাম।

মা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন---সত্যি ?

তাহেরা লজ্জাবনত মুখখানি আরও নত করে বল্লে—হাঁ।

ছয়

সকালের ডাকে জাফর তাহেরার উত্তর পেয়েছে। দরজা বন্ধ ক'রে চিঠিখানি সে বার কয়েক পড়লে। যতই পড়ে ততই সে চিঠিখানি যেন উগ্র মদের মতো তাকে উন্মাদ ক'রে তুল্ল। সে যেন আর নিজেকে ধ'রে রাখতে পারছে না। শিস্ দিতে দিতে বেরিয়ে প'ড়ল,—ট্রামে-বাসে, রিক্সা ও টেক্সিতে সারা ক'লকাতা শহর একবার ঘুরে তবে সে বাসায় ফিরলে। তাহেরা লেখাপড়া শিখেছে, বুদ্ধিশুদ্ধিও তার আছে, নিজের মতামত ও পছন্দ-অপছন্দের সমর্থন করার সাহসেরও তার চরিত্রে অভাব নেই,—তবু সে যে অবলা, পিতামাতা, সমাজ ও সংসারের প্রবল বিরুদ্ধতার প্রতিকূলতা করার কতটুকু শক্তিই বা তার আছে। সে নারী, শুধু এই একটী মাত্র অপরাধে তার মতামতের, বিশেষত নিজের বিয়ে সম্বন্ধে মতামতের কিছুমাত্র মূল্য আছে এই কথা তার পিতামাতাও যেমন স্বীকার করবে না, সমাজও তেমনি কোনই আমল দেবে না। উপরন্তু নিজের মতামত প্রকাশ ক'রলে নিন্দা-বদনামেরও অন্ত থাক্‌বে না! জাফর ভাব্‌লে, যদি-তাহেরার মতামতকে অগ্রাহ্য করে, জোর ক'রে তাকে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়!—সে আর ভাব্‌তে পারলে না। সে উঠে দাঁড়ালো, রুমের ভিতর দ্রুত পায়চারি ক'রতে লাগলো। তার চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠলো তাহেরার মিনতিভরা চোখ—তারি আশা পথ চেয়ে সে হয়ত উন্মুখ হয়ে আছে। তাকে সহসা পাত্রস্থ করার জন্য তার বাপ উঠে প'ড়ে লেগেছেন। যদি এই সর্বনাশ থেকে সে তাহেরাকে না বাঁচায়, অন্তত তার সাধ্যানুসারে বাঁচাবার চেষ্টা না করে তবে তার পক্ষে তা হবে চরম কাপুরুষতা। .

একটা সঙ্কল্পও যেন তার মনে জেগে উঠল। মেসে ওয়াহেদ ও মনির তার দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু—বিকশোন্মুখ পুষ্পকলিকে যেমন বৃক্ষ আর ঢেকে রাখ্‌তে পারে না, জাফরও তেমনি তার বিকশোন্মুখ প্রেম-শতদলকে তার বন্ধুদের কাছ থেকে যেনো আর লুকিয়ে রাখ্‌তে পারছিলোনা। তাহেরার

চিঠি যেদিন সে পেল সে-দিনটী তার জীবনে অবিস্মরণীয় হ'য়ে থাকবে। কোন মানবহস্তের একখানি ক্ষুদ্র চিঠিতে যে এমন অলৌকিক দৈবশক্তি থাক্‌তে পারে এ কল্পনা করা যায় না। কোনো অপৌরুষেয় ধর্ম্ম-পুস্তকও তার ভক্তরা এত আগ্রহ নিয়ে এতবার পড়েনি, যতবার জাফর সেই ক্ষুদ্র পত্রখণ্ড পড়লে এবং প্রতিবারই নতুন বিস্ময়, নতুন আলোক, নতুন প্রেরণাই সেই পত্রখণ্ড যেন তাকে দিলে। কস্তরী-মৃগ নাকি নিজের গন্ধে নিজে আকুল হ'য়ে বনে বনে ছুটে বেড়ায়, জাফরকেও যেদিন সে তাহেরার চিঠি পেয়েছিলো সেদিন কস্তরী-মৃগের মত সারা ক'লকাতায় ঘুরে বেড়াতে দেখা গেলো। সেদিন অনাবশ্যক কত চিঠি যে কত জায়গায় লিখ্‌লে, জীবনে কোনোদিন যাদের কাছে কোনো চিঠি লিখেনি, তাদের কাছেও আন্দাজী চিঠি ছেড়ে ব'সলে, হয়ত সঠিক ঠিকানাও জানে না, লিখ্‌বার কিছু ছিলও না, তবুও বিনিয়ে বিনিয়ে কেমন আছ, ভাল আছি, চিঠি দিয়ো এমনি মামুলী কথা কয়টী পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠাব্যাপী লিখ্‌লে। সেদিন তার প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তার হাঁটায়, তার কথায়, হাসিতে, ভঙ্গিতে শুধুই প্রকাশ পাচ্ছিল—

"আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাত-পাখীর গান,
না জানি কেন রে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ।
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ
ওরে উথলে উঠেছে বারি,
ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারি।"

সঙ্গীত সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান থাক বা না থাক সঙ্গীত-চর্চা করা যে উচিত এই বিশ্বাস ওয়াহেদ মনে মনে পোষণ করে, এবং তাতে যে ঘরে বাইরে অনেক ও অনেকার সঙ্গে মিশবার সুযোগ জুটে এ সে দেখেছে এবং মনে হয় সঙ্গীতের চেয়ে এই সুযোগটুকুর প্রতিই তার আকর্ষণ বেশী। একবার ত সে একটি সস্তা গণতান্ত্রিক সঙ্গীত বিদ্যালয়ে গোপনে নামও লিখিয়েছিল। সম্প্রতি কোনো এক নিলামঘর থেকে সে সাড়ে চার টাকা দিয়ে একটি হারমোনিয়ামও কিনে ফেলেছে। এখন দিনে-রাত্রে

ঐ নিয়ে ও শুধু পেঁ পোঁ করতে থাকে। সকালে কি একটা গান নিয়ে সে সকলের কানের উপর আ-া-া করছিল, তখন মূর্ত্তিমান ঝড়ের মতো জাফর আবির্ভূত হ'য়ে—'তুই আবার কি গান করবি, দে আমায়—' ব'লে, জোর ক'রে হারমোনিয়ামটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিলে। ওয়াহেদের বহু তপস্যার আ-া-া যার উপর তার বহু 'ভবিষ্যৎ' নির্ভর কর্‌ছে তা আর শেষ হতেই পারল না।

ওয়াহেদ বিস্মিত হ'য়ে ব'লে উঠল,—তুমি গান করবে? জাফরের কণ্ঠস্বর কর্কশ। তার কথা শুন্‌লেই মনে হয় তার বুঝি বারমাসই সর্দ্দি ক'রে আছে। কাজেই তার সেই অস্বাভাবিক কর্কশ কণ্ঠ দিয়ে যে কোনো দিন গান গাওয়া হতে পারে এ কেউ ভাবেনি। মনির সিগারেটটা ঠোঁট থেকে নামিয়ে ব'লে উঠল,—'তুমি যদি গান ধর, সবাই মনে করবে, এখান থেকে মেস্‌ উঠে গিয়েছে এবং ধোপারাই এ-বাড়ী নিয়েছে ভাড়া।'

জাফর সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল—'আলবৎ আমি গান করব। ওয়াহেদ কি গানের Monopoly পেয়ে গেছে নাকি?

হারমোনিয়ামের চাবি টিপে সত্যই যখন জাফর মুখ ব্যাদান করলে, ওয়াহেদ চেঁচিয়ে উঠল,—'দোহাই, একটু থাম্‌, একটু থাম্‌ আমরা আগে কানে তুলো দিয়ে নিই, না হয় কানে তালা লাগ্‌বে যে।—বল্‌তে বল্‌তে সে এবং উপস্থিত সকলে দু'হাতের দুই আঙ্গুল দিয়ে কর্ণ-বিবর বন্ধ ক'রে বস্‌লে। ততক্ষণে কিন্তু জাফর শুরু করে দিয়েছে—

'হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি,
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি'......

হারমোনিয়ামের সঙ্গে তার গলার শব্দের কোন সামঞ্জস্যই নেই, তবুও সে বেসুরোভাবে এই লাইন দুইটী বার বার আবৃত্তি ক'রতে লাগল। কাঁহাতক্‌ আর কানে আঙ্গুল দিয়ে বসে থাকা যায়, ওয়াহেদ কান থেকে আঙ্গুল নামিয়ে ব'লে উঠল,—'ওরে ধোপার গাধা, ঐটি কি গান?'

হাত পা ছেড়ে দিয়ে মনিরের গায়ের উপর গড়িয়ে পড়তে পড়তেই সে বল্লে,—'গান কাকে বলে স্যার জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?'

---যাকেই বলুক, অন্তত তুমি যা আবৃত্তি করলে তা কিছুতেই গান নয়।

---কেন নয় শুনি ?

---কেন নয় তা অবশ্য বুঝিয়ে বলা শক্ত, তবে তুমি যা এইমাত্র চেঁচালে তা কবিতা, গানে সুর থাকে, কবিতায় না থাক্‌লেও চলে।

---বেশ, কবিতায় সুর দিলেই ত গান হ'য়ে গেল, এই ত সোজা নিয়ম জানি।

মনির ব'লে উঠল---সুর কাকে বলে জানিস্ ?

জাফর---এইমাত্র সুরের একটা Practical demonstration দেওয়ার পরও জিজ্ঞাসা কর্‌ছিস্ সুর কাকে বলে জানি কিনা !

মজিদ এবার নীরবতা ভঙ্গ করতে বাধ্য হ'ল, বল্লে---অর্থাৎ গলা ছেড়ে দিয়ে খুব টান্‌তে পারলেই সুর হয়ে গেল, যেমন---হ্-ঈ-ই-ঈ-ঈ-দ-অ-অ-অ-য়-আ-া-া-া-জ, ই-ই-ই-ঈ-ঈ ; তাই না জাফর ?

জাফর---আলবৎ, তা ছাড়া আর কি, লক্ষ্ণৌ, মুর্শিদাবাদ ও ঢাকায় কত ওস্তাদই ত দেখলাম, সবই ত আ-া-া-া---সে রাজহংসের মত গ্রীবা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর ক'রে স্বরটাকে কিছুক্ষণ ধরে কণ্ঠনালীর ভিতর কাঁপিয়ে ওস্তাদী আ-া-া-র আর একটা demonstration দিয়ে দিলে। তারপর বল্লে---চল, বেড়িয়ে আসি।

মনির বল্লে---এ দুপুরে কোথায় বেড়াতে যাবো ?

ওয়াহেদ---বায়স্কোপে নিয়ে যাও ত যেতে পারি।

জাফর---বেশ স্বচ্ছন্দে, চল।

মজিদ---খাওয়াটাও হবে ত ?

জাফর---দেখা যাবে, চলই না।---এই ব'লে সে জেবটা একবার স-জোরে নাড়া দিলে, ঝন্‌ঝনাৎ শব্দে জেবও তার গুরুত্ব সম্বন্ধে সকলকে ওয়াকিফহাল ক'রে দিলে।

রাস্তায় বেরিয়ে সে খুব দামী সিগারেট কিনে ওয়াহেদ ও মনিরকে এক একটি দিয়ে নিজেও একটি ধরালে। তার এই অপ্রত্যাশিত বিলাসিতার

কৈফিয়ৎ স্বরূপই যেন সে আপনা আপনিই বল্লে—শুধু সাহেবগুলোই দুনিয়ার সব ভাল জিনিষ ভোগ ক'রে যাবে তার কী মানে আছে? সুযোগ পেলে আমাদেরও মাঝে মাঝে মুখ পরিবর্তন ক'রে দেখা উচিত।

ওয়াহেদ—তাতে অন্তত একঘেঁয়েমির হাত থেকে বাঁচা যায়।

মনির—জাফর, আজকের খাবারটাও যেন ভাই একঘেঁয়ে না হয়।

জাফর—তা আর বল্‌তে হবে না, কোন্ রেষ্টুরেণ্টে যাবে ঠিক কর। হাত পেতে টাকার ভাঙ্গতী নিতে না নিতেই—হয়ত এতক্ষণ ওঁৎ পেতেছিল, এক ভিখারী হাত পেতে দাঁড়ালে। জাফর হাসিমুখে একটা দু'আনি তার হাতে ফেলে দিয়ে বন্ধুদের বল্লে—চল।

মনির ও ওয়াহেদ জাফরের আজকের এই অপ্রত্যাশিত ঔদার্য্য ও বিলাসিতায় বেশ একটু আশ্চর্য্য হ'ল।

মনির পথ চল্‌তে চল্‌তেই বল্লে—এতই যখন দাতা সেজেছিস্, দু' আনা পয়সা দিয়ে ত আটজন ভিখিরী বিদায় ক'রতে পারতিস্—।

জাফর—ওতে শুধু বিদায় করা হয়, কাকেও সাহায্য করা হয় না।

মনির—ও-লোকটা এখনি গিয়ে পেট ভরে তাড়ি খাবে।

জাফর—দু'আনা পয়সা আটজনকে দিলে কারও পেট ভ'রত না, একজনকে দিলে সে তাড়িই খাক আর ভাতই খাক অন্তত পেট ভরে খেতে ত পারবে।

ঘর থেকে বের হওয়ার পর এরি মধ্যে জাফর অন্তত শ' খানেক বার তার বুক পকেটে হাত দিয়েছে। মাঝে মাঝে রুমালটা হাতের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে। রুমালটা হাতে থাক্‌লে তা বাম হাতে নিয়ে ডান হাত সে বুক-পকেটে ঢুকিয়ে দেয়, কি একটা জিনিষ স্পর্শ করেই আবার হাত বের ক'রে নেয়। মোড়ের কাছে আস্‌তেই সে ব'লে উঠল—চল্ মসুদের সঙ্গে একবার দেখা করে আসি। মসুদ তাদেরই সহপাঠী, মোড়ের কাছেই একটা বাড়িতে থাকে।

তার প্রস্তাব শুনে ওয়াহেদ ও মনির অবাক্ না হয়ে পারলে না। মসুদের সঙ্গে জাফরের বহুদিনের মনোমালিন্য—আলাপ বন্ধ তাও আজ

প্রায় ছ'মাস। অন্যান্য বন্ধুরা মায় ওয়াহেদ মনির পর্য্যন্ত উভয়ের মিলনের জন্য কত চেষ্টা করে দেখেছে, কিন্তু জাফরকে তা'রা কিছুতেই রাজী করাতে পারেনি। এমন কি গত ঈদের দিনেও যাতে তাদের পুনর্মিলন হয়, অন্তত আলাপটা হয়, সে চেষ্টা করেও শুধু জাফরের এক গুঁয়েমির জন্যই তারা ব্যর্থকাম হয়েছে। কাজেই জাফরের প্রস্তাব শুনে ওয়াহেদ ও মনিরের অবাক্ হওয়াতে বিস্ময়ের কিছুমাত্র কারণ নেই।

প্রথমটা ওয়াহেদ ও মনির বিশ্বাসই করতে পারেনি কিন্তু মস্তুদের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে সে যখন বারংবার পীড়াপীড়ি করতে লাগল তখন ওয়াহেদ বলে উঠল—তুমি একলাই যাও আমরা যাব না।

---কেন ?

একটু উষ্মার সঙ্গেই ওয়াহেদ উত্তর করলে—মস্তুদের কাছে যাওয়ার জন্যে কতবার আমাদের অপমান করেছ মনে আছে ?

—ওঃ মানুষের মন কি ভাই সব সময় এক রকম থাকে ? ও বেচারীর সঙ্গে অনর্থক মনোমালিন্য রেখে কী লাভ ?

মনির ভাব্‌লে আজ জাফরের মাথায় যখন খেয়াল চেপেছে, এই খেয়ালের ঝোঁকে যদি এই অপ্রীতিকর মনোমালিন্যটা ঘুচে যায় মন্দ কি ?

মনির বল্লে---চল্ ওয়াহেদ, নিজেদের মধ্যে কোনো রকম অপ্রীতিকর সম্বন্ধ রাখা ভাল নয়, আজ জাফরের মনে যখন সুবুদ্ধি জেগেছে, আজই এর একটা ইতি হয়ে যাক—মন্দ কি। ব'লে সে ওয়াহেদের হাত ধ'রে সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালে। সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে ওয়াহেদ আরও মিনিট দুই বাদানুবাদ করলে বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে বন্ধুদ্বয়ের অনুসরণ করতেই হ'ল।

পথে জাফর আরও অসংখ্যবার তার বুক-পকেটে হাত দিয়েছে। তার মনের গোপন কথা সে বন্ধুদের কাছে প্রকাশ করবেই, প্রকাশ করার জন্যই আজ সে তাদেরে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছে। কিন্তু কথাটা পাড়ার সূত্র সে খুঁজে পাচ্ছে না, কাজেই বলি বলি ক'রেও কথাটা তার মুখে যেন আস্‌ছে না। অনাবশ্যক শুধু হাতই পকেটে ঢুকছে, আর সিগারেটের পর সিগারেটই শুধু শেষ হয়ে চলেছে। স্মার্ট জাফরকে কোনোদিন বলা যায়

না ; তাই আজ হঠাৎ বন-হরিণের মতো তার লঘু পদবিক্ষেপ আর চলচঞ্চল গতি দেখে তার পরিচিতদের বিস্মিত হবারই কথা।

ঠিক হ'ল আপাতত এখন কোনো রেষ্টুরেণ্ট থেকে 'হাল্‌কা নাস্তা' সেরে ময়দানে বেড়ানো, তারপর সাঁঝের শো'য় সিনেমা দেখে আবার কোনো রেষ্টুরেণ্ট থেকে একেবারে ডিনার খেয়েই বাসায় ফিরবে। রেষ্টুরেণ্ট প্রেম-প্রকাশের বা প্রেম-পত্র পাঠের যোগ্যস্থান নয়, তাই রেষ্টুরেণ্টেও বহু আয়াসে জাফর তার অদম্য ইচ্ছাকে দমিয়ে রাখলে। ময়দানে তিন বন্ধু বৃত্তাকারে আসন নিতেই জাফর সিগারেট কেস্‌ ও দিয়াশলাইটী সামনে রেখে, ধীরে ধীরে বুক-পকেট থেকে চিঠি বের ক'রে ওয়াহেদ ও মনিরের দিকে খামটী উঁচু ক'রে ধরে জিজ্ঞাসা করলে—কার চিঠি বল ত?

ওয়াহেদ আর মনিরের বুঝতে বাকি রইল না।

দুই বন্ধু একরকম সমস্বরেই ব'লে উঠল—তাই বল।

মনির—কবে পেলে?

জাফর—আজ সকালের ডাকে।

ওয়াহেদ—দেখি হাতের লেখাটা।

জাফর চিঠিখানি তাদের সামনে খুলে দেখালে। হাতের লেখা পরিষ্কার ও সুন্দর।

মনির বেশ উৎফুল্ল হ'য়ে ব'লে উঠল—পড়। শোনা যাক। অগ্রসরদলের সভানেত্রী হওয়ার যোগ্যতা আছে কিনা বুঝা যাবে।

জাফর অর্দ্ধসমাপ্ত সিগারেটটী ঘাসের উপর রেখে পড়া আরম্ভ করল।

জাফর,

আজ কয়দিন ধরে ভেবেচিন্তে কূলকিনারা করতে পারছি না যে, কি ব'লে তোমায় সম্বোধন করি—এই সম্বোধন-উদ্ভাবনার অকৃতকার্য্যতাই এই কয়দিন তোমার চিঠির জবাব আরম্ভ করতে দেয়নি। সম্বোধনে কিছুমাত্র বিশিষ্টতা দিতে পারলাম না ব'লে দুঃখিত, তবুও এইটুকু সান্ত্বনা যে, আশৈশব তোমার প্রিয়জন এই নামেই তোমাকে সম্বোধন ক'রে এসেছ, এই সম্বোধন তোমার অণু পরমাণুতে মিশে আছে, কাজেই

তোমার এর চেয়ে কোনো প্রিয়তর সম্বোধন হতে পারে আমি ভাবতে পারি না। আর এই নামটা ত কিছুমাত্র অসুন্দর নয়—একবার উচচারণ করলেই ত দেহমন ফুরফুর ক'রে উড়তে চায়। এই নাম নিয়ে কতদিন কত কবিতা রচনা করেছি তার ত ইয়ত্তা নেই—'জা-ফ-র'-এর প্রত্যেক অক্ষরকে অবলম্বন ক'রে যত কবিতা লিখেছি সব একত্র ক'রে ছাপ্‌লে হয়ত একটা ওয়েষ্টার ডিক্সনারীরই আকার নেবে। তুমি ত এক মামুলি সম্বোধন দিয়েই তোমার চিঠির আরম্ভ ক'রে সেরেছ—কিন্তু আমি যদি তোমাকে রাজা সম্বোধন ক'রে বসি তা'হলে তুমি কেন, পৃথিবীশুদ্ধ লোক হেসে গড়াগড়ি দেবে। কিন্তু নিঃস্ব ভিখারিণীকেও রাণী ডাক্‌লে কেউ এতটুকু ঠোঁট ফাঁক করার প্রয়োজন অনুভব করে না। মেয়েদের প্রতি এ যে কত বড় করুণা তা মেয়েরা বুঝবে না। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত পরানুগ্রহেই যাদের জীবনের একমাত্র নির্ভরতা, তারা রাণী সম্বোধনে গর্বানুভব ক'রে পুলকিত যে হবেন তাতে আর বিচিত্র কি! রাণী, রাণী, রাণী, কত বড় ব্যঙ্গ এর অক্ষরে অক্ষরে। তোমার এই সম্বোধন ফিরিয়ে নাও, ফিরিয়ে নাও প্রিয়তম! অসহায়া নিঃস্বকে নিষ্ঠুরের মত আঘাত হেনেও কি তুমি আনন্দ পাও? স্বামীনির্ব্বাচন, বিবাহ, প্রেম ইত্যাদি সম্বন্ধে মতামত ও খেয়াল-খুশী চুলোয় যাক, দুই ফুস্‌ফুস্‌ ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারব কিনা, দুই চোখ তুলে আকাশের চাঁদের দিকে তাকাব কিনা তারও অনুমতির জন্যে অন্যের দৃষ্টির প্রসন্নতা খুঁজে ফিরতে হয় যাকে, সে রাণী বটে! একখানি চিঠি দিতেও পেতে যে পারে না সে আবার রাণী! নিজকে চুরি করার মতো হীনতায় টেনে নিয়ে না গেলে তোমার চিঠিও কি আমি পেতাম? পরাধীনতা ও বন্ধন যে মানুষকে নৈতিক অবনতির দিকে নিয়ে যায় সেদিন তা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেছিলাম। বাস্তবিক মানুষের জীবনে দৈবের প্রভাবও যে অসাধারণ! তুমি চিঠি লিখবে তাও কি ছাই আমি জানতাম। সেদিন হঠাৎ রাত্রে স্বপ্নে দেখি: সুদূর আকাশের অন্ধকার ভেদ ক'রে একটী পূর্ণ চাঁদ যেন আমার ঘরে এসে ঢুকেছে, জ্যোৎস্নালোকে সমস্ত ঘর হেসে উঠল, চাঁদখানি হাসতে হাসতে আমার ঘরে ভাসতে লাগল—যেন আমার বিছানার চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আমি ধরতে চেষ্টা করছি, ধরি ধরি করেও যেন ধরতে

পারছি না। অমনি হঠাৎ ঘুম গেল ভেঙ্গে। তখন বুঝলাম, আজ নিশ্চয়ই আমার জীবনে চাঁদের আলো ফুটবে। তোমার আসার আশা-পুলকে কখন যে রাত ভোর হ'য়ে গেল তা টেরও পাইনি। সকাল থেকেই কান খাড়া করেছিলাম তোমার আগমন-সংবাদের প্রতীক্ষায়। যখন পিয়নের ডাক কানে গেল তখন হঠাৎ মনে হ'ল তুমি না এসে তোমার চিঠিও ত আসতে পারে। সেণ্ডেল ছেড়ে খালি পায়ে তাড়াতাড়ি আব্বার ঘরের জানালার পর্দ্দার আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালাম! সবুজ খাম দেখে সারা দেহমন দুরু দুরু ক'রে উঠল, পুলকে না ভয়ে, কে জানে! দেখেই মনে হ'ল ঐ চিঠি তোমার না হয়ে যায় না, ঐ খাম থেকেই যেন তোমার দেহসুরভি জানালার বাইরে এসে আমায় অভিনন্দন জানালে। তোমার হাতের ছোঁয়ার, তোমার প্রেমের, তোমার ভালবাসার সৌরভ-সুষমা যেন আমাকে তক্ষুণি মূৰ্চ্ছিত ক'রে ফেলবে; কোনো প্রকারে সেই মুহূর্ত্তে নিজেকে সামলিয়ে সরে পড়লাম। বিকেলে আব্বার চেহারায় অমাবস্যা দেখেই বুঝলাম, রাত্রে আমার চেহেরার পূর্ণিমারই এই পরিণতি। তোমার চিঠি-কাজেই পৃথিবীর যে কোনো ঐশ্বর্য্যের বিনিময়েও লোভসংবরণ আমার পক্ষে সম্ভব নয়; নিজেকে চোরের পর্য্যায়ে নামিয়ে তবে তোমার চিঠি হাত করেছি, এই ত রাণীর ভাগ্য! জীবনের বাল্যপাঠ শেষ হতে না হতেই আমার ক্ষুদ্র মানস-রাজ্যে পাপড়িবদ্ধ ফুলকলির মত যে রঙীন ধ্যানরাজ্য জেগে উঠেছে, যে-চিন্তা যে-কল্পনা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমার সমগ্র দেহ-মন সুরভিত ক'রে তুলেছে,—সেই সুরভিত ধ্যানরাজ্যের অভিষেক-দিবসে যার কোনো মতামত দেবার, হাঁ-না জানাবার অধিকার নেই, তাকে তুমি রাণী আখ্যা দিয়েছ! এতে বুঝা যায় তোমরা অতি-আধুনিকরাও রাণী অর্থে বোঝ—ঘোমটা-ঘেরা মুখ, আর পটলচেরা চোখ, যাদের মন আর হৃদয় ব'লে কিছু থাক্‌বে না। হুকুম তামিল করায় হবে যারা একান্তমনে দাসীর সেরা দাসী।

যে-সুন্দরের ধ্যানে বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের প্রভাত রেঙে উঠে আজ বীণার মত বেজে উঠেছে; আহ্বান করার পূর্বেই, নিমন্ত্রণ-আয়োজনের আগেই বলপূর্বক যাকে আমাদের স্বপ্নরাজ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, সে আমাদের ধ্যানের সুন্দর কিনা, তা'কে একটু মনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখবার

ফুরসৎও ত কেউ আমাদের দেয় না। মত্ত হাতীর মতো নারীর ধ্যান-লোককে মথিত ক'রে যে আসে সে ত লটারীর 'হইলে হইতে পারা'র অশ্বডিম্ব থেকে সাত রাজার ধন মাণিক---যে কোনোখানে তার স্থান হ'তে পারে। কিন্তু আমার জীবন ও যৌবন যাঁকে অবলম্বন ক'রে সার্থক হ'তে চেয়েছিল, আমার ধ্যানরাজ্যের সেই সুন্দর ত আমার অদৃশ্য ছিলেন না। যেদিন তাঁকে প্রথম দেখলাম সেদিন দেখেছি তাঁর দৃষ্টিতে বিদ্যুৎ, হাসিতে চাঁদের আলো, বাক্যে ফুলের সুরভি, দেহে কচি পাতার বসন্তোৎস, তাঁর চরণে দেখেছি মুক্তি, গতিতে দেখেছি ফাল্গুন-উষার দক্ষিণা বাতাস---সেই ত আমার ধ্যানের রাজা, কল্পলোকের সুন্দর। তাঁর আমন্ত্রণলিপির ত আমার দরকার নেই; আমার অন্তরের অন্তরলক্ষ্মী যে সৃষ্টির আদি থেকে ফুলমালা গাঁথা শুরু করেছে, সে-মালা হাতে আজও ত সে হাত বাড়িয়ে আছে তাঁর কণ্ঠের উদ্দেশ্যে।

তোমার চিঠির উত্তর একমাত্র চোখের জলেই দেওয়া যায়---চোখের জল তোমার কাছে পৌঁছাবার কোনো উপায় নেই ব'লে কাগজে-কলমে মনের ব্যথাকে কথার আকার দেবার চেষ্টা করছি। প্রিয়তম, বুক চিরে দেখাবার কোনো উপায় নেই, না হয় দেখ্‌তে পেতে আশৈশব একটু একটু ক'রে কার ধ্যানমূর্ত্তি গঠন ক'রে হৃদয়ের নিভৃত অন্তরে লালন করেছি, পূজা দিয়েছি। বুদ্ধি হওয়ার পর তোমার সঙ্গে আর বেশী দেখা হয়নি। শেষ দেখা বোধ হয় কোনো এক ঈদের দিনে। তুমি আমাদের বাড়ী এসেছিলে, সেদিন তোমাকে সালাম করবার অনুমতি পেয়েছিলাম, সেদিন এই শুভ মুহূর্ত্তে নত নেত্রের ভ্রূর রেখায় রেখায় শুধু কি ভক্তিই বয়ে নিয়েছিলাম, সেদিন নম্র দুই করতল কি তোমার পায়ে আমার সর্ব্বস্ব রেখে আসেনি? শৈশবের কোন্ এক বিস্মৃত দিবসে যে সরল স্নেহপূর্ণ দু'টি লাজুক চোখ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম, আজ যৌবনের উদয়-শিখরে দাঁড়িয়েও ত সে চোখ থেকে চোখ তুল্‌তে পারছি না। সর্ব-চক্ষুর অন্তরালে যাঁর চক্ষু বিচরণ করে ফিরছে তিনি ত দেখেছেন আমার যা কিছু সবই সেদিন তোমার পায়ে উজাড় করে দিয়েছি। আমার অন্ধকার নিশা, আমার মাথার উপাধান, আমার পাঠ্য বই, আমার রাফ খাতা সবাই জানে আমার সবই তোমার। এত যুক্তিপ্রমাণ দিয়ে কি

তোমায় ভালবাসার কথা বলতে হবে? তুমি ভালবাস কি বাস না, সে কথা ত কোনোদিন চিন্তা করিনি—যুক্তিপ্রমাণ ও লোভ-স্বার্থ সম্বন্ধে সজাগ হওয়ার পূর্বেই যে মন তোমার পায়ে সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছে, আজ তোমার গুণাগুণ বিচার করার ত তার প্রবৃত্তি নেই।

শৈশবের স্মৃতিপথ বেয়ে মনের পরতে পরতে তোমার যেটুকু কথা এখনো বিচরণ করে ফিরছে তাই ত আমার নেয়ামৎ, তাই ত আমার মনের স্বাস্থ্য। শৈশবে তোমার সঙ্গে একবার নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েছিলাম, তারপর সে কথা কবেই ভুলে গিয়েছি। কিন্তু আশ্চর্য্য, শৈশব-সীমা ডিঙাতে না ডিঙাতেই দেখি তোমার সঙ্গে যেটুকু আলাপ হয়েছিল, যেটুকু হেঁটেছিলাম, কখন তুমি সাম্‌নে গাড়ী দেখ্‌তে পেয়ে তোমার বাম হাত দিয়ে আমার ডান হাতখানি তোমার হাতে তুলে নিয়েছিলে, সব খুঁটিনাটি একে একে আমার মনের পরদায় ভেসে উঠছে—নতুন জীবনের নবীন পুলকে সবই যেন আমার শিরায় শিরায় বিচরণ ক'রে ফিরছে। আজও মনে হয়, আমার সেই হাতখানির যেখানটায় তুমি ধরেছিলে সেখানে যেন তোমার দেহ-সৌরভ লেগে রয়েছে, আমার সারা দেহকে সে যেন সুরভিত করে তুলছে। আজও চাঁদের হাসি, ফুলের সুবাস, দক্ষিণা বাতাস সবই যেন তোমার স্মৃতি-সৌরভ বয়ে নিয়ে এসে আমার দেহ-মনে অপূর্ব পুলকের সঞ্চার করছে।

সুন্দরের জন্ম কোন্ ভৌগোলিক সীমানাকে গৌরবান্বিত করেছে, সে কথা ভাব্‌বার ত কোনো প্রয়োজন নেই। পশ্চিমে বা পূর্ব্বে, উত্তরে বা দক্ষিণে যেখানেই জন্মান না কেন, সুন্দর চির সুন্দর—তাঁর মুখের হাসিতে চাঁদের আলো, তাঁর বাক্যে সঙ্গীত, তাঁর দেহে ফুলের সুরভি। অভিভাবক,—অভিভাবকের ভয়ে তুমি এত সন্ত্রস্ত হচ্ছ কেন? বুড়ো অন্ধের দল আজ যৌবনধর্ম্মকে যদি ভুলে গিয়ে থাকে, যৌবনের রঙীন স্বপ্ন, চলচঞ্চল গতি, শক্তি ও আলোকে যদি তারা প্রত্যাখ্যান ক'রে বসে তাতে ক্ষুব্ধ না হয়ে তাদের কুসংস্কারকে বরং করুণা করাই উচিত। জানি অভিভাবকরা চান, আমি একটি ভালো ছেলেকে বিয়ে ক'রে ধনে মানে সোনা-রূপোয় ভূষিতা হয়ে কিছুদিন ঝলমল করি আর প্রতি বৎসর এক একটি সন্তানের জননী হয়ে তাঁদের দৌহিত্র-ক্ষুধা মিটাই, তা হলেই তাঁরা স্বর্গসুখ

পান। কোনো মেয়ের জীবনে অন্য কোনো সাধস্বপ্ন থাকতে পারে, এ তাঁরা ভাবতেই পারেন না—এ কথা শুনলেও হয়ত তাঁরা কানে আঙ্গুল দেবেন। তাঁদের মতে ভাল ছেলে হ'ল ডিপুটি বা সাব-ডিপুটি, যিনি মাস-পয়লা মুঠা ভরে প্রচুর রৌপ্যচক্র আন্‌তে পারেন এবং হ্যাটকোট চড়িয়ে সেই চক্রারোহণে মাসের শেষে পৌঁছতে পারেন তিনিই আদর্শ ভালো ছেলে। রৌপ্যযানে চড়ে মাটির দেহ মাটিতে খুব আরাম্‌সে রক্ষা করা যায় বটে, কিন্তু মাটির ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশের রহস্যসন্ধান করা যায় না। যে মেয়ে আশৈশব স্বপ্নের মালা গেঁথে চলেছে, অনন্ত আকাশের নীলিমায় নীলিমায় রহস্য সন্ধান করে ফিরেছে, তাকে কি ক'রে হ্যাট-কোটের দারোগাগীরি ভুলাতে পারে? নিজেকে স্বর্ণরৌপ্যের ভারবাহীতে পরিণত ক'রে বিধাতার নিজের হাতের দানকে অপমান করতে চাইনে। তুমি শুনে হয়ত আশ্চর্য্য হবে আমি বুদ্ধি হওয়ার পর থেকে জীবনে কোনো অলঙ্কার পরিনি—আমার নাকে-কানে ছিদ্র ক'রে খোদার উপর খোদকারী করতে আজও কাউকে দিইনি। যার সঙ্গে আমার মালা-বদল হ'বে, তার সৌন্দর্য্যে যদি আমার দেহ-মন সৌন্দর্য্য বিভূষিত হয়ে না ওঠে, তাঁর বাণীর বিদ্যুৎস্ফুরণে যদি আমার কল্পলোকের রুদ্ধ দুয়ার খুলে না যায়, তাঁর চরণের গতি যদি আমার জীবনে মুক্তি নিয়ে না আসে, তা হলে সে তুচ্ছ মালা-বদলে নিজের ভাগ্যে অপমান ও বিড়ম্বনা ছাড়া আর কী ঘট্‌তে পারে? অতএব অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে সালাম। পিতা জন্ম দিয়েছেন, মাতা স্তন্য দিয়ে লালন করেছেন, শুধু এই জন্যই কি তাঁদের খামখেয়ালকে চরিতার্থ ক'রে আমার সুন্দর জীবন ও সুন্দরতর ভবিষ্যৎকে বলি দিতে হবে? নিজেদের খেয়াল খুশীকে চরিতার্থ করতে গিয়ে যাঁরা দৈবক্রমে পিতা ও মাতা হয়ে পড়েছেন, নিজেদের কৃতকর্ম্মের সন্তানকে সমর্থ জীবনে পৌঁছাবার আগ্ পর্য্যন্ত প্রতিপালণের জন্যে কি তাঁরা ন্যায়ত দায়ী নন্। নিজেদের স্বাভাবিক দায়িত্বপালনের বিনিময়ে কোন্ অজুহাতে তাঁরা সন্তানের কাছে কৃত-জ্ঞতার আবদার করেন! দেখ্‌ছি মানুষের উন্নতিই আজ মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন দুঃখের কারণ হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির সর্ব্বত্র জন্ম-প্রতিপালন একই নিয়মাধীন---পশুপাখীও জন্ম দিচ্ছে, সন্তান প্রতিপালন করছে,

মানুষের চেয়ে তাদের সন্তানবাৎসল্য কিছুমাত্র কম নয়। অথচ বয়স্ক সন্তানের উপর জোর খাটানোর কোনো প্রবৃত্তিই তাদের নেই। কৃতজ্ঞতা লাভের জন্য তা'রা সন্তানের মুখের দিকে হা ক'রে চেয়ে থাকে না! অসমর্থ সন্তানকে পালন করেছে ব'লে তার কাছে কৃতজ্ঞতা দাবী করা অন্ধকে ভিক্ষা দিয়ে ভিক্ষার ওজনে আশীর্ব্বাদ শুনবার জন্য হা ক'রে তাকিয়ে থাকার মতো নয় কি? কাজেই অবিবেচক অভিভাবকদের কথা মেনে আমার জীবনের পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার মাঝে অমাবস্যাকে টেনে নিয়ে আসতে আমি রাজী নই। আমার পায়ে বেড়ি লাগাবার জন্যে খুব তোড়জোড় চল্‌ছে, কাজেই, হে সুন্দর, তুমি এসে আমায় মুক্ত করো। শৃঙ্খলের ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ আমি শুন্‌তে পাচ্ছি, কাজেই শুভস্য শীঘ্রম, হে প্রিয়তম!

তোমারই
তাহেরা অর্থাৎ তোমাহারা

চিঠি পাঠের পর একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে সে বল্লে---বলো, এখন কি করা যায়। জাহেদ সাহেবের চিঠিও ত তোমাদের দেখিয়েছি—তিনি শুদ্ধ রাজী হয়ে যে ভালয় ভালয় বিয়ে হবে, তার কোনো সম্ভাবনা নেই। কাজেই এখন আমাদের নিজের পথ দেখতে হবে।

মনির---তোমার বাবাকে লিখ না কেন, তিনি গিয়ে ধরে পড়লে জাহেদ সাহেব হয়ত 'না' করতে পারবেন না।

জাফর---একে ত 'অগ্রসর' হিসেবে সে ধরণের বিয়েতে আমার ঘোরতর আপত্তি তার উপর মেয়ে যখন রাজী তখন আমি খামাখা কাপুরুষের মতো ব্যাক্‌ডোর পলিসি গ্রহণ করতে যাব কেন?

ওয়াহেদ---তবে কি করবে?

জাফর---মেয়ের মতিগতি ত বুঝলে, ইচ্ছে করলে আমি এখন যা তা করতে পারি, অন্তত Elope যে করতে পারি তাতে কোনো সন্দেহই নেই। কিন্তু তা আমি করব না, কারণ তাতে আমাদের 'অগ্রসর-সংঘের' বদনাম হবে। তার উপর, মেয়েদের ব্যাপারে Unchivalrous হওয়া আমি উচিত মনে করি না।

মনির---অত দীর্ঘ ভূমিকা না ক'রে কি উচিত মনে কর তাই বলো না কেন ?

জাফর---আমার ইচ্ছে তোমাদের দু'জনকে নিয়ে এই Week-endএ জাহেদ সাহেবের কর্ম্মস্থানে গিয়ে মুখোমুখী তাঁর সঙ্গে আলাপ করে ব্যাপারটার একটা হ্যস্তন্যস্ত করে ফেলি।

ওয়াহেদ---তা অবশ্য নেহাৎ মন্দ হয় না। তবে আমরা কেন ? বিয়ে করবে তুমি, পিঠে যদি তোমার হাতুড়ীও ভাঙ্গে তাতেও দুঃখ করবার থাকবে না, কিন্তু আমরা কেন খামখা মার খেয়ে বেইজ্জৎ হ'তে যাবো। কথায় বলে পেটে খেলে পিঠে সয়, পেটে না খেয়ে আমাদের পিঠে সইবে কেন ?

জাফর---মার খাওয়া অত সোজা ব্যাপার নয়। তোমরা বাংলা দেশের বয়স্কা মেয়ের পিতার মনস্তত্ব জান না বলেই অত ভয় পাচ্ছ। মারামারি কি কোনো গণ্ডগোল করতে গেলেই ত পাড়াময় কথাটা রাষ্ট্র হবে, দশজনের কানে যাবে, হয়ত আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারে। গণ্ডগোলের কার্য্যকারণ খুঁজতে কত উর্ব্বর মস্তিষ্কই তখন গবেষণায় লেগে যাবেন। ফলে কত সম্ভব-অসম্ভব কাহিনীরই সৃষ্টি হবে, যাকে বয়স্কা কন্যার পিতা যমের চেয়েও বেশী ভয় করেন। কাজেই তোমরা নির্ভয়ে আমার সঙ্গে যেতে পার। আমি একা গেলে জাহেদ সাহেব হয় ত আমাকে আমলই দেবেন না। দু'তিন জন হ'লে অত সহজে সাতপাঁচ ব'লে কথাটা উড়িয়ে দিতে পারবেন না।

সাত

আগেই সঙ্কল্প করা ছিল। শনিবার সন্ধ্যায় তিন বন্ধু ট্রেন থেকে নেমেই খুলনার ডাকবাংলায় এসে উঠলো। ইচ্ছা রাতটা ডাকবাংলোয় থেকে রবিবার সকালে নিরিবিলি সময়ে গিয়ে জাহেদ সাহেবের সঙ্গে দেখা করবে। রাত্রে খেয়ে দেয়ে ঘণ্টাখানেক sight seeing'ও করলে আর জাহেদ সাহেবের বাসাটাও জিজ্ঞাসাবাদ করে ঠাহর করে রাখ্‌লে।

সকালে চা-পর্ব্ব সমাধা করে জাহেদ সাহেব অফিস-ঘরে বসে ডাক দেখ্‌ছিলেন। এমন সময় তিন বন্ধু সেই ঘরে ঢুকে তাঁকে সালাম করে দাঁড়ালো। চোখ তুলে দেখে জাহেদ সাহেব ত যেন আকাশ থেকে পড়লেন, মুহূর্ত্তে তাঁর চোখমুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বিস্ময়ের আতিশয্যে হাত তুলে সালাম গ্রহণের ভদ্রতাটুকু পর্য্যন্ত তিনি ভুলে গেলেন।

প্রকৃতিস্থ হতে তাঁর মিনিট দুই লাগল। তারপর বল্লেন—বস, কখন এলে ?

জাফর—কাল সন্ধ্যায় এসেছি।

জাহেদ সাহেব—কোথায় উঠেছ ?

জাফর—ডাক বাংলায়।

জাহেদ সাহেব—ডাকবাংলায় উঠ্‌লে কেন, কারও সঙ্গে এসেছ বুঝি ?

জাফর—না, আমার এই বন্ধু দু'টি আমার সঙ্গে এসেছেন।

জাহেদ সাহেব—এই পথে অন্য কোথাও বেড়াতে যাচ্ছ তা হ'লে।

জাফর—না আপনার কাছেই এসেছি।

শুনে জাহেদ সাহেবের মুখ অধিকতর কালো হয়ে উঠল। অফিস-ঘরের কথোপকথনের মৃদু রেশ ভিতরের বারান্দায়ও পৌঁচোচ্ছিল। তাহেরার মা তখনও গোছলখানায়। তাহেরা বারান্দায় ইজিচেয়ারে

গা এলিয়ে দিয়ে কি একটা বই পড়ছিল। হঠাৎ অফিস-ঘরের মৃদু শব্দে সে সচকিত হয়ে উঠলো—শুধু সে নয় তার শিরা-উপশিরার সমস্ত রক্তস্রোতও বুঝি জেগে উঠলো। হস্তস্থিত খোলা বইটা সামনের তেপায়ার উপর রেখে সে কান খাড়া ক'রে ব'সলো। পরে স্যাণ্ডেল জোড়া সেখানে রেখে ধীরে ধীরে জানালার পর্দ্দার আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো।

জাফরের কথার উত্তরে জাহেদ সাহেব খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে কি যেন ভাবলেন; তারপর বলে উঠলেন—তবে এখানে না উঠে ডাক-বাংলায় উঠ্লে কেন? চাকরটাকে নিয়ে জিনিষপত্তরগুলো না হয় আনিয়ে নাও না।

জাফর—না, থাক্। আপনার সঙ্গে কথা শেষ হলে আমরা আজই ফিরে যাবো।

জাহেদ সাহেব—এঁরা তোমার সঙ্গে পড়েন বুঝি?

জাফর—হাঁ, এঁরা আমার বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু। এঁদের সামনে অসঙ্কোচে আলাপ করা যাবে, কিছুই গোপন করবার দরকার হবে না।

জাহেদ সাহেব—চা খাবে?

অত্যন্ত বিমর্ষমুখেও ভদ্রতা করতে হ'ল।

জাফর—না, এই মাত্র চা খেয়ে বেরোলাম।

জাফর গলা খাকারি দিয়ে কথাটা পাড়বে ভাব্‌ছে এমন সময় জাহেদ সাহেব বলে উঠ্‌লেন—পড়া-শোনা কেমন চলছে?

জাফর—ভালই। আপনার চিঠি পেয়েছিলাম।

জাহেদ সাহেব—তোমার বাবা মা কেমন আছেন?

জাফর—(হতাশভাবে)—ভালই।

তাড়াতাড়ি ঢোক গিলে আবার বলে উঠলো—আমি বল্‌ছিলাম বিয়েটা হলে এমন কি আর ক্ষতি হ'ত?

জাহেদ সাহেব—এসব ব্যাপার তোমার বাবার সঙ্গে আলাপ হলেই বোধ হয় ভালো হয়।

জাফর উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বেই তিনি আবার প্রশ্ন করলেন---প্র্যাক্‌টিস্ করবে, না চাকরী বাকরীর তদ্বির করবে ভেবেছ?

জাফর---আগে বি. সি. এস'টা দিয়ে দেখব, না হয় অগত্যা বার্ ত খোলাই রয়েছে।

জাহেদ সাহেবকে আর সুযোগ দিতে সে রাজী নয়, কাজেই সঙ্গে সঙ্গেই আবার ব'লে উঠলো---আমার মতে বিয়েটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, এর ভিতর বাপ-মাকে টেনে আনা উচিত নয়। কারণ, বৌ ত আমার জন্যই, বাবার জন্যে নয় যে, বাবা পছন্দ করবেন বা মতামত দেবেন?

জাহেদ সাহেব---দেখ আমরা সেকেলে লোক। (বড় অসহায় হয়েই তাঁকে এ-কথাটা স্বীকার করতে হ'ল, না হলে বন্ধু-মহলে প্রাণ গেলেও তিনি নিজেকে সেকেলে ব'লে স্বীকার করতেন না।) আমরা বিয়ে টিয়ের ব্যাপার মা-বাপের মধ্যে আলোচনা হওয়াই উচিত মনে করি।

জাফর---আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে, আপনার মেয়েও একেলে, আর যে তাকে বিয়ে করতে চাচ্ছে সেও একেলে; কাজেই একেলে ধরণেই তাদের বিয়ে হওয়া উচিত।

জাহেদ সাহেব---একেলে ধরণ মানে যদি এ-রকম বেহায়াপনা হয়, তবে তাকে আমি অন্তত প্রশ্রয় দিতে পারব না।

জাফর---জন্মের বিরুদ্ধে কিছু করবার আমাদের হাত ছিল না। কি করব আমরা একালে জন্মেছি কাজেই যত বেহায়াপনাই হউক না কেন, একালের ধরণধারণ আমাদের মেনে চলতেই হবে।

মনির---যদি অপরাধ না নেন জিজ্ঞাসা করি, সেকালের দোহাই দিয়ে কি আমরা একালের বিষাক্ত গ্যাস বা বোমার আতঙ্ক থেকে, অর্ডিন্যান্সের হাত থেকে, এমন কি বীমা-দালালের কবল থেকেও কি রক্ষা পাচ্ছি?

ওয়াহেদ---গাল জ্বালা করলেও কন্‌কনে শীতের মধ্যে ঘুম থেকে উঠে গালে ধারালো বা ভোঁতা যে রেজার বা ব্লেড থাকে তাই ঘষতে হয়---কেননা এটি একেলে সভ্য মানুষের একটা অভ্যাস। আপনি নিজেকে যতই সেকেলে বলুন একালের হাত থেকে কি নিজেকে বাঁচাতে পারেন? পারেন না।

জাফর—কাজেই মেয়ের বিয়ের ব্যাপারেও আপনাকে একেলে হতেই হবে।

এবার জাহেদ সাহেব বোধকরি নিজেকে আর কিছুতেই সামলাতে পারলেন না, উত্তেজিত কণ্ঠে ব'লে উঠ্লেন---অত কথা কাটাকাটীর কি দরকার, এম, এ আর ল' পড়ছ, এই সোজা কথাটা বুঝতে পার না : তোমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার আমার আদৌ ইচ্ছা নেই।

জাফর---আপনার ইচ্ছে না থাকলেই ত সমস্ত ব্যাপার ফুরিয়ে গেল না ; আমাদের বিয়ের ব্যাপারে আপনার বা আমার বাবা-মার ইচ্ছা অনিচ্ছা ত গৌণ ব্যাপার। এই ব্যাপারে তাহেরা ও আমার ইচ্ছা অনিচ্ছাই ত যাকে বলে deciding factor.

জাহেদ সাহেব---আমার কন্যা কিছুতেই আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবে না।

জাফর—এ কথা কি আপনি জেনেশুনে বলছেন?

জাহেদ সাহেব---জানার দরকার নেই, আমার মেয়ে আজন্ম কোনোদিন আমার মতের বিরুদ্ধাচরণ করেনি, আজ করবে?

জাফর---অন্য বিষয়ে না করতে পারে, কিন্তু বিয়েটা তার নিজস্ব ব্যাপার, এ-বিষয়ে পিতার অন্যায় রুলিং সে না-ও মান্‌তে পারে।

জাহেদ সাহেব---আমার মেয়েকে বোধ করি অন্যের চেয়ে আমিই ভালো জানি।

জাফর---সেটা সত্য না-ও হতে পারে। আধুনিক মেয়ের মন তার বাবা কেন, মা-ও জানে না। তাই, মেয়েদের স্বাভাবিক লজ্জা ও ভীরুতার সুযোগ নিয়ে আপনারা তাদেরে যেখানে সেখানে পাত্রস্থ ক'রে তাদের জীবনকে দুর্ব্বিসহ ও নিরানন্দ ক'রে রাখেন।

জাহেদ সাহেব---অত যুক্তি-প্রমাণ প্রয়োগ ক'রে কী লাভ? আমি ত বলেই দিয়েছি, তোমার হাতে আমি মেয়ে দেব না।

জাফর---মেয়ে যখন স্বয়ং আমার হাতে আসতে এ-রকম আগ্রহ দেখাচ্ছে, তখন আপনি কেন তাকে আমার হাতে দিতে আপত্তি করছেন

বুঝ্‌তে পারছি না। অথবা আপনার উচিত আমার অযোগ্যতা কোথায় তা আমাকে দেখিয়ে দেওয়া। আমার সার্টিফিকেটের কপিগুলি যদি আপনার কাছে বিশ্বাসযোগ্য না হয়ে থাকে বেশ যাচাই ক'রে নিন্‌—অরিজিন্যাল কপিগুলি আমার সঙ্গেই রয়েছে, মিলিয়ে দেখে নিন্‌। যৌবনের কিছুমাত্রও যদি আপনার দেহ-মনে অবশিষ্ট থাকত আর আপনি যদি নেহাৎ হৃদয়হীন না হতেন তা'হলে বুঝ্‌তে পারতেন, দুইটি যুবক-যুবতী পরস্পরকে ভালবেসে যদি বিবাহবদ্ধ হতে চায়, তাতে কিছুমাত্র অসম্মান নেই। তাদেরও না, তাদের পিতামাতারও না।

জাহেদ সাহেব—আমার মেয়ে তোমাকে ভালোবাসে এটা গাঁজাখুরী গল্প ছাড়া আর কিছুই না।

জাফর ধীরে ধীরে পকেট থেকে তাহেরার চিঠিখানি বের করলে, তারপর সেখানি সাম্‌নে খুলে ধরে বল্লে—হাতের লেখা বোধকরি চিন্‌তে পারেন?

হতভম্ব জাহেদ সাহেব মুহূর্তে বুঝি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে বস্‌লেন। চোখে তিনি ঝাপ্‌সা দেখ্‌তে লাগ্‌লেন, তাঁর চোখ-মুখ মরার মতো শাদা হয়ে গেল।

জাফর চিঠিখানি জাহেদ সাহেবের সাম্‌নে টেবিলের উপর রেখে দিয়ে বল্লে—পড়ে দেখুন, কোনো আপত্তি নেই, ওতে ভালোবাসার কথা ছাড়া অন্য কোনো আপত্তিকর কিছুই নেই। আপনি স্বচ্ছন্দে পড়ে দেখ্‌তে পারেন। আমার বিশ্বাস তাহেরাও এতে আপত্তি করবে না। অত্যন্ত অনিচ্ছায়, নেহাৎ বিমর্ষভাবে, খুব নিরানন্দ মনে অতি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জাহেদ সাহেব চিঠিখানি পড়ে গেলেন। তাঁর মনের অবস্থা যা হ'ল তা বর্ণনাতীত। কন্যার অপঘাত মৃত্যু-সংবাদেও বুঝি তিনি এতখানি আঘাত পেতেন না। ইচ্ছে হলো উঠে গিয়ে মেয়ের টুঁটি টিপে ধরেন—কিন্ত ভদ্র মানুষ নিরুপায়, মনের দারুণ রোষকেও ভদ্রতার আবরণে ঢেকে নিজের ভদ্রতা রক্ষা করতে হয়। আজন্ম ভদ্রতার আবেষ্টনে বর্দ্ধিত জাহেদ সাহেবের পক্ষে অপরিচিত লোকের সামনে বয়স্থা কন্যা নিয়ে হৈ চৈ ক'রে নিজের ইজ্জতের হানি করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

কাজেই দৈহিক ও স্নায়বিক সমস্ত উত্তেজনা তাঁকে নীরবে ম্লানমুখে সহ্য করে ভদ্রতা রক্ষা করতে হ'ল।

অনেকক্ষণ পরে তিনি ধীরে ধীরে নতমুখে বল্লেন—এ সব আমি কিছুই জানতাম না। কয়েকদিনের মধ্যেই আমি মন স্থির ক'রে তোমাকে চিঠি দিয়ে আমার মতামত জানাবো। আচ্ছা, আজ তা'হলে এসো, আমাকে এক্ষুণি একটু বের হতে হবে কি না।

জাফরেরা সালাম ক'রে বেরিয়ে যাওয়ার পর জাহেদ সাহেব ইজিচেয়ারে নিজেকে ঢেলে দিলেন, তাঁর দু'চোখের কোণায় দু'টী বৃহৎ অশ্রুফোঁটা চক্‌চক্ করে উঠল।

আট

যত বড় সর্ব্বনাশই আসুক না কেন, সেই সর্ব্বনাশের ভিতর দিয়েও ভদ্র মানুষকে ভদ্রতা বজায় রেখে বেঁচে থাকতে হয়---জীবনের দৈনন্দিন কর্তব্য পালন করতে হয়। জাফরকে কোনো প্রকারে বিদায় করেই জাহেদ সাহেব তাঁর ভাবী বেয়াইকে অর্থাৎ যার ছেলের সঙ্গে তাহেরার বিয়ের আলাপ চল্‌ছিল, তাঁকে চিঠি লিখে দিলেন---তাঁদের শর্তানুসারে অর্থাৎ জামাই হায়দর ইমামের বিলাত পড়াবার অর্দ্ধেক খরচ তিনি বহন করতে প্রস্তুত আছেন। দীর্ঘ ছুটী নিয়ে তিনি শিগ্‌গীর নিয়ার ইষ্ট্‌ ভ্রমণে বের হবেন ব'লে তাঁর ইচ্ছে: বিশেষ আড়ম্বর না ক'রে তাড়াতাড়ি সপ্তাহ খানেকের মধ্যে বিয়ের ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলা---তা-ও লিখ্‌লেন। হায়দর ইমামের পিতা আমজাদ ইমাম সাহেব জাহেদ সাহেবের চিঠি পেয়ে যেন হাতে চাঁদ পেলেন, কারণ ছেলের বিলেত যাওয়ার গোঁ তিনি কিছুতেই ছাড়াতে পারছিলেন না, অথচ তাঁর এমন অবস্থা নয় যে ছেলেকে অন্যের সহায়তা ছাড়া তিন বছর ধরে অক্সফোর্ডে রাখ্‌তে পারেন। কাজেই সেদিনই রাত্রের ট্রেণে তিনি খুলনার উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

জাহেদ সাহেবের সঙ্গে আলাপ ক'রে আগামী শুক্রবার বিয়ের দিন ধার্য্য করে পাকা কথা দিয়ে তিনি পরদিন তাঁর কর্ম্মস্থানে ফিরে এলেন।

শুক্রবার বাদ্ জুমা জাহেদ সাহেবের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন একে একে এসে উপস্থিত হ'ল, তাঁর বাইরের ঘরটী সুচারুরূপে সজ্জিত করা হয়েছে। তিনটার গাড়ীতে বরযাত্রীদলও এসে পড়ল। ঠিক হ'ল সন্ধ্যার পর বিয়ের শাস্ত্রীয় ক্রিয়াটা শেষ ক'রে নিয়ে তারপর খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা যাবে। সন্ধার পর মৌলবী সাহেব আস্‌লেই বিয়ে পড়াবার যোগাড় হ'ল। মৌলবী সাহেব মেয়ে সাবালিকা শুনে মেয়ের দু'জন আত্মীয়কে মেয়ে এই বিয়েতে সম্মত আছে কি না জানবার জন্যে অন্দরে পাঠিয়ে দিলেন। তা'রা এসে পরস্পর চোখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রে যেই বলেছে 'মেয়ে রাজী আছে', অমনি দরজার ভিড় ঠেলে জাফরও

সঙ্গে সঙ্গে আরও চার পাঁচজন যুবক ঘরে ঢুকে পড়ল। জাফর ত একরকম বাইর থেকেই চেঁচিয়ে উঠল---জনাব, সাক্ষীরা মিথ্যা কথা বল্‌ছে, এই বিয়েতে পাত্রী রাজী নেই।

এই অপ্রত্যাশিত কাণ্ডে ঘরের সমস্ত লোক বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল, জাহেদ সাহেবের মুখ লজ্জায় এতটুকুন্‌,—তাঁর মুখে কোনো কথাই যেন যোগাল না, তিনি মুখ নীচু ক'রে বসে রইলেন। অনেকে হৈ চৈ ক'রে উঠলেও নিছক ভদ্রতার খাতিরে তিনি হৈ চৈ-ও করলেন না। হয়ত সর্বসমক্ষে এই লজ্জার গুরুভার তাঁকে সামান্য উত্তেজিত হতেও দিলে না। কে একজন জিজ্ঞাসা করলে—আপনি কে?

জাফর বিস্মিত হয়ে বল্লে—আমাকে চেনেন না।

সঙ্গীদের উদ্দেশ ক'রে বল্লে---এই, ব'লে দে না, আমি কে? মনির---এর নাম জান্‌তে চান, না পরিচয়?

পূর্বোক্ত ভদ্রলোক—নাম এবং পরিচয় দুই জানালে উপকৃত হ'ব।

মনির—ইনি স্বনামধন্য মিঃ জাফর হোসেন, ইনি সুবিখ্যাত 'নিখিল ভারত অগ্রসর সংঘের' সভাপতি।

পূর্বোক্ত ভদ্রলোক---তা আপনি কি ক'রে জানেন যে এই বিয়েতে মেয়ে রাজী নেই?

জাফর---আমি যে জানি সে-বিষয়ে আপনার সন্দেহ থাকতে পারে, কিন্তু পাত্রীর বাবার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। থাকলে এই প্রশ্ন আপনি না ক'রে তিনিই করতেন।

কেউ কেউ ভাবলে মাথা খারাপ, কেউ ভাবলে মাথায় ছিট আছে একটু পরেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। তাই তা'রা গরম না হয়ে বরং নরম সুরেই বল্লে---আপনি বসুন, আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আপনার মতো বিখ্যাত লোক আজ এখানে উপস্থিত হয়েছেন। আচ্ছা, আগে বিয়েটা হয়ে যাক, পরে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে আপনার সঙ্গে আলাপ করা যাবে।

জাফর—আপনি ত বেশ লোক দেখছি; ইসলামের বিধান হ'ল সাবালিকা মেয়ের সম্মতি নিয়েই তার বিয়ে দিতে হবে, আর আপনারা সব মুসলমান হয়েও এক সাবালিকা মেয়ের মতের বিরুদ্ধে বিয়ে দেবেন, আর

আমরা তা চুপ করে সহ্য করব, এ কি ক'রে আপনারা আশা করেন? আমরা অগ্রসর আন্দোলন করছি কি শুধু লোক দেখাবার জন্যে?

বরও ত কলেজে পড়া ছেলে, বিশেষত বিলাতের খেয়ালে মাথা রয়েছে ভরপুর, কাজেই তারও রক্ত উষ্ণ হতে বেশী দেরী লাগবার কথা নয়।

হায়দার ইমাম আর কিছুতেই চুপ করে থাক্‌তে পারলে না, বল্লে—আপনি দয়া ক'রে আপনার অগ্রসর-আন্দোলন বাইরে প্রশস্ত মাঠে গিয়েই করুন; ঘরের ভিতর স্থান এত সঙ্কীর্ণ যে বেশী অগ্রসর হ'তে গেলেই দেওয়ালে ঠোক্কর খাবেন।

বরের কথায় সকলে হো হো ক'রে হেসে উঠল।

জাফর কিন্তু দমবার পাত্র নয়, সে ব'লে উঠল—বাইরে আপনাকেই যেতে হবে। পরের টাকায় বিলেত যাওয়ার সঙ্কল্প ত করেছেন, একটা মেয়েকে তার বিনা সম্মতিতে বিয়ে করতে লজ্জা হয় না? সেখানকার মেয়েরা শুন্‌লে যে শেম্‌ শেম্‌ করবে।

বর—আরও কিছুদিন ভদ্রতা শিখে তবে কথা বলতে আসবেন। আপনি কি ক'রে জানেন যে বিনা সম্মতিতে বিয়ে করতে যাচ্ছি?

জাফর—আমি জানি না ত কে জানে? এই দেখুন। বলে, জেব থেকে সে এক চিঠি বে'র ক'রে দেখালে, আজকের ডাকেই পেয়েছি, আপনার জন্য তাহেরার ঘুম হচ্ছে না কিনা তাই লিখেছে: 'শুক্রবার আমাকে বলি দেবার ব্যবস্থা হয়েছে—বাঁচান।'

শুনে উপস্থিত সকলে পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগল। জাহেদ সাহেবের ইচ্ছা হ'ল, এই মুহূর্তে যদি ধরণী দ্বিধা হয় তিনি পরম নিশ্চিন্তে তাতে ঢুকে পড়বেন।

জাফর—আর এই চিঠি জাল বা মিথ্যা ব'লে যদি আপনাদের সন্দেহ হয়, তবে তাহেরা ত এখানেই রয়েছে তাকে ডেকে বরং আপনারা জিজ্ঞেস্‌ করতে পারেন।

মৌলবী সাহেবকে লক্ষ্য ক'রে সে আবার বল্লে—আচ্ছা মওলানা সাহেব, সাবালিকা মেয়ের বিয়ে তার সম্মতি ছাড়া কি জায়েজ?

মৌলবী সাহেব—না। তা কি ক'রে হয়? এ যে শরীয়তের হুকুম।

জাফর—দেখ্‌লেন তো হায়দার সাহেব? আমাকে ধন্যবাদ দিন যে আপনাকে এত বড় গোনাহ্‌র কাজ থেকে বাঁচিয়েছি।

ওয়াহেদ—শুধু ধন্যবাদ দিলে চলবে না, ভালো ক'রে খাইয়েও দিতে হ'বে।

মৌলবী সাহেব বরের দিকে তাকিয়ে বল্লেন—এখন কী করা যায়?

বর উত্তর দেবার পূর্বেই জাফর ব'লে উঠলো—কেন? বিয়ে পড়াবেন। বিয়ে আজ হ'তেই হ'বে।

মৌলবী সাহেব—মেয়ে রাজী না হ'লে কি ক'রে বিয়ে হবে?

জাফর—মেয়ে যার সঙ্গে রাজী আছে তার সঙ্গে বিয়ে হ'তে ত কোনো আপত্তি নেই। সে ভদ্রলোক ত আপনার সামনেই দাঁড়িয়ে।

মনির চেঁচিয়ে উঠলো—বসে পড় হে, কাঁহাতক আর দাঁড়িয়ে থাকা যায়। ওঁরা ভদ্রতা ক'রে বসতে না-ই বা বল্লেন, আমাদের ত অন্ততঃ নিজের ভদ্রতায় বসে পড়তে হয়।

জাফর মৌলবী সাহেবের সাম্‌নে এগিয়ে এসে' বরকে উদ্দেশ্য ক'রে বল্‌লো—কাইগুলী একটু সরে বসুন তো, কিছু মনে করবেন না।

শিক্ষিত ভদ্র বর, বিলাত যাওয়ার প্রাক্কালে অন্তত কাইগুলীর মর্য্যাদা না রাখলে লোকে বলবে কি? কাজেই বর একটু সরে বসলো। জাফর কিছুমাত্র দেরী না ক'রে বরের পরিত্যক্ত আসনে বসে পড়লো। তার সঙ্গীরাও আশে-পাশে আসন পেতে বসলো।

জাফর—মৌলবী সাহেব, তাড়াতাড়ি বিয়েটা পড়িয়ে দিন। আমাদের দশটায় গাড়ী ধরতেই হ'বে। বন্ধুরা গাড়ী নিয়ে শিয়ালদ' অপেক্ষা করবেন।

মৌলবী সাহেবকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে' জাফর আবার ব'লে উঠলো—পাত্রী যে সর্বান্তঃকরণে রাজী তাতে যদি কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে

তবে এই চিঠিগুলি পড়ে দেখুন।---এই ব'লে সে তাহেরার সব চিঠিগুলি উপস্থিত মজলিসের সাম্‌নে রাখলে।

মৌলবী সাহেব---চিঠির সম্মতিতে বিয়ে জায়েজ হবে কিনা ভাব্‌ছি।

জাফর---ভাব্‌বার কি দরকার? তাহেরা নিজের মুখে বল্লে জায়েজ হ'বে তো?---সঙ্গে সঙ্গে সে 'তাহেরা, তাহেরা, তা---'ব'লে চেঁচিয়ে ডাক্‌তে লাগ্‌লো। পর্দার অন্তরালে চুড়ির মৃদু রিণিঝিণি শব্দ শোনা গেল। বরের ধৈর্য্যের বাঁধ এবার বুঝি ভাঙল। রীষ্ট ওয়াচটার দিকে চোখ রেখে বর ব'লে উঠলো---আপনার বিরুদ্ধে আমি ডিফামেশন আনবো।

জাফর---জাহেদ সাহেবের পয়সায় তো?

বর---আপনাকে পুলিশে দেওয়া উচিত।

শিক্ষিত মার্জিত ভদ্র বর, তার বেশী আর কি বলতে পারে? মধ্যযুগ হ'লে না হয় ডুয়েল লড়ার প্রশ্ন উঠ্‌তে পারত। আধুনিক যুগের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিরোধ ও দুঃখ বড় নিরীহ। আধুনিক যুগে জন্মগ্রহণের এই হয় তো একটা সুবিধা!

জাফর---আপনারাই তো এইমাত্র বে-আইনী কাজ ক'রে পুলিশে যাওয়ার পথ পরিষ্কার করছিলেন, ভাগ্যে আমি এসে পড়েছিলাম। সেকথা যাক্, আমার মনে হয় এখন সব চেয়ে উত্তম ব্যবস্থা---Forgive & Forget.

এবার পর্দার দিকে তাকিয়ে জাফর বল্লে---তাহেরা এসেছো?

মৃদু উত্তর ভেসে এল---হুঁ।

জাফর---সবই ত শুনেছো, এখন আমার সঙ্গে বিয়েতে রাজী আছ তো? তোমার বয়স হয়েছে, তুমি লেখা পড়া শিখেছ, তোমার বুদ্ধি ও মননশক্তি অসাধারণ, কাজেই আশা করি কোনো-প্রকার লজ্জা সঙ্কোচ ও ভয় না ক'রেই তুমি তোমার মতামত জানাবে।

তাহেরা---আমি সর্বান্তঃকরণে সম্মত আছি।

জাফর---পর্দার ভিতরে থেকে তুমি কথা বলছ না অন্য কেউ বলছে তা এঁরা কি ক'রে বুঝ্‌বেন? এঁদের মনে সন্দেহ হ'তে পারে তো!

কাজেই সামনে এসেই তোমার মতামত জানানো ভালো।—উপস্থিত নব্য-পন্থীদের মধ্যেও কেউ কেউ জাফরের কথায় সায় দিলে। তবুও তাহেরা দেরী করছে দেখে জাফর আবার ব'লে উঠল: বিয়ের ব্যাপারে কিছুই ত লজ্জা করবার নেই রাণী, নরনারীর সম্পর্ক পৃথিবীতে চিরকাল ধরে আছে এবং চিরকাল ধরেই থাক্‌বে। এমন কি, স্বর্গ থেকেও তা বাদ দেওয়া সম্ভব হয়নি, কারণ স্বর্গের কল্পনাকারীরাও বেশ জানে ঐটী বাদ দিলে স্বর্গের লোভে কেউ একটি মাছিও তাড়াবে না। কাজেই আমার বিশ্বাস: নেহাৎ মরাল কারেজের অভাবেই মানুষ এ ব্যাপারে সঙ্কোচ করে থাকে। প্রকৃতিতে কি কোন সঙ্কোচ আছে? তদুপরি অগ্রসর-দলের ভাবী নেত্রীর পক্ষে মরাল কারেজের কিছুমাত্র অভাব শোভা পায় না। এসো।

তাহেরা পর্দা সরিয়ে ধীরে ধীরে প্রবেশ ক'রে জানালে, সে সম্মত আছে। তাহেরার অকম্প্র ও অসঙ্কোচ কণ্ঠস্বর তরুণ শ্রোতাদের মুগ্ধ করলো। কিন্তু সেই কণ্ঠস্বর জাহেদ সাহেবের কর্ণরন্ধ্রে গলিত অগ্নি-স্রাবের মতো প্রবেশ ক'রে তাঁর রক্তে রক্তে আগুন ধরিয়ে দিলে। তবুও নিরুপায় তিনি। এক চড়ে এই বেহায়া মেয়ের মুখ তিনি মূক ক'রে দিতে পারেন, জাফরকে ইচ্ছা করলে তিনি এই মুহূর্তে পুলিশে সোপর্দ করতে পারেন। কিন্তু উচচশিক্ষিত মার্জিত ভদ্রলোক তিনি—তাঁর পক্ষে নিজের মেয়েকে কেন্দ্র ক'রে একটা হৈ চৈ বাধিয়ে রাস্তার লোককে ঘরে এনে জড় করা সম্ভব নয়। তাঁর মেয়েকে নিয়ে কানে কানে একটা অপ্রীতিকর কানাকানির সুযোগ ত তিনি লোককে দিতে পারেন না!

বিয়ে পড়ানো শেষ হতেই জাফর তাহেরাকে বল্লে—চল, বাইরে মোটর দাঁড়িয়ে আছে। হাত-ঘড়ির দিকে দৃষ্টিক্ষেপ ক'রে অত্যন্ত ব্যস্ত হ'য়ে ফের বল্লে: মাত্র আধ ঘণ্টা সময়, জিনিষ-পত্তর বাজে লট-বহর নিয়ে কী হবে? জীবনের নতুন অধ্যায় একেবারে নতুন জিনিষ-পত্তর দিয়েই আরম্ভ করা ভালো। এসো, মাকে সালাম ক'রে এসেছ ত? চল, বাবাকেও সালাম ক'রে নে'য়া যাক্।—তাহেরা ও জাফর জাহেদ সাহেবের কাছে গিয়ে তাঁর পায়ে হাত দিতেই তিনি পা সরিয়ে নিলেন না

বটে কিন্তু মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলেন। বজ্রাহত বনস্পতির মতো তাঁর সেই শাদা ফ্যাকাশে মুখ থেকে কন্যা-জামাতার উদ্দেশে আশীর্বাদ বেরুল না অভিশাপ, তা একমাত্র তাঁর অন্তর্যামীই জানেন।

জাফর বেরিয়ে যাওয়ার পূর্বে হায়দরের হাত নিজের হাতে নিয়ে জোরে ঝাঁকানি দিয়ে বল্লে—নেভার মাইণ্ড। অত বিমর্ষ হ'লে চলবে কেন, চিয়ার আপ ইয়ং ম্যান! জীবনে এ-রকম কত নৈরাশ্যই ত আসবে, সে-সবকে জিইয়ে রেখে চিরস্থায়ী ক'রে রাখলে ত জীবন চলে না। নৈরাশ্য ও দুঃখকে পরমুহূর্তে ভুলে গিয়ে নতুন আশায় নীড় বাঁধতে হয়, এবং একেই ত ব'লে মানব-জীবন। হাওড়া থেকে কখন রওয়ানা দিচ্ছেন জানাবেন, যদি পারি তাহেরাকে নিয়ে আপনাকে 'ভন্ ভয়েজ' জানিয়ে আসব। আচ্ছা!—আর একটা ঝাঁকানি দিয়ে বল্লেঃ গুড বাই। অন্য সকলকে "আদাব, আদাব, আসি তা'হলে" ব'লে তাহেরার হাত ধরে উভয়ে বাইরে দণ্ডায়মান মোটরে গিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তার বন্ধুরা, হয়ত সেই সঙ্গে উপস্থিত তরুণ দলও "থ্রি চিয়ার্স ফর আওয়ার প্রেসিডেণ্ট এণ্ড হিজ ব্রাইড্, হিপ্ হিপ্ হুররে" ব'লে চেঁচিয়ে উঠল। সেই বিপুল 'হিপ্ হিপ্ হুররে' ধ্বনির মধ্যে মোটর ষ্টেশন-অভিমুখে ছুটে চল্ল।

প্রদীপ ও পতঙ্গ

প্রথম অধ্যায়

জোহরার কথা

রশিদ এম্‌. এ. পাশ করিয়া মনে করিতেছে, এম. এ. ডিগ্রীর সাথে সাথে তাহার লেখক হওয়ারও অধিকার জন্মিয়াছে। বিদেশী কাগজে সোস্যালিজমের ইংরাজী প্রবন্ধ পড়িয়া বাংলা সাপ্তাহিকে তাহার বুলি কপচাইলে হাটে-বাজারে সাহিত্যিক বলিয়া পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে বটে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এই করিয়া যে সত্যই সাহিত্যিক হওয়া যায় না, এই কথা এম্‌. এ. ডিগ্রীও তাহাকে শিক্ষা দিতে পারে নাই।—তাহার এই পরিচয়ের সুযোগ লইয়া সে নাকি কলিকাতায় আমার বন্ধুমহলে আমার খুব বদনাম করিয়া বেড়াইতেছে। এমন কি, সে নাকি আমার চরিত্রের উপর পর্য্যন্ত কটাক্ষ হানিয়াছে। বলিতেছেঃ আমি না-কি কওসরের সঙ্গে প্রেম...। এ-রকম অপবাদ শুনিলে কোন্‌ মেয়ের না রাগ হয়? রাগ আমারও হইয়াছিল। রাগিয়া আমিও প্রায় তাহাকে গালাগালি দিয়া বসিয়াছিলাম আর কি। পরক্ষণে ভাবিলামঃ এ-রকম পরনিন্দা-সম্বল করুণার পাত্রকে গালি দিয়া কী হইবে? তবে, তাহার ইতিহাসটা একবার বাজারে প্রকাশ করিয়া দিব না কি? থাক্‌। পরনিন্দা করিয়া মুখ খারাপ করিতে চাহি না। আমি প্রেম করিয়াছি, বেশ করিয়াছি, হাজার বার করিব, তাহাতে তাহার মাথা-ব্যথা কেন? সে কি আজ ভুলিয়া গিয়াছে, আমার ঘরের চারিদিকে কয় দিন কয় মাস কয় বৎসর সে মাছির মতো ভন্‌ ভন্‌ করিয়া ফিরিয়াছে? আমার মুখের এক-টুক্‌রা কথার জন্য, একখানি হাসির জন্য কত দিন কত রাত্রি সে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া কাটাইয়াছে? কতবার আমার কাশিকে হাসি মনে করিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে? আমাদের বাসায় আমার দূর-সম্পর্কীয় যে আত্মীয় বালকটি থাকিত, তাহার বয়স মাত্র দশ বছর হওয়া সত্ত্বেও,

বি. এ. ক্লাসের ছেলে হইয়াও কেন তাহার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাইতে সে লজ্জা বোধ করে নাই? বন্ধুর অজুহাতে সপ্তাহে সপ্তাহে তাহার উপঢৌকনের ডালি যে ঊর্দ্ধমুখী স্তূপশীর্ষকে আমাদের টেবিলের উপর বহিয়া নিয়া আসিত, তার উচ্চতার লক্ষ্য কি আমাদের সেই আত্মীয় বালকটি, না আমা হেন ব্যক্তিটি?

আজকালকার আধুনিকাদের এক নতুন ঢং,—তাঁরা সব সহিতে পারেন কিন্তু বিয়ে সহিতে পারেন না। লেখা শিখিলাম, পড়া শিখিলাম, মেট্রিক ও আই.এ.-র সিঁড়ি ডিঙাইলাম, বি. এ.তে চোখ-ধাঁধানো লাফ্ দিলাম, গর্ভের সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হইলেই এম. এ.র জন্য তৈয়ারী হইব ইচ্ছা আছে। বাসা হইতে গাড়িতে উঠিতে বোরকা পরিলেও গাড়ী হইতে কলেজে ঢুকিতে বোরকা গাড়ীতেই ফেলিয়া যাইতাম। কাজেই আধুনিকা না হইয়া উপায় কোথায়? কিন্তু বিবাহ না করিয়া আধুনিকতা করা আমার ধাতে পোষাইবে না। তবে ব্যাপারটা এই, তথাকথিত আধুনিকা বান্ধবীদের হইতে কিছুকাল গোপন রাখিতে হইবে। অশিক্ষিতাদের নিন্দা সহ্য করা যায়, সে বড় জোর চুপি চুপি দুই চার জনে মিলিয়া আমার ও আমার স্বামীর নিন্দা করিয়া পান ও অবসর ধ্বংস করিবেন, এই ত? কিন্তু শিক্ষিতারা ত কোন আবরু রাখিবেন না, একেবারে সংবাদপত্রের সদর রাস্তায় আসিয়া চুলোচুলি শুরু করিয়া দিবেন। তাঁহারা না হয় লজ্জা-শরমের মাথা খাইয়া বসিয়াছে, কিন্তু আমি, যে অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পর ভাশুর জানিতে পারিবেন লজ্জায় এখানে আমাদের বাগান-বাড়িতে আসিয়া দিন কাটাইতেছি, তাহা ত করিতে পারি না। পারিলে...।

যাক্, এই হতভাগ্য বিশ্বনিন্দুককে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে কেন যে নুন্ খাওয়াইয়া শেষ করিয়া দেওয়া হয় নাই, এই আশ্চর্য্য মানি! পূজনীয়া সাহিত্য-সম্রাজ্ঞীরা যে ইহাদিগকে আতুর-ঘরে নুন্ খাওয়াইয়া হত্যা করিবার সুপরামর্ষ দিয়াছেন, মায়ামুগ্ধ স্নেহ-দুর্বল জননীরা কি এ-সব শুনিবেন? ছেলে যত বড় অপদার্থই হউক, এই অপদার্থা জননীগুলি ছেলের মুখ দেখিয়াই একেবারে মূর্চ্ছা যান্। আর ছেলেগুলিও দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিতে না উঠিতেই শুরু করিয়া দেন—ব্যথা, ব্যথা। তাহাদের

কথায় ব্যথা, লেখায় ব্যথা, মুহূর্তে মুহূর্তে দরদ, বেদনা। গদ্যে পদ্যে কোথাও চোখ দিবার উপায় নাই, খালি ব্যথা, ব্যথা। কচি খোকারা প্রথমতঃ আধ্যাত্মিকতা চর্চা করিতে গিয়া মা-বাপ-ছাড়া এতিম বিধাতার উপর কিছুকাল হাত মশ্‌ক করেন, তারপর হাত একটু পোক্ত হইলেই শুরু করেন—ব্যথা, বেদনা, দরদ। বাংলা সাহিত্য শেষকালে দেখিতেছি হতাশপ্রেমিকের আড্ডায় পরিণত হইল। শরৎচন্দ্র কথায় কথায় কাঁদিয়া হয়রাণ হইয়াছেন, তরুণরাও চোখে তৈল দিয়া তা শুরু করিয়াছে। এই সেই দিনের খোকা রশিদ পদ্যে ব্যথার হাম্বারব ছাড়িয়াও যেন তৃপ্ত হয় নাই—'ব্যথার কাহিনী' বলিয়া এক বিরাট উপন্যাস শেষ করিয়া ফেলিয়াছে। একদিন ত সে কি এক বিরাট ভ'ল্যুম আমাকেই শুনাইতে বসিয়া গেল। খোকার কচি মুখের কাকুতি দেখিয়া অস্বীকার করিতে পারি নাই। সে কী ব্যথা রে বাবা! কতক্ষণ শোনার পর আমার কান ও মন ব্যথায় ত্রাহি ত্রাহি করিয়া উঠিল। মনে হইল, এই বই যদি কেউ হিমালয়ের পাদদেশে বসিয়া একবার পড়িতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে পাষাণ হিমাচল নিশ্চয়ই গলিয়া জল হইয়া যাইবে। এই সেদিনের খোকা রশিদ, সে চায় আমার সঙ্গে প্রেম করিতে; এবং সাহিত্যে কিছুদিন বে-পরওয়া ব্যথার অভিযান চালাইয়া মনে করিতেছে, আমার সঙ্গে প্রেম করিবার তাহার যোগ্যতা জন্মিয়াছে। খোকাকে বলিয়া রাখি, গদ্যে পদ্যে কিছুখানিক ব্যথার বাষ্প ছড়াইতে পারিলেই একটি মেয়ের—কিছুমাত্র আত্মপ্রশংসা না করিয়াও যে-মেয়েকে সুশিক্ষিতা ও সুন্দরী বলা যায়—দেহ মনের উত্তরাধিকারী হওয়া যায় না। যে-কওসরের নামের সঙ্গে আমার নাম জড়াইয়া সে কলিকাতার বাজারে বাজারে আমার বদনাম করিয়া ফিরিতেছে, সে কওসর অন্ততঃ ইউনিভার্সিটী এনুয়াল স্পোর্টস্ প্রতিযোগিতায় কান্‌ট্রি ক্রস রেসে ফার্স্ট হইয়াছে, আট শ' আশী গজ দৌড়ে সেকেণ্ড হইয়াছে, হার্ডল্‌স্‌এ থার্ড হইয়াছে। আর শ্রীমানকে ত সে-দিন দেখিয়াছি চোখে চশমা আঁটিয়া, টাইটুই টাঙাইয়া, বাট্‌ন্‌ হোলে ফুল লাগাইয়া মেয়েদের গ্যালারীর সামনে অনাবশ্যক ঘোরাফেরা করিতে। শ্রীমানকে বলিয়া রাখি, শুধু ফুলবাবু সাজিয়া চোখ মারিলেই মেয়েদের মন ধড়ফড় করিয়া ওঠে না। কওসর এম.

এ. তে ফার্ষ্ট ক্লাস পাইয়াছে---কিন্তু শ্রীমান ত থার্ড ক্লাস। থার্ড ক্লাসে আজকাল মাষ্টারীও জোটে না। আর তিনি চান বরমাল্যও! শ্রীমানের মতো অত অধঃপাতে যাই নাই যে, বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার উপমা দিয়া পরনিন্দা করিব। না হয়, কে না জানে শ্রীমানের ইতিহাস—সেই যে পড়াশোনার নামে কলেজে যাওয়া-আসার সময় ঢাকার কোন্ এক বাড়িতে থাকা হইত, সে-বাড়ির একটি চাকরাণীর সহিত শ্রীমান এমন এক কাণ্ড করিয়া বসিল যাহা কয়েক মাসের মধ্যেই হাতে-কলমে একেবারে লজ্জার বিষয় হইয়া উঠিল। শ্রীমানের পলায়নের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। একরকম জোর করিয়াই খাজা সাহেব নিজেই কলমা পড়াইয়া দিয়া ব্যাপারটিকে একেবারে হালাল করিয়া দিলেন। যাক্; পরনিন্দা করা নাকি ভালো নয়। সাহিত্যিকের গলায় যদি বরমাল্য দিই, তবে রশিদের মতো এমন চুনোপুটির গলায় দিব কোন্ দুঃখে। বাংলাদেশের ছোট বড় বহু সাহিত্যিকই ত এই জোহরার পায়ে পায়ে ঘুরিয়াছে; আমার ঠোঁট একটু ফাঁক হইতে না হইতেই তাহারা সারা গালে হাসি ছড়াইয়া দিয়াছে; আমার ফটো দেখিয়া কবিতা লিখিয়াছে—এমন একাধিক কবির নাম করিতে পারি। যখন সবে মাত্র আই. এ. পাশ করিয়া সারিয়াছি,—জীবনে কোন বাধা নাই, কোন বন্ধন নাই, আকাশের পাখীর মতো বল্গাহারা মুক্ত-জীবন, হাওয়ায় ফর্‌ফর্ করিয়া ফিরিতেছি, মাটির উপর কখনো পা রাখিয়া পথ চলিয়াছি মনে পড়ে না, তখন এই রশীদের পীর, যিনি বঙ্গকাব্য-সিংহাসনের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী, আমাকে অভিনন্দিত তথা তোষামোদ করিয়া কবিতার পর কবিতা রচনা করিয়াছেন। শুধু কি তিনি? সেই যে 'ভগ্নবীণা'র কবি মিঞা মহব্বৎ আলী, যিনি প্রেয়সীকে বিবাহ করার চেয়ে হরণ করাকেই প্রেমের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ মনে করেন, আ-রে সেই ফ্যাঁকাসে ভদ্রলোক আর কি—যাঁর ফিলজফী হইতেছেঃ মানুষের অবনতিতেই মানুষের উন্নতি এবং ইহাকে সুযোগ বুঝিলেই যিনি সোসিওলজী বলিয়াও চালাইয়া দেন, তিনিও কি কম করিয়াছেন? আর কিছুদিন এই রকম করিলে ভারতবর্ষের ডাক-বিভাগের ঘাট্‌তি কমিয়া যাইত। আর একজন ভদ্রলোক, নাম বলিবার দরকার নাই, তবে সকলেই

জানেন, তাঁর ধারণা: তিনি জীবন-আলেখ্যের সুনিপুণ শিল্পী এবং তাঁর ফিলজফী হইতেছে—'গড়ের মাঠই ভারতবাসীর মনুষ্যত্বের বিচার-গাহ'। তাঁর অনুনয়-বিনয়ের কান্না নীল কাগজে সবুজ খামের ভিতর এখনো আমার টেবিলের উপর এক গাদা পড়িয়া আছে। আর, কবি সাধু মিঞার কথা কী বলিব? তিনি দেখিতে শ্রীকৃষ্ণের ভায়রা-ভাই হইলেও মনটি তাঁহার কচুরী পানার মতো চিরতাজা ব-তাজা। একবার ছোটকালে শ্মশানে তাঁর বাঁশী শুনিয়া শ্রীরাধা নাকি তাঁর কপোল চুম্বন করিয়া বলিয়াছিলেন, 'কালা আমার, তুমি বি.এ. ফেল করিবার আগে তোমার কবিতা এম. এ.র পাঠ্য হইবে।' সাধু মিঞার ধারণা, কাব্য জগতে তাঁহার তুলনা—পশ্চিমে দিনান্‌জিও আর পূর্ব্বে তিনি স্বয়ং। এই কবির সদ্য প্রকাশিত 'কচু-খেত' নামক কাব্য-গ্রন্থের তিন-চতুর্থাংশ কবিতা ত আমাকে নিয়াই লেখা! ইঁহাদের ন্যাকামি তবুও কানে তুলা দিয়া হইলেও বরদাশ্‌ত করা যায়; কিন্তু বিজ্ঞাপন-জগতে শিশু-সাহিত্যের যাদুকর নামে পরিচিত বিখ্যাত গহ্বর মিঞার কথা মনে লইলে হাসিও পায়, কান্নাও আসে।—ইনি এখন 'হনুমান' কাগজের দপ্তরীর কাজ ছাড়িয়া দিয়া নিজে মনুমেণ্টের আড়ালে দাঁড়াইয়া থাকেন, আর কচি বৌকে গড়ের মাঠে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত আরামে নিজের নামের ঢোল-শহরত শুনিয়া দিন্‌কে রাত এবং রাতকে দিন করিতেছেন। এ কথা কে না জানে যে, তিনরঙা একখানি কাগজ হাতে লইয়া গড়ের মাঠে দাঁড়াইলেই ইণ্ডিপেনডেন্স-ডে করা হয়; আর করিলেই পুলিশ জেলে লইয়া যায়, ইহাতে আর বিচিত্র কি। বৌকে জেলে পাঠাইয়া সেই সার্টিফিকেটের জোরে তিনি মৌমাছির মতো যত্র-তত্র ভন্‌ ভন্‌ করিয়া ফিরিতেছেন এবং সেই একঘেয়ে ভনভনানীতে আমার কান পর্য্যন্ত ঝালাপালা করিয়া তুলিয়াছেন। আরো কত বিশ্ববিখ্যাত (উপরে যাঁহাদের পরিচয় উল্লিখিত হইয়াছে তাঁহারা যে বিশ্ববিখ্যাত এই বিষয়ে অন্যের সন্দেহ থাকিলেও তাঁহাদের নাই।) সাহিত্যিকের সজল নেত্র আমার জানালায় জানালায় কাকুতি জানাইয়া গেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সেদিনও ত আমাদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ঔপন্যাসিক, ইস্‌লাম-জগতের একচ্ছত্র কাব্য-সম্রাট, যিনি সাহিত্যের অলিতে-গলিতে যত্র-তত্র মুসলমান নায়ক

ও হিন্দুনায়িকা প্রবেশ করাইতে পারিলেই যে এই দেশের সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে এই বৃহত্তর ফিলজফীর প্রচারক, এবং যাঁর সুস্পষ্ট ধারণা যে, মুসলমান বলিয়াই তিনি এতদিন নোবেল প্রাইজ পান নাই, তিনি দাঁতভাঙা কবিতায় চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, যাহা পড়িতে আমার তিন গ্লাস জল শেষ করিতে হইয়াছে। ইঁহাদের কাছে তুচ্ছ রশিদ, যার সাহিত্য-খ্যাতি এখনো সাপ্তাহিকের সীমা ডিঙাইয়া মাসিকে প্রবেশ করিতে পারিল না, যে একটি অসহায় নারীর সর্ব্বনাশ করিতে ইতস্তত করে নাই। আহা, সেই হতভাগিনীর কথা মনে হইলে এখনো আমার চোখে জল ভরিয়া আসে।

কী নিদারুণ দুঃখেই না রাবেয়াকে তাহার ক্ষুধার ইন্ধন জোগাইতে গিয়া জীবনের কঠোরতম দেনা শোধ করিতে হইল। তাহার সামান্য ভুলের শাস্তি বিধাতা এবং মানুষ এমনভাবে দিল যে, তাহার আর সংসারে মুখ দেখাইবার পথ রহিল না। অথচ তার এই দুঃখের জন্য দায়ী যে, সে ত কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় একজন সাধ্বী সতীর বদনাম করিয়া ফিরিতেছে,—নিজের কৃতকর্ম্মের জন্য এতটুকু সঙ্কোচ এতটুকু লজ্জা তাহার দেখাইতে হয় না!—রাবেয়ার ছেলেটি হওয়ার দিন কয়েক পরেই রশিদ গোপনে পলাইয়া সেই যে কলিকাতায় না কোথায় চলিয়া গিয়াছে, আর ফিরিয়া আসে নাই। খাজা সাহেব দূরদর্শী লোক, একবার যে পাপ করিতে পারে সে যে আবারও করিতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি রাবেয়াকে তাঁহার বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলেন। হতভাগিনী বুঝি কারও কাছে শুনিয়া থাকিবে—ছেলেটি কোলে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আমার কাছে আসিয়া একেবারে পা জড়াইয়া ধরিয়া রশিদের খবরের জন্য কাকুতি মিনতি করিতে লাগিল। যে রশিদ রাত্রিদিন আমার প্রসাদ ভিক্ষা করিয়া মরিতেছে, সে যে তলে তলে এত বড় বিয়োগান্ত নাটক রচনা করিয়া বসিয়াছে সে ত আমি জানিতাম না। এই কাহিনী শুনিয়া যেন আকাশ হইতে মাটিতে পড়িলাম। যেটুকু অনুকম্পা রশিদের জন্য অনুভব করিতাম, তাহা মুহূর্ত্তে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল।—রাবেয়ার ছেলেটি কিন্তু চমৎকার হইয়াছে। যুগ্মভ্রূর নীচে ডাগর দুইটি চোখ ভারী অপরূপ। মানুষের অন্তরেষ্ণা ও স্নেহ, এই বিভিন্নমুখী দুইটি ধারা একসঙ্গে যে

প্রবাহিত হইতে পারে, সেদিন জীবনে এই নতুন অভিজ্ঞতা লাভ হইল। ছেলেটিকে হাত বাড়াইয়া কোলে নিতে নিতে সূচের মতো একটা তীব্র ঘৃণা আমার সারা দেহকে ঘিরিয়া যেন কণ্টকিত হইয়া উঠিল। জীবনে কী পাপ করিয়াছিলাম জানি না ; রশিদের কোন খবর তাহাকে দিতে পারিলাম না বটে, কিন্তু সে রাত্রে তাহাকে আমার বাসায় থাকিবার জন্য বলিলাম। সে-ও রাজী হইল। কিন্তু সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া দেখি, অবাক্ কাণ্ড। আমার বিছানার নীচে মেঝেয় একটি শিশু ওঁা ওঁা করিয়া কাঁদিতেছে। রাবেয়াকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। ...সে-ছেলে আজ প্রায় পাঁচ বছরে পড়িয়াছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত রাবেয়ার কোন খোঁজ পাইতেছি না।—প্রতিদিন দৈনিক কাগজে কত মানুষই ত রেলে ও মোটরে চাপা পড়ার খবর দেখি, তাহার মধ্যে রাবেয়াও একজন কি না, কে জানে! সে ত রেহাই পাইল, কিন্তু আমার দুঃখের যে অন্ত হইতেছে না। একা মানুষ, ফর্‌ফর্‌ করিয়া উড়িয়া ঘুরিয়া জীবন কাটাইতেছিলাম, বিধাতা কোথা হইতে এই আপদ আনিয়া ফেলিল! ধাই রাখিয়া, একটা পরের ছেলেকে মানুষ করা কম হাঙ্গাম নাকি? চাকর-বাকরগুলিও হারামখোর, তা'রা নাকি সারা-দেশে এমন একটি মানুষ খুঁজিয়া পায় না যে ছেলেটির ভার নিতে পারে। ছেলেটিও এমনি হারামজাদা, (হারামখোর চাকরগুলি হয়ত শিখাইয়া দিয়াছে) কতবার ধমক দিয়াছি---তবুও আমাকে মা ডাকা স্বরু করিয়াছে। ছি, ছি, লজ্জায় আর বাঁচি না।

হাঁ, যাহা বলিতেছিলাম। কবি নকলনবিশ গদা হোসেন সাহেবের কথা না বলাই বোধ হয় ভালো হইবে। তাঁহার কাব্য-পাঠক মাত্রেই জানেন, আমিই হইতেছি তাঁহার ধ্যানলক্ষ্মী, তাঁহার কাব্যসরস্বতী, তাঁহার ইহপরকালের ফেরদৌস। তিনি ত সকলকে বলিয়া বেড়ান, আমাকে দেখিয়াই তিনি কবি, আমার কথা শুনিয়াই তিনি গায়ক। এই মহাপরুষ ত একদিন আমাকে পর্য্যন্ত গান শোনাইতে হাজির। বুদ্ধি হওয়ার পর হইতে যে গানের জন্য দিনের অর্দ্ধেকসময় ও মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে এবং গানের দ্বারা আনন্দ পাওয়া ও আনন্দ দেওয়া যার জীবনের সব চেয়ে বড় কীর্ত্তি, তাহাকে কিনা গান শোনাইতে চান রাসব-কণ্ঠ

গদা হোসেন! মরণ আর কাহাকে বলে? মামাকে ডাকিয়া দিয়া উঠিয়া পড়িলাম। মামারও আবার সেই ঘোড়ারোগ আছে কি না! সে-দিন ত তিনি নিজের লেখায় নিজকে 'সু-সাহিত্যিক', 'প্রতিভার বরপুত্র' ও 'লব্ধপ্রতিষ্ঠ' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। গান শোনার অনুরোধ শুনিয়া তাঁহার মন ত নেহায়েৎ কাঁচুমাচু হইয়া গেল, অথচ তাঁহার 'প্রতিষ্ঠা' ও 'সুসাহিত্যিকত্ব' বজায় রাখিতে তাঁহাকে গান শুনিতেই হইল।—উঠিয়া আসিবার সময় মামার কানে কানে বলিলাম, কুইনাইন্ও ত আমরা খাইয়া থাকি।

সত্যি, এই মামাটিকে নিয়া আমার ভারী মুস্কিল। আমার নাম এক্সপ্লয়েট করিয়াই আজ মামা 'সু-সাহিত্যিক'। অথচ আমি যা লিখি, লোকে মনে করে, তাহাতে মামার হাত আছে। এমন কি, আমার 'সর্ব্বনাশী' নামক বইটিকে পর্য্যন্ত অনেকে মামার লেখা বলিয়া কানাঘুষা করে। সত্য বলিতে কি, মামা আমার জন্য অনেক কিছু করিয়াছেন বটে, কিন্তু মামা আমাকে 'আমি' হইতে দেন নাই। না হয়, আমি কী না হইতে পারিতাম? যাহার পিতামহ তৃতীয় মোহ্সীন, মাতামহ দ্বিতীয় স্যার সৈয়দ, যাহার পিতামহের মাসী দ্বিতীয় চাঁদ সুলতানা, মাতামহীর মাতা পঞ্চম রাবেয়া, যাহার পিতামহের খালাতো ভাইয়ের মামাতো ভাই দ্বিতীয় হারুণ রশীদ, যাহার মাসীমার মেসো মহাশয় ভারত গভর্ণমেণ্টের ইন্ডাষ্ট্রী ডিপার্টমেণ্টের হেডক্লার্ক,—সর্ব্বশেষে যাহার মামা শুধু সু-সাহিত্যিক নন্, শুধু জীবন-আলেখ্যের সুপটু পটুয়া নন্, শুধু বঙ্গের মুসলিম শিশিরভাদুড়ী নন, পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেফ্ট্ উইঙ্গ হকিয়ারও— এ হেন আমি মামার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারিলে কী না হইতে পারিতাম? মামার অজ্ঞাতে বলিতে ভয় নাই, এই মামার প্রভাব হইতে মুক্তি পাইবার জন্যই মামার অমতে তাড়াতাড়ি বিবাহ করিয়া ফেলি। মামাটি আমার আবার তলে তলে শয়তান কম নহেন। মামার ধারণা, আমি প্রেমে পড়িয়া গেছি। চুপি চুপি বলিতে দোষ নাই, সত্যি আমার বিশ্বাস, প্রেম ট্রেম ও-সব বিলকুল ঝুট্ বাত্। না হয়, এত সব নবাবজাদা ও আই. সি, এস্. ছাড়িয়া......। প্রেমে আর যাই থাক, আভিজাত্য থাকে না। প্রয়োজন অবশ্য ছিল না, তবুও মামার মামুলী সম্মতি

পাইতেও দেরী হইল না। কিন্তু এ বিবাহ যাহাকে করিলাম, সত্য বলিতে কি, তাঁহার রূপও দেখি নাই, গুণও দেখি নাই, দেখিলাম শুধু তাঁহার রোপেয়া আনিবার শক্তি আছে কি না। উপরোক্ত দুইটি অনাবশ্যক জিনিষ থাকিলে বিপদ হইত—তাঁহার রূপ ও গুণ চর্চা করিতেই ত অনর্থক আমার কত সময় নষ্ট হইত, অথচ তাহার দ্বারা সঙ্গিনীদের মনে ঈর্ষা জাগান ছাড়া প্রকৃত লাভ কিছুই হইত না। কিন্তু রোপেয়া হইতেছে সর্ব্ববিজয়ী—যাহাকে দিয়া পৃথিবীতে অসাধ্য সাধন করা যায়। না হয়, আমার মতো মেয়ে আবার রোপেয়ার প্রেমে পড়ে? সত্য বটে, রোপেয়ার আমার অভাব নাই, তবুও আরো পাইতে বা পাওয়ার চেষ্টায় দোষ কি? রোপেয়া থাকিলে কী না হয়? একদিনেই আমি কাব্য-সরস্বতী ও বিদ্যাসাগরিণী হইয়া যাইতে পারি। দশ টাকার বই এক টাকায় বিলি করিয়া অসাধ্য-সাধন-পটিয়সী সংবাদ-পত্রিকার পৃষ্ঠায় বর্ত্তমান যুগের তেলিছমাৎ বিজ্ঞাপনের মুগুর হানিয়া আমার নাম বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দিতে পারি। আমার বিবাহের পর বন্ধুরা প্রকাশ্যে পর্য্যন্ত বলিয়াছেন, ছেলে হইলে তবুও রক্ষা। যদি পিতার রং লইয়া মেয়ে জন্মায়, তবে তাহাকে চালাইতে অর্দ্ধেক রাজত্ব দান করিতে হইবে। কিন্তু এই বোকা আর বোকীরা জানে না যে, আজকাল উন্নতির যুগ, ঢোল শোহরতের যুগ—মেয়ের চতুর্দ্দশ বছর বয়সে একটু আর্টিস্‌টিকেলী ছবি তুলিয়া পত্রিকা অথবা মা'র বইয়ের গোড়ায় ছাপিয়া দিতে পারিলেই, ব্যস, অর্দ্ধেক রাজত্বের কাজ সহজেই ফতে। বিজ্ঞানের যুগ, কাজেই বিজ্ঞাপনের জোরে চতুর্দ্দশ বছরকে যত বছর ইচ্ছা আটকাইয়া রাখা যায়। আসল ত রোপেয়া, যত বছর বিজ্ঞাপনের খরচ দিতে পারা যায়, ঈশ্বর কৃপায় তত বছর মেয়ের বয়স চতুর্দ্দশ বছরের উপর এক মাসও বাড়ে না। এই যুগের তরুণদের আদর্শ: বুদ্ধির মুক্তি। কাজেই আজিকার মুক্তবুদ্ধি তরুণের জন্য ইসারা-ইঙ্গিতই' যথেষ্ট। ক-বলিতেই সে আজ কলা হইতে কনে পর্য্যন্ত সব বুঝিয়া ফেলিতে পারে। শুধু মা'র ছবি দেখিয়া মেয়ের আন্দাজ করিতে পারে এমন তরুণ কলেজে কলেজে আজকাল ঢের জন্মলাভ করিতেছে। অতএব মা ভৈঃ, নিরাশ হইবার কারণ নাই।—যাক্ বাজে কথা।

বিবাহ ত করিলাম ভালো মতলবে; কিন্তু বিধির বিধান আমি কম্‌লী ছাড়িলেও কম্‌লী আমাকে ছাড়ে কই। মামার এক্সপ্লয়েটেশনের ত বিরাম নাই—আমার নামের রূপ ও স্বামীর রোপেয়ার প্রতি তাঁহার মামাত্ব দিন দিন আরও ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিল। কাজেই আমি আর 'আমি' হইতে পারিলাম না। আমার জীবনের এই বৃহত্তম ট্রেজেডী কি কেহ বুঝিবেন?

মুসলিম ইহলোকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক, কবি-শাহেন-শাহ্ 'বাদাম-পেস্তা' নামক বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাসের লেখক অর্থাৎ বাংলার মোপাশাঁ যাঁহাকে বিশ্বের টলষ্টয় আখ্যা দিয়া সার্টিফিকেট দিয়াছেন, তিনি পর্য্যন্ত তাঁহার আসন্ন-প্রকাশ্য 'বদ্‌বক্তের 'বদ্‌দোওয়া' নামক বই আমার নামে উৎসর্গ করিতে চাহিয়াছিলেন—কিন্তু বহু কষ্টে বহু দোহাই দিয়া এই বিপদ হইতে রেহাই পাইতে হইয়াছে।

পর-চর্চা করা অলস নিষ্কর্ম্মাদের কাজ। পরনিন্দা করা আরও খারাপ। হতভাগিনী রাবেয়ার করুণ কাহিনী বিবৃত করিয়া পরনিন্দা করার প্রবৃত্তি আমার নাই। দুঃখ এজন্য যে একটি পরের ছেলেকে খাওয়াইয়া পরাইয়া মাসে মাসে আমার অনেকগুলি টাকার শ্রাদ্ধ হইতেছে। এই আপদটাকে কোন প্রকারে কোথাও বিদায় করিতে পারিলেই বাঁচিতাম। সত্য বলিতে কি, সাহিত্যিকদের প্রেমে পড়িতে ইচ্ছা নাই ইচ্ছা হয়ও না কারণ উঁহাদের প্রেমের পরিধি হইতেছে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। গান না জানিলেও হয়ত গান গাহিয়া মানুষের কানের শান্তি ভঙ্গ করিতে ইঁহারা এতটুকু ইতস্তত করেন না—অথবা প্রেমের নামে কবিতায় বা গল্পে কিছু মায়াকান্না কাঁদেন, এই ত? ইঁহাদের গুণপণা যতই বর্ণনা করিব না ভাবি, ততই দেখিতেছি, অতীত দিনের স্মৃতি-ভাণ্ডার হইতে এক এক করিয়া সব মনের কোণে উঁকি মারিতেছে।—বলিব কি, হাসিয়াই ত বাঁচি না। আর এক কচি ত বুড়িগঙ্গার পাড় হইতে কর্ণফুলীর তীর পর্য্যন্ত 'মাই ভুখা হুঁ ভুখা হুঁ' বলিয়া বুক চাপড়াইয়া ফিরিতেছে। এবং তাঁহার দোসর এক কবি-কিশলয়, যাঁহার ফিল্‌জফী হইতেছে ফেল্‌, ফেল্‌, জীবনের বৃহত্তম আদর্শ হইতেছে ফেল্‌ করা, এবং প্রত্যেক ফেলের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পায়ের নীচে যে এক একটি

জয়স্তম্ভ পাতাল ফুঁড়িয়া উঠিতেছে এই বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, এবং বি. এ. ফেল্ হইতে যে কোন সম্মানজনক ডিগ্রী আছে এই কথা তিনি বিশ্বাসই করেন না ; কারণ তাঁহার ধারণা, ইহাতে পি. এইচ. ডি'র চাইতে অন্তত এইটুকু সুবিধা বেশী যে, এই ডিগ্রী থাকিলে প্রাইমারী স্কুল হইতে হাই স্কুল পর্য্যন্ত অসঙ্কোচে মাষ্টারী করা যায়। আর সম্পাদক হওয়াই যে সকলের উপর টেক্কা দিবার সহজ উপায়, এই সহজ সত্যটুকু তিনি বড় অল্প বয়সে বুঝিয়া ফেলিয়াছেন। সম্পাদক হওয়ার লজিকেল পরিণতি হইল মৌলানা হওয়া—দোওয়া করিতেছি শীঘ্র শীঘ্র যেন শ্রীমানের 'মৌলানা'-প্রাপ্তি ঘটে। তবে আফ্সোস্, সম্প্রতি তিনি বিদেশী কোটেশনের ভাঙা লাঠি হাতে সকলকে ভয় দেখাইয়া ফিরিতেছেন। তাঁহার এই লাঠি চার্জ্জে স্বয়ং ঝড়ঝঞ্ঝা বাবু পর্য্যন্ত কাহিল হইয়া ভয়ে বাংলদেশ ত্যাগ করিয়াছেন। এই দুই সাঙাৎ মিলিয়া গদ্যে পদ্যে কিছুদিন আমার উপর যে পত্রাঘাত চালাইয়াছেন, আমার বিশ্বাস, আর কোন মেয়ে হইলে এতদিনে হার্টফেল করিত। আমি বলিয়াই এতদিন ভীষ্মের মতো প্রেমের এই শর-শয্যায় শুইয়াও অটল অচল থাকিয়া নিজের স্থির বুদ্ধি ও সজ্ঞানে নিজের স্বামী নিজে নির্ব্বাচন করিতে পারিয়াছি। আর স্বামী নির্ব্বাচনে যে আমার ভুল হয় নাই, তাহার সাক্ষী আমার মামা। মোট কথা, সাহিত্য-চর্চার কপালে ঝাড়ু। কয়টি সাহিত্যিক সাহিত্য চর্চা করিয়া বউকে ভাত-কাপড় দিতে পারিয়াছেন? অথচ প্রেম করার বেলায় তাঁহাদের এতটুকু ইতস্ততঃ নাই। ভিতরে তলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে, এক একজন সাহিত্যিক ইঁহার মধ্যেই অন্ততঃ শ' খানিক প্রেম করিয়া সারিয়াছেন, আবার নতুন মুখের সন্ধানে হয়ত এর জানালায় উঁকি মারিতেছেন, ওর দরজায় ঢুঁ মারিতেছেন; এর জন্য গান, ওর জন্য কবিতার ভোঁতা তীর ছুঁড়িতেছেন। যাক্—

প্রথম শ্রেণীতে আই. এ. পাশ করিয়া যখন ইউনিভার্সিটিতে ভর্ত্তি হইলাম, তখন এই সাহিত্যিক মহাপুরুষদিগকে আমার জানালায় চোখ রাখিয়া পথ চলিতে চলিতে হোঁচট খাইতে দেখিয়াছি। টোপ গিলিলে সুতা ছাড়িয়া দিয়া মাছকে খেলাইতে আনন্দ পায় না এমন মহাত্মা কয়জন আছেন?

অনেকের মতো গান শোনার অছিলায় আমাদের বাসায় রসিদ, ক'ওসর ইত্যাদিরও আসা-যাওয়া হইত ; অথচ ওদের 'গা'-এর সঙ্গেও পরিচয় ছিল না ও নাই, তবুও গানের আসরে উপস্থিতির বিরাম ছিল না। আমার একটুক্‌রা কথা, অর্দ্ধস্ফুট আধখানি হাসি, এই নিয়া তাহাদের উৎসাহ ও ঔৎফুল্লের অবধি থাকে না। গল্প, যত বাজে গল্প, এক কথাকে বার বার পুনরাবৃত্তি, এক কথাকে পাঁচ শ' বার, প্রতিদিন 'কেমন আছেন?' শুনিয়া শুনিয়া মানুষের যে ক্লান্তি আসিতে পারে, এইটুকুও যেন এই বোকা পুরুষেরা বুঝিতে পারে না। আমার পরম আরামের রেনী-ডের' অবসরগুলিকেও এমন একঘেয়ে কথার ভোঁতা ছুরি দিয়া হত্যা করিতে দেখিয়াও বাধা দিই নাই—তাহাদের চোখ-মুখের কাকুতি বেঙেজের উপর হাত-বুলানির মতো মনে হইত।

সেদিন মন ভয়ানক খারাপ ছিল। খোকনকে পাঠাইয়াছিলাম স্কুলে। ভর্ত্তির ফর্মে দেখি, পিতার নাম লিখিতে হইবে। সেই অসভ্যটার নাম লিখিতে আমার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি হইল না। যে শিশু ও নারীর উপর এমন অত্যাচার করিতে পারে, নিজের কৃতকর্ম্মের বোঝা অন্যের ঘাড়ে চাপাইয়া নিজে পরনিন্দা করিয়া বেড়াইতে পারে, সে আর যাহাই হউক ভদ্রলোক নয়। সত্যই সেদিন এই কঠোর বাস্তবতার সঙ্গে সাম্‌না-সাম্‌নি পরিচয়ে বুঝিলাম—মানব-সন্তান কত অসহায়! শুধু মায়ের উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার সামান্য অধিকারটুকু পর্য্যন্ত তাহার নাই! সংসারে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার জন্য তাহার আবার পিতা চাই। সে পিতা যত বড় অপদার্থই হউক, যত বড় কুলাঙ্গারই হউক, তাহার নামেই তাহাকে পরিচয় দিতে হইবে।—সন্ধ্যায় বসিয়া বসিয়া এ-সব কথা ভাবিতেছি, তখন হঠাৎ ক'ওসর আসিয়া ঢুকিল; দেখিয়াই মন একটিবার রঙীন হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই সমস্ত অন্তঃকরণ 'না' 'না' করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল।

সন্ধ্যায় হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়া আসিল। ক'ওসর অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠি উঠি করিয়াও উঠিতেছিল না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলিলাম: এত বৃষ্টিতে কি ক'রে যাবেন, থেকে যান।

না, না... বলিল বটে, কিন্তু এতখানি প্রসন্নতা নিয়া কোন মানুষ কোন দিন 'না' 'না' উচচারণ করিয়াছে বলিয়া ত মনে হয় না।

নীচে তাহার থাকিবার সীট্ করিয়া দিতে হইল।

রাত্রির গভীরতায় সমস্ত নিস্তব্ধ। বাহিরে শুধু অবিরাম বৃষ্টির ঝুপ ঝুপ শব্দ। ঘুম আসিয়াও আসিতেছিল না—বারে বারে ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। কি জানি কেন, কিসের আকর্ষণে উঠিয়া পড়িলাম। সমস্ত বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল। সুইস্ টিপিতে ইচ্ছা হইল না। খালি পায়ে কম্পিত চরণে বার কয়েক রুমের ভিতর পায়চারী করিলাম। কিসে যেন দরজার কাছে টানিয়া নিয়া গেল। নীচের সিঁড়ি বাহিয়াও যেন কার মৃদু পদশব্দ উঠিয়া আসিতেছিল। হাতড়াইয়া খিলে হাত দিতে না দিতেই—হঠাৎ খোকন 'মা' 'মা' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। দৌড়িয়া আসিয়া সুইস্ টিপিলাম। দুনিয়ায় আকস্মিকতার প্রভাবও কম নয় দেখিতেছি। আর একটু হইলেই হয়ত আমার মাথা ধুলায় মিশিয়া যাইত। খোকনের দুই চোখ বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়িয়া তাহার গাল পর্য্যন্ত ভিজিয়া গিয়াছে। 'মা, আমার ভয় করছে'—বলিয়াই আমাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল। আঁচল দিয়া তাহার দুই চোখ মুছাইয়া দিয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া আবার শুইলাম। মনে হইল, আমার এতদিনের কষ্ট ও অর্থব্যয় আজ এক মুহূর্ত্তে সার্থক হইয়া গেল। সকালে চা'র টেবিলে কওসরের চোখ দেখিয়া তাহারও যে ভালো ঘুম হইয়াছে মনে হইল না।

সেইদিন মামাকে লিখিয়া দিয়া আমার সম্বন্ধে মামার সমস্ত উৎকণ্ঠা দূর করিলাম। (দেখা যাক্. মামার প্রভাব হইতেও হয়ত মুক্তি পাওয়া যাইতে পারে।) আমি রাজি। হোসেনকেও লিখিয়া দিলাম, আমার খোকনের বাবা হইতে হইবে কিন্তু। হোসেনও যেন জলে-পড়া মানুষ হঠাৎ কুল পাইলেন—টেলিগ্রামেই তাঁহার আনন্দ জানাইলেন। পারিবারিক মহলে হোসেনের 'নীরব কবি' বলিয়া বদনাম ছিল—আমার মত শুনিয়া সকলেরই আশঙ্কা হইল এইবার হয়ত তিনি সরব হইয়া উঠিবেন। কিন্তু আমি বেশ করিয়া জানিতাম, কাহার উদ্দেশ্যে তাঁহার খাতার পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ভরিয়া উঠিয়াছে এবং তাহার দেখা পাইলেই যে

তাঁহার কাব্য-তুব্‌ড়ি নীরবতা এক্তেয়ার করিবে এই বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। যাক্। ছিদ্রান্বেষিণীরা হয়ত বলিবেন—দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা, দাড়ির জঙ্গল, বর্ণের কালিমা, এ-সব দেখিয়াও কি করিয়া আমি রাজী হইলাম! তাঁহাদের বলিয়া রাখি, চাঁদেরও কলঙ্ক আছে। চশ্‌মা দিলেই দৃষ্টিক্ষীণতা সারিয়া যায়। দাড়ির হিল্লা পাঁচ মিনিটেই করা যায়। আর রং? কুছ পরওয়া নাই। মাথার কেশ কালো, চোখের ভ্রূ কালো, কাজল কালো, কে বলে কালো অসুন্দর?

কিন্তু বছর যাইতে না যাইতেই কে একজন কলিকাতা হইতে এক বেনামী পত্র লিখিয়া আমার স্বামীকে জানাইয়াছে—আমি নাকি সেই কওসরের সাথে প্রেম করিয়াছিলাম। এমন কি, সে নাকি আমার ঘরে নিশিযাপনও করিয়াছে ইত্যাদি। দরকার হইলে তাহার মুখের সাক্ষ্যও নাকি তিনি দিতে পারেন। আমার প্রতি কাহার এই অহেতুক হিতৈষণা, বুঝিতে আর বাকী রহিল না। যে পরনিন্দাকারী কলিকাতার বাজারে বাজারে আমার কুৎসা রটনা করিয়া কিছুমাত্র ক্লান্তি বোধ করিতেছে না, শেষকালে তাহার দ্বারাই আমার এই সর্বনাশ আসিল। সরল বিশ্বাসী মানুষের বিশ্বাস করিতে দেরী হয় না। চিঠি পাওয়ার তিন দিন পরে হোসেন আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—তোমার সঙ্গে আর স্বামী-স্ত্রী রূপে বাস করা আমার ইজ্জতের হানি।

কৈফিয়ৎ দিয়া নিজেকে অপমান করিতে ইচ্ছা হইল না। বলিলাম: বেশ, ছেড়ে দিন।

ভদ্র পরিবারে ছাড়াছাড়ি যে কত বড় অভদ্রতা, এ কলেজে-পড়া মেয়েরা বুঝিবে না। লেখা পড়ার কপালে...। তাঁহার কথা শেষ পর্যন্ত শোনার প্রবৃত্তি হইল না। বলিলাম: তুমি গিয়ে আর একটি বিয়ে করবেনা ত?

—কেন করব না? আমার যে আইন-সঙ্গত অধিকার আছে!

—আমরাও সে-অধিকার তৈরী করতে চাই।

—অত দেমাগ দেখিও না। আবার ডাক্‌বে, পায়ে ধরবে।...আমার অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার প্রতিই যে এ ইঙ্গিৎ, বুঝিতে বেগ পাইতে হইল না।

—আমার ছেলে-মেয়েকে আমি বাড়িতেই পড়াব ; যে-স্কুলে মায়ের নাম না লিখে বাপের নাম লিখতে হয় সে-স্কুলে আমি ছেলে পাঠাব না।

—লেখাপড়া-করা মেয়েদের কপালে...। কী একটা কুৎসিৎ কথা উচচারণ করিয়া তিনি হন্ হন্ করিয়া একেবারে গাড়িতে গিয়া উঠিলেন।

তাঁহার বিদায়ের পরক্ষণেই, কি জানি কেন, চোখ ভরিয়া জল আসিল। অন্তরের অন্তস্থল ভেদিয়া কান্না মোচড় দিয়া উঠিল। বিছানায় গড়াইয়া পড়িলাম। দুই চোখের জলে বালিশ পর্য্যন্ত ভিজিয়া গেল। দুপ দাপ্ করিয়া খোকন দৌড়িয়া আসিয়া বইগুলি টেবিলের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিল এবং 'মা' 'মা' বলিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। মুহূর্ত্তে রাগ মাথায় চড়িয়া আসিল—আঁচলে চোখ মুছিয়া সোজা উঠিয়া আসিয়া টাস্ টাস্ করিয়া তাহার দুই গালে দুই চড় লাগাইয়া দিয়া বলিলাম: যা হতভাগা, আমার বাড়ী থেকে বেরো—দুধ কলা দিয়ে আর সাপ্ পুষতে চাই না। কান ধরিয়া টানিতে টানিতে ঝিকে চেঁচাইয়া বলিলাম: এটাকে বাড়ী থেকে দূর ক'রে দাও। খোকনের কান্না শুনিয়া ঝি-চাকর সবাই দৌড়িয়া আসিল। ঝি খোকনকে লইয়া বাহিরের দিকে ছুটিয়া গেল! আমি চেচাইয়া বলিলাম: ওকে যে এ-বাড়িতে ঢুক্‌তে দেবে, সে যেন আমার চাক্‌রীতে ইস্তফা দিয়ে যায়।

পরের ছেলের প্রতি আমার অতিরিক্ত ও অহেতুক স্নেহ দেখিয়া একদিন যে চাকর-চাকরাণীরা ঈর্ষা করিয়াছে, হাসাহাসি করিয়াছে, তাহারাও আজ আমার হুকুম শুনিয়া অবাক্।

সন্ধ্যায় বায়স্কোপ দেখিতে গেলাম—কিন্তু মাথা-ধরা সারিল না। দশটায় ফিরিয়া আসিয়া কিছু না খাইয়াই শুইয়া পড়িলাম। কিন্তু ঘুম আসিল কৈ? ছট্‌ফট্ করিতে করিতে রাত প্রায় বারটা পার হইয়া গেল। কখন কি জানি, তন্দ্রার মতো আসিয়া ছিল। হঠাৎ পাশের ছোট বালিশটির উপর হাত পড়িতেই বুকের ভিতর হাহাকার করিয়া উঠিল। উঠিয়া ঝিকে ডাক দিলাম, (নিজের চাকরের কাছে এত বড় লজ্জা আর কোনদিন অনুভব করি নাই)—খোকন কোথায়, জিজ্ঞাসা করিলাম। ঝি সাড়া দিয়াই চুপ করিয়া রহিল। অন্ধকারের যবনিকা ছিঁড়িয়া যেন তাহার হাসি আসিয়া আমাকে বিঁধিতে লাগিল।

—হারামজাদী চুপ ক'রে রইলি কেন?...গর্জ্জন করিয়া উঠিলাম।

—ঘুমিয়ে আছে।

—কিছু খেয়েছে?

—না। কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

—নিয়ে আয়।...বলিয়াই স্থইস্ টিপিলাম।

খোকনের দুই গালে চোখের জলের ধারা তখনো চক্ চক্ করিতেছে। বুকে টানিয়া লইয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম।

ঝি জিজ্ঞাসা করিল—খাবার দিয়ে যাব?

বলিলাম—না। পরক্ষণে বলিতে হইল—কিছু দিয়ে যা।

খোকনকে বুকে লইয়া শুইয়া ধীরে ধীরে আঁচল দিয়া চোখ মুছাইয়া দিলাম। তাহার চোখ মুছিতে মুছিতে আমার মনে মনে একটি ক্ষুদ্র প্রার্থনা জাগিল— খোদা আমার পেটের সন্তানটিও যেন এমনি হয়, এমন যুগ্ম ভ্রূ, কালো চোখ, শ্যামল রং।

শ' সত্যই বলিয়াছেন—বিবাহ যে একবার করিয়াছে তাহার পক্ষে আবার বিবাহ না করিয়া থাকা সত্যই কষ্টকর। এই কষ্ট করিবই বা কোন্ দুঃখে? মনের ভিতর আবার সেই পুরাতন প্রার্থীদের নামের তালিকা পুনরাবৃত্তি হইতে লাগিল। এইবার কিন্তু চশমা-পরা, দাড়ীওয়ালা, হাসিহীন, গুরু-গম্ভীর চেহেরা নয়—। এবং নিমেষে কাব্য-সাহিত্যের স্থনিপুণ শিল্পী হইতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ঔপন্যাসিক পর্য্যন্ত সকল চেহারার উপর একবার মনশ্চক্ষু বুলাইয়া লইলাম।—সাহিত্যের এত চূড়া উপচূড়া থাকিতে মন কিন্তু কোথাও ঠেকিল না—ঠেকিল একটি ছোট্ট টিলায়, যে টিলা...।

লেখকের কথা

থাক্, থাক্। থাম, থাম জোহরা। দোহাই, তুমি সেই নাম তোমার মুখে উচ্চারণ করিও না—নিজ হাতে লিখিও না। এই গল্প আর তোমাকে লিখিতে দিলে শুধু তোমার অপমান হইবে না, সমস্ত নারীজাতিই লজ্জিত হইবেন। আর মনে করিবেন, আমি একটা কাপুরুষ, নারীর প্রতি আমার কিছুমাত্র ভক্তি-শ্রদ্ধা নাই। বিপত্নীক জীবনে আমার সম্বন্ধে এ-রকম একটা ধারণা প্রচার হইতে দেওয়া কিছুমাত্র বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। আর মেয়েলী ভাবে বিনাইয়া বিনাইয়া তুমি গল্পকে যে অনাবশ্যক লম্বা করিয়া তুলিতেছ, তাহাতে পাঠিকাদের আপত্তি না থাকিলেও পাঠকদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে। সংক্ষিপ্ত করাই যে বাহাদুরি, এই কথা যারা পাঁচ হাতের যায়গায় দশ হাত কাপড় পরে তাহারা বুঝিবে না ; তাদেরে বুঝাইতে যাওয়াও পণ্ডশ্রম। দেখ, দুই মিনিটেই আমি তোমার জীবন-ইতিহাসের এই অধ্যায়ের যবনিকাপাত করিয়া দিতেছি।

সাহিত্যিকদের প্রতি জোহরার যত ঘৃণাই থাকুক, কিন্তু প্রথম চোটেই তাহার মন ধাবিত হইল সেই সাহিত্যিকদের প্রতি। জোহরার মন সমস্ত প্রার্থীমণ্ডলী ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাতিল করিয়া ছুটিল। সে ভাবিল : অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবি এমন বে-পরওয়া যে, কিছুতেই বাগ মানান যাইবে না। অপ্রতিদ্বন্দ্বী ঔপন্যাসিকের পরের পয়সায় গ্লাস ঢালিবার অভ্যাস আছে ; তা অবশ্য খারাপ নয়, তবে আবার মাঝে মাঝে জেলে যাইবার সখ আছে যে। সোনা মিঞার চেহেরা অবশ্য বেশ ভালো, খাঁটি সোনার মতো, কিন্তু কমিউনিজমের বদখেয়ালই ত সব মাটি করিল...। শিশু-সাহিত্যের যাদুকরের আবার নিজে বাহিরে থাকিয়া বৌকে জেলে পাঠাইয়া পেট্রিয়টিজম্ করার সৌখিনতা আছে কি না! তাঁহার আগের বৌটি ত জেলেই মারা গেছে। বাবা, লফসী খাইয়া কবিদার মতো মোটা হইয়া গেলে গেছি আর কি। অনাগত কথাশিল্পীটার কথা—না, না, চাটগাঁ গিয়া কে আবার সুটকী মাছ খাইয়া মরিবে?...'না' 'না' করিয়া বতিল করিতে করিতে জোহরার মন এমন এক নামে আসিয়া ঠেকিল, যে-নামের মালিক তাহার ইষ্ট ত কোনদিন করেই নাই, বরং অসামান্য

অনিষ্ট করিয়াছে—ঘরে ঘরে তাহার নামে বদনাম করিয়াছে, তাহার নামের সঙ্গে অকথ্য কলঙ্ক-কালিমা জড়াইয়াছে; এমন কি, তাহাকে স্বামীচ্যুত করিয়া ছাড়িয়াছে। সে ভাবিল: এইবার কিন্তু বেশ হালকা হাসি হাসি চেহারা চাই। হোসেনের মতো গুরুগম্ভীর ভারিক্কি মানুষ হইলে নিজেও গম্ভীর হইয়া বসিয়া বসিয়া ইউনানী চর্চা করা যায় বটে, কিন্তু প্রেম চলে না। বগলে সুড়সুড়ি দিয়াও তাঁহার মুখে কোনদিন হাসি ফুটাইতে পারি নাই। ইহাকে কিন্তু সুড়সুড়ি দিতে হইবে না, সুড়সুড়ি দেখাইতেই সে হাসিয়া গড়াইয়া পড়িবে। এইবার চাই—যে বুক ভরিয়া নিশ্বাস লইতে পারে, মুখ ভরিয়া হাসিতে পারে, যার চোখে চোখে বিদ্যুৎ লীলা করে। যে মুখে হাসি ফুলের মতো ফুটিয়া উঠিয়া জল-কল্লোলের মতো ফাটিয়া পড়ে, তেমন মুখ চাই। তাহার ধারণা, যে মুখে তাহার মন ঠেকিয়াছে সেই মুখ তেমনি। আর, সে যে তাহাকে ভালবাসে তাহাতে কি বিন্দুমাত্র সন্দেহ আছে? না হয় এতদিন, এত উপেক্ষায়ও সে তাহাকে ভুলিতে পারে না কেন? নিন্দাবাদ—সে ত তাহাকে স্মরণ করার, তাহার নামচর্চা করার অন্য উপায় মাত্র। তাহার কৌশলেই ত সে আজ সেই মূর্ত্তিমান বোরিং হোসেনের হাত হইতে মুক্তি পাইয়া বাঁচিয়াছে। কৌশল হয়ত খুব নীতিজনক নয়; কিন্তু তাহাতে কী আসিয়া যায়? উদ্দেশ্য দিয়াই ত কর্ম্মের বিচার। অন্য অকর্ম্মণ্য হতাশ-প্রেমিকদের মতো সে ত হতাশভাবে খালি 'ব্যথা' 'ব্যথা' করিয়া দিন কাটায় নাই। সে ত ঠোঁটে ঠোঁটে তাহার নাম জপ করিয়া ফিরিয়াছে। তাহাতে আবার মস্ত বড় সুবিধা, খোকনও ফিরিয়া পাইবে তাহার বাবাকে, তাহার জন্মদাতাকে। ব্যস্; কুছ্‌পরওয়া নাই, রশিদই সই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

যথাসময়ে জোহরা একটি মৃত কন্যা প্রসব করিল। ভালোই হইল। যে-জীবন পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে সে-জীবনের জের তাহাকে আর টানিয়া চলিতে হইবে না। হাজার পাঁচেক টাকার কথা শুনিতেই হোসেন আর দ্বিরুক্তি করে নাই—এক হাতে চেক্ লইয়া অন্য হাতে তালাক-নামা লিখিয়া দিয়াছে। চিঠি পাওয়ার পর রশিদ যে শুধু কিছুমাত্র ইতস্তত করে নাই তাহা নয়; বিস্ময়ের বিষয়, এত বছরের, এত আদরের কেরানীগিরির প্রতিও একটিবার সে পিছনে ফিরিয়া চাহিল না। হয়ত তাহারও আর পেছনের জের টানিবার ইচ্ছা নাই। এই কথা সর্বজনবিদিত যে, জোহরা সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর স্বল্পসংখ্যক অনুগৃহীতদের অন্যতম। অন্য ভাই-বোন না থাকাতে পিতার সম্পত্তির সে হইয়াছে একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। পিতা মৃত্যুর সময় শ্যালক-টিকেই জোহরার অভিভাবক করিয়া গেছেন। কিন্তু ঐশ্বর্য্যশালিনী ভাগিনেয়ীর অনুগ্রহ-দৃষ্টির উপর মামার অনেক সুখ-সুবিধাই নির্ভর করে, কাজেই বুদ্ধিমান মামা ভাগিনেয়ীর অভিভাবক না হইয়া অল্পদিনের মধ্যেই হইয়া পড়িয়াছেন ভাগিনেয়ীর অনুগ্রহপ্রার্থী ও আশ্রিত।

ইহাকেই বলে আরাম। এই আরামের অনুকূল স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে কোন্ দিক দিয়া যে বছর কাটিয়া গেল, তাহা রশিদ টেরও পায় নাই।—জীবনের কোন দিকে কোন অভাব নাই, নাই অনটন। কোন জিনিষ চাহিয়া না পাওয়ার অতৃপ্তি, এই সব জোহরার জগতের বাহিরের ব্যাপার। নিজেকে কিছু করিতে হয় না, করিতে চাহিলেও নিমক-হালাল চাকর-চাকরানীর জন্য তাহা পারিবে কেন? হাত বাড়াইবার আগেই যাহা দরকার তাহা হাতে আসিয়া পৌঁছে। মাটিতে পা ফেলিয়া চলিতে হয় না; তাহা যদি হইবে তাহা হইলে জোহরার গাড়ী আছে কি জন্য? হাঁটায় অভ্যস্ত পায়ে না হাঁটিতে না হাঁটিতে যেন খিল ধরিয়া গেল। তবুও পায়ে হাঁটিবার আগে হাঁটিলে জোহরার তাহাতে সম্মানের

লাঘব হইবে কি না তাহা ভাবিতে হয়। সকাল বিকাল বাহিরে যাইবার সময় গাড়ী ত তৈয়ারই থাকে; নিষেধ করার আগেই হয়ত শো'ফার গাড়ীর দরজা খুলিয়া দেয়। মানা করিতে ইচ্ছা হইলেও সেই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় না। ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ বা দেহরক্ষার জন্যই যে খাওয়া, সেই কথা সে যেন ভুলিয়াই গেছে। আগে মনে করিত বাঁচিয়া থাকার জন্যই খাওয়া; কিন্তু এখন সে কী মনে করে কে জানে? কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখন তাহার জীবন স্রেফ খাওয়ার জন্য বাঁচিয়া থাকায় যে পরিণত হইয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ক্ষুধা বোধ করিবার ফুরসৎই বা কোথায়? সকালে বিকালে দুপুরে রাতে চর্ব চুষ্য লেহ্য পেয় ইত্যাদিতে খাবার-টেবিল ভরপুর—প্রচুরভাবে সবগুলির সদ্ব্যবহার না করিলে অন্তত চাকরবাকরগুলি ত মনে করিতে পারে সে এ-সবের উপযুক্ত নয়। অনভ্যস্ত পেট এত সব বোঝার চাপে দিন দিন স্ফীততর হইয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমবর্দ্ধমান ভুঁড়িটির দিকে চাহিয়া তাহার মাঝে মাঝে মনে হয়—বড় লোক হওয়ার এ ত মাত্র প্রথম লক্ষণ দেখা দিয়াছে।

রশিদের নির্ভাবনার সুখের দিন একটার পর একটা গড়াইয়া যাইতে লাগিল। ভাবনা-উদ্বেগকে কিছুদিনের জন্য অবসর দিয়া রশিদ এবার ভালো করিয়া হাত-পা ছড়াইয়া জীবনকে ভোগ করিতে লাগিল। অর্থাৎ, খাওয়া আর ঘুমানো, ঘুমানো আর খাওয়া। খাওয়ার বহর যেমন প্রয়োজনাতিরিক্ত, ঘুমেরও আর কোন বাঁধা-ধরা সীমা রহিল না। আগে ভোর পাঁচটায় ঘুম হইতে উঠিয়া পনর বিশ মিনিট পর্য্যন্ত ব্যায়াম করিত সে, তারপর হাত-মুখ ধুইয়া প্রাতঃভ্রমণে বাহির হইত। কিন্তু এখন ভোরে উঠিবার প্রয়োজনই যেন ফুরাইয়া গিয়াছে। ন'টার আগে ত নয়ই, কোন কোন দিন দশটাও হইয়া যায় আজকাল তাহার বিছানা ছাড়িতে।

সে ভাবে, শরীরটা একটু জুৎ করিয়া নেওয়া যাক্। কোন কাজে হাত দিয়া ফেলিলে, তখন শরীরের দিকে আর ফিরিয়া তাকাইবারই অবসর পাওয়া যাইবে না। কেরানীগিরি করিতে যাইয়া কী পরিশ্রমটাই না হইয়াছে। শরীরের শিরা-উপশিরাগুলি পর্য্যন্ত যেন মুষড়িয়া বাঁকিয়া গেছে। কিছুদিন অবসর না নিলে এগুলি আর সোজা করিবার ফুরসৎই পাওয়া যাইবে না। শরীরটাকে ভালো করিয়া

পরিশ্রমক্ষম ও জুৎসই না করিয়া কাজে হাত দিলে মাঝ-পথেই হয়ত শরীরটা হোঁচট খাইয়া বসিবে।

শুভ্র দুগ্ধফেননিভ নরম বিছানায় শুইয়া শুইয়া মোটা পাশ-বালিশটার উপর ডান পা'টা তুলিয়া দিয়া ভাবিতে ভাবিতে তাহার ইচ্ছা সঙ্কল্পে পরিণত হয়, সঙ্কল্প দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়া ওঠে। সে শোয়া হইতে বিছানা ছাড়িয়া সোজা উঠিয়া বসে—কাজ, কাজ, কাজ চাই। কাজ করিতে হইবে, পরিশ্রম করিতে হইবে। পরিশ্রম ছাড়া কি কখনো কিছু হয়? না, হইয়াছে? শুধু প্রতিভা দিয়া কবেই বা কী হইয়াছে? শুধু পরিশ্রম দিয়া মানুষ পৃথিবীতে অসাধ্য সাধন করিতে পারে, করিয়াছে, তার বহু নজির আছে। পরিশ্রম করিতে পারার শক্তির নামই ত প্রতিভা। রবীন্দ্রনাথ যদি শুধু বসিয়া শুইয়া খাইয়া দিন কাটাইতেন, অন্য দশজন বড় লোকের ছেলের মতো যদি অর্থের থলির উপর মাথা রাখিয়া, অবসরের নরম মোলায়েম বিছানার উপর গা এলাইয়া দিয়া মদ্য আর নারী লইয়া জীবনটাকে গড়াইয়া দিতেন, তাহা হইলে তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা তাঁহাকে একদিনের জন্যও অমরত্ব দান করিতে পারিত না এবং বাংলা সাহিত্যও অপাঠ্য থাকিয়া যাইত। বিশ্ব-সাহিত্যের সহস্র ধারায় আমাদের সাহিত্যের ক্ষুদ্র আঙ্গিনা কি এমন রূপ রস বর্ণ গন্ধ ও জীবনের প্রাচুর্যে টগবগ করিত? নিউটন হইতে আজিকার রমণ পর্যন্ত কারই বা দিন-রাত জ্ঞান, খাওয়া-পরার নিয়ম, ছিল বা আছে? পরিশ্রম ছাড়া পৃথিবী গরীব থাকিত, অন্ধ থাকিত, বধির হইয়া থাকিত। ---সে খাট হইতে নামিয়া এবার ঘরের ভিতর পায়চারি করা আরম্ভ করিল; বাম হাতে গোঁপের বাম পার্শ্ব ঘুরাইতে ঘুরাইতে প্রথমে খুব সরু লৌহশলাকার মতো করিল, তারপর একটা আঙটিতে পরিণত করিল।

উপর্যুপরি একটির পর একটি সে তিনটি সিগারেট শেষ করিল। তারপর টেবিলের সামনে চেয়ারে বসিয়া কাগজ-কলম লইয়া সে রীতিমতো এষ্টিমেট কষিতে শুরু করিয়া দিল। কোন্ কাজে কত দরকার; এমনি কোন বীজনেস্ করিতে গেলে কোন্ বিষয়ে কত লাগিতে পারে; ঘর ভাড়া, ফার্ণিসার, মিনিয়ালস্, ষ্টাফ ইত্যাদি আলাদা আলাদা হেডে কত লাগিবে; মেক্সিমাম্, মিনিমাম ধরিয়া তার একটা এভারেজ খরচ কষিয়া

ফেলিল। সে দেখিল, একটু ভদ্রভাবে ষ্টার্ট দিতে গেলেও অন্তত ত্রিশ হাজারের কমে কোন বীজনেসেই হাত দেওয়া যায় না।

প্রথম প্রথম এ-সব এষ্টিমেট্ লইয়া সে জোহরার সঙ্গেও আলাপ করিত,--জোহরা কিছুই বলিত না, শুধু হাসি মুখেই সায় দিত। টাকা কত দিতে পারিবে, না পারিবে, সে-সব আভাস সে কোনদিন দেয় নাই। শুধু হাসিয়া সে রশিদের এ-সব ছেলেমানুষী উপভোগ করিয়াছে। শেষকালে যখন এ-সব স্কীমিং খুব ঘন ঘন হইতে লাগিল, তখন শোনা মাত্রই জোহরার এত ক্লান্তি আসিত যে, সে যেন আর হাসিবারও উৎসাহ পাইত না। অগত্যা তক্ষুণি সে বই পড়ায় বা অন্য কাজে মন দিত।

মাঝে মাঝে বলিত—চাকুরী কর ত বল, মিনিষ্টারকে ব'লে একটা জুটিয়ে দিই।...শুনিয়া মেয়েলোকের উচ্চাকাঙ্খা সম্বন্ধে রশিদ একেবারে হতাশ হইয়া যাইত। এই রকম দঃখের সময় বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে স্কুল হইতে কলেজ পর্য্যন্ত যত যুক্তি সে পড়িয়াছে ও শুনিয়াছে এবং এই বারো বছর ধরিয়া বাণিজ্যের সপক্ষে সে যত ভাবনা ভাবিয়াছে সব একে একে সে জোহরার উপর ঝাড়িবার উপক্রম করিত। জোহরা বই হইতে চোখ না তুলিয়াই বলিয়া বসে: বাংলাদেশের সাহিত্যিকেরা চরিত্র জিনিষটাই আদতে বুঝতে পারে না।...শুনিয়া, বক্তৃতার মাঝে রশিদও আশ্চর্য্য হয় এবং থামিয়া বলে—বাংলাদেশের সাহিত্যিক is a key maker of superstitions কেন বাংলা বই পড়তে যাও খামখা। উপন্যাস পড়তে হয় ইংরেজি উপন্যাস পড়।

চাকুরী সম্বন্ধে সেও যে ভাবে নাই, তাহা নহে। তবে চাকুরীর যে স্বাদ সে পাইয়াছে, সেই স্বাদ গ্রহণে তাহার আর প্রবৃত্তি হয় না। তার উপর চাকুরীর সীমারেখাই বা কতখানি,—সামনে পাঁচিল দিয়া পথ রোধ করা। একঘেয়ে গুণতি জীবন, গুণতি টাকা, না আছে বিরাট রকমের কোন চড়াই উৎরাই; না আছে লাভের আশাতীত আশা, না আছে লোকশানের ধারণাতীত আশঙ্কা।--এই সব ভাবিয়া চাকুরীর প্রস্তাবে জোহরার কথায় সে কোন উত্তর দেয় না। তার উপর, চাকুরী করিতে গেলে কতটুকু চাকুরীই বা পাওয়া যাইবে? আই. সি. এস., বি. সি. এস. ত আর সুপারিশে পাওয়া যায় না! জোহরার স্বামী হইয়া, মোটর হইতে

যাহার পা মাটিতে ঠেকাইতে হয় না, রাজা বাহাদুর ও নবাব বাহাদুরেরা যাহাকে পার্টিতে নিমন্ত্রণ করেন, তাহার এখানে নিমন্ত্রণ রাখিতে আসেন, এহেন তাহার পক্ষে একশ' দেড়শ' টাকার চাকুরী পোষাইবে কেন? জোহরার স্বামীর পক্ষে তাহা মানাইবেই বা কেন?

বেলা ন'টা সাড়ে ন'টায় ঘুম হইতে জাগিয়া, গোসল সারিয়া চা খাইতেই ত প্রায় এগারটা। তারপর সিগারেট ফুঁকিতে ফুঁকিতে কাগজে ছবি, প্রোপার্টি বিক্রী, বিয়ে ও এংলো ইণ্ডিয়ানের বৌ পালাইবার বিজ্ঞাপন দেখিতে দেখিতেই ত বেলা একটা। ইহার মধ্যে জোহরা হয়ত সারা কলিকাতা সহর একবার ঘুরিয়া আসে। বেলা ১টার সময় খাইয়া রশিদ দিবানিদ্রা আরম্ভ করে, আর সন্ধ্যা পাঁচটা পর্য্যন্ত নির্বিবাদে বিছানায় পড়িয়া থাকে। পাঁচটায় উঠিয়া চা পানের পর জোহ্‌রার পার্শ্বে বসিয়া কলিকাতা শহরের রাস্তায় রাস্তায় কিছুখানিক হাওয়া খাইয়া গোটা আটটায় বাসায় ফিরিয়া আসা। তারপর বসিয়া কি গড়াইয়া খাওয়ার সময় করিয়া তোলা। আর কী করিলে কী হইতে পারে তাহারি একটার পর একটা স্কীম্ করা ছাড়া ত তাহার কোন কাজ নাই। খাইয়াই, রেডিও যতক্ষণ চলে চলিল; তারপরেই ত আবার ঘুমানো। এই ত তাহার জীবন। মাঝে মাঝে তাহার মন বিদ্রোহী হইয়া ওঠে। মাথা ঝাড়া দিয়া মনে মনে বলে---না, এই ভাবে আর আল্‌সেমী করলে চলবে না, সময় বয়ে চলেছে। সে মনে মনে ঠিক করে, যা হয় আগামী পহেলা বৈশাখ হইতেই কিছু একটা শুরু করিতেই হইবে। বিলাতে গিয়া সায়েন্স 'পড়িবার কথা একবার জোহরার কাছে উত্থাপন করিয়াছিল, জোহরা হাসিয়া কথাটা এক ফুয়ে উড়াইয়া দিয়া বলিয়াছিল---Morning shows the day, টাকাগুলিই শুধু জলে ফেলা হবে।

অগত্যা সেই পথের মোহ ত্যাগ করিয়া সে এইবার একান্তভাবে ব্যবসার কথা ভাবিতে লাগিল। বিনিময়ের সহস্র স্রোতধারা ধরিয়া একেবারে সাগর-মুখে পাড়ি দিতে হইবে, এই তাহার সঙ্কল্প। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস সে ব্যবসা সম্বন্ধে জোহরাকে রাজী করাইতে পারিবে। কারণ, ব্যাঙ্কের জমা টাকা একদিন শেষ হইয়া যাইবেই যদি না সেটাকে বাড়াইবার চেষ্টা করা হয়। এইটুকু জোহরার মতো বুদ্ধিমতী মেয়ে নিশ্চয়ই

বুঝিতে পারিবে। এই কলিকাতার উপরই ত কত লোক সামান্য টাকাকে নাড়াচাড়া করিয়া ক্রোরপতি হইয়াছে, আবার কত ক্রোরপতি শুধু পৈত্রিক জমা টাকা ভাঙ্গিয়া খাইয়া পথের ধুলায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জোহরা অন্তত এইটুকু ভাবিতে এবং বুঝিতে পারিবে, বিনা কারণেই রশিদ এই বিশ্বাস আপন মনে পোষণ করিয়া বসে।

দেখিতে দেখিতে বৈশাখ মাস আসিয়া পড়িল। কিন্তু প্রস্তাবটি সাহস করিয়া সে এখনো জোহরার কাছে উত্থাপনই করিতে পারে নাই। বিবাহের আগে জোহরার বাড়ীতে যখন সে উঠিয়া আসে নাই, তখন জোহরার সঙ্গে কত বড় বড় বিষয় সে অসঙ্কোচে আলোচনা করিয়াছে। জোহরার কী করা উচিত, কী করা উচিত নয়, সেই সম্বন্ধে একদিন দৃঢ় বিশ্বাস ও জোরের সঙ্গে কত উপদেশই- না সে বর্ষণ করিয়াছে! কোন্ পথে জোহরার জীবন পরিচালনা করা উচিত, কী করিলে তাহার জীবন মহৎ ও গৌরবের হইতে পারে, এ-সম্বন্ধেও একদিন তাহার পরামর্শ জোহরা শ্রদ্ধার সঙ্গে না হউক মনোযোগের সঙ্গে অন্তত শুনিয়াছে। কোন কোন পরামর্শ গ্রহণ পর্য্যন্ত করিয়াছে। পুরোনো গাড়ীটা বিক্রী করিয়া নূতন গাড়ী ত তাহারই পছন্দ-মতো কেনা হইয়াছে। প্রসবের সময় তাহার পরামর্শ-মতোই নার্সিং হোমে না গেলে সে ত সেইবার বাঁচিতই না।

আজ ছোট বড় কোন ব্যাপারেই তাহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা হয় না। তাহাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করা এখন জোহরা কেন, চাকর-চাকরানীরাও অনাবশ্যক মনে করে। পর্ব উৎসব পার্টি নিমন্ত্রণে কী কী আয়োজন হইবে, কাহাকে কাহাকে নিমন্ত্রণ করা হইবে, এমন কি অতি তুচ্ছতম বিষয়েও তাহার মতামতের অধিকার ও যোগ্যতা এখন কেহই যেন স্বীকার করে না। যাহা যাহা দরকার, এখন জোহরা নিজেই সব করে। জোহরার প্রয়োজনের জীবন হইতে এইভাবে বাদ পড়িতে পড়িতে এখন জোহরার কাছে কোন কাজের কথা তুলিতেও তাহার আর সাহসে কুলায় না। কাজেই তাহার সঙ্কল্পের কথা বলি বলি করিতেই পহেলা বৈশাখ পার হইয়া গেল। যেই পহেলা বৈশাখ পার হইয়া গেল, মনে

হইল যেন তাহার মনের উপর হইতে একটা ভারী বোঝা নামিয়া গেল, বুক অনেকটা হাল্কা বোধ হইল। ভালো করিয়া নিঃশ্বাস লইয়া সে এইবার সঙ্কল্প করিল—না, পহেলা জানুয়ারী হইতেই আরম্ভ করিতে হইবে। দুনিয়ার সব কাজ-কারবার ইংরেজী হিসাবে চলিতেছে, অতএব ইংরেজী বছরের প্রথম হইতে আরম্ভ করাই ভালো, এই বেশ হইবে। এই সঙ্কল্প গ্রহণের পর বেশ নিশ্চিন্ত আরামে তাহার দিন কাটিতে লাগিল।

সাহস করিয়া বিপদ ঘাড়ে না নিলে যে কিছুই হয় না, এই কথা রশিদ বেশ ভালো করিয়া জানে। কিন্তু জানা এক কথা এবং সেটাকে কাজে খাটানো অন্য কথা। সত্যের মাহাত্ম্য, পরোপকারের জন্য, ন্যায় ও সত্যের জন্য আত্মদানের গৌরব কার না মুখস্থ আছে! তবুও কয়জনে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারে? পারে না বলিয়াই, যাঁহারা পারেন, সেই সব অসাধারণদের জন্য মানুষ প্রশংসার বাণী উচ্চারণ করে। আত্মনির্ভরতা সম্বন্ধে নোয়াখালীর মোল্লাও তিন ঘণ্টা ধরিয়া বক্তৃতা দিতে পারে। কিন্তু তবুও পৃথিবীতে পরমুখাপেক্ষীর সংখ্যাই বেশী। কাজেই, বেচারা রশিদেরই বা কী অপরাধ? যাহা হউক, শেষ পর্য্যন্ত প্রসঙ্গক্রমে একদিন সে কথাটা বলিয়াই ফেলিল। শুনিয়া জোহরা শুধু আশ্চর্য্য হইল না, কিছুক্ষণের জন্য রীতিমতো অবাক্ হইয়াই রহিল। তারপর হো হো করিয়া হাসিয়া, টেবিলে সজোরে একটা কিল মারিয়া বলিয়া উঠিল—'তুমি ব্যবসা করবে! তা হলে দুনিয়ায় ব্যবসা কে করবে না, শুনি? ব্যবসা কি এতই সোজা?'

সুযোগ সুবিধা পাইলে সে-ও যে অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারে, ব্যবসা করিয়া পৃথিবীতে যাহারা সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে তাহাদের যে কাহারও চারখানা হাত বা মাথায় যে অন্তত এক জোড়া শিং নাই, এই সম্বন্ধে ইচ্ছা করিলে সে খুব জোর বক্তৃতা দিতে পারিত। কিন্তু জোহরার অবজ্ঞা-মিশ্রিত হাসি দেখিয়া তাহার আর সেই সাহসই হইল না।

এইভাবে জানুয়ারী ও বৈশাখ আরও কয়েকবার আসিল এবং যথনিয়মে পার হইয়াও গেল।

আশ্চর্য্যের বিষয়, অল্প দিনেই টের পাওয়া গেল, রশিদ খোকনের নাম শুনিতেই পারে না, খোকনের গন্ধ পাইলেই তাহার সারা শরীর যেন বিষাক্ত হইয়া ওঠে, এক অস্বাভাবিক ঈর্ষা ও ঘৃণায় তাহার সর্ব শরীরের রক্ত যেন উষ্ণজলের মতো ফুটিতে থাকে। তাহার মনে হয়, তাহাদের দুই জীবনের সুখের মাঝে এ অযথা অনধিকার-প্রবেশ করিয়াছে। তাহাদের সুখে ভাগ বসাইয়াছে, এবং হয়ত ইহারই জন্য সে জোহরার ভালোবাসায় একাধিপত্য পাইতেছে না। বসিয়া হাসি-তামাসা ও গল্প-গুজবে হয়ত ডুবিয়া আছে; কিন্তু যেই মাত্র খোকন সেই ঘরে ঢোকে, অমনি তাহার সারা শরীর রি রি করিয়া ওঠে, ঠোঁটের হাসি আত্মহত্যা করিয়া বসে, মুখের কথা মুহূর্ত্তে জীবনী-শক্তি হারাইয়া ফেলে, মানসিক স্থৈর্য্য ও শান্তি এক মুহূর্ত্তে দূর হইয়া যায়। খোকনকে যখনি জোহরার পিছনে পিছনে ফ্যা ফ্যা করিয়া ন্যাওটা ছেলের মতো ঘুরিতে দেখে, তখন কতবারই ত তাহার ইচ্ছা হইয়াছে উহাকে লাথি মারিয়া দোতলা হইতে একেবারে নীচে ফেলিয়া দেয়। যখন ও ঠোঁট বাঁকাইয়া মাথা দুলাইয়া রাজ্যের মাথামুণ্ড ব্যাপার লইয়া বক্ বক্ করিতে থাকে, তখন রশিদের ইচ্ছা হয় তাহার সারা গাল বেড়াইয়া একটি বাহান্ন সিক্কা ওজনের থাপ্পড় বসাইয়া দিয়া তাহার মুখের কথা চিরদিনের মতো বন্ধ করিয়া দেয়। সত্যি সত্যি, কেউ যখন সামনে থাকে না, তখন সুযোগ পাইলেই সে দুই একটা চিমটি, ঠোকর, চড়, যখন যাহা সুবিধা পায় দেয় না যে এমন নয়। যেন কত আদরই করিতেছে, হাত বাড়াইয়া ধরিয়া হয়ত অলক্ষ্যে এমনি এক চাপ দিয়া বসে যে, তাহাতে খোকন রীতিমতো ব্যথাই পায়। ফলে, তাহাকে দেখা মাত্রই খোকনের মুখের হাসি মুহূর্ত্তে নিভিয়া যায়।

রশিদের মনে হয়, যেন এই ক্ষুদ্র ছেলেটিই তাহার সমগ্র জীবনের ক্ষুদ্রতা, অক্ষমতা ও পরাজয়কে সকলের সামনে বিঘোষিত করিয়া বেড়াইতেছে। একটি সামান্য চাকরানীর সহিত তাহার দূর-অতীতের একটি লজ্জাকর সম্পর্ককে এই ছেলেই জোহরার সামনে উজ্জ্বল ও অবিস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। তাহার জন্যই হয়ত জোহরার পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা সে আজও পাইতেছে না। খোকন চোখের সামনে

না থাকিলে এইসব কথা জোহরা কবেই হয়ত ভুলিয়া যাইত। যতই সে এইসব চিন্তা করে, ততই তাহার মন খোকনের উপর বিরক্ত হইয়া ওঠে।

কতদিন তাহার ইচ্ছা হইয়াছে—ঘুমন্ত অবস্থায় এই ছেলেটিকে গলা টিপিয়া শেষ করিয়া দিলে হয় না! কতদিন সে খোকনের সরু তুলতুলে গলার দিকে হাত পর্য্যন্ত বাড়াইয়াছে। কিন্তু কি জানি কেন, শেষ পর্য্যন্ত সে সেই চরম মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সাহসই বজায় রাখিতে পারে নাই। খোকনের প্রতি তাহার এই অহেতুক অবজ্ঞা ও বিরাগ নিশ্চয়ই জোহরার চোখ এড়ায় নাই। কাজেই, খোকনের যে কোন অপঘাতে জোহরার সন্দেহ তাহার উপর পড়িবেই, এই আশঙ্কা হয়ত তাহার ছিল। তখন যে-ছায়ায় শুইয়া শুইয়া সে এখন রাতকে দিন ও দিনকে নির্ভাবনায় রাত করিতেছে, তাহা হয়ত হারাইতেই হইবে।

দুপুরে অথবা সন্ধ্যা বেলা খোকন হয়ত বসিয়া বসিয়া স্নেক-লেডার, লুডু অথবা কেরম্ খেলিতেছে, একাকী হয়ত ষ্ট্রাইকার দিয়া এমনি হাত মশ্‌ক করিতেছে, মাঝে মাঝে জোহরাও তাহার সঙ্গে হয়ত যোগ দেয়। হয়ত তখন কোথা হইতে রশিদ আসিয়া প্রবেশ করিল। খোকনকে দেখা মাত্রই তাহার মাথা গরম হইয়া উঠিল। সে তৎক্ষণাৎ ধমক দিয়া বলিয়া ওঠে—যা, যা, পড়তে যা, খালি দিন রাত খেলা, মাষ্টার ত সারাদিন বসেই কাটায়।

বালকের মুখের হাসি এক মুহূর্ত্তে নিভিয়া যায়। চোখ-মুখ শ্রাবণ আকাশের মতো কালো করিয়া সে জোহরার মুখের দিকে মুখ ফেরায়।

জোহরা চোখ না তুলিয়াই জবাব দেয়—তুই খেল, এখন পড়বার সময় নয়।

রশিদ যেন অভিমান করিয়াই বলে—এখন পড়বার সময় নয় ত কখন পড়বার সময়? তুমি 'নাই' দিয়ে দিয়ে ওকে একেবারে নষ্ট ...।

এইবার জোহরা বিদ্রূপ-কণ্ঠে বলিয়া ওঠে: অত পড়লে তোমার মতো নিষ্কর্ম্মা হয়ে যাবে।—রাগে রশিদের মুখে কথাই জোগায় না। মেয়েলোকের বিদ্রূপ, পুরুষের অকর্ম্মণ্যতা-অক্ষমতার প্রতি ইঙ্গিৎ।

সে চিন্তার খেই হারাইয়া বসে। দুপ্ দুপ্ করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া যায়। নামিতে নামিতে প্রতি পদক্ষেপে কিন্তু ভাবে, জোহরা হয়ত ডাকিবে, ফিরিবার জন্য অনুরোধ করিবে। পায়ের গতি আপনাআপনি মন্থর হইয়া পড়ে। নীচে দরজার কাছে কিছুক্ষণ থমকিয়াও দাঁড়ায়। তারপর ধীরে ধীরে গেট পার হইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়ে। বেকার ভবঘুরের মতো অনির্দেশ এ-রাস্তা হইতে ও-রাস্তা, পরিচিত এ-বাসা হইতে ও-বাসায়, অনর্থক এখানে ওখানে হাঁটিয়া গল্প-গুজবে সময় কাটাইয়া ট্রামে উঠিয়া বসিতেই তাহার মনে হয়—তাহার জীবনটা একটা বোঝা, নিজেরও, পরেরও। অনাবশ্যক পরের অনুগ্রহ সে ভোগ করিতেছে বটে, কিন্তু পরের শ্রদ্ধা ভালোবাসা সে কিছুমাত্র অর্জন করিতে পারে নাই। বন্ধুরা তাহার সৌভাগ্য দেখিয়া ঈর্ষা করে, তাহারা তাহাকে lucky king উপাধি দিয়াছে। lucky king বলিয়াই তাহারা তাহাকে ডাকে। ডাকিবেই ত। তাহারা কেউ চল্লিশ টাকার কেরানী-গিরি, কেউ পঞ্চাশ টাকার মাষ্টারী, কেউ হকারী, কেউ ইন্সিউরেন্সের দালালী করিয়া, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জীবন কাটায়। অথচ দুই বেলা খালি অন্ন জোটানোর অতিরিক্ত, জীবনের বিচিত্র উপভোগের পথে একটু লোভ করিবার, একটু হাত বাড়াইবার সাহস পর্য্যন্ত তাহারা পায় না। আর, সে কি না বিনা আয়াসে, নির্ভাবনায় নবাবী-হালে খাওয়া-পরার চূড়ান্ত করিতেছে এবং আলস্যে ভরপুর তার উদ্বেগহীন তাড়াহুড়াহীন দিনগুলি শুধু গড়াইয়াই কাটাইতেছে। রোজ ক্ষুধা পা'ক বা না পা'ক, খাবার আগ্রহ হউক বা না হউক, খাবার জুটুক বা না জুটুক—খাইয়া বা না খাইয়া নিয়মিত দশটার আগে ছাতা বগলে তাহাদের মতো দৌড়াইতে হয় না। একটু দেরী হইলে বুকের পাল্‌পিটেশন্ ও অস্বাস্থ্যকর ধুকধুকানি তাহার ত ভুগিতে হয় না। এখন তাহার পক্ষে তিন শ পঁয়ষট্টি দিনই ত রবিবার। তার উপর, সে দেশ-বিখ্যাতা জোহরার স্বামী,—যে জোহরার জন্য তাহারা সব সময় আই. সি. এস. নিদেনপক্ষে নবাবজাদা কল্পনা করিয়া আসিয়াছে। কাজেই, তাহার প্রতি প্রত্যেক মধ্যবিত্ত পরিবারের কলেজে-পড়া ছেলেরই ঈর্ষা হওয়ার কথাই ত। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এখন কিন্তু তাহার ধারণা সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহার ধারণা এবং সেই ধারণা এখন দিন দিনই তাহার বদ্ধমূল হইতেছে যে,

তাহার মতো লোকের আত্মহত্যা করা উচিত। পরান্নে, পরের অনুগ্রহে, পরের ছায়ায়, পরগাছার মতো জীবন তাহার বিষাইয়া উঠিয়াছে; তাহার চাইতে পঁয়তাল্লিশ টাকার হাড়গোড়-ভাঙ্গা কেরানী ঢের বেশী সুখী। তাহারা পরের টাকার পেরাসাইট্ নয়—দশটা পাঁচটার বেশী চব্বিশ ঘণ্টা ধরিয়া তাহাদের ত পরের হাসি ধার করিয়া হাসিতে হয় না।

নিজের পরিশ্রম-লব্ধ অন্ন কী মধুর! পূর্ব্বের সেই পঁয়তাল্লিশ টাকার জীবনের ছবি রশিদের চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে। তখন কি সে এ-রকম অসুখী ছিল? ঘর্ম্মাক্ত শরীরের প্রতি লোমকূপে তখন জীবন নৃত্য করিয়া ফিরিত। এখন ত মনে হয় দেহের সে-সব ছিদ্র যেন বন্ধ হইয়া গেছে—তাহার ভিতর দিয়া আর বসন্তের দক্ষিণা বাতাস প্রবেশ করিয়া শরীরকে নাচাইয়া তোলে না। অথচ এত বড় সুখের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া অনিশ্চয়তার আবর্ত্তে পা দিতেও এখন আর বুকের ভিতর জোর পাওয়া যায় না। জোর, যথেষ্ট জোর একদিন তাহার মনে ছিল; আজ কি করিয়া কোথায় যেন সব মিলাইয়া গিয়াছে। সুখ ঐশ্বর্য্য উদ্বেগহীনতা ছাড়া, জোহরার নামের মোহ এবং গৌরবও কম না কি? জোহরার স্বামী—এই গৌরবে তাহার বিবাহের খবর পর্য্যন্ত সংবাদপত্রে ছাপা হইয়াছে। এই পদ-গৌরবেই সে এখনও ধনী ও অভিজাত সমাজে পরিচিত। শুধু পরিচিত নয়, এই কারণেই সে distinguished পর্য্যন্ত হইয়া পড়িয়াছে। যাহারা তাহাকে জানিত না, এখন তাহারা পর্য্যন্ত চিনে, কেহ কেহ সালামও করে। গ্র্যাণ্ড হোটেল, ফারপো বা প্লেটির বাড়ীর পার্টিতে নিমন্ত্রণ পর্য্যন্ত আসে। তাহাকে চিনে না, জানে না, কোনদিন দেখে নাই, এমন কত বড় বড় বাড়ীর ছেলেমেয়ের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র তাহার নামে আসে। জোহরার সঙ্গে বিবাহ না হইলে এ কখনো সম্ভব হইত! তাহার সম-সাময়িক বাংলায় তাহার সমবয়সী, সম-অবস্থাপন্ন ও সম-লেখা-পড়া-জানা কত শত যুবকই ত রহিয়াছে। কেহ তাহাদিগকে পোছে, না, জিজ্ঞাসা করে? দ্রাক্ষা-বঞ্চিত শৃগালের মতো কোন বন্ধু বিবাহের সময় নেপথ্যে—একবার বিবাহ হইয়াছে, এক ছেলের মা ইত্যাদি—বলিয়া নাকি নাক সিটকাইয়া ছিল। আহম্মকেরা জানে না যে, এ অর্থনীতির যুগ, বাটখাড়া তুলিয়া

দেখিতে হইবে কোন্ দিক্ ভারী। জোহরার রূপ আছে, যৌবন আছে, বাড়ী আছে, গাড়ী আছে, ধন আছে, লেখাপড়াও সে জানে, আর কী চাই? একবার বিবাহ বা ছেলে হওয়ায় এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া পড়িল? আর তাহাও ত সব হালাল-ভাবেই হইয়াছে! খোকনের মতো হারাম......! সেই সব বন্ধুদের মুখের হাসি আজ কোথায়? তথাকথিত কুমারী বৌয়ের পরণের নেংটি আর মুখের ক্ষুদ জুটাইতেই ত তাহার সেই হিতৈষী-বন্ধুরা আজ নাজেহাল ও গলদ্‌ঘর্ম্ম। না, ভাগ্য ভালোই বলিতে হইবে। নিজের বাড়ীতে মা-বাপ-ভাই-বোনের মধ্যে মান-অভিমান, ঝগড়া-বিবাদ, মতবিরোধ কি হয় না? আলবৎ হয়। কাজেই, সারা দিন টো টো করার পর, সন্ধ্যায় সে আবার যথাস্থানে ফিরিয়া আসে। জোহরার সঙ্গে হাসিয়া রসিকতা করিয়া আলাপ জমাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে খোকনের প্রতি ঈর্ষা তুষের আগুনের মতো জ্বলিতে থাকে।

একদিন, তখন খোকনের বয়স আরও কিছু কম ছিল। সন্ধ্যাবেলা, তখনো বাতির সুইস্ সব ঘরে টিপিয়া দেওয়া হয় নাই। জোহরা পেছনের বারান্দায় বসিয়া খোকনের জন্য গরম মোজা বুনিতেছিল। হঠাৎ নীচে সিঁড়ির গোড়ায় যেন খোকন চেঁচাইয়া কাঁদিয়া উঠিল! রশিদ বোধ হয় তখন সিঁড়ি দিয়া উঠিতেছিল। হয়ত পতনশব্দ শুনিয়াই সে তাড়াতাড়ি খোকনকে কোলে তুলিয়া লইয়া চেঁচাইয়া উঠিল—ইস্, আর একটু হ'লে...। তারপর চাকর-চাকরানীদের নাম ধরিয়া এ'কে ও'কে ডাক-হাঁক দিয়া তাড়াহুড়া করিয়া একেবারে হুলস্থূল বাধাইয়া দিল। জোহরা ও চাকর-বাকর ছুটিয়া আসিয়া দেখে, পড়িয়া গিয়া খোকনের ডা'ন ভ্রূর উপরিভাগ কাটিয়া গেছে এবং লাল রক্ত-স্রোত তাহার কপাল বাহিয়া গায়ের জামা পর্য্যন্ত ভিজাইয়া দিয়াছে। জোহরা তাড়াতাড়ি নিজের আঁচল দিয়া খোকনের ক্ষত-স্থান চাপিয়া ধরিল এবং অন্য হাতে তাহার গাত্রবস্ত্র দিয়াই খোকনের গাল হইতে রক্ত মুছিয়া লইল। সত্যই আর একটু হইলে সর্বনাশ হইত। সিঁড়ির পুরাতন লোহার রেলিং তুলিয়া ফেলিয়া তাহাতে শ্বেত মর্ম্মরের রেলিং লাগানো হইতেছে; নূতন রেলিং লাগানো এখনো সম্পূর্ণ হয় নাই। কান্নার প্রথম চোট থামিতেই, কি

করিয়া সে পড়িল তাহা জোহরা জিজ্ঞাসা করার আগেই খোকন বলিয়া উঠিল—মা, উঠবার সময় উনি আমাকে ধাক্কা মারলেন কেন?

রশিদের রাগ মাথায় চড়িয়া বসিল। খোকনকে কোল হইতে দুম্ করিয়া সেখানে রাখিয়া সে চেঁচাইয়া উঠিল—হারামজাদা, আমি ধাক্কা দিলাম কি রকম? উপকারের নাম নেই, না? আমি না ধরলে এতক্ষণে ত পটল তুল্‌তে...।

জোহরা শিহরিয়া উঠিল। খোকনের প্রতি রশিদের বিরাগ সে লক্ষ্য করিয়াছে। কিন্তু অকারণে একটি ক্ষুদ্র শিশুর প্রতি মানুষ এতখানি নির্ম্মম হইতে পারে, এ সে কখনো ভাবে নাই।

সেই মুহূর্ত্তে খোকনের আঘাত ও রক্ত দেখিয়া সে এতখানি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তখন ঐ বিষয় নিয়া উচচবাচ্য করার প্রবৃত্তি তাহার হইল না। তাড়াতাড়ি নিজেই একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিয়া, সে ডাক্তারের জন্য গাড়ী পাঠাইয়া দিল। এবং খোকনকে লইয়া নিজের ঘরে আসিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

ঘণ্টা খানেকও বোধ করি পার হয় নাই। কাপড় ছাড়িয়া হাতমুখ ধুইয়া ধীরে ধীরে জোহরাকে একখানি হাসি উপহার দিয়া রশিদ বলিল,—জান, একেই বলে দুধ-কলা দিয়ে কাল সাপ পোষা।

জোহরার গম্ভীর মুখ হইতে উত্তর হইল—কেন?

—যে এ-বয়সে এমন ডাহা মিথ্যা বল্‌তে পারে, সে যে বড় হ'লে কী চীজ্ হবে তা অনুমান করতে পারছ না?

—তা বেশ পারছি, তার জন্য কিন্তু তোমার ভাবতে হবে না।

—হারামজাদা, বাপের ঠিক নেই যার, সেই সব ছেলেপুলে কি কখনও ভালো হয়? থর্ণ্ডাইক প্রমুখ মনস্তত্ত্ববিদরা ত প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন, মানুষ হেরেডিটির বাইরে যেতে পারে না।

উত্তপ্ত কণ্ঠে জোহরা বল্লে—এ-সব কথা মুখে আন্‌তে তোমার লজ্জা হয় না?

—কেন লজ্জা হবে? আমি জানি ব'লেই ত বল্‌ছি। ওর মা মাগী কত লোকের সঙ্গে ঢলাঢলি করেছে। কার ছেলে না কার ছেলে—তুমি

মাঝখান থেকে শুধু জলের মতো টাকা খরচ ক'রে মরছ। এতদিন বলিনি। আজ বলছি, তুমি যা ভেবেছ তা নয়। ও আমার—নয়।

এইবার যেন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি হইল। জোহরা আর নিজেকে সামলাইতে পারিল না—অন্ধ মিথ্যাবাদী! এই চোখ, এই চুল, এই নাক কি তোমার নয়? মিথ্যে ব'লে মানুষকে ফাঁকি দিতে পার, কিন্তু বিধাতার হাতকে ত ফাঁকি দিতে পারনি!

'বেত্রাহত কুকুরের মতো' কথাটা বাংলা সাহিত্যে অতি-ব্যবহারের ফলে বড় একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে। পুনরুক্তি এড়াইবার জন্য ওটা বাদ দিতে হইল। তবে এই কথা সত্য, কথাটা শুনিয়া রশিদ বড় অসহায়ের মতো ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। যাইতে যাইতে অবশ্য, এই বাড়ী ছাড়িয়া যাইবার সঙ্কল্প সে আবারও করিল। কিন্তু এই কথাও ঐতিহাসিক সত্যের সমান সত্য যে, পরদিন সকাল বেলা চা'র টেবিলে তাহার আসন শূণ্য ছিল না, তাহাকে টোষ্ট রুটী দিয়া অর্দ্ধ-ভাজা ডিম পরম আনন্দে ভক্ষণ করিতে দেখা গিয়াছে। এবং শপথ করিয়া বলিতে পারি, ঐসব তাহার গলায় একটুও আটকায় নাই,—চা'র গন্ধটা ভালো হওয়াতে উপর্য্যুপরি বরং দুই কাপ চা-ই সে আজ খাইল। সিগারেট বোধ হয় ফুরাইয়া গিয়াছিল। চাকরকে বলিতেই সে জোহরার কাছ হইতে পয়সা লইয়া সিগারেটও আনিয়া দিল।

ইহার পর বহুদিন গত হইয়াছে। আরও বহুদিন নির্ব্বিবাদে গত হইতে পারিত। কিন্তু রশিদটা কিছুতেই যেন জোহরার গা-সহা হইয়া উঠিতে পারিতেছে না। আগে বরং অন্যকে আমোদ দিবার এবং নিজেকে আমোদে রাখিবার একটা অসাধারণ ক্ষমতা তাহার মধ্যে দেখা যাইত, এখন দিন দিন তাহাও সে হারাইয়া ফেলিয়োছে। আগে সামান্যতেই সে হো হো করিয়া হাসিয়া বাড়ী গুলজার করিয়া তুলিত। এখন তাহার হাসিতে সেই উল্লাস, সেই জীবনীশক্তি আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আগে ছোট ছেলেমেয়েদের মজলিশে বহু ঘটনা মুখে মুখে রচনা করিয়া অদ্ভুত অবিশ্বাস্য সব ভূতপরীর গল্প একটানা বলিয়া যাইতে পারিত; আর অন্যের মুদ্রাদোষগুলি এমন নিখুঁতভাবে অনুকরণ করিতে পারিত যে, অতি বড় গম্ভীর লোককেও সে এক মুহূর্ত্তে হাসাইয়া ছাড়িত।

সে যখন কথা বলিত, মনে হইত যেন জলস্রোত প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। জোর করিয়া না থামাইলে সে ত থামিতেই জানিত না। তাহার সেই সব শক্তি এখন কোথায় গেল, সে নিজেও তাহা ভাবিয়া পায় না। এখন তাহাকে দেখিলে অতি বড় উৎসাহী লোকেরও শরীরে আলস্য ধরিয়া যায়। সে যেন এক মূর্ত্তিমান সুপ্তি। তাহাকে দেখিলে এখন জোহরার ত রীতিমতো হাই উঠিতে থাকে।

জোহরার সঙ্গে বিবাহ হওয়ার পূর্ব্বে রশিদ কিন্তু এই রকম ছিল না। তখন তাহার সামনে এক গৌরবময় ভবিষ্যৎ তরঙ্গিত হইয়া ফিরিত। কৃতিত্বের সঙ্গে পরীক্ষার ব্যূহের পর ব্যূহ ভেদ করিয়া নিজের সমগ্র শক্তির পরিচালনায় সে সৃষ্টি করিবে তাহার নূতন জীবন, গড়িয়া তুলিবে সফলতার নূতন বুনিয়াদ, এই ছিল তাহার সঙ্কল্প। পিতার সম্পত্তি, সে ত লটারীর টাকা। উত্তরাধিকার-সূত্রে তাহা ভোগ করা, সে ত নিজের শক্তির মৃত্যুকে ডাকিয়া আনা,—এই ছিল তখন তাহার মত।

এমন কি, শেষ পরীক্ষা পাশ করার পর সে বাড়ীর সাহায্য নেওয়াই বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। স্বাধীনভাবে অন্ন সংস্থানের জন্য, নিজের পায়ে নিজেকে দাঁড় করাইবার জন্য, নিজের বৃহত্তর ও ব্যাপকতর ভবিষ্যৎ গড়িবার কল্পনা লইয়াই সে কলিকাতায় আসিয়া উঠিয়াছিল। আরম্ভের ক্ষুদ্রতার জন্যে সে কোনদিন ভাবে নাই। ক্ষুদ্র আরম্ভই যে একদিন তাহাকে বিরাট পরিণতির দিকে লইয়া যাইবে, আজিকার ক্ষুদ্র বীজ যে একদিন বিরাট মহীরূহে পরিণত হইবে সে-বিষয়ে তাহার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। নিজের শক্তি পরিশ্রম ও সাধনায় এই পঁয়তাল্লিশ টাকার পাতালপুরী হইতেই সে যে একদিন গৌরবের গৌরীশৃঙ্গে আরোহণ করিতে পারিবে, বুকে এই দুঃসাহস ও আত্মপ্রত্যয় লইয়া সে তাহার পঁয়তাল্লিশ টাকার কেরাণীগিরি আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। বহু বড় লোকের এমন ক্ষুদ্র আরম্ভের নজির তাহার জানা আছে, কাজেই সে কোনদিন হতাশ বোধ করে নাই। শুধু দুই সংখ্যার সম্বল লইয়া জীবন আরম্ভ করিয়া ক্রোরপতি হইয়াছেন, এমন বহু লোকের বহু দৃষ্টান্ত জানা আছে। কাজেই সেও মাত্র পঁয়তাল্লিশ টাকায় আরম্ভ করিয়া দিল তাহার সাধনা। এগারটায় অফিস বসে; সে কিন্তু নিয়মিত দশটায় এমন কি

কোন কোন দিন সাড়ে নয়টায় অফিসে গিয়া হাজির হইত; পাঁচটার জায়গায় ঐ দিকে সাতটা পর্য্যন্ত থাকিয়া ফাইলের পর ফাইল নকল করিয়া চলিত। অন্য কেরাণীরা সুযোগ পাইলেই ফাঁকি দেয়; হেড ক্লার্ক আসন হইতে উঠিলেই নিজেরা কলম ছাড়িয়া বাজে গল্প-গুজবে লাগিয়া যায়। তাহাকে কিন্তু চেষ্টা করিয়াও তাহারা কোনদিন দলে ভিড়াইতে পারে নাই। একটু পান বিড়ি খাওয়া, এক আধটু খোশ আলাপ-আলোচনা করা, সে কিছুই পছন্দ করিত না। বরং তাহাদের এইসব দেখিয়া লজ্জায় তাহার মাথা হেট হইয়া যাইত। বাঙালীর অধঃপতনের মূল যে কোথায়, এত দিনে সে যেন তাহা ধরিতে পারিয়াছে। নিজের ডিউটীতে এইভাবে ফাঁকি দেওয়াকে সে জাতীয় চরিত্রের অবনতি বলিয়াই ভাবিত। ভাবিত, জীবন-যুদ্ধে বাঙালীর সর্ব্বাঙ্গীন পরাজয়ের মূলে রহিয়াছে এই ফাঁকিবৃত্তি,—নিজ কর্ত্তব্যকে অবহেলা। আফিসে যাতায়াতের সময় সে কদাচিত ট্রামে চড়িত। সে মনে করিত, মানসিক পরিশ্রমের আগে পরে কিছু শারীরিক পরিশ্রম স্বাস্থ্যের অনুকূল। মেসের অনেক কাজও সে নিজেই করিত। সমস্ত বাড়িটায় ঝাঁট দেওয়া তাহার একার কর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল না যদিও, তবুও ঘুম হইতে উঠিয়াই সে একবার উপরে নীচে সমস্ত বাড়িটা ঝাঁট দিয়া দিত। দরিদ্র স্বল্প-বেতনের কয়েকজন কেরাণী মিলিয়াই তাহারা এই মেসটা করিয়াছে। চাকর-নফর তাহারা রাখে নাই। পালা করিয়া রান্না হইতে আরম্ভ করিয়া দেহ-ধারণের যাবতীয় কাজই নিজেরাই করিত। চাকর রাখিবার প্রস্তাব যে কয়েকবার না উঠিয়াছে তাহা নহে, কিন্তু রশিদের আপত্তিতেই তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। বেশীর ভাগ কাজ ত সে-ই করে, ভারী বাজার পর্য্যন্ত সে নিজে বহিয়া আনে। কাজেই, মেসে তাহার মতামতটা সকলে গ্রাহ্য করে বৈ কি। চাকর রাখার কথা উঠিলেই সে বলিয়া উঠিত—'প্রত্যেকের নামে যেদিন সেভিংস্ ব্যাঙ্কে অন্তত হাজার টাকা ক'রে জমা হবে সেদিনই চাকর রাখবার প্রস্তাব উঠাতে পারবে।'

সারাদিনের পরিশ্রম ক্লান্তির পর খাওয়া-দাওয়া করিয়া শুইলেই তাহার মনে হইত, শরীরের শিরায় শিরায় প্রতি স্নায়ুমণ্ডলীতে যেন নূতন

জীবন-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যেন কাজ করিবার শক্তি ও যোগ্যতা বাড়িয়া গেছে।—শরীরের অণুপরমাণুতে শক্তি, আরাম ও কর্ম্মক্ষমতার মৃদু বিচরণ ও ব্যাপ্তি অনুভব করিতে করিতে ও তার অনাবিল আনন্দ উপভোগ করিতে করিতে তাহার মনে হইত—স্বর্গ, স্বর্গ। ইহা হইতে বঞ্চিত হওয়া মানে, জীবনের অপূর্ব আস্বাদ হইতে বঞ্চিত হওয়া।

মানব-জীবনে বিস্ময়ের অবধি নাই—অথচ ঠিক এইরকম সময়ে যখন জোহরার আহ্বান আসিল, তখন ত সে তাহা অস্বীকার করিতে পারিল না। বরং তাহার অন্তরের অন্তঃকরণ যেন এতদিন ইহারই প্রতীক্ষায় ছিল! কঠিনের সাধনা করিতে যাইয়াও মানুষ সহজের মোহ ত্যাগ করিতে পারে না। মাইনের চেয়েও ঘুষের প্রলোভন প্রবলতর। সত্য সত্যই একদিন মূল্যবান নববস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, আতর গোলাব ও এসেন্সের গন্ধে বলাই চাটুজ্জে লেইনের দুর্গন্ধময় হাওয়াকে উতলা করিয়া দিয়া, তদুপরি মেসের সকলকে হতাশ ও অবাক্ করিয়া সে চলিয়া গেল। মোটর ভো করিয়া ষ্টার্ট দিবার পর হইতে সারাপথে সে ভাবিয়াছে: এইবার তাহার শক্তির প্রকৃত উদ্বোধন হইবে, এইবার সে পৃথিবীতে অঘটন ঘটাইবে। হয়ত তাহার জীবন-দেবতা এতদিন এইরকম দেবীরই তপস্যা করিয়াছে; প্রতীক্ষা করিয়াছে—যে রূপে যৌবনে ঐশ্বর্য্যে তাহার জীবনে নিয়া আসিবে সহস্র পথের মোহনা, তাহার প্রতি পদক্ষেপে যে করিবে শক্তির রশ্মিপাত। এইবার গড়িয়া তুলিবে সে তাহার ভবিষ্যৎ—যে ভবিষ্যৎ তাহার সমসাময়িক সমস্ত যুবকদের ভবিষ্যৎকে ম্লান করিয়া দিবে। ভবিষ্যৎ কর্ম্ম-প্রণালীর আভাসও তাহার মনের ভিতর যে উঁকিঝুঁকি না মারিল তাহা নয়। একবার মনে করিল, ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া দিয়া বিড়লা বা ওয়াছেল মোল্লাকে হারাইয়া দিবে। পরক্ষণেই মনে হইল: না, বুদ্ধি এবং অর্থ দুইয়েরই ব্যবহার করিতে হইবে—যাহা সাধারণত এই দেশের ধনীরা করে না। সাহস করিয়া নূতন পথে পা দিতে হইবে। ঝুঁকি না নিলে কি কখনো কিছু হয়? না, হইয়াছে? একটা মোটর-কারখানা করিয়া সে ত এদেশের ফোর্ড হইয়া উঠিতে পারে।—ভাবনার মোড় ফিরিয়া যাইতে দেরী হয়

না।—শুধু টাকা দিয়া কী হইবে? টাকায় মানুষকে কতখানি হায়াৎ দিতে পারে? পটল তুলিতে না তুলিতেই ত লোকে ভুলিয়া যাইবে। তাহার চাইতে বরং খোদাবক্সের মতো বিরাট একটা লাইব্রেরী দিয়া যদি বসিতে পারা যায়, মন্দ হয় না। প্রাণ ভরিয়া লেখাপড়া করা যাইবে; চাই কি, গীবনের রোমান সাম্রাজ্যের মতো একটা বই লিখিয়া ফেলিতে পারিলেই ত একদম অমর। তাহার চাইতেও ভালো হয়, মানুষের মঙ্গল হয়, টাকাও আসে, নোবেলের ডিনামাইট আবিষ্কারের মতো, মার্কনীর বেতারের মতো বা কুরী-দম্পতির রেডিয়ামের মতো কিছু একটা যদি আবিষ্কার করিতে পারে,—যাহাতে করিয়া প্রকৃতিকে শাসনে আনা যাইবে, ভূমিকম্প রোধ করা যাইবে, অথবা অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করা যাইবে। জার্ম্মানী হইতে বিজ্ঞান শিখিয়া আসিয়া একটা বিরাট ল্যাবরেটোরী দিয়া দিনের পর দিন রাতের পর রাত আবিষ্কারের নেশায় সাধনা করিতে কী আরাম! জোহরা কি ম্যাডাম কুরী হইতে পারিবে না?

জোহরা সুন্দরী, জোহরা গাইতে পর্য্যন্ত পারে। তাহার ডা'ন জুলফির নীচে তিল নয়, সামান্য একটি কালো দাগ দেখা যায়। সারা মুখের রূপ-জ্যোৎস্নার মাঝে সেই কালো দাগটি যেন অপরূপ বিস্ময়। মনে হয়, তাহার সারা মুখের সমস্ত সৌন্দর্য্য যেন সেই কালো দাগটিকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতেছে। তাহার সঙ্গে দেখা হইলেই প্রথমে চোখ পড়ে সেই দাগটির উপর, এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই দাগের উপর হইতে চোখ ফেরানোই দায়। সে যখন গানে সুর ধরে, মুখের শিরা উপশিরায় রক্ত-চলাচল দ্রুত হইয়া সারা মুখখানি তখন রক্তজবার মতো লাল হইয়া ওঠে। মনে হয়, তাহার দেহের সমস্ত সৌন্দর্য্য বুঝি সেই কালো দাগটিকে ঘিরিয়া লেলিহান হইয়া উঠিয়াছে। গানের চাইতে গায়িকাই তখন শ্রোতৃবর্গের আকর্ষণের, লোভের ও মোহের বস্তু হইয়া ওঠে।

অর্থ যাহার বেশী, অর্থের লোভও তাহার অধিক। রূপ যাহার আছে, রূপের সাধনায় সে-ই তৃপ্তি পাইয়া থাকে অধিক। জোহরা আজীবন রূপের সাধনা করিয়া আসিয়াছে এবং এই বিষয়ে তাহার অহঙ্কার ও গৌরববোধও কম নয়। একবার স্কুলে নীচের শ্রেণীতে পড়িবার সময়

শিক্ষা-বিভাগের কোন এক উচচপদস্থ পরিদর্শক তাহাদের স্কুল ভিজিট করিতে আসিয়াছিলেন। পরিদর্শক যখন হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—এই ক্লাসে সব চেয়ে সুন্দরী মেয়ে কে? সকলের আগে, পরিদর্শকের প্রশ্ন শেষ হইতে না হইতেই, চট্ করিয়া উঠিয়া জোহরাই উত্তর দিয়াছিল—আমি......।

এই জোহরার কি জানি কি করিয়া অতি শৈশব হইতেই সঙ্গীতের প্রতি প্রবল আকর্ষণের সৃষ্টি হয়। বড় হইয়া সঙ্গীতের জন্য সে যথেষ্ট অধ্যবসায় ও অর্থব্যয় করিয়াছে। নিজে গিয়া ওস্তাদের কাছে গান শেখার জন্য কয়েক মাস বাসা করিয়া লাখ্নৌ পর্য্যন্ত থাকিয়া আসিয়াছে। সেখান হইতে ওস্তাদ আনাইয়া প্রায় দুই বছর ধরিয়া মাহিনা দিয়া খাওয়া-পরা দিয়া নিজের কাছে রাখিয়া সে দিন-রাত করিয়া গান শিখিয়াছে। কি জানি কেন, তাহার মতো মেয়েও গানকে শুধু সৌখিনতা হিসাবে নিতে পারে নাই, গানকে সে সাধনা হিসাবেই যেন গ্রহণ করিয়াছিল। এই গানের জন্যই অনেক রাজা মহারাজা ও নবাব বাহাদুরের বাড়িতে তাহার নিমন্ত্রণ হয়—অন্যকে গান শুনাইয়া, নিজের গানের দ্বারা অন্যকে তৃপ্তি দিয়া, অন্যের বাহবা ও প্রশংসা শুনিয়া সে তাহার সমস্ত সাধনা ও পরিশ্রম সার্থক মনে করে। সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া ও হৃদয় দিয়া গান করিলে সে গান যে শ্রোতাকে কতখানি মুগ্ধ করে, অভিভূত করে, তা জোহরার গান না শুনিলে বুঝা যাইবে না। মানুষের সাধনার সফলতা তাহাকে শুধু নয়—তাহার সমগ্র আবেষ্টনকে পর্য্যন্ত জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তোলে। সে যখন সঙ্গীত শুরু করে, মনে হয় যেন ঘরের দেওয়ালগুলি পর্য্যন্ত কান খাড়া করিয়া আছে। সঙ্গীত-পাগল বহু বড়লোক তাহার এখানে গানের নামে, হয়ত বা গায়িকার আকর্ষণে, আসা-যাওয়া করে। রশিদের এ-সব ভালো লাগার কথা হয়, তবুও আপত্তি করার মতো সাহস সে কোন প্রকারে সঞ্চয় করিলেও অধিকার তার আছে কি না সে ঠিক করিতে পারে না। তবুও নিজেকে স্বামী মনে না করিয়া উপায় নাই, হয়ত এই মনে করে বলিয়াই একদিন মরিয়া হইয়া সে বলিয়া ফেলিল: 'তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি করছ, এ-সব ভালো না, লোকে—'

---তোমার ভালো না লাগে, কাল থেকে তুমি গাড়ী নিয়ে হাওয়া খেতে যেয়ো।...তীব্র ঝাঁঝালো কণ্ঠে, যেই কণ্ঠে কিছুক্ষণ আগেও সঙ্গীতের অপূর্ব্ব মধুবর্ষণ হইয়া গেছে, উত্তর আসিতে কিছুমাত্র দেরী হইল না।

দুই একদিন অভিমান করিয়া সে হাওয়া খাইতে গেল বটে; কিন্তু দেখা গেল, তাহাতে মন আরও খারাপ হইয়া যায়। হাওয়া খাওয়ার আনন্দ চুলোয় যাক্‌---নানা ভাবনা, নানা সন্দেহ ঈর্ষা বিদ্বেষে মন জর্জ্জরিত হইয়া ওঠে। তার চাইতে সুরভিত ঘরময় বিছানো সাদা ধবধবে ফরাসের এক পাশে বসিয়া গান শোনা বেশ আরামদায়ক। পান সিগারেট ত আছেই, মাঝে মাঝে চা-ও চলে। মুমিনপুরের নবাব, হাতীমগড়ের রাজা, ব্যারিষ্টার মোনায়েম, জাষ্টিস্‌ নো'মানী, ইঁহারা ত আর কেউকেটা নহেন; ইঁহাদের সঙ্গে বসিতে পারা, আলাপ করিতে পারা, সে কয়জনের ভাগ্যে জোটে?---মনের পট পরিবর্ত্তন হইতে এক মুহূর্ত্তও দেরী হয় না। সে ভাবিয়াই বসে, ইঁহারা সব ভালো লোক, ইঁহারা শুধু গান শুনিতেই আসেন,---তার অতিরিক্ত আশা বা দুরাশা কেহই পোষণ করেন না। দশ মিনিটের মধ্যে সে তাহার মনে মনে প্রমাণ করিয়া ফেলে, জোহরার কাছে যাহারা গান শুনিতে আসে তাহারা সব ভালো লোক। মুমিনপুরের নবাব সাহেবের এয়া লম্বা দাড়ি, নমাজের সময় হইলে এই মজলিশের এক প্রান্তে গান বাজনা মিনিট পাঁচেকের জন্য থামাইয়া যিনি জায়-নামাজ পাতিয়া বসেন, তাঁহার দ্বারা কোন গোনাহ্‌র কাজ সম্ভব নয়। এমনি যুক্তি-প্রমাণ সবাইর পক্ষে খাড়া করিয়া সে সান্ত্বনা সংগ্রহ করে।

এত বড় সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াও কিন্তু সে নেহায়েৎ হতভাগ্যের মতো বিছানার এক প্রান্তে বসিয়া বসিয়া হাই তোলে। রাজা ও নবাব বাহাদুরদের জৌলুস পোষাক ও রৌশন চেহারার সামনে তাহার মধ্যবিত্ত পোষাক ও চেহারা সূর্য্যের সাম্‌নে জোনাকীর মতো বড় ম্লান ও বড় বিসদৃশ ঠেকে। তাহার উপর চোখ পড়িলে আর সকলের, মায় জোহরার শুদ্ধ, এমন কি মাঝে মাঝে তাহার নিজেরও মনে হয়, এই সুর-সভায় সে যে শুধু অনাবশ্যক তাহা নহে, সে যেন মুর্ত্তিমান ছন্দঃপতন। জোহরা ইঁহাদের সামনে তাহার দিকে তাকাইতেই ত পারে

না। তাহার উপর চোখ পড়িলেই তাহার মন বিরক্তিতে ভরিয়া ওঠে। সে যেন গানের খেই হারাইয়া বসে।

মানুষের জীবনের পদে পদেই বিস্ময় ও অপ্রত্যাশিত। বিচার করিয়া চিন্তা করিয়া জীবনের আগাম খসড়া তৈয়ার করা, নিজেকে কি ভাবে চালাইবে তার রুটিন দেওয়ালে টাঙ্গাইয়া রাখা, মূর্খতা ছাড়া আর কি? জীবন রেলগাড়ী নয় যে, সে বাঁধা-ধরা রাস্তা ধরিয়া নির্দ্দিষ্ট ষ্টেশনে থামিয়া থামিয়া তার গন্তব্য স্থানে গিয়া পৌঁছিবে। অদ্ভুত ও বিচিত্র প্রতিকূলতা জীবনের ডিনামিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে। আজ যাহাকে নিজের চাইতেও প্রিয়তর ভাবা যায়, কাল হয়ত তাহাকে এতই ঘৃণ্য মনে হয় যে, তাহার দিকে ফিরিয়া তাকানোই যায় না। স্ত্রী কর্ত্তৃক স্বামী, স্বামী কর্ত্তৃক স্ত্রী, সন্তান কর্ত্তৃক পিতামাতা, পিতামাতা কর্ত্তৃক সন্তান হত্যা ত অসম্ভব ঘটনা নয়; অথচ সন্তানের জন্য, পিতামাতার জন্য, স্বামীর জন্য, স্ত্রীর জন্য, মানুষ কী না ত্যাগ করিতে পারে? কী ত্যাগ মানুষ ক'রে নাই?—প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে, সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছে, সুখ ত্যাগ করিয়াছে, প্রেম ত্যাগ করিয়াছে! একদিন জোহরা ভাবিয়াছিল, রশিদকে নিয়া তাহার জীবনে স্বর্গ রচনা সার্থক হইবে, ফুলে ফলে তাহার জীবন ভরিয়া উঠিবে। আজ সেই রশিদকেই মনে হয় তাহার জীবনের রাহু, তাহার জীবনের আগাছা। তাহার বিশ্বাস, এই রাহুকে দূর না করিলে জীবনে আনন্দের জ্যোৎস্না পরিপূর্ণ-রূপে ঝরিয়া পড়িবে না। বাগানের প্রস্ফুটিত গোলাবের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার মনে হয়, এই ফুল ফোটার জন্য যেমন তাহার চারিদিক হইতে আগাছা উপড়াইয়া ফেলিতে হয়, তেমনি তাহার জীবনের আগাছা সমূলে উৎপাটন না করিলে ফুলের মতো তাহার জীবনেও সুখ সহস্র দল মেলিয়া ফুটিয়া উঠিবে না।

ভুল মানুষ করে, ভুল নিয়াই মানুষের জীবন, এ যেমন সত্য, সময়ে মানুষের মনে ভুলের জন্য অনুশোচনা অনুতাপও যে না আসে তাহা নয়। সঙ্গী নির্বাচনে জোহরার চাইতে বুদ্ধিমতী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্না মেয়েদেরও ভুল করিতে দেখা গিয়াছে। স্বামী নির্বাচনের জন্য মেয়েদের যতবার স্বাধীনতা দেওয়া গিয়াছে, ততবারই তাহারা ভুল করিয়াছে।

প্রেমে গদ্‌গদ হইয়া অতি বড় বিদুষী মেয়েকেও মূর্খ পশুর গলায় বরমাল্য দিতে দেখা গিয়াছে। প্রেম করার জন্যে মেয়েদের স্বাধীনতা দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু স্বামী নির্বাচনে স্বাধীনতা দেওয়া মানে, সোজা কথায়, শিশুকে তরবারি নিয়া খেলিতে দেওয়া। প্রেমে দায়িত্ব নাই। মেয়েরা চিরদিনই দায়িত্বহীন। করুণা, অনুগ্রহ, খোসামোদ, প্রশংসা, এই সব মেয়েদের অতি বড় পাষাণকেও গলাইয়া দিতে পারে। বিচার করিবার, রূঢ় সত্যকে গ্রহণ করিবার শক্তি তাহাদের নাই। সে ফুল বটে কিন্তু সে নিজে ভোগ করিতে জানে না, তাহাকে ভোগ করিলেই সে তৃপ্ত। যে পুরুষ তাহাকে ভোগ করে না, তাহাকে সে মনে করে কাপুরুষ।

জোহরার মতো বুদ্ধিমতী ও সর্বসংস্কারমুক্তা মেয়ের পক্ষে ভুল উপলব্ধি করিতে দেরী লাগার কথা নয়। কাজেই, অন্যের আগে স্বাভাবিক ভাবেই তাহার নিজের মনে হইল, বিবাহ ব্যাপারে নিজের স্বাধীনতার পরিচয় দিতে গিয়া রশিদের মতো একটা অপদার্থকে বিয়ে করা তাহার উচিত হয় নাই। অভিভাবকদের উপর নির্ভর করিলে তাহার ভাগ্যে অন্তত আই, সি, এস্. বা ব্যারিষ্টার স্বামী জুটিতই,—যাহাকে নিয়া সে মাথা উঁচু করিয়া চলিতে পারিত, যে তাহার বন্ধু মহলে, তাহার সঙ্গীত-মজলিশে সম্মানের আসন গ্রহণ করিতে পারিত, যে সবার অনুগ্রহ ভিক্ষা না করিয়া সবার সম্মানের অধিকারী হইতে পারিত। সে এই ভাবিয়া নিজের উপর আশ্চর্য্য হয় যে, তাহার মতো মেয়ে কি করিয়া রশিদের মতো ছেলেকে বিবাহ করিল! তাহার কি তখন মাথা খারাপ হইয়া ছিল, বুদ্ধি-শুদ্ধি সব লোপ পাইয়াছিল না কি? যে রশিদ বড় লোকদের সঙ্গে ভালো করিয়া আলাপ পর্য্যন্ত করিতে জানে না, জানে না সৌখিন-ভাবে একটু সাজগোজ করিতে, এমন কি টয়লেটের জ্ঞান পর্য্যন্ত যাহার অত্যন্ত আদিম ও আনাড়ির মতো, বহু প্রার্থীকে উপেক্ষা করিয়া তাহাকেই নাকি শেষকালে সে স্বামী নির্ব্বাচন করিয়া বসিল। ছি ছি!!

এখন রশিদকে দেখিলেই তাহার মনে হয় ও যেন তাহার জীবনে এক মূর্ত্তিমান অভিশাপ জোঁকের মতো দুর্ভাগ্যের মতো তাহার জীবনের সঙ্গে লেপ্টাইয়া রহিয়াছে। পরস্পরের প্রতি তাহাদের ব্যবহার এখন অনেকটা যন্ত্রের পর্য্যায়ে গিয়া পৌঁছিয়াছে। রশিদ যন্ত্রের মতো খায়-

দায় ঘুমায় বটে ; কিন্তু তাহার প্রতি আগের মতো খাতির-যত্ন যে কিছুই নাই, তাহা লক্ষ্য করিয়া সে বেশ বুঝিতে পারে, জোহরা এখন তাহাকে রীতিমতো এড়াইয়া চলে, চাকর-বাকর এখন তাহার প্রতি লক্ষণীয়ভাবেই উদাসীন। হয়ত ইহাই স্বাভাবিক। যে নিজেকে প্রকাশ করিতে পারে না, নিজের দাবী প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না, নিজের অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করিতে অক্ষম, সে ত অনাবশ্যকই। সে থাকিলে কোন স্থান পূর্ণ থাকে না, সে গেলে কোন স্থান শূন্য হয় না। সে যদি জোহরার জীবন হইতে সরিয়া যায়, জোহরার জীবনে কিছুমাত্র শূন্যতা বাড়িবে না, কিন্তু তাহার নিজের জীবন হইবে এক বিরাট শূন্য। শূন্যকে ভরিয়া তোলার দৃঢ় সঙ্কল্প, ভবিষ্যতের গৌরীশৃঙ্গ, মনের ভিতর আর আনাগোনা করে না। নতুন নতুন কল্পনায়, নতুন ভাব ও মতামত জাহির করায় একদিন তাহার জুড়ি ছিল না। ক্লাসের বেঞ্চিতে বসিয়া বসিয়া একদিন সহপাঠিদের নিয়া সে যে কল্পনার কত তাজমহল গড়িয়াছে, বক্তৃতার চোটে বন্ধুদের সামনে ভবিষ্যৎ জীবনের পিরামিড খাড়া করিয়া দিয়াছে। তাহার মনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রাণখোলা হাসিতে একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের কমন-রুম পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আজ তাহার অব্যবহৃত দেহ যেমন কর্ম্মশক্তি হারাইয়া স্থবির হইতে বসিয়াছে, অব্যবহৃত কল্পনাও তেমনি উড়িবার শক্তি হারাইয়া পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে। বড় কিছু কল্পনা করিতেও সে এখন আর সাহস পায় না।

জোহরার মন হইতে ক্ষণিকের কুজ্ঝটিকা এখন কাটিয়া গেছে। স্পষ্টই সে এখন বোঝে, তাহার জীবনে ও'র প্রয়োজন ফুরাইয়া গেছে। কাজেই ও এখন সরিয়া পড়ে না কেন ? সরিয়া পড়িলেই ত আপদ যায়। মনে এ-রকম ভাব আনাগোনা করিলে জোহরা মনের কাছে কোন বাধাই এখন পায় না। কিছুতেই বাধা দিবার বা 'না' জানাইবার ক্ষমতা যাহার নাই, এ-বাড়ীর ভালো-মন্দ সব কিছুতেই রহিয়াছে যাহার 'হাঁ', লতিকাসুলভ ম্রিয়মান হাসির সঙ্গে জোহরার সব কাজে ও কথায় যার ঘাড় তথা মাথা-শুদ্ধ ওঠা-নামা করে, সেই মানুষ থাকা না-থাকা ত সমান। সে কেন তাহার আনন্দের উৎসবের পথে মূর্ত্তিমান অভিশাপের মতো সাক্ষীগোপাল হইয়া বিরাজ করিবে ? তাহার দৈনন্দিন

জীবনে পাহারা বসাইবার সে কে? রশিদের সরিবার বা মরিবার লক্ষণ না দেখিয়া সে আরও বিরক্ত হইয়া ওঠে। মরিবে কি, দিন দিন সে যেইভাবে বর্দ্ধিত হইয়া চলিয়াছে, এই বাড়তি যদি অচিরে না থামে তাহা হইলে তাহার জন্য আলাদা করিয়া ঘরে দরজা কাটিতে হইবে যে।

এমনি তাড়াইয়া দেওয়ার কথাও যে সে ভাবে নাই, তাহা নহে। কিন্তু কি করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া যায়? ভুল করিয়া হইলেও দশ জনের সামনে যথাশাস্ত্র যাহাকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে, আশ্রয় দেওয়া হইয়াছে, আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত জন যে-ব্যাপারটি জানে, তাহা কি এমনি করিয়া এত সহজে ছিঁড়িয়া ফেলা যাইবে? জোহরা ভাবে: হোসেনের সঙ্গে একবার এক রকম বিশ্রী ব্যাপার ঘটিয়া গেছে, তখন তাহা প্রথম বয়সের প্রথম ভুল বলিয়া হয়ত কেহ বড় একটা গ্রাহ্য করে নাই। কিন্তু আবার সে ভুলের পুনরাবৃত্তি করিতে গেলে কাহারো কাছে মুখ দেখানোই সম্ভব হইবে না। সেই ব্যাপারের পর মামা ত রাগ করিয়া তাহাদের বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। অভিভাবকদের আশা ও প্রতীক্ষা ছিল হোসেনের সঙ্গে তাহার বিয়ে হওয়া, সেই বিয়ের অন্যতম কারণ ত অভিভাবকদের খুসী করা। কিন্তু এ যে সম্পূর্ণ তাহার স্বনির্বাচিত! হোসেন ছিল বড় বেয়াড়া ধরনের লোক, বদ্‌রসিকের চূড়ামণি। বিবাহের পর এক দাড়ি কামাইয়া মানুষ করিতেই ত রীতিমতো কুরুক্ষেত্র বাধিয়াছিল। রাজি করাইতে শত পাঁচেক টাকা ঘুষ পর্য্যন্ত দিতে হইয়াছে। কিন্তু এ যে একদম্ পোষা হইয়া গিয়াছে। পোষা মানুষকে নিয়া ঘর করা মানে—নিজের দেহ ও মনকে সম্পূর্ণ অবসর দেওয়া। দেহ ও মনে বেকার বনিয়া যাওয়া, এ কি কোন জীবন্ত মানুষের পক্ষে সম্ভব?

রশিদের সঙ্গ যখন অসহ্য হইয়া উঠিল, তাহার মনে হইতে দেরী হইল না, বিবাহের তাহার কীই বা দরকার ছিল? খামকা সে নেহায়েৎ বোকার মতো দুই দুইবার এই ফাঁদে পা দিয়া এখন আটকাইয়া গেছে। বিধাতা মানুষকে দিয়া এমন ভুলও করায়! এখন রশিদের মরা ছাড়া সে আর কিছুই ভাবিতে পারে না। রশিদের মৃত্যুই হইবে তাহার মতে,

তাহার পক্ষে এবং রশিদের পক্ষেও খুব ভদ্রভাবে সম্মানের সহিত পরস্পর হইতে মুক্তি।

নানারকমের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যে ও ঔদাসীন্যে রশিদের মনও মাঝে মাঝে বিরক্ত হইয়া বিদ্রোহের কথা যে ভাবে না, তাহা নহে। কিন্তু কী করিবে, কোথায় যাইবে, কিছুই সে ঠিক করিতে পারে না। জোহরার বাড়ী ছাড়িয়া যাওয়ার কথাও সে বহুবার ভাবিয়াছে। কিন্তু ভাবিতে গিয়া মনে হইয়াছে, এখান হইতে পা বাড়াইলেই পা দিতে হয় শূন্যে---একেবারে অনিশ্চয়তার গোলকধাঁধাঁয়। এই কথা ভাবিতেই বুকের ভিতর কিছুমাত্র আশা ও সাহস আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অন্তত হাজার কয়েক টাকা হইলেও না হয় কোন প্রকারে দাঁড়ানো যাইত। একবার ভাবিল—জোহরার বাড়ী হইতে কিছু হাত করিয়া সরিয়া পড়িলেই বা ক্ষতি কি ? জীবনে এমন কথা এই প্রথম সে ভাবিতে পারিল।

একদিন এম্‌নি নিরুদ্দেশ ঘুরিতে ঘুরিতে, কোথায় যাইবে, কী করিবে, কোন প্রকারে সময় কাটাইতে না পারিয়া সে তাহার সেই পুরাতন মেসে গিয়া হাজির হইল। কারো সঙ্গে কোন দরকার ছিল না, বসিয়া বসিয়া গল্প করিলে হয়ত সময় কাটানো যাইবে মনে করিয়াই ঢুকিয়া পড়িয়াছে। প্রথমে বায়স্কোপে যাওয়ার ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু তাহা করিতে গেলে জোহরার কাছে টাকা চাহিতে হয়, চাহিলে সে নোট একটা ছুঁড়িয়া যে না দিবে তাহা নয়; তবে এই চাওয়া এবং দেওয়ার ভঙ্গিমা এত বেশী কুৎসিৎ ভিক্ষাবৃত্তির মতোই মনে হয় যে, চাহিয়া আর তাহার লজ্জার অবধি থাকে না। এক সময় হাসিয়া রসিকতা করিয়া রোজ রোজই চাহিয়া নিতে পারিত, আবদার করিয়া বেশি আদায় করিয়াও নিত। কিন্তু ইদানীং জোহরার পক্ষ হইতে অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য এত রূঢ় হইয়া উঠিয়াছে যে, সেখানে হাসিতে যাওয়া মানে বৃষ্টির জলে সিগারেট ধরাইতে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। মেসের পুরাতন বন্ধুদের সঙ্গে—যাহাদেরে মোটরের ভিতর হইতে মূল্যবান সোনালী চশমার ভিতর দিয়া সে এতদিন কৃপার চোখে চাহিয়া আসিয়াছে---তাহাদের সঙ্গে বসিয়া বসিয়া সে আজ রাত দশটা তক্ গল্প করিল। এমন কি, তাহাদের খাওয়ার মামুলী অনুরোধও সে আজ উপেক্ষা করিল না। কিন্তু খাওয়ার

প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সে বড় একটা খাইতে পারিল না—রোজ মুর্গি মাটন চপে যাহার অভ্যাস হইয়া গেছে, তাহার পক্ষে হঠাৎ একটুখানি চিংড়ীর চচচড়ি আর সামান্য একটু পাতলা ডালে আর কাঁহাতক খাওয়া চলে। রাত্রে থাকিয়া যাওয়ার অনুরোধও যখন সে আজ রাখিবার বন্দোবস্ত করিল, তখন মেসের সবাই একটু তাজ্জব না হইয়া পারিল না।

কিন্তু অপরিসর ক্ষুদ্র গৃহে না আছে একটা জানালা, না আছে একটু বাতাস চলাচলের পথ। এত ঠাসাঠাসি যে, সে যেন ভালো করিয়া নিঃশ্বাস লইতেই পারিতেছিল না। গরম ত অসহ্য বটেই; তাহার উপর যাহার সীটে তাহার যায়গা দেওয়া হইয়াছিল তাহার মশারিটাতেও বোধ করি ফুটার অন্ত ছিল না। মশার কামড়ে, কামড়ের চেয়ে তাহার ভনভনানিতে তাহাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিল। পাশের নর্দ্দমা হইতে এমনি দুর্গন্ধ আসিতে লাগিল যে, তাহার পক্ষে নিঃশ্বাস নেওয়াই কঠিন হইয়া উঠিল। অথচ আশ্চর্য্য যে, এখানে পরম আনন্দে সে তাহার দুই বছর জীবন কাটাইয়া গিয়াছে, কোনদিন এতটুকু ঘুমের ব্যাঘাত হয় নাই। সে দেখিল, তাহার পাশের বন্ধুগুলি এমন অঘোরে ঘুমাইতেছে যে, তুলিয়া কবরস্থান পর্য্যন্ত নিয়া গেলেও তাহারা টের পাইবে বলিয়া মনে হয় না। ইহার তুলনায় জোহরার সুগন্ধময় শয্যা স্বর্গ, ফুরফুরে হাওয়া এক জানালা দিয়া ঢুকিয়া অন্য জানালা দিয়া বাহির হইয়া যায়। মাথার উপর বৈদ্যুতিক পাখা ত স্যুইস্ টিপিলেই শাঁ শাঁ করিয়া চলিতে থাকে। স্বর্গ আর কাহাকে বলে? রহিয়াছে যখন, এত রাত্রে উঠিয়া আর চলিয়া যাওয়া যায় না।

অতি কষ্টে সেই রাত্রে তাহাকে বিনিদ্রই কাটাইতে হইল। সকালে বাড়ী ফিরিয়া সে এমন ঘুম দিল যে, এক ঘুমে বেলা বারোটা পার হইয়া গেল, এবং খাইতে বসিয়া ভালো করিয়াই গত রাত্রের ক্ষতিপূরণ করিয়া ছাড়িল। তাহার বড় আশা ছিল, কাল সে কোথায় ছিল, খাইয়াছে কিনা, কী খাইয়াছে ইত্যাদির সন্ধান জোহরা লইবে। কিন্তু জোহরা যখন কিছুই জিজ্ঞাসা করিল না, এমন কি, এতক্ষণ ধরিয়া সে কেন ঘুমাইতেছে বলিয়া একটু বকিলও না, তখন সত্য সত্যই তাহার মন হতাশ হইল, নিরাশায় মুহ্যমান হইয়া পড়িল।

বিকালেও আর এক পশলা দীর্ঘ ঘুমের পর উঠিয়া বিছানায় বসিয়া বসিয়া রশিদ ভাবিতে লাগিল। দেহ ও মন এমনি অবশও কাহিলযে, তাহার ভাবিতেও আর ইচ্ছা হইতেছিল না। মনে কিছুমাত্র উৎসাহ এবং আগ্রহ যেন আর অবশিষ্ট নাই! মৃত্যু যেন তাহার শিরায় শিরায় পা ফেলিয়া আগাইয়া আসিতেছে। আশ্চর্য্য! হঠাৎ তাহার খেয়াল হইল, বাঁচিয়া আর কী হইবে! মরাই শ্রেয়। এমন ভাবে বাঁচিয়া না-ই বা রহিল! জীবনে আর কিছুই নূতনত্ব নাই। যে দিনগুলি সে কাটাইয়া আসিয়াছে এবং যে দিনগুলি সাম্‌নে রহিয়াছে তাহার মধ্যে কীই বা পার্থক্য ? একদিন বাঁচিয়া থাকাও যা, দশ বছর বাঁচিয়া থাকাও তাই। সেই বৈচিত্র্যহীন নিরানন্দ একঘেয়ে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত! মৃত্যু, মৃত্যু, মৃত্যু যেন তাহাকে ঘাড় ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছে। রাত্রে শুইয়া শুইয়াও সে ভাবিতে লাগিল,—জীবন ত দেখা হইল, জীবনের অভিজ্ঞতাও জানা হইল; মৃত্যু কি রকম, মৃত্যুর কাল যবনিকার অন্তরালে কী আছে, কে জানে! সেখানেও কি এম্‌নি আর একটি জগৎ আছে? এমনি সুখ দুঃখ হাসি অশ্রু? না, সব ফাঁকি, সব অন্ধকার, শুধু নির্জীবতা, শুধু দিনে দিনে ক্ষয় হইয়া লয় প্রাপ্তি? এই রহস্যের দ্বারোদঘাটন করিতে হইবে। মরিবে, মরিবে, মরিবে সে। একবার ভাবিল---ছাদের উপর হইতে এক লাফ দিলেই ত সব চুকিয়া যায়। আবার ভাবিল, বীমের সঙ্গে একটা রশি টাঙাইয়া ঝুলিয়া পড়িলেই ত সঙ্গে সঙ্গে, ফাঁসী দিয়া মরাটা কেমন, তাহারও স্বাদ পাওয়া যায়। কিন্তু হাতে কলমে করিতে গিয়া দেখিল, ছাদের উপর হইতে লাফাইয়া পড়িতে বা গলায় দড়ি দিয়া ঝুলিয়া পড়িতে যে সাহসের দরকার, তা তাহার কিছুতেই সংগ্রহ হইতেছে না। শেষকালে ভাবিল, কিছুটা পটাসিয়াম সাইনাইড জোগাড় করিতে পারিলে মন্দ হয় না। তাহা হইলে অতি সহজে মুহূর্ত্তে জীবনের রাজ্য হইতে অভাবনীয় রহস্য-ঘেরা মৃত্যুর রাজ্যে সে পৌঁছাইয়া যাইতে পারে। কথাটা মনে হইতেই তাহার দেহ-মন একবার রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।---সে কি আনন্দে, না ভয়ে?

শেষ অধ্যায়

লেখকের কথা

এইবার লেখকের দুঃখের কাহিনী শুনুন।—আধুনিক মানুষকে নিয়া গল্প লিখিতে বসাই এক ঝক্মারি ব্যাপার। জানাইবার মতো, লিখিবার মতো কী সংবাদই বা ইহাদের জীবনে আছে? আজ সকলের মনের দুর্গ মনেই ত ধ্বসিয়া পড়িতেছে। কোন ভয়াবহ বিস্ফোরণ আজ কোথায়? কাজেই, বলা বাহুল্য, কিছু একটা অঘটন ঘটিবার সমস্ত আশা রশিদ নিজ গুণেই ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। এই গল্পের অকালমৃত্যু সে-ই ডাকিয়া আনিয়াছে। লেখকের বিন্দু-বিসর্গ দায়িত্ব ইহাতে নাই। কারণ, ইহার পরও রাত্রে এবং দুপুরে, সকালে এবং বিকালে দেখা গেল, জোহরার টেবিলের কোন অমৃতের প্রতিই রশিদ কিছুমাত্র অবিচার করিতেছে না। দুপুরে খাইতে খাইতেই সে মনে মনে বলিয়া উঠিল, বাবা, বেঁচে থাক্ বাবুর্চি। লাখ্নৌ ভারতকে শুধু গানের ওস্তাদ দান করে নাই, রান্নার ওস্তাদও দিয়াছে। ইতিহাস স্বীকার করুক বা না করুক, এই কথা সত্য যে, ওস্তাদের দানের চেয়ে বাবুর্চির দান কিছুমাত্র কম নয়। বলা বাহুল্য, হাতের কাজ হাত, রসনার কাজ রসনা অবিরাম করিয়া চলিয়াছে। পেয়ালা হইতে একটা আস্ত ফাউল সে তুলিয়া লইল। ঘাড় ধরিয়া ডিসের উপর তুলিয়া ধরিতেই মাংসগুলি হাড় হইতে খসিয়া পড়িতে লাগিল। যাহা পড়িল, তাহার সঙ্গে ফের রসনার সংযোগ হইতেই আর একবার তাহার মনে মনে উচ্চারিত হইল—স্বর্গ থাকুক, বাঁচিয়া আছি, এই যথেষ্ট। কাজেই, হয়ত নেহায়েৎ বাঁচিয়া থাকার জন্যই, পর দিন, তার পরের দিন, তারও পরের দিন রশিদকে জোহরার খাওয়ার টেবিলে যথাসময়ে উৎসাহ-সহকারে দক্ষিণ হস্ত পরিচালনায় দেখা গেছে। তাই বলিতেছিলাম, এই গল্পের অকালমৃত্যুর জন্য কারো যদি দায়িত্ব থাকে, সেই দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে গল্পের নায়কেরই।

গল্প

আবুল ফজলের শ্রেষ্ঠ গল্প ।। আষাঢ়—১৩৭১

মাটির পৃথিবী

বৌ আর শাশুড়ী।

—আসুক, আসুক, বলবনি?

শাশুড়ী বাজখাই-কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে: আসুক না, বলিস তোর বাবাকে ...আমি কারেও ডরাই না! আমার টেকা আমার পইসা আমার কথা শুন্‌লে মরিচ লাগে, না?

---মরিচ লাগ্‌বে না কেন! পোড়াকপাল্যা মিন্‌ষে আসুক না আজ, মরিচ লাগে কিনা পুছার কইরব।

---করি-ঈ-স্‌, আমি কারে ডরাই নাকি? আমি কার কামাই খাই নাকি?

শাশুড়ী এক দিশী সাহেব-বাড়ীতে সকাল বিকেল ঝি-গিরি করে। বৌও ছাড়বার পাত্র নয়, সেও চেঁচিয়ে উঠে: আমারে কি চুরিতে ধরেছ্?

শাশুড়ী কণ্ঠে বৈরাগ্য এনে বলে: হতীনের ঝি হতীনেরা তলে তলে আমার নাড় কাটে। তোর দুষ্‌মনীতে আমার কি করবি?...আল্লা আমার পক্ষে।

---টাকা কি আমার ফাতেহায় দিছে?

বুঝা যাচ্ছে, ঝগড়াটা টাকা নিয়েই আরম্ভ হয়েছে।

শাশুড়ী ভেংচি দিয়ে ওঠে: অ-বাপ্‌রে বাপ্‌, অ-বাপ্‌রে বাপ্‌! আর কেই বা কারে দিয়া এক্কেবারে ভর‍্যা দিছে এ?

---দিছে না দিছে, আমি চেয়ে আছি নাকি?

---তোমারেও দেয় না কেন? টেকা চাইতে ঘিন্‌ করে...না? বুড়া-রোগা খসম বলে নাক তুল্‌তে তো পার।

বৌ বোধ করি একটুখানি ক্লান্ত হয়ে থাকবে, তাই হতাশভাবে বলে উঠল: অ-মা, মা! ঘরে একটু নিশ্চিন্তি বস্‌বার শো'বার উপায় নেই, সারাদিন শুধু চেঁচামেচি সোরগোল---।

---হারামজাদা আজ আসুক, দিনরাত বৌয়ের পা-চাঁটা বের কর্‌ছি।

---রোজ রোজ বৌয়ের পা-ধরে কামড়াও কেন্? কি বল্‌বে, সামনে বল্ল্যা দেখি।

---বলবই তো! আসুক না আজ---নিশ্চয়ই বলব।

ঘণ্টা দুই পরে।

বারান্দায় মাটিতে শোওয়ানো শিশুর কান্না ক্রমশঃ তীব্রতর হয়ে ওঠে: ওঁা ওঁা...

বৌ বড় মেয়েকে ডাকে: সাবেরা, ও সাবেরা!

শাশুড়ী লক্ষ্যহীন নির্বিকারভাবে উত্তর দেয়: আমি পান আনতে সাবেরারে দোকানে পাঠাইছি।

বৌ ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে: কি? কি?

শাশুড়ী নিরুত্তর থেকে বৌয়ের প্রশ্নকে অগ্রাহ্য করে।

---দোকানে পাঠাইছ তো ছেলে কোলে নাও না কেন্?

---নেব না।

---তবে দোকানে পাঠালে কেন? আমি যদি কোলে নি, আমি কুত্তার ঝি।

---না নাও, মরুক।

---মরুক তবে।

রাস্তায় ফেরিওয়ালার গলা শোনা যায়: আম, ফজ্‌লী আ---ম।

শাশুড়ী: আরে, কি ডাকে---এ!

এ'র টান কিন্ত লক্ষ্ণৌর ওস্তাদী গানের টানের মত অনেকক্ষণ চলে।

মেজো ছেলে টুনু আঙিনার এক কোণে খেলা করছিল। ছুটে এসে বল্লে: আম---অ-দাদী, আম।

---কয়টা করে পুছ কর তো।

বৌ রান্নাঘর থেকে আপ্‌না আপনি বলে ওঠে: ঝাঁটা মার্, এই বছর ধরে আম খাইতেই পাইল্লাম না।

শাশুড়ী: কেন, সেদিন চার পয়সা দিয়ে একটা কিন্‌ছিলাম না, খাওনি বুঝি?

বৌ: অ-বাপ্‌রে বাপ্---এ-একটা আম!

আমওয়ালার উদ্দেশ্যে শাশুড়ী চেঁচিয়ে ওঠে: কয়টা করে গো?

বুড়ীর কণ্ঠস্বর, অন্যমনস্ক আমওয়ালার কান পর্য্যন্ত পৌঁছয় না।

শাশুড়ী: বেটা আভাগীর পুত কানের মাথা খেয়েছে!

এইবার ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে বল্লে: আরে বলি, টাকায় ক'টা করে আম?

আমওয়ালা: দশটা, অ-খালা!

---তোমার আম সোনা বিয়োয়, না?

---বারটা পর্য্যন্ত দিতে পারবো।

খালা বোন্‌পো'র প্রতি এতটুকু মাসিগিরী না দেখিয়ে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল: রাস্তা থেকে তোমার নাম্‌তে হবে না---যে-পথে এসেছ, সোজা সে পথ দেখ।

সাবেরা পান নিয়ে রাস্তা থেকে নাম্‌তে নাম্‌তে বলে উঠল: অ-দাদী, আম নিলা না?

---ভাল না, অ-নাতীন্! সব দাগী পঁচা আম।

শাশুড়ী বাটা নিয়ে পরমানন্দে পান বানাতে বসে যায়। বৌ এসে দরজার কাছে মাটিতেই বসে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে।

বুড়ী পানের খিলি মুখে গুঁজে হাঁড়ীপনা মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে বাটাখান্ বৌয়ের দিকে ঠেলে দেয়।

রাত্রে খাবার পালা।

বড়ছেলে মন্নু ভাতের থালা নিয়ে ঠায় বসে আছে।

টুনি বলে উঠ্‌ল : অ-বাবা, ভাই খাচ্ছে না।

---কিরে শূয়ারের বাচচা! কি খাবি, কি সালন খাবি ?

বলির পাঁঠার মত কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে মন্নু বলে : আমি মুন্না খাবনা।

দেরী হয় না, তজুর হাত কখনো ইতস্ততঃ করে না...দুম্‌ দুম্‌ মন্নুর পিঠের উপর পড়তে থাকে : কি খাবি শালার বেটা শালা, ক ?

বৌকে লক্ষ্য করে তজু চেঁচিয়ে ওঠে : তুই শূয়ার তোর বাপ দাদা সাতগুষ্টি শূয়ার! কেন ছেলেকে সকাল সকাল ভাত খাওয়াস্‌নি ?

বৌও ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে : আমি দিচ্ছিলাম না ? হারামজাদা বাসন ঠেলে ফেলে বলে কিনা, আমি বাবার সঙ্গে খাবো।

—কেন ঠেলে ফেল্‌বে, ছেলে তোর সাতগুষ্টির পীর কি না! ছেলের বাপের সাধ্য বাসন ঠেলে ফেলে! তোমারও পিঠ চুল্‌কাচ্ছে না ?

—আমার কি দোষ!

বৌয়ের স্বর নেমে আসে।

ঝগড়া চেঁচামেচি ও মারধর এ যেন এদের দৈনন্দিন জীবনের খোরাক। স্বামীর স্বামীত্ব, মায়ের মাতৃত্ব ও শাশুড়ীর শাশুড়ীত্বের এসব হ'ল একমাত্র উপজীবিকা। কাজেই কিছু-একটা শুরু হ'তে আর দেরী লাগে না।...সকালে বড়-মেয়েটি মুখে মুখে জবাব দিয়েছে বলে তার মা পিঠের উপর কষে কয়েক ঘা দিয়ে 'মর্‌' বলে ধাক্কা দিয়ে একেবারে ঘর থেকেই বের করে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গিনা থেকে শাশুড়ী চেঁচিয়ে উঠ্‌ল : তুই মর্‌, তোর ভাই মরুক---আমার নাতীনের আপদ বালাই নিয়ে তোর সাতগুষ্টি মরুক!

---তোর সাতগুষ্টি মরুক বলে ঝঙ্কার আসতে দেরী হয় না। অর্থাৎ যে কোন ছুতোয় আরম্ভটা নিতে পারলেই হয়...তারপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চল্‌তে থাকে দুই নারীকণ্ঠের শক্তিপরীক্ষা।

বিকেল নাম্‌তে না নাম্‌তেই দুপুরের গুমোট কেটে যেতে দেরী হয় না। ধীরে ধীরে উল্টো দিক থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে থাকে।

বৌয়ের কণ্ঠস্বর শোনা যায় : মা! অ-মা!

অনুচ্চকণ্ঠে শাশুড়ী সাড়া দেয়ঃ কি!

---চা'র পাতা আছে?

---না।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর বুড়ী বলে উঠেঃ অ-মন্নু মিঞা, একটা পয়সা নিয়ে দোকান থেকে এক পয়সার চা নিয়ে আয়।

বুড়ী নীরবে আঁচলের গিঁঠ্ খুলে একটি পয়সা দিয়ে দেয়।

সাম্‌নের ঘর থেকে শোনা যায়ঃ দাও না একটি চুমু, মুখটা উঁচিয়ে আছে, দেখছ না? চোখের মাথা খেয়েছ নাকি?

---দেব না, যাও।

---সত্যি? তবে ফেরাদি সোহাগ দেখাতে এস, দেখে নেব। এই বলে গর্ গর্ করতে করতে ছলিমন জোর করে ছেলেটিকে কোলে তুলে নিয়ে দু'চোখে অভিমানের বাষ্প ছড়াতে থাকে।

অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে ফের বলেঃ আজ আমার ছেলের জন্য এক পয়সার চিনেবাদাম পর্য্যন্ত আননি...পয়সা বাঁচাচ্ছ, তা আমি বুঝি না?

আনু বলেঃ অ-ইস্‌লাম, এদিকে আয়। ছেলেকে কোলে নেবার জন্য হাত বাড়ায়।

ছলিমন ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেঃ না, যাবে না। অত সোহাগ মারাতে হবে না...বাসি সোহাগ আমার ছেলে চায় না। সুন্দর যৌবন দৃপ্ত দীর্ঘ গ্রীবা সর্পদেহের মত ফণা উত্তোলন করে বুঝি ফোঁস ফোঁস করতে থাকে। সে উত্তোলিত ফণার দিকে চেয়ে আনু উত্তর দেয়ঃ মুখ ভেঙ্গে দেব।

---দাও দিকিন! বলে বৌ খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে।

---দিলে কি কর্‌বি? তর সয় না। স্বামী লাফিয়ে উঠে বৌকে ঝাপ্‌টে ধরে কষে স-শব্দে এক চুমু লাগিয়ে দেয়।

বৌ 'উ ও' বলে খিল্ খিল্ করে সারাদেহেই হেসে ভেঙ্গে পড়ে। মুহূর্তের জন্য কোষোম্মুক্ত অসি বুঝি সূর্যকিরণে ঝক্‌মক্ করে ওঠে। ছলিমনের হাস্যোজ্জ্বল দু'চোখের এমনি দীপ্তি!

গ্রীষ্মের দুপুর...রৌদ্রে খাঁ খাঁ কর্‌ছে।

শাশুড়ী পাড়ায় টহল দিয়ে আস্‌তে আস্‌তে দূর থেকেই চীৎকার দিয়ে ওঠে: টুনী, অ-টুনী।

কোন সাড়া না পেয়ে বলে ওঠে..হতভাগী কানের মাথা খেয়েছ নাকি? মরেছ নাকি অ-ভাগীর বেটি? বলি, টুনী ঘরে আছে? প্রতিবেশীনীর সঙ্গে গুন্ গুন্ কথার নিবিড়তা ভেদ করে এতক্ষণে শাশুড়ীর ঝাঁঝালো গলা এসে পৌঁচেছে। পৌঁছতেই বৌও চেঁচিয়ে উঠল: এঁ্যা, এঁ্যা।

ততক্ষণে কিন্তু দুম্-দুম্ শুরু হয়ে গেছে। দাদীর কণ্ঠস্বর শুন্‌তে পেয়ে টুনী ঘরের আড়ালে দাঁড়িয়ে কাঁপ্‌ছিল: দেখ্‌তে পেয়েই বুড়ী শ্যোনপক্ষীর মত গিয়ে পড়ল নাত্‌নীর উপর: পুকুরে পুকুরে যাবি... আর পানিতে নামবি, নামবি? যাবি? যাবি?

ক্ষুদ্র কণ্ঠের না না কে আর শোনে!

টুনীর ষ্টার্ট নিতে দেরী হয়...পিঠের উপর একচোট দুমাদুম আঘাতের পর...ভ্যা শোনা যায়।

বৌ ঝঙ্কার দিয়ে বলে ওঠে: আমার মেয়ে যায়নি, ফুলজান নিয়ে গেছে...না হয় আমার মেয়ে কোন দিন যায় ওই পুকুরে?

ফুলজানের মা তার ঘর থেকে চেঁচিয়ে ওঠে: তোমার মেয়ে বড় আজল! না? বড় মোমের পুতুল!

ফুলজানের মা খেয়ে একটু গড়াগড়ি দিচ্ছিল...দিবানিদ্রার মায়া তাকে এবার ত্যাগ করতেই হ'ল। বিছানা থেকে যে শুধু লাফিয়ে উঠল তা নয়, ঝটিতি সে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। কাজেই দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঝগড়া তুমুল থেকে তুমুলতর হয়ে উঠল।

অপরাহ্ণের নিস্তব্ধতাকে বড় রূঢ়ভাবে হত্যা করা হয়।

কে জানে, কোন্ ছেলে নাকি ছলিমনের ছেলেকে মেরেছে। খবর পুকুরঘাটে পৌঁছতে না পৌঁছতেই ছলিমন আতারী পাতারী দৌড়ে এসে: কোন্ সতীনের পুত, কোন্ ব্যশ্যার পুত আমার ছেলেকে মেরেছে? বলে পাড়া মাথায় করে তুল্ল আর কি!

কোন দিক থেকে কোন সাড়া না পেয়ে সে আরো উত্তেজিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল: দূর সতীনের ঝি সতীন, সব সতীন এখন বোবা সেজেছে।

---আমার মেয়ে মারেনি---বলে, সাবেরার মাও ছুটে আসে।

---মারেনি? বলে ছলিমনও ক্ষীপ্তা বাঘিনীর মত দাঁত খিঁচিয়ে ওঠে।

---কে দেখেছে? কোন্ সতীন বলে?

---এই, পুতুলী বলেছে, ওদের মতি বলেছে।

---এইদিকে আয় দিকিন্ পুতুলী।

পুতুলী আসে না।

---আচ্ছা, আমি পুতুলীর মার সঙ্গে দেখা করি, মেয়ে এমন মিথ্যা কথা কি করে বলে, আমি দেখাচ্ছি।

রবিবার কিন্তু মহাসমরের এক দৃশ্যই অভিনয় হয়ে গেল। খেয়ে-দেয়ে দুপুরে সবাই পরম নিশ্চিন্তে দিবা-নিদ্রা দিচ্ছিল। হঠাৎ গোটা পাঁচ সাত মেয়ে হাউ-মাউ করে চেঁচিয়ে উঠল। বাড়ীর পুরুষরাও ঘুম পাতারী জেগে উঠে যে যা হাতের কাছে পেল, নিয়ে ছুটে এল। এসে দেখে অবাক্ কাণ্ড! দুই মেয়ে চুলোচুলি করে একজনের মাথা আর একজন মাটিতে ঘষছে, ছাড়াতে না পেরে বাকী মেয়েরা চীৎকার আর চেঁচামেচি কর্‌ছে। পুরুষদের বিস্ময়-ভাব কাটবার পর যুধ্যমান দুই মেয়েকে দু'জনে দু'দিকে টেনে ছাড়িয়ে দিলে। উভয় বীরাঙ্গনার হাত শত্রু শোণিতে প্লাবিত হলনা বটে, কিন্তু দেখা গেল, উভয়ের ছিন্ন কালোচুলের গোছা বিজয়-নিশানের মত উভয়ের হাতে শোভা পাচ্ছে!

তবুও কি ক্ষান্ত হয়! একজন চেঁচিয়ে ওঠে: হতীনের ঝি হতীনের চুল ছিঁড়ে বাতাসের আগে উড়াব। সমুচিৎ পাল্টা জবাব আস্‌তেও দেরী হয় না।

পরম সৌভাগ্যের বিষয়, পুরুষদের অত্যধিক আশ্চর্য্য ও হতভম্ব ভাব তাদের রক্তকে বোধ করি গরম হতে দেয়নি। তা না হলে হয়ত ব্যাপার রক্তহীন সমরে ক্ষান্ত হত না। পুরুষরা মেয়ে দু'টিকে ধম্‌কিয়ে

ভিতরে পাঠিয়ে দিলে বটে, কিন্তু অস্ত্রহীন নন্‌ভায়োলেণ্ট যুদ্ধ মুখে মুখে চল্‌তেই লাগল। মেয়েমানুষের মুখ আপ্‌না হতে হয়রান হয়ে বন্ধ না হ'লে কার সাধ্য বন্ধ করে!

এই বাক্‌যুদ্ধ থেকে এই মহাযুদ্ধের কারণ যা পাওয়া গেল তা এই: কয়েকদিন আগে সাবেরা নাকি তার নাকের এক বেশর হারিয়েছে। আজ তার মা উত্তরপাড়া থেকে এক বুড়ীকে ডেকে এনেছে। কার মুখে সে শুনেছে, এ-বুড়ী নাকি 'চালান' দিয়ে চোর বের করতে পারে। বুড়ী এসে কতকগুলি কাঁঠালপাতায় আশপাশের সব মেয়েছেলের নাম লিখে পাতাগুলি একটা লোটার উপর রেখে মন্ত্র পড়তে থাকে। অন্য সব নাম দিয়ে হাজার মন্ত্র পড়লেও লোটা নাকি নড়ে না, অথচ ছলিমনের নামলেখা পাতা রেখে মন্ত্র পড়লেই নাকি লোটা আপনা আপ্‌নি ঘুরতে থাকে। এ-কথা ছলিমনের কানে যেতেই সে ছিট্‌কে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে চেঁচিয়ে উঠল: কোন্ হতীন হলে আমি চুরী করেছি? অ-হতীন! বের হ, এক্ষুণি চুল ছিঁড়ে বাতাসে উড়াব।

মরা মানুষেরও ধৈর্য্য হারাবার কথা। সাবেরার মাও দৌড়ে এসে চেঁচিয়ে উঠল: হতীন কছ্‌ কারে? অ-হতীনের ঝি হতীন, আস্‌ছি তো, এখন কি কর্‌বি কর্ না। বল্‌তে না বলতেই হতীনের ঝি হতীন বলে ছলিমন তার চুল ধরে একেবারে লট্‌কে পড়ল---সেও দু' হাতে ছলিমনের চুল ধরে টান দিতেই দু'জনই পপাত ধরণীতলে।

ব্যাপার শুনে তজু সেই বুড়ীকে নিয়েই লাগল: তুই হারামজাদীই সবের মূল। তুই শূয়রের বাচচা না এলে এই ঝগড়াই ত হত না।

বুড়ী অবাক্ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল: আমারে ডাক্‌ছ কেন? আমি কি সেধে এসেছি?

---হারামজাদী, আবার কথা কও!---আজ সাত বছর এক জায়গায় আছি, কোনদিন মারামারি হয়নি, আজ তোর জন্যই এই কেলেঙ্কারী হল।

গতিক ভাল নয় দেখে বুড়ী অগত্যা নিজের ছোট পুটুলিটী নিয়ে ধীরে ধীরে সরে পড়ল।

তজু ডাকে ঃ আয় ছলিমন, এখানে আয়! অ-ছলিমনের মা, এস দিকিন! আমি-ই বিচার করব। বলে, সে হাঁটুর উপর হাঁটু ফেলে গম্ভীর হয়ে বসে। বিচারকের মৃত্তিকাসন থেকেই সে তার বৌয়ের উদ্দেশ্যে গর্জ্জন করে উঠে ঃ এই হারামজাদী, পোড়ামুখী! তুই চুপ্ কর্ না।

চুপ্ করবে কি---বরং পার্শ্বে উপবিষ্ট স্বামীকে দেখে তার গলা পঞ্চম থেকে সপ্তমে চড়ে বসল ঃ পোড়াকপালীর পুতের কল্লা, ভাইয়ের কল্লা খেতাম আমার কতকগুলি চুল ছিঁড়ে দিয়েছে,---ছলিমন-হতীনকে জিজ্ঞেস্ কর, কেন ছিঁড়ল?

তজুর আর সহ্য হয় না ঃ পোড়ারমুখীকে এক্ষুণি গরুপেটা করব। তোর বাপ-হালা এক শূয়ার, তোরে জনম দিছে—আর আমার বাপ-হালা এক গাধা, তোরে আমাদের বাড়ী এনেছে। চুপ্ না করবি তো লাগা আবার চুলোচুলী। বলে সে বৌকে ঘাড় ধরে বাইরে ঠেলে দেয়।

তারপর বসে পড়ে, বিচারকের কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে ঃ বুড়ীকে কে ডেকে এনেছে?

তজুর বৌ ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে ঃ ছলিমনের মা বলেছে। ছলিমনের মা সমান তাল রেখে চেঁচিয়ে ওঠে ঃ শোন্, অ-বাছার মা শোন্ একবার আমার কি গরজ পড়েছে? তুমি তোমার মেয়ে পাঠিয়ে ডাকিয়ে আনলে কেন?

---মিথ্যে কথা বলো না। আমি কি ও-বেটীকে চিনি নাকি? তুমি না কাল বলেছ, ও-বুড়ী চালান দিতে জানে।

---বলেছি তো, পাঁচ শ বার বলেছি।

---তা আবার 'না' কর কেন? ডাকাওনি বলে অত সতী কওলাও কেন?

তজু চেঁচিয়ে ওঠে ঃ ওরে থাম্ না, একটু চপ্ কর না। কণ্ঠস্বরের লড়াই, চুপ করলেই হার মান্তে হবে। কাজেই দুই কণ্ঠই সমানে

চেঁচাতে লাগল---এ বলে, বুড়ীকে তুই ডাকিয়েছিস্ ও বলে তুই ডাকিয়েছিস্।

ছলিমন বলে উঠল : তুই আমারে চোর বল্লি কেন ?

---আর কারও নাম উঠে না, তোর নাম ওঠে কেন ? বড় সতী কিনা।

---সতী নয় ত তোর মত খান্‌কী নাকি ?

---হতীনের ঝি হতীন, ঘুষি মেরে দাঁত ফেলে দেব এক্ষুণি।

---দে দিকি ? বলে ছলিমন গালখানি বাড়িয়ে ওর মুখের কাছে নিয়ে আসে।

এই আস্ফালনের পর আত্মসম্মান বজায় রাখ্‌তে হ'লে হাতের ব্যবহার করতেই হয়। আর পূর্ব্ব পরাজয়ের আগুণও মনের ভিতর কেন গায়ের চামড়ায় চামড়ায় পর্য্যন্ত ধিকি-ধিকি জ্বল্‌ছিল, আর স্বামী তো কাছেই রয়েছে।

---দিলে কি করবি ? বলে সত্যি সত্যি তজুর-বৌ ছলিমনের গালে এক ঘুষি বসিয়ে দিলে।

---মা'রে, মা'রে---অ-দাদা, অ-দাদা ! বলে ছলিমন চেঁচিয়ে মরাকান্না শুরু করে দিলে।

ছলিমনের মাও চেঁচিয়ে উঠে : অ-হতীনের ঝি হতীন, তোর বাপের মেয়ে পেয়েছিস্ যে ঘুষি মার্‌লি ? চল্ চল্ ছলিমন ! আচ্ছা দেখাব অ-হতীন !

বলে গড়গড় কর্‌তে কর্‌তে মায়ে-ঝিয়ে নিজেদের উঠানে ফিরে এসে গালাগাল ছুঁড়তে লাগল। এরা দু'জন হলে কি হয়, তজুর বৌ খাতুনের গলা একাই এক শ'! এদের দু'কণ্ঠকে ছাড়িয়ে তার বাজখাঁই কণ্ঠই শোনা যায় সকলের ঊর্দ্ধে।

তারপর কণ্ঠে বৈরাগ্যের ভাব ঢেলে দিয়ে ছলিমনের মা চেঁচিয়ে ওঠে : যা করল তজুই করল। তজু ডেকে নিয়ে আজ মার খাওয়ালে। আচ্ছা, খোদায় ইন্‌সাফ্ করবে---আমি সব খোদার হাতে দিয়েছি।

তজুও চেঁচিয়ে ওঠে : তজুমিঞার কথা তোমরা খুব শুন্‌লে কিনা। চুপ্ করতে বল্লাম, চুপ্ করলে না কেন ?

---তোমার বৌ করেছিল? তোমার সাম্‌নে যে ঘুষি মার্‌লে, তার কি ইন্‌সাফ কর্‌লে তুমি?

—চুরির কথা চেঁচিয়ে উড়িয়ে দিলে কেন? এতেই তো বুঝা যায়।

—কি বুঝা যায়?

—বুঝা যায়, নিশ্চয়ই এতে 'কিন্তু' আছে?

---কি? কি বল্লি তজু? বলে, ছলিমনের মা ছিট্‌কে ঘর থেকে উঠানে নেমে এসে উন্মাদ হয়ে উঠেঃ তুই বল্লি, আমরা চুরি করেছি?

---তবে কি?

তজুর-বৌ জোর পেয়ে দ্বিগুণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠেঃ---বড় সতী! সেবার এখানে বসে পান খেতে খেতে তিন্‌টী পয়সা আমার পায়ের নীচে চেপে রেখেছিলে না?

---এয়া আল্লা, তুই ইন্‌সাফ করবি! এই ঝুটার প্রতিফল তার ছেলে-মেয়ের উপর দিয়ে তুল্‌বি! বলে দু'হাত উপরে তুলে দিলে ছলিমনের মা।

তজু উঠে যেতে-যেতে বল্লেঃ নিশ্চয়ই 'কিন্তু' আছে।

দুপুরের নিস্তব্ধতা ভেদ করে তজুরমার কণ্ঠস্বর শোনা যায়ঃ চাইনা, চাইনা! দূর্, মরে যা, মরে যা। কলের মুখ কেউ খুলে দিলে বুঝি। এক নিশ্বাসে শতবার বলেও বুড়ীর মুখ থেকে 'মরে যা' বের হতেই লাগল। লাট সাহেব এসেছেন---রাস্তার ওপার পল্টন মাঠ, সেখানে পুলিসদের প্যারেড্ হচ্ছে। পাড়ার আর আর ছেলেমেয়ের সঙ্গে সাবেরাও রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাই দেখ্‌ছিল। বুড়ীকে দূর থেকে দেখেই সাবেরা তাড়াতাড়ি ছুটে বাড়ী ঢুকে পড়ল। বুড়ী ঢুকে সাবেরাকে দেখেই রুখে উঠলঃ বেশ্যে, হারামজাদী, লাট সাহেব তোর ভাতার! দাঁত মুখ খিঁচে বুড়ী এম্‌নি তেড়ে আসল যে মেয়েটি দৌড়ে না পালালে এতক্ষণে হয়ত তার দফা রফাই শেষ হত। সাবেরাকে নাগালে না পেয়েই বুড়ীর মুখ ছুটেছেঃ দূর্! দূর্! চাইনা, চাইনা, মরে যা, মরে যা,......।

বল্‌তে বল্‌তে চুলার কাছে বসে পড়ে বুড়ী যেন সাবেরাকে চিবাতে লাগল।

মেজ ছেলেটী বারান্দায় বসে ঘুড়ি বানাবার দুরূহ কাজে মশ্‌গুল। মা ডাক দিলেঃ মন্না, শোন!

মন্নার ধ্যান ভাঙে না।

---মন্না, আগ্‌লি না? মা পুনরায় গর্জ্জন করে ওঠে। তারপর দ্রুত উঠে এসে ছেলের পিঠের উপর দুম্‌-দুম্‌ শুরু করে দিলে---।

---শুন্‌বি, শুন্‌বি, শুন্‌বি? এক ডাকে জওয়াব দিবি---দিবি? ছেলে ভ্যা করে কান্না আরম্ভ করলে।

---কেন সকালে টুনুকে এত মার খাওয়ালি? হাতে দুম্‌দুম্‌ চল্‌তে থাকে।---কেন আমি ওকে অত মার্‌লাম? হারামজাদা, কেন ওকে অত মার খাওয়ালি?

এদের দৈনন্দিন-জীবন-ইতিহাসের পাতাগুলি এম্‌নি করেই খোলে আর এম্‌নি করেই বন্ধ হয়!

তজু কি জানি কি করে সামান্য একটু বাংলা লিখ্‌তে পড়তে শিখেছিল তারি দৌলতে সে কি একটা কারখানায় একটা চাকরীও পেয়ে গেছে। কাজেই এই পাড়ায় তার অবস্থা ভালই বল্‌তে হবে। সকাল থেকে সাঁজ তক্‌ তাকে কর্ম্মস্থানে হাতুড়ি পিটাতে হয়। আট দশ বছরে এই হাতুড়ি পিটাবার অভ্যাস যেন তার মজ্জাগত হয়ে পড়েছে। বাড়ী এসেও সে এই অভ্যাস ছাড়তে পারে না।

বাড়ী থেকে বহুদূরে থাক্‌তেই সে কোন ছেলে বা মেয়ের নাম ধরে চেঁচিয়ে তার আগমন-বার্ত্তা ঘোষণা করে। ছেলেরা তাড়াতাড়ি বিস্তৃত মাদুরের উপর উপুড় হয়ে পড়ে খোলা বর্ণ শিক্ষার সাম্‌নে বিড়-বিড় করে সারা দেহ দোলাতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে বৌ-এর কাংস্যকণ্ঠ একেবারে নীরব হয়ে যায়। বৌ-এর কণ্ঠ নীরব হ'লে কি হবে, পান থেকে চুন খস্‌বার উপায় নেই। হয়ত বা ভুলক্রমে পানির লোটাটী দরজা থেকে একহাত দূরে রাখা হয়েছে, হয়ত বা তার পৌঁছার আগে হুঁকাটী সাজিয়ে দরজায় রাখা হয়নি, হয়ত চা'য়ে চিনি বেশী বা

কম হয়েছে—যে-কোন একটা চুতো বের করতে দেরী হয় না। সঙ্গে সঙ্গে তর্জ্জনগর্জ্জন ও হাতুড়ি পিটা আরম্ভ হয়ে যায়—ছেলেমেয়ে থেকে ছেলেমেয়েদের মা পর্য্যন্ত কেউ আর বাদ যায় না। আগে প্রতিবাদ চেঁচামেচি কান্নাকাটি খুব চলত, আজকাল তা-ও মন্দীভূত হয়ে পড়েছে। হয়ত প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় তারা বুঝতে পেরেছে, কারখানার লোহার মত এসব তাদেরও নীরবেই সয়ে যেতে হবে। অন্য কি উপায় আর আছে ? হয়ত রোজ দু'বেলা ভাতের মত এই তাদের তগ্‌দীরেরই লেখা, এই খাতুন ভাবে।

তার পাড়া-কাঁপানো গর্জ্জন শুন্‌লে মনে হয় বোধ করি তজু আমীর হামজার মত পালওয়ানই হবে! কিন্তু আসলে তাকে দেখলে সেই পুরোনো তালপাতার সেপাই উপমাটাই সর্বাগ্রে মনে পড়ে। কালো লিক্‌লিকে শরীর, হাড়ে-চামড়ায় জড়াজড়ি করে কোন প্রকারে বুঝি খাড়া আছে, মেদমাংসের আভাস সারা শরীরের কোথাও নেই। বোধ করি, আওয়াজটা সে তার মার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রেই পেয়েছে। তার মাও ক্ষুদ্রাকতি হ্যাঙ্‌লা মেয়ে—যতক্ষণ বাড়ী থাকে বাড়ী মাথায় করে রাখে। তবে সুখের বিষয়, সে জন্ম-পাড়াবেড়িয়ে, পাঁচমিনিট কোথাও স্থির হয়ে থাকে না। পাড়া বেড়িয়ে ফিরবার পথে নেহাৎ কিছু না হউক, এক বোঝা ভাঙ্গাচটা, ডালপালা নিয়ে ফিরবেই। এসেই হয়ত নাতিকে ডাক দিলেঃ অ'মন্নু মিয়া!

বৌ হয়ত আওয়াজ শুনে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে, দেখে চেঁচিয়ে ওঠে (না চেঁচিয়েও যে কথা বলা যায়, এই অভ্যেস ও জ্ঞান এবাড়ীর কারও নেই): অ-মা, তুমি বুড়ো মানুষ—কেন লাক্‌ড়ি আন্‌তে গেলে ?

লাক্‌ড়ীর বোঝাটা দুম্ করে একপাশে ফেলে বুড়ী চেঁচিয়ে ওঠে: তুই হারামজাদী বুড়ো, তোর সাতগুষ্টি বুড়ো, তোর খালা বুড়ো!

বলা বাহুল্য, বৌ-এর মা নেই, একখালা (মাসী) বোধকরি আছে। তাকেই বৌ-এর বাপের বাড়ীর উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত সমস্ত গাল তাকেই একা ভোগ করতে হয়। তার কানেও যে এসব গালির গুলী উড়ে পড়ে না তা নয়। শুনে, বুবু কেন এসব শোনার জন্যে তাকে রেখে

আগে মরল—এই নিয়ে খুব কিছুটা নিষ্ফল বিলাপ করার পর—বেয়ান শুনুক বা না শুনুক, হয়ত গাল-নিন্দে যে বে-তারে চলে এই জ্ঞান তারও আছে বলেই, নিজের পাড়াপড়শীদের শুনিয়ে শুনিয়েই বেয়ানের চৌদ্দ-পুরুষের শ্রাদ্ধ করতে থাকে।

শাশুড়ী হাঁপাতে হাঁপাতেই বলেঃ অ-পোড়াকপালী, অ-বুড়ী, তুই কি বলিস্?

বৌও ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেঃ তুই বুড়ী, তোর সাতগুষ্টী বুড়ী।

পাশে একটী বুড়ী ছিল, তাকেই সাক্ষী হ'তে হল। বৌ তাকে ডেকে বলে উঠলঃ দেখ তো বু! কথা শুন তো! আমি কি তেইর সাতগুষ্টীরে মরিচ দিলাম?

বুড়ী শাশুড়ীও চেঁচিয়ে উঠেঃ বল তো বইন, আমি কি তেইর বাপদাদার খাতক নাকি?

বুড়ী জানে, এই তোপের মুখে কোন পক্ষে সায় দিলে অপর পক্ষ তার মাথার পাকাচুল একটিও মাথায় রাখবে না। কাজেই বুড়ী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চুপ করেই থাকে।

ছলিমনের স্বামীটি যে শুধু অকর্ম্মণ্য ও বদ্‌মেজাজী তা নয়, ডাহা গাঁজারুও। তার বাড়ী শহরের কাছাকাছি কোন্ এক গ্রামে। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ীতে সে ঘরজামাই হয়ে রয়েছে। শ্বশুরবাড়ী বল্‌তে শাশুড়ী আর এক শ্যালক মাত্র। শ্যালকটী কোন্ একটি চায়ের দোকানে চাকরী করে—টাকা পাঁচেক পায় বুঝি। এই একমাত্র সম্বল, কাজেই অভাবের একশেষ। চাল কিনে তো তেলনুন্ কেনার পয়সা জোটে না, তেল নুন কিনে তো চাল কেনা হয় না। ছলিমনের মা আশা করেছিল, জামাইও রোজগার করবে, ছেলে-জামাইর মিলিত রোজগারে হয়ত বাকী জীবনটা স্বচ্ছন্দে কেটে যাবে। কিন্তু জামাইটী আজ পর্য্যন্ত কোন কাজেই গা লাগাল না, চাকরী হয়ত ধরল, কিন্তু একটু কাজের ভিড় দেখলেই পালিয়ে এল।

এমনি করে মাসে দু'তিনবার করেই সে এখানে-ওখানে চাকরী নিতে আর ছাড়তে লাগল। যে-করেই হউক, বিড়ি কিন্তু তার ঠোঁটে

থাকা চাই-ই। বছর দু'য়েক হয়, একটি ছেলেও হয়েছে—তবু টাকা রোজগারের দিকে তার ঝোঁক একটুও দেখা গেল না। কেউ কিছু বল্লে বরং উত্তর দেয়ঃ চাকরীই যদি করতে হ'বে, শ্বশুর বাড়ীতে কেন? সারাদিন সারা সহরময় টো টো করে ঘুরে বেড়ায়,—প্রায় রাত দুপুরেই বাড়ী ফেরে। থাকে ত খায়, না হয় একটি বিড়ি পুড়িয়ে চুপ্‌টী করে বৌএর পাশটিতে শুয়ে পড়ে। যে-দিন সকাল সকাল ফিরে—ছেলেকে কোলে নিয়ে আদর-সোহাগ করে। কোন কোন দিন নিম্নস্বরে একটু বিদ্যাশিক্ষা দেওয়ার অর্থাৎ তজুর মুখে শোনা ক খ আবৃত্তির চেষ্টাও করে, তার মুখে মুখে ছেলেকে বলায়। হয়ত ভাবে, নিজের তো কিচ্ছু হ'ল না, ছেলেটার যদি একটা রাহা হয়। হয়ত ছেলের জন্যে সে তজুর মতো কারখানার চাকরীই স্বপ্ন দেখে!

রমজানের চাঁদ উঠবে বোধ করি সেদিন—আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মুসলমান সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায়, ছাদে, আঙিনায়, যে যেখানে একটু ফাঁকা পেয়েছে, সেখান থেকে আকাশের দিকে সোৎসুক নেত্রে তাকিয়ে আছে। তজুও ছেলেমেয়েদের নিয়ে রাস্তায় উঠে এসে রমজানের চাঁদের খোঁজে আকাশের আনাচে-কানাচে চোখ বুলুচ্ছে। ছলিমন আসন্ন-মাতৃত্ব-ভারাক্রান্ত দেহখানি নিয়ে দুয়ারের কাছে লেপ্টে বসে আকাশ পানে তাকিয়ে আছে। সেই সময় তজুদের ছাগলটী পাকা কাঁঠালপাতা চিবোতে চিবোতে—বেড়াঘেরা কোথাও নেই তো—তাদের ঘরের পাশ দিয়ে ধীরে মন্থর গতিতে ঘরে ফিরছিল। ছাগলটীকে দেখ্‌তেই হঠাৎ ছলিমনের মুখ থেকে বেরিয়ে পড়লঃ—দূর, হতীনের-ঝি হতীনের ছাগল। হয়ত আজ এই রমজানের চন্দ্রোদয়-মুহূর্তে একটা ঝগড়া-সৃষ্টির ইচ্ছা তার আদৌও ছিল না। হয়ত কথাটী শুধু তার মনে মনেই এসে পড়েছিল। কিন্তু অভ্যাসদোষে তা বেরিয়ে পড়েছে উচচ হয়ে। সামনের বাড়ীর আঙিনায় দণ্ডায়মান খাতুনের কানে কথাটী পৌঁছতেই সেও ঝঙ্কার দিয়ে উঠলঃ তুই হতীনের ঝি হতীনের কি?

দেখ্‌তে দেখ্‌তে চাঁদ-দেখার সমস্ত আনন্দ ও ঔৎসুক্যকে ছাপিয়ে দুই সম্মিলিত নারীকণ্ঠের এক তুমুল কোলাহল উত্থিত হল। চাঁদ-দেখা ফেলে রেখে ফাটনোন্মুখ বোমার মত হয়ে তজু বাড়ীর দিকে

ফিরল। আঙিনার পাশ থেকে শক্ত একটা চটা কুড়িয়ে নিয়ে অগ্রসর হতেই বৌ চেঁচিয়ে উঠল: আমি কি করেছি? ঐ হতীনের-ঝি হতীন খামখা ঝগড়া লাগাল কেন? অনর্থক গালাগাল দিয়ে তজু আজ তার শক্তির কিছুমাত্র অপচয় করলে না।

—দূত্তোর পোড়ারমুখী...বলে চটা উঠাতেই, অভ্যেস্ বশেই বোধ করি, বৌ কাপড় টেনে দিয়ে পিঠ পেতে দাঁড়ালে। যখন তজু থামল, তখন তার নিজেরই হাঁপানী শুরু হয়ে গেছে।

মিনিট দুই-তিন দম নিয়ে, তারপর সে ছলিমনদের আঙিনায় ঢুকে গর্জ্জন করে উঠল: তুই শূয়রণীও আর ঝগড়া করার সময় পেলি না, না?

উদ্ধত-ফণা সর্পিনীর মত গ্রীবা বাঁকিয়ে ছলিমনও উত্তর দিলে: তোর মাগ্ শূয়রণী, আমাকে গালাগাল দিলে কেন? তুই হারামজাদাও আবার বাড়ী বয়ে ঝগড়া করতে এয়েছ্?

—শূয়রণীর-ঝি শূয়রণী মুখ ভেঙ্গে এখন গুঁড়িয়ে দেব!

—দে দেখি হারামজাদা! বলে তার মাতৃত্ব-ভারাক্রান্ত দেহখানিকে অতি কষ্টে তুলে, ক্ষুধিতা শার্দ্দুলীর মত চোখে মুখে আগুন ছড়াতে, ছড়াতে বাইরে এসে ঈষৎ বঙ্কিমগ্রীবা হেলিয়ে সে তজুর সাম্‌নে রুখে দাঁড়াল। ইত্যবসরে, কোথা থেকে আতাড়ি-পাতাড়ি ছলিমনের মা ছুটে এসে, কপালে করাঘাত করতে করতে চেঁচিয়ে উঠল: কি করছিস্, কি করছিস্। ঘরে যা, ঘরে যা—অ-মা, মা—। বলে মেয়েকে ধরে টেনে ঘরে ঢুকাতে ঢুকাতে বল্লে: অনিষ্ট হবে, পেটের পুত-ঝির অনিষ্ট হবে। চুপ্ কর্, চুপ্ কর্। আমি সব ইন্‌সাপের ভার আল্লার হাতে দিয়েছি—এয়া আল্লা! আজ পয়লা রোজার দিন, তুই ইন্‌সাপ্ কর! বলে সঙ্গে সঙ্গে ছলিমনের মা পশ্চিমমুখো হয়ে সেজদায় পড়ে প্রার্থনাটির পুনরাবৃত্তি করলে।

তজু বাড়ীতে যা, কারখানায় কিন্তু তা নয়। সহকর্ম্মী ইয়ারদের সঙ্গে জুটে অবসর সময় গাঁজার কল্কিতে দম সে-ও দেয়, চা'র দোকানে বসে আড্ডাও যথেষ্ট মারে। তবুও কারখানায় খুব খাটিয়ে ও নিপুণ মিস্ত্রী বলে তার সুনাম আছে। চাকরীতে ভর্তির দিন থেকে আজ

পর্য্যন্ত কর্ত্তব্যে অবহেলা কেউ কোন দিন তার মধ্যে লক্ষ্য করেনি। সে চোখ বুঁজে হাতুড়ি চালালেও তা কখনও লক্ষ্যচ্যুত হয় না। কারখানার লোহার উপর তার হাতুড়ির আঘাত বৌ-এর পিঠে কিলের মতই অব্যর্থ। মুখে গালাগাল চালাতে চালাতেই যেমন সে কিল্ চালাতে পারে, কারখানার সহকর্ম্মীদের সঙ্গে খোশগল্প করতে করতে সে হাতুড়িও তেমনি চালাতে পারে।

কিন্তু রোজার মাঝামাঝি একদিন সে এমন গম্ভীর মূর্ত্তি নিয়ে কারখানায় এল যে, দেখে সকলে একটু আশ্চর্য্য না হয়ে পারল না। এসে নীরবেই কাজ ধর্‌লে, একমনে ঘণ্টা দু'য়েক কাজ করেও গেল। সঙ্গীরা খুব অবাক হ'ল, কারণ এম্‌নি নিরানন্দ ও নির্ব্বাক মুখে সে কাজ কোনদিন করে না। কাজ করতে করতে, বোধ করি অন্যমনস্কই হয়ে থাকবে, হঠাৎ তার হাত থেকে হাতুড়ি গেল ফস্‌কে, অগ্নিতপ্ত লৌহখণ্ড আর একটু হলেই পড়েছিল আর কি তার পায়ে। তার নিজেরই বিস্ময়ের অন্ত রইল না। সেদিন হাতুড়ি আর সে ধরলে না। কে একজন সহকর্ম্মী টিট্‌কারী দিয়ে বল্লেঃ মিস্ত্রিকে আজ রোজায় ধরেছে বুঝি। তজুরা, সাজাবো এক কল্কি?

আর একজন বল্লেঃ না হে, আজ বুঝি ভাবীর মুখ দেখে আসা হয়নি।

তজু আজ কারও কোন টিট্‌কারীর উত্তরই দিলে না, দেওয়ার প্রবৃত্তিই তার হল না। বড়বাবুকে বলে বাকী দিনের ছুটী নিয়ে সে কারখানা থেকে বেরিয়ে পড়ল। কারখানা থেকে বেরিয়ে সে রাস্তার কলে ওজু করলে, তারপর টেশন-রোড দিয়ে ঘুরে গোরস্থানের দিকে চলতে লাগল। বাইর থেকে কেউ আছে কিনা দেখে নিলে, তারপর ধীরে ধীরে জেব থেকে একটি ময়লা টুপী বের করে মাথায় পরলে। গেট পেরিয়ে একটি আন্‌কোরা নূতন কবরের পাশে এসে দাঁড়াল।

আগের দিনই মাত্র ছলিমন একটি মেয়ে প্রসব করে মারা গেছে। এইটি তারই কবর। ছলিমনের শব বহন করে এনে, এই কবর খুঁড়ে, যারা তাকে গোর দিয়ে গেছে, তার মধ্যে সেও ছিল। কাল থেকে বহু কথা তার মনকে তোলপাড় করে তুল্‌ছে—তার মত লোককেও

একরকম বোবা বানিয়ে ছেড়েছে। কাল বরাদ্ধ মার না খাওয়ায় খাতুন ও তার ছেলেমেয়েদের পিঠ চুল্‌কিয়েছিল কিনা জানি না, কিন্তু বিস্মিত তারা নিঃসন্দেহেই হয়েছিল।

এই তাজা পার্বত্য গেরুয়া মাটীর নীচে যে দেহখানি একমাত্র ক্রিমিকীটের খোরাক হয়ে নিস্পন্দ প্রাণহীন পড়ে রয়েছে, কাব্য কাকে বলে তার কাণাকড়ি না জেনেও, একদিন এই দেহ তজুর চোখে কাব্যের অঞ্জন বুলিয়েছিল। বিবাহ-Cum-সন্তানপূর্ব ছলিমনকে দেখ্‌লে চেয়ে থাক্‌তেই হ'ত। তার মায়ের মতই তার গড়ন একহারা ও দীর্ঘ ছিল। রং খুব ফর্সা ছিল না বটে, কিন্তু লীলায়িত তন্বী দেহখানি বিদ্যুৎভঙ্গিমার মত মায়াময় ছিল। তজুকে সব চেয়ে উন্মাদ করত তার গতি—দৌড় ছাড়া হেটে চল্‌তে তাকে কদাচিৎ দেখা যেত। চির-তৈলবঞ্চিত তামাটে চুল, গোলগাল মুখখানি ও ভাসা ভাসা চোখ দু'টি নিয়ে সে যখন বিদ্যুৎ-ভঙ্গিমায় ঘর বার পুকুর আঙিনা ছুটে বেড়াত, দেখে তজু কিছুতেই ঘরে বসে থাক্‌তে পারত না। একেবারে খোলাখুলি দাঁড়িয়ে চোখ ভরে দেখবে তাও সম্ভব নয়, কারণ তাকে দেখ্‌লেই সে ছুটে পালাত। কাজেই অনন্যগতি তজু, তার মা তো প্রায়ই ঘরে থাকতো না, বাইরে আঙিনায় বেড়ার আড়ালে দাঁড়িয়েই ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ছলিমনদের ঘরমুখো হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে কাটাত।

কতদিন—ছলিমনদের অবস্থা তো সে জানে—নিজেই হয়ত দোকান থেকে এক পয়সার পান সুপারী কিনে নিয়ে পকেটে পুরে ছলিমনের মার কাছে এসে বলত: অ-চাচী, এক খিলি পান খাওয়াবি?

ছলিমনের মা হয়ত দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে উঠ্‌ত: অ-পুত, আমি পান কোথায় পাব? সে তগ্‌দীর কি আল্লা আমারে দিছে?

তজু তখন ধীরে ধীরে পকেট থেকে পান-সুপারী বের করতে করতে হাসিমুখে বলত: অ-চাচী, কেন সে-তগ্‌দীর দিবে না? আল্লার দুনিয়ায় কি পানের কাহাৎ লেগেছে? এই নাও।

ছলিমনের মা পান-সুপারী হাত বাড়িয়ে ভিতরে দিতে দিতে বলে উঠত: ছলিমন, তোর তজু-ভাইকে এক খিলি পান বানিয়ে দে তো? সুপারী কাট্‌তে, পানের ডাঁটা ছাড়াতে তার হাতের কাঁচের চুড়ি কয়গাছ

মৃদু রিনি ঝিনি করে উঠত। তজুর বুকের তাজা রক্তে তারি প্রতিধ্বনি আছাড় খেয়ে পড়ত। তজু নিজেকে যেন আর ধরে রাখতে পারত না।

ছলিমন তার শীর্ণ হাতখানি বাড়িয়ে মার হাতে পানের খিলিটি দিয়ে দিত। সাত বছর পরে, আজ এই কবরের পাশে দাঁড়িয়েও বুঝি সে সেই অমৃতের স্বাদ অনুভব করতে পারে। ছলিমন মাকে এক খিলি দিয়ে, নিজে এক খিলি মুখে পুরে, পেছনের দরজা দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যেত। তজুর বসে থাকার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, সে-ও পান চিবোতে চিবোতে বেরিয়ে যেত। সেদিন তার শিরায় শিরায় কি-এক অপূর্ব সঙ্গীত মৃদু গুঞ্জরণ করে ফিরত।

পান খেলে ছলিমনের স্বচিকন ঠোঁট দু'খানি এমনি টক্‌টকে লাল হয়ে উঠত যে, দেখে সহজে চোখ ফেরানো যেত না। ইদানিং এই সম্বন্ধে সে নিজেও এত সজাগ হয়ে উঠেছে যে, পান খেলেই পাড়াময় এবাড়ী ওবাড়ী, এর মা, তার বৌ, ও'র বোনের কাছে একবার টহল দিয়ে আসা চাইই—তার রক্তজবার মত ঠোঁট দু'খানি সকলের সাম্‌নে একবার ঘুরিয়ে আনতে না পারলে সে যেন কিছুতেই পান খাওয়ার স্বাদ ও সার্থকতা বুঝ্‌তে পারত না। তজু তাদের আঙিনায় দাঁড়িয়ে, কাল্লার মার ঘর থেকে লাল টুকটুকে ঠোঁট বেঁকিয়ে ছলিমনকে বের হয়ে যেতে দেখে নিত---তখন তার মনে হত ছলিমনের ঐ ঠোঁটের অগ্নিশিখা যে কোন নগরকে বুঝি ভস্মীভূত করে দিতে পারে।

আজ এই কবরের পাশে দাঁড়িয়ে এ-রকম কত দৃশ্যই না একে একে তার মনে ভেসে উঠ্‌তে লাগল। কিন্তু বহু সাধ্যসাধনা করেও সে তার মাকে রাজী করাতে পারেনি। তার মা নোওয়াবার মত মেয়ে নয়। সে ছেলের মুখের উপরই বলে দিয়েছিল: খড়ম-পা বৌ আমি কিছুতেই আনব না। তজুর মার ধারণা—খড়ম-পা অর্থাৎ খড়মের মত যে-সব মেয়ের পায়ের গোড়ালি উঁচু, তাদের স্বামী কখনো বাঁচে না। আজ তার মা'র সে-কথাটিও তজুর মনে হল। সে ভাবলে: কই, ছলিমনের স্বামী তো মরল না, বরং উল্টো ফলই হল। যত সব বাজে কুসংস্কার!

যাক্, অনেকক্ষণ ধরে, সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছলিমনের কবর 'জেয়ারৎ' করলে।

ছলিমনের নবজাত শিশুটীকে নিয়ে ছলিমনের মা মহা মুশ্কিলে পড়েছে; দু'বেলা খাবার জোটানোই যাদের পক্ষে কঠিন, শিশুর জন্য দুধ-বার্লি কিনবার সঙ্গতি তাদের কোথায়? খালি-পেট শিশুকে শুধু কোলে নিয়ে বা দোলায় দুলিয়ে তার কান্না থামানো যায় না। ছলিমনের মা ছাড়া কোলে নেবার অন্যলোকও তো নেই। তার উপর চা'ল ডাল যোগাড় হলে, তাকেই রান্নাবান্না করে, ছেলে-জামাইকে খাওয়াতে হয়। কাজেই অনেক সময় শিশুকে দোলায় ফেলে রাখা ছাড়া উপায় থাকে না। ভাতের ফেন, কলা কচ্‌লিয়ে নরম করে অথবা কোনদিন যদি দু'এক পয়সার দুধ কিন্‌তে পারা যায়, তা দিয়ে শিশুটিকে কোন প্রকারে এই কয়দিন এখনো বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। ছলিমনের মার ধারণা এই করে এই শিশুকে বাঁচানো কিছুতেই যাবে না—শুধু শুধু দীর্ঘদিন ধরে বেঁচে থেকে তাকেই নিষ্ফল কষ্ট দে'য়া হচ্ছে। সারা দিনরাত এক ঘেয়ে কান্না শুন্‌তে শুন্‌তে ছলিমনের মা কেন, শিশুর বাবা পর্য্যন্ত বিরক্ত হয়ে ওঠে। রাত্রে অবস্থা আরও অসহ্য—মাতৃস্তন্য বঞ্চিত ক্ষুধিত শিশু অবসন্ন ও ক্লান্ত হয়ে নেতিয়ে না পড়া পর্য্যন্ত সারাক্ষণ শুধু তাঁ তাঁ কাঁদ্‌তে থাকে। দশ পনর দিনের শিশুকণ্ঠে এত শক্তি থাক্‌তে পারে সে কল্পনাই করা যায় না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে এমন একটানা ক্রন্দনেও যে এই শিশুকণ্ঠ সহজে ক্লান্ত হয় না এ সত্যিই বিস্ময়কর! এমন একটানা ক্রন্দনের মাঝে কারও ঘুম দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার আশা করা যায় না। একরাত দু'রাত তিনরাত —ক'রাত আর এভাবে না ঘুমিয়ে শিশুর কান্না শুনে থাকা যায়? সমস্ত স্নেহ-বন্ধনকে ছিঁড়ে মন আপনা আপনিই বিরক্ত হয়ে ওঠে। কয়েকদিনের মধ্যেই সকলের ধৈর্য্য যেন শেষসীমায় এসে পেঁাছল। ধৈর্য্য শেষ হলে কি হবে, একটা জ্যান্ত মানব-শিশুকে তো আর গলা টিপে মেরে ফেলা যায় না! চোখ-কান বন্ধ করে সহ্য করতেই হয়। আনু ছলিমনের বড়ভাই—দু'একদিন কোন প্রকারে আহ্ ওহ্ করে সয়েছিল, তারপর থেকে খেয়ে দেয়ে সে দোকানেই থাকা আরম্ভ করে দিলে। জামাইটিও মাঝে মাঝে রাত্রে উধাও হতে লাগল।

যেকোন অপরাধের জন্য দায়ী হলেও পুরুষের উপায়ের অভাব নেই ; কিন্তু নিরাপরাধ হলেও নারীর পালিয়ে বাঁচার উপায় কোথায় ? কাজেই সারা দিনরাতের সমস্ত উপদ্রব একা ছলিমনের মা'র উপর দিয়েই যেতে লাগ্‌ল। রাত্রে আলো জ্বালিয়ে কলা থ্যেৎলা করে মুখে দিয়ে, কোলে নিয়ে, নিজের শুষ্ক স্তন শিশুর মুখে ঠেলে দিয়ে—অর্থাৎ যত রকমের উপায় ছলিমনের মায়ের মাথায় আসা সম্ভব, সবই সে একে একে ব্যবহার করেও যখন শিশুর কান্না থামাতে পারে না, তখন বিরক্ত হয়ে একরাত শিশুকে দোলায় শুইয়ে দিয়ে দোলাটা বাইরে বারান্দার চালের সঙ্গে টাঙিয়ে রাখ্‌লে। বেচারা কি আর করবে—না ঘুমিয়ে কত রাত আর থাকতে পারে ? শিশুকে বারান্দায় রেখেও নিশ্চিন্তে ঘুমোবার উপায় নেই। খোলা বারান্দা—ভয় হতে লাগ্‌ল, পাছে শৃগাল কুকুর এসে কিছু একটা করে বসে। কাজেই বাতি জ্বালিয়ে নিজেকেও বসে থাক্‌তে হয়। সকালে জামাই ঘরে ঢুকতেই ছলিমনের মা ঝাঁজের সঙ্গে বলে উঠল : তোমার ছেলে বাপু, তুমি কোথায় নিয়ে যাবে যাও। আমি আর পারিনা। দুধ কিনে দেবে না, বার্লি দেবে না—আমার চোখের সাম্‌নে এ-রকম ভাবে না খেয়ে বাচচাটা মর্‌বে এ আমি দেখ্‌তে পারব না।

ফলে সেদিন সারারাত্রি জামাইর আর টিকিটিও দেখা গেল না।

এখন প্রায়ই অসহ্য হ'লে ছলিমনের মা কানের কাছ থেকে একটু দূরে রাখার জন্যই বোধ করি রাত্রে দোলাশুদ্ধ শিশুকে বারান্দাতেই টাঙিয়ে রাখে। তাতেও কিন্তু শিশুর কান্না কিছুমাত্র কমে না, উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পায়।

সারা দিনরাত্রি-ব্যাপী একই একঘেয়ে কান্না শুন্‌তে শুন্‌তে পাড়া-পড়শীরা পর্য্যন্ত বিরক্ত হয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে তাদের বিরক্তি ও শ্লেষ-বিদ্রূপ যে কানে আসে না তা নয়, কিন্তু কন্যাশোক ছলিমনের মার মন থেকে ঝগড়া ফসাদ করার প্রবৃত্তি ও সামর্থ্য নিঃশেষে শেষ করে দিয়ে গেছে।

দুঃখের দিন-রাত্রি এদের এম্‌নি করে পোয়াতে থাকে। শিশুটি শুধু ছলিমনের মার নয়, আশেপাশের সবারই এক দারুণ সমস্যা হয়ে

দাঁড়িয়েছে। দিনরাত এক নিরুপায় ক্ষুধিত শিশুর কান্না আর কাঁহাতক সহ্য করা যায়! সেই ঝগড়ার পর থেকে তজুদের সঙ্গে এদের আলাপ নেই—ছলিমনের মৃত্যুর দিন অবশ্য তজু দশ প্রতিবেশীর মত মৃতার প্রতি শেষ কর্ত্তব্য করে গেছে। অন্যেরা সবাই মাঝে মাঝে এসে ছলিমনের মাকে সান্ত্বনা ও সহানুভূতি জানায়, তাতে কিন্তু সমস্যার নিরাকরণ হয় না।

প্রথম কয়দিন তজুর বৌ এসব আপদবালাই জোর করেই উপেক্ষা করেছিল—শুনেও শুনত না, দেখেও দেখত না। মনে মনে সে ভাবে, অপরের সুখে-দুঃখে তার কি এসে যায়—কিছু বল্‌তে গেলেই ঝগড়া লেগে বসবে হয় ত।

কিন্তু রোজ রোজ দিন রাত ক্ষুধাকাতর ছোট শিশুর কান্না শুন্‌তে শুন্‌তে, কি জানি কেন নিজের ছোট ছেলেটিকে বুকে টেনে নিয়েও সে কিছুতেই স্বস্তি পায় না। প্রায় প্রতি রাত ছলিমনের মেয়ের কান্না শুনে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়—অস্থির মনে এপাশ ওপাশ করে, পাখা নাড়ে, নিজের ঘুমন্ত ছেলেকে বুকের উপর তুলে নিয়ে স্তন-বাঁট শিশুর মুখে গুঁজে দেয়। কিন্তু তবুও তার কান পড়ে থাকে ও-বাড়ীর মাতৃহারা শিশুর ক্রন্দনের উপর। চোখ বুঁজে ঘুমোবার চেষ্টা করে, কিন্তু ঘুম কিছুতেই আসেনা।

অমনি অনাবশ্যক তারও বহু বিনিদ্র রজনী কাটে। একদিন নিশীথ রাতে ঘুম ভাঙার পর যখন ঘুম কিছুতেই আসছে না, তখন অনেকক্ষণ ধরে কি ভেবে-চিন্তে সে উঠে বসলে। ও ঘরে হলেও শাশুড়ীর নাকডাকা শোনা যাচ্ছে। স্বামী ঘুমিয়ে আছে কিনা—একবার ডেকে দেখলে! অবশ্য কোন সাড়াই পাওয়া গেল না। তখন সে ধীরে ধীরে নিঃশব্দে ঘরের দরজা খুলে বের হয়ে পড়লে।

রোজায় সারাদিন উপোস থেকে আর কাঁহাতক শিশুর কান্না বরদাশ্‌ত করা যায়। কিছুতেই কান্না থামাতে না পেরে ছলিমনের মা শিশুকে বাইরে বারাণ্ডায় দোলায় শুয়ে দিয়ে নিজে একটুখানি গড়িয়ে পড়েছিল। ক্লান্ত শরীর—হয়ত তন্দ্রাই এসে পড়েছে। কিছুক্ষণ পর হয়ত শিশুর কান্না শ্রবণেন্দ্রিয়ে না ঢোকার জন্যেই হঠাৎ সজাগ হয়ে

উঠল। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আস্ছে, কিছুতেই উঠতে ইচ্ছা হচ্ছে না। পরক্ষণে ভাবলে, হয়ত ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে—কিছুক্ষণ পরেই তো 'ছেহ্‌রী' খাওয়ার জন্যে উঠতে হবে, তখন দেখা যাবে এই ভেবে সে আবার চোখ বন্ধ করলে।

ছলিমনের মা বাকী রাত্রি আর কান্নাকাটি শুন্‌তে পেলে না। শেষ রাত্রে খেতে উঠেও অবাক্ হ'ল---শিশু বেশ নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। সেই থেকে, সারাদিন খুব কান্নাকাটি করে বটে, কিন্তু মাঝ রাত থেকে শিশু বেশ নিঃশব্দে ঘুমিয়ে পড়ে এবং সকালও অনেকক্ষণ ধরে ঘুমিয়ে কাটায়। একদিন কি মনে করে ছলিমনের মা শিশুকে বাইরে দোলায় না রেখে, ঘরের ভিতর বিছানায় নিজের কাছে রাখলে---ফলে সেরাত্রি না পারলে শিশুর কান্না থামাতে, না পারলে নিজে ঘুমাতে। অগত্যা বাধ্য হয়ে তুলে নিয়ে বাইরে দোলায় শুইয়ে দিলে। শেষ রাতে উঠে, ছলিমনের মা সত্যই আশ্চর্য্য হল---শিশু দোলায় পড়ে বেশ অকাতরে ঘুমুচ্ছে!

এতদিন যে-সন্দেহটা ছলিমনের মার মনের কোণে শুধু উঁকিঝুঁকি মারছিল এখন তাই তার মনে একরকম বিশ্বাসে পরিণত হ'লো। সে লোকের মুখে শুনেছে, দুগ্ধপোষ্য শিশু রেখে যে-মা মারা যায়, সে কিছুতেই নিশ্চিন্তে কবরে শুয়ে থাকতে পারে না। রাত্রে যখন সবাই ঘুমোয় তখন সে তার শিশুর কাছে আসে, তাকে দুধ খাওয়ায়, সান্ত্বনা দেয়। অবশ্য এও সত্য যে এ-রকম মৃতা মার দুধ যে শিশু খায় সে কিছুতেই বাঁচে না। এখন তার ধারণা হল, নিশ্চয়ই ছলিমন রাত্রে এসে তার ছেলেকে দুধ খাইয়ে যায়। ছেলের পক্ষে এটা অমঙ্গল-জনক ভেবে সে দু'এক রাত শিশুকে বাইরে রাখলে না—কিন্তু শিশুর কান্নায় ঘরে তিষ্ঠানই দায় হয়ে পড়ে। অগত্যা ছলিমনের মা ভাবলে ---দুধ ছাড়া এমনিও আর সে কয়দিন বাঁচবে! মরে তো মার দুধ খেয়েই মরুক! এই ভেবে সে আবার শিশুটিকে বাইরে দোলায় রাখ্‌তে লাগল।

এ-সব তো শুধু শোনা কথা---সত্য মিথ্যা জানবার জন্যে ছলিমনের মার মনে এক অদম্য কৌতূহলের সঞ্চার হল। কখন কত রাতে আসে কে জানে। সে ভাবলে, না হয় এক রাত জেগেই কাটাবো।

সত্যি সত্যি ছলিমনের মা সে-রাত তার বিছানাটা ভাঙা বেড়াটার কাছ্-ঘেষেই করলে, বেড়ার ছিদ্রটার চারদিকের বেরিয়ে-পড়া চটাগুলি ভেঙ্গে ফেলে আরও একটু ফাঁক করে নিলে। তারপর সেই ছিদ্রপথে চোখ রেখে নীরবে বসে রইল। দূরে পুলিশ লাইনের ঘণ্টায় দশটা, এগারটা, বারটা একে একে বেজে চল্ল। ঘুমে তার শরীর ভেঙ্গে পড়তে চায়। তবুও তার পণ, সে আজ তার হারানো কন্যাকে একবার দেখবেই---আর দেখবে কি করে মৃত মানুষ আবার জ্যান্ত হয়ে কবর থেকে উঠে আসে। আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না, বারটার কিছুক্ষণ পরই সে যা দেখল তাতে সে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। ঈষৎ ঝাপ্সা অন্ধকারেও চিন্তে তার বেগ পেতে হল না।

দেখেই প্রথম সে খুব ভয় পেয়েছিল। যে দুষমন্, গলা টিপে মেরে না ফেলে। কিন্তু পরক্ষণে দেখে সে অবাক্ হল, ছেলেকে দু' হাতে দোলা থেকে উঠাতেই ছেলের কান্না থেমে গেছে, তারপর বুকের কাপড় উঠিয়ে সে শিশুর মুখে তার স্তন-বাঁট গুঁজে দিলে।

কি কর্‌বে, ছলিমনের মা ভেবে পেলে না। শিশুর কান্না থেকে বাঁচতে হলে, সর্বোপরি শিশুকে বাঁচাতে হলে, মানা করা যায় না। অথচ নিজের নাতানকে চির শত্রুর দুধ খাওয়াবে এ যে ভাবাই যায় না। মনে মনে সে যত অছিলাই দাঁড় করাক না কেন, তার প্রবৃত্তি কিন্তু এতে কিছুতেই সায় দিচ্ছিল না।

তবে ছলিমনের মার মনে মনে যত দ্বন্দ্বই চলুক, রোজ কিন্তু সে দোলাশুদ্ধ শিশুকে বারান্দায় ঝুলিয়ে না রেখে পারলে না।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঈদ---রমজান-শেষে খুশীর ঈদ---এসে পড়ল। যাকে প্রতি মুহূর্ত্তে অভাবের তাড়না সহ্য করতে হয়, সেও আজ তার যথাসর্বস্বের বিনিময়ে হলেও একটু আনন্দ করছে---একটু মিষ্টিমুখের আয়োজন করছে। ছলিমনের মাও খুব সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে ঘরদোর নিকানো সেরে, বিছানাপত্র ধুয়ে দিলে। হাড়ি পাতিল সব মেজে ঘষে সাফ করলে এবং নিজে গোসল করে ছলিমনের বড় ছেলেটিকেও গোসল করিয়ে দিলে।

জামাইটার কাল থেকে খোঁজ নেই। আনু কি করে কে জানে—কিছু সেমাই ও চিনি এনে দিয়েছে। ছলিমনের মাকে তাই রাঁধ্‌তে হবে। ছলিমনের শিশুটি ঘুম থেকে জাগ্‌তে না জাগ্‌তেই যে-কান্না শুরু করেছে তা আর কিছুতেই থাম্‌ছে না। নিত্যনৈমিত্যিক ব্যাপার, তবুও আজকের এই খুশীর দিনে এই একঘেঁয়ে কান্না ছলিমনের মার কিছুতেই সহ্য হচ্ছিল না। প্রাতঃস্নানের যে পূত-পরিব্যাপ্তি এতক্ষণ তার সারা দেহমনে বিচরণ করছিল—তা এই মা-হারা অসহায় শিশুর নিদারুণ কান্নার রূঢ় আঘাতে একেবারে ধুয়ে মুছে নিঃশেষ হয়ে গেল। একটা অক্ষম রোষে তার মন বিষিয়ে উঠল। তবুও ছেলেকে ডেকে বলে দিলে, যে করেই হউক জামাইকে খুঁজে নিয়ে এস—আজ ঈদের দিনে বাইরে বাইরে ঘুর্‌বে এ ভাল দেখায় না। আজকের দিনেও ছেলের পরণে পুরোনো কাপড় ও গায়ে ছেঁড়া সার্ট দেখে ছলিমনের মা আর কিছুতেই চোখের জল রাখতে পারলে না। চোখের জলে মনের দুঃখ লাঘব করার ফুরসৎও ছলিমনের মা'র নেই। নামাজের সময় ঘনিয়ে আসছে, সেমাই না রাঁধলে কি খেয়ে ছেলে ঈদ্‌গায় যাবে? অগত্যা ছেঁড়া কাপড়ের আঁচলে চোখের জল তাকে মুছতেই হল এবং কান্না-রত শিশুকে কোলে নিয়েই সে চুলা ধরিয়ে দিলে।

তজুর বৌ গোসল করে নতুন রেশ্‌মী শাড়ী পরে আজ ঘরময় উড়ে ফিরছে। সে ভোর চারটায় উঠে ঘর-দোর, জিনিষপত্র সব পরিষ্কার করে নিয়েছে। সেমাই রান্না তার হয়ে গেছে, তজুও ছেলেমেয়েদের সে একপালা খাইয়েও দিয়েছে। তার ছেলেমেয়েরা সবাই আজ নববস্ত্রে সজ্জিত হয়েছে দেখে সারা বছরের পিঠের ব্যথা সে একনিমেষে ভুলে গেল। স্নেহে প্রেমে ভালবাসায় আজ তার বুক ভরে উঠেছে। নতুন কাপড় পরে চোখে কাজল মেখে চুলে সুগন্ধি তৈল ও কাপড়ে 'খোশ্‌বু' মেখে সে আজ নববধূর মত হাসিখুশীতে ভেঙ্গে পড়ছে। বৌ-এর মুখখানি কোনদিনই তজুর পছন্দের নয়, মুখের বাম-পাশ্‌টায় খানিকটা ছোট-কালের এক পোড়া দাগে কালো হয়ে আছে। তাই শুভদৃষ্টির দিন থেকে তজু যে বৌকে 'পোড়ারমুখী' ডাকা আরম্ভ করেছে, আজ চার পাঁচটী ছেলেমেয়ের মা হওয়ার পরও যখনি বৌকে ডাক্‌তে হয়, সে

'পোড়ারমুখী' বলেই ডাকে। কিন্তু আজ বৌ শাশুড়ীকে পা ধরে সালাম করে তার কাছে আস্‌তেই বৌ-এর হাস্যবিভাসিত মুখ দেখে, বিশেষ করে, দুই আল্‌তা-রাঙা পায়ের উপর চোখ পড়তেই, এক অপূর্ব্ব পুলকে তার হৃদয়-মন ভরে উঠল। নতমুখী সালাম-রতা বৌকে পায়ের কাছ থেকে তুলে নিয়ে সে তার পোড়ামুখখানির উপরই একটি প্রেমের নিদর্শন এঁকে দিতে দিতে আজ এই সর্বপ্রথম বোধ করি ডাক্‌লেঃ খাতুন!

খাতুনের পা আজ মাটি ছুঁয়ে চলার কথা নয়। যা ছিল জীবনে শুধু অভ্যাস, তা আজ এক মুহূর্ত্তের দৈবানুগ্রহে হয়ে উঠেছে জীবনের বসন্তোৎসব। কে জান্‌ত, উৎসবের অনির্বচনীয় পুলকও মানবদেহের শিরায় শিরায় এম্‌নি আনন্দ-মুখর হয়ে ফিরে!

কিন্তু ছলিমনের শিশুটির অবিরাম কাৎরাণী এই আনন্দোৎসবের মাঝে যেন ছন্দপতনের মত তার কানে ভেসে আস্‌তে লাগল। মাঝে মাঝে তার অজ্ঞাতেই তার মন উন্মনা হয়ে ওঠে। নিজের কোলের শিশুকে দুধ খাওয়াতে বসে, কোথায় যেন মনের কোণে এক খট্‌কা লাগে। আবাল্য সে শুনে এসেছে, ঈদের দিনে কারও প্রতি কোন দুষ্‌মনী রাখ্‌তে নেই। ছলিমন ও ছলিমনের মাকে সে আপন ভাব্‌তে পারুক বা না পারুক, কিন্তু তার মনে হল, ঐ দুধের শিশুর কান্না তার পুণ্য ও আনন্দের মাঝে যেন এক অমার্জ্জনীয় অন্যায়ের মত বিচরণ করে ফিরছে। ওই কান্না না থামলে তার সমস্ত আনন্দই বুঝি ব্যর্থ হয়। জোর করে মনকে ফিরাতে চায়, পরের ছেলের জন্যে তার কেন মাথাব্যথা বলে কত যুক্তিপ্রমাণ খাড়া করে। তবুও এই আনন্দ ও কর্মব্যস্ততার মাঝেও সে ওই শিশুর কান্না কিছুতেই ভুলতে পারে না। সেমাই খেতে বসে কিছুতেই ভাল করে খেতে পারলে না। তজু ছেলেদের নিয়ে ঈদ্‌গায় গেছে, শাশুড়ী সেমাই নিয়ে কোন্‌ পড়শীর বাড়ী বিলাতে বেরিয়েছে। শাশুড়ী-স্বামী জান্‌তে পারলে অনর্থ অবশ্যম্ভাবী জেনেও সে আজ কিছুতেই নিজকে রুখ্‌তে পারলে না।

ধীরে ধীরে সে ছলিমনদের উঠানে গিয়ে ডাক্‌লেঃ অ-চাচী! অ-ছলিমনের মা চাচী!

বিস্মিতা ছলিমনের মা উত্তর দিলেঃ কে?

—আমি।

বাইরের দিকে নজর পড়তেই ছলিমনের মা বলে উঠল ঃ ওমা! বৌ নাকি! আয় মা!

তজুর বৌ ঘরে উঠে এসে ছলিমনের মা'র পায়ে হাত দিয়ে ঈদের সালাম জানালে। তারপর মেয়েটিকে টেনে কোলে তুলে নিয়ে সেখানে বসেই দুধ খাওয়াতে লাগল। এতক্ষণে খাতুনের মনে হল, তার এক মাসের রোজা রাখা এবার সার্থক হ'ল, তার ঈদের আনন্দও যেন এতক্ষণেই পূর্ণ হ'ল।

মা

এক

সেই চিরন্তন নর ও নারীর ব্যাপার লইয়াই ঝগড়াটা শুরু হইয়াছিল। হামিদুল্লাহ্ তদীয় শ্বশুর বংশের সঙ্গে যে ঝগড়ার বীজ বপন করিয়াছিলো তাহা কালে ফলে ফুলে মঞ্জরিত হইয়া এমনি রুদ্র-মূর্তি পরিগ্রহ করিল যে পাড়া-প্রতিবেশীদের এবং চতুর্দ্দিকের দশ গ্রামের দেখিবার এবং খুশী হইবার ব্যাপার হইয়া উঠিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, যে-ব্যাপার যুগযুগান্তর হইতে কতবার নির্বিবাদে ঘটিয়া গেল, তাহা লইয়াই এই বংশানুক্রমিক ঝগড়ার ভিত্তি পত্তন।

হামিদুল্লাহ্ শিকদারের পাশাপাশি তাহার খুড়তুতো ভাইদের বাড়ী —একই পূর্বপুরুষের রক্ত উভয় পরিবারের বুনিয়াদ বটে, কিন্তু মিল বলিয়া কোন জিনিসের লেশমাত্রও তাহাদের মধ্যে অবশিষ্ট ছিল না। মিল ছিল শুধু এক জায়গায়, উভয় পরিবার ভাবিত তাহারা উহারা হইতে বড়, এবং উভয় পক্ষে এটাই ছিল একমাত্র সান্ত্বনার বিষয়। এই বড়ত্বের ওজন ধন-সম্পত্তি বা বিদ্যাশিক্ষা লইয়া কখনও হয় নাই, কারণ উভয় পক্ষই জানিত ওয়ারিশী সূত্রে এদিক দিয়া তাহাদের সমান ভাগই মিলিয়াছে। তবে উভয় পক্ষের বড়ত্বের ওজন চলিত, বৈবাহিক সম্বন্ধ লইয়া—কে কোথায় কত বড় ঘরে বৈবাহিক সম্বন্ধ পাতাইয়াছে, কে কত বেশী দেন মোহর দিয়া সম্বন্ধ করিয়াছে বিবাহে, উৎসবে কে কত বেশী খরচ করিয়াছে তাহা লইয়া রীতিমত খোঁটাখুঁটি চলিত। পাড়ায় উভয় পক্ষে হিতৈষী লোকের অভাব ছিল না—তাহারা ওই পক্ষের সংবাদ বাড়াইয়া ছড়াইয়া এ পক্ষের গোচরীভূত করিত, এই পক্ষের সংবাদ বাড়াইয়া ছড়াইয়া ঐ পক্ষের কানে তুলিয়া দিয়া খুশী হইয়া উঠিত।

প্রতিযোগিতা সব দিকেই ছিল।

কোরবাণীর সময় এক পক্ষ অন্য পক্ষের গরু কিনার অপেক্ষায় থাকিত। ইহারা ষাট দিয়া কিনিলে উহারা সত্তর, উহারা সত্তর দিয়া কিনিলে ইহারা আশি দিয়া কিনিত—প্রতিযোগিতার ইহাই ছিল ধারা।

একদিন ব্যাপার একটু গুরুতর হইয়া উঠিল।

দুপুরে কেমন করিয়া ছুটিয়া আসিয়া ওই বাড়ীর একটি গরু হামিদদের ক্ষেতে ঢুকিয়া খাইয়া মাড়িয়া অনেকটা ক্ষেত তছ্‌নছ্‌ করিয়া দিল। এই পক্ষের চাকর রাগিয়া গরুটিকে খোয়াড়ে দিলে পারিত, কিন্তু তাহা না করিয়া গরুটিকে তিন চার জনে আগলাইয়া এমন মারা মারিল যে যাহা তৃতীয় ব্যক্তির পক্ষেও অসহ্য, এবং ওই বাড়ীর কানে পৌঁছে মত গরুটিকে লক্ষ্য করিয়া এমন সব গালি পাড়িল যাহা মানুষ মানুষকে দিতেও লজ্জা বোধ করিবে।

এই সূত্র ধরিয়া উভয় পরিবারে যে ঝগড়ার সূত্রপাত হইল, তাহার জের সারা দুপুর ধরিয়া টানিতে টানিতে অপরাহ্ন কাটাইয়া রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিল। কাহারও লাঠি কাহারও মাথায় পড়িল না বটে কিন্তু তাহার বাড়া হইল। যত অভিধান-বহির্ভূত লজ্জাহীন গালির কর্দ্দম পরস্পরের দিকে নিক্ষিপ্ত হইল—তাহার বানান লেখক জানে না বলিয়া লিখিতে পারিল না।

ওই দিকের কর্ত্তা রাগিয়া চেঁচাইয়া বলিলেন---তুই শালা ছোটলোক, বিয়ে করেছিস্‌ ছোটলোকের মেয়ে, খেতে পায় না—।

এ দিকের কর্ত্তাও গর্জ্জিয়া বলিলেন—টাকা ডোমেরও হয়, তোর শ্বশুর শালা ত একটা চোর, ভণ্ড, জানি ত সব—আগে নামের আগে শুধু এস্‌ লিখত, জিজ্ঞাসা করলে বল্‌ত, সেখ আবদুল লতীফ, এখন কয়েক বৎসরের মধ্যে উন্নতি করতে করতে 'এসের' অর্থ হয়েছে সৈয়দ, এই ত, সব জানি—।

কথাগুলি নিছক মিথ্যা হইলে হয়ত কাহারও গায়ে বড় একটা লাগিত না কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহার সঙ্গে সত্যেরও কিছু কিছু যোগ ছিল---কাজেই সত্যের ছুরি উভয় পক্ষের ভিতরে কাটিয়া কাটিয়া বিঁধিতে লাগিল।

যুদ্ধ শেষে উভয় সেনাপতি যখন স্ব স্ব শিবিরে প্রবেশ করিল—তখন বাড়ীর ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, বধূরা দীপ জ্বালাইয়া ভাতের হাঁড়ি আগলাইয়া রণক্লান্ত সৈনিকদের অপেক্ষায় বসিয়া আছে।

হামিদ ঢুকিতেই পত্নী আয়ষা একখানি ছোট টুল টানিয়া দিয়া স্বামীকে পাখা করিতে লাগিল।

তারপর উঠিয়া তামাক সাজিয়া হুঁকাটী স্বামীর সম্মুখে ধরিয়া দিয়া, আয়ষা কলকিতে টিকা জ্বালাইয়া ফুঁয়াইতে লাগিল। তাহার পরণে রেঙ্গুনী লাল গামছা, গায়ে লাল ওড়না, কাপড়ের রং তাহার গায়ের সঙ্গে একেবারে মিশিয়া না গেলেও তাহাতে যে অপূর্ব সৌন্দর্য্যের স্বষ্টি হইয়াছিল, তাহা দেখিবার মত; নাকের নাক-ফুল দীপালোকে চিক্ চিক্ করিতেছিল, কলকি ফুঁয়াইতে ফুঁয়াইতে তাহার কপালে ছোট ছোট স্বেদবিন্দু ফুটিয়া উঠিয়াছিল, কাঁচা সোনার পাতের উপর যদি শরতের শিশির-বিন্দু থরে থরে সাজাইয়া রাখা হয় এবং তাহার উপর যদি বাল-সূর্য্যের প্রথম উদয়-রশ্মি আসিয়া পড়ে, তবে বোধ হয় এমন দেখাইতে পারে। সোনামুখের ফুঁয়ে ফুঁয়ে কল্‌কির আগুন যেন ডানা পাইয়াছে, লাল হইয়া লাফাইয়া উঠিতে চায়—উভয় আগুনের আলোকে যে অপূর্ব সৌন্দর্য্যের স্বপ্নজাল স্বষ্টি হইয়াছিল, তেমনটি দেখিবার সৌভাগ্য মানুষের জীবনে দুই একবারের বেশী আসে না।

কিন্তু এই সৌন্দর্য্য-ইন্দ্রধনুর যিনি মালিক, তাহার আজ এই সৌন্দর্য্য উপভোগের ফুরসৎ নাই, তাহার ভিতরে ভিতরে তখনও তুষের আগুন ধিকিধিকি জ্বলিতেছিল।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া শুইয়া হামিদের কল্পনা আজিকার ঝগড়ার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া জ্বলিতে লাগিল। পার্শ্বে তরুণী আয়ষার সুন্দর দেহ একরাশ জ্যোৎস্নার মত পড়িয়া আছে। স্বামীর চিন্তান্বিত ভাব দেখিয়া আজ তাহারও ভাবনার অন্ত নাই। হায়, তাহারই জন্য তাহার স্বামী এমন নিষ্ঠুরভাবে লোকের খোঁটা সহ্য করিতেছে,, অথচ এর প্রতিকারের কোন ক্ষমতাই তাহার নাই।

ভাবিয়া রাখিল, কাল সে স্বামীকে আর একটি বিবাহ করিবার জন্য অনুরোধ করিবে।

হামিদের সারা রাত্রি ঘুম হইল না—ওই দিকের কর্ত্তার খোঁচা অতীত ও বর্ত্তমানকে লইয়া তাহার মাথার ভিতর মাকড়শার জাল বুনিতেছিল।

তাহার মনে পড়ে দশ বৎসর আগের কথা, তখন তাহার জীবন পঁচিশটি বসন্তের সম্মিলিত স্বপ্নময় সুষমায় ভরপুর, মনে কত স্বপ্ন গড়িয়া উঠে, কত স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়, এমনই ছিল সে দিনগুলি। একদিন মফঃস্বল হইতে ফিরিবার সময় পথের ধারের এক সামান্য গৃহ-আঙিনায় একটী অপূর্ব সুন্দরী কিশোরী-মূর্ত্তিকে সে দেখিয়া ফেলিয়াছিল। জমিদার না হউক, তালুকদারের ছেলে সে, দেশের যে কোন সম্ভ্রান্ত অবস্থাপন্ন পরিবারে তাহার বিবাহ হইতে পারিত। কিন্তু সেই দিন সেই মেটে আঙিনার পাশে তাহার মন যে এমনি করিয়া বাঁধা পড়িয়া গেল তাহা হইতে সে নিজেকে আর ছাড়াইতে পারিল না। তাহার পিতা কিন্তু বাঁকিয়া বসিলেন,—তিনি কিছুতেই ওই অখ্যাত বাড়ীতে সম্বন্ধ করিবেন না।

মা বলিলেন—বাবা, তোকে আমি জামালপুর চৌধুরী বাড়ী হতে বিয়ে করাব। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলিলেন—'পরে তোর ইচ্ছে হ'লে তুই ওটাকেও বিয়ে করিস, বেটা ছেলের দুই বউ আর এমন কি—এখন এটা আগে বিয়ে করলে চৌধুরীরা বড় লোক সতীনের উপর মেয়ে দিতে চাইবে না—।'

মায়ের যুক্তিসঙ্গত কথাও কিন্তু তাহার ভাল লাগিল না।

সে তাহার ভগ্নীপতিদের দিয়া বাবাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। বাপ রাগিয়া তাহাকে বাড়ী হইতে দূর হইয়া যাইতে বলিলেন। তার পর তাহার রেঙ্গুনে পলায়ন—সেখানে কত কষ্ট, রাইস্ মিলে চাকুরী। তারপর হঠাৎ একদিন বজ্রাঘাতের মত পিতার মৃত্যু সংবাদ তাহাকে বিচলিত করিয়া তুলিল, সমস্ত ছাড়িয়া ছুড়িয়া ঘরের ছেলে আবার ঘরে ফিরিয়া আসিল।

সেদিন মায়ের সে কি কান্না।

মা এবার নিজে সাধিয়া তাহার এই বিবাহ করাইয়া দিলেন। প্রায় আট বৎসর পূর্বে যেদিন এ অসামান্য সুন্দরী নব-বধূর বেশে আসিয়া প্রথম এই ঘর আলো করিয়া বসিয়াছিল এবং তাহার মনে স্বপ্নের রঙমশাল জ্বালিয়া দিয়াছিল, সেদিন তাহার আনন্দের সীমা পরিসীমা ছিল না। তারপর এই কয় বৎসর ধরিয়া এই মেয়েটী তাহার রূপে ও গুণে এ বাড়ীকে স্বর্গ করিয়া তুলিয়াছে। সামান্য গৃহস্থ পরিবারের মেয়ে, কিন্তু আদব-কায়দায়, চলাফেরায় সে কী অপূর্ব শালিনতা-শ্রীমণ্ডিত। যৌবনের উৎসাহে হামিদ নিজে ইহাকে কিছু কিছু লেখাপড়াও শিখাইয়াছিল।

ইহাকে লইয়া সে কি একদিনের জন্যও অসুখী হইয়াছে? তাহার খুড়তুতো ভাইরা বড় ঘরে বিবাহ করিয়া কি তাহার চাইতে বেশী সুখী হইতে পারিয়াছে? বড় ভাই জালালকে ত প্রথম বৌ তালাক দিতে হইয়াছে—শেষে বাঁশখালী তালুকদার বাড়ী হইতে যে'টা আনিয়াছে তাহার ত দেমাগে পা মাটিতে পড়িতেই চাহে না, হামেসাই ত ক্যাচ্ ক্যাচ্ ও বাড়ীতে লাগিয়াই আছে। ছোট ভাইয়ের বউ ত ছ'মাস ধরিয়া বাপের বাড়ী পা তুলিয়াই বসিয়া আছে—কাবিনের তিন হাজার টাকার অলঙ্কার পুরাপুরি বুঝিয়া না পাইলে সে নাকি আসিবে না। তাহার ত এসব লড়বড় নাই। বিবাহের পরেই ত আয়ষা তাহাকে কতবার বলিয়াছে—তুমি আর একটি বড়লোক দেখে বিয়ে কর, আমি যে গরীবের মেয়ে, পাড়ায় তোমার মুখ থাকে না, আমি সতীনের সঙ্গে মিলে মিশে ঘর করতে পারব।—বলিতে বলিতে তাহার সুন্দর মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিত; তাহার সেই শরম-রাঙা গালের উপর শুধু চুম্বন দিয়াই সে এতদিন এ-সব কথার উত্তর দিয়াছে।

সারাদিনের পরিশ্রান্ত আয়ষা কবে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল--হঠাৎ শেষরাত্রে ঘুম ভাঙ্গিতেই বুঝিল, সে স্বামীর বাহু-বন্ধনে। স্বামীর দ্রুত বক্ষস্পন্দন ও উত্তপ্ত দেহের পরশ তাহাকে জানাইয়া দিল, তিনি জাগিয়া আছেন—জিজ্ঞাসা করিল 'জেগে আছ?'—

তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না, আজিকার ঝগড়ার আঘাত তাহার স্বামীকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া ছাড়িয়াছে। স্বামীর বক্ষ-স্পন্দন তাহার

বুকের ভিতর দিয়া মরমে পৌঁছিয়া বিপক্ষের কোন্ খোঁটাটি তাহার স্বামীকে আজ এমনি উতলা করিয়া তুলিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহরূপে তাহাকে জানাইয়া দিল।

বিছানার প্রান্ত হইতে পাখাটি কুড়াইয়া লইয়া সে বাতাস করিতে করিতে বলিল—'তুমি ঘুমাও, আমি পাখা করি—।' স্বামী নির্বাক। তারপর আরও ধীরে ধীরে বলিল, 'তুমি আর একটি বিয়ে কর, ওদের খোঁটা দেবার মুখ বন্ধ হউক, এ আর আমি সইতে পারি না।'

দিন দুই পরে একদিন হামিদ মিয়া দেউড়ীতে বসিয়া হুঁকা টানিতেছিল। আশে পাশে পাড়ার আরও দুই চারিজন একটা লম্বা টুল দখল করিয়া বসিয়া মিয়ার সঙ্গে আলাপ করিতেছিল—সকলের দৃষ্টি হুঁকার দিকে, হুঁকাটী যেন একটী নূতন দেখিবার জিনিস। মিয়া একটা লম্বা টান দিয়া হুঁকার নল ডান দিকে ফিরাইয়া দিতেই রশীদ নলটী ধরিয়া লইয়া বলিল'—'আলীর বাপ চাচা, খান'—আলীর বাপ ওরফে কালা মিয়া হাত বাড়াইবার আগেই রশীদ ফট্ ফট্ করিয়া টানা আরম্ভ করিয়া দিল। তাহার পাশে আঠার ঊনিশ বছরের একটী ছোক্‌রা বসিয়াছিল, সে অলক্ষ্যে রশীদের রানে চিম্‌টী কাটিয়া চোখের ইসারায় বলিল, এদিকে।

হঠাৎ দেখা গেল লালটুপী মাথায় ঘোড়ায় চড়িয়া কে একজন পুকুরের পূর্ব পাড় বাহিয়া ঐ বাড়ীর দিকে যাইতেছে। সকলে সেদিকে চোখ তুলিয়া চাহিয়া রহিল। বৃদ্ধ জমিলার বাপ ভাঙ্গা চশমাখানি নাকের উপর হইতে নামাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া হা করিয়া চাহিয়াও যেন ঠাহর করিতে পারিল না, জিজ্ঞাসা করিল—কে? রশীদ বলিল—ও-বাড়ীর বড় মিয়ার শালা—।

হামিদ হাসিয়া বলিল—জানেন্ ওরা ঊনিশ 'শ চৌদ্দ সালের সৈয়দ। সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, বুড়া জমিলার বাপ কথাটা খোলাসা করিয়া লইবার জন্যই যেন জিজ্ঞাসা করিল—'অর্থাৎ'—

'অর্থাৎ ওরা আগে ছিল শেখ, হঠাৎ ঊনিশ শ' চৌদ্দ সাল হ'তে ওর বাপ সৈয়দ লেখা আরম্ভ করেছে, সে হ'তে ওরা সৈয়দ।' তাহার ঠোঁটে ফুটিয়া উঠিল বিদ্রূপের এক তীক্ষ্ন হাসি।

সকলে আর একদফা হাসিয়া কথাটাকে যেন ছুঁড়িয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল। আরও কয়েক ছিলিম করিয়া তামাক পোড়াইবার পর একে একে সকলে উঠিয়া গেল, জমিলার বাপ উঠিতে চাহিলে হামিদ মিয়া বলিল—বস না চাচা। আর এক ছিলিম তামাক খাও।—জমিলার বাপ 'না' 'না' করিয়া টুল হইতে নামিয়া মিয়ার কাছে আসিয়া মোড়ার উপর আরও গাড়িয়া বসিল।

হামিদ নিম্নস্বরে বলিল—চাচা, খোঁটা ত আর সহ্য হয় না একটা বউ টউ দেখো না, এ, একটু খান্দানী দেখে।

তা' বাবা তার কি আর কমি আছে—চাইলেই পাও। গাজীপাড়া সৈয়দ বাড়ীতেও মেয়ে আছে, শুনলাম সোনাখালি কাজী বাড়ীতেও একটি ভাল মেয়ে আছে—দক্ষিণ পাড়ার জমির মুন্সির ছেলের জন্য চাইবে বল্‌ছিলো, চরপাড়া শিকদার বাড়ীতেও ত দু'তিনটী মেয়ে আছে, এই করিয়া জমিলার বাপ প্রায় ডজন খানেক ভাল মেয়ের হিসাব দিয়া বলিল—এখন তোমার যেটি মর্জি। এই লইয়া অনেকক্ষণ আলাপ আলোচনা চলিল। জমিলার বাপ রাত্রে একেবারে আহারের পরই উঠিলেন।

সব বাড়ীতে এক একবার টুঁ মারিয়া দেখা গেল—কিন্তু কেহই পূর্ব স্ত্রীকে তালাক দেওয়া ছাড়া সতীনের উপর মেয়ে দিতে রাজী হইল না।

পবিত্র ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে জন্মগ্রহণ করিয়াও আর একটি বিবাহ করিতে গেলে আয়ষাকে তালাক দিতে হইবে এই কথা হামিদের কল্পনায় আসিলে সে আর একটি বিবাহের নামও মুখে আনিত না—। আয়ষা এ পরিণতি ভাবিতে পারিলে স্বামীকে আর একটি বিবাহের জন্য কখনো অনুরোধ করিত কি না সন্দেহ। এ-বিবাহের কথা পাড়াময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছে, এখন এই সংকল্প হইতে ফিরিয়া গেলে বিপক্ষের মুখের জোর আরও বাড়িয়া যাইবে। এতদিনের খোঁটা কোন প্রকারে সহ্য হইয়াছে, কিন্তু এবার যে অক্ষমতার খোঁটা আসিবে, তাহা যে কোন পুরুষের সহ্য করিবার ক্ষমতার বাহিরে।

একদিন হামিদ আয়ষাকে নিরালায় ডাকিয়া সব কিছু খুলিয়া বলিল। আয়ষা স্বামীর জন্য অনেকখানিই ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু

হঠাৎ এত বড় ত্যাগের আহ্বান তাহার উপর আসিবে এ তাহার স্বপ্নের ও অতীত। স্বামী-সোহাগিনী আয়ষার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল। তাহার এতদিনের আনন্দ-সৌধ ভাঙ্গিয়া চৌচির হইয়া গেল।

হামিদ আয়ষাকে বুঝাইয়া বলিল—এখন উপায় যে নাই, ফিরে গেলে লোকের কাছে মুখ যে আর দেখান যাবে না। আয়ষা নীরবে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিতে লাগিল। তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া হামিদ ধীরে ধীরে বলিল—'ছেলে দুইটি এখানে থাক্, তুমি ছোট মেয়েটিকে নিয়ে বাপের বাড়ী গিয়ে থাক, আমি যাবো আসবো, খরচ চালাবো, বিয়ে হ'য়ে গেলে সব চুকে যাবে।'...

এতখানি বিপদ মাথায় করিয়া যখন বিবাহ করিতে হইবে, তখন হিতৈষীরা পরামর্শ দিল একেবারে সকলের উপর টেক্কা মারিতে হইবে।

সোনাখালী কাজীবাড়ী ধন ও পদমর্য্যাদায় সকলের সেরা। প্রথমা স্ত্রীকে তালাক দিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে বলাতে তাহারাও মেয়ে দিতে রাজী হইল, কিন্তু দ্বিতীয় বিবাহ বলিয়া খুব লম্বা করিয়া হাঁকিয়া বসিল। প্রতিযোগিতা যেখানে সেখানে নিজের সামর্থ্য অসামর্থ্যের বিচার চলে না—ধনের বাড়া মান, সেই মান যে রাখিতে হয়!

দশ হাজার টাকার কাবিন লিখিয়া দিয়া, নগদ পাঁচ হাজার টাকার অলঙ্কার দিতে হইল। সামান্য তালুকদারীতে এত টাকা হয় না, অগত্যা হামিদকে মহাজনের শরণাপন্ন হইতে হইল, তাহাদের কৃপায় অনেকের মত হামিদেরও এইবারকার মত ইজ্জৎ অক্ষুণ্ন রহিল।

জোড়া বাঁদী সমভিব্যহারে নব বধূ জমিলা স্বামীর ইজ্জৎ বাড়াইবার মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া স্বামীর ঘর করিতে আসিল। কিন্তু তাহার চেহারা দেখিয়া মেয়ে-মহলে একটা অস্ফুট কানা-ঘুষার সৃষ্টি হইল। অলোকসামান্যা সুন্দরী বলিয়া যাহার খ্যাতি বিবাহের কয়েক মাস পূর্ব হইতে এ বাড়ী হইতে শুরু করিয়া সারা পাড়াময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ তাহার চেহারা দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল। মেয়েদের অনেকে খুশী হইয়া ব্যাপারটি অতি নিঃস্বার্থভাবে যেখানে সেখানে পাড়াময় বলিয়া বেড়াইতে লাগিল!

হামিদ রাগিয়া লাল হইয়া গেল। আয়ষার কথা ভাবিয়া আজ তাহার মনে দ্বিগুণ আগুন জ্বলিয়া উঠিল। বাড়ীর একটি চাকরাণীকে ডাকিয়া বলিল—ডাক্ ত বুড়ীর মাকে।

বুড়ীর মা কাঁপিতে কাঁপিতে ঘরে ঢুকিয়াই মেঝে লেপটাইয়া বসিয়া পড়িল। হামিদ কিছু জিজ্ঞাসা করিবার আগেই নিজের কপালে করাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিল—বাবা, তারা জোচেচার, ঠক, আমাকে যে-মেয়ে দেখিয়েছে এ সে মেয়ে কিছুতেই নয়, সুন্দর মেয়ে দেখিয়ে কালো মেয়ে একটা পাল্কীতে ভ'রে দিয়েছে।

হামিদের বুঝিতে আর বাকী রহিল না।

কিন্তু কি করা যায়, কাবিন রেজিষ্ট্রি হইয়া গিয়াছে, আর ত উপায় নাই। এই জোচুচরীর জন্য ক্ষতিপূরণের নালিশ করা যায়, কিন্তু টাকা নাই। এ-বিবাহে তাহার প্রায় পাঁচ ছয় হাজার টাকা কর্জ্জ হইয়াছে মাসে দুই'শ করিয়া সুদ টানিতে হইবে। মান, ইজ্জৎ ও প্রতিশোধের জন্য হয়ত আরও কর্জ্জ করা যায়, কিন্তু এত কর্জ্জের উপর আর কর্জ্জ দিবে কে?

হামিদ দমিবার পাত্র নয়, তবে আপাততঃ বুদ্ধিমান লোকের মত চুপ করিয়া রহিল, সুযোগের অপেক্ষায়।

বৎসর খানেক পরে হঠাৎ এক নতুন কাণ্ড ঘটিয়া গেল। জমিলা বাপের বাড়ী নাইয়র গিয়াছিল, শ্বশুর বাড়ী হইতে তাহাকে আনিবার জন্য লোক গেলে সে শ্বশুর-বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতে অস্বীকার করিয়া বসিল।

দুই পক্ষের তাড়া খাইয়া শেষকালে সে বলিল—তাহার স্বামী পূর্ব স্ত্রীকে তালাক দেয় নাই, সেখানে যাওয়া আসা করে, ওদের খোরপোষ চালায়, কিছুদিন আগে সে-বউয়ের নাকি একটি ছেলেও হইয়াছে। পাড়ার মেয়েদের মধ্যে কেহ এ-কথা তাহাকে বলিয়াছে আর স্বামীর ব্যবহারে সে এ বিষয়ে এক রকম নিঃসন্দেহ। জমিলার বাপ ও ভাইরা এই কথা শোনা মাত্রই একেবারে জ্বলিয়া উঠিল। তাহারা জমিলার শ্বশুর-বাড়ীর লোকগুলিকে রীতিমত অপমান করিয়া পাল্কী ত ফিরাইয়া দিলই, সঙ্গে

সঙ্গে জানাইয়া দিল কেহ যেন আর মেয়ে নিতে না আসে---দেন-মোহরের পাঁচ হাজার ত অলঙ্কার দিয়াছে আর বাকী পাঁচ হাজার যেন দিয়া মেয়েকে তালাক দিয়া যায়, না হয় মুস্কিল হইবে..।

সন্ধ্যার সময় তাহার প্রেরিত লোক যখন ফিরিয়া আসিয়া শ্বশুর-বাড়ীর খবর জানাইল তখন হামিদ রাগে গোস্বায় একেবারে উন্মাদের মত হইয়া উঠিল; তাহার ইচ্ছা হইতেছিল এখনি যাইয়া কাজী বাড়ীতে আগুন ধরাইয়া দেয়।

পরদিন সে আদালতে তাহার শ্বশুরের নামে জোচুচরীর মোকদ্দমা দায়ের করিয়া আসিল। শ্বশুর এই কথা শুনিয়া আর একটা পাল্টা জোচুচরীর মোকদ্দমা জামাইয়ের নামে দায়ের করিয়া দিল।

এতদিন পরে মোকদ্দমা দায়ের করাতে এবং প্রথমে সুন্দরী মেয়ে দেখাইয়াছিল তাহার প্রমাণাভাবে হামিদের মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ হইয়া গেল। আগেই বলিয়াছি হামিদ দমিবার পাত্র নহে, সে তৎক্ষণাৎ তাহার বউকে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া দাবী করিয়া আর এক মোকদ্দমা দায়ের করিয়া বসিল, উহারা জমিলার পক্ষ হইতে দেন-মোহরের অপ্রাপ্ত পাঁচ হাজার টাকার দাবী করিয়া আর এক নম্বর দায়ের করিল। প্রথম দফায় হামিদের টাকা খরচ ছাড়া বেশী কিছু হইল না, কিন্তু দেন মোহরের পাঁচ হাজার সোজা ডিগ্রী হইয়া গেল। এই মোকদ্দমার খরচ ও ডিগ্রী শোধ করিতে তাহার দুইখানি বড় বড় তালুক বিক্রী করিতে হইল।

শনিবার দিন ঝাউতলা হাট, হামিদদের বাড়ী হইতে বেশী দূরে নয়। গ্রামে সপ্তাহে মাত্র দুইবার হাট, দূর হইতেও লোক না আসিয়া উপায় নাই।

হামিদ আগে হইতে প্রস্তুত ছিল। সন্ধ্যার আঁধার ঘনাইয়া আসিতেই উত্তর দক্ষিণ রাস্তার মোড়ে বটগাছতলায় মুদীর দোকানের পার্শ্ব হইতে সে হঠাৎ লোকজন লইয়া বাহির হইয়া রাস্তার উপর হইতে একজন পথিককে জোর করিয়া ধরিয়া একেবারে দোকানে ঢুকাইয়া ফেলিল! জোর জবরদস্তী করিয়া তাহার নিকট হইতে একখানি পাঁচ হাজার টাকার হ্যাণ্ডনোট লিখাইয়া লইল, তারপর ছাড়িয়া দিল।

যাহার নিকট হইতে এই হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া লওয়া হইল সে হামিদের বড় কুটুম্ব অর্থাৎ শ্যালক।

সে ভদ্রলোক বাড়ী ফিরিয়া জমিলার কাবিন খুলিয়া পড়িতে বসিল, দশ নম্বর শর্ত্তে লেখা আছে—'শ্রীমতি মজকুরা অন্য কোথাও থাকিলে তাহাকে মাসিক ত্রিশ টাকা হিসাবে খোরাকী দিতে বাধ্য থাকিব।' তারপরেরদিন সে আদালতে যাইয়া শ্রীমতি মজকুরা ওরফে জমিলা বিবির পক্ষ হইতে মাসিক ত্রিশ টাকা হিসাবে গত ছয় মাসের খোরাকী দাবী করিয়া হামিদের নামে এক নালিশ দায়ের করিয়া দিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিকট হইতে জবরদস্তী করিয়া হ্যাণ্ডনোট লিখাইয়া লইয়াছে বলিয়া থানায় ডায়েরী দিয়া আসিল।

এত লঙ্কাকাণ্ডের পর সেই বড় লোকের মেয়েকে লইয়া দাম্পত্য জীবন কাটাইবার কোন প্রকার আগ্রহ হামিদের মনে আর একটুও অবশিষ্ট ছিল না, কাজেই কয়েকদিন পর সে আয়ষাকে বাপের বাড়ী হইতে লইয়া আসিল।

নিকটের আত্মীয় ও খুব ঘনিষ্ঠেরা ছাড়া সকলে জানিত যে, সে, আয়ষাকে তালাক দিয়াছে। তাহার চাচাতো ভাইরা এত আহাম্মক নয় যে এ-সুযোগ হেলায় ছাড়িয়া দিবে—তাহারা এই লইয়া পাড়ার আরও কয়েকজনকে উস্কাইয়া দিল।

হুজুগ তুলিয়া দিতে এবং অন্যকে জব্দ করিতে আনন্দ পায় না এ-যুগে এমন লোক কয়জন আছে?

তাহারা আশে পাশের প্রায় দশটি গ্রামের মৌলবী হইতে দস্তখত করাইয়া এক ফৎওয়া আনিল—হামিদ তালাক দেওয়া বৌ লইয়া ঘর করিতেছে, তাহাকে এক ঘরে করা প্রত্যেক মোমিন মুসলমানের কর্ত্তব্য।

ভাইয়ের পারলৌকিক মঙ্গল-উদ্দেশ্যে এই হিতৈষণার জন্য মৌলবী সাহেবদের যাহা কিছু খয়রাৎ দিতে হইল, তাহা চাচাতো ভাইরাই দিয়াছিল; ভাইয়ের কাজ, তাহাদের বেশী আফসোস্ নাই।

হামিদকে তালুকদারীর অবশিষ্টাংশ বন্ধক দিয়া টাকা সংগ্রহ করিতে হইল। তারপর সেই অঞ্চলের বড় মৌলবী সাহেবকে পঞ্চাশ টাকা

নজর দিয়া সে তাহার হাল খুলিয়া বলিল—তিনি ফৎওয়া লিখিয়া দিলেন তাহার বিবি তালাক হয় নাই এবং আরও দশ পনর জন মৌলবী হইতে এই মর্ম্মে দস্তখৎ করাইয়া দিলেন।

দুই দিকের দুই ফৎওয়া, গ্রামবাসীরা মহাবিপদে পড়িল—তাহারা কোন্ ফৎওয়ার হুকুম মানিবে। তারপর বহু বচসার পর ঠিক হইল উভয় পক্ষের সব মৌলবীগুলিকে হাজীর করিয়া এক বাহাছের মজলিস ডাকা হউক, সেই মজলিসের সিদ্ধান্তই মানিয়া লওয়া হইবে।

মজলিসের দিন ধার্য্য হইল।

হামিদের সোনাখালীর শ্বশুর-বংশও 'একতাই বল' এই কথা প্রমাণ করিবার জন্য তাহার চাচাতো ভাইদের সঙ্গে যোগ দিল। তাহারা গ্রামে সব মৌলবী মৌলানাদের বাড়ী হাঁটাহাঁটি করিয়া হামিদের পাঁচের যায়গায় দশ, দশের যায়গায় পনর করিয়া দিল। যাহারা তাহাতেও দমিল না তাহাদিগকে আরও বেশী দিয়া অন্ততঃ অনুপস্থিত থাকিতে বাধ্য করিল।

হামিদের শ্বশুর কাজী আবদুল বারী সাহেব বড় মৌলবী সদর উদ্দিন সাহেবকে যাইয়া ধরিলেন, তিনি বলিলেন, 'আমি যে আগে ফৎওয়া দিয়ে দিছি।' কাজী সাহেব বলিলেন—'তাতে কি, ওইদিন আপনি কাজের অছিলা ক'রে শহরে বা কোথাও চলে যান—দেখুন ইসলামের কাজ!—কেউ কিছু করবে না আমি শালা টাকা খরচ ক'রে মরছি, আপনাদেরই কাজ, বেশী আর এখন পারছি না, এই এক শ' দিচ্ছি, আল্লার ওয়াস্তে লিল্লাহ্—আপনার বিবিদের পান খরচা!'

হামিদের একমাত্র ভরসা বড় মৌলবী সাহেব। তাঁহার কথা লোকে মান্য করে, তাঁহার বাগ্মিতাও অসাধারণ। সে খুব সকাল পান্কী লইয়া মৌলবী সাহেবের কাছে লোক পাঠাইয়া দিল।

জোহরের পর মসজিদের উঠান লোকে ভরিয়া গেল। হামিদ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল, তাহার প্রেরিত পান্কী ত এখনো মৌলবী সাহেবকে লইয়া আসিয়া পৌঁছিল না।

ওই পক্ষের লোক চেঁচামেচি করিতে লাগিল—শুরু করুন, শুরু করুন।

অনেকক্ষণ পর শূন্য পাল্কী ফিরিয়া আসিল।

ফেরৎ লোকেরা যখন, মৌলানা সদরউদ্দিন সাহেব শহরে গিয়াছেন, কাজেই আসিবেন না, জানাইল, তখন সকলে বুঝিল আর দেরী করিয়া লাভ নাই। মৌলবী আবদুল আলীম বয়সে সকলের বুড়া, কাজেই তাঁহাকে সদর আঞ্জুমন অর্থাৎ সভাপতি করা হইল।

তিনি পান চিবাইতেছিলেন, পিকদানীতে একগাল পানের পিক্ ফেলিয়া লইয়া বলিলেন—'মৌলবী অলিউল্লাহ্ সা'ব আপনার গলা বড় আছে, আপনি হামিদুল্লাহ্ শিকদারের দ্বিতীয় বিবাহের কাবিনখানি পড়ে যান ত—।

মৌলবী অলিউল্লাহ্ সভাপতির পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কাবিননামা পড়িতে লাগিলেন ঃ—

ইয়াদকির্দ্দ লিখিতং শ্রীহামিদুল্লাহ্ শিকদার মৃত সাং নিশ্চিন্তপুর থানা চাঁদখালি, জাতে মুসলমান, ব্যবসা তালুকদারী, কস্য শুভ-বিবাহের কাবিননামা পত্র মিদং আগে, আমি সজ্ঞানে, সরল অন্তঃকরণে স্থিরতর মতিতে অত্র থানার অন্তরগত সোনাখালী মৌজা নিবাসী, জমিদারী বেবসায়ী শ্রীযুক্ত কাজী আবদুল বারী সাহেবের দুহিতা সুচরিতা কন্যা মোসাম্মাৎ জমিলা খাতুন বিবিকে পার্শ্বের লিখিত সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্যে এবং নয়াপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত গোলাম মোহাম্মদ চৌধুরী সাহেবের ওকালতীতে মং ১০,০০০ টাকা মোহর মোয়াজ্জল ও মৌয়াজ্জল এন্দল তলব আদায় দিবার প্রতিজ্ঞায়, নিম্নলিখিত শর্ত্তাদী শিকার করতঃ শ্রীমতি মজকুরাকে আপন নেকাহ আক্‌দে আনিলাম—

১। প্রথম সর্ত্ত এই যে শ্রীমতী মজকুরার বিনানুমতিতে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিব না এবং গোপনে কোন উপপত্নি না রাখিব, যদি করি বা রাখি বলিয়া প্রকাশ হয় তবে উক্ত স্ত্রীর উপর তিন তালাক বর্ত্তিবেক...'

তৎক্ষণাৎ সভাপতি সাহেব চীৎকার করিয়া উঠিলেন—ব্যস্, আর পড়্‌তে হবে না, এই প্রথম শর্ত্তের দ্বারাই তালাক বর্ত্তে, কি বলেন মৌলবী সাহেবরা—

মৌলবী সাহেবরা সকলে একবাক্যে বলিয়া উঠিল—হ্যাঁ। জরুর। বেশক্!

হামিদ—এ যে আমার আগের বউ, কাবিনে ভবিষ্যতের কথা লেখা আছে—।

সমবেত মৌলবীরা চেঁচাইয়া উঠিল—শরিয়তের কথা তুমি কি জান?—

এতগুলি কণ্ঠের গর্জ্জন ধ্বনির মধ্যে হামিদের আবেদন ডুবিয়া গেল।

হামিদ নত মস্তকে তাহার মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা শুনিল। সর্ববাদীসম্মতি-ক্রমে ঠিক হইল, দ্বিতীয় বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বৌ আয়ষা তালাক হইয়া গিয়াছে—সে এই বউ লইয়া ঘর করিলে তাহাকে এক ঘরে করাই শরিয়তের হুকুম।

হামিদ মানুষের সমস্ত ঘৃণা ও লজ্জা সারা মুখে মাখিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

মানুষের খোশনামী আছে, মানুষ সামাজিক জীব, সমাজের আদেশ শিরোধার্য্য না করিয়া তাহার উপায় নাই। তাই হামিদ তাহার প্রিয়-তমা জীবন-সঙ্গিনীকে চিরদিনের জন্য বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিল।—তাহার বুক ভাঙিয়া চৌচির হইয়া যাইতেছিল, হয়ত আর দেখা হইবে না।

এই কয় বৎসরের নিদারুণ সংগ্রাম, অর্থ-হারা জীবনে বিরাট কর্জ্জের নিপীড়ন, স্বাস্থ্য-হারা দেহে প্রিয়তমা পত্নী হইতে অতি নিষ্ঠুর-ভাবে বিচ্ছেদ, হামিদকে একেবারে মৃত্যুর দ্বারে আনিয়া ছাড়িয়া দিল।

কয়েক মাসের মধ্যেই হামিদ একেবারে শেষ শয্যা গ্রহণ করিল।

মৃত্যু-শয্যায় শুইয়া তাহার দুই চোখ বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে-ছিল। কত সুখ-দুঃখের স্মৃতি আজ তাহাকে ব্যথিত করিয়া তুলিতেছে। তাহার চির-বিদায়ের দিনে আজ তাহার প্রিয়তমা জীবন-সঙ্গিনী তাহার পাশে নাই। কন্যাটি যেন তাহার মায়েরই কুমারী মূর্ত্তি, তাহাকে শিয়র হইতে সম্মুখে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া, তিনি পুত্রদের বলিলেন—তোমাদের

মাকে এ বাড়ীতে নিয়া আসিও; আমার মৃত্যুর পর, আর কোন আপত্তি উঠ্‌বে না। হঠাৎ এক নিমেষে সমস্ত অতীত যেন বায়স্কোপের মত তাঁহার মনের পরদায় খেলিয়া গেল—তাঁহার দুর্বল শিরায় শিরায় আবার বিদ্যুৎ জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ হইয়া আসিল—তিনি চীৎকার দিয়া উঠিলেন—প্রতিশোধ চাই।

তাঁহার মরণোন্মুখ দেহে এ-অস্বাভাবিক উত্তেজনা সহ্য হইল না—সেই রাত্রেই তাঁহার জীবন-প্রদীপ চিরতরে নিভিয়া গেল।

দুই

হামিদ শিকদার মরিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন বটে কিন্তু তাঁহার রোপিত বিষবৃক্ষ তেমনি জিয়িয়াই রহিল। মামলা মোকর্দ্দমায় সর্বস্বান্ত হইয়াও তাঁহার পিতৃভক্ত পুত্রেরা পিতার সারা জীবনের লাঞ্ছনা, তাঁহার শেষ মুহূর্ত্তের বাণী ভুলিতে পারিল না। নূতন করিয়া আবার মোকর্দ্দমা শুরু হইল—একে অন্যকে জবদ করিবার নিত্য নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইতে লাগিল। চোর লেলাইয়া দিয়া একে অন্যের গরু চুরি করাইয়া দূর দেশে পাঠাইয়া দিতে লাগিল। একের ঘরে অন্যে আগুন লাগাইয়া দেওয়া ত মাসিক ব্যাপারে পরিণত হইল। কাজী বাড়ী আশে পাশের বাড়ীসহ কতবার পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া গেল।

শেষে ব্যাপার পরিবারের ক্ষুদ্র সীমা ডিঙাইয়া একেবারে গ্রামময় ছড়াইয়া পড়িল। দুই গ্রামের লোক পরস্পরকে শত্রু ভাবিতে লাগিল। ---এখন হইতে কাজী বা শিকদার বাড়ী না হউক তাহাদের গ্রামের কাহারও বাড়ীতে আগুন লাগাইয়া দিতে পারিলেও, বিপক্ষ দল মনে করে ইহাতেই তাহাদের জিৎ।

এদিকের লোক ঐদিকের আঁওতায় গেলে উহারা আগলাইয়া মারপিঠ করে, আবার এদিকের লোক ঐদিকের আওতায় পাইলে সহজে ছাড়িয়া দেয় না।—চুরি, ডাকাতী, মারপিট, হরদম চলিতে লাগিল।

পুলিশের লোক এদিকের ঘটনায় সন্দেহ করিয়া ওই দিকের লোক চালান দেয়, আবার ওই দিকের ঘটনায় এদিকের লোক চালান দেয় এবং দুই পক্ষ হইতে ঘুষ খাইয়া গোঁফে তা দিয়া ফিরে।

দিনে দিনে জীবন একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল—কাহারও ঘর-বাড়ী এক মুহূর্ত্তের জন্যও নিরাপদ নহে। বিপক্ষের বাড়ী যখন জ্বলিয়া উঠে তখন মনে বেশ লাগে, কিন্তু যখন নিজের চালে আগুন দাউ দাউ করিয়া ফাঁপিয়া উঠে তখন এই নিষ্ঠুরতায় উৎসাহী থাকিতে পারে এমন সচ্ছল অবস্থা পাড়াগাঁয়ে বেশী লোকের নয়।

মানুষ স্ত্রী পুত্র লইয়া সংসার করে, তারপর জীবিকা সংগ্রহের জন্য হাড়ভাঙ্গা খাটুনী। কাজেই এই কয় বৎসরের উদ্বিগ্ন জীবন কাটাইয়া তাহারা একেবারে হাঁপাইয়া উঠিল।

একটা মীমাংসা হইলেই যেন উভয় পক্ষ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে।

শেষে ভিন্ন গ্রামের লোক পাঠাইয়া উভয় পক্ষ ভাবের আদান প্রদান করিল। তারপর বাইশ গ্রামের সরদার ডাকিয়া একটা সালিসের বন্দোবস্ত হইল।

উভয় পক্ষই দোষী—বিচার আর কী হইতে পারে?—সমবেত বিচারপতিগণ রায় দিলেন—

আপনারা পরস্পরকে মাফ করে মিলে যান—।

জনাব আলী মুন্সী আরবী করিয়া বলিলেন—কুল্লু মুসলিম এক সমান্।

তাহারা পরস্পরকে ক্ষমা করিয়া সেই মজলিসে পরস্পর গলাগলি করিল বটে কিন্তু অনেকের মনে খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল—স্থায়ী কিছু একটা না হইলে হয়ত এ ছাই চাপা আগুন আবার অনুকূল বাতাসে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে।

বুড়া জমিলার বাপ তাহার বাড়ীর পোড়া আম গাছগুলির দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিল, স্থায়ী মিলনের কি একটা বন্দোবস্ত হতে পারে না?

কথাটা অনেকেই তাহার মুখ হইতে লুফিয়া লইয়া খুব জোর দিয়া বলিয়া উঠিল। শান্তিপিয়াসী উভয় গ্রামবাসী এবং বাইশ গ্রামের সরদারেরাও কথাটা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মানিয়া লইল।

কাহারও পক্ষ হইতে কোন যুক্তিসঙ্গত নির্দ্দেশ আসিতেছে না দেখিয়া, জমিলার বাপ নিজে একটুখানি কাশিয়া লইয়া বলিয়া ফেলিলেন —হামিদ শিকদারের ত বিয়ের উপযুক্ত এক মেয়ে আছে—

তৎক্ষণাৎ সোনাখালীর একটী লোক বলিয়া উঠিল 'কাজী সাহেবের এক নাতীও ত আছে—।

দুই পক্ষের লোকের চাপে এবং সরদারদের অনুরোধে প্রস্তাবটা কোন পক্ষই অস্বীকার করিতে পারিল না। এই বিবাহের দ্বারা উভয় পরিবার তথা উভয় গ্রামের মধ্যে একটা স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা হইবে, এই জন্য সকলে উৎসাহী হইয়া উঠিল। হামিদের পুত্রেরা প্রথমত একটু আমতা আমতা করিল বটে, কিন্তু শেষকালে সমবেত লোকের জ্বলন্ত উৎসাহের সিদ্ধান্তকেই তাহাদেরও মানিয়া লইতে হইল।

কাজী সাহেবের নাতি ইব্রাহীম রেঙ্গুনে কারবার করে—তাহাকে সেখান হইতে চট্‌পট্ আনাইয়া সখিনার সহিত তাহার শুভ-পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন করা হইল।

সখিনা শুধু মায়ের দৈহিক সৌন্দর্য্যকে তাহার সারা দেহ ভরিয়া পায় নাই, তাহার গুণরাজিও হৃদয় ভরিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। মায়ের সুশিক্ষায় তাহাকে আর যাহাই না করুক, অন্য লোকের বিতৃষ্ণার কারণ করে নাই। শ্বশুর শাশুড়ী, বিশেষত দাদাশ্বশুরের স্নেহে সে একরকম ডুবিয়া গেল। স্বামী প্রবাসে থাকে—তাহার অতৃপ্ত হিয়ার অফুরন্ত প্রেম নিবেদন লইয়া প্রতি জাহাজে চিঠি আসে, সেই চিঠির ভিতর দিয়া কত অনাস্বাদিত জীবনের স্বাদ সে হৃদয় ভরিয়া পান করে। বৎসরে দুই মাসের জন্য মাত্র স্বামী দেশে আসে—এই দুইটী বিরহী হিয়া সারা বৎসর ধরিয়াই এই দুই মাসের কামনা করিয়া থাকে, এই দুই মাসই তাহাদের স্বর্গবাস।

বিবাহের বছর দুই পরে, হঠাৎ ইব্রাহীমের মনে খেয়াল চাপিল, সে সখিনাকে একবার তাক্ লাগাইয়া দিবে। সখিনাকে না জানাইয়াই সে একদিন জাহাজে চড়িয়া বসিল। সে জানে সখিনা তখন বাপের বাড়ীতে। মনে করিয়াছিল সোজা নিজ বাড়ী চলিয়া যাইবে, তারপর সেখান হইতে সখিনার জন্য লোক পাঠাইবে। এই করিয়া বিদেশ প্রত্যাগত স্বামীকে প্রথমদিনে অভ্যর্থনা করার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহার অন্তরের গোপন অশ্রু-সরোবরে একটি ছোট্ট ঢিল মারিতে হইবে, দেখি তাহা হইতে বুদ্বুদ উঠে, না তাহা এমনিই তলাইয়া যায়।

শহর হইতে তাহাদের বাড়ীর পথেই সখিনাদের বাড়ী। সেই পথের ধারে পৌঁছিতেই তাহার মনের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল—তাহার এত দিনের ভুখা বিরহী মন যেন সেইখানেই বাঁধা পড়িয়া ঘুরিতে লাগিল। —অদৃশ্যলোকে থাকিয়া আরও একটি বুভুক্ষিতা বিরহিনী যেন বাহু মেলিয়া তাহার পথ আগলাইয়া দাঁড়াইল।

সে বহুক্ষণ ধরিয়া মনের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করিয়াও মনকে ছাড়াইয়া লইতে পারিল না—। অগত্যা সে ধীরে ধীরে তাহার শ্বশুর বাড়ীতে যাইয়া উঠিল, ভাবিল পরদিন সখিনাকেও সঙ্গে লইয়া বাড়ী যাইবে।

বিকালে নাস্তা করিতে বসিয়া সখিনার বড় ভাই মতীন জিজ্ঞাসা করিল—ভাই সাহেব, কারবারে এবার কত লাভ দাঁড়ালো ?

ভাই সাহেব ওর্ফে ইব্রাহীম বলিল,—এবার কারবার বড় সুবিধে নয়, হাজার পাঁচেক মাত্র লাভ হয়েছে।

ম—বাড়ীতে কত আন্‌লেন ?

ই—এ হাজার দু'তিনেক, বাকীটা কারবারে খাটাতে হ'ল কিনা।

এই লইয়া রেঙ্গুনের অনেক আলাপ জমিয়া উঠিল। প্যাগোডা, বর্ম্মা-রমণীর অবাধ স্বাধীনতা হইতে মতীনও যে অদূর ভবিষ্যতে একবার রেঙ্গুনে যাইবে—আলাপ সেই পর্য্যন্ত পৌঁছিতেই ঘরের ভিতর অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া উঠিল। সখিনা বাতি লইয়া ঢুকিতেই মতীন কাজের অছিলায় মেজ ভাই শামসুকে ডাকিতে ডাকিতে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন ইব্রাহীমের যাওয়া হইল না—এতদিন পর দুলাভাই আসিয়াছে শ্যালকেরা চাপিয়া ধরিল, আজকার দিনটাও থাকিয়া যাইতে হইবে। শাশুড়ীও বলিলেন—বাবা, আজকের দিনটা থেকে যাও, কাল সখিনাকেও সঙ্গে নিয়ে যেয়ো—।

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর হঠাৎ সখিনা স্বামীকে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিল—তুমি এক্ষণি বাড়ী চলে যাও—এক মুহূর্ত্তও দেরী করো না।

ই—কেন ?

স—কেন টেন নয়, কোন কথা নয়—বিশেষ কারণ না থাকলে বুঝি তোমায় তাড়িয়ে দিচ্ছি ? পরে খুলে বলব তুমি এখন যাও।

তাহার কণ্ঠের অস্বাভাবিক কম্পনে ইব্রাহীম ভীত হইল, তাহার না করিবার শক্তি যেন লোপ পাইল। শুধু বলিল—তুমি?

স—আমি ভাইয়ের সঙ্গে কাল আসব—এই টাকার থলে নাও।

সে আঁচলের ভিতর হইতে একটা টাকার থলি বাহির করিয়া ইব্রাহীমের হাতে দিল।

ই—বেশ ভার হবে যে, তারপর এত টাকা নিয়ে রাত্রে পথ চলাও নিরাপদ হবে না—বরং তুমিই কাল পাল্কী করে নিয়ে যেও।

স—না, তা হবে না, আর কথা নয়, তুমি যাও।

তারপর স্বামীর হাত ধরিয়া টানিয়া গলায় হাত দিয়া কানের কাছে মুখ রাখিয়া বলিল—তুমি যে এখন চলে যাচ্ছ, এ কথা যেন এ বাড়ীর কেউ টের না পায়। হঠাৎ টিপ করিয়া সখিনা স্বামীর পায়ে পড়িয়া সালাম করিয়া ফেলিল—তারপর একরকম ঠেলিয়াই স্বামীকে ঘরের বাহির করিয়া দিল।

ইব্রাহীম মাথা মুণ্ড কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না—কিন্তু ভয়াবহ একটা কিছু কল্পনা করিয়া সে ভিতরে ভিতরে কাঁপিতে লাগিল। অথচ স্ত্রীর উৎকণ্ঠিত ও চুপি চুপি ভাব দেখিয়া এই বিষয় প্রশ্ন করিয়া কথা কাটাকাটি করিতেও তাহার সাহস হইল না। একটা কিছু বিপদের সম্ভাবনার মধ্যে স্ত্রীকে ফেলিয়া যাইতে তাহার মন কিছুতেই সায় দিতেছিল না—তবে সখিনার বাপের বাড়ীতে তাহার ভয় বা কি ভাবিয়া এবং তাহাকে কাল নিশ্চিত চলিয়া আসিবার জন্য বার কয়েক তাগিদ দিয়া,—সে এক রকম হতভাগ্যের মত সাতপাঁচ ভাবিতে ভাবিতে নিশীথ অন্ধকার ভেদ করিয়া বাড়ীর পথ ধরিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

স্বামীকে বিদায় দিয়া সখিনা মায়ের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, তিনি চোখ-বন্ধ করিয়া শুইয়া আছেন, হয়ত তাঁহার ঘুম আসিতেছে। কিন্তু পদশব্দে মেয়ের পায়ের শব্দে তাঁহার ঘুম ছুটিয়া গেল। তিনি চোখ খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কী?

স—চাবি রাখতে এসেছি।

মা হাত বাড়াইয়া বলিলেন, দাও।

স---না, তুমি ঘুমোও, আমি তোমার বালিশের নীচে রেখে দিয়েছি।

সখিনার অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে সে নিজেই চমকিয়া উঠিল।

কিন্তু মা পাশ ফিরিয়া একটু হাসিলেন, এতদিন পরে স্বামীর সঙ্গে প্রথম দেখা, একটু কাঁপিবে বই কি!

তারপর সখিনা স্বামীর জন্য রচিত শয্যায় আসিয়া আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল।

সকাল হইতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। সন্ধ্যায় একবার সারা আকাশ কালো হইয়া উঠিয়াছিল অত্যধিক কিন্তু ঝড় বাতাস থাকাতে মেঘ জমাট বাঁধিতে পারে নাই। রাত্রে বাতাস একটু কমিতেই, হঠাৎ আকাশে গুরু গুরু ডাক আরম্ভ হইল। বিদ্যুৎ ও বজ্রধ্বনিতে আকাশ যেন ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইল, সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিও নামিয়া আসিল।

সখিনার মন স্বামীর জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল, হয়ত ঝড় বৃষ্টিতে পড়িয়া কতই না কষ্ট পাইতেছেন। শেষ কালে কি-সব ভাবিয়া একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে পাশ ফিরিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিল বটে কিন্তু ঘুম আসিল কিনা কে জানে।

রাত্র প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে---

হঠাৎ নিশীথ অন্ধকারের গভীরতা ভেদ করিয়া উত্তরের ঘর হইতে ঘোঁ ঘোঁ করিয়া কে যেন কাৎরাইয়া উঠিল। কিন্তু প্রবল বাত্যা বিতাড়িত হইয়া সেই শব্দ কোথায় ভাসিয়া গেল!

কিছুক্ষণ পর সেই নিস্তব্ধ কক্ষে কে চুপি চুপি বলিল---ছালা খুলে ধর।

কে যেন কম্পিতস্বরে উত্তর দিল---বাতি জ্বালা---।

শব্দ হইল---কেন?

আবার ভাঙ্গা কম্পিত কণ্ঠে শব্দ হইল---লম্বা চুল যে!

দিয়াশলাইর কাঠি জ্বালাইয়া দেখিতেই লোকটির হাত হইতে কাঠি পড়িয়া গেল।

আবার অন্ধকারে সব ডুবিয়া গেল, সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া উভয়ের মর্ম্ম ছিঁড়িয়া ডুকরিয়া বাহির হইল—ও ও।

কপালে করাঘাত করিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি কাঁপিতে কাঁপিতে বাহির হইয়া গেল।

প্রথম ব্যক্তি বলিল---ফেলে না দিলে সকালে যে ধরা পড়বে---

উঠান হইতে কম্পিত কণ্ঠের উত্তর আসিল---আমি পারব না---!

প্রথম ব্যক্তি অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই ভয়াবহ অন্ধকারে যমদূতের মত বসিয়া বসিয়া কাপিতে লাগিল। পরে উঠিয়া খণ্ডিত দেহ ছালায় ভরিতে চাহিল, কিন্তু তাহার হাত পা যেন নুলা হইয়া গেছে--হাত পা'র অত্যধিক কম্পনে সে কিছু ধরিয়া তুলিতেই পারিল না। সে আবার কাঁপিতে কাঁপিতে দিয়াশলাই জ্বালাইল কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না। তাহার চোখে যেন দুনিয়ার অন্ধকার আসিয়া আজ জমাট বাঁধিয়াছে। মনের ভিতর সাহস সংগ্রহ করিয়া সে কতবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুই হইয়া উঠিল না, তাহার হাত পা থর্থর্ কাঁপিতে লাগিল।

হঠাৎ মস্জিদ হইতে ফজরের আজানধ্বনি ভাসিয়া আসিল 'নিদ্রার চেয়ে প্রার্থনাই ভাল'।—হায়রে মোয়াজ্জিন, যাহারা চির-নিদ্রায় নিদ্রিত তাহাদের জন্য নিদ্রাই যে সব চাইতে উত্তম অন্তত এই ত খোদার ব্যবস্থা।

উত্তরের ঘরের ভয়াবহ অন্ধকারের মধ্যে ততোধিক ভয়াবহ লোকটির মর্ম্ম ছিঁড়িয়া বাহির হইল—না, না, নিদ্রাই ভাল। নিদ্রাই ভাল! কেউ যেন আজ না জাগে হে আল্লাহ্।

আয়ষা ঘর হইতে বাহির হইয়া দেখিল, মতীন বেঁহুসের মত দাওয়ায় লেপটাইয়া বসিয়া আছে, তাহার চেহারা অস্বাভাবিক, বিকৃত, চোখ রক্তাক্ত।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—কি?

মতীন যন্ত্রপুত্তলিকার মত শুধু অঙ্গুলি নির্দ্দেশে ঘরের ভিতর দেখাইয়া দিল।

আয়ষা মুখের ঘোমটাখানি টানিয়া দিয়া অতি সন্তর্পণে জামাইয়ের শোয়ার ঘরের ভিতর খোলা দরজা দিয়া একটুখানি গলা বাড়াইয়া দেখিলেন,—দেখিয়াই তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া সেখানে মাটিতে পড়িয়া গেলেন।

মতীন উঠানে লাফাইয়া পড়িয়া চেঁচাইয়া উঠিল—জামাই, তোমার জামাইয়ের কাণ্ড।

ভোর হইতে না হইতে সংবাদ গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। মতীন আর কালবিলম্ব না করিয়া থানার দিকে ছুটিল।

দেখিতে দেখিতে পুলিশ, পেয়াদা, দারোগায় সমস্ত গ্রাম সরগরম হইয়া উঠিল। লাল পাগ্ড়ী দেখিয়া গ্রামের লোক আস্তে আস্তে সরিতে লাগিল—কে জানে কাকে আসামী করিয়া বসে। খুনী মোকদ্দমার সাক্ষী দিয়া বসিলেও ত নাস্তানাবুদ হইতে হইবে।—আর কিছু না বুঝিলেও গ্রামবাসীরা এই সব বুঝে।

মতীন ও শমসু জবানবন্দী দিল, তাহাদের ভগ্নিপতি ইব্রাহীমই তাহাদের ভগ্নি সখিনাকে হত্যা করিয়াছে। তাহারা রাত্রে স্বামী স্ত্রী এই ঘরে শুইয়াছিল—সকালে উঠিয়া তাহারা দেখে এ হাল—ইব্রাহীম পলাতক।

পাড়ার আরও অনেকেই সাক্ষ্য দিল—হাঁ জামাই আজ দুই দিন যাবৎ এখানেই ছিল।

দারোগা এই রকম নিষ্ঠুরভাবে পত্নী হত্যার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মতীন বলিল—এ হীন উপায়ে বংশানুক্রমিক ঝগড়ার প্রতিশোধ নেওয়া ছাড়া এর আর কী কারণ থাকতে পারে? এই দুই আত্মীয় পরিবারের বংশানুক্রমিক ঝগড়া ও বৎসরের পর বৎসর ব্যাপী মামলা মোকদ্দমার কথা পুলিশের লোক হইতে আরম্ভ করিয়া পাড়ার প্রতি ঘরের চালের পোড়া বাঁশ কাঠের পর্য্যন্ত অবিদিত নয়।

ইব্রাহীমকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে বন্ধ করা হইল। তাহার স্বপক্ষে তাহার নিজের আত্মীয় স্বজন ছাড়া অন্য কোন সাক্ষী পাওয়া গেল না। সে দিন স্ত্রীর নিকট হইতে গোপনে বিদায় লইয়া সারা রাত্রি হাঁটিয়া সে বাড়ীতে পৌঁছিয়াছিল প্রায় শেষ রাত্রে, কাজেই পাড়া

প্রতিবেশীদের সঙ্গে তাহার দেখা হইল একেবারে সকালে এবং সকলের 'কবে এসেছ'--প্রশ্নের উত্তরে সে বলিল, পরশু আসিয়াছে, গত রাত শ্বশুর বাড়ী হইতে বাড়ী পৌঁছিয়াছে। সেই দিনই যখন এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের সংবাদ এইরকম রূপ লইয়া তাহাদের গ্রামে পৌঁছিল—এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা হাজির হইল তখন অনেকের সন্দেহ হইল—হয়ত বা! বৌয়ে কি এতদিনের হিংসা বিদ্বেষ ভুলাইতে পারে?

যে আগুন এত বছর ধরিয়া তাহাদের গ্রামকে জ্বালাইয়া পোড়াইয়া ভষ্মীভূত করিয়া ছাড়িয়াছে—তাহারা সমস্ত গ্রাম মিলিয়া কত চেষ্টায় সে আগুন নিভাইয়া একটুখানি নিশ্চিন্ত হইয়াছে আজ এই উদ্ধত যুবা সেই নিভানো আগুনকে এমনি নিষ্ঠুরভাবে জ্বালাইয়া দিল দেখিয়া তাহারা ইব্রাহীমের প্রতি একেবারে বাঁকিয়া বসিল। তাহারা ইব্রাহীমের পক্ষে সাক্ষ্য ত দিলই না, বরং কেহ কেহ তাহার বিপক্ষে যাইয়া সাক্ষ্য দিয়া আসিল।

এই লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের রায় প্রকাশের দিন আদালতে তিল ধারণের স্থান রহিল না—যাহাকে সাধু ভাষায় বলে—একেবারে লোকে লোকারণ্য।

বিচারপতি দাঁড়াইয়া রায় পড়িয়া শুনাইলেন—চাক্ষুষ সাক্ষীর অভাবে আসামীকে ফাঁসীর পরিবর্ত্তে দ্বীপান্তরের শাস্তি দেওয়া হইল।

বিচারপতির রায় পড়া শেষ হইতে না হইতেই, একটি পনর ষোল বৎসরের ছেলের হাত ধরিয়া আপাদ মস্তক বোরকাবৃতা একটি মেয়ে সাক্ষীর কাটগড়ার দিকে অগ্রসর হইয়া বিচারপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে—।

বিপুল জনতা স্তব্ধভাবে এই অদ্ভুত দৃশ্যের দিকে চাহিয়া রহিল। বিচারপতি অনুমতি দিলেন। আগন্তুকা সহজ অথচ নির্ভীক কণ্ঠে বলিলেন—আমি নিহতা সখিনার মা, আমার নাম আয়ষা, দণ্ডিত আসামী আমার জামাই, এই মোকদ্দমার প্রধান সাক্ষীদ্বয় আমার পুত্র। এতদিন পুত্রস্নেহের দৌর্ব্বল্যই আমাকে সত্য প্রকাশে বাধা দিয়েছে, আজ তারই প্রায়শ্চিত্তের জন্য আমি আদালতে এসে দাঁড়িয়েছি। এই কাগজখানিই

এই লোমহর্ষণ হত্যার প্রকৃত অপরাধীকে নির্দ্দেশ ক'রে দেবে। এই কাগজখানি আমার নিহতা কন্যা ঘটনার রাত্রে চাবির সঙ্গে আমার বালিশের নীচে রেখে যায়। এই বলিয়া কাগজখানি বিচারপতির হাতে দিয়া নির্ভীক পদক্ষেপে যেমনি আসিয়াছিলেন তেমনি রাণীর মত অনম্র উচচশিরে আদালত-গৃহ হইতে তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

বিচারপতি কাগজখানি খুলিয়া দেখিলেন, তাহাতে লেখা আছে—মা, গত রাত্রে আমার ভাইদের গোপন পরামর্শ আমি শুনিয়াছি, তাঁহারা আজ রাত্রে আমার স্বামীকে হত্যা করিতে চায়, উদ্দেশ্য তাঁহার আনীত অর্থ অপহরণ ও তাঁহার পিতাপিতামহ কর্ত্তৃক আমার বাবাজানের উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ। কিন্তু, মা, তিনি ত নিরপরাধ, নিরপরাধ স্বামীকে বাঁচানো যে আমার কর্ত্তব্য—তাই ভাইদের উত্তোলিত খড়্গতলে আমি নিজকেই পাতিয়া দিলাম। মা, তাহারা আমার ভাই, তোমার পুত্র।

সখিনা

বিচারপতি পূর্ব্ব রায় কাটিয়া নূতন রায় লিখিলেন—

আসামী ইব্রাহীম বেকসুর খালাস, প্রথম নম্বর সাক্ষী মতীনউদ্দিনের ফাঁসী, দ্বিতীয় নম্বর সাক্ষী শামসুদ্দীনের দ্বীপান্তর।

রায়ের উপসংহারে বিচারপতি লিখিয়াছেন—যিনি এই মোকদ্দমার সুবিচারের জন্য দায়ী আমি তাঁহার প্রশংসা বা তাঁহাকে পুরস্কৃত করিয়া তাঁহার এই অপূর্ব্ব ত্যাগকে অপমান করিতে চাহি না।

বিচারপতি আসন ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে দণ্ডিত আসামীদ্বয়কে তাহাদের কোন শেষ প্রার্থনা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা শুধু বলিলেন—আমাদের আর কিছুই চাইবার নাই। শুধু একটিবার মা'র পদধূলি লইবার হুকুম—।

বিচারপতি—না, সে প্রার্থনা মঞ্জুর করা হবে না, তোমরা সে পদধূলির যোগ্য নও।

হুকুম শুনিয়া মতীন ও শামসু মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যেখানে দাঁড়াইয়া আয়যা সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছে, সেখানে উপুড় হইয়া পড়িয়া সেখানকার ধূলি দুই হাতে মাথায়, কপালে ও মুখে ঘষিতে লাগিল।

একখানি হাসি

একখানি ক্ষুদ্র হাসির কাহিনী মাত্র—

পুরাতন স্কুল—নূতন মাষ্টার। বয়স ও ডিগ্রীর খ্যাতি দেখে নিযুক্ত করা গেছে। সদ্য কলেজ-বিজয়ী নন্;—উনবিংশ শতাব্দীর নব্বই-এর দিকে তিনি কলেজ-কুরুক্ষেত্র একরকম শ্রীকৃষ্ণের মতই জয় করে সেরেছেন কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর, দুর্ভাগ্য দেশের—তিনি ডিপুটীও হলেন না, উকিলও না;—রাইটার্স বিল্ডিংয়ের মোটা ফাইল পরিষ্কার করলে এত দিনে তিনি হেডের এসিষ্ট্যাণ্ট অন্তত হয়ে যেতেন।—কিন্তু ওই মোটা মাইনের লোভই তাঁর হল না কোনদিন, নিদেন পক্ষে রাজনীতিতে ঢুক্‌লে এতদিনে তিনি জেলা, বিভাগ ও প্রদেশের সীমা ডিঙ্গিয়ে অল্-ইণ্ডিয়াতে পৌঁছতে পারতেন; কিন্তু কোনদিন ওই ইচ্ছেই তিনি করলেন না—কাজেই অল্ ইণ্ডিয়ায় না পৌঁছে অর্বাচীন বালক পরিবৃত ক্ষুদ্র ক্লাস-রুমের মধ্যেই তাঁর সমস্ত খ্যাতি অখ্যাতি নাম-যশ সারাজীবন আটকে থাক্‌তে বাধ্য হল।

লেখাপড়া সম্বন্ধে তাঁর খ্যাতি অসাধারণ—মাষ্টারী-জীবনের ধনুর্বাণ ও শক্তিশেল চেম্বার্স ও নেস্‌ফীল্ড, এই দুই অস্ত্রে অর্জ্জুন ও মেঘনাদের মতই তাঁর দক্ষতা। চেম্বার্স ত ঠোঁটস্থ, নেস্‌ফিল্ডের কোন্ লাইনের কোন্‌খানে কমা ও সেমিকোল্‌ন্ আছে, তা বই ট্রাঙ্কের নীচে বন্ধ রেখেও তিনি নির্ভুল বলতে পারেন।- প্রথম দিন টিচার্সরুমে আলাপ প্রসঙ্গে বলেই ফেল্লেন--এই দুইটি অস্ত্র হাতে থাকলে যে-কোন গাধাকে পিটিয়ে ঘোড়া করা যায়, এবং তিনি নাকি লিখে দিতে পারেন যে সে ঘোড়া অনায়াসেই কলেজস্কোয়ারের ডারবী জিততে পারবে। —জিতেছে এ রকম ঐতিহাসিক প্রমাণ উদ্ধৃত করে তিনি যখন আর একদিন ফাষ্টক্লাসের ছাত্রদের বুঝিয়ে দিলেন—অর্থ আর ব্যাকরণ এই দু'টো জিনিস শয়নে-স্বপনে-জাগরণে আহারে বিহারে ধ্যানে-কল্পনায় চিন্তা কর—দেখি হাসান্ সুহরবর্দ্দী কি করে তোমাদের আট্‌কে রাখেন!—তখন ছেলেদের মধ্যে

একটা রীতিমত উৎসাহের সাড়া পড়ে গেল। এ রকম রণসঙ্গীত শুনলে কার না বুক ফুলে ওঠে? যারা এ বছরের আশা ছেড়ে দিয়ে আগামী বছর ইউনিভারসিটিকে একবার দেখে নেবে বলে আস্তিন গুটোচ্ছিল, তারাও উৎসাহিত হয়ে বইর গাদা উল্টিয়ে নেস্‌ফীল্ডকে টেনে বের করলে। এই নতুন এসিষ্ট্যাণ্ট্ হেডমাষ্টারের নাম রফিক।

সৈয়দের মাষ্টারী জীবন এই বছরখানেক হল বলে। যুবক হলেও রফিক যখন 'হ্যালো ইয়ংমেন' বলে তাকে একটা বিড়ি বাড়িয়ে দিলে, সে সসঙ্কোচে 'থ্যাঙ্কস্' বলে প্রত্যাখ্যান করলে। রফিকের পক্ষে এ-যে কত বড় ত্যাগ, তা' জানলে সৈয়দ কখনো প্রত্যাখ্যান করতে পারত না।

রফিক সহজে দমবার পাত্র নন্, বলে উঠলেন—মশায় গান্ধীর কল্যাণে বিড়ির অস্পৃশ্যতা গেছে, এখন দেশের শ্রেষ্ঠ কুলীনদের সঙ্গে তার সম্বন্ধ।

সৈয়দ বল্লে—আভিজাত্যের মোহ আমার নয়, অভ্যেস যে নেই। বিশ্বেস হয়ত হল না।—এক বছর মাষ্টারী করেই রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল? বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো রফিক।

—মশায়, রক্তকে উষ্ণ রাখতে হলে রীতিমত সিল্‌ভার টনিক দরকার যে! রূপোর এমনি গুণ, খেতে হয় না, নাড়াচাড়া করলেই রক্ত জোশ দিয়ে উঠে, ভূড়ির বহর বেড়ে যায়, গাল্ থলথলে হয়ে ওঠে।

সৈয়দ মনে মনে রফিকের উপর বড় খুশী ছিল না; এসিষ্ট্যাণ্ট হেড মাষ্টারীর জন্য সৈয়দও প্রার্থী ছিল। কিন্তু গাধা পিটিয়ে ঘোড়া বানাবার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সঙ্গে কলেজের কাঁচা বিদ্যার পাল্লা দেওয়া ত সহজ নয়। বল্লে, আচ্ছা, রফিক সাহেব, আপনারা এত আগে পাশ করেও কেন খামখা আমাদের ভাত মারতে মাষ্টারী করতে এলেন?

রফিক তার প্রাণের কথাই জানাল—মশায় সাধে কী? জীবনে এম্বিশন্ ছিল মানুষ তৈরী করব—দেশের ছেলেগুলোকে মানুষ করব।

—বিধাতাকে অবসর দেবার ব্যর্থ চেষ্টা না করে যদি নিজে অবসর মত ইন্সিউরেন্স ক্যান্‌ভাসিং করতেন, তা'হলে মোটর দৌঁড়ান বা না দৌঁড়ান, অন্ততঃ গায়ে ছেঁড়া জামা পরতে হত না।

সৈয়দ ভিতরে ভিতরে সে পথে চেষ্টার ত্রুটি করে না; কিন্তু বড় সুবিধে করতে পাচ্ছে না! সুবিধে করতে না পারলেও দিন দিন তার এই ধারণা বদ্ধমূল হচ্ছে যে এই পথে সাফল্য তার না এলেও অনেকের আসতে পারে; কিন্তু তার দুঃখের ক্লাইমেক্স হচ্ছে হিন্দু ক্যানভাসারেরা আগেভাগে বাজার দখল করে আছে। তার ধারণা, এ জন্যেই তার সাফল্য হচ্ছে না! রফিক এ-স্কুলে যোগ দিতেই সে তাকেও পাকড়াও করেছিলো, কিন্তু বেচারী যখন জানালেন, তিনি এই ফাঁদের মধ্যে বহু পূর্বেই পা বাড়িয়ে আটকে গেছেন, এখন শুধু মরলেই বাঁচেন—শুনে সৈয়দের মন অকারণে রফিকের উপর আরও চটে গেল। সৈয়দের ইতিহাস বড় করুণ—বি-এর পর থেকে সে যে লক্ষ্যভেদের চেষ্টায় গুলী ছোঁড়া শুরু করেছে, পর্য্যায়ক্রমে আই-সি-এস, আই-পি-এস, বি-সি-এসের হাতি ঘোড়া ছাগ থেকে সাবরেজেষ্ট্রি-কুক্কুট পর্য্যন্ত কিছুই বাদ দেয়নি। কিন্তু এমনি দৈব, গুলী লাগলে সব শিকারেই লাগতে পান্ত, কিন্তু আফসোস কোথাও লাগল না। অগত্যা বি-টি পাশ করে এই অগতির গতি মানুষ তৈয়ারীর সহজ কাজে লেগে গেছে সে। বি-টি পাশ করলেই যে মানুষ বিধাতা হয়ে ওঠে, বিধাতার মত বিনা-পয়সায় অবশ্য নয় বিধাতার পরে মানুষ-তৈয়ারীর যোগ্যতা যে একমাত্র তাদেরই আছে, এ কথা এ মর্ত্যভূমে মানুষ তৈরীর পোর্টফলিও যাঁদের হাতে, তাঁরা খুব ভাল করেই জানেন। বুদ্ধিমান সৈয়দ মাষ্টারী করলেও আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে অফিসে দরখাস্তও একখানা দিয়ে রেখেছে। সেই থেকে প্রতি ডাকে আসাম-বেঙ্গলের সীল্‌ওয়ালা খামের জন্য তার বুকের ভিতর প্রতীক্ষা দুরু দুরু করে ওঠে।

রফিক উত্তর দিলে—জামা ছিঁড়েছে বটে, কিন্তু জেব ছেঁড়েনি। গিন্নী রোজ জেব হাতড়িয়ে দেখেন কিনা। জামা উড়ে যাক্ কিন্তু জেবে ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র ছিদ্রটির উপরও তিনি তাঁর সূচি-শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে কার্পণ্য করেন না। আমিও বলি, জামা যেখানে যাবে যাক্, জেব্ থাকলেই হল, জেবই ত আসল! জামা ছিঁড়লে ত আর শরীর পথে খসে পড়বে না কিন্তু জেব ছেঁদা হলে ত বিড়ি গলে রাস্তায় পড়ে যাবে। তাহ'লে ত গেছি আর কি!—মাথায় হাত বুলিয়ে বল্লে,

যে গোটাকয়েক চুল এখনো কাঁচা আছে, গিন্নীর তর্জ্জন গর্জ্জনে তাও মুহূর্তে সাদা হয়ে যাবে।

—বেশ! বেশ! হরিহর বলে উঠল, আপনার গিন্নি ত স্বাস্থ্য-তত্ত্ব ও অর্থ-নীতি খুব ভাল করেই জানেন দেখছি! মশারির নীচে হাইজিন আর ইক্‌নমিক্‌সের ক্লাস খুলে দেন না ত রোজ?

—দিন্ দিন্ মশায়, একটী বার!—রফিক সারা চেহেরায় মিনতিকে দোলা দিয়ে পূর্বকোণ থেকে পশ্চিম-কোণের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলে —বিড়ি হাজার বার হাতে উঠুক, ...কিন্তু ঐটির কাছে...চোখ মুখের রেখায় তাচ্ছিল্য ছবির মত ফুটে উঠল। দে ত বাবা মানিক! মানিক হুঁকাটী দিতে না দিতেই ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠ্‌লো।

—নেভার মাইণ্ড, নেই ছোড়েগা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বাঁকা তরবারির মত একটা নীরব হাসি উপেক্ষা ও করুণার ঔদ্ধত্যে তার চোখের সামনে ভেসে উঠল—তৎক্ষণাৎ তার চোখ-মুখের রং বিকৃত হয়ে কাল হয়ে গেল।

শীতল কাছে উঠে এসে বল্লে—আরে, খামখা ব্যস্ত হবেন না, হেডমাষ্টার খেতে গেছেন, নিশ্চিন্তে আরও এক ছিলিম শেষ করা যাবে। তাই নাকি? তবে দে ত মানিক, শিগ্‌গীর—রাস্তার দিকে চোখ রাখিস্ বেটা! আদেশ দিল বটে, কিন্তু নিজেই সেই আদেশ পালন করতে আরম্ভ করল।

নিশ্চিন্ত আরামে মিনিট পাঁচ-সাতেক টানার পর কল্কের তামাক যখন গোপনে তার শেষ নিশ্বাসের কাকুতি জানালে তখন রফিক শীতলের হাতে হুঁকাটী দিয়ে বল্লে—নিন্ নিন্। ততক্ষণে বেচারী শীতলের চেহারা কাল হতে হতে নীল হয়ে ওঠার উপক্রম হয়েছে।

তারপর ধীরমন্থর গতিতে রফিক ক্লাসে গিয়ে ঢুকল—ঢুক্‌তেই যেন বিনামেঘে বজ্রাঘাত! অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার চোখ ক্লাসের পশ্চিম কোণে গিয়ে পড়ল। এই কোণটীকে এড়াবার জন্য সে সব সময় সচেষ্ট থাকে—পারত পক্ষে সেদিকে চোখ দেয় না, ভুলে কোন সময় চোখ পড়লেই তার রক্ত মাথায় চড়ে বসে। সে যেদিন এ-স্কুলে প্রথম

হাজির হয়েছে, সেদিন থেকেই সেই কোণটির উপর সে হাড়ে হাড়ে চটে আছে। সেই কোণায় বিরক্তি-উৎপাদক কোন কুদর্শনচক্র কেউ স্থাপন করেনি, সুন্দর ছিপছিপে একটি ছেলে নিম্নমুখী হয়ে রোজ সেখানে বসে। ক্লাসে এত জা'গা থাকতে ছেলেটি কোনদিন সেই জা'গা-ছাড়া অন্যত্র বসে না।

লাজুক ভীতু ছেলে—মাষ্টারের চোখে চোখে চেয়ে কখনো কথা বলতে পারে না। তার এক অভ্যাস, হয়ত খারাপ অভ্যাস-ই প্রায়-ই কারও চোখে চোখ পড়লে অথবা এমনিও নিম্নমুখো হয়ে অকারণে মুচকে হাসে। সে হাসির ভঙ্গিমায় কি আছে রফিকই জানে। প্রথম দিন হতে সেই হাসিতে চোখ পড়তেই তার মাথায় রক্ত টগ্‌বগ করে ফুটতে থাকে—ভিতরের আগুনে মুখের কথা জিবে যায় আট্‌কে। একে ত তার পড়ায় গতি নেই, তার উপর রাগে মুখের কথা থম্‌কে থম্‌কে বেরোয়। প্রথম দিন পড়াতে পড়াতে ছেলেদের চেহারার তৃপ্তি মেপে দেখার জন্যে প্রত্যেকের চেহারায় চোখ বুলিয়ে মনিরের এই নিম্নমুখী হাসির উপর চোখ পড়তেই তার বুকের ভিতর কে যেন এক ধারাল ছুরি বসিয়ে দিলে। ছেলেটি প্রতিবাদ করলে, কিচ্ছু বোঝেনি বল্লে কিছুই এসে যেত না—আবার বোঝাত, বারবার বুঝিয়ে দিত; কিন্তু এই নীরব ফিকে হাসিটি তার মাথায় আগুন ধরিয়ে দিলে। দু'মাস সে এ স্কুলে এসেছে সে থেকেই এই দু'মাসের কোন নিভৃত মুহূর্তও এই হাসিটিকে সে মন থেকে ছাড়াতে পারেনি। যখনি এই কোণে চোখ পড়েছে, তখনি দেখেছে এই অনুগ্রহবঙ্কিম হাসিটি তার নীচের ঠোঁট অবলম্বন করে ঝুলে আছে। কতদিন বাতি নিবিয়ে শু'তেই এই হাসিটি বাঁকা ছোরার মতো তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে, এই হাসিটি যেন তার এই ত্রিশ বছরের শিক্ষকতাকে চ্যালেঞ্জ করছে। ধরা-ছোঁওয়া যায় না—অথচ ভিতরে ভিতরে এই হাসি শতমুখো সূঁচের মত বিঁধতে থাকে।

মাথা গরম হয়ে চোখ মুখ লাল হয়ে উঠ্‌ল। গম্ভীর হয়ে মনিরকে আদেশ দিলে—দাঁড়া, বেনানা অর্থ কি বল্‌?

ভীতকণ্ঠে উত্তর এল—কলা, স্যার!

না, দাঁড়াও টুলের উপর—ইউ, ইউ, ইউ বলে বিদ্যুৎগতিতে একবারে ফার্ষ্ট বয়ের কাছে এসে মাষ্টারের আঙ্গুল থামলো। ফার্ষ্ট বয় উত্তর দিলে—'প্লেন্‌টেইন্'।

—ইয়েস্—বেত নিয়ে এস, চোখ দিয়ে যেন তার আগুন ছুট্‌ছে। এতদিনের হাসির সঞ্চিত আগুন যেন আজ বোমার মত ফেটে পড়ল —মনিরকে এমন বেদম প্রহার করলে যে প্রহারের চোটে মাষ্টার নিজেই অজ্ঞান হবার উপক্রম।

রাত্রে বাতি নিবাতেই চির-পরিচিত হাসিটি আজ আরও তীক্ষ্ণ হয়ে চোখের সাম্‌নে ভাস্‌তে লাগল—যেন সূর্য্য-কিরণে বাঁকা তরবারি ঝিক্‌মিক্ করে ওঠল। ঘুম কিছুতেই আসে না চোখ বন্ধ করলেই সেই হাসি যেন আরও ধারালো হয়ে ওঠে। কত গাধাকে সে ঘোড়া বানিয়ে ছেড়েছে আর এই ছোঁড়া কিনা হাসে—উপহাসে না করুণায়? জিঘাংসায় তার শিরায় শিরায় রক্ত রি রি করে ফিরে। পাশের ছোট ছেলেটি মশার কামড়ে উলট পালট খেতে থাকে পাখা নেড়ে ছেলেকে ঘুম পাড়াতে হয়। সম্বল মাত্র একখানা মশারি, তা টাঙিয়ে গৃহিণী দক্ষিণের ঘরে শোন! মশার কামড়ের দরকার হয় না,—ভন্‌ভনানিতেই নাকি তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়। রাত্রে ছেলেপিলে কাঁদ্‌লে তিনি যা মেজাজ করে উঠেন তা শুন্‌লে মনে হয় যেন ছেলেপিলেগুলির এই ধরাধামে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য বেচারা রফিকই একমাত্র দায়ী। সেই নিষ্ঠুর হাসির আগুন আর ছেলেদের কান্না থামিয়ে রাখতে হয়, বহুরাত্রি সে ঘুমাতে পারে না। বেচারী নিশ্চিন্ত আরামে এতদিন ধরে বিদেশে মাষ্টারী করে এসেছে। বাড়ী থেকে স্কুল করে জীবনের বার্দ্ধক্যটুকু সুখে কাটাবে মনে করে দশটাকা কম বেতন স্বীকার করে এই চাক্‌রী কবুল করেছে! এখন সুখের দক্ষিণা বাতাস হাড়ে হাড়ে বেশ বইছে বটে!

স্কুলে ঢুক্‌তেই হরিহর বল্লে—'দাদা, দিন দেখি একটা বিড়ি।'—'গিন্নী খেয়ে উঠ্‌বার আগেই এই জেবটিতে গুণে গুণে চারটী বিড়ি আর এই খোলটিতে—' রফিক একটী ময়লা কাগজে জড়ানো

দিয়াশলাইর বাক্স জেব থেকে বের করে দেখালে,—'চারটী কাঠি রেখে দেন —দশটা পাঁচটার এই বরাদ্দ।—খেয়ে উঠে একটা, স্কুলে পৌঁছে একটা, দুপুর ছুটিতে একটা, আর একটা ফের্‌বার পথে। আস্ত একটা তোমাকে কোত্থেকে দিই? একটি জ্বালাও, দু'জনে খাওয়া যাবে? রফিক বল্লে।

একটা বিড়িতে দু'জনের তৃপ্তি হবে না—হরিহরকে অন্যদিকে হাত বাড়াতে হল।

সৈয়দ শুনে ত অবাক!—ম'শায়, আপনি ত মহাসৌভাগ্যবান, এমন হিসেবী স্ত্রী পেলে মাষ্টারী করেও ভারতমহাসাগরের উপর সেতু বাঁধা যায়।

থার্ডমাষ্টার গণি বল্লে—রফিক সাহেবের স্ত্রী যে শিক্ষিতা, জানেন না বুঝি?

হরিহর—তাই ত, তিনি রফিক সাহেবের জামা সেলাই করে দেন না, শরীরে আলো বাতাস লাগলে যে স্বাস্থ্য ভাল থাকে শিক্ষিতা না হ'লে এসব Ventilation—তত্ত্ব কি আর অশিক্ষিতারা জানে? কথা জমে উঠবার আগেই ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেজে ওঠে।—সে-ই অলক্ষুণে হাসি ছাদ ফুঁড়েই যেন রফিকের চোখের সাম্‌নে এসে হাজির হয়—সে হাসির আলোতেই যেন তার মুখের হাসি মুহূর্ত্তে নিবে যায়। ঘরের মেঝে আর চেয়ার পা ধরে নীচের দিকে টান্‌লেও না উঠে উপায় নেই।

ক্লাসে ঢুকে জোর করেই আজ সে চোখ পূর্ব্বদিকে ফিরিয়ে রাখলে। ফাষ্ট বয়, হয়ত সকল ছেলের অনুরোধেই, জিজ্ঞেস করলে—স্যার, বেনানা অর্থ কলা কি অশুদ্ধ?

—ক্লাস সেভেন থেকে উপরের দিকে বেনানা অর্থ আর কলা থাকে না।

—তবে কি স্যার?

—কেন, প্লেন্‌টেইন্‌।

—প্লেন্‌টেন্‌ অর্থ স্যার?

---বেনানা।

বেনানা অর্থ প্লেন্‌টেইন, প্লেন্‌টেইন অর্থ বেনানা ত হল—কিন্তু স্যার বইর বাইরে সেটা কোন জিনিষকে বোঝায়, তা না বুঝলে কেমন করে চল্‌বে—।

—কেমন করে চলে এই দেখাচ্ছি—তারপর উঠে বোর্ডে চক চালিয়ে বল্লে—পরীক্ষায় প্লেন্‌টেইন অর্থ লিখতে বল্লে লিখবে—বেনানা, বেনানা অর্থ লিখতে বল্লে লিখবে প্লেন্‌টেইন! তা'হলেই সেণ্ট পারসেণ্ট্‌। এই সোজা কথাটা বুঝতে পারছ না গাধারা? পরীক্ষকের বাড়ীতে গিয়ে তোমাকে ত বেনানা বা প্লেন্‌টেইন অর্থ, কলা না মূলা, বোঝাতে হবে না। আর হয়ত জিজ্ঞেস করতে পারে, এটা কোন্‌ নাউন, মেস্‌কুলিন, না ফেমেনিন্‌, সিঙ্গুলার না প্লুরেল? আর কি চাই? ---বলে তৃপ্তির সহিত সকলের চেহারার দিকে চোখ ফিরাতেই অজ্ঞাতে চোখ মনিরের উপরও গিয়ে পড়ল;—হাসি লুকোবার চেষ্টা করলেও হাসি রফিকের চোখ এড়ালো না।—আঘাত হেনে তরবারি খাপে ঢুকলেই আঘাতের যন্ত্রণার লাঘব হয় না। মুহূর্ত্তেই তার চিন্তার খেই হারিয়ে গেল—চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল। মুখের কথা তার গতি হারিয়ে বসল—না পড়িয়ে বসে থাক্‌লে ছাত্রদের কাছে অক্ষমতাই জাহির হয়! খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হলেও চল্‌তে হয়। কতক্ষণ পর কথার খেই হারিয়ে পড়ার মাঝে সে চুপ করতেই শব্দ হল—বুঝেছি, স্যার। যে ঠোঁটের উপর তার চিরপরিচিত নির্ম্মম হাসিটি রোজ খেলা করে—এ-ও সেই ঠোঁটেরই কথা! শুনেই তার মাথার ভিতর রক্ত যেন জোশ দিয়ে উঠল। ছেলে যে-কিছু বুঝেনি, এ-যে শুধু তাকে অনুগ্রহ করা হল, করুণা করা হল, এই খেয়াল তার মনে জেগে উঠতেই তার পক্ষে মাথা ঠিক রাখা অসম্ভব হয়ে উঠল। এ বিশ্বাস তার মনের ভিতর দৃঢ়তর হতে লাগ্‌ল। এবং মনে মনে নিঃশব্দে উচ্চারিত হল —কচু বুঝেছ। ঝুনু দাঁত, নতুবা হয়ত ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যেত।

বিধাতা সহায় হলেন। ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠল। স্বস্তির চাঁদ বুকের ভিতর হেসে উঠল বটে, কিন্তু এক ঘণ্টা পরেই আবার

এই ক্লাসে আস্‌তে হবে মনে হতেই, মুখের হাসি ত মিলিয়ে গেলই, সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভিতর টিপ্ টিপ্ শুরু হল। কুচ্ পরওয়া নেই— এ-কথা মনে বার বার আউড়িয়েও সে মনের আকাশকে মেঘশূন্য করতে পারলে না। ক্লাস থেকে বের হল বটে, কিন্তু সেই চিরপরিচিত হাসিটি তার সদ্যোজাত সহোদর 'বুঝেছি' কে নিয়ে তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ক্লাস থেকে ক্লাসে যাতায়াত করে তার সব ক্লাসগুলিকে অশান্তিময় করে তুল্ল। তার ধনুর্ব্বাণ ও শক্তিশেল এমন অনুগ্রহ কোনদিন পায়নি— এই দীর্ঘ জীবনের অস্ত্রশিক্ষাকে ওই নিরঙ্কুশ নিঃশব্দ ক্ষুদ্র হাসিটী এমন কেটে কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো করতে পারে, এ তার অভিজ্ঞতার বাইরে। ধনুর্ব্বাণ ও শক্তিশেলের হাসি ও 'বুঝেছি'—রূপ দু'টি ক্ষুদ্র সূচের কাছে এমন পরাজয়, যে কোন বীর পুরুষকে কাণ্ডজ্ঞানহীন উন্মাদ করে তুলতে সক্ষম।

বাংলার ঘণ্টায় দৃষ্টিকে সংযত করে যথেষ্ট সতর্ক হয়েই সে ক্লাসে ঢুক্‌লে।—পূর্ব দিকেই একরকম মুখ করে বস্‌লে।

ছেলে একটি জিজ্ঞেস করলে:—স্যার, উর্ব্বশীর প্রথম লাইন বুঝিনি (যাক্, বুঝিনি বল্লে করুণা করা হয় না, বুঝিয়ে দেওয়া যায়); —নহ মাতা নহ কন্যা নহ বধূ, ইত্যাদি।

শিক্ষক গম্ভীর ভাবে আরম্ভ করলে—নহ অর্থ নয়, মাতা অর্থ মা, কন্যা অর্থ মেয়ে, বধূ অর্থ স্ত্রী—অর্থাৎ কবি উর্ব্বশীকে সম্বোধন করে বল্‌ছেন, হে উর্ব্বশী তুমি মাও নও, মেয়েও নও, বৌও নও—।

—তা'হলে কি হল স্যার?

—তা'হলে কি হল স্যার? বলে ভেংচি দিয়ে এমন এক কিম্ভূত-কিমাকার মুখভঙ্গি করলে যে তার সোজা অর্থ এই যে এ সব গাধা কস্মিনকালেও ঘোড়া হতে পারবে না।—কেন?—মা, মেয়ে, বৌ ছাড়া কি পৃথিবীতে আর কোন সম্বন্ধ নেই? মাসী, পিসী, শালী, শাশুড়ী, ভাবী, ভাইঝি, ভগিনী—কত কিছু হতে পারে।..কথা শেষ না হতেই ধীর অনুচ্চকণ্ঠে শব্দ হল—বুঝেছি স্যার। মনিরের কণ্ঠ—সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয়ই ক্ষীণ হাসির বাঁকা তরবারি খাপে ঢুকবার আয়োজন করছে।

বারুদের গোলায় যেন জ্বলন্ত টিকা ছুঁড়ে মারা হ'ল! মাষ্টার গর্জ্জন করে উঠলেন—কচু বুঝেছ! চোখ পড়তেই দেখে, তার ভাবহীন প্রশান্ত চেহেরার নীচে ঠোঁটে সেই ক্ষুদ্র হাসিটি বাঁকা কৃপাণের মত ঝুলছে। রাগে গোস্বায় তার দ্বিগ্বিদিক জ্ঞান রইল কিনা কে জানে! দাঁত কড়মড় ক'রে উঠল—তর্ক কর ষ্টুপিড্ কোথাকার! বলে ঠাস্ ঠাস্ করে তার দুই গালে কসে দুই চড় বসিয়ে দিলে।

পরে গম্ভীর হয়ে চেয়ারে বসে একটা ছেলের কাছ থেকে একফর্দ্দ কাগজ চেয়ে নিয়ে কি লিখতে লাগল। হেডমাষ্টারের কাছে মনিরের আরও কঠোর শাস্তির জন্য রিপোর্ট করা হচ্ছে নিশ্চয়ই যদিও মনিরের দোষ কি, তারা কেউ এখনো বুঝতে পারেনি, তবুও ক্লাস শুদ্ধ ছেলে ভয়ে ভিতরে ভিতরে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। হেডমাষ্টার শুধু যে স্কুলের মাথা তা নয়, বেত্রদণ্ড পরিচালনেও তিনি সকলের শীর্ষস্থানীয়।

শেষ-ঘণ্টা শেষে টিচার্স রুমে ছাতা নিতে এসে যখন হুঁকার দিকে চেয়ে রফিক বল্লে—সে রিজাইন্ দিয়েছে, সৈয়দ ভিতরে ভিতরে খুশী হলেও এ অপ্রত্যাশিত কাণ্ডে সেও যেন আকাশ থেকে পড়ল। হরিহরের হাতের ধূমায়িত হুঁকা ত কিছুক্ষণের জন্য ঠোঁট হতে বিচ্ছিন্ন হয়েই রইল। সহকর্মীদের বহু বিস্মিত মুখের—'কেন? কি হয়েছে?'—প্রশ্নের উত্তরে জানালে—এখানকার গাধাকে ঘোড়া বানাবার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র বরং নিজেরি গাধা হয়ে যা'বার ষোল আনা সম্ভাবনা।

নিকুঞ্জ বাবু সহানুভূতি করে বল্লেন—একি ভাল করলেন? এ বুড়ো বয়সে খাম্‌খা আবার কোথায় গিয়ে চাকুরী খুঁজবেন?

—গাধা পিটিয়ে ঘোড়া বানাবার কাজ করে জীবন কাটালাম বলে নিজে এখনো গাধা হয়ে যাইনি—আগের চাকরীতে আমি রিজাইন্ দিইনি—চার মাসের ছুটী নিয়ে এসেছিলাম। রফিক জানালে।

ছেলেরা খুব আড়ম্বরের সহিত তার বিদায়ের আয়োজন করলে। বিদায়-সঙ্গীত, অশ্রু-অর্ঘ্য, ইয়া উয়া কত কিছু রচিত হয়ে চা'র পেয়ালায় শোকের তুফান বইয়ে দিলে। উৎসবটীকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যে মনির উঠে পড়ে লেগেছে, কি জানি কেন সে-ই আজ বেশী করে

পরিশ্রম করছে; টুল-বেঞ্চ টানা, ঘর সাজান, অভিভাষণ ছাপান, ফুল, হারমোনিয়ম যোগাড় করা, সব কাজেই তার দৌড়াদৌড়ির অন্ত নেই।

সে-রাত্রে কিন্তু রফিকের কিছুতেই ঘুম হল না—তার সম্বর্দ্ধনার জন্য আহুত জনাকীর্ণ ছাত্র-পরিবৃত সভা, অতিভাষণ-পূর্ণ অভিভাষণ, ফুলের মালা—আরও কত কিছু যে তার মনের আকাশে ভেসে উঠল তার ইয়ত্তা নেই;—সঙ্গে সঙ্গে তার দেখতে ভুল হল না, সেই ছাত্র ও শিক্ষক পরিপূর্ণ স্কুল হল্‌টীর অন্য প্রান্তে সেই নির্ম্মম 'হাসি' আর তার সহোদর 'বুঝেছি' উপেক্ষা ও অনুগ্রহের হাসি হাস্‌ছে। বিশেষ করে সেই সাদা ঠোঁটের নীরব হাসিটী সে কিছুতেই ভুলতে পারলে না—জনসভার প্রান্তে দাঁড়িয়ে নীরব হাসিটী উপেক্ষা ও করুণায় যেন তাকে ব্যঙ্গ করছে।

রাত শেষ না হতেই গিন্নীকে ডেকে বলে দিলে—সকালের ট্রেনেই তার যেতে হবে। শুনে গিন্নী ত অবাক্—সন্ধ্যার ট্রেনে যাওয়ার কথা, ছেলেরা দুটার সময় স্কুলে সভা কর্‌ছে বল্লে!

—না, দেরি করা সম্ভব নয়, কালই আমার জয়নিং ডেট্‌। গিন্নীর তর্জ্জন-গর্জ্জন, চোখের জল কিছুতেই তাকে ঠেকাতে পারলো না। রফিক উঠে কাপড়-চোপড় বাঁধা শুরু করে দিলে।

যাত্রার সময়, গিন্নী সকালে যে মুরগীটি জবেহ করবে ভেবেছিলো সেটির পাখা ঠ্যাং বেঁধে এনে মাথা খাওয়ার দিব্য দিয়ে বল্লে—এইটি নিতেই হবে!

রফিক ত হেসেই খুন—তোমার আট আনার মুরগী খাওয়ার জন্য এক টাকা রেলভাড়া দিই আর কি!

—কে আর দেখছে, যতক্ষণ রেলে থাকবে ততক্ষণ না হয় ট্রাঙ্কেই পুরে রাখবে।

রফিক আর এক ছোট হেসে নিয়ে বল্লে—বাইরের লোককে ঘোড়া বানাতে গিয়ে দেখছি ঘরের মানুষকে গাধা বানিয়ে ফেলেছি—তা হলে ত তোমাকেও ট্রাঙ্কে পুরে আমার সঙ্গে বিনা ভাড়ায় নিয়ে যেতে পারি।

হামিদাও এবার হাসলো বটে কিন্তু মুরগী নেওয়ার জিদ্‌ ছাড়লো না—অবশেষে রফিককে আগামী মাসে একটা ছুটী আবিষ্কার করতে

হল, এবং সেই ছুটিতে আসার রীতিমত শপথ গ্রহণের পর, তবে এই মুরগী-কাণ্ডে দাঁড়ি টেনে তার যাত্রা করা সম্ভব হল।

ট্রেন ছেড়ে দিতেই নিজের ছেলেমেয়েদের ছবি রফিকের চোখের সামনে ভেসে উঠল। রাত্রে ছেলেগুলি মশার কামড়ে ছট্‌ফট করতে থাকবে, মনে হতেই তার চোখ ছল ছল করে উঠল।

স্কুলের সম্বর্দ্ধনার কথা ভেবে, ওরা যে আজ বেজায় জব্দ হবে মনে হতেই ওর খুব করে হাসি পেল। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক ছাত্র অনেকের কথাই মনে হল—সৈয়দ, হরিহর এরা কত অমায়িক–পরস্পরের মধ্যে কোন হিংসা দ্বেষ নেই। আহ্‌, শরীফ, সুকুমার, এনাম, এরা কত মেধাবী, ভক্ত ও একনিষ্ঠ, থাকলে অন্ততঃ এগুলিকে মানুষ করা যেত—তাদের নবনীত কোমল সুন্দর ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠতেই তার চোখ আবার ছল ছল করে উঠল—বুকের ভিতর নিঃশ্বাস ভারী হয়ে গেল।

পরক্ষণে যে ছবি তার অন্তর-আকাশে উঁকি মারল, তাতে মনের ভিতর মুহূর্ত্তে দাবদাহের সৃষ্টি হল। একরকম অজ্ঞাতেই অন্তর মথিত করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল—কচু বুঝেছ।

কেউ শুনে ফেল্লে না ত, ভেবে মুহূর্ত্তেই তার সারা মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। যার উদ্দেশ্যে এ ক্ষুদ্র দুই শব্দ-বিশিষ্ট বাক্যটি উচ্চারিত হল সে হয়ত তখনও ফুলের মালা ও হারমোনিয়মের যোগাড়ে দৌড়োদৌড়ি করে গলদ্‌ঘর্ম হচ্ছে।

হাকিম

দুঃখের অমানিশা বুঝি ভোর হল—

ফাতেমার বুক সুখে, গর্বে, গৌরবে ফুলে ফুলে উঠছে। বৃদ্ধ আবদুল্লা আজ নিজেকে দেশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করলে,—পুলকে, অহঙ্কারে, হাসি ও কথায় সে যেন আজ ফর্ ফর্ করে উড়তে লাগল; বার্দ্ধক্যের জরা আজ তার দেহচ্যুত, মাথা সোজা করে চলতে আজ তার কিছুমাত্র কষ্ট নেই। মন আজ আশার আকাশে ভবিষ্যতের জ্যোৎস্না তরিতে পাল তুলে দিয়ে ভেসে চলেছে।—ডেপুটি, মুন্সেফ, হাকিম, নিদেন পক্ষে দারোগার বাবা—সারা দেশের মধ্যে ক'জনের এ সৌভাগ্য!

ম্যাট্রিক পাশ, সে যে কত বড় এবং সে পাশ যে কত দুরূহ এ সব ধারণা ফাতেমার নেই। তবে সে যে দেশে আর কেউ না পারার মত দুরূহ, এবং বিনিদ্র রজনীর কঠোর তপস্যার ফল, এ তার জানা আছে। কাজেই পুত্রের এই বিজয় সংবাদে তার জরা-জীর্ণ-শুষ্ক বুকও ভাদ্রের বন্যা-প্লাবিত নদীর মত সুখে, আনন্দে ও এক অনির্বচনীয় পুলকে তরঙ্গিত হতে লাগল—ঝরণা ধারার মত সুখের অন্তহীন ঢেউ-এর পর ঢেউ তার ভাঙ্গা বুকের পাঁজরায় পাঁজরায় মর্মরিত হয়ে উঠল।

স্বপ্ন, স্বপ্ন, মানুষের জীবনে বিধাতার সর্বশ্রেষ্ঠ দান,—স্বপ্নের পাখায় চড়ে পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে, দিন মজুর ভিস্তী কল্পনার অশ্বপৃষ্ঠে চড়ে ময়ুর সিংহাসনে বাদশাহ হয়ে বসে, চির-আলো বঞ্চিত অন্ধ, বন্ধ চক্ষুর অন্তরালে কল্প-লোকের যবনিকা ছিন্ন করে কত বিচিত্র রঙমহল রচনা করে, শত সুন্দরীর নুপুর নিক্কণ, সহস্র কণ্ঠের বীণানিন্দিত সুর তার কল্প লোকের পরদায় পরদায় মূর্চ্ছনা তোলে। বিধাতার এ অপরূপ দান না হলে মানুষ হয়ত পশু হ'ত, না হয় জড় পদার্থের উর্দ্ধে উঠতে পারত না।

রিক্ত সর্বহারার মানস লোকেও এমন কত স্বপ্ন-স্বর্গের ভাঙ্গা গড়া চলে—।

না হয় কে না জানে আজকাল ম্যাট্রিক সার্টিফিকেটে কারও হাঁড়ি ভরে না, চালের ফুটো বন্ধ হয় না, ফাতেমা ও আবদুল্লার শতছিন্ন কাপড়ে হয়ত তালিও পড়ে না। তবুও তারা আজ রাজরাণীর মত সুখী, আবু হোসেনের মত অভাবহীন।

ছেলের পরীক্ষার ফিস্ দিতে গিয়ে এবার ঘর ছাওয়া হয়নি, বৃষ্টির জল বাইরে পড়ার আগে ঘরের ভিতর তার আগমন সংবাদ জানায়। জায়গা জমি যা ছিল ছেলের পড়ার খরচ জোগাতেই তা হয়েছে মহাজনের করতলগত। ফাতেমাকে তার স্বল্প পুঁজি পাঁজি গায় গায়ের অলঙ্কার পর্য্যন্ত নিঃশেষে শেষ করতে হয়েছে।—তবুও আবদুল্লার কল্পনায় আজ ডেপুটি, মুন্সেফ ভিড় জমিয়েছে;—ফাতেমার মনেও আজ অভাবহীন সচ্ছল সংসারের সঙ্গে সঙ্গে আপাদমস্তক অলঙ্কার-ভূষিতা, লাল টুকটুকে একটী পুত্রবধূর স্বপ্ন খুশীতে তার সারা বুককে তোলপাড় করে তুলেছে।

সর্বাঙ্গীণ অজ্ঞতা, অশিক্ষা ও মূর্খতার্ মধ্যে জীবন যাপন করেও কি করে আবদুল্লার শিক্ষার প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছিল এবং মনে মনে একটা দূর ভবিষ্যতের স্বর্গ দানা বেঁধেছিল তাও আশ্চর্য্য। পাড়া পড়শী দেশব্যাপী কারও যে বিলাসিতার সখ হয়নি, যে দূরাশা কারও মনে কোনদিন বাসা বাঁধতে পারেনি,—তা কি করে আবদুল্লার মনে আশ্রয় পেল কে জানে। বহু ছেলে মেয়ের অকাল মৃত্যুর পর, এই ছেলেটিকে অনেক তাবিজ মাদুলী ভারাক্রান্ত ক'রে বহু মসজিদ দরগায় মানত শিরণী দিয়ে সে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে।—কাজেই এ রকম যত্ন ও তপস্যার যে ছেলে তার সম্বন্ধে শুধু বেঁচে থাকার চেয়ে একটু উচচাকাঙ্খা থাকা বিচিত্র নয়। আবদুল্লার অবস্থা আগে এক রকম সচ্ছলই ছিল বল্‌তে হবে। আট দশ বিঘা চাষের জমি ছিল এবং নিজে স্থানীয় জমিদার মজুমদারদের ওখানে তহশিলদারী করে মাহিনা ও উপরি পাওনায় দশ'বিশ টাকা সারিয়ে নিত, তাতেই খাওয়া দাওয়া

ও ঘর সংসারের যাবতীয় খরচ পুষিয়ে যেত।—কিন্তু ছেলেকে হাকিম গিরির প্রথম সিঁড়ি ডিঙানোতেই তার সমস্ত জায়গা জমিকে মহাজনের খাতায় আশ্রয় ভিক্ষা করতে হয়েছে। পাড়া গাঁয়ের মানুষ হলে কি হবে! পাড়াগাঁর প্রতি আবদুল্লার কিছু মাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। পাড়ার পাঠশালায় প'ড়ে চাষা মজুর হওয়া আর বড় জোর শ্যালক সংখ্যা বৃদ্ধি করা ছাড়া যে আর কিছু হওয়া যায় না এ তার বদ্ধমূল ধারণা। বাস্তবিক সে পাঠশালায় প'ড়ে এর উপরে কেউ উঠেছে এমন প্রমাণ দেওয়াও সম্ভব নয়। কাজেই আবদুল্লা তার এত তাবিজ মাদুলীর ছেলেকে কি করে সেই পাঠশালায় দিয়ে হাকিম হওয়ার পথকে চিরতরে রুদ্ধ করে দেয়। অথচ তার চোখের উপর মজুমদারদের ছেলেগুলি সহরে বোর্ডিং-এ থেকে পরীক্ষার উচচ থেকে উচচতর বেড়া ডিঙিয়ে আজ কেউ উকিল, কেউ মুন্সেফ, কেউ ডেপুটি;—আর এখনো যারা স্কুল কলেজের জাঁতা কলে ফর্ ফর্ করছে তারাও ছুটিতে গ্রামে এসে বিলেতী জুতার মস্ মস্ শব্দে ও থিয়েটারে রাজরাণীর পোষাক ও তরবারি ঘোরানোর চাকচিক্যে তাদের ভবিষ্যৎ হাকিমী জীবনের পরিচয় দেয়।—আবদুল্লার মনে এ সবের ছোঁয়াচ লাগা বিচিত্র নয়। এ সব দেখে আবদুল্লার নিরীহ ক্ষুদ্র বুকের ভিতরও হয়ত স্বপ্নের বীজ বোনা হতে থাকে।

আল্লার অনুগ্রহে তাবিজ মাদুলীর ফল যখন ব্যর্থ হল না, তখন তার মনে মনে সেই স্বপ্নের বীজ ক্রমে অঙ্কুরিত হয়ে উঠল।

জমিদার-সরকারের মোকদ্দমা উপলক্ষে যখনি তার সহরে যাওয়ার সুযোগ ঘটত, প্রায়ই সে হাকিম বানাবার কারখানা, স্কুল, কলেজ, বোর্ডিংগুলি বাইরে থেকে হলেও একবার দেখে আসত;—বোর্ডিং-এ ছেলেরা পরিষ্কার ধব ধবে বিছানায় শোয়, তুর্কী টুপী মাথায় দিয়ে, এক বোঝা বই বগলে চেপে ছাতি ধরে জুতা মচ্ মচ্ কর্‌তে কর্‌তে স্কুলে কলেজে যায়,—দেখে তার মনের ভিতর স্বপ্নের পাখী পাখা ঝাপটাতে থাকে।

ক্লাসের দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইংরেজী বক্তৃতার তুফানে কতবার সে হতভম্ব হয়ে গেছে।—দারওয়ান বেটার জন্যে শুন্‌তেও পারা যায়

না, সে বেটা আবার ক্লাসের দরজায় দাঁড়াতে দেয় না। তবুও সে সাহস করে দারওয়ানকে জিজ্ঞাসা করে—'কত মায়না পায়'। 'তোর কি বেটা' বলে দারওয়ান ও মারমুখো হয়ে ওঠে। মুখ কাঁচু মাচু করে বার কয়েক বাবু সম্বোধন করে বিনীতভাবে বলে—আমার ছেলেও পড়বে...। বলে মনে মনে তার সঙ্কোচ ও লজ্জার অন্ত থাকে না। দারওয়ান একটু নরম হয়ে বলে—পাঁচশ', সাতশ', হাজার। পথ চল্‌তে চল্‌তে আবদুল্লা ভাবে, পাঁচশ', হাজার না হলে কি ইংরেজীর এমন তুফান ছোটে, এ রকম না হলে কি হাকিম তৈয়ার হয়?

তিন টাকার হেডপণ্ডিত ও পাঁচ টাকার মাথা-মাষ্টার দিয়ে মুন্সেফ তৈয়ারী আর হয় না। নিরীহ গ্রাম্য পাঠশালার উপর অহেতুক তার ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য জমে ওঠে এবং মন তার কাছারীর এজলাসে এজলাসে ঘুরে বেড়ায় আর সেখানে স্বপ্নের পর স্বপ্নের, স্বর্গের পর স্বর্গের ভাঙ্গা-গড়া চল্‌তে থাকে।

পুরাতন ছাতাখানা বগলের নীচে দাবিয়ে দলিল ভারাক্রান্ত দুই বৃহৎ জেব দুলাতে দুলাতে আবদুল্লা যখন ঘরে পৌঁছে তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। হাত মুখ ধোয়ার আগে এক কল্‌কে তামাক তার শেষ করতেই হয়। ফাতেমা সন্ধ্যার আগে থেকেই বারান্দায় পানি ভরা লোটা, বসবার একটী মোড়া, মোড়ার উপর একখানি পাখা, আর কল্কেতে তামাক দিয়ে পাশে হুঁকাটী রেখে দেয়। আবদুল্লা আস্‌তেই ফাতেমা হাত থেকে ছাতা ও গা থেকে কোর্ত্তাটী খুলে নিয়ে ঘরের ভিতর রেখে আসে, এবং কল্কেতে আগুন দিয়ে নিজে পাশে দাড়িয়ে পাখা করতে থাকে।

আবদুল্লা উঠানে ঢুকেই চেঁচিয়ে ওঠে—হা-কি-ম—ছেলের নাম হাকিম নয়, তবুও আবদুল্লা তাকে হাকিম বলেই ডাকে। ছেলের নামের সঙ্গে হাকিম শব্দের কোন রকমের সামঞ্জস্যও নেই, তবুও তার মনের সাধ তাকে হাকিম ডাকবেই। ছেলের নাম সীকান্দর আলমগীর, আবদুল্লা হয়ত ভেবেছিল ছোট খাট নাম মানুষকে ক্ষুদ্রতার দিকেই নিয়ে যায়, তাই নামের জোরে দিগ্বিজয়ের বাসনা হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

দুই বড় বড় বিশ্ববিজয়ী নাম যুক্ত করেও যেন তার সাধ মেটেনি, ছেলেকে যখন তখন হাকিম ডাক্‌তে ডাক্‌তে এখন হাকিম ছেলের ডাক-নামে পরিণত হয়েছে।

ছেলেকে কোলে নিয়ে আস্তে আস্তে হুঁকা টান্‌তে টান্‌তে আবদুল্লা ছেলেকে শুধায়—হারে সাহেবের পুত, মুন্সেফ হবি না ডেপুটি? বলে উপুড় হয়ে একটি চুমু খায় ছেলের মুখে। আবদুল্লার ছেলে তখন গালের ভিতর লজেঞ্জুস চোষার কাজে রসনা আর গালেটের প্রতিযোগিতায় রত; কাজেই তখন তার উত্তরও হয় বড় সংক্ষিপ্ত হুঁ, হাঁ পর্য্যন্তই। তারপর হাকিম তৈয়ারীর কারখানা সম্বন্ধে গল্প করতে গিয়ে সে এক রকম বক্তৃতার তুফানই ছুটিয়ে দেয়।—ফাতেমা,—নিরীহ, অজ্ঞ, পাড়াগাঁয়ের বঙ্গ-ললনা কি বোঝে হাকিমী, কি বোঝে প্রফেসর, নিবিড় বিস্ময়ে নির্বাক মুখে শুনে যায়। এত বড় নীরব সহজ বিশ্বাসী শ্রোতা পেলে মরা মানুষেরও প্রেরণা আসার কথা।

সীকান্দর আলমগীরের বাল্য-কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনার দরকার দেখি না—তাতে অপরূপত্ব কিছুই নেই, তবে তাকে এটুকু প্রশংসা দেওয়া যায় যে, সে মা-বাপের অত্যধিক স্নেহ সোহাগেও বয়ে যাওয়ার লক্ষণ প্রকাশ করেনি। গোড়া থেকেই সে পড়াশুনায় বেশ মজবুৎ বুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছিল।

আবদুল্লা ভিতরে ভিতরে ছেলের জন্য যত দুর্বলতাই পোষণ করুক না কেন, কিন্তু পড়ার বেলায় সেও খাঁটি হাকিমের বাবার পরিচয় দিতে লাগল। সীকান্দর আলমগীরের পক্ষে পড়াশোনায় এদিক ওদিক করার কোন সুযোগ ছিল না। মামার বাড়ী, ফুফুর বাড়ী যাওয়া তার বন্ধ হল—এমন কি খেলার সময় ও ঘুমের সময় সঙ্কুচিত হতে হতে প্রয়োজনের দুই তীরকেও প্রায় গ্রাস করার উপক্রম করে তুল্ল।

সহরে বোর্ডিং-এ রেখে তার পড়ার বন্দোবস্ত যখন হল, সেখানেও সে বেশ মেধার পরিচয় দিতে লাগল। হাকিম হলে মুঠোয় মুঠোয় টাকা আসে বটে, কিন্তু বোর্ডিং-এ থেকে হাকিমীর জন্য তৈয়ার হতে মুঠোয় মুঠোয় টাকা ব্যয়ও করতে হয়। তাই বছরেরর প বছর আবদুল্লার

পৈতৃক সম্পত্তি বিঘার পর বিঘা মহাজনের হস্তগত হতে লাগল। নিজে খালি পায়ে চলে মোটা ভাত মোটা কাপড়ে দিন গুজরান করা যায় বটে, কিন্তু যে ছেলে ভবিষ্যতে হাকিম হয়ে এজলাস অলঙ্কৃত করবে, তাকে ত আর খালি পায়ে রাখা যায় না। ভবিষ্যতে যিনি লোকের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হবেন তাঁর আহার বিহারে একটু চাকচিক্য চাই বই কি।

সীকান্দর আলমগীর যখন বন্ধে ফেজ টুপীর লেজ উড়িয়ে জুতা মচ্ মচ্ করে দেশে আসত, পাড়াপড়শীরা অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাক্‌ত, আর এই ভেবে তাদের মনের ভিতর হাহাকারের অন্ত থাকত না যে এ ছেলের হাকিম হওয়া একেবারেই অবিসংবাদিত, ঠেকানোর কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে তাদের নিরাশা, দুঃখ, বুকের ভিতর একেবারে দাবানল হয়ে উঠত। অনেকে মুখ ফুটেই বলত—মজুমদারদের জমিদারী লুট হচ্ছে, সেই লুটের টাকায় এ বাবুগিরী আর হাকিম তৈয়ারী! মজুমদারেরা জানুক বা না জানুক, এ লুট সম্বন্ধে পাড়াপড়শীরা এক রকম নিঃসন্দেহ। এ সম্বন্ধে আসল ব্যাপার কিন্তু তার বিপরীত। সীকান্দর আলমগীরের জন্মের আগ্ পর্য্যন্ত আবদুল্লা কিছু কিছু উপরি পাওনা নিত বটে, কিন্তু সীকান্দরের জন্মের পর, তাবিজ মাদুলীর জোরেই হউক বা যে কারণেই হউক সে যখন বাঁচবার লক্ষণ জাহির করলে, সেই থেকে আবদুল্লা মাইনা ছাড়া কোন প্রকারের উপরি পাওনাই গ্রহণ ছেড়ে দিয়েছে। কারণ তার পীর সাহেবের ছেলে মৌলবী কুদরৎ সাহেব নাকি বলেছেন ঘুষ ও উপরি পাওনা খেলে রুজী এবং হায়াৎ কমে যায় এবং সংসারে কোন কাজেই বরকৎ থাকে না, সেই থেকে আবদুল্লা একমাত্র দশ টাকা মাইনা ও মহাজন সম্বল করেই দিন কাটাচ্ছে। ঘুষে হয়ত বরকৎ কমে যায় সত্য, কিন্তু মহাজনের টাকায় বরকৎ ছাড়িয়ে রুজীর আসল ধরেই যে টান দেয় সে খবর হয়ত তাকে কোন মৌলবী আজও দেয়নি। কাজেই ছেলে হাকিমীর প্রথম সিঁড়ি ডিঙাতেই মহাজনের দেনা তার ভিটাবাড়ীর উদ্দেশ্যে সর্বগ্রাসী লোলুপ হস্ত প্রসারিত করে বসেছে। তবুও ভরসা এই যে ছেলের চাকুরী হলে এসব শুধতে আর কয়দিন!

ছুটীতে ছেলে বাড়ী এলে মহাজনের সুদ, নালিশ, ডিগ্রী, ক্রোক, কোথায় সব উধাও হয়ে যায়;—আমার ডিপ্‌টী সাব এসেছে বলতে বলতে যে নির্মল অনাবিল হাসি তার সারা মুখমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে, দেখলে মনে হয় না তাতে কোন সংশয়, অভাববোধ ও দুঃখ আছে। পুত্রের আগমনে ফাতেমা ও আবদুল্লার সব ব্যথা, বেদনা, দুঃখ অভাব অন্তরতলে চাপা পড়ে যায়। একটু ভাল খাওয়া দাওয়া, কিছু দুধ-কলা ও মুরগীর আয়োজন কোন প্রকারে আবদুল্লা করে ফেলে। ফাতেমার সারা বছরের পরিশ্রম ও আদরে পালিত মুরগীগুলি একটির পর একটি আবদুল্লার ছুরির নীচে ঘাড় পেতে দিতে বাধ্য হয়।

সীকান্দর আলমগীরও এরই মধ্যে তার ভবিষ্যৎ হাকিমী জীবনের পরিচয় দিতে শুরু করেছে—ভবিষ্যতে সে যে হাকিম হবে এ বিষয়ে সেও যেন একরকম নিঃসন্দেহ। নীচের ক্লাসে পড়বার সময় থেকে সে যখন ছুটী ছাটায় বাড়ী আসত, পাড়ার ছোট ছেলেমেয়েদের যোগাড় করে তাদের ছোট্ট দেউরী ঘরকে আদালতে পরিণত করে তুলত। ভাঙ্গা একখানি টেবিল সামনে নিয়ে চেয়ারের অভাবে একখানি পা-ভাঙ্গা টুলকে বেড়ার সঙ্গে লাগিয়ে আলমগীর তাতে বেশ জাঁকালভাবে বসে এজলাসের অভাব সহজে দূর করে হাকিমী করতে থাকত। অন্যান্য ছেলেমেয়েরা কেউ আসামী, কেউ ফরিয়াদী, কেউ উকিল-মোক্তার, কেউ চাপরাশী কেউ পেশকার। সহরে-পড়া লালটুপী মাথায় আলমগীরকে কেউ কোন দিন বিচারকের আসন থেকে বেদখল করতে পারেনি। পরিষ্কার ধবধবে কাপড় পরা, টেরী কাটা, জুতা মচ্‌ মচ্‌কারী ছেলের হাকিমী করা সম্বন্ধে প্রশ্ন করার সাহস পাড়াগাঁয়ের ময়লা ছেলেদের না হওয়াই ত স্বাভাবিক। এজলাসকে খাঁটি এজলাস করে তোলার জন্যে, হাকিমের মাথার উপর একখানা চাটাই-ভাঙ্গা বীমের সঙ্গে টাঙ্গিয়ে লম্বা রশি বেঁধে বাইরে এক জনকে টান্‌তে দেওয়া হত। বাতাস লাগুক বা না লাগুক টানা একটু ক্ষান্ত হলেই কিন্তু হাকিমের আর মেজাজের ঠিক থাকত না। গম্ভীর কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠত—এ পাঙ্খাওয়ালা, টানো।

হাকিমের গর্জ্জন যখন পাঙ্খাওয়ালার উপর ঘন ঘন চড় চাপড় হয়ে বর্ষণের পর্য্যায়ে গিয়ে পৌঁছল, তখন কাকেও আর সেই অভিনব

সম্মানের কাজে রাজী করা গেল না। অগত্যা নিরীহ দারওয়ান বেচারী রাবেয়াকেই দাদার ফরমাস পালন করতে হ'ত—হাকিমের হুকুম পালন না করে তার পক্ষে উপায় ছিল না! সহর-ফেরৎ টেরী, চেইন, আঙটিতে ঝক্‌মক্‌কারী এ বিরাট দাদার হুকুম মত দাদার হাকিমী অগত্যা তাকেই বজায় রাখতে হল। রাবেয়া আলমগীরের ছোট বোন, আবদুল্লা ও ফাতেমার শেষ সন্তান—হয়ত আলমগীরের দেখাদেখি, তবে বিনা তাবিজ ও মাদুলীতেই আজ পর্য্যন্ত সেও বেঁচে আছে। ভবিষ্যত হাকিমের ভগ্নী হয়ে জন্মগ্রহণ করাতে সে কিন্তু মা-বাপের ষোল আনা স্নেহ হতে বঞ্চিত। তবুও সে বড্ড মায়ের আঁচলঘেঁষা। তাকে নিয়ে ফাতেমার দুঃখ ও ব্যথার অন্ত নেই,—ছোট হলেও মায়ের চিরন্তন সাধ মেয়েকে কাপড় চোপড়ে, গহণা অলঙ্কারে মনোমত করে সাজিয়ে সাধ ফরমান পুরাবেন। কিন্তু আলমগীরের পড়ার খরচ যোগাতে সে শুধু নিজের গহণাপত্র শেষ করেনি, বছরে দু'চারটি হাঁস মুরগী ও ডিম বিক্রী করে যে দু'চার পয়সা জমিয়ে রাখবে তারও উপায় নেই—ছেলের টাকার দরকার খবর আসতেই আবদুল্লার ম্লান মুখের দিকে চেয়ে ফাতেমা নিজের সর্বস্ব উজাড় করে না দিয়ে থাকতে পারে না। তাই আজও সে মেয়ের হাতে কানে একখানি অলঙ্কারও দিতে পারেনি। এ যে কত বড় দুঃখ এ মেয়ের মা ছাড়া আর কে বুঝবে।

আলমগীর কখনো আসামীকে কখনো ফরিয়াদীকে, কখনো উকিল মোক্তারকে ধমক দিয়ে নিজের হাকিমী জাহির করতে থাকে, আর বেচারী রাবেয়া হতভম্ব হয়ে দাদার হাকিমী মাথার উপর পাখা টান্‌তে টান্‌তে নিজকে ক্লান্ত ও ক্ষুদ্র হাতদু'খানাকে অবশ করে তোলে। একটু জিরোবার উপায় নেই, জিরোলে দাদার হাকিমী সঙ্গে সঙ্গেই বোমার মত সশব্দে তার পিঠের উপর ফেটে পড়ে।

রাবেয়ার বয়স বছর সাত আটেক তক্‌ হতে পারে, গোলগাল মুখখানি শিশুসারল্যের মূর্তিমতী প্রকাশ। পিতার উচচ নাসিকার দুপাশে মায়ের দীর্ঘ আয়ত নেত্র দু'টি সে উত্তরাধিকার সূত্রেই পেয়েছে। মাথার চুলগুলি রুক্ষ, শুষ্ক, বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে উড়ে ফির্‌ছে—তেলে চুলে সাক্ষাৎ কবে হয়েছে কে জানে। রাবেয়ার কাছে তার দাদাটি এক

প্রহেলিকা বিশেষ। জুতায় মোজায়, টেরি ও কাপড়ে এমন ফিট্‌ফাট্‌ কারও দাদা সে কোনদিন দেখেনি। সব সময় দাদার দিকে সে হতভম্ব হয়ে চেয়ে থাকে—দাদা, ডেকে কথা বল্‌তে সাহসে কুলায় না।

যেদিন আবদুল্লা বাড়ীতে থাকে, সেও আড়াল থেকে উঁকি মেরে ছেলের এ হাকিমী-অভিনয় শুনে ও দেখে, মাঝে মাঝে ফাতেমাকে ডেকে এনে দেখায়; উভয়ের বুকে খুশী আর ধরে না। আবদুল্লা ছেলের হাকিমী অভিনয় দেখতে দেখতে কল্পনার পুষ্পক রথে চড়ে বাস্তব আদালতের এজলাসেও একবার ঘুরে আসে এবং হুঁকা টান্‌তে টান্‌তে ফাতেমার কাছে কবে কোন রাখাল বালক, বাল্যে এরকম বিচার নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে তার ভবিষ্যতে রাজা হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ করেছিল হাস্‌তে হাস্‌তে সে গল্প বল্‌তে থাকে। খুশী, হাসিতে অভাব ও সমস্ত দুঃখের স্মৃতি নিমেষে মুছে যায় উভয়ের মন থেকে।

ছেলের কলেজের ভর্তি হবার সময় একসঙ্গে অনেক টাকার দরকার পড়েছিল। সে সময় আবদুল্লা যে বিপদে পড়েছিল তা আর বলে বুঝাবার নয়। দ্বিগুণ, তিনগুণ সুদ দিতে স্বীকার করেও কোথাও টাকা পাওয়া গেল না—ভিটাবাড়ী ছাড়া অন্য কোন জমি আর অবশিষ্ট নেই যে বিক্রী করে বা বন্ধক রাখে। কি করে,—আবদুল্লা উন্মত্তের মত দেশের এ প্রান্ত থেকে ঐ প্রান্ত পর্য্যন্ত জানা অজানা কত মহাজনের কাছে ধন্না দিলে কিন্তু কোন ফল হল না। শেষকালে অনন্যোপায় হয়ে ভিটেবাড়ীর দলিলপত্র নিয়ে তাকে পল্লীবাসীর অগতির গতি সাহাদের দুয়ারে হাত পেতে দাঁড়াতে হল। সে দাগী খাতক অর্থাৎ কারও কর্জ্জ সে কিস্তিমত দিতে পারেনি। সকলকে নালিশ দরবার করে, ডিক্রী করিয়ে জায়গাজমি বিক্রী করে টাকা উসুল করতে হয়েছে। কাজেই হৃষীকেশ বাবুকে রাজী করাতে বিস্তর সাধ্যসাধনা বহু কান্নাকাটি ও বারংবার হাতে পায়ে ধরতে হয়েছে, আলমগীরকে নিয়ে একেবারে হৃষীকেশ বাবুর হাতে 'আপনার গোলাম'—বলে, সোপর্দ্দ করে দিলে। তিনিও দেখে খুশী হলেন যে ছেলেটির আপাদমস্তকে মুসলমানীর লক্ষণ কোথাও নেই, এ যেন তাদের বাড়ীর ছেলে। হিন্দুর

ছেলের মত আবদুল্লার এ ছেলেটিকে দেখে গোঁড়া হৃষীকেশ বাবুর মনটা সত্যিই অনেকখানি নরম হয়ে এল। অনেক হাঁ না করার পর অগত্যা তিনি রাজী হলেন। তবে সে রাজী গলাকাটার নামান্তর মাত্র, কাবুলী হারে সুদ ত দিতে হবেই এবং তিন বছরের মধ্যে সমস্ত টাকা মায় সুদে আসলে শোধ দিতে না পারলে ভিটেমাটি মহাজনের দখলে ছেড়ে দিতে হবে। এ ছাড়া হৃষীকেশ বাবু আর এক অভিনব দলিল দাবী করে বসলেন--

আবদুল্লাকে তিনি বল্লেন—এ ছাড়া তোমাকে আর এক দলিলে দস্তখৎ দিতে হবে। আবদুল্লা বিণীতভাবে জানালো কর্ত্তার যা হুকুম।

তারপর হৃষীকেশ বাবু ধীরে ধীরে বল্লেন—আর একটা আলাদা দলিলে তোমাকে লিখে দিতে হবে, ভবিষ্যতে তুমি বা তোমার বংশধরগণ কোনদিন গো-কোরবানী করবে না, মস্‌জিদের সামনে দিয়ে বাজনা বাজিয়ে যেতে কোনদিন মিছিলকে বাধা দিবে না এবং ভবিষ্যতে তুমি ও তোমার বংশধরগণ ভোটের সময় আমি ও আমার বংশধরগণের কথা মত ভোট দেবে। শুনে আবদুল্লার মুখ দিয়ে কিছুক্ষণ কথাই সরল না। সে চুপ করে ভাবতে লাগল। হৃষীকেশ বাবু ফের বল্লেন—এ দলিল না দিলে, আমি টাকা দিতে পারব না, তুমি অন্যত্র দেখ। বলে, তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আবদুল্লা কুল থেকে আবার যেন ডুব-জলে পড়ে গেল। সে হতাশ হয়ে বলে উঠল—কর্ত্তার হুকুম কি আমি কখনও অমান্য করেছি? ঢোক গিলে, চারদিক একবার চেয়ে নিয়ে বল্লে তবে হুজুর পাড়ায় যেন এ সংবাদ কেউ না জানে। কর্ত্তা বলে উঠলেন বেশ তাই হবে; এ দলিলে তোমাদের বাপ বেটা দু'জনকেই কিন্তু দস্তখৎ দিতে হবে। পাছে তার পুত্রের হাকিমীর দরজা চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যায় এ ভয়ে কোন আপত্তি উত্থাপন করতে আবদুল্লার আর সাহসই হল না।

দলিল সম্পাদন করে বিদায়ের সময় হৃষীকেশ বাবু হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন—আবদুল, এ দলিলের কথা তুমিও কাকে কিছু বল না, তোমার ত কিছু ভয় নেই আর, এ ত রেজেষ্ট্রি হয়নি, এ শুধু আমরা হিন্দু

মুসলমান দু'ভাই একটু ভয়ে ভয়ে থাকার জন্যেই নিলাম। কর্ত্তার এ অহেতুক ভ্রাতৃত্ব ও অভয়বাণী সত্ত্বেও আবদুল্লার ভয় কিন্তু মনের ভিতর রয়েই গেল।

এত কষ্ট ও অর্থ ব্যয়ের এখনো এটুকু সান্ত্বনা যে, হাকিমীর দিকে আলমগীরের গতি কোথাও আটকাচ্ছে না; বছরের পর বছর সে পাশ করে যাচ্ছে। পড়া সম্বন্ধে সহরময় তার নাম পড়ে গেছে—ছাত্রমহলে গুজব, পরীক্ষার সময় সে কোনদিন রাত্রে ঘুমোয় না। এমন কি আই. এ. পরীক্ষার সময়ে সে নাকি রাত্রে খেয়ে পড়ায় বসত আর পরদিন ভোরে খাওয়ার আগে উঠে স্নানাহার করে পরীক্ষার হলে গিয়ে হাজীর হ'ত। মাথার তালুর উপর কিছুটা চুল সে কেটে নিয়েছিল এবং পরীক্ষার হলে যাবার সময় সে-স্থানটায় ছটাক পরিমাণ মাখন বেশ করে বসিয়ে নিত। শেষদিন কিন্তু মাথার উপর মাখন থাকা সত্ত্বেও, পরীক্ষার হল থেকে বেরোবার সময় মাথা ঘুরে একদম ফিট হয়ে সে পড়ে গিয়েছিল। যাক্ তবুও সান্ত্বনা এ যে সে হাকিমীর দিকে আর এক ধাপ অগ্রসর হল।

এবার বি.এ. কাজেই পরিশ্রমের মাত্রাকে এবার আরও বাড়াতে হল—ফলে দিনকে রাত, রাতকে দিন করতেই হল। বন্ধে কোন সময় বাড়ী এলে তার যদি জাগতে কিছুমাত্র দেরী হয়ে যেত, আবদুল্লা নিজেই উঠে এসে রাত দু'টা তিনটায় আলমগীরকে জাগিয়ে দিত— বাবা, ডিপ্‌টি মিঞা, ওঠ, কিছু পড়' বলে নিজেই মশারিটা খুলে নিয়ে নিজেই হ্যারিক্যানটা জালিয়ে দিত। আবদুল্লা, যারা ডিপুটি ও হাকিম হয়েছে তাদের পাঠ্য-জীবন সম্বন্ধে বহু অলৌকিক গল্প শুনেছে, কোন্ ডেপুটি চোখে সরিষার তৈল দিয়ে রাত জেগে পড়ত; কোন্ মুন্সেফ বাড়ীর চিঠি না পড়ে বাক্সে বন্ধ করে রাখত এবং পরীক্ষা যেদিন শেষ হত সেদিন সব খুলে পড়ত, এরি মধ্যে হয়ত মা মরে গেছেন, পিতা একটি সৎমা আম্‌দানী করেছেন, ভাইয়ের অসুখ হয়েছে আরও কত কি ওলট পালট। হাকিমী পথের এসব কঠোর তপস্যার কাহিনী আবদুল্লা আরও অলঙ্কার দিয়ে ও সবিস্তারে ছেলের কাছে বয়ান করত। ছেলে

বুঝেছিল হাকিম তাকে হতেই হবে—সে হতে গেলে আহার নিদ্রার কথা ভাবলে চল্‌বে না। কাজেই সেও এবার আরও দ্বিগুণ উৎসাহে শুরু করলো পড়াশোনা।

ছেলে বি. এ. ক্লাসে ওঠার পর খরচও বেড়ে গেল বই কি। আবদুল্লাও অন্তহীন ভাবনায় পড়ে গেল, ধার হাওলাৎ কর্জ্জ তার মাথায় এসে ঠেকেছে। নিজের আজীবনের অভ্যাস ও সখের জিনিস তামাক, হয়ত দু'চার পয়সা বাঁচতে পারে ভরসায় তাও ছেলে থাড্‌ ইয়ারে ওঠার পর সে ছেড়ে দিলে। ওদিকে হাকিম হওয়ার পথের পথিক ছেলে প্রায় পথের প্রান্তে এসে পৌঁচেছে, একেবারে হাকিমীর সদর দরজায় বল্‌তে হয়—এখন বিড়ি কিছুতেই মানায় না, কাজেই পিতার তামাক ত্যাগের উদ্‌বৃত্ত পয়সা দিয়ে তাকে ধরতে হল সিগারেট।

পড়ার ছাপ মরার ছাপের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। পরীক্ষার মাত্র মাস ছ'য়েক বাকী—রাত দিন বিচার কর্‌লে হাকিমী ফস্‌কে যাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। যে হাকিমীর জন্য তার বাবা সর্বস্ব ত্যাগ করে আজ ভিখিরী হওয়ার পথে এসে পৌঁচেছে, তা ফস্‌কালে তার আর মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না, তার বাবার পৃথিবীতে দাঁড়াবার স্থান থাকবে না। কাজেই সমস্ত অবসাদ ও জড়তাকে ঝেড়ে ফেলে সে নূতন উদ্যম ও উৎসাহে আবার বই নিয়ে বসে। এবং সঙ্গে সঙ্গে হাকিম হওয়ার যাবতীয় লক্ষণ সে প্রকাশ করতে লাগল, চোখে ঘন ঘন সরিষার তৈল ঢেলে পড়ার শত্রু ঘুমকে সে তাড়ালে। তার পিতার বর্ণিত প্রাতঃস্মরণীয় হাকিমদের মত শুধু যে চোখকে ঘুম থেকে বঞ্চিত করল তা নয়, নিয়ম মত স্নানাহারও ছেড়ে দিলে, পিঠকে শয্যা থেকে, মাথাকে উপাধান থেকে বঞ্চিত রাখলে। মাথায় তিল তৈল থেকে আরম্ভ করে মহাভৃঙ্গরাজ পর্য্যন্ত দিনে রাতে কত যে ঢালা হতে লাগল তার আর ইয়ত্তা নেই। খেলাধূলাকে ত সে চিরদিন হাকিম হওয়ার পরিপন্থী মনে করে এসেছে; আগে সন্ধ্যার সময় যে এক আধটু বেড়াতে বেরোত তাও এখন ছেড়ে দিলে। তার সঙ্গী বন্ধু-বান্ধবেরা তার সীটের পার্শ্ব দিয়ে চলবার সময় পাছে চোখে চোখ পড়লে বসে পড়ে আলাপ সালাপ জুড়ে দেয় সে ভয়ে সে পড়ুক বা না পড়ুক ওদের দেখামাত্র অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়—বই বন্ধ থাক্‌লে তাড়াতাড়ি

খোলা আরম্ভ করে, খোলা থাক্‌লে পড়া শুরু করে দেয়। তবুও নেহাৎ কেউ যদি বসে পড়ে, তা হ'লে সে এমনি মেজাজ করে উঠে যে, সম্মানহানি না করে সেখানে কারও পক্ষে বসে থাকা সম্ভব নয়। এই জন্যে কত জনের সঙ্গে যে তার হাতাহাতির উপক্রম হয়েছে তা আর এখানে বলে লাভ নেই। বাংলাদেশের মেয়েরা বলে থাকেন—পড়ার মত গরম আর কিছুই নেই, মনে হয় মেয়েলোকের মুখের কথা হলেও কথাটাতে কিছু সত্য আছে। যতই দিন যেতে লাগল, আলমগীরের মেজাজও এত খিটখিটে হয়ে উঠল যে তার সঙ্গে কথা বলাই দায়। সেদিন ত বোর্ডিং-এর বাবুর্চি, তার দেরী দেখে ভাত খেতে ডাকতে এসে একেবারে বেকুব বনে গেল,—বেটা, ইডিয়েট, রাসকেল, বলে সে চটিজুতা নিয়ে লাফিয়ে উঠে যে মেজাজ দেখাল তেমন মেজাজ হাকিম দূরে থাক্‌ পুলিশের দারোগারাও করে না। বাবুর্চি ত প্রাণ নিয়ে পালিয়ে কোন প্রকারে দেহরক্ষা করল বটে কিন্তু তার কণ্ঠস্বর বাবুর্চির পিছনে বার্কের Impeachment of Warren Hastings-এর পৃষ্ঠা তিনেক শেষ না করে আর থামলই না।

সেদিন সহরে যাবার সময় আবদুল্লা তার মায়নার টাকা দশটির জন্য জমিদার সরকারে খুব ধন্না দিয়ে এসেছে। টাকা ত পাওয়া গেলই না। বরং কর্ত্তার কিছু গরম কথা কানে করে নিয়ে আস্‌তে হয়েছে। দাখিলার বাণ্ডেল নিয়ে খাঁ খাঁ রৌদ্রের মধ্যে প্রজাদের বাড়ী বাড়ী নিষ্ফল ঘোরা ঘুরে ঘুরে একেবারে হয়রাণ পেরেশান হয়ে বাড়ী ফিরে দাওয়ার উপর মাথায় হাত দিয়ে সে বসে পড়ল। ফাতেমার পক্ষে স্বামীর চেহারা দেখে ব্যাপার বুঝে নিতে দেরী হল না, তবুও পাখা নাড়তে নাড়তে জিজ্ঞাসা করল—কিছুই পাওয়া গেল না বুঝি?

আবদুল্লার মাথার ঘাম কাঁচা পাকা দাড়ি বেয়ে টপ্‌ টপ্‌ করে ঝরে পড়তে লাগল। বল্লে—সেবার আসবার সময় আলম একটা ফাউণ্টেন-পেনের কথা বলেছিল, কালী-ভরা কলম আর কি, লেখবার সময় ঐগুলি বার বার দোওয়াতে ডুবাতে হয় না, পরীক্ষার সময় নাকি খুব সুবিধা। অভাবীর চোখ ফিরে ফিরে শূন্য ভাণ্ডারের দিকেই তাকায়, হতাশাবিহ্বল আবদুল্লার দুই চোখও আজ ফাতেমার শীর্ণ হাত দুখানির উপরই যেন

বার বার লুটিয়ে পড়তে চায়। কিন্তু মুখ ফুটে বলবার মুখ ত তার নেই। স্বামীর চক্ষু অনুসরণ করে ফাতেমার পক্ষে স্বামীর মন বুঝে নেওয়া কিছুমাত্র কষ্টকর নয়। ফাতেমার দু'হাতে দু'খানা চুড়ি এখনও তাদের একক জীবনের শূন্যতা নিয়ে বিরাজ করছে। ঘরে ঢুকে দু' হাতে দু'গাছি কাল সূতা বেঁধে নিয়ে সে কোন প্রকারে তার হাত দু' খানির নারীত্ব রক্ষা করল, তারপর একখানি কাগজে মুড়ে চুড়ি দু'খানি অর্থাৎ নিঃস্বের শেষ সম্বল—আবদুল্লার হাতে গুঁজে দিলে। কাগজের মোড়কটী হাতে নিয়ে ফাতেমার হাতের দিকে চোখ পড়তেই আবদুল্লার চোখে জল টলটলায়মান হয়ে উঠল, তাকে সেখান থেকে উঠতেই হল, না হয় এখনি হয়ত চোখের জল টপ্ টপ্ করে ফাতেমার সামনেই গড়িয়ে পড়বে।

পূর্বে সহরে গেলে যে সব বোর্ডিং ও কলেজে সে অনাবশ্যক ঘুরা ফেরা করত, আলমগীরের সহরে যাওয়ার পর আবশ্যক সত্ত্বেও এবং ফাতেমা অনুরোধ করেও তাকে সেখানে আর নিতে পারে নি। সে ভাবে হাজার হউক সেখানে ছেলে আছে, সেখানে গিয়ে দেখা দিয়ে ছেলেকে তার সঙ্গীদের কাছে খামাখা লজ্জা দিয়ে কি লাভ। তার যে রকম ছেঁড়া ও ময়লা কাপড়, না আছে পায়ে এক জোড়া জুতা, না আছে মাথায় একটী ভাল টুপী, ছেলে কি করে পরিচয় দেয়? কবে কোন্ এক আহাম্মক বাপ এরকম ভাবে বোর্ডিং-এ ছেলের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে, ছেলেকে সঙ্গীদের প্রশ্নের উত্তরে চাকর বলে পরিচয় দিতে বাধ্য করেছিল, বোর্ডিং-এ ছেলেকে দেখতে যাওয়ার কথা মনে হলেই ঐ আহাম্মক বাপের শোচনীয় দৃশ্য তার চোখের সাম্‌নে ভেসে ওঠে। সেই লজ্জাবনত ছেলেটির পক্ষ হয়ে সে মনে মনে খানিকটা তর্কও করে নেয়,—ছেলের দোষ কি? সে বুড়ো আহাম্মক, ময়লা টুপী ছেঁড়া জামা আর হাঁটুর উপর কাপড় পরে সেখানে গেল কোন্ আক্কেলে? ইত্যাদি। কাজেই আলমগীরের সঙ্গে দেখা করার জন্যে সে কখনো বোর্ডিং-এ বা কলেজে যেত না। কলেজ ও বোর্ডিং-এর মাঝামাঝি পথে কোথাও অপেক্ষা করত, কলেজে যেতে বা ফির্‌তে এভাবে পথে পিতা-পুত্রে দেখা হত। প্রায়ই বৃদ্ধ ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে দীঘির পাড়ে দু'চোখ

বিস্ফারিত করে বসে থাকত, পিতা-পুত্রে চোখো-চোখী হ'তেই আবদুল্লার চোখে মুখে আনন্দের দীপ্তি খেলে যেত, আলমগীর সঙ্গীদের থেকে পাশ কাটিয়ে এসে দাঁড়াত। কোন সময় কোন সঙ্গী জিজ্ঞাসা করলে, হয়ত উত্তর না দিয়েই চলে যেতে হত অথবা বাধ্য হয়ে বলে ফেলত—বাড়ীর লোক।

এমনি করে একদিন সেই দীঘির পাড়ে বহু উদ্বেগ অপেক্ষার পর আবদুল্লা পুত্রকে ফাউণ্টেনপেন কেনার টাকাও দিয়ে এল।

পরীক্ষার আর বেশী দেরী নেই, কাজেই এগারটায় হোষ্টেলের ইলেকট্রিক লাইট্ নিবতে না নিবতেই আলমগীরের হ্যারিকেন জ্বলে উঠে প্রায় রাত্রি ভোর হওয়ার আগে আর নিবেই না। হাকিমীর রথ দিনরাত ধরেই গড় গড় করে চল্‌তে লাগল। আলমগীর যে হাকিমের নীচে কিছু হচ্ছে না, এ সংবাদ কি করে হোষ্টেলেও প্রচারিত হয়ে পড়েছিল। কাজেই সঙ্গীদের কেউ কেউ এ নিয়ে ঠাট্টা করতেও ছাড়ত না। কিন্তু যে দিন তাদের হোষ্টেল সুপারিনটেণ্টডেণ্ট অধ্যাপক জাফর পর্য্যন্ত এ ধরণের একটা বিদ্রূপ নিক্ষেপ করলে, সেদিন তার আর সহ্য হল না। মুখ ফুটে কিছু বল্লে না বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে জ্বলে পুড়ে খাক হ'তে লাগল। রোজকার মত বই সাম্‌নে খুলে বসেছিল বটে কিন্তু আজ কিছুতেই সে মনকে বইতে আটকে রাখতে পার্‌লে না। জাফর সাহেবের বিদ্রূপ অগ্নিশলাকার মত তখনো তার মাথার ভিতর জ্বল্‌ছিল। মনের ভিতরে আপনা আপ্‌নি সঙ্কল্প জাগল, অন্তরের অন্তর-তলে উচ্চারিত হল—না, হাকিম তাকে হতেই হবে, ব'লে আর এক কোষ সরিষার তৈল চোখে ঢেলে দিয়ে মনোযোগ রাখার জন্যে সে এবার উচ্চঃস্বরেই পড়া আরম্ভ করে দিলে।

যা লিখছি শুধু তাই ঘট্‌ছে মনে করার কোন কারণ নেই। ছাত্রাবাসে বিচিত্র প্রর্কৃতির, বিভিন্ন মেজাজের অসংখ্য ছাত্র; দিন রাত কত কিছুই তাতে ঘট্‌ছে তার ইয়ত্তা আছে? আলমগীরের আলো কারও ঘুমের গভীরতা নষ্ট কর্‌ছে, তার পড়ার শব্দে কারও ঘুম আদৌ আস্‌ছে না, বই নিয়ে রাত দুপুরেই অনেকের সঙ্গে তার প্রায় হাতা-

হাতিই লেগে যায়। তার নোট বই কেউ কোনদিন ধরেছে ত, সেদিন হোষ্টেলের শান্তিভঙ্গ হল ভাবতেই হবে।

যাক্ ব্যাপার একদিন বড় করুণ হয়ে উঠল। সেদিন শেষ রাত্রে, তখনো ভোর হওয়ার ঢের দেরী, হঠাৎ আলমগীরের চীৎকার ও ওজস্বিনী ইংরাজী বক্তৃতার তুফানে কারও আর ঘুমিয়ে থাকার সাধ্য রইল না। কাঁচা ঘুমে বাধা পেয়ে কেউ কেউ একেবারে শোয়া থেকেই মশারির খুঁটি নিয়ে লাফিয়ে উঠল। উঠে অবস্থা দেখে, তাদের হাতের লাঠি হাতেই থ'হয়ে রইল। আলমগীর হোষ্টেলের এমাথা থেকে ওমাথা পর্য্যন্ত দৌড়োদৌড়ি কর্‌ছে, আর মুখে বার্কের বক্তৃতার খৈ ফুট্‌ছে; কিছু ঠিক নেই, বার্ক থেকে মে'কলেতে যাচ্ছে, মে'কলে থেকে সেক্সপিয়র অনর্গল বকে চলেছে। হঠাৎ টেবিলের উপর থেকে হ্যারিকেন-টাকে সশব্দে একেবারে ঘরের মেঝে ফেলে দিলে। টেবিলটাকে একাই ঠেলে তার বিছানার উপর তুলে ফেল্লে। চেয়ারটাকে বিছানার উপর বসিয়ে নিজে তার উপর বেশ আরামসে বসে একেবারে আদেশ দিয়ে বসলে--চাপরাশী আসামীকে পাকড় লাও। দারওয়ান—উপরের দিকে বার কয়েক আঙ্গুলী সঞ্চালন করে, ফের চেঁচিয়ে উঠল--পাঙ্খা খেঁচো। ছেলেরা ত কাণ্ড দেখে অবাক্। জাফর সাহেবও পাশের এক রুমে থাকেন, তিনিও দৌড়ে এলেন। জাফর সাহেবকে দেখে চট্ করে সে লাফ দিয়ে চৌকি থেকে নীচে নেমে বাইরের দিকে এক দৌড়, সঙ্গে সঙ্গে আর সকলেও তার পিছনে ছুটল,—জাফর সাহেবের ঘরের খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে প্যাগের উপর থেকে হ্যাট্ একটা তুলে নিয়ে মাথায় দিয়ে আর এক দৌড়ে একেবারে তার বিছানার উপরে চেয়ারে এসে বসে পড়ল। হ্যাট্ শুদ্ধ মাথা ঢুলাতে ঢুলাতে জাফর সাহেবের দিকে চেয়ে চেয়ে বলে উঠল—আসামী, টোমার ফাঁসীর হুকুম, জল্লাদ লে যাও। শুনে অনেকে চেষ্টা করেও হাসি চাপতে পারলে না। তারপর দেওয়াল আলমারীতে একটা প্লেট ছিল, উঠে তা নিয়ে মেঝের উপর ছুঁড়ে মারলে, প্লেট ঝন্ ঝন্ শব্দে ভেঙ্গে টুক্‌রা টুক্‌রা হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আলমগীরও হা হা করে হেসে উঠল। পরক্ষণে আবার দু'হাতে মাথার কেশ ছিঁড়তে লাগল, কেউ ধরার

আগে দেওয়ালে কপাল ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে কপাল রক্তাক্ত করে ফেল্লে।

জাফর সাহেব ডাক্তারের কাছে টেলিফোন করে দিলেন।

জিনিস পত্র তচ্ নচ্ করে ছিঁড়ে, দেওয়ালে মাথা ঠুকে হুলস্থূল কাণ্ড বাধিয়ে দিলে—কাজেই তাকে ধরে রাখতে হল। কিন্তু মুখ ত আর ধরে রাখা যায় না, Lady Macbeth-এর Soliloquy থেকে এলজেব্রার ফরমুলা পর্যন্ত তার ঠোঁটে ঠোঁটে উড়তে লাগল, Paradise Lost-এর পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা তার ঠোঁটের আগায় তুবড়ীর মত ফুটতে লাগল—এসবের মাঝে মাঝে, হে চাপরাশী, দারওয়ান, খানসামা, ষ্টুপিড, নন্‌সেন্স, পাখা টানো—ছ'মাস ফাঁসী, তিন বছর জেল—হরদম চলছে।

ডাক্তার উন্মাদের লক্ষণ বলে মত দিয়ে, কিছু ঔষধের ব্যবস্থা করে চলে গেল।

আলমগীর খুব অসুস্থ ব'লে বাড়ীতে টেলিগ্রাম করা হল।

টেলিগ্রাম পেয়ে আবদুল্লা বেঁহুসের মত হাতে নাতে বেরিয়ে পড়ল, সেদিন সারা পথ আল্লা শব্দ তার ঠোঁট ছাড়া হয়নি।

ফাতেমা পৃথিবীর বিরাট শূন্যতার উপর ভর দিয়েই যেন জোড়া গরু মানত করে বসল এবং জায়নামাজে উপুড় হ'য়ে পড়ে চোখের জলে যেন নির্মম বিধাতার অদৃশ্য দুই চরণ ভিজিয়ে দিলে।

আবদুল্লা কাঁপতে কাঁপতে হোষ্টেলে ঢুক্‌তেই, আলমগীর তড়াগ ক'রে লাফিয়ে উঠে হ্যাট্-শূন্য মাথা থেকে হ্যাট্ উত্তোলন করার মত ভঙ্গি করে "গুড মর্ণিং পাপা"—বলে চেঁচিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে হা হা করে হাসতে লাগল। পরক্ষণে ডেম্, ব্লাডি, হাকিম, জাফর সাহেবের তিন মাসের ফাঁসী বলে দু'হাতে চুল ছিঁড়তে লাগল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল।

দেখে আবদুল্লার চোখের জল আর বাধা মান্‌ল না—সেও হু হু ক'রে কেঁদে উঠল।

হোষ্টেলের ক'জন ছাত্রও সঙ্গে গিয়ে তাকে বাড়ী পৌঁছিয়ে দিলে।

আবদুল্লা দেশে যত কবিরাজ, ডাক্তারের নাম শুনেছে, যত ফকির বুজরুগের খবর পেয়েছে, প্রত্যেকের পায়ে পায়ে ধন্না দিলে। মরিয়া হয়ে যেমন করে পারে, সকলকে দিয়ে চেষ্টার ত্রুটী কর্‌লে না। তেল, ঔষধ দোয়া দরূদ পানি পড়ার আর অন্ত রইল না—বাল্যের মত তাবিজ মাদুলীতে আবার আলমগীরের গলা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।

কখনো হাসি, কখনো কান্না, কখনো চীৎকার, পরণে কাপড় ত রাখেই না। বেঁধে রাখলে জিনিস পত্তর ভেঙ্গে হুল স্থূল কাণ্ড বাধিয়ে বসে।

যতক্ষণ, বাল্যকালের মত তক্তপোষের উপর চেয়ার টেবিল বসিয়ে এজলাস-অভিনয় করার সুযোগ করে দেওয়া যায়, ততক্ষণ ভয়াবহতা যেন একটু কমে। দিনের বেলায় কোন প্রকারে পাড়ার কোন কোন ছেলেমেয়েকে ফুসলিয়ে, বাতাসা, মুড়ি দিয়ে যোগাড় করে আনা যায় বটে কিন্তু রাত্রেই মুস্কিল। দিনে রাতে মাথার উপর ভাঙ্গা-চাটাই এর পাখা আবার টানা হতে লাগল। কিন্তু এই অভিনব কাজের জন্য রাবেয়াকে আর পাওয়া গেল না। রাবেয়া আর পূর্বের সেই রাবেয়া নেই—তার সারা দেহ এখন হরিণীর মত সচকিত হয়ে উঠেছে, রূপে, রঙে, স্বভাবের স্নিগ্ধ নম্রতায়, বিস্ফারিত চক্ষু দু'টির তীরে তীরে সৌন্দর্য্য কুসুমিত হয়ে উঠেছে। দূর থেকে দেখেও মনে হয় তার দেহ-সৌরভে বাতাসও যেন উতলা হয়ে পড়ে—পায়ের তলার মাটি যেন তার চরণ-স্পর্শে সজীব হয়ে ওঠে।—আজ আবদুল্লা পরিবারের সেই একমাত্র আলো। কিন্তু সেই আলোর দিকে চোখ তুলে চাইবার আলো আজ তার মা-বাপের চোখে নিঃশেষে ফুরিয়ে গেছে।

আলমগীর টেবিলের উপর দোয়াৎ কলম ও কাগজ সাজানো না পেলে কান্না ও মাথা ঠোকাঠুকিতে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে তোলে। কাগজে ফর্‌ ফর্‌ করে তার হাতের কলম ছুটে চলে, মাথা-মুণ্ডহীন ইংরেজী অক্ষরের সারির পর সারি দ্রুত পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা কাগজ কাল করে তোলে।

রাত্রে ব্যাপার যেরকম ভয়াবহ হয়ে ওঠে তা কোন মা-বাপের পক্ষেই সহ্য করা সম্ভব নয়। কখনো চীৎকার, কখনো ভেউ ভেউ

করে কান্না, কখনো হা হা করে হাসি--কখনো চুল ছিঁড়ছে, কখনো মাথা ধুক্‌ছে। হাতে পায়ে শিকল লাগিয়ে বেঁধে রেখে এ অসহ্য দৃশ্য আবদুল্লা ও ফাতেমাকে সহ্য করতে হয়। তাড়াতাড়ি বাতি নিবিয়ে দেয়;—হয়ত ভাবে, অন্ধকার ভেদ করে পুত্রের গোঙানী তাদের কানে পৌঁছবে না। —রাত গভীর হতে না হতেই একজনের অজ্ঞাতে আর একজন আস্তে আস্তে নীরবে শয্যা ত্যাগ করে উঠে পড়ে—পুত্রের কাছে কাছে ঘুরে, সারা চৈতন্য দিয়ে যেন পুত্রের রোগ গ্রাস করে নিতে চায় নিজের দেহে--বাবর হুমায়ুনের কেচ্ছা আবদুল্লার শোনা ছিল, কতদিন দু'জনে সে গল্প আলোচনা করেছে। উভয়ের বুকে বুকে প্রার্থনার অন্ত নেই। অন্ধকারে দু'জনে হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে কতদিন মাথা ফুলিয়ে ফেলেছে; কেউই মুখে রা না করে মাথায় হাত দিয়ে নীরবে আবার শয্যায় গিয়ে শুয়ে পড়েছে। একজন আর একজনকে ঘুমন্ত মনে করে হয়ত কিছুক্ষণ পর আবার উঠে পড়ে। এমনি করে কত নিশির পর নিশি ভোর হ'তে লাগল আবদুল্লা ও ফাতেমার। চৌকির উপর থেকে টেবিল চেয়ার নামানোর উপায় নেই—নামালেই কান্না, চীৎকারের অন্ত থাকে না।

মাথা ধুক্‌তে ধুক্‌তে সেদিন ভোরে হ্যাট লাও চাপরাশী ব'লে চীৎকার করতে লাগল। আর দেখা গেল কপাল ফেটে দর দর করে রক্ত পড়ছে। আবদুল্লার আর সহ্য হ'ল না। মজুমদারদের বড় কর্ত্তার কাছে গিয়ে বড় কাকুতিমিনতি করে একটা পুরোনো হ্যাট যদি থাকে, চাইলে। কর্ত্তা কবেকার ছেঁড়া ওল-ওঠা একটা হ্যাট দিলে। তাই এখন সারাক্ষণ মাথায় দিয়ে সে দারওয়ান, চাপরাশী, আসামী হাজির, ছয় মাস জেল---ইত্যাদি চেঁচাতে থাকে।

সেদিন অপরাহ্নে হৃষীকেশ বাবু স্বয়ংই ক্রোক নিয়ে হাজির। শোকের ভয়াবহতা আবদুল্লার মধ্যে কিছুই আর অবশিষ্ট রাখেনি----দেখলেই মনে হয় সে যেন এক পা কবরেই আছে। দাঁড়াতেই সারা শরীর থর থর করে কাঁপতে থাকে, তবুও কাঁপতে কাঁপতে হৃষীকেশ বাবুর সাম্‌নে আস্‌তে হল, একেবারে তাঁর পায়ের কাছেই বসে পড়ল। তার মুখে কোন কথাই ফুটল না--পাড়া পড়শীরা যারা তার ছেলের আই-এ পাশের খবর পাওয়ার পর খুশী হয়েই যেন স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে

হৃষীকেশ বাবুকে নালিশ করে দেওয়ার জন্য উস্‌কিয়েছিল, তারাই আজ হৃষীকেশ বাবুর সাম্‌নে দুই যুক্তকর বাড়িয়ে দিয়ে বল্লে—কর্ত্তা, বাঁধতে হয় আমাদের বাঁধুন, এ-বর্ষায় ও পাগল ছেলে নিয়ে কোথায় দাঁড়াবে? কড়া মহাজন হৃষীকেশ বাবু সহজে দম্‌বার পাত্র নন, তবুও তিনি আজ আবদুল্লার মুখের দিকে চেয়ে ক্রোক্ জারী করতে পারলেন না। পাকা মহাজন হৃষীকেশ বাবু একেবারে খালি হাতে ফিরে গিয়ে নিজের জীবন-ইতিহাসকে দাগী করে দেবেন, নিজের জীবনের রেকর্ড নিজে নষ্ট করবেন? তাই কি একটা ভেবে যাবার সময় পাড়াপড়শীদের বল্লেন—আচ্ছা তোমাদের কথা আজ আমি রাখলাম, কিন্তু তোমাদেরও আমার একটি কথা রাখতে হবে। সকলে—কর্ত্তার যা হুকুম ব'লে একেবারে গদগদ হয়ে উঠল। তিনি আস্তে আস্তে বল্লেন—'দুই সতীনের' চরের দখল নিয়ে মজুমদারদের সঙ্গে আমাদের একটা দাঙ্গা হতে পারে, তোমরা আমার পক্ষে যাও বা না যাও অন্ততঃ মজুমদারদের পক্ষে যেয়ো না। সকলের পক্ষ থেকে মাতব্বর জানালে—কর্ত্তার হুকুম কি আমরা না মেনে পারি?

আবদুল্লার ঘরে উনান কোনদিন জ্বলে, কোনদিন জ্বলে না—।

বহু রাত্রির মত সে রাত্রেও আবদুল্লাদের কোথায় আর খাওয়া দাওয়া? আবদুল্লা ও ফাতেমার খাওয়া, শুধু মাত্র জীবন রক্ষায় পরিণত, চারটি থাক্‌লে তাই রাবেয়া খায়।

টেবিলের সাম্‌নে সেই ভাঙ্গা চেয়ারে বসে বসে আলমগীর, চাপ-রাশী, দারওয়ান বলে চেঁচাতে থাকে। কোন সাড়া না পেলেই বেদম মাথা ধুক্‌তে থাকে। পুত্রের কান্না চীৎকার বরদাস্ত করতে না পেরে, মাঝে মাঝে আবদুল্লা কম্পিত-চরণে নিজেই সেই ঘরে ঢুকে পড়ে।—পাপা, আসামী, বলো ধর্মাবটার, চাপরাশী, বাঁধো। বলো ধর্মাবটার! বলে, হয়ত ভেউ ভেউ করে কেঁদে ওঠে আলমগীর। হয়ত টেবিলের উপর মাথা আছড়াতে থাকে। পুত্রের মনে কিছুমাত্র শান্তি আস্‌বে মনে করে, বৃদ্ধ শীর্ণ কম্পিত দু'হাত সাম্‌নে বাড়িয়ে দিয়ে কোন প্রকারে হয়ত উচ্চারণ করে 'ধর্মাবটার'।

আবদুল্লার দুই চোখের ধারা দাড়ি বেয়ে বুক পর্য্যন্ত ভিজিয়ে দেয়।

এমন সময় রাবেয়া কি জন্য ঘরে ঢুক্‌তেই, আলমগীর চেঁচিয়ে উঠল---মেম সাহেব, মেম সাহেব, beauty, beauty is joy for ever রাবেয়া বেরিয়ে যেতেই আবার চীৎকার দিয়ে উঠল---চাপরাশী বাঁধো, ব'লে হা হা করে হেসে উঠে, পরক্ষণেই ভেউ ভেউ করে কান্না শুরু করে দিলে। আবদুল্লার দুর্ব্বল কম্পিত দেহ আর স্থির থাক্‌তে পারল না। সে সেখানেই পড়ে গেল এবং উঠবার কোন চেষ্টাই যেন আজ সে কর্‌লে না—অথবা হয়ত চেষ্টা করার কোন উদ্যম ও শক্তি তার দেহে আর অবশিষ্ট ছিল না।—মাটিতে মাথা রেখে, চোখের জলে মাতা বসুমতীর বক্ষ সিক্ত করে আল্লাকে জিজ্ঞেস কর্‌লে,—কোনদিন নামাজ ত বাদ দিই নি, রোজাও ছাড়িনি, আল্লাহ্ তবুও কি অপরাধে আমার এ শাস্তি? প্রশ্নের পর প্রশ্ন তার দুর্ব্বল ক্ষতবিক্ষত বুকের তলায় আছাড় খেতে থাকে।

এমনি করে দুঃখের বহু অমানিশির এক নিশি ভোর হয়—বাইরে প্রভাত-সূর্য্য নতুন জীবনের হাসি হাসে, পাখীর বিচিত্র কূজনে মরা পৃথিবী আবার প্রাণ পায়, শাখায় শাখায় ফুল গন্ধ বিতরণ করে।

কিন্তু আবদুল্লার প্রশ্নের উত্তর?

পরদেশীয়া

বাবার মতলব ভালো ছিল—

কায়দা কানুন, এটিকেট, তার উপর বিশুদ্ধ উচ্চারণে ইংরেজীটা ভালো শিখা হইবে, এ মহৎ উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার ও আমার সমকক্ষ প্রতিবেশীদের উপর টেক্কা দিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিলেন একেবারে কলিকাতায়, খাস সাহেবদের স্কুলে।

সাহেবদের স্কুলে পড়ি, সাহেবদের হোষ্টেলে থাকি, হ্যাট্ কোট্ সূট্ ছাড়া পরিতে হয় না। এক কথায়, দুনিয়ার স্বর্গলোকেই বিচরণ করি।

এ পরাধীনা ভারতবর্ষে জন্ম হইলেও বাবা স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখিতেন—কিন্তু তাঁহার ভারত আবা কাবা লুঙ্গী দাড়ি ও পৈতা টিকির নির্বীর্য্য শ্রীহীন ভারত নয়। তাঁহার সম্মুখে ছিল হ্যাট্ কোট্ পরা সমুন্নত-মস্তক সবল মানুষের ভারত। বাবার ধারণা ছিল, বিলাতে না গেলে মানুষের মনুষ্যত্ব পূর্ণ হয় না। তিনি ত সব সময়ই বলিয়া বেড়াইতেন—তিনি যদি খোদা হইতেন তাহা হইলে সমস্ত ভারতবর্ষটাকে একটা প্রকাণ্ড জাহাজে তুলিয়া বিলাতে সফর করাইয়া আনিতেন। তাঁহার বন্ধুরা তাঁহাকে একরকম নাস্তিকই মনে করিত।

একবার তাঁহার কোন এক ডিপুটি-বন্ধু হজ্বে যাইবার সময় বাবা অত্যন্ত জোর গলায় উপদেশ দিয়াছিলেন—আরে, খামখা মক্কায় গিয়ে এতদিনের রক্ত জল-করা টাকাগুলি বদ্দু ডাকাতদের খাওয়াইওনা, তার চাইতে লণ্ডনে যাও—তোমার হজ্বে-আকবর হবে—।

এ নিয়া বন্ধু ও পরিচিত মহলে আলাপ আলোচনা তর্ক গালাগালি কম হয় নাই। হইলে কি হইবে, বাবা তার প্রত্যুত্তরে পর বৎসর আমার চাচাকে বিলাতে পাঠাইয়া দিলেন। যাইবার পূর্বে এ কথাও

চাচার কর্ণগোচর করাইতে কসুর করিলেন না যে, মেম-বধূ ঘরে আনিতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই।

মা শুনিয়া তেলে বেগুনে জলিয়া উঠিলেন—শুকরখাগী মদখোর মেম নিয়ে আমি ঘর করতে পারব না; তার চেয়ে আমি বাপের বাড়ী চলে যাবো, আমার বাপের বাড়ীতে দু'মুঠো ভাতের অভাব পড়েনি। —তিনি রাগিতে রাগিতে রাগের চরম সীমায় আসিয়া একেবারে কাঁদিয়া ফেলিলেন। কিন্তু বাবা এ সব থোড়াই কেয়ার করেন। তিনি ত সব সময় বলিয়া থাকেন, মেয়েদের তর্জ্জন গর্জ্জন, চোখের পানি সবই দেশী পুলিশের ফাঁকা আওয়াজ।

আমার স্বল্পভাষী চাচাটী কিন্তু যা কাণ্ড করিল—একেবারে সকলকে বোকা বানাইয়া ছাড়িল। তিন বৎসর বিলাতে থাকিয়া ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া, ফিরিবার সময় মক্কা-শরীফে হজ্ব করিয়া আবাল্যের হ্যাট্ কোট ছাড়িয়া একেবারে আচকান পা'জামা ও দাড়ি লইয়াই ফিরিয়া আসিল। শুধু এ হইলেও কোন প্রকারে সহ্য হইত, আসিবার সময় এক আরবী মেয়েকে বিবাহ করিয়া সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে।

অধিকন্তু বাবাকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিয়া ফেলিল—বেশ করেছি এ ত খাস সুন্নৎ...এরা আসল কোরেশ...।

মা শুনিয়া প্রথমে খুব সন্তুষ্ট হইলেন—কিন্তু যখন দেখিলেন, এর সঙ্গে কথা বলাও যায় না, যায় না গিন্নীগিরী খাটানও তখন তিনি হাঁপ ছাড়িয়া সরিয়া পড়িলেন।

বাবার মুখে রা ফুটিল না—তিনি আকাশ হইতে একেবারে মাটির উপর পড়িয়া গেলেন।—চাচার এ বেশ, এ বিবাহ, তাঁহার ভিতরে আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল, তাঁহার পরম স্নেহের সহোদর হইয়া সে তাঁহার এতদিনের স্বপ্নকে লাথি মারিয়া ভাঙ্গিয়া দিল! তাঁহার দস্তুরমতো ঘৃণা হইতেছিল এ পথভ্রষ্ট ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ করিতে।

চাচা হাসিয়াই বলিয়া উঠিল—বড়ভাই, এবার, বেশ হবে—আপনার ভাইপো-রা সব সৈয়দ লিখতে পারবে...।

সত্যই বাবা মনে দারুণ কষ্ট পাইয়াছিলেন—তিনি চাচার কথায় কোন উত্তর না দিয়া উঠিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন।

চাচা মা'র ঘরে যাইয়া, ক্রোধভরে টেবিল চাপড়াইয়া বলিয়া উঠিল—দেখুন ত ভাবীজান, ভাইজানের এ কী রকম অন্যায়—মানুষকে ধর্মকর্মও করতে দেবে না, নিজের জাতীয়তা রক্ষা করতেও দেবে না! এ হ'লে আমি হিজরৎ করব, থাকব না এ বাড়ীতে...ইংরেজের অনুকরণ ক'রে আমি কেন বাঁদর বন্‌তে যাব...?

মা বলিলেন—সে ত বেশ, কিন্তু ভাই, এখান থেকে আর একটা বিয়ে কর—ওকে নিয়ে তুমি দিন রাত শুধু সুন্নৎ কেন ফরজও পালন কর, কারও আপত্তি থাকবে না, কিন্তু আমাদের এখানকার একজন না হ'লে যে চলছে না—দু'টা মনের কথা, একটা সুখ-দুঃখের কথা বলতে পারি না—ইসারা ক'রে ক'রে যে হাঁপিয়ে উঠলাম—।

চাচা শুধু মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসেন; আর বলেন—ছোয়াবে ছোয়াব হবে, তার উপর বংশটাও ভাল হবে; বুঝলেন, যাকে বলে, একেবারে এক গুলীতে দুই শিকার। হিন্দুরা বলে, বাংলার মুসলমান না কি সব নিম্নজাতির হিন্দু থেকে হয়েছে, এ বদনামী ঘুচাতে হবে।

আমি টেবিলের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া বিলাতী ম্যাগাজিন খুলিয়া মেয়ে সন্তরণকারিণীদের ছবি দেখিতেছিলাম। আগাগোড়া এই সু-পুষ্ট মেয়েগুলি আমার চোখে অপরূপ দেখাইতেছিল—কোথাও এতটুকু খুঁৎ নাই, পায়ের কড়ে আঙ্গুল হইতে মাথা পর্য্যন্ত কেমন ভরা, পরি-পুষ্ট—! আমার প্রতি ইসারা করিয়া চাচা বলিয়া উঠিল—আমাদের শামসুরও বৌ আন্‌তে হবে আরব দেশ থেকে, খাস বনি হাসেম। কেমন বাবা শামসু?

আমি তন্ময় হইয়া ছবি দেখিতেছিলাম—চাচা এতক্ষণ কি বলিতেছিল বড় একটা কানে ঢোকে নাই, আমার নাম ধরিয়া ডাকায় চোখ তুলিয়া দেখি, চাচা ও মা আমার প্রতি চাহিয়া হাসিতেছেন। চাচার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—what?

—মক্কা শরীফ থেকে তোমারও বৌ আনব, বেশ হবে বাবা, নয়? চাচা ভাইপো একসঙ্গে উটে চড়ে' দোদুল-দোল করতে করতে শ্বশুর-বাড়ী যাবো।

No, No, হাজা-টাজা ক'রে আমি কথা বলতে পারব না, মিষ্টার চাচা, আমি মেম বিয়ে করবো...।

মা বলিয়া উঠিলেন—শোন, ছেলের কথা। মেমও হবে না, আরবীও হবে না; সাত সমুদ্দুর তের নদীর ওপারে না পারব একটু বেহাই বাড়ী যেতে, বেহাই-বেহাইনের সঙ্গে একটু আলাপ করতে! তার চাইতে আমি এখান থেকে লাল টুক্‌টুকে বৌ আনব...।

চাচা জোর দিয়া বলিয়া উঠিল—না, না, এখান থেকে বিয়ে কিছুতেই হতে পারে না, আমরা শূদ্র চাঁড়ালের বংশধর, এ কিছুতেই সহ্য করতে পারব না। বেহাই বাড়ী যেতে যখন আপনার এত সাধ তখন হাজী অব তুরঙ্গাইর সঙ্গে বেহাইপনা বা বেহায়াপনা করলেই পারেন—খাইবার পাস্ পর্য্যন্ত রেল হয়েছে, বাকীটুকু উটের উপর চড়ে ঢুলে ঢুলে বেশ আরামে যাওয়া যাবে,—আঙ্গুর নাশপাতি বাদাম যত ইচ্ছে খেতে পারবেন—বৌ ও পাবেন খুব হৃষ্টপুষ্ট, শামসুকে কেন, আপনাকে সুদ্ধ কোলে নিয়ে বেড়াতে পারবে।

মা এক খিলি পান মুখে গুঁজিয়া বলিয়া উঠিলেন—যাও, যাও, সব তাতেই তোমার ঠাট্টা, নিজে ত আনছ একটা হাতী, কোলে নিয়ে বেড়ায় না কেন তোমাকে?

—সত্যিই ঠাট্টা নয়, কোন্‌দিন পানিপথের পঞ্চম যুদ্ধে হাজী অব তুরাঙ্গাই ইংরেজকে হটিয়ে দিল্লীর তক্তে চড়ে বসে তার ঠিক নেই, তখন আপনাকে আর পায় কে, দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরোর বেয়ান, তখন আপনি কস্তুরী দিয়ে পান খাবেন, মেশক্ দিয়ে মরিচের চাট্‌নি বানাবেন, জাফরাণ দিয়ে সুট্‌কী পাকাবেন—তখন এ গরীবদের কি আর মনে থাকবে?

—যাও, যাও বালেষ্টর কিনা মানুষকে আর কথা বল্‌তে গায়ে লাগে না!

এ বলিয়া মা উঠিয়া গেলেন—চাচাও হাসিতে হাসিতে নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

বাবার সঙ্গে চাচার আর বেশী সম্বন্ধ রহিল না—চাচা কাছারী আর মক্কেল লইয়াই দিন কাটায়, বাবার ঔদাসিন্যের জন্য মা'র কাছে আপত্তি জানায়, ঝগড়াও করে।

বাবা হ্যাট্ কোট পরিয়া নয়টার সময় মোটরে চড়িয়া বসেন, চারিটায় আফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া চা খাইয়া, টেনিস রেকেটখানি হাতে লইয়া নিজেই ড্রাইভ করিয়া ক্লাবের দিকে ছোটেন—আর সেই রাত নয়টায় ফেরেন।

চাচা আজকাল কাছারী যান, আসকান পা'জামা ও পাগড়ী পরিয়া। জোহরের নমাজ সম্ভব হয় না, বাকী চার ওয়াক্ত বাড়ীর সামনের মসজিদে পড়া তার চাই-ই। এ উভয় সহোদরের চাল চলন দেখিয়া লোকেরা মুখ চাওয়া-চায়ি করে।

চাচার ব্যবহারে পিতার দারুণ মনোকষ্ট আমার প্রাণে অত্যন্ত আঘাত করিল। মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম, পিতার এ মনোকষ্ট দূর করিবার আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। পাছে বাবা মনোকষ্ট পান এ ভয়ে নিজের চলাফেরায় কোনদিন এতটুকু বাঙ্গালীত্ব প্রবেশ করিতে দিই নাই। দারুণ গ্রীষ্মের সময় ছ'ঘণ্টা ক্লাস করিয়া যদি কোট প্যাণ্ট খুলিয়া একটা পাতলা লুঙ্গী বা ধুতি পরি, জুতা মোজাগুলো খুলিয়া বসি তবে কী আরামই না লাগে—কিন্তু পাঠ্য বইয়ে পড়া হলেও তখনও রামের বন গমনের কথা ভুলিয়া যাই নাই কাজেই, পিতার মুখের দিকে চাহিয়া সে আরাম কোনদিন ভোগ করি নাই। স্কুল হইতে আসিয়া চা খাইয়া হাফ্ প্যাণ্টের উপর জুতা মোজা পরিয়া খেলার মাঠে ছুটিয়াছি।

এমনিভাবে নিজেকে গড়িয়া তুলিতেছিলাম।

মরুভূমির মেয়ে সুন্দরী হইতে পারে এ ধারণা কোনদিন ছিল না। চাচী আম্মাকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম—সেই শুষ্কং কাষ্ঠং খোর্মা খেজুরের বালুকাময় দেশে এমন লাল মরিচের মত রং। তাঁকে দেখা ছাড়া কথা বলার কোন সুযোগ ছিল না—আরবী না জানার জন্য

মাঝে মাঝে অত্যন্ত দুঃখ হইত। এ সুদূর দেশের মেয়েটি কি অপূর্ব আশা-আকাঙ্খায় এ দুর্বোধ্য দেশে স্বেচ্ছায় নিজের নির্বাসন-দণ্ড বরণ করিয়া লইয়াছেন, এই বিচিত্র জীবন, ততোধিক বিচিত্র এই পারি-পার্শ্বিকতা তাহার মনে কী ভাবের স্বষ্টি করিয়াছে, জানিবার উপায় নাই। দিগন্ত প্রসারিত উণ্মুক্ত প্রকৃতির মাঝে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গিণীর ন্যায় এতদিন তিনি ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, আজ হঠাৎ পাখা গুটাইয়া ঘোমটা টানিয়া খাঁচার ভিতর কেমন লাগিতেছে, কে জানে?

সাধারণতঃ আমি কলকাতাতেই থাকিতাম, বন্ধেও বড় একটা বাড়ী আসিতে হইত না, দারজিলিং সিমলা যাইবার সময় বাবা আমাকেও সঙ্গে লইয়া যাইতেন। সেনেটোরিয়ামে থাকিয়া, সাহেব-সুবাদের বাড়ী খানা খাইয়া দিন বেশ ফূর্তিতেই কাটিতেছিল।

মেট্রিকের পর বিলাত যাইবার সময় বাড়ীতে বিদায় লইতে আসিয়া চাচী-আম্মার চেহারা দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম—সেই লাল মরিচের মতো রং একেবারে ধোঁয়াটে হইয়া গিয়াছে—সেই ভরা গাল দু'খানি ভাঙ্গিয়া একেবারে হাড্ডির সঙ্গে আসিয়া লাগিয়াছে, শরীরখানি যেন বিরাট একখানি কঙ্কালে পরিণত হইয়াছে। ভাত তিনি এখনো খাইতে পারেন না, তাঁর জন্য গোস্ত রুটীরই বন্দোবস্ত করা হয়, একটা পেশোয়ারী রোজ আধসের খোর্মাও দিয়া যায়। তথাপি কেন জানিনা তাঁহার শরীরখানি ভাঙ্গিয়া নুইয়া পড়িয়াছে।

চাচার চাল-চলন ও বিবাহের জন্য পিতার অসন্তুষ্টি, ভালো করিয়াই মনে ছিল—কাজেই বিলাত আসিয়া, চেষ্টার ত্রুটী করিলাম না।—বাবাকে আগে বাগে কিছুই লিখিলাম না, মনে করিয়া রাখিলাম মেম লইয়া একেবারে বাবার সামনে হাজির হইয়া তাঁহাকে তাক্ লাগাইয়া দিব।

তাহাই করিলাম। বাবা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন—মা'রও অপছন্দ হইল না। এই ছোটখাটো ফুটফুটে মেয়েটিকে দেখিয়া কারও অপছন্দ হইবার কথা নহে। শাশুড়ী মাত্রেরই পুত্রবধূ সম্বন্ধে কর্তব্য আছে—মাও তাঁহার পুত্রবধূর সংস্কারে লাগিয়া গেলেন। তাঁহার প্রথম প্রস্তাব

হইল—বৌকে গাউন ছাড়াইয়া শাড়ী পরাইতে হইবে, মাথায় কাপড় দিতে হইবে, হাতে গলায় এবং কানে অন্ততঃ কিছু কিছু অলঙ্কার না পরিলে তাঁহার নাকি সম্মানের লাঘব হয়। বৌ ত এ প্রস্তাব শুনিয়া হাসিয়াই খুন—কিন্তু অনেক বুঝাইয়া সুজাইয়া তাহাকে রাজী করাইলাম। স্বামীর জন্য যে মেয়ে স্বদেশ স্বজন ছাড়িয়া সাত সমুদ্র তের নদী ডিঙ্গাইয়া এতদূর আসিতে পারে তাহার পক্ষে 'বব্' না রাখা বা দু'কানে দু'টা ছেঁদা করা এমন আর কি!

কিন্তু ব্যাপার একটু কঠোর হইয়া উঠিল যখন মা তাহার বে-পর্দ্দা অবস্থায় বাহির হওয়ায় আপত্তি তুলিলেন। বাবার আর সহ্য হইল না, তিনি রাগিয়াই মা'কে বলিলেন—যাও, যাও, তোমার আর ন্যাকামী করতে হবে না, মেম মেমের মতই চলবে, তা না হ'লে এখান থেকে তোমাদের মতো সাত হাত ঘোমটা-দেওয়া বৌ আনলেই ত পারতাম!

মাও উত্তেজিত ভাবেই বলিলেন—বিয়ের পর থেকেই পুরুষদের মধ্যে আমাকে নিয়ে ডং ডং করবার চেষ্টা কি কম করেছ? পেরেছ কোনদিন নিতে? কেন বাবা, বাইরে যেতে কে নিষেধ করছে, আমরা বুঝি দার্জ্জিলিং সিমলায় বায়স্কোপ থিয়েটারে আর যাইনি? পর্দ্দা করে গেছি, পর্দ্দা করে এসেছি।

—বাপের কর্ত্তব্য ছেলের মঙ্গলামঙ্গল দেখা, তোমাকে নিয়ে আমি যে-কষ্ট যে-লজ্জা ভোগ করেছি, জান—ছেলেকে তার হাত থেকে নিষ্কৃতি দেবার জন্যই ত মেম বিয়ে করালাম—।

তারপর অত্যন্ত গর্ব্বোদ্যত কণ্ঠে বাবা বলিলেন—তোমাদের মতো কূপমণ্ডুক মেয়ে নিয়ে আর যার চলে চলুক, আমার ছেলের চলে না।

এই নিয়া বাবা মা'র রোজ রোজ ঝগড়া হইতে লাগিল। শেষকালে সহ্য করিতে না পারিয়া মা একদিন আমার নানা বাড়ীই চলিয়া গেলেন।

এতদিনের শান্তিময় গৃহে হঠাৎ অশান্তির সৃষ্টিতে মনে মনে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। তার উপর এই এক বৎসরে মিনির চেহারা ও শরীর যাহা হইয়া গেল তাহাতে অত্যন্ত দুঃখ বোধ

করিলাম—চুল উঠিয়া গেছে, চোখ বসিয়া গেছে, দু'খানি গালে হাড় ছাড়া যেন আর কিছুই অবশিষ্ট নাই।

হইবে না কেন?—মা যতদিন ছিলেন, বেচারী না দেখিয়াছে একটু বিয়ারের মুখ, না পাইয়াছে একটুখানি নৃত্য-গীতের সুযোগ। মাসে দু'একবার তবুও চুরি চামারী করিয়া সাহেবদের রেষ্টুরেণ্টে লইয়া যাইতাম, একটু বেকন্ খাওয়াইয়া খুশী করিবার চেষ্টা করিতাম। নিজের মনে অনুশোচনা হইতেছিল—কেন আমি ইহাকে নিয়া আসিলাম, বেচারী না পাইতেছে একটু সঙ্গ, একটু সোসাইটী, একটু আমোদ। মাঝে মাঝে দরজা জানালা বন্ধ করিয়া, জুতা খুলিয়া রাখিয়া নিজেই মিনির সঙ্গে বল্ নৃত্যের অভিনয় করিতাম—কিন্তু দুধের স্বাদ কি ঘোলে মিটে।

সেদিন টেনিস্ কোর্ট হইতে ফিরিয়া আসিয়া চুপি চুপি উপরে উঠিতেছিলাম—ইচ্ছা, দেখি বসিয়া বসিয়া মিনি কি করিতেছে, আর সুযোগ পাইলে পিছন হইতে তাহার দুই চোখ টিপিয়া ধরিব, এমনি একটা তৃতীয় শ্রেণীর রসিকতার খেয়াল করিয়া উপরে উঠিলাম। দেখি, পশ্চিমের খোলা জানালার পর্দ্দা সরাইয়া বাহিরে মাথা গলাইয়া বিষাদ-মুখে মিনি অস্তায়মান সূর্য্যের দিকে অনিমিষে চাহিয়া আছে আর তাহার দুই চোখ বাহিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছে—তার স্বদেশ গমনোদ্যত অস্তায়মান সূর্য্যের কিরণে কিরণে সে যেন তার জলভরা চোখের বাণী তার স্বদেশ-স্বজনের কাছে প্রেরণ করিতেছে। দেখিয়া আমার পা অচল হইয়া গেল, মনের সব ফূর্ত্তি এক নিমেষে যেন আত্মহত্যা করিয়া বসিল। হঠাৎ মনে হইল হায় রে সহস্র চেষ্টা যত্ন করিয়া ডেফোডিল্‌কে শিউলিতলায় জিইয়ে রাখা গেলেও যাইতে পারে বটে কিন্তু তাহাতে ত ফুল ফুটিবার নহে। তাহার দুই হাত নিজের হাতে নিয়া বলিলাম—মিনি আমাকে মাফ কর তোমার এই দুঃখ দুর্দ্দশার জন্য আমিই ত দায়ী।

সে তাহার দুইটী জলভরা চোখ—কিসের সঙ্গে তাহার তুলনা দিব? সে-অতুলনীয় নীলাভ চোখ আমার চোখের উপর রাখিয়া বলিল —সেই কথা বলো না তুমিই ত আমার স্বর্গ শ্যাম্‌স তোমার জন্য আমি নরকে যেতেও রাজি...।

মুখে আর উত্তর যোগাইল না—সে যে আমার জন্য নরকে যাইতেও পারে সে আমার চাইতে আর কে বেশী জানে। তাহার ভাঙ্গা ভাঙ্গা গাল দু'খানির উপর ঠোঁট রাখিতেই আমার চোখেও পানি আসিয়া পৌঁছিল। মিনি শুকাইয়া চামচিকার মতো হইয়া উঠিয়াছে তাহার উপর সে অন্তসত্বা। তাই কয়দিন ধরিয়া ভাবিতেছিলাম কি করা যায়—কোথাও ভালো যায়গায় চেঞ্জে না নিয়া গেলে তাহাকে হয়ত বাঁচানই যাইবে না। অভিমান করিয়া বাবাকেও কিছু বলিলাম না— তিনি কি চোখের মাথা খাইয়া বসিয়াছেন।

যাহা হউক কয়েকদিন পর বাবা আমাকে ডাকিয়া যাহা বলিলেন তাহাতে তাঁহার উপর আমার ভক্তি আর শ্রদ্ধার সীমা রহিল না। সেদিন ভাল করিয়াই মনে হইল বাবা নামক লোকটী অত্যন্ত ভাল মানুষ এবং জীবনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তিনি বলিয়া দিলেন---বৌকে নিয়া বিলাত ঘুরিয়া আসিতে। সম্ভব হইলে জুন মাসে রিটায়ারের পর তিনিও আমাদের সঙ্গে মিলিত হইবেন। বুঝিলাম তাঁহার অনাগত পৌত্র বা পৌত্রীকে তিনি British-born subject না করিয়া ছাড়িবেন না। পুত্র কন্যা British-born হউক কী চীনা-born হউক তাহাতে আমার বড় মাথাব্যথা নাই, মিনি তাহার স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইলেই হয়।

পনের বিশ দিনের মধ্যে সব ঠিকঠাক করিয়া মিনিকে লইয়া যাত্রা করিলাম, মাকে হাতে পায়ে ধরিয়া কত বলিলাম তিনি আসিলেন না। বরং রাগের সহিত বলিয়া দিলেন—যে বাড়ীতে আমার বৌয়ের উপর আমার হুকুম খাটেনা সে-বাড়ীতে আমি আর যাব না।

প্রায় মাস পাঁচেক পরে মিনি একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিল। সেদিন তাহার যে আনন্দ ও গর্বোদ্ভাসিত চেহারা দেখিয়াছিলাম তাহা জীবনে ভুলিবার নহে। প্রেমময়ী নারী যেন তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য লইয়া প্রেমাস্পদের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে এমনি হাসি ছিল তাহার ঠোঁটে এমনি গর্বোদ্যত চাহনী ছিল সেদিন তাহার চোখে।

ছেলেটি শক্ত হইবার অজুহাত দিয়া বিলাতে আরও বছর'খানেক কাটাইয়া দিলাম। বাবাও অসুখ বিসুখের নাম করিয়া আর আসিলেন

না, তাহাতে আমার সুবিধা ছাড়া অসুবিধা কিছুই হইল না—ছেলের ও ছেলের মা'র ইয়া উয়া অসুখের লিষ্টি দিয়া আরও কিছুদিন ইউরোপে ঘুরিয়া লইবার সুযোগ করিয়া লইলাম। দেশে ফিরিতে আমার রীতিমত ভয় হইতেছিল—পাছে মিনির শরীরখানি আবার ভাঙ্গিয়া পড়ে। বছর দুই ইউরোপে থাকিয়া তাহার শরীরখানি আবার বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও রঙীন হইয়া উঠিয়াছে। একদিন মিনিকে বলিলাম—তোমাকে আর ভারতবর্ষে নিয়ে যাব না।

বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে সে জিজ্ঞাসা করিল—কেন? অপরাধ?

—না, সেখানকার আবহাওয়া তোমার সইবে না, আমার কাছে গিয়ে ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে মরে' যাওয়ার চাইতে, এই সুদূর দেশে থেকে তুমি যদি স্বাস্থ্য নিয়ে বেঁচে থাক তাতেই আমি বেশী সুখী হব—।

—তোমার বুকে যেন মাথা রেখে মরতে পারি, ঈশ্বরের কাছে এই ত আমার শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা ছিল।

—মিনি, তোমাকে আমি বেঁধে মারতে চাই না; ডাইভোর্স দিয়ে যাই, তুমি তোমার নিজের দেশে অন্য কাকেও বিয়ে করে' সুখী হও, আর ছেলেটিকে তুমি রাখলেও রাখতে পার, আমাকে দিয়ে দিলেও দিতে পার, সে তোমার খুশী।

—শ্যামস্, তুমি আমাকে এতখানি নীচতায় ঠেলে দিতে চাও?

—মিনি, এতে নীচতা ত কিছু নেই, একদিন ভুল করে যে-বোঝা আমরা কাঁধে তুলে' নিয়েছিলাম সারাজীবন সে ভুলের বোঝা বহাটাই ত ভালবাসা নয়।

—তোমার কাছে না হতে পারে, আমার কাছে কিন্তু এই আমার জীবন দেবতার পূজা, এ বোঝা বহন করে, তিলে তিলে মৃত্যুও যদি বরণ করতে হয় তাই করব।

মনে মনে খুশী ও বিরক্তি দুই-ই অনুভব করিলাম। বুঝিলাম, মা হাওয়া'র কন্যারা পশ্চিমেই জন্মাক আর পূর্বেই জন্মাক আসলে একই ধাতুতে তৈয়ারী—স্বামী আর স্বামীত্বকে ছাড়াইয়া যাইবার ক্ষমতা ইহাদের নাই।

অগত্যা সপরিবারে দেশে ফিরিলাম।

বাবা অবসর গ্রহণ করিয়া বেশ নির্ব্বিঘ্নে আরামের সাথে দিন কাটাইতেছেন, ক্লাবে আজকাল আর যান না। সন্ধ্যা হইলেই চাকর ইজিচেয়ারখানি বাহির করিয়া রাখে, মিঠে-কড়া তামাক ভরিয়া হুঁকাটী পাশে রাখিয়া যায় তিনি চটি পায়ে সাদা লুঙ্গীর উপর গেঞ্জীটা গায়ে দিয়া ইজিচেয়ারের উপর পড়িয়া হুঁকা টানিয়া টানিয়া অপরাহ্নকে সন্ধ্যা করিয়া তোলেন।

সেদিন সন্ধ্যায় তাঁহার পাশে বসিয়া 'বিলাতের গল্প করিতেছিলাম। অদূরে ড্রিল মাষ্টার বাবার প্রতিষ্ঠিত বোর্ড স্কুলের ছাত্রগুলিকে ড্রিল করাইতেছিল, আমার চোখ ছিল সেই দিকে, অধিকাংশ ছেলের পরণে লুঙ্গি, লুঙ্গী পরিয়া ইহারা মার্চ করিতেছে, লাফালাফি করিতেছে, লেপ্ট রাইট্ করিতেছে। বক্তৃতা মঞ্চে দাঁড়াইয়া পাশ্চাত্য সভ্যতাকে যত ইচ্ছা মুখ ভেঙচাইতে আমার আপত্তি নাই কিন্ত এই কি—?

ইচ্ছা হইতেছিল ব্যাটা ড্রিল মাষ্টারকে একটা অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া আমার সম্মুখ হইতে তাড়াইয়া দিই—ড্যেম্।

বেশী করিয়া রাগ হইল বাবার উপর—আমরা কোনদিন এমনি ঘরের মধ্যেও লুঙ্গি পরিতে পারি নাই, আর আজকাল তাঁহার স্কুলের ছাত্রেরা তাঁহার সম্মুখেই এই সব করিতেছে—। এই সব ভাবিয়া মনে মনে আমি ফুলিয়া উঠিতেছিলাম, হঠাৎ চাচার ঘর হইতে চাকর বাকরের চীৎকার শুনিয়া দৌড়িয়া গেলাম, যাইয়া দেখি চাচী-আম্মার দেহে আর প্রাণ নাই। দুইদিন আগে তিনি একটি মৃত কন্যা প্রসব করিয়া খুবই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন জানিতাম কিন্ত এমনভাবে মৃত্যু হইবে এই কথা কেহ ভাবে নাই। চাচা কাছাড়ী হইতে ফিরেন নাই। দেখিতে দেখিতে সকলেই আসিয়া জমিল। চাচার কাছে লোক ছুটিল। তিনি ঢুকিতেই বৃদ্ধা-চাকরাণী মাথায় করাঘাত করিয়া চীৎকার দিয়া উঠিল... তুমি এতক্ষণে আস্‌তেছ, মৃত্যু পর্য্যন্ত সে ত দরজা থেকে চোখ ফেরায়নি, শেষকালে মা মা করতে করতেই জান গেল—।

চাচা চীৎকার করিয়া উঠিলেন—পানি দাওনি? সকলেই নির্বাক, মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল একে অপরের। বুড়ী ধীরে ধীরে

বলিল—আমি একটুক্‌রা খেজুর মুখে ধরেছিলাম, কিন্তু ঠোঁটে নিলে না বাবা!—বুড়ীর চোখের পাতা ভিজিয়া গেল।

চাচা চাচী-আম্মার লাশের পাশে বসিয়া পড়িয়া আবার হতাশ ভাবে বলিয়া উঠিল—হায়, হায়, তোমরাই ওকে মেরে ফেলেছ, সে যে পানি চেয়েছিল! আরবীতে মা অর্থ যে পানি, এক ঢোক পানি দিতে তোমাদের হুঁশ হ'লনা...! চাচী-আম্মার মুখের উপর নিবদ্ধ তাঁহার দুই চোখ বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল। বাবার দিকে তাকাইয়া দেখি, তাঁহার চোখও ছল ছল করিতেছে—আর মিনির গণ্ড পর্য্যন্ত ভিজিয়া গিয়াছে।

১৯৩৭

জয়

সিরাজ এবার বি. এ পরীক্ষা সম্মানের সহিত পাশ করিয়াছে।

সব জিনিসের মৌসুমের মত বাংলাদেশে বিবাহেরও একটা মৌসুম আছে—মেট্রিকের পর, আই-এ'র পর, বি-এ'র পর, একেবারে হতভাগ্যদের এম-এ'র পর সেই মৌসুম আসে। সিরাজের দুই মৌসুম বৃথাই গিয়াছে। এবার কিন্তু মা নাছোড়বান্দা। সিরাজ বলিল, তাহার পসন্দমত পাত্রী ঠিক করিলে সে রাজি—। অগত্যা মা তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন।

প্রতিবেশী এবং আত্মীয় স্বজনদের হাতে পায়ে বেড়ী-পরা নাকে কানে বিচিত্র অলঙ্কার ভারাক্রান্তা মেয়েগুলির দিকে চাহিয়া সিরাজের বিবাহের জন্য বিশেষ লোভ হইত না। মধ্যে মধ্যে শুধু মনে হইত, ব্রাহ্ম-খৃষ্টান কি বিয়ে করা যায় না? কিন্তু পিতার ক্রূদ্ধ মূর্তি মনে জাগিয়া উঠিতেই সেই আশা কর্পূরের মত উবিয়া যাইত।

পরীক্ষার পর সে একদিন অধ্যাপক আমীনের বাসায় একটি কিশোরী বালিকাকে অধ্যাপক সাহেবের পার্শ্বে বসিয়া লেখা-পড়া করিতে দেখিয়াছিল। মুখে ঘোমটার বালাই নাই—চুলগুলি পিঠ কালো করিয়া পড়িয়া আছে, নাকে মুখে অলঙ্কারের বোঝা নাই—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কচি কিশলয়ের মত একটি মেয়ে। রঙের দিক দিয়া বালিকাকে সুন্দরী বলা যায় না—তথাপি সিরাজের চোখে ভাল লাগিল।

মা যখন এবার বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করিলেন, সে তখন তাহার মনের কথা মাকে খুলিয়া বলিল। পুত্রবৎসলা জননী স্বামীর কাছে ধন্না দিয়া পড়িলেন। বহুদিন হইতে চেষ্টা করিয়াও হাজী সাহেব বিবাহে পুত্রের সম্মতি পান নাই—গৃহিনীর মুখে এ কথা শুনিয়া—'যাক্, বাঁচা গেল', বলিয়া তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন।

... ...

বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী গ্রেজুয়েটের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে অধ্যাপক সাহেবেরও নারাজ হইবার কারণ ছিল না।

সিরাজের পিতা হাজী সাহেব একজন জমিদার। তাঁহার প্রকাণ্ড বাড়ী—ভিতরে বাহিরে পুকুর, বাহিরের পুকুরের পার্শ্বে বিরাট মসজিদ, তারই পার্শ্বে গোরস্তান—অনতিদূরে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত জুনিয়ার মাদ্রাসা। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে যাইয়া পড়িতে তাঁহার কখনো ভুল হয় এ অপবাদ তাঁহার পরম শত্রুও দিতে পারিবে না। প্রত্যেক শুক্রবারে জুমা শেষে মসজিদে হাজী সাহেব ইসলামের একতা, ভ্রাতৃভাব, সাম্য, সুদ দেওয়া-নেওয়া হারাম ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সভা-অন্তে মাদ্রাসার ছাত্রেরা ও সমবেত মুসল্লীগণ—আল্লাহু আকবর ও 'ইসলাম কী জয়'—ধ্বনিতে মসজিদ প্রাঙ্গন মুখরিত করিয়া তোলে।

বৃদ্ধ হাজী সাহেব তাঁহার দেশের একচ্ছত্র নেতা। তবে অন্য মুসলমান জমিদারের মত তাঁহারও আর্থিক অবস্থা মোটেও ভাল নয়। মসজিদ পাকা করিবার সময় তিনি যে হাজার তিনেক টাকা সুদে কর্জ লইয়াছিলেন তাহা এখনো পরিশোধ হয় নাই। তার পর যখন নন্‌কো'র সময় তরুণদের হাতে তাঁহার নেতৃত্ব ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, তখন তিনি পাঁচশত টাকা ফেলাফৎ ফাণ্ডে ও পাঁচশত টাকা আঙ্গোরা ফাণ্ডে চাঁদা দিয়া জেলা খেলাফৎ-কমিটির সভাপতি-পদ রক্ষা করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য সেই টাকাও আসিয়াছিল মহাজনের লোহার সিন্ধুক হইতে। কলিকাতা বা ঢাকা হইতে যখন আঞ্জুমানের প্রচারক, জমিয়তের প্রতিনিধি ও খেলাফতের নেতারা আসিতেন, তখন তাঁহার মাদ্রাসার ছাত্রদের লইয়া মিছিল করিয়া তিনি ষ্টেশনে যাইতেন—নিজে মিছিলের পুরোভাগে থাকিয়া উচ্চস্বরে 'ইসলাম কী—' বলিয়া উঠিতেন আর সমবেত জনতা 'জয়' বলিয়া দিঙমণ্ডল মুখরিত করিয়া তুলিত।

সিরাজের বিবাহ স্থির হইয়াছে।

শুক্রবার বাদ্‌জুমা বরযাত্রী রওয়ানা হইবে। একমাত্র পুত্রের বিবাহে যাহাতে কিছু ত্রুটি না ঘটে, সেই দিকে হাজী সাহেবের বিশেষ নজর ছিল। সেই উদ্দেশ্যে হাজার পাঁচেক টাকা মহাজনের নিকট হইতে চক্রবৃদ্ধিহারে কর্জ লওয়া হইল।

শুক্রবার যথারীতি হাজী সাহেব ইসলামের সাম্য নীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন, কোরাণ-হাদীস হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলেন, সব

মুসলমান ভাই ভাই, একই দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মাত্র। 'আল্লাহু আকবর' ও 'ইসলাম কী জয়'—ধ্বনির মধ্যে সেদিনও সভাভঙ্গ হইল। সন্ধ্যায় নমাজ-অন্তে নৌকা করিয়া বরযাত্রীরা রওয়ানা হইয়া গেল এবং পরদিন সন্ধ্যায় তাহারা নিরাপদে অধ্যাপক সাহেবের গ্রামের ঘাটে গিয়া পৌঁছিল।

ঘণ্টা দুই পরে মাদ্রাসার মদর্‌রসে আউয়াল বিবাহ বাড়ী ঘুরিয়া আসিয়া বলিলেন—বিছানা পড়িতে রাত্রি বারটা একটা হইবে। তার পর হাজী সাহেবের কানে কানে কি একটা সংবাদ বলিলেন। হাজী সাহেব যেন মুহূর্তে আসমান হইতে জমিনে পড়িয়া গেলেন—'এঁ্যা বলেন কি, মওলানা ?'

—'আমি স্বচক্ষে কন্যার পিতাকে বুকের উপরে হাত রেখে নমাজ পড়তে দেখেছি।

—শিয়া !

—তাইত মনে হয়।

—হারামজাদা, শুয়োর, সে জেনেও আমাকে বলেনি !

সিরাজের সমস্ত রোমান্স, সমস্ত স্বপ্ন নদীর জলে ডুবিয়া গেল।

—মওলানা, এ'বিয়ে হবে না। এই ব্যাটা মাঝিরা নৌকা ফেরা।

—হুজুর, এখন ত ভাটা। বিস্মিত মাঝি ভয়ে ভয়ে নিবেদন করিল।

কুছ্ পরওয়া নেই, গুণ টেনে, উজান বেয়ে নিয়ে যাও।

জমিদার সাহেব বধূ লইয়া ফিরিতেছেন---সমস্ত গ্রাম নৌকা ঘাটে আসিয়া উপস্থিত। নৌকা হইতে নামিয়াই হাজী সাহেব উচ্চ:স্বরে বলিয়া উঠিলেন—'ইসলাম কী—' সমবেত জনতা চীৎকার করিয়া উঠিল —জয়।

বধূ-শূন্য পাল্কী তাহাতেই ভরিয়া উঠিল !!

১৩৩৪

জনক

সৈয়দ আবদুল আলীম চৌধুরী বড় ব্যবসায়ী ও জমিদার—তাঁহার প্রকাণ্ড দ্বিতল দালান, অসংখ্য দাস-দাসীতে বাড়ী গুলজার। তিনি পাক্কা মুসলমান, সুন্নতের বর্‌খেলাপ্‌ কাজ খুব কমই করেন। তাঁহার চারিটি স্ত্রী।

বৃদ্ধ চৌধুরী সাহেব এবার মনস্থ করিয়াছেন—জীবনের বাকী কয়টা দিন মক্কায় যাইয়া কাটাইবেন। তাই সমস্ত সম্পত্তি উইল করিয়া স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাগণের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতেছেন।

একটি বালকের হাত ধরিয়া একটি মধ্যবয়স্কা মেয়ে চৌধুরী সাহেবের কাছে উপস্থিত......।

'দলিলে আমার বাছার জন্যও যেন কিছু বরাদ্দ থাকে।'

দরজার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া চৌধুরী সাহেব হাঁকিলেন—'তা হয় না......।' বিধবা মেয়েটি তাঁহারই প্রজা।

কয়েকদিন পর দেশ বিখ্যাত জমিদারের নামে এক সমন আসিয়া উপস্থিত......ফাতেমা খোরাকির দাবী করিয়া নালিশ করিয়াছে।

চৌধুরী সাহেব ত আগুন। 'দেখে নেব বেটী কার দুনিয়ায় থাকে!'

ফাতেমার একমাত্র সাক্ষী শহরের বড় মৌলবী সাহেব যিনি তাহাদের আক্‌দ (বিবাহ) পড়াইয়াছিলেন......।

মোকদ্দমার দিন সকালে মৌলবী সাহেবকে মোটরে করিয়া ডাকাইয়া আনিয়া চৌধুরী সাহেব তাঁহার হাতে হাতে অনেক জরুরী কথা আলাপ করিলেন......।

মৌলবী সাহেব আদালতে সাক্ষ্য দিলেন, তিনি এই বিবাহের কিছুই জানেন না।

ফাতেমা আর একটি সাক্ষী গুজরানের প্রার্থনা জানাইল।

আদালত তাহাকে অনুগ্রহ করিল। বালক পুত্রকে কোলে লইয়া সে কাঠগড়ায় গিয়া দাঁড়াইল......'এই আমার প্রধান সাক্ষী'...।

স্তম্ভিত আদালত দেখিল, শিশু-সংস্করণে চৌধুরী সাহেবই বটে! ধর্মাবতার কিন্তু রায়ে লিখিলেন 'আইন বে-আইনী পুত্র' স্বীকার করেনা —মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌...!!

আজ চৌধুরী সাহেব হজ-যাত্রী—গায়ে লম্বা আলখেল্লা, গলায় জুজ্‌দানে তাঁহার নিত্যপাঠ্য কোরাণ শরীফ ও অযিফা—মাথায় শুভ্র পাগড়ী এবং ততোধিক শুভ্র বুকভরা দাড়ি, তাঁহাকে সত্যই দরবেশের মত দেখাইতেছিল। যথারীতি সকলের নিকট বিদায়ের পর তিনি মোটরে আসিয়া উঠিলেন। হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া এক ভিখারিণী ও এক ভিখারী শিশু—পরণে জীর্ণকন্থা ও কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি—তাঁহার দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়াছে। চোখ পড়িতেই তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'জলদী চালাও সোফার—ট্রেন মিস্‌ করব উল্লু কাঁহা কা...!!'

......ভোঁ......মোটর দ্রুতবেগে ধাবিত হইল। স্বর্গ পানে??

১৩৩৪

সংস্কারক

যেদিন সাহিত্য-সভায় সর্বপ্রথম অধ্যাপক আলমের 'নারী ও অবরোধ' সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনিলাম, সেদিন মনে হইয়াছিল, সত্যই দেশে নূতন যুগাবতার বা মুজেদ্দেদের জন্ম হইয়াছে—বাংলার এবং সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের উন্নতি এবার শনৈ শনৈ......।

......আমাদের মেয়েরাও বি-এ. এম-এ. পাশ করিবে, পুরুষকে নরখাদক মনে করিবেনা......দুনিয়ার অন্যান্য উন্নত দেশের মহিলাদের সহিত সমতালে পা ফেলিয়া চলিবে ইত্যাদি অনেক কথাই যাহা আমার মত পাড়াগেঁয়ে ছেলের পক্ষে নূতন, শুনিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। বাস্তবিক সেদিন অধ্যাপক সাহেব যে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাঁহার চোখে মুখে যে দীপ্ত ঔজ্জ্বল্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে মনে হইয়াছিল জাতির নবজন্ম, ইসলামের রিনেসাঁ ঐ এল বুঝি! সেদিন মনে মনে তাঁহাকে আদর্শ সমাজ সংস্কারক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলাম। সেই হইতে তাঁহার পিছনে অনেক হাঁটিয়াছি, নারী জাতির মুক্তির জন্য তাঁহার অনলবর্ষী বক্তৃতা অনেক শুনিয়াছি। দিন দিন তাঁহার প্রতি ভক্তি বাড়িয়াছে বই কমে নাই।

গ্রীষ্মের বন্ধে বাড়ী যাইব। অধ্যাপক সাহেবের সঙ্গে একবার দেখা না করিয়া গেলে কেমন দেখায়! যাত্রার দিন সকালে উঠিয়া তাঁহার বাসার দিকে রওয়ানা হইলাম। পথ চলিতে চলিতে মনে প্রশ্ন জাগিয়াছিল—গুরুপত্নীর কি পদধূলি লইব, না শুধু সালাম জানাইলেই চলিবে?

বাড়ীর গেটে পৌঁছিয়া দেখি, তিনি বারান্দায় পায়চারি করিতেছেন। সালাম করিতেই বলিলেন, 'একটু দাঁড়াও......।' কামরার ভিতর যেন কাহাকে ইশারা করিলেন। অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইবার আগে কামরার ভিতর অলক্ষ্যে এক নজর দেখিয়া লইলাম। শাড়ী-পরা কে একজন যেন বাহির হইয়া গেল।।

ভিতর দিকের দরজাখানি ভেজাইয়া তিনি আমাকে ঢুকিতে আজ্ঞা করিলেন। একটা টুল টানিয়া বসিলাম। যেদিন তাঁহার 'সতীত্ব' প্রবন্ধ পড়িয়াছিলাম, সেদিন হইতে তাঁহার সামনে চেয়ারে বসিতাম না। তিনি লিখিয়াছিলেন,—'পুরুষের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময়ে যে নারীর চরিত্রস্খলনের আশঙ্কা আছে, সে নারী বাজারের পতিতা নারীর চেয়ে কোন অংশেই শ্রেষ্ঠ নয়, ইত্যাদি। আজ সে কথা বারে বারে মনে হইতেছিল আর ভক্তি ও শ্রদ্ধায় আমার অন্তর তাঁহার পায়ে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল...।

দরজা দুই আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক ছিল। তিনি উঠিয়া ভাল করিয়া খিল দিয়া লইয়া আমার সঙ্গে কথা পাড়িলেন......। সাম্‌নের ছুটিতে আমি কি কি করিব, আমাদের গ্রামে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য কিভাবে কাজ করা যায়, Charity begins at home, আমাদের পরিবারের মধ্যে মা-বোনকে কেমন করিয়া up to date করিতে পারি ইত্যাদি অনেক রকম উপদেশই তিনি সেদিন আমাকে দিলেন। হঠাৎ অন্দরের দিকে চোখ পড়িতেই তিনি চাকরকে হাঁকিয়া বলিলেন, 'ঐ দিকের খিড়কিটা বন্ধ করে দে...।'

আরও কিছুক্ষণ আলাপের পর আমি বিদায়ের জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি আবার হাঁকিলেন—'ওরে, সামনের রুম থেকে ওদেরে সরতে বল্, এ যাচ্ছে।'

দরজার কাছে একটি গাড়ী দাঁড়ানো ছিল। বিশেষ আগ্রহ হল ......কিছুদূর আসিয়া একবার পিছন ফিরিয়া তাকাইলাম...সর্বাঙ্গে কাপড় মুড়ি দিয়া দুইটি আট দশ বৎসরের বালিকা দণ্ডায়মান পাল্কী-গাড়ীতে উঠিতেছে......অধ্যাপক সাহেব ও তাঁহার ছেলেরা দুইদিকে দুইখানি পর্দা দিয়া ঘিরিয়া ধরিয়াছেন,। বুঝিলাম, অধ্যাপক সাহেবের মেয়েরা হয়ত কোন আত্মীয় বাড়ী যাইতেছে!!

অধ্যাপকের উচ্চ কণ্ঠস্বর আমার কানে ভাসিয়া আসিল—'পিছনের জাফরিটা বন্ধ করো, বোরকা দেখা যায় যে!!'

সেই দিন আমাকে রাস্তায় আপনা আপনি হাসিতে দেখিয়া লোকে পাগল ঠাউরায় নাই ত?

১৩৩৪

শাঠ্যৌষধ

—বড় রাস্তার মোড়ে যে দোতালা বাড়ীখানা আছে তার উপরের তালায় কিছুদিন হইতে কয়েকজন হিন্দু ভদ্রলোক আছেন। সম্প্রতি কতকগুলি মুসলমানও নীচের তালায় ভাড়াটে হইয়া আসিয়াছে। উপরের তালা হইতেও কিছু নীচে এবং নীচের তালা হইতে কিছু উপরে বারান্দার মত একটা খোলা জায়গায় পায়খানাটা করা হইয়াছে—যাহাতে একটী পায়খানায় উপরে-নীচের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। বুদ্ধিমান বাড়ীওয়ালা।

সকালে নীচের তালার একজনকে পায়খানা হইতে বাহির হইয়া আসিতে দেখিয়া উপরের এক বাবুর নাক মুখ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল—লোকটাকে এখানে পায়খানা করিতে নিষেধ করিয়া দিল।

'ভাড়া দিইনি মশাই?' উত্তেজিত কণ্ঠে উত্তর হইল।

'গরু-খোর কোথাকার এখানে পায়খানা করবে?'

পরদিন উভয় পক্ষ প্রস্তুত।

পায়খানার দুয়ার হইতে বেটা, ম্লেচ্ছ, যবন, কাফের, শালা ইত্যাদি শুরু হইয়া ক্রমশঃ ঘটনা মুখ হইতে হাতে আসিয়া পৌঁছিল......।

ভীষণ মারামারি......দাঙ্গা।

উভয় পক্ষে অনেক হতাহত।

পুলিশ আসিয়া দুই পক্ষকে গ্রেপ্তার করিয়া চালান দিল।

বিচারে ছয় মাস হইতে ছয় সাত বৎসর অনেকের শ্রীঘর বাসের ব্যবস্থা হইল।

সকালে মুকুন্দ লোটা হাতে যাইতেই দেখিল পায়খানা হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে রহিম—উভয়ের মাথায় তখনো পট্টি বাঁধা। পট্টির ভিতরে যেন নূনের ছিটা পড়িল উভয়ের রক্ত আর একবার টগবগ করিয়া উঠিল।

চোখের লড়াই। কলিযুগে দৃষ্টিবাণ গায়ে লাগেনা, লাগিলে দ্বিতীয় বার রক্তপাত অনিবার্য্য ছিল।

'কেঁউ উল্লু খাড়া হে.....' উভয়ের ভয়ার্ত্ত দৃষ্টি পিছনে ফিরিতেই দেখিল—বন্দুক কাঁধে সান্ত্রী পায়চারি করিতেছে।

বিধি বাম।

চোখ কট্‌মট্‌ করিয়া মুকুন্দ পায়খানায় ঢুকিয়া পড়িল।

রহিম তাড়াতাড়ি ছুটিয়া চলিল তৈলের ঘানির দিকে।।

১৩৩৬
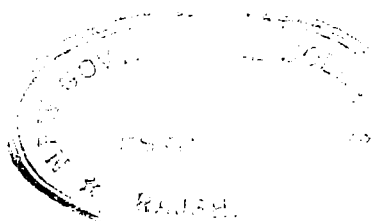
নিজের মা ও পরের বাপ

সদ্য খানসাহেব খেতাবপ্রাপ্ত চৌধুরী সাহেব সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমে বসে চুরুট ফুঁকছিলেন, আর হয়ত মনে মনে খসড়া তৈয়ার করছিলেন কি করে আর এক লাফে একেবারে—'বাহাদুরে' উন্নীত হয়ে পুরাদস্তুর 'খানবাহাদুর' হবেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ অন্দর থেকে হৈ চৈ ও কান্নাকাটির এক সম্মিলিত চীৎকার তাঁর কানে ভেসে এল,—খোকা কুয়ায় পড়ে গেছে, খোকা কুয়ায় পড়ে গেছে! মুহূর্তে বিদ্যুদ্‌স্পৃষ্টের মত চৌধুরী সাহেব তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে পড়লেন, মুখের চুরুট কোথায় ছিট্‌কে পড়ল তার আর ঠিকঠিকানা রইল না। গায়ের চাদর ছুঁড়ে ফেলে রুদ্ধশ্বাসে ছুট্‌লেন তিনি ভিতর প্রাঙ্গণের দিকে।

—'সর্বনাশ, সর্বনাশ, কি করে পড়ল, কি করে পড়ল?'—মুখে বল্‌তে বল্‌তে, পায়ে ছুট্‌তে ছুট্‌তেই তাঁর মাল-কোঁচা মারা হয়ে গেল, জল তোলার দড়িটা কোমরে জড়িয়ে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছেন, এমন সময় চৌধুরী-গিন্নি চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন—বোধ করি চীৎকার শুনে তিনিও দোতালা থেকে ছোট ছেলেটাকে কোলে নিয়ে দৌড়ে নাম্‌ছিলেন, সিঁড়ির গোড়া থেকে স্বামীকে এই বীরমূর্ত্তিতে দেখে সতী সাধ্বী আর স্থির থাকতে পারলেন না—'তুমি কেন পাগলামি কর্‌ছ, তুমি মরবে নাকি? কুয়ায় নাম্‌লে আর উঠ্‌তে পারবে?'

চীৎকার শুনে চোখ ফিরাতেই, চারিচক্ষুর মিলনের ফলে নয়, যা দেখলেন তাতেই তাঁর উৎকণ্ঠিত ভীত পাণ্ডুর মুখেও এক নির্মল হাসি ফুটে উঠল, উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠ্‌লেন,'—ওই যে খোকা—!'

অন্য ছেলেমেয়েরা সমস্বরে বলে উঠল—'ঝিয়ের খোকা বাবা, ঝিয়ের খোকা'।

—'অঃ!' বলে একটা পূর্ণ পরিতৃপ্তির নিশ্বাস, চৌধুরী সাহেবের প্রশস্ত ও সুপুষ্ট বুক থেকে (যে বুকে তিনি আগামী নববর্ষে 'সাহেব'

থেকে 'বাহাদুরে' উন্নীত হওয়ার উচ্চাশা পোষণ করছেন) উঠে সুন্দর লাবণ্যময়-নাকের দুই সুড়ঙ্গপথে বেরিয়ে গেল। হাত অটোম্যাটিক কলের মত মুহূর্ত্তে মাল-কোঁচা খুলে ফেল্ল। তিনি ফের যথারীতি ভদ্রলোক হয়ে দাঁড়ালেন।

—'ঝি হারামজাদি কই? একটা লোক টোক ডেকে আনে না কেন!'—ভদ্রলোক হওয়ামাত্রই তিনি ক্রোধোন্মত্ত কণ্ঠে গর্জ্জন করে উঠ্‌লেন। ছেলেমেয়েরা চেঁচিয়ে উঠল—'ওই যে বাবা বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে।'

ছেলেটা বড্ড মা নেওটা। সব সময় মায়ের পাশে পাশেই ঘুরে বেড়ায়। সকাল থেকে ঝি কূয়ার ধারে বসে বাসি হাঁড়িপাতিল মাজা ঘষা করছিল, মায়ের বারবার নিষেধ সত্বেও ছেলেটা কূয়ার দড়ি নিয়ে খেল্‌ছিল। হয়ত জল তুলতে চেষ্টা করছিল, হয়ত বা জল-ভরা বাল্‌তির ভারে হঠাৎ কূয়ায় পড়ে গেছে। ঝুপ্‌ শব্দ শুনে বিদ্যুৎগতিতে উঠে বুড়ি কূয়ায় ঝাঁপ দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ মাথাঘুরে, হয়ত বা পা পিছলে সানের উপর পড়ে গেছে, পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বেহুঁশ, মুখে আর রা করতে পারেনি দাঁতে দাঁত লেগে একেবারে ফীট্।

ভাগ্যে, সেই মুহূর্ত্তে চাকরটি বাজার থেকে এসে ঢুকল, শুনে তাড়াতাড়ি সে ধামাটা নামিয়ে দড়ি বেয়ে নেমে গেল। চৌধুরী ও চৌধুরীগিন্নী সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন নীচের দিকে। খানসাহেব হয়ত মনে মনে ভাবলেন, যত বাহাদুরিই সে দেখাক, কস্মিনকালেও তার ভাগ্যে 'বাহাদুর' খেতাব জুটবে না!

মাথায় অনেকক্ষণ জল ঢালার পর বুড়ি ঝিয়ের হুঁশ ফিরে এল, চোখ খুলে চাকরের কোলে খোকাকে দেখে লাফিয়ে উঠে মত্ত হস্তীর বলেই যেন সে খোকাকে নিজের বুকে টেনে নিলে। ইত্যবসরে চৌধুরী সাহেবের খোকাটিও কখন যে মার কোল থেকে বাপের কোলে স্থানান্তরিত হয়েছে তা কেউ লক্ষ্য করেনি। আদরের আতিশয্যে আজ খোকাকে শুধু কোলে নিয়ে যেন তাঁর তৃপ্তি হচ্ছিল না। খোকার দু'হাত নিজের গলার দু'দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে তিনি আজ তাকে নিবিড়ভাবে বুকে জড়িয়ে

ধরেছেন। চৌধুরী সাহেবের ভাবে মনে হল, এই নিবিড় পৈত্রিক স্নেহটুকু আজ খোকার একান্তই প্রাপ্য, সে কুয়ায় পড়ে নি, এই কি তার পক্ষে কম কৃতিত্ব!

গম্ভীরকণ্ঠে চৌধুরী সাহেব ঝিকে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন—'খোদা বাঁচানেওয়ালা, আর একটু হলেই ত তোমরা মায়েপুতে আমাকে পুলিশের হাঙ্গামায় ফেলেছিলে।' মুখে কথাটা বলে, ভিতরে ভিতরে তিনি শিউরে উঠলেন; তা'হলে হয়ত সারা জীবনের জন্য তাঁর 'বাহাদুর' হওয়াটাই ফস্‌কে যেত, উঃ। পরক্ষণে গর্জ্জন করে উঠলেন —'এমন হারামজাদ বজ্জাত ঝি আমি আর রাখতে পারব না, কাল থেকে তুমি আর আমাদের এখানে কাজে এসো না বুঝেছ, আমরা অন্য ঝি রাখব।'

এই দুর্দিনে অন্নহীনের দু'বেলা অন্নের ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আদেশ শুনে ঝি'য়ের আবার মূর্চ্ছা পাওয়া উচিত ছিল। আশ্চর্য মূর্চ্ছা কিন্তু ও যায়নি। বরং দেখা গেল এক অনাবিল পুলকানন্দে তার শীর্ণ চোখমুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে এবং খোকার সিক্ত মুখমণ্ডলে সে তার ফোকলা মুখে চুম্বনের পর চুম্বন বুলিয়ে দিচ্ছে।

তাঁর আদেশের এই শোচনীয় পরিণাম দেখে, খাঁন সাহেবের আপাদ-মস্তক জ্বলে উঠল। এ দৃশ্য তাঁর যেন আর কিছুতেই সহ্য হল না। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে তিনি দ্রুত সেই স্থান ত্যাগ করলেন।

কিন্তু পরম বিস্ময়ের বিষয় ড্রয়িং রুমের দিকে যেতে যেতে তাঁর ওষ্ঠদ্বয়ও অটোম্যাটিক যন্ত্রের মত ক্রোড়স্থিত খোকার মুখমণ্ডলে বার বার ন্যস্ত হতে লাগল।

১৩৫০

কবিতার অপমৃত্যু

দক্ষিণ-দ্বারী ছোট্ট শোবার ঘর। সদ্য আহার সমাধা ক'রে মাহবুব এইমাত্র উঠে এসে খাটের উপর গড়িয়ে পড়েছে। স্ত্রী নাহার বিছানার পাশে বসে মাহবুবের মুখে গুঁজে দিলে পানের খিলিটি। মাহবুব নাহারের মুখের দিকে চেয়েই পান চিবোতে লাগ্‌লো। হয়ত সে-মুখ চেয়ে থাকার মতোই। সকালে চা খেয়ে নাহার যে পান খেয়েছে তারি লালিমা তার দুই ঠোঁটের আগায় এখনো মিলিয়ে যায়নি—তারি লাল্‌চে আভা চিকন ঠোঁট দু'টির আগায় এখনো মেঘাবৃত ইন্দ্রধনুর মতো শোভা পাচ্ছে। নাহার হাসুক বা না হাসুক, মনে হয় সব সময় রূপোর মতো চকচকে একখানি হাসি জ্যোতির মতো তার সারা মুখে ছড়িয়ে আছে, বসন্তের একটী 'কু'তেই সে হাসি হয়ত এক্ষুণি ফুলের মত ফুটে উঠ্‌বে —কিন্তু ভেঙে ছড়িয়ে পড়বে না।

মাহবুবের সদ্য-রক্তস্নাত ঠোঁট দু'টির দিকে চেয়ে চেয়ে নাহার বল্লেঃ আমি চট করে খেয়ে আসি, তুমি ঘুমোও, কেমন?

মাহবুব পাশ ফির্‌তে ফির্‌তে বল্লেঃ বড্ড শীত শিগ্‌গীর এসে ল্যাপারখানা দিয়ে যেয়ো—ব'লে কুঁক্‌ড়ে সে চোখ বুঁজবার আয়োজন করতে লাগ্‌লো।

উঠ্‌তে উঠ্‌তে নাহার মাহবুবের নীচের ঠোঁটটা টিপে দি'য়ে বল্লেঃ ঠোঁট দু'টি ত বেশ জবাফুল হয়ে উঠেছে!

তাই না কি?—সম্পূর্ণ না ফিরেই নাহারের মাথাটী টেনে নিয়ে সে একটী চুমু খেলে।

যাবার সময় নাহার ব'লে গেলঃ একটু গরম হলেই, খেয়ে এসে আমি কম্বল দিয়ে যাবো।

চোখ বুঁজতেই হঠাৎ মাহবুবের এক অদ্ভুত খেয়াল হ'ল—যে খেয়ালের এই মাত্র practical demonstration হয়ে গেল, যে

খেয়াল নিয়ে গত সন্ধ্যায় ক্লাবে বসে মাহবুব তুর্ক ত নয় আস্ত বক্তৃতাই দিয়ে দিয়েছেঃ পান খাওয়া আর চুমু খাওয়ায় ফারাক কি?

অদ্ভুতই ত বটে! যে একটা চুমুর জন্য কত কবি কতবার সমরকন্দ আর বোখারা দান ক'রে ফেল্‌তে এতটুকু দ্বিধা করেনি, সে চুমু খাওয়ার সঙ্গে তুলনা করা কিনা পান খাওয়ার।

এই পরিপূর্ণ যৌবনে তার সাতাশ বছরের সঞ্চিত সমস্ত ক্ষুধা কৌতূহল উৎসাহ সব কি ক'রে যে নিভে একেবারে পানি হয়ে গেল সেও এক আশ্চর্য্য ব্যাপার।

এক বছর আগে নাহারকে একবার মাত্র দেখে মাহবুব তার জন্য কি পাগলামীই না করেছে,—এখন তা মনে হ'লে তার নিজেরই হাসি পায়।

সব কবিতাগুলি ছাপালে হয়ত একটা এনসাক্লোপিডিয়াই হয়ে উঠত!

সে মাহবুব কি ক'রে কাল ক্লাবে বসে এড্‌মণ্ড-বার্কী কণ্ঠে ব'লে এসেছেঃ সে নাকি পল্টন ময়দানে দাঁড়িয়েও এ কথা তারস্বরে ঘোষণা কর্‌তে পারে যে, মেয়েলোকের ঠোঁটও যা, পুরুষের ঠোঁটও তাই, নিছক মাংসপিণ্ড—। ওদের লালা সে যতই তরল রৌপ্যের মতো দেখাক না, ওতে শর্করা-জাতীয় কোনো পদার্থ ত নাই-ই বরং ভয়ঙ্কর কোনো রোগের বীজাণু থাকাও বিচিত্র নয়।—দশটা পাঁচটা দাম্পত্য জীবনও যা, দশটা পাঁচটা অফিস করাও নাকি তাই।—এখন অন্তত এই ত মাহবুবের মত।

পৌষের দুপুরে খেয়ে এসে শু'লে শীত একটু লাগবেই ত। কুঁক্‌ড়ে, হাত দু'টি বুকের ভিতর গুঁজে, চেষ্টার ত্রুটী হ'ল না, কিন্তু ঘুম এল না।—উঠে এসে কাপড়ের সন্ধানে এদিক সেদিক চোখ ঘুরিয়ে বুঝলে, লেপ কম্বল মায় চাদরগুলি পর্য্যন্ত হয়ত ছাদের উপর রোদে গা গরম করছে।

চৌকাট পর্য্যন্ত রোদ এসেছে, সে উঠে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালে, তার যেন আজ নতুন ক'রে উপলব্ধি হ'ল—শীতকালে খেয়ে ঠায় রোদে দাঁড়ান বেশ আরাম ত।

হঠাৎ দূরে বেড়ার ফাঁকে ভিতরের ঘেরা-পুকুরের দিকে চোখ পড়তেই তার চোখে মুখে উৎসাহ জ্বলে উঠল।

চৌকাটের উপর দাঁড়িয়ে আঙুলের মাথায় ভর দিয়ে দেখবার চেষ্টা করলে—কিন্তু বিশেষ স্পষ্টভাবে ঠাহর করা যায় না। উঁচু বেড়ার ফাঁক দিয়ে শুধু এক আধটু চুল-নাড়া গা-মোছা, ভিজা গায়ের চাকচিক্য, এই টুকুই শুধু দেখা যাচ্ছে। তবে এইটুকু আন্দাজ করা গেল, কোনো মেয়ে সদ্য স্নান ক'রে উঠে গামছা দিয়ে চুল ঝাড়ছে। বেড়ার ফাঁকে মেয়েটির সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে কিছুই আন্দাজ করা গেল না বটে, তবে সে যে পুরুষ নয় এইটুকু আন্দাজই তার উৎসাহের আকাশে শত সূর্য্য জ্বালাবার জন্য যথেষ্ট। মাহবুবের বুকের ভিতর রক্ত চলাচল দ্রুত হতে দ্রুততর হতে লাগল—নীচের ঠোঁটটী উপরের দাঁতের নীচে আপনা আপনিই চাপা পড়ল।

উৎসাহ ও কৌতূহলের শতশিখা তার শিরায় শিরায় লেলিহান হয়ে উঠল। পিছনের দরজার দিকে বার বার ফিরে ফিরে তাকাল—নাহার বা অন্য কেউ যদি এসে পড়ে।

পাশের বাড়ির বউ টউ কেউ হ'বে বুঝি। মাহবুবটা এমনি অসভ্য—এই কথা মনে হতেই তার উৎসাহের বা নারী সম্বন্ধে কৌতূহলের কিছুমাত্র লাঘব হ'লনা। তার মনে হল ইচ্ছে করলে সে আগের মতো এক্ষুণি একটা কবিতা লিখে ফেলতে পারে।

মেয়েটী কাপড় বদলে ফির্‌ছে। তাকে দরজায় এমনিভাবে হা ক'রে তাকিয়ে থাকতে দেখলে কি ভাববে কাজেই সে জানালার দিকে সরে গেল—জানালার পর্দ্দায় দৃষ্টি গলাবার মতো যথেষ্ট ফাঁক আছে বটে কিন্তু বাইর থেকে দেখার বিশেষ সম্ভাবনা নেই। কাজেই মাহবুব জানালার দিকেই সরে দাঁড়াল।

মেয়েটী বুঝি তার সরবার আগেই উঠানে বাড়িয়েছিল পা সেখান থেকেই বিস্মিত কণ্ঠে ব'লে উঠল—এরি মধ্যে উঠে পড়েছ।

স্নান-শুচি মেয়েটির দুই কাঁধ বেয়ে জলভরা মেঘের মতো ঘন চুল নেমে পড়েছে,—দুই চোখে তরবারির মতো দু'খানি হাসি চিক্‌চিক্‌

করছে। মেয়েটির সে শুচি স্নাত শ্রী যে-কোনো পুরুষের বুকের রক্তকে উষ্ণ ক'রে তুলতে পারে; কিন্তু মাহবুবের সবই অদ্ভুত—তার মুখের পূর্ণিমায় হঠাৎ যেন অমাবস্যা নেমে এল।

পৌষের রাতে লেপের ভিতর এক লোটা বরফ পানি ঢেলে দিলেও এমন হতাশ হতে হয় না। তার আশা ও উৎসাহের আকাশের দীপ্ত সূর্য্য নিমেষে দপ্ ক'রে নিভে গেল। এমন একটী প্রাণ-চঞ্চল আশা—যার শিখা এতক্ষণ ধ'রে তার শিরায় শিরায় লেলিহান হয়ে ফিরছিল, তা এক ফুঁয়ে নিভে ছাই হয়ে গেল।

অথচ এক বছর আগেও এই মেয়েটির জন্য সে বহু কবিতাই লিখেছে, অথবা এক মুহূর্ত্ত আগেও লিখতে পারত।

১৩৩৮

আলো ছায়া

“‘মাফ্ করো, মাফ্ করো”—হঠাৎ তাহার চিন্তায় বাধা পাইয়া কাসেম চোখ তুলিয়া চাহিল। একটী লোলচর্ম্মা শীর্ণকায়া ভিখারিণী। ভ্রুর চামড়া ঝুলিয়া পড়িয়া চোখ দুইটিকে এক রকম ঢাকিয়াই ফেলিয়াছে, সমস্ত দেহ ধনুকের মত বাঁকিয়া একটী দেড়হস্ত পরিমাণ লাঠির উপর ভর করিয়া আছে, যেন গাছের মরা ডাল, মাত্র একটুখানি দমকা বাতাসের অপেক্ষা! নীচের দিক হইতে চোখ তুলিতেই অক্ষম, যেন সে সারাক্ষণ তার হারা যৌবনকে খুঁজিয়া ফিরিতেছে......! যার কাছে হাত পাতে সেই বলে মাফ্ করো—কাসেমের বডড ইচ্ছা হইল বুড়ীর শীর্ণ হাতের মধ্যে একটী আনি গুঁজিয়া দেয়, কিন্তু সবাইর মাফ করোর মধ্যে নিজেকে একা পৃথক করিয়া লইতে তার যেন সঙ্কোচ হইল—আর দশ জনের দৃষ্টি আকর্ষণের ভয়ে সেও ঘাড় নাড়িয়া না করিয়া দিল। পরক্ষণেই মনে হইল নীচে যাইয়া বুড়ীকে একটা আনি দিয়া আসিতে হইবে।

ডেকের উপর ডান পার্শ্বে দুইটি মেয়ে ও দুইটি পুরুষ একটী বিছানার উপর জড় হইয়া বসিয়া কখনও বিড়ি টানিতেছিল, কখনও বা নারিকেলের হুঁকা, আর বেশ সহজ আনন্দে নর-নারী-নির্বিশেষে মুখ পরিবর্ত্তন করিতেছিল। চেহারা দেখিলে মনে হয় তাহারা ঠিক পাহাড়ী না হইলেও পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী অপেক্ষাকৃত সভ্য কোন পার্বত্য জাতি হইবে। মেয়েদের মধ্যে একটির বয়স চৌদ্দ পর্যন্ত হইতে পারে কিন্তু তার দেহ গঠনের পরিপুষ্টি পূর্ণযুবতীর মত। রং বেশ সাধারণ বাঙ্গালী ঘরের মেয়েদের মতই ফর্সা, কিন্তু নাকটা চাপা হওয়াতে মুখ-শ্রী নষ্ট হইয়াছে। নিটোল হাত বেশ মোটা সোটা পরিপুষ্ট—প্রশস্ত বক্ষস্থল, খুব কম বাঙ্গালী পূর্ণবয়স্ক যুবকের তত প্রশস্ত বক্ষস্থল দেখা যায়। পা দু’খানি যেন লোহার থাম, বালিকাকে দেখিতে সেকালের রোমান গেলেডিয়টরের কিশোর মূর্ত্তির মত দেখাইতেছিল।

সব চাইতে দেখিবার ছিল তার গাল দুইখানি, যেন গালের ভিতর দু'টা বড় বড় বেল পুরিয়া দেওয়া হইয়াছে, সে সমুন্নত গাল দুইখানির উপর রক্তের হোলি খেলা চলিতেছে। বক্ষের দুই পার্শ্ব ঈষদোন্নত হইয়া উঠিতেছে---মহাসাগরের বুকে জল ফুঁড়িয়া যখন প্রথম দ্বীপ জন্ম লাভ করে, দূর তীরভূমি হইতেও দ্বীপের উচ্চতা দেখা যায় না, অথচ মনে হয় যেন সমস্ত সাগর সেখানে মাথা ফুঁড়িয়া উঠিতে চাহিতেছে—দেখিলেই মনে হয় ইহারও দেহের সমস্ত স্বাস্থ্য যেন বুকের দুই কেন্দ্রে দানা বাঁধিবার জন্য আকুলি বিকুলি করিতেছে। নিকটবর্ত্তী সব যাত্রীর চোখ পড়িয়াছিল তার গাল দুইখানির উপর। বালিকা কিন্তু নির্বিকার চিত্তে হুঁকা টানিতেছিল।

একটী বুড়া বাবু আসিয়া কাছে বসিলেন, ভোজন রত ব্যক্তির হাতের কাঁটাটির প্রতি মার্জ্জারপত্নী যেমন করিয়া তাকায় বুড়ার দৃষ্টি বালিকাটির হুঁকার প্রতি অনেকটা সেই রকম। পুরুষটী হুঁকা বাবুর হাতে তুলিয়া দিল। বাবু হুঁকাটী রাখিয়া কলিকাটী বার কয়েক টানিয়া ফুলা ফুলা গাল দু'খানির উপর ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বার কয়েক দৃষ্টি হানিয়া চলিয়া গেল। হুঁকা দেখিলেই বাবু ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া বসে। ধূমের সঙ্গে দৃষ্টি সুধা, চায়ের সঙ্গে দুধের মতই চলিতে লাগিল।

পিছনে সিঁড়ির কাছে এক পয়সার মাল তিন পয়সায় বিক্রির দোকান ছিল। এক ছড়া শুকনা কলা, শুকাইয়া দড়ি হইয়াছে--টিনের ভিতর কতকগুলি বিস্কুট তথৈবচ। পান বানাইয়া খুব গাদা করিয়া রাখা হইয়াছে আর সিগারেটের খালি ও ভরা প্যাকেটে সাজাইয়া স্থানটিকে দোকান করিয়া তুলিবার রীতিমত চেষ্টা হইয়াছে। আর একটা মোটা টিনের ভিতর কতকগুলি মুড়ী দাঁতের চাইতেও শক্ত হইয়া আছে। বলা বাহুল্য চা ত আছেই।

চা ঢালা হইতেছিল, আর অপেক্ষাকৃত সাদাকাপড়ওয়ালারা চুমুক লাগাইতেছিলেন। লেমোনেড্ খাইয়া বোতলটি মাটীতে রাখিতেই কোথা হইতে ক্ষুদে কুকুরের মত একটি জীর্ণ কন্থা পরিহিতা ময়লা মেয়ে দৌড়িয়া আসিয়া কাসেমের দিকে দুইটি সাদা সাদা মিনতিভরা চোখ

তুলিয়া বলিল—বাবু আমি খাই? বোতলের নীচে কিছু সাদা ফেনা জমা হইয়াছিল।

বোতলটি অনেকক্ষণ মুখের উপর উপুর করিয়া রাখিল, কিছু পড়িল কিনা কে জানে। হঠাৎ দোকানদারের ধমক খাইয়া থতমত ভাবে বোতলটা নামাইয়া রাখিয়া মেয়েটা দৌড় দিল—জিভ চাটিতে চাটিতে মেয়েটা জাহাজের এক কোণে একটা শতচ্ছিন্ন জীর্ণ বাসপরিহিতা বৃদ্ধার কাছে যাইয়া বলিল—মা, আমি সরবৎ খাইছি, তুই খাবি?—

রেল জাহাজ অনাবিষ্কৃত দেশের মত—যে আগে আসিতে পারে তারই রাজ্য বিস্তৃতির অপ্রতিহত অধিকার।

ষ্টীমারে আগের ষ্টেশনে যাত্রী যারা উঠিয়াছিল তারা নিজেদের বিছানা পত্র যতখানি ছিল সবখানি সাধ্যানুসারে বিস্তৃত করিয়া বিছাইয়া সটান শুইয়া পড়িয়াছে। আর বাক্স তোরঙ্গ দিয়া যতখানি জায়গা দখল করা সম্ভব করিয়া ফেলিয়াছে।

পরবর্ত্তী ষ্টেশনে বিস্তর কুলী উঠিল—ইহারা আসামে চা বাগিচায় চালান হইতেছে। বেচারীরা উঠিয়া দেখে চল্লিশ পঞ্চাশজন বাবু সমস্ত ডেকটা দখল করিয়া আছে। ময়লা এক একটা গাঁট্রি লইয়া সবাই এদিক ওদিক ঘুরিতে লাগিল। বাবুদেরও ছোট হইবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। শেষকালে বুকে খুব করিয়া সাহস বাঁধিয়া একজন কোণার দিকের এক বাবুকে বলিল—হুজুর, একজরা। হুজুর চাদরের নীচে চোখ মেলিয়া বলিল—কে? ভাগ্।

নীচে খালাসীরা ভাত খাইতেছে, একটা বড় সিন্দুকের মত বাক্স তাহার উপর আটদশজনলোক এক একটি টিনের বা মাটির বাসন লইয়া বসিয়া পড়িয়াছে, কর্ত্তা গোছের একজন পরিবেশন করিতেছে। মোটা মোটা ভাত থালার পর থালা কোথায় উধাও হইয়া যাইতেছে; তবে সালন একচামচের বেশী নয়, তথাপি বাধিতেছে না, এক একটা গ্রাস যেন শিক্ষিত বাঙ্গালীর এক এক বেলা। বীর্য্যশ্রীমণ্ডিত দৃঢ়কায় সবল পেশী এ দুঃসাহসী লোকগুলিকে দেখিলে বুকে ভরসা হয়, মনে আশা জাগে Dominion Status কি full Independence চাই।

অনেকক্ষণ থার্ড ক্লাসের এ গাড়ী ও গাড়ী ঘুরিয়া কাসেম যখন শেষ একটাতে সুট্‌কেস্‌টী রাখিয়া বসিবার জায়গা তালাস করিল তখন দেখে গোয়ালন্দ জাহাজের যাত্রীরা আগে উঠিয়া সব লম্বা হইয়া শুইয়া আছে। লেট্রিনের কাছে একটুখানি জায়গায় জাহাজের সে পাহাড়ী কিশোরী ও তার সঙ্গিনীটি জড়সড় হইয়া কোন প্রকারে বসিয়া আছে। সটান শায়িত বাবুর পা আসিয়া কিশোরীর গদীর মত রাণ স্পর্শ করিয়াছে। পুরুষটি লেট্রিন ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বার কয়েক এদিক ওদিক ঘুরিয়া সে তাহাদের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতেই মেয়ে দুইটী উঠিয়া একটা কাপড় পাতিয়া নীচে বসিয়া গেল। পুরুষগুলি ভাঙ্গা বাংলায় বলিল—বাবু বসিয়েন। লজ্জায় তাহার মাথা হেট হইয়া গেল! তাহার ভিতর যে বাঙ্গালী পুরুষ ছিল তাহার আর মাথা তুলিবার পথ রহিল না। তাড়াতাড়ি সে দরজার কাছে আসিয়া মাথা লাগাইয়া বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহাদের দিকে আর তাকাইতেই পারিল না।

কালীবাড়ী ষ্টেশনে গাড়ী থামিতেই সুট্‌কেস্‌টী লইয়া সে নামিয়া পড়িল।

অন্য গাড়ীতে উঠিয়া দেখে অবস্থা তথৈবচ। মিঞা সাহেবেরা আর বাবুরা সটান শুইয়া আছেন। কুলী ও তথাকথিত ছোট লোকেরা বেঞ্চে এবং নীচে বসিয়া ঢুলিতেছে, কেউ কেউ দরজায় ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঘুরিয়া ফিরিয়া অনেকক্ষণ দেখিল জায়গা কোথায়ও নাই। একটা বাজে লোক তাহাকে "অজুর বইয়েন" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কি জানি লোকটা তাহাকে চিনিল, না তাহার পাজামাকেই সম্মান করিল। কিন্তু তাহার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল, ইহারা এমনি করিয়া মার খাইতেছে! পাশের শায়িত বাবুকে সজোরে ধাক্কা দিয়া বলিল-- মশায় উঠে বসুন। ঘুম পাতাড়ী বাবু জাগিয়া উঠিয়া একেবারে খেঁকি কুকুরের মত তেড়িয়া উঠিল। কাসেম এ পরিণতির জন্য প্রস্তুতই ছিল। বেশী কথা বলা তার স্বভাব নয়। য়ুনির্ভা.সটি জিমনেসিয়ামে মুগুরভাঁজাহাতে বাবুর ডান হাতখানিকে মুচড়িয়া ধরিয়া আর এক হাতে একটী ঘুষি তুলিতেই কলের মত বাবুর অন্যহাত বিছানা যতদূর সম্ভব কুড়াইয়া লইল।

অন্ধকারের বুক চিরিয়া বিরাট দৈত্যের মত গাড়ী ছুটিয়াছে। সুদূর দিগন্তের কিনারে কিনারে খণ্ড আলো রেখা দেখা যাইতেছে, সে আলোও যেন গাড়ীর সাথে সাথে পাল্লা দিয়া দৌড়াইতেছে। তাহার দৃষ্টি সে অন্ধকার সৌন্দর্য্যের মধ্যে আলোর ঘোড়দৌড়ে ডুবিয়া গেল।

জানালার উপর মাথা রাখিয়া কাসেম ষ্টেশনে লোক উঠানামা দেখিতেছিল। বাঁশীর সাথে সাথে গাড়ী প্রথমে মন্থর গতিতে তারপর আরও জোরে চলিতে লাগিল। শেষ দমটী টানিয়া হাতের সিগারেটটী ফেলিয়া দিয়া নীচের দিকে তাকাইতেই দেখে একটী মেয়ে এক হাতে বুকের মধ্যে কি একটা চাপিয়া ধরিয়া উর্দ্ধশ্বাসে গাড়ীর সঙ্গে দৌড়াইতেছে। কর্তব্য স্থির করিতে দেরী হইল না। দরজা খুলিয়া কাসেম এক হাতে বাহিরের দিকের হ্যাণ্ডেলটি ধরিয়া আর এক হাত প্রসারিত করিয়া কোন প্রকারে মেয়েটির একখানি হাতের নাগাল পাইল—টানিয়া তাহাকে একেবারে গাড়ীতেই তুলিয়া ফেলিল।

অনেকক্ষণ হাউ মাউ করিয়া হিন্দী-বাংলার মিশ্রণে মেয়েটী যাহা বলিল তাহা হইতে এটুকু মাত্র বুঝা গেল—আসামের ঐদিকে তাহারা কোন একটা চা বাগিচায় স্বামী স্ত্রী কাজ করিত। হঠাৎ কলেরায় আক্রান্ত হইয়া আজ তিন দিন হইল তাহার স্বামী মারা গিয়াছে। স্বামীর শেষ নিদর্শন, তাহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন এ ছেলেটিকে লইয়া সে পলাইয়া যাইতেছে, পাছে এ ক্ষুদ্র শিশুও সেই মহারাক্ষসীর হাত হইতে নিস্তার না পায়। স্বামী স্ত্রীর সমগ্র কুলী জীবনের সঞ্চিত যা ছিল তাহাতে শুধু একখানি চাটগাঁর টিকেটের ভাড়া হইয়াছে। মেয়েটির বয়স কুড়ি বাইশ হইবে, শীর্ণ মুখ, সমস্ত দেহখানি শুঁট্‌কী মাছের মত শুকাইয়া গিয়াছে, ভাত কাপড় পাইলে মেয়েটি সুন্দরী হইতে পারিত। ছেলেটী কাঁদিয়া মরিতেছে। এটা ওটা করিয়া শুষ্ক স্তন বারে বারে সে শিশুর মুখে ঠেলিয়া দিতেছিল, শিশুর কান্না থামিবার মত তাহা হইতে কিছু বাহির হইলে কান্না থামিত।

তখন ভোর হয় হয়, নিদ্রিত যাত্রীরা প্রায় জাগিয়া উঠিয়াছে। মেয়েটি বসিতে পারে সেই পরিমাণ একটুখানি জায়গা দিবার জন্য কাসেম অনেককে অনুরোধ করিল—কিন্তু নিজের দখলী স্বত্ব স্বেচ্ছায়

অন্যকে ছাড়িয়া দিবার মত আহাম্মক সেখানে কিেউ ছিল না। রাগে তাহার সর্বশরীর ঘিস্ ঘিস্ করিতেছিল, অথচ অপরিচিতা তরুণী মেয়ের পক্ষ হইয়া ঝগড়া করিতেও তাহার লজ্জা হইতেছিল। শোয়া থেকেই একটী বাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন Charity begins at home। তাইত, লজ্জায় তাহার সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়া উঠিল, তথাপি সে উঠিয়া মেয়েটিকে তাহার জায়গায় বসিতে বলিল, মেয়েটি ঘাড় নাড়িয়া অসম্মতি জানাইল এবং আঁচল বিছাইয়া যেখানে সে লেপ্টাইয়া বসিয়া পড়িয়াছিল সেখানেই বসিয়া রহিল।

ছেলের কান্নায় গাড়ীর সবাই উত্যক্ত হইয়া উঠিল। ভোরে কোথায় শ্যামল প্রকৃতির লীলাখেলা দেখিবে, বাবুরা চন্দ্রনাথ পাহাড়ের উদ্দেশ্যে নমস্কার করিবে, মিঞা সাহেবেরা একটু আল্লার নাম নিবে, না চেঁচামেচি! অনেকের মনের ভাব—ধ্যেৎ, কার মুখ দেখে আজ গাড়ীতে উঠেছিলাম! অনেকক্ষণ কান্নাকাটির পর ছেলেটি একরকম নির্জীব হইয়া নেতাইয়া পড়িল। সীতাকুণ্ডে ট্রেন মিনিট পাঁচ সাতেক থামিবে, কাসেমের বডড ইচ্ছা হইতেছিল, মেয়েটিকে কিছু খাবার কিনিয়া দেয়, কিন্তু লজ্জায় তাহার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবশ হইয়া রহিল। ট্রেন থামিতেই চট্ করিয়া তাহার মনে হইল একি দুর্বলতা! তৎক্ষণাৎ ভেণ্ডারকে ডাকিয়া কিছু খাবার কিনিয়া সে মেয়েটিকে দিয়া দিল। বুভুক্ষু শকুনি মরাগরু যেমন করিয়া গেলে মেয়েটি তেমন করিয়া খাবারগুলি গিলিতে লাগিল। তাহার সহযাত্রীদের হঠাৎ গলার এক্সারসাইজের দরকার হইয়া পড়িল। সকলে খাঁ, কুঁ, খুঁৎ, হ্যাঁচ্ছো আরম্ভ করিয়া দিল। আর সেই সঙ্গে বিশেষ অর্থপূর্ণ দৃষ্টি পরস্পরের মধ্যে বিনিময় হইতে লাগিল।

হামীদ পাশের সঙ্গীকে বলিল আগেই ত আমি ইসারা করেছিলাম। লোকটিও সমঝদারের মত মাথা নাড়িয়া উত্তর করিল, দুনিয়াতে সব শালাই ঐ...। উপরের ঝুলানো তক্তা হইতে কোন কলেজফেরৎ যুবক হাঁকিল—গণেশদা, বঙ্কিমবাবু না লিখেছেন, সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র?

ইসাক বি. সি. এস পরীক্ষা দিয়া ফিরিতেছে সে সুর করিয়া বলিয়া উঠিল A thing of beauty is a joy for ever. অন্য এক যুবক মুচকি হাসিয়া আপন মনেই বলিয়া উঠিল killing—।

এসব কুৎসিত ইঙ্গিত কাহাকে লক্ষ্য করিয়া, বুঝিতে কাসেমের দেরী হইল না। একমাত্র লজ্জাকে সম্বল করিয়া সে হেটমুখে বসিয়া রহিল। গাড়ী চট্টগ্রাম ষ্টেশনে ভিড়িতেই স্যুটকেস্‌টা হাতে লইয়া সে নিঃশব্দে ভিড়ের সঙ্গে মিশিয়া গেল।

ঈদের আগের দিন বাজার করিয়া কাসেম বক্সীর হাট হইতে ফিরিতেছিল। টেরী বাজারের মোড়ে আসিতেই হঠাৎ তাহার কানে আসিল—হুজুর চারদিনছে ভুখা। ফিরিয়া তাকাতেই চিনিল, ট্রেনের সেই মেয়েটী, বুকে ময়লা কাপড় দিয়ে জড়ানো কচি শিশুটি। চাকরটিকে অগ্রসর হইতে বলিয়া সে এক ধারে দাঁড়াইয়া পড়িল।

সদাগর সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন রোজা নেই রাখ্‌তা?

শুধু উপবাস থাকিলেই যদি রোজা হয় তাহা হইলে ত সে আজ চারদিন ধরিয়াই রোজা। কলের জল আর সেই যে রেলে এক সাহেব কিছু মিঠাই দিয়েছিল, তারপর আর ত কিছু সে খায় নাই। তথাপি মিথ্যা সে বলিতে পারিল না, বলিল নেই হাজুর। সওদাগর সাহেব চাকরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন পাতিলে রাত্রের ভাতটাত কিছু আছে কিনা। চাকর জানাইল যৎ সামান্য আছে, তবে গন্ধ হইয়াছে। তারপর হাজী ইসলাম সাহেব বলিলেন—যা'ত মস্‌জিদে মৌলবী সাব আছেন, দিনে বে-রোজদারীকে ভাত দেওয়া জায়েজ কিনা জিজ্ঞেস করে আয়। চাকরটী ফিরিয়া আসিয়া বলিল—মৌলবী সাব খয়দে কবিরা গোণা অইব। সদাগর সাহেব হাত নাড়িয়া "যাও" বলিয়া দেওয়ালের উপর হইতে তস্‌বিহ্‌টা লইয়া জুতা ফট্‌ ফট্‌ করিতে করিতে আছরের নমাজের জন্য মস্‌জিদের দিকে চলিয়া গেলেন। কাসেম দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সব দেখিল।

আজ পুণ্য রমজান মাসে কবিরা গোণাহ্‌ অর্জ্জনের জন্য তাহার বড় লোভ হইল। সমাজের উদারতার প্রতি তাহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল, টুপী ি তাড়াতাড়ি জেবের ভিতর ঢুকাইয়া রাখিল। তারপর মেয়েটিকে ডাকিয়া অদূরবর্তী হিন্দু খাবারের দোকানে লইয়া গিয়া কিছু খাবার কিনিয়া মেয়েটির হাতে দিয়া সে চলিয়া গেল। মেয়েটী কিছুই বলিতে পারিল না, শুধু জল ছল ছল চোখে চাহিয়া রহিল—আর তাহার অন্তর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল ওই যুবকটির চলে যাওয়া পথের উপর...।

১৯২৯.

শরীফ

এক কালে বড় লোক ছিল, এখন শুধু শরাফতীটুকুই অবশিষ্ট আছে। ঘরের গিন্নী প্রায়ই পাড়ার মেয়েদের বলিয়া থাকেন, সেদিনও সে কথাই আমেনার মা'কে বলিতেছিলেন—দেখি বলুক ত, এত বড়টী হ'লাম, চারটী ছেলে একটী মেয়ের মা, কেউ দেখেছে? বাড়ীর চাকরেরা পর্য্যন্ত এ আঙ্গুলের নখের কোণাও ত দেখেনি—এই বলিয়া চটিজুতার ভিতর হইতে ডান পা খানি বাহির করিয়া বৃদ্ধা আঙ্গুলটী উঁচাইয়া দিলেন। তারপর ডিবা খুলিয়া একখিলি পান মুখে পুরিয়া আর একটা আমেনার মা'র হাতে দিয়া আবার শুরু করিলেন। মুখ খুলিতেই পানের পিক তাহার দুই চোয়াল বাহিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল—'মরদ দূরে থাক, গাঁয়ের মজহাবের কোন আওরত পর্য্যন্ত আমাকে দেখেছে এমন কথা কোন বেটী বলুক ত—ইত্যাদি ইত্যাদি। ওড়নার আঁচল দিয়া মুখ মুছিতেছিলেন আর ক্ষণে ক্ষণে ফিক্ ফিক্ করিয়া ঘরের দেওয়ালে পানের পিক ফেলিতেছিলেন। ওড়না এবং ঘরের দেওয়াল রঙীন হইয়া উঠিতেছিল। চার ছেলের উপর মেয়ে—কাজেই খুব সোহাগের, বাড়ীতে ডাকিতও সবাই সোহাগী—বাহিরে এক জবর-জং পোষাকী নাম হয়ত আছে, তাহা বিবাহের কাবিনে ছাড়া আর কোথাও কাজে লাগে নাই। আমরাও সে নাম এখানে লিখিয়া তাহার আভিজাত্য নষ্ট করিতে চাহি না—সোহাগীতেই আমাদের বেশ চলিয়া যাইবে। মায়ের আদুরে কন্যা—ছেলে বয়স হইতেই রং বেরঙের শাড়ী এবং সোনা-রূপার নানা অলঙ্কারে সোহাগীর দেহ ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

শরীফদের লেখাপড়ার দরকার আছে তেমন কথা শাস্ত্রে লেখা নাই। তাই এ বাড়ীর চিঠিপত্র—কর্ত্তা কোন প্রকারে উর্দুতে লিখিতে পারিলেও ঠিকানাটা রাস্তার উপর উকিল বাবুর বাসা হইতে লিখাইয়া আনিতে হয়। বাড়ীর ছেলেদের বাল্যকাল ত একরকম নিরাপদেই কাটিল যখন তাহারা একটু সেয়ানা হইয়া উঠিল তখন দেখে, মাথা

মুড়াইয়া সাদা লুঙ্গীর উপর লম্বা কোর্তা ঝুলাইয়া, দাড়িতে ক্ষুর না লাগাইয়া, আর পঞ্জেগানা নমাজ আদায় করিয়া শরাফতী রক্ষা পুরামাত্রায় হয় বটে; কিন্তু ভিতরে ভিতরে এসব যেন তাহাদের অসহ্য লাগে—মনে হয় এসব এ বয়সের নয়, এ বয়স নিছক পুণ্যতে সন্তুষ্ট নয়, পাপেও যেন লোভ জাগে; এ বয়স যেন চায় একটু লম্বা ক'রে চুল রাখে, টেরী কাটে, দাড়ী ছাঁটে, স্মার্ট গোছের ধুতি-পায়জামা হাফ্‌পেণ্ট সার্ট-কোট পরে, একটু লাফায়, দৌড়াদৌড়ি করে—একটু পান-সিগারেট—কিন্তু তাহারা সবাই জানে, সে-সব এ ভিটায় হইবার যো নাই। একবার বড় ছেলেটি সামনের দিকে একটুখানি চুল লম্বা রাখিয়াছিল, কর্ত্তার দৃষ্টি পড়া মাত্রই ছেলেটির পিঠের উপর জুতাবৃষ্টি যাহা হইল তাহা প্রায় শিলাবৃষ্টির সমান। উপরন্তু তৎক্ষণাৎ নাপিত ডাকিয়া ছেলেটির মাথা মুড়াইয়া দুই হাতে কান ধরিয়া বাড়ীর সামনের পুকুরের চতুর্দিকে সাত পাক ঘুরাইয়া তবে ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

শেষকালে যখন শরাফতীর এ সব অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিল তখন ছেলেরা রেঙ্গুন, আকিয়াব, ঢাকা, কলিকাতা যে যেদিকে সুবিধা পাইল, পলাইয়া বাঁচিল।

গত আশ্বিনেই সোহাগীর দশ বৎসর গত হইয়াছে। জোড় বৎসরে নাকি বিবাহ হয় না, আবার আর-এক-বেজোড় বৎসর আসিতে আসিতে সোহাগীর বয়স তের হইয়া যাইবে।—শরীফের ঘরের মেয়ে, অত বয়স পর্য্যন্ত রাখা যায় না! কাজেই সোহাগীর বয়স এগার থাকিতে থাকিতে তাহার বিবাহ কার্য্য শেষ করিবার জন্য তাহার হিতৈষী তস্য পিতামাতা উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। মায়ের আদুরে কন্যা—সোহাগীর মা মেয়েকে কিছুতেই দূরে বিবাহ দিতে চাহেন না—পিতারও এ মত। উভয়ের লক্ষ্য এক, কিন্তু উদ্দেশ্য ভিন্ন। মায়ের উদ্দেশ্য—একমাত্র কন্যা, দূরে বিবাহ দিলে সব সময় সংবাদাদি পাওয়া যাইবে না; কাছে হইলে ঘন ঘন আশা যাওয়া করিতে পারিবে। পিতার উদ্দেশ্য—বেশী দূরে হইলে হাঁটিয়া নাইয়র করা হইবে না পাল্কিতে আনা নেওয়া করিতে হইবে; তাঁরটা নিছক অর্থ-নীতির হিসাব।

যাহা হউক, ঠিক হইল—সোহাগীকে যথাসম্ভব কাছেই বিবাহ দিতে হইবে।

শরীফ বংশের একমাত্র আদুরে কন্যার জন্য জামাই জুটিতে বেশী দেরী হইবার কথা নয়। গ্রামে গ্রামে এ রকম আরও কত শরীফ এই ভাবে শরাফতকে জিয়াইয়া রাখিয়াছে। আবার একমাত্র কন্যার জামাই হইবার লোভও কম নয়।

কন্যার বিবাহে তাহার চারিপুত্রের কেহই উপস্থিত নাই এ ব্যথা মা'য়ের প্রাণে সহ্য হইবার নয়—কিন্তু অশ্রুপাত ছাড়া অন্য উপায় নাই,—ছেলেদের কাহারও সন্ধান আছে, কাহারও নাই; যাহাদের সন্ধান জানা আছে তাহাদের কাছে মায়ের দিব্য দিয়া চিঠি লেখা হইয়াছে, কিন্তু তাহারা কেহই আসিবে না। আজ এ শুভদিনে পুত্রদের অনুপস্থিতি পিতার প্রাণেও যে কোন ব্যথার সৃষ্টি করে নাই তাহা নহে। কিন্তু কী করা যায়, সোহাগীর বিবাহ ত স্থগিত রাখা যায় না।

শুভ চাঁদ এবং তারিখ দেখিয়া সোহাগীর বিবাহ তাহাদের পাশের গ্রামের মীর্জ্জা নূর আলীর পুত্রের সঙ্গে সম্পন্ন হইয়া গেল—তাহাদের বাড়ী হইতে মাইল দুই তফাৎ। সোহাগী রেশমী চুলীর উপর রেশমী শাড়ী পরিয়া, পঁয়ত্রিশ তোলার ঠেং-খাড়ুর নীচে জরীর জুতা মচ্‌ মচ্‌ করিতে করিতে স্বামীর ঘর করিতে চলিল। গলায় তাহার ত্রিশ তোলা ওজনের কণ্ঠি, পঁচিশ তোলা ওজনের চিক্‌, ত্রিশ তোলার চন্দ্রহার, পঁয়ত্রিশ তোলার হাঁসুলী; দুই কানে সাতটা করিয়া চৌদ্দটা ছিদ্রে চৌদ্দটা বালি, তার উপর কর্ণফুল, ঝুমকা ত আছেই; নাকে নাকফুল; ছোট একটী বোলাক, তার উপর আর একটা বড় বোলাক, টালি বলিলেই হয়, চিবুক পর্য্যন্ত ঢলিয়া পড়িয়াছে; কোমরে মাথায় এবং বাহু হইতে আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত যে সব অলঙ্কার সোহাগীর অঙ্গসৌষ্টব বর্দ্ধন করিয়াছিল তাহাদের প্রকৃত নাম ও ওজন স্মরণ রাখিবার মত স্মৃতিশক্তি খুব কম পুরুষেরই আছে। দুই জন দুই বাহু ধরিয়া তুলিয়া না দিলে বেচারী সোহাগীকে সেদিন সেখানেই বসিয়া থাকিতে হইত।

কর্ত্তা আমাদের বুড়া—চুল দাড়ী পাকিয়া সাদা হইয়া গিয়াছে।

প্রতি শুক্রবার জুমা বা'দ তাঁহার দেউড়ীতে খুব আলাপ জমে। সেদিনও জুমা'র পর হুঁকা হাতে তিনি দেউড়ীতে বসিয়া আছেন— মসজিদ হইতে যাঁহারা তাঁহার সামনের পথ দিয়া যাইতেছিলেন, তিনি তাহাদের সকলকে অনুরোধ করিলেন শুধু একটান তামাক খাইয়া যাইতে, কিন্তু সবাই তাঁহার আলাপ সম্বন্ধে ওয়াকিফ্‌হাল ছিল—এক বার বসিয়া গেলে 'আছ্‌রের'র আগে উঠিবার যো নাই, আর আলাপের বিষয়ও ত চিরন্তন, তাঁহাদের বংশের প্রাচীন গৌরবের ইতিবৃত্ত—কাজেই, কাজের এবং অকাজের ছুতা ধরিয়া তাহারা চলিয়া গেল। তবে আলবোলা সুন্দরীর প্রতি যাহাদের একটা নাড়ীর টান ছিল তাহারা অনিচ্ছায়ও বসিয়া পড়িল। এ ও'র কুশল জিজ্ঞাসার পর যখন শুনিল যে, হরিহর মহাজনের দেনার দায়ে আবদুলের ভিটাখানি ডিক্রি হইয়া গিয়াছে, তখন তিনি হুঁকায় একটী জোরে তলা-ফাটা টান দিয়া নাকে মুখে ধূম ছাড়িতে ছাড়িতে নলটী আবদুলের হাতে দিয়া বলিলেন, "খোদার কুদরৎ সব, ভাই। দুনিয়াতে যে রকম দিন রাত হয় মানুষের জীবনেও ঐ রকম দিন রাত আসে। জামানার গর্‌দীশ, একদিন ইংরেজ পর্য্যন্ত আমাদের বাড়ীতে উঠতে হুকুম চাইত, তোমরা সব ছেলে মানুষ বোধ হয় দেখনি, আবদুলের বাপ স্বচক্ষে দেখেছে—তারা সব নেক্‌কার, সকাল সকাল বেহেস্ত নসীব হয়েছে, আমরা গোনাহ্‌গারদের খোদা কি দেখে—"? দীর্ঘনিশ্বাসে তাঁহার বুক দুলিয়া উঠিল।

"তখন মেম সাহেবদের পর্য্যন্ত আমাদের অন্দরে ঢুকবার হুকুম ছিলনা।"

আরে ছ্যাঃ, ওরা আবার জানানা, বলি, মরদ তবে কারা! শুধু ..যাহা বলিলেন তাহা আর লেখা যায় না।—আর তোমরা না দেখলেও শুনেছ ত অন্তত, যখন আমাদের দিন ছিল তখন আমাদের বাড়ীর মেয়েগুলিকে, পাঁচ ছয় বড় জোর—তাঁর ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল—সাত বৎসরের পর থেকে আর কেউ দেখেছে? ছয় সাত বৎসরের মেয়েও পাল্কী ছাড়া কোথাও যায়নি। আজ আমাদের রাত, তাই এখন আমাদের বাড়ীর মেয়েদের রাত্রে বোরকা পরে নাম্নর করাতে হয়। খোদা ইজ্জতের মালিক, তাই আমায় তিনি একটী মাত্র মেয়ে দিয়েছেন।—দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধের চোখ মুখ কালো হইয়া উঠিল।

সোহাগী শ্বশুর বাড়ী যায়। মাস দুই মাসে আবার আসে—নিশীথ রাতে বোরকার ভিতর ঝুম ঝুম করিয়া গহনা বাজে, যেন পাড়া গাঁয়ের ডাক হরকরা। সোহাগীর পিতা মধ্যে মধ্যে উদ্বিগ্ন হইয়া বলেন, আর ইজ্জত রইল না, জেউরের আওয়াজ যে লোকের কানে যায়!—তাঁহার চোখ মুখ বিকৃত হইয়া ওঠে। সোহাগী বোরকার ভিতর অধিকতর সঙ্কুচিত হইয়া আরও ধীরে ধীরে নরম পা ফেলে।

দিন যায়, মাস যায়, এই ভাবে বৎসর—আবার আসে, আবার যায়। সোহাগীর স্বামী লোকটী সৌখিন কম নয়—সোহাগীকে সে একেবারে ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছে বলিতে হইবে। সোহাগীর দেহও আর এগার'র মধ্যে বাঁধা রহে নাই—ক্রমে বার তের করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল, সন্ধ্যার পুষ্প কলিটী রাত্রির গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে যেমন বিকশিত হইয়া ওঠে সোহাগীর দেহও তেমনি বিকশিত হইয়া উঠিতে লাগিল। পূর্ণিমার পূর্ণ জোয়ারে যেমন মরানদীও কানায় কানায় ভরিয়া ফুলিয়া ওঠে, সোহাগীর দেহও তেমনি ফুলিয়া উঠিয়াছে, কোথা হইতে যে এক অপূর্ব শ্রী আসিয়া তাহার সারা দেহে ময়ূরের মত পেখম মেলিয়া বসিল তাহা নিকটের লোকেরা টেরও পায় নাই। সেই ভরা দেহের পূর্ণ সৌন্দর্য্যে কোন্ পুরুষ না ভুলিয়া থাকিতে পারে? কাজেই সোহাগীর স্বামীর দোষ দেওয়া যায় না।—

গোপনে দোকান হইতে সাচি পানের খিলি, ঠোঙায় করিয়া মিঠাই, মায় চানাচুর পর্য্যন্ত সব আসিতে লাগিল—। গভীর রাত্রে দুই জনে বসিয়া খায়, গল্প করে, আরও কত কী—বাড়ীতে কেহ না থাকিলে সোনাবানের পুথি পড়ে—শুন শুন গুণিগণ.........।

সোহাগীর ভাইরা বাড়ী আসে না—তবে কেহ কেহ মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু পাঠাইয়া বৃদ্ধ পিতামাতাকে মেহেরবাণী করে।

মা'র মরণাপন্ন অসুখ বলিয়া লেখাতে, আজ কয়দিন হয় কী ভাবিয়া বড় ছেলেটী আসিয়াছে—হয়ত ভাবিয়াছিল—বাবা এবার বেশী বাড়াবাড়ি করিবেন না।

যাক্, আজ কয়েকদিন হইতে সোহাগীর মা ভয়ানক উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন, এখন নাকি সোহাগীর আট মাস, মেয়ের প্রথম প্রসবের সময় তাহাকে এখানে রাখিতে হইবে।

সোহাগীর বড় ভাই যাইয়া ঠিক করিয়া আসিয়াছে—শুক্রবার সোহাগীকে আনিতে যাইবে।

সোহাগীর শ্বশুর-শাশুড়ীও বিশেষ আপত্তি করে নাই—কাছের পথ ভাল মন্দের খবরাখবর পাইতে বিশেষ কষ্ট হইবে না।

সেইদিন সোহাগীর মা ঘটা করিয়া মসজিদে শিণি দিলেন—এক জোড়া পায়রা-বাচচা মস্‌জিদে এবং একটা খাসী শাহ্ কস্তনতুনিয়ার দরগায় ছাড়িয়া দেওয়াইলেন।—মস্‌জিদের মুয়াজ্জিন সাহেব পায়রাগুলি ধরিয়া লইয়া গেলেন। বাড়ীর উঠানে পেঁৗছিয়াই মোয়াজ্জিন চেঁচাইয়া উঠিলেন—'আরে গেল কৈ—জল্‌দী ছুরী লাও।' খুশীর সময় মোয়াজ্জিন সাহেবের মুখে উর্দু আসে। পরের দিন হাটে দরগার মোতওল্লী খাসিটী পনর টাকায় বিক্রী করিয়া আসিলেন। আকন্দ মিঞাজী নাকি কেতাব দেখিয়া বলিয়া দিয়াছিল, এই করিলে আর কোন বিপদের ভয় নাই—প্রথম কিনা! তাই এত ঘুষের ব্যবস্থা!

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর সোলতান মিঞা বলিল 'বাবাজান, এখন রওয়ানা দিলে ত হয়।' বৃদ্ধ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, 'এখন কেমন করে হয় রে—এখনো লোক চলাচল বন্ধ হয়নি।'

তথাস্তু। এখানে দ্বিরুক্তি বা যুক্তি কিছুই চলে না। কিছুক্ষণ ঘুমাইয়া রাত্রি দুইটায় যাত্রা করা যাইবে, ঠিক হইল।

স্বামী সোহাগীর কাঁধের উপর হাত রাখিয়া বলিল—তোমার ত ফিরে আস্‌তে চার পাঁচ মাস—?

সোহাগী—তুমি প্রত্যেক দিন একবার করে নিশ্চয়ই যাবে।

স্বামী—তাও কী হয়?

সোহাগী—তা'না হলে আমরা আসব না। লজ্জায় তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল।

স্বামী বলিল—তোমরা মানে—?

লজ্জায় এবার সোহাগীর কান পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল। স্বামীর বুকে মাথা রাখিয়া সে ধীরে ধীরে বলিল—

আমি বুঝি একা আসব? অলক্ষুনে! অনাগত সন্তানের প্রতি এই ইঙ্গিতে তাহারও গৌরবে বুক ভরিয়া উঠিল। সে স্ত্রীকে দুই বাহু দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া অজস্র চুম্বনে তাহার চোখ মুখ ভরিয়া দিল। সোহাগী স্বামীর বাহু—মুক্ত হইয়া বলিল—কাল পরশু কিছু সাটিনের কাপড় নিয়ে যেয়ো—।

স্বামী—কি করবে?

সোহাগী—বসে বসে তোমার ছেলের জামা তৈয়েরী করব—। বলিয়াই লজ্জায় মরিয়া হইয়া সে পলাইয়া গেল।

রাত দুইটায় উঠিয়া সোহাগীকে সাজাইয়া গোছাইয়া আপাদমস্তক পুরু বোরকা পরাইয়া ঠিক করিয়া লওয়া হইল।

আজ প্রথম সোহাগী শ্বশুর-বাড়ী হইতে বাপের বাড়ী যাইবার সময় হাসিমুখে বাহির হইতে পারিল না। অকারণে তাহার মনটা যেন কাঁদিয়া উঠিল। স্বামীর বাহুবন্ধনে সে অনেকক্ষণ ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিল, স্বামী ত অবাক, এমন ত কখনও হয় নাই। তাহারও প্রাণটা যেন এক অজানা ব্যথায় কাঁপিয়া উঠিল। অগত্যা কাছের পথ---প্রতিদিন যাইবে আশ্বাস দিতে হইল, তারপর স্ত্রীর অশ্রুপ্লাবিত মুখে একটী শেষ চুম্বন দিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

ছেলে লণ্ঠন জ্বালাইতে চাহিলে বৃদ্ধ ধমক দিয়া বলিলেন—আরে বেকুব, লণ্ঠন জ্বালাইলে হঠাৎ যদি পথে কেউ এসে পড়ে, তারা দেখবে না মেয়েলোক---?

ছেলেটির রাগ ধরিল।—আর দেশ-বিদেশ ঘুরিয়া তাহার মনটাও কিছু উদার হইয়া উঠিয়াছিল, সে এ সব বাঁধাবাঁধি সহিতে পারিতেছিল না। ভিতরে ভিতরে সে রাগে জ্বলিতে লাগিল। কিছুদূর আসিয়াই সে একটু ঝাঁঝের সহিত বলিয়া ফেলিল—'এমন গহীন রাত, তার উপর এমন আঁধার, নিজের শরীর পর্য্যন্ত দেখা যায় না—হঁচট্ খাচিচ, বাত্তি জ্বালালে কী ক্ষতি?

'হারামজাদা, শূয়ার-কা বাচচা বলে কী?—বলিয়াই বৃদ্ধ ধমকাইয়া উঠিলেন। ছেলে বুঝিল, পিতা এখনও পূরা মাত্রায় 'শরীফ' আছেন—হাতের লণ্ঠনটী রাস্তার উপর রাখিয়াই সে পিছনের দিকে হাঁটা আরম্ভ করিল।

বৃদ্ধ আগে আগে হাঁটিতেছিলেন, সোহাগী মধ্যখানে, মনে করিয়াছিলেন—ছেলে পিছে পিছে আসিতেছে। ছেলে কিন্তু ততক্ষণে ষ্টেশনের রাস্তায় গিয়া উঠিয়াছে।

হঠাৎ প্রবল ঝড়ের মত কী যেন শাঁ শাঁ করিয়া আসিতেছে মনে হইল। বৃদ্ধ অন্যমনস্কভাবে কী সব তাঁহাদের অতীত অবস্থা চিন্তা করিতে করিতে পথ চলিতেছিল। আপাদমস্তক বোরকাবৃতা সোহাগী কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারে বোরকার ক্ষুদ্র ছিদ্র পথে কিছুই দেখা যাইতেছিল না। আলো থাকিলে অন্তত কলুর বলদের মত সম্মুখ-ভাগটা কিছু কিছু মালুম করা যাইত! সোহাগী ঠিক করিতে পারিতেছিল না—সে আওয়াজ সম্মুখে কি পিছনে, ডাইনে কি বাঁয়ে—এক সময় এক দিকে মনে হয়। সে তাহার মাতৃত্ব-ভারাক্রান্ত অবশ দেহ লইয়া ধীরে ধীরে পা ফেলিতছিল—বোরকার আচ্ছাদনের মধ্যে বাহিরের কোন আওয়াজই তাহার অনুভূতির মধ্যে আসিতেছিল না। বিশেষত স্বামীর বিদায়-বেলার আদর-সোহাগ তখনও তাহার মনের ভিতর অপূর্ব পুলক শিহরণের সাথে ঘুরপাক খাইতেছিল। হঠাৎ শাঁ শাঁ করিয়া প্রবল সাইক্লোনের মত বৃদ্ধের পার্শ্ব দিয়া একটা মোটর চলিয়া গেল—মোটরে লাইট্ নাই, পুলিশের হাত এড়াইবার জন্য ড্রাইবার খুব জোরে চালাইতেছিল এবং হর্ণ টিপিতেছিল না।—বৃদ্ধ হঠাৎ সন্ত্রস্ত হইয়া 'মা' বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আর একটী ক্ষীণ কণ্ঠের 'মা' বাতাসে মিলাইয়া গেল; সে যেন নিশীথ রাতে সন্তানহারা জননীর বিলাপ ধ্বনির শেষ রেশ। বৃদ্ধ আকাশ বিদীর্ণ করিয়া চেঁচাইলেন—মা সোহাগী। কোন সাড়া নাই, শব্দ নাই, সমস্ত নিঝুম, নিস্তব্ধ। অন্ধকারের মধ্যে বৃদ্ধ দুই হাতে সমস্ত রাস্তা হাতড়াইতে লাগিলেন। কিছুদূর পিছনে আসিতেই তাঁহার হাতে যাহা লাগিল তাহাতে তাঁহার হাত ভিজিয়া রক্তাক্ত হইয়া গেল।

১৩৩৬

আহমদ

আহমদ খুনের আসামী—

স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি বিক্রী করিয়াও সে রেহাই পাইল না—

বিচারে তাহার যাবজ্জীবন দীপান্তর হইল।

গৃহে বাইশ বৎসরের স্ত্রী জোলেখা ও শিশুপুত্র ফর্‌হাদ—।

বিদায়ের দিনে চোখের জলে তাহার মনের কথা ভাসিয়া গেল—। জোলেখার চোখের জল শুকাইয়া জমাট্ বাঁধিয়াছে। উভয়ের অপলক দৃষ্টি ফর্‌হাদের কচি মুখের উপর—।

সেই মিলন-তীর্থে-স্নাত চক্ষু পরস্পরের উপর নিপতিত হইল।

গভীর স্নিগ্ধ ক্ষুধাতুর দৃষ্টি—চোখের দৃষ্টিতে ঘটিল উভয়ের জীবনের দেনা-পাওনার আদান প্রদান!

বাহিরে পুলিশ হাঁকিল—এ বেটা!—শিশুপুত্রের মুখচুম্বন করিয়া তাহাকে জোলেখার কোলে ফেলিয়া দিয়া, আহমদ দ্রুত বাহির হইয়া পড়িল।

এতক্ষণে জোলেখার শুষ্ক চোখে জল আসিল—।

কাপড়ে কেরোসিন ঢালিয়া আগুন দেওয়া, গলায় দড়ী-কলসী বাঁধিয়া ডুবিয়া মরা ইত্যাদি অনেক কথা একে একে তাহার মনের উপর ভাসিতেছিল।

হঠাৎ বাহির হইতে আধ-আধ রবে ফর্‌হাদ ডাকিল—

মা, মা—।

মা চমকিয়া উঠিল—একি ফর্‌হাদের কণ্ঠ! এ যেন তারই কণ্ঠস্বর!

শিশু কান্নারত মাকে ক্ষুদ্র বাহু দিয়া জড়াইয়া ধরিল—।

জোলেখা রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল—এ যে শুধু শিশুর বাহু নয়—এ যে শক্তিশালী বাহু, তাহাকে জীবনের দিকে টানিতেছে।

পনর বৎসর পরের কথা। রাজ ঘোষণায় আহমদ মুক্তি পাইয়াছে।

জেলের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম চল্লিশ বৎসরের আহমদকে আশি বৎসরের করিয়া ছাড়িয়াছে।

ভগ্নস্বাস্থ্য লোলচর্ম বৃদ্ধ কোন প্রকারে টিকেট কিনিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। আজ বিশ্ব-প্রকৃতির এক নূতন মূর্ত্তি যেন সে ভিতরে বাহিরে অনুভব করিল—তাহার সারা দেহ-মন সুখে ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

পনর বৎসরে জোলেখা কেমনটী হইয়াছে—সে কী এখনও তাহার অপেক্ষায় আছে? ফরহাদ কত বড়টী হইয়াছে?—চোখ বুজিয়া কল্পনায় সে পনর বৎসর আগেকার শিশু ফর্‌হাদের নাদুস নুদুস কোমল মুখখানির চিন্তায় বিভোর হইয়া গেল।

জেল-কর্ত্তা পথ খরচের জন্য চারিটি টাকা দিয়াছিলো। টিকেট কিনিয়া একখানি আধুলী মাত্র অবশিষ্ট ছিল। সারারাত কাটাবার পর দিনের বারটায় ট্রেন হইতে নামিয়া প্রায় চার ক্রোশ পথ হাঁটিয়া তাহাকে বাড়ী পৌঁছিতে হইবে, তবুও নিজের খাবারের জন্য কিছু না কিনিয়া আধুলীখানা পরণের কাপড়ের কোনায় গিরা দিয়া ট্যাকে গুঁজিয়া রাখিয়াছে, পরের দিন ষ্টেশনে নামিয়াই ফর্‌হাদের জন্য কিছু খেল্‌না কিনিবে।

কোথা হইতে এক বালকের হাত ধরিয়া এক বৃদ্ধা ভিখারিণী আহমদের সাম্‌নে হাত বাড়াইয়া বলিয়া উঠিল—বাবা, তোমার বাল্ বাচচার ভালাই হবে—।

আহমদ ট্যাঁক হইতে আধুলীখানা বাহির করিয়া ভিখারিণীর হাতে গুঁজিয়া দিল।

কপর্দকহীন অবস্থায় পরদিন সে চাটগাঁ ষ্টেশনে পৌঁছিল। হঠাৎ তাহার খেয়াল হইল—এতদিন পর শূন্য হাতে কেমন করিয়া বাড়ী যাইবে? পুত্রের হাতে কী দিবে? আজ এই নিঃস্ব অসহায় মুহূর্তে

তাহার এই রিক্ততা তাহার কাছে বড় কঠোর হইয়া উঠিল—তাহার ইচ্ছা হইতেছিল—দুই হাত উর্ধে তুলিয়া গলা ফাটাইয়া খোদাকে জিজ্ঞাসা করে, তাহার পনর বৎসরের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের উপর কি শুধু সরকারেরই দাবী?

স্থির করিল, সে সহরে আরও কয়েকদিন কুলীগিরী করিবে।

একদিন বর্ষার গুরু গুরু ডাক তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। জোলেখার জন্য একখানি কাপড় ও ফর্‌হাদের জন্য কিছু খেল্‌না ও বাতাসা কিনিয়া লইয়া সে যাত্রা করিল। প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাহাকে রুখিতে পারিল না। ঝড়ঝঞ্ঝা ও বজ্রপাতকে উপেক্ষা করিয়া লোল-চর্ম-বৃদ্ধ পনর বৎসর পরে নিজগ্রাম মুখে ছুটিল।

ক্ষীণ-দৃষ্টি চক্ষু দিয়া পথের দুই পাশের গ্রামগুলিকে অন্ধকার সমেত যেন সে গিলিয়া খাইতে লাগিল—এই তাহার বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের ক্রীড়াভূমি!

উঠানে ঢুকিতেই দেখিতে পাইল, উঠানের পশ্চিম ধারে একটী কাঁচা কবর, তাহার শিয়রে একটী মোম বাতি মিটি মিটি জ্বলিতেছে।

আহমদের প্রাণ দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিল।

কম্পিত পদে জীর্ণ গৃহের দুয়ারে উঠিতেই দেখিল—ঘরের ভিতর একটী ক্ষুদ্র কেরসিনের ডিবে মিটি মিটি করিতেছে। তাহারি পার্শ্বে শত গ্রন্থিযুক্ত জায়-নামাজের উপর ততোধিক গ্রন্থিযুক্ত বস্ত্রাবৃতা এক নারী সেজদায় পড়িয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ফরিয়াদ করিতেছে—

রহমানের রহীম—!

বৃদ্ধের সারা অঙ্গ অবশ হইয়া আসিল; সমস্ত শরীর ঝিম্ ঝিম্ করিয়া কাঁপিতেছিল।

তাহার জীবনের তীর্থভূমিতে কম্পিতপদে ঢুকিতেই সে ধড়াস্ করিয়া পড়িয়া গেল।—

দূর হইতে শুধু শুনা গেল—ফর্‌হাদ—!—!

১৩৩৪

রহস্যময়ী প্রকৃতি

মা—

দ্বিতীয় শব্দ উচচারণ করার পূর্বেই দীর্ঘ পাঁচ মিনিট ব্যাপী কুক্ কুক্ খক্ খক্ ও কামারের হাঁপরের মত গলা বুক ও ফুস্‌ফুসের সম্মিলিত খেঁচুনীর মৃত্যুযন্ত্রণা আরম্ভ হয়ে গেল। যন্ত্রনার চরম কষ্ট বুঝাবার জন্যই মৃত্যু শব্দটা জুড়ে দেওয়া হ'ল, না হয় যে যন্ত্রনা মেয়েটি ভোগ করছে, তার ফলে যদি মৃত্যু হত, তা'হলে গত চব্বিশ বছরে মেয়েটির অন্ততঃ চব্বিশ হাজার বার মৃত্যু ঘট্‌তে পারত। মেয়েটির নাম সাতাশ বছর আগে ফুলমতি রাখা হয়েছিল। কিন্তু এ সুদীর্ঘ কালে ঐ নামে তাকে কয়বার যে ডাকা হয়েছে তা গণতে গেলে বোধ করি এক হাতের আঙুলের ডগা শেষ হওয়ার আগেই গণা শেষ হয়ে যাবে। আদর ও বিরক্তির কোমল-কঠোর রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ফুলমতি বহু পূর্বেই ফুলি'তে এসে ঠেকেছে।

দম নিয়ে ফুলি আবার কথাটা পাড়তে চাইলো। কথা বল্লেই পুনরায় হাঁপানির আক্রমণ আশঙ্কায় মা বারণ করে বল্লে—এইত্তার চুপ খর্—কি খ-অতিছ্অর পরে খইস্‌ছোনা। কথাটা বলার জন্য ফুলি সারারাত ঘুমাতে পারেনি—সারারাত বিছানায় পড়ে পড়ে সে কুক্ কুক্ করেছে আর সারাক্ষণ শুধু এ কথাটাই তার সারা দেহ মনে তোলপাড় করে ফিরেছে। রাত্রেই সে কথাটা মাকে জানাবে বলে সঙ্কল্প করেছিল, কিন্তু গতরাত্রে তার বাবা বাড়ী ছিল বলে বল্‌তে পারে নি।

ফুলি দ্বিতীয়বার মুখ খোলার আগেই সেই সকাল বেলায় রমজানের দাদী এসে উঠানে দাঁড়িয়েই হাঁক দিলে—ওবা ফুলির মা, ফুলির হাঁপা-নিরলাই রাতিয়া আঁরাউদ্ধা যে ঘুমন যাইত্‌নপাইল্লাম—তেইর হাঁপানি কি বাইর্‌গে না? ফুলির মা তখন অন্ধকার গৃহকোণে চুণের হাঁড়ি সন্ধান

করে ফির্‌ছিল এবং গালের ভিতর পান ঠাসা থাকাতে সহসা কোন উত্তরই দিতে পারলে না। ফুলি নিজের বসা পিঁড়িখানা টেনে নিয়ে রমজানের দাদীর দিকে এগিয়ে দিয়ে—অ দাদী বই অ,—বল্‌তে যাচ্ছিল। কিন্তু দাদির দা পর্য্যন্ত উচচারিত হতে না হতেই হাঁপানির নাড়ী-ছেঁড়া খেঁচুনী শুরু হয়ে গেল।

—থৌক্, থৌক্, অ নাতিন্ তুই বয়, অ নাতিন্ তুই বয়, বলতে বল্‌তেই রমজানের দাদী পিঁড়িটা টেনে নিয়ে দোর গোড়াতেই বসে পড়ল।

ফুলির হাঁপানি তখনও থামে নি। ফুলির মা রমজানের দাদীকে দেখে অভিমানে স্ফীত হয়েই যেন চিরপরিচিত কথা তার চিরপরিচিত কণ্ঠে আবার চেঁচিয়ে উঠল—অ ফূ, আল্লায় কি তেইরে ন দেখের না, আল্লার কি চৌক্ কানা অইয়ে ন অ ফূ? খত গরি খইদ্ধে আল্লারে; —নয় তেইরে লই যা, নয় আঁরে লই যা। আল্লায় ত ন উনের অ ফূ। আঁর ত আর সহ্য ন অর্, আঁর ত আর বরদাস্ত ন অর্।

রমজানের দাদী সান্ত্বনার সুরে বল্লে—ছবর্ খর্ অ ঝি, ছবর্ খর্। আল্লার দরবারে কি কিয়ের খমি আছে না? আল্লার মেরবাণী অইলে তেই কি একদিন ভালা হইত্ ন পারে না অ ঝি?

ফুলির মা একখিলি পান বানিয়ে রমজানের দাদীর হাতে দিতে দিতে হতাশভাবেই বল্লে—আল্লার মেরবাণী অ ফূ খববরের ভূতর গেইলে অইব যে। অভিমান-মিশ্রিত প্রত্যয়ের সঙ্গে যোগ কর্‌লে—তার আগে নয় অ ফূ।

রমজানের দাদী উঠে যাওয়ার পর মাকে নিরিবিলি পেয়ে কথাটা বলার জন্য ফুলি আবার উস্‌খুস্ করতে লাগল। কথাটা গত কাল থেকে এত সহস্রবার সহস্রভাবে তার মনে ওলট পালট খাচ্ছে যে না বলে তার উপায়ই যেন নেই। কথাটা গ্রাহ্য হবে কি না, মার কাছে গ্রাহ্য হলেও শেষ সিদ্ধান্ত যাদের উপর নির্ভর করে তাদের কাছে গ্রাহ্য হবে কি না এ বিষয়ে যথেষ্ট সংশয়-শঙ্কা তার মনে আছে। তবুও কাল থেকে তার ব্যর্থ জীবনের সামনে একটা ক্ষীণ রশ্মিরেখা সে যেন

দেখ্‌তে পেয়েছে। তার জীবনের পশ্চাতে ও সম্মুখে সীমাহীন বারিধির মত নৈরাশ্য ও ব্যর্থতা, তাই এই ক্ষীণ রশ্মিরেখার ক্ষীণতর হাতছানিতেই সে যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে।

লজ্জা, শরম, সঙ্কোচ ও দ্বিধা শঙ্কায় মর্‌ মর্‌ হয়ে, মা'র বারণ সত্ত্বেও কম্পিত কণ্ঠে সে তার বহু আকাঙ্খিত কথাটী এবার বল্লে— দুলির মাইয়া দুনোয়ার ভার কি আঁহি নিত্‌ ন পারি না অ-মা? দুলি ফুলির সর্ব কনিষ্ঠা ভগ্নি—সম্প্রতি দু'টী শিশু-কন্যা রেখে মারা গেছে।

কথাটার ইঙ্গিৎ ফুলির মা মুহূর্তে বুঝতে পারল। হতভাগিনী কন্যার মত তার চোখের সামনেও হয়ত একটা আশার ক্ষীণ রেখা খেলে গেল। কিন্তু সে মুহূর্ত মাত্র, পরক্ষণেই অবধারিত মৃত্যুর একটা কাল মেঘ তার আশার আকাশকে নিশ্চিহ্ন করে ছেয়ে ফেল্লে। কন্যার আগ্রহ উৎসুক প্রশ্নের উত্তরে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়া মায়ের মুখ তখন আর কিছুই বল্‌তে পারল না।

ফুলি গরীব চাষী মজিদের সর্বজ্যেষ্ঠা কন্যা—ফুলির পর মজিদের পর পর আরও তিনটী কন্যা ও একটী পুত্রসন্তান জন্মগ্রহন করেছে। তিন বছর বয়সের সময় ফুলির একবার খুব শক্ত কাশি হয়েছিল, বহু চেষ্টা সত্বেও সেই কাশি ত সারলই না, বরং অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই তা দুরারোগ্য ক্রনিক হাঁপানিতে পরিণত হল। তাবিজ দোয়া পানি-পড়া থেকে আরম্ভ করে, ডাক্তারি, কবিরাজী ও নানা টোটকা ঔষধ ফুলির বাবা মজিদ যেখানে যা শুনেছে, তা সাধ্যানুসারে মেয়েকে খাইয়ে দেখেছে।

আল্লার নামে গরীব লোক সে, বড়টা পারেনি কিন্তু একবার একটা ছাগল পর্য্যন্ত মানৎ করে মেয়ের হাত ছুঁইয়ে ছেড়ে দিয়ে দেখেছে। মস্‌জিদে দরগায় কত শিণি দিয়েছে, শহরে বড় মস্‌জিদে পর্য্যন্ত কত বাতি দিয়েছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। মজিদ ও মজিদের বৌএর আশা ছিল এই মেয়ে কিছুতেই বাঁচবে না, কিন্তু কুক্‌ কুক্‌ করে বুকের ভিতর দিন রাত হাপর চালিয়েই মেয়ে দেখতে দেখতে চৌদ্দ, পনর, ষোল, সতর করে ধাপে ধাপে বছর

ডিঙাতে লাগল, তখন মজিদ ও মজিদের বৌএর বুক শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়ারই ত কথা। গরীব চাষার ঘরের কৃষ্ণকায় মেয়ে, তার উপর হাঁপানিতে কঙ্কালসার—কে করবে এ মেয়েকে বিয়ে! অথচ প্রকৃতির কি নির্মম পরিহাস—হাঁপানির ফলে ফুলির দেহ যতই অস্থিচর্মসার হউক না কেন, কিন্তু যৌবন দেবতার পরশমণির স্পর্শ থেকে তা ত বঞ্চিত হয় নি। যৌবনের সোণার কাঠির স্পর্শে নারীদেহের যেখানে যে ভাবে বিকশিত হয়ে ওঠার কথা তার ত কোথাও তিলমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নি। কাজেই ফুলির বাপ মা যদি ফুলির দিকে তাকিয়ে চোখে অন্ধকার দেখে তা আর এমন বিচিত্র কি! ফুলির বাপ-মায়েরই বা কি অপরাধ? এই ভয়াবহ পরিস্থিতির সামনে দাঁড়িয়ে বাংলা দেশে এমন কোন বীর-পিতা ও বীর-মাতা আছেন যে যিনি নিশ্চিন্তে দুই ফুস্ ফুস্ ভরে নিশ্বাস নিতে পারেন, পেটভরে খেতে পারেন, চোখভরে ঘুমাতে পারেন?

গোঁদের উপর বিষ ফোঁড়া—ফুলির অনুজাগণেরও যেন আর তর-সইছে না। তারাও যৌবন-সাগরের উর্মি প্রহত বেলাভূমির দিকে প্রতি-যোগিতা করেই যেন দ্রুত এগিয়ে আস্‌ছে। তবে আশার কথা তাদের জন্যে যথা সময়ে বর জুট্‌তে দেরী হল না। বড়কে ডিঙিয়ে ছোটদের বিয়ে প্রচলিত লোকিক আচারে বাধে—কিন্তু উপায় নেই। কিছুকাল ধরে মজিদ বয়স্ক ও প্রবীণ বিপত্নিকদের লোক মারফৎ এক রকম সেধেও দেখেছে। কিন্তু একটা জন্ম হাঁপানি রোগীর জন্যে কে আর এগোবে? পাড়াগাঁয়ে চাষী সমাজে বৌ নিয়ে বিলাসিতা চলে না—সেখানে বসিয়ে বৌ পালবার সাধ্য এবং প্রবৃত্তি দুই-ই কারও নেই। সেখানে বৌকে দস্তরমত উদয়াস্ত খেটে খুটে খেতে পর্‌তে হয়। কাজেই ফুলির বিয়ের আশা ফুলির পিতা-মাতাকে চাপা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গেই চেপে রাখ্‌তে হয়েছে। শেষকালে পাড়াপড়শীরাও পরামর্শ দিলে একজনের জন্য সবকে আটকিয়ে রেখে কি লাভ?—অন্যদের বিয়ে দিয়ে দাও।

কাজেই ফুলিকে বাদ দিয়েই ফুলির তিন কনিষ্ঠা ভগ্নির বিয়ে যথা সময় যথাক্রমে হয়ে চুকে গেছে। ফুলি হাঁপানি নিয়েও তিন ভগ্নিকে

নিজ হাতে বিয়ের সাজে সাজিয়ে পাল্কিতে তুলে দিয়েছে—তার পর হাপানির পায়ে-মাথায় এক করা নাভিশ্বাস ও চোখের জলের প্রতি-যোগিতা কর্‌তে কর্‌তেই গৃহকোণে সরে দাঁড়িয়েছে। স্বামীসহ বোনেরা যখনি বেড়াতে এসেছে, ফুলি নিজ হাতে তাদের শয্যা রচনা করে দিয়ে, নিজে গৃহের শেষ প্রান্তে ভূ-শয্যায় উপুড় হয়ে পড়ে কুক্ কুক্ করে হাঁপানির হাপর চালিয়েছে, আর চোখের জলে শিয়রের মাটি ভিজিয়ে কাদা করে তুলেছে। এই করেই ফুলি তার জীবনের সাতাশ বছরে এসে পেঁাচেছে।

মজিদের সামান্য দু'এক খণ্ড জমি আছে—তাতে সকাল সকাল ফসল বুনে সে সারা বছর ধরে ঘরামীর কাজ করে। আশে-পাশের কয়েক গ্রামব্যাপী ঘরামী হিসেবে তার খুব পসারও আছে। এই করে মোটা ভাত-কাপড়ে বছরের দু'মাথা মিলিয়ে সংসার তার একরকম চলে যাচ্ছে। তবে কাজ কর্‌তে কর্‌তেও যখনি ফুলির ব্যর্থ-জীবনের কথা মনে পড়ে, তখন মজিদের মুখের হাসি মিলিয়ে যায়; খেতে বস্‌লে মাঝে মাঝে হাতের গ্রাস মুখে তুল্‌তে ভুল হয়। ফুলির মা'র কিন্তু এখন পর্য্যন্ত মস্‌জিদে শির্ণি দেওয়ার বিরাম নেই। এর মধ্যেই একদিন মজিদের কনিষ্ঠা কন্যা দুলি দু'টি শিশু কন্যা রেখে অকস্মাৎ ইহলোক ত্যাগ করল। দুলি ছিল তার স্বামী বসিরের তৃতীয় পক্ষ—একে একে তিনটী স্ত্রী বিয়োগে বসির ত বসির যে কোন দুঃসাহসী স্বামীই ত ভড়্‌কে যাওয়ার কথা।

বসিরের চেহারাকে খাঁটি তাম্র বর্ণের নিদর্শন বলা যায়, স্বভাবতঃ সে সাদাসিদে মানুষ; সরল ও কষ্টসহিষ্ণু কিন্তু কিছুটা হাবা। কাপড় পর্‌লে হাঁটুও যে ঢাকা দরকার এ অভ্যাস তার কোনদিন হয় নি। হয়ত দেশী তাঁতির মোটা কাপড় হাঁটুর নীচে নামতেও চায় না। তবে লোকে বলে সে পয়সা চেনে—পয়সা সে আন্‌তেও জানে, পয়সা সে রাখতেও জানে। চাষার ছেলে হলেও সে চাষ করেনা—সাত আট ক্রোশ দূরের এক হাট থেকে সস্তা বেতের জিনিস---কুলা, চালুনী, লাই, ধামা, জুঁইর, চাই ইত্যাদি কিনে এনে নিকটবর্ত্তী হাটে কোনটা এক পয়সা, কোনটা আধ পয়সা, কোনটা দু'পয়সা মুনাফায় বিক্রী করে।

এ ভাবে কম লাভে বেশী বিক্রী নীতি অবলম্বন করে সে বেশ দু' পয়সা রোজগার করছে। তার হাতে কাঁচা পয়সার নাড়াচাড়া দেখে এ ভাবে পয়সা রোজগারের লোভ প্রতিবেশী আরও কারো কারো যে হয়নি তা নয়। কিন্তু রাত থাক্‌তে ঘুম থেকে উঠে কিছুটা ভাত তরকারী কলা পাতায় জড়িয়ে একটা দীর্ঘ বাঁশ কাঁধে ফেলে সাত আট ক্রোশ হেঁটে অলি হাটে যাওয়া আবার সেখান থেকে ভরা বোঝা কাঁধে নিয়ে সেই দীর্ঘ পথ হেঁটে নিশীথ রাতে বাড়ী পৌঁছার কল্পনা কাকেও আর বসিরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামাতে পারেনি। নিত্য বোঝার চাপে বসিরের কাঁধ যেমন মিশ মিশে কালো হয়ে গেছে, তেমনি বেশ মাংসল হয়ে ফুলেও উঠেছে। বসিরের সঙ্গে দেখা হলে প্রথমে তার ঐ দুই কাঁধের উপরই নজর পড়ে—মনে হয় ঐ কাঁধ দু'খানিই প্রকৃত বসির। প্রথম দুই বৌ মরার পর বৌ-খোর বলে পাড়ায় পাড়ায় তার এমন বদ্‌নাম রাষ্ট্র হয়ে পড়ল যে তার সমকক্ষ পরিবারের কেউই আর মেয়ে দিতে রাজী হলনা। বসিরের খাওয়া পরার ভাবনা নেই—তার উপর শাশুড়ী-ননদ-জা-বিহীন ঘরে নির্বিবাদে খেয়ে পরে জীবন কাটাতে পারবে ভেবে মজিদ কিন্তু মেয়ে দিতে আপত্তি করল না।

লোকের কথার উত্তরে সে শুধু বল্লে—হায়াৎ মওতের মালিক আল্লা। দুলির হায়াৎ থাইলে আজরাইলের সরত গেলেও তেই মইরত নয়, আর হায়াৎ ন থাইলে কি লোয়াদি বাঁধি রাইত পাইরগম্ না।

দুলির মৃত্যুর পর শরৎ কবিরাজ উঠে যাবার সময় বসিরকে এক পাশে ডেকে নিয়ে চুপি চুপি বলেছিল—এত ভারী ঔষধেও যেঅন্ কোন ফল ন অইল্ তঅন্ মনে হঅর্ যে তোঁয়ারে গ্রহ দোষে পাইয়ে নঅইলে তিন তিনটা বৌ মরার কোন কারণ নাই।

—গরদোষ অইলে খি খইত্ত অইব বাবু।

—খনঅ ভাল জ্যোতিষীরে দিয়েরে স্বস্ত্যয়ন খরাইতে অইব।

—শস্তন কি বাবু।

—দুষ্ট গ্রহকে শান্ত খরি দোষ খডানোরে খয় স্বস্ত্যয়ন। তুঁই একদিন আঁর খাচে আইস্ব আঁই ভাল জ্যোতিষী দেখাই দিয়ম্। এই বলে শরৎ কবিরাজ বিদায় নিল।

বসিরের স্ত্রীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর পাড়ার ঘরে ঘরে মেয়ে মহলে বেশ কথা কাটাকাটি চল্ল কিছুক্ষণ—কোন কোন ঘরে কিছুদিন ধরে। কুলসুম-এর স্বামী অত্যন্ত পান বিলাসী। কাজেই সকলেই জানে কুলসুমের ঘরে কখনো পানের অভাব হয় না। দুলির লাশ গোরস্থানে নিয়ে যাওয়ার পর কান্নার Ex-officio duty যাদের রয়েছে তারা ছাড়া বাদ বাকি একদল কুলসুমের ঘরে গিয়ে ঢুক্‌ল।

জমিরের মা এক গাদা চুণ জিভের ডগায় ডলে দিয়ে বলে উঠল —বসির বঅর্‌ পোরাখোয়াইল্লা—আর নয় তিন্না তিন্না বৌ মরেনা।

বাচার মা মোটা দেহ দুলিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিলে--- ন মরের কেয়া, এই পাড়ার খন্‌ বৌয়ে বৈদ্যের দাবাই খাইয়ে যে! জোয়ান্‌ জোয়ান্‌ মরদ্‌ অল্‌ মরের যে এক্কানা দাবাই ন পা'র্‌। ছঅনা, বইস্যাত্তে পইছা দুয়া অইয়ে দেই ধর্ম টর্ম আল্লা রছুল মানের নি। তেকা বৈদ্য ডাকের, তেকা-বৌয়েরে দাবাই খাবার—এই পাড়ায় অত সোয়াগ ন সয়। সত্যই এই পাড়ার কোন বৌ-ই আজ পর্য্যন্ত ডাক্তার কবিরাজের ঔষধ খেয়ে মরার সৌভাগ্য লাভ করে নি। এই বিষয়ে এ গ্রামে ভাগ্যবতী দুলিই পাইওনিয়ার!

পাড়ায় জমিরের মা'র একটু নমাজী কালামী বলে নাম আছে। বিস্ময়ে বিস্ফারিত-নেত্র হয়ে জমিরের মা বল্লে, আইচ্ছা, বসির এ'ন্‌ দজ্জাল্‌ কেএনে অইল্‌!—তে'বলে এইবার মলই স'অরেও ন ডাকে, এক্কানা তাবিজ দোওয়া ঝাড়াফুয়াও ন গ'রায়!

কুলসুমের বয়স অল্প—তবুও সব কথাতেই কিছু একটা ফোড়ন দেওয়া তার স্বভাব। সে বলে উঠল---ভাজীর খতা মানি। আইচ্ছা আগের দুই বৌয়েরে ত বইস্যাবদ্দা দাবাই ন খাবাইয়েল তারারলাইতে ম'লই সা'বরে আনি বউত দোওয়া দরূদ পড়াইয়েল্‌, তারা মইল্ল কা?

বৃদ্ধা কালুর মা চুপ করে বোধ করি জীবনের অনিশ্চয়তা সম্বন্ধেই ভাব্‌ছিল আর দন্ত-বিহীন ফোখ্‌লা মুখে এক গাল পান ঢুকিয়ে দিয়ে গাল চিবুক জিহ্বা ও মাড়ির দ্রুত উত্থান পতনের সম্মিলিত সহযোগে

পান চিবাবার যা অভিনব কসরৎ কর্‌ছিল তা কিছুক্ষণের জন্য থামিয়ে তার দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা-লব্ধ সর্বোত্তম জ্ঞানের কথাটা বল্লে—তোরা খঅস্ কি? আছুল খতা, অয়াৎ, অয়াৎ—ন থাইলে টেঁয়ারা দিয়েরেও রাইত্ নঅ পারিবি। আর অয়াৎ থাইলে যমেও ন গছিব।

কথাটা পাড়াগাঁয়ে এত খাঁটি ও এত বহু পরীক্ষিত যে তার কোন প্রতিবাদ চলে না।

শরৎ কবিরাজের কথাটা কিন্তু বসিরের মনে ধরেছিল। কাজেই কয়েকদিন পর বসির শরৎ কবিরাজের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলে। তিনি কামাখ্যা থেকে আগত বর্তমানে তাদের পাড়া থেকে পাঁচ ক্রোশ উত্তরে চক্রধরপুরে অবস্থিত এক জ্যোতিষীর বিস্তৃত বিবরণ ও পরিচয় দিয়ে সেখানে গিয়ে জ্যোতিষীর ব্যবস্থা মত স্বস্ত্যয়ন ও নিজের ভাগ্য গণিয়ে দেখতে পরামর্শ দিলেন বসিরকে।

বসির কালবিলম্ব না করে চক্রধরপুর রওয়ানা হ'ল। জ্যোতিষীর খোঁজ পেতে বেশী বেগ পেতে হল না, কারণ ইতিমধ্যেই জ্যোতিষীর খ্যাতি ও পসার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। মৃগ-চর্মের উপর উপবিষ্ট জ্যোতিষী সন্ন্যাসীর সম্মুখে যথারীতি দক্ষিণা রেখে সে নিজের দুঃখের কাহিনী আনুপূর্বিক বর্ণনা করলে। জ্যোতিষীও যা জানা দরকার খুঁটে খুঁটে সব জেনে নিয়ে তাকে কাল ভোরে আসার আদেশ দিয়ে সেদিনকার মত বিদায় করে দিলে।

নিকটে এক গৃহস্থ-গৃহে রাত কাটিয়ে ভোরে এসে হাজির হতেই জ্যোতিষী তাকে জানিয়ে দিলে—তার চতুর্থ স্ত্রীও মারা যাবে এবং তাও বিয়ের এক বছরের মধ্যে। বসির কপালে করাঘাত করে দুই যুক্তকর প্রসারিত করে বলে উঠল—খনঅ উপায় নঅইব না বাবাজী।

জ্যোতিষী দৃঢ়কণ্ঠে জানালে—না! তবে তোমার পঞ্চম স্ত্রী খুব দীর্ঘ-জীবী হবে, এমন কি স্বামীকে ডিঙ্গিয়েও সে বহুদিন বেঁচে থাক্‌বে!

শুনে বসির পঞ্চম স্ত্রীর আয়ু চতুর্থ স্ত্রীতে বদলী করার উপায় আবিষ্কারের জন্য জ্যোতিষীর দুই পা জড়িয়ে ধরে অনেক কান্নাকাটি

করলে বটে কিন্তু জ্যোতিষী কিছুতেই রাজী হল না। নিয়তির এই বিধান খণ্ডাবার কোন ক্ষমতা তাঁর কেন তাঁর গুরুরও নেই বলে তিনি চুপ করলেন। অনন্যোপায় হয়ে, পঞ্চম স্ত্রীর আয়ু সম্বল করেই বসিরকে ফিরে আস্‌তে হল। তৃতীয় স্ত্রীর মৃত্যুর পর পাড়ায় তার সম্বন্ধে একটা রীতিমত আতঙ্কের সঞ্চার হয়েছে—এখন চতুর্থ স্ত্রীরও আশু মৃত্যু সম্ভাবনার সংবাদে সেই আতঙ্কটা নানা প্রকার টীকা-ভাষ্য ও মন্তব্য সহকারে পল্লবিত হয়ে মুখ থেকে মুখে, গৃহ থেকে গৃহান্তরে, এ পাড়া থেকে ও পাড়ায় ছড়িয়ে পড়ল।

বসির মনে মনে সঙ্কল্প কর্‌লে—এ বছরের জন্য কানা খোঁড়া রোগী বুড়ী যাই হউক একটা নামকেওয়াস্তে বিয়ে করে রাখ্‌বে, পরে ভাল দেখে জাত বিচার ও যাচাই করে বিয়ে কর্‌লেই চল্‌বে।

কিন্তু ঐ রকম মেয়ে জোটানো বসির যত সহজ মনে করেছিল, কার্য্যকালে দেখা গেল তত সহজ নয়। যতই দীন হউক, নিজের সন্তানের আয়ুকে মাত্র তিন'শ পঁয়ষট্টি দিনে সীমাবদ্ধ করে দিয়ে কোন্ পিতামাতা নিজ হাতে সন্তানকে যমের দুয়ারে ঠেলে দিতে রাজী হবে বলুন! ফুলির কথা বসিরের যে মনে হয় নি তা নয়—কিন্তু সম্বন্ধটা লৌকিক আচারে বাধে বলে সে মুখ খুলে বলতে পারে নি। যাই হউক, বসিরের অবস্থা ও ইচ্ছেটা তার শ্বশুর বাড়ীরও আলোচনার বিষয় যে হবে তাতে আর বিচিত্র কি। সে আলোচনাটা ফুলির কানে যেতেই তার মনে এক অপ্রত্যাশিত আশার ক্ষীণ রশ্মি রেখা ফুটে উঠেছিল। সে ক্ষীণ আশায় বুক বেঁধে সে কথাটা মার কাছে পাড়তেও কাল বিলম্ব করে নি।

ফুলির বাপ মার জন্য সমস্যাটা জটিল ও গুরুতর। এক দিকে বিবাহিত জীবনের স্বাদ আহলাদ থেকে চির-বঞ্চিতা কন্যার ব্যর্থ জীবনের হাহাকার—আর এক দিকে নিজের হাতে হাত পা বেঁধে নিজের কন্যাকে যমের দুয়ারে নিক্ষেপ করা। এ দ্বন্দ্ব ও সংশয় শঙ্কায় তারা তিন দিন তিন রাত্রি বিনিদ্রই কাটিয়ে দিলে। চতুর্থ দিনে মজিদ খুব ভোরে মসজিদ থেকে ফজরের নামাজ পড়ে এসে স্ত্রীকে ডেকে জানিয়ে দিলে

--হায়াৎ মওৎ আল্লার হাতে, গণকের কথা সে বিশ্বাস করে না। ফুলিকে বসিরের সঙ্গে সে বিয়ে দেবেই। মজিদের ইচ্ছা ও কন্যার চির অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়েই বোধ করি ফুলির মা-ও শেষ পর্য্যন্ত আর বিশেষ আপত্তি করলনা। কপালে যাই থাক্, কোন্ মা কন্যার জন্য স্বামীর স্বাদ, বিয়ের স্বাদ কামনা করে না!

তবুও ফুলির মা বল্লে—দুলির সঁঅতও তুঁই এ খতা খইলা,---আঁর হাঁপানী ব্যারাইন্মা মাইয়া আঁর ত মনে ন খতর্।

মজিদ উত্তর দিলে অয়াৎ ফুরাইলে, অন্য খাইৎ বিয়া দিলেও কি তেই ন-মইরত না?

এ যুক্তি খণ্ডন করা ফুলির মার সাধ্যাতীত।

কাজেই দু'একদিন পরে একটা অবধারিত মৃত্যুর কাল ছায়ার নীচে, একটা আতঙ্কের মাঝখানে এই অবাঞ্ছিত বিয়ে অতি দীনভাবে মাত্র চার পাঁচ জন লোকের সামনে সমাধা হয়ে গেল। দশ বার বৎসর পূর্বে বসিরের প্রথম বিয়ের সময় কেনা ও তার ভূতপূর্ব স্ত্রীর পরিহিত ম্লান জীর্ণ শীর্ণ বেনারসীতে সজ্জিত হয়ে ফুলি পাল্‌কীতে গিয়ে চড়ে বস্‌লো। সারা পথে হাঁপানীর হাপর চালাতে চালাতেই সাতাস বৎসর বয়সে এ সর্ব প্রথম ফুলি এক ক্ষীণ-রশ্মি রেখার ক্ষীণতর হাতছানিতে সাড়া দিয়ে স্বামীর ঘর করতে চল্লো! তার জীর্ণ শীর্ণ দেহের পাঁজর ভাঙ্গা কক্ কক্ খক্ খক্ ও সশব্দ খেঁচুনীর নীচে যে ব্যথিত ও হতাশা-বিদ্ধ মানবহৃদয় আছে তাতে আসন্ন মৃত্যুর বিভীষিকা, না অপ্রত্যাশিত নবীন জীবনের পুলক সঞ্চরণ করে ফিরছিল, তা এক তার অন্তর্য্যামী ছাড়া আর কে বলতে পারে?

রোগ-জীর্ণ দুর্বল দেহে যেটুকু শক্তি অবশিষ্ট ছিল সবটুকু দিয়ে ফুলি তার এ নূতন জীবন আঁকড়ে ধরলে। হয়ত এ জীবন সে আবাল্য ধ্যান করেছে। হয়ত এ তার নারী জীবনের শ্রেষ্ঠ স্বপ্ন। হয়ত তিন'শ পঁয়ষট্টি দিনের স্বল্প পরিসর মেয়াদী দাম্পত্য জীবনের প্রতি-মুহুর্তটিকে সে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করে নিতে চায়, হয়ত তার দেহমনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এত দিনের সঞ্চিত যে অতৃপ্ত নারীত্ব বদ্ধ জলস্রোতের মত

স্ফীত হচ্ছিল তা আজ হঠাৎ নির্গমনের ক্ষীণ পথ রেখাকে ভাসিয়ে প্লাবিত করে দিতে উন্মুখ। না হয় স্বামীর মন তুষ্টির জন্য এমন করে কেউ নিজেকে ঢেলে দেয় না। দুলির কন্যা দুটিকে সে মায়ের মত আদর যত্নেই কোলে তুলে নিলে। তার অনভিজ্ঞ স্বল্প বুদ্ধিতে স্বামীকে সেবা যত্ন করা, খুশী করার যত ছলা কৌশল জানা ছিল সবই সে সর্বান্তঃকরণে প্রয়োগ করতে লাগলো। দিন রাত কক্ কক্ খক্ খক্ করে তার অনলস দুই পা আর অক্লান্ত দু'খানা হাত চালিয়ে সে বসিরের সংসারকে বেশ গুছিয়ে তুল্লে। কিন্তু গুছিয়ে তুল্লে কি হবে—বসির ত জানে একটা অনিবার্য্য ফাঁক পূর্ণ করবার জন্যই তাকে আনা হয়েছে মাত্র এক বৎসরের জন্য। সে দীর্ঘজীবী পঞ্চমার পরিবর্তে শুধু বেগার দিতেই এসেছে এক বছর, তারও ত দু'মাস পার হয়ে গেছে অর্থাৎ আর দশ মাস পর তাকেও তার পূর্ববর্তিনীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিদায় নিতে হবে। বসির হিসাবী বেপারী মানুষ—একে স্ত্রীর ন্যায় আদর যত্ন করা এবং একআধখানা ভাল কাপড় চোপড় দেওয়াকেও তার কাছে একটা অপব্যয় বলে মনে হতে লাগলো। কাজেই ফুলির জীবন অত্যন্ত অনাদর ও উপেক্ষার মধ্যেই কাটতে লাগল।

এতদিন বসির জানতো এক আত্মীয়ার হাঁপানী রোগ আছে—নানা হাট থেকে কয়েকবার পয়সা খরচ করে সে হাঁপানির ঔষধও কিনে দিয়েছিল। কিন্তু হাঁপানী যে কি বস্তু এতদিন পরে সে তা হাড়ে হাড়ে টের পেতে লাগলো। দিন রাত ২৪ ঘণ্টা তার কানের উপর কক্ কক্ খক্ খক্ করা বুকফাটা খিঁচুনি কি করে যে মানুষ বরদাস্ত করতে পারে এ সে ভেবে পায় না। প্রতিবার হাঁপানির সময় তার মনে আশা জাগে —এ বুঝি শেষ নিশ্বাস বেরুল। দিনের পর দিন মাসের পর মাস যথা নিয়মে গত হয়ে চল্ল, কিন্তু শেষ নিশ্বাস বেরুবার কোন নামগন্ধও দেখতে না পেয়ে সে রীতিমত হতাশ হয়ে জ্যোতিষীর কাছে গিয়ে তার হতাশাটা একদিন জানিয়েও এসেছে। জ্যোতিষী আশ্বাস দিয়েছে—ঘাবড়াও কেন বেটা? বছরের এখনও ছ'মাসের বেশী বাকী।

কাজেই নবীন আশায় বুক বেঁধে বসির এবার পূর্ণ উদ্যমে তার ব্যবসা চালাতে লাগলো। সামনে বড় রকমের খরচ আছে বলেও সে এবার ব্যবসাটা বেশ মন দিয়ে ধরেছে—বাড়ীর খাবার দাবারের খরচও কিছু কিছু কাটছাঁট করে প্রতি হাটে কিছু কিছু যাতে জমে তার চেষ্টা কর্‌ছে।

তার সঙ্কল্প, দীর্ঘজীবী পঞ্চমাকে একটু ভাল ঘর দেখেই আন্‌তে হবে—ভাল ঘরে গেলেই ত টাকা চাই। এরি মধ্যে সে প্রায় টাকা পঞ্চাশেক জমিয়ে ফেলেছে—তার ইচ্ছা দীর্ঘজীবী পঞ্চমাকে আন্‌তে অন্তত শ'খানেক টাকা সে খরচ করবে। এ পাড়ায় এ পর্য্যন্ত কেউ পাঁচ কুড়ি টাকা খরচ করে বিয়ে করেনি। তার সঙ্কল্প তা সে করবে অর্থাৎ এ পাড়ায় বিয়ের খরচে সেঞ্চুরী করার গৌরব সেই অর্জ্জন করবে। এখন থেকে একটা ভাল বউ দেখার জন্য সে কোন কোন পরিচিত আর আত্মীয়দের বলেও রেখেছে। ফুলির যত সাধ তত সাধ্য নেই—হাঁপানী তার একমাত্র প্রতিবন্ধক। স্বামী ও স্বামীর সংসারের জন্য সে যতখানি খাট্‌বে ভাবে, দুরন্ত হাঁপানির জন্য সে তত খাট্‌তে পারেনা।

ফুলি আবাল্য স্বল্প-ভাষিণী। হয়ত হাঁপানির জন্য বাধ্য হয়েই সে স্বল্প-ভাষিণী, কারণ কথা বল্‌তে গেলেই তার হাঁপানী শুরু হয়ে যায়। স্বামীর অনাদর উপেক্ষা, অন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন ও গালাগালিতেও কোন উত্তর করে না সে। শুধু দুই স্বচ্ছ চক্ষু তারকা তুলে হাবার মত চেয়ে থাকে। সে জানে উত্তর করতে গেলেই হাঁপানী শুরু হয়ে যাবে—আর হাঁপানী শুরু হয়ে গেলেই স্বামীর মুখের গালাগালি হাতের কিল মুষ্টিতে পরিণত হয়ে তার পিঠেই ঝরে পড়বে।

হাঁপানির জন্য নামাজ সে শিখতে পারেনি। বহু চেষ্টা করে দেখেছে—একশব্দ উচ্চারণ করতে না করতেই হাঁপানী শুরু হয়ে যায়। এভাবে বহু পণ্ডশ্রমের পর সে এ আশা ত্যাগ করেছে। স্বামীগৃহের পশ্চিম দিকের একটি নির্জ্জন কোণকে সে বেশ করে লেপে পুঁছে নিয়েছে। একটি জায়নামাজ ও একখানা ধোওয়া কাপড় যা সে অন্য কোন সময় পরে না, সেখানে একখানা দড়ির উপর রেখে দিয়েছে।

যখন মস্‌জিদ থেকে আজানের স্বর তার কাণে এসে পৌঁছে তখন হাতের কাজ ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে অজু করে সে সেই স্থানটিতে উপস্থিত হয়। পরণের ময়লা কাপড়টা বদলে জায়নামাজটা বিছিয়ে শুধু আল্লা আল্লা করেই বারকয়েক সেজদা দেয়—আর আল্লার কাছে একমাত্র প্রার্থনা জানায় তার হাঁপানী রোগের আরোগ্যের জন্য। তার দৃঢ় বিশ্বাস হাঁপানির হাত থেকে রেহাই পেলে সে স্বামীকে খুশী কর্‌তে পার্‌বে। বিয়ের সাত আট মাস পরেও যখন ফুলির হাঁপানী কিছুমাত্র বৃদ্ধি হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ হলো না, তখন বসির ত রীতিমত ঘাবড়িয়ে উঠল। জ্যোতিষীর খোঁজে আবার সে বেরুল—কিন্তু এবার জ্যোতিষীর দেখা পেলনা। তিনি দেশে না কোথায় চলে গেছেন। ফিরে এসে অনন্যোপায় হয়ে সেও মস্‌জিদে দরগায় বাতি দেওয়া আরম্ভ কর্‌ল। বসির কিন্তু এখনও একেবারে নিরাশ হয় নি। ভরসা হাঁপানীতে না মরে অন্য রোগেও ত মর্‌তে পারে। আবার ভাবলে মরার জন্য রোগেরই বা দরকার কি—এমনিই ত কত শত মানুষ রোজ মর্‌ছে! ভাল মানুষ রাত্রে খেয়ে দেয়ে শুয়েছে, ভোরে বিছানা থেকে ওঠেনি—এমন কাণ্ডও ত সে বহু শুনেছে। কাজেই নিরাশার অন্ধকারেও সে আশার ক্ষীণ রেখা দেখতে পায়।

এত আল্লাকে ডাকাডাকির পরও হাঁপানীতে কোন জোয়ার-ভাটা, উনিশ-বিশ না দেখে ফুলিও যে শঙ্কিত না হচ্ছিল তা নয়। সেও গোপনে মুরগীর ডিম-টিম বেচে যা দু'এক পয়সা পেত তা দিয়ে মস্‌জিদে দরগায় বাতি দেওয়াতে লাগ্‌ল। মস্‌জিদে দরগায় উভয়ে বাতি দিচ্ছে বটে, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে উভয়েরই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিপরীত। হয়ত এই ভক্তি-দু-ধারার উভয় সঙ্কটে পড়ে বিধাতাও Non-intervention অর্থাৎ নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছেন। না হয় রোগের নড়চড় বা উত্থান-পতন হবেনা কেন।

ফুলির হাঁপানী প্রথম কয়েক মাস বসির অনিবার্য্য ও সাময়িক আপদ হিশেবেই সয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল। কোন প্রকারে মাস তিনেক সে নীরবে সইতে পেরেছিলও তারপর পাটি-বালিশ নিয়ে সে দেউড়ী ঘরে শোওয়া আরম্ভ করে দিলে। তখন নৈরাশ্যের অন্ধকারে

চোখের জলে মাটি ভিজানো ছাড়া ফুলির অন্য উপায় ছিলনা। স্বামীর পায়ে-হাঁটা ব্যবসা—এত হাঁটাহাঁটির পর হয়ত সমস্ত শরীরে ব্যথা হয়ে থাকে—তার ইচ্ছে হয়---সে কাছে গিয়ে স্বামীর পায়ে হাত বুলিয়ে হাতপাগুলি টিপে দেয়। কিন্তু পোড়া কপাল, স্বামী তাকে কাছে ঘেঁষতেই দেয় না, কতদিন চুপি চুপি উঠে দেউড়ী ঘরের দরজা খুলে নিঃশব্দে স্বামীর পদপ্রান্তে বসে পায়ে হাত দিয়েছে—স্বামী প্রথম প্রথম চম্‌কে উঠে কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা কর্‌ত, কে? আমি—উত্তর দিতে গিয়ে কত দিন কাশি আর হাঁপানিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর কিল লাথিতে সে গভীর রাত্রেই একটা তুমুল কাণ্ডের স্বষ্টি হয়েছে।

বসির একটু বেশী-মাত্রায় তামাক-খোর। ফুলি এটা ওটা বেচে যা দু'চার পয়সা হাতে পেত তা দিয়ে—তার ছোট ভাই নজু প্রায়ই হাটে যাওয়া-আসার পথে তার এখান দিয়ে উঠে;—তাকে দিয়ে হাট থেকে সুগন্ধি তামাক খয়ের আনিয়ে রাখত। রাত্রে সুগন্ধি তামাক ভরে, সুগন্ধি খয়ের দিয়ে পান সাজিয়ে চুপি চুপি দেউড়ী ঘরে কম্পিত চরণে সে গিয়ে ঢুকত। তামাকের গন্ধে কোন কোন দিন বসিরের পক্ষে লোভ সামলানো অসম্ভব হয়ে পড়ত, পানের খিলিটাও যে হাত পেতে না নিত তা নয়। কিন্তু বেশীর ভাগ সময় এই দুর্বলতা সামলিয়ে সে হুঁকা শুদ্ধই হয়ত লাথি মেরে দূরে ছুঁড়ে ফেলত। আর বৌয়ের চুলের ঝুটি ধরে লাথি মেরে ঘরের বার করে দিয়ে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিয়ে আবার শুয়ে পড়ত। হতভাগিনী স্বামী-সঙ্গ-বঞ্চিতা ক্ষুধিতা নারী শীতের দিনে ঠক্‌ঠক্ করে অথবা বর্ষার দিনের কাদায় জলে একাকার হয়ে কান্নানৈরাশ্য ও হাঁপানির মরণ-যন্ত্রণা নিয়েই সে ঘরের দুয়ারে মাটিতে পড়ে কত রাত কাটিয়ে দিয়েছে।

এত মারধর অত্যাচারেও কি জানি কেন সে নিজেকে কিছুতেই রাত্রে নিজের ঘরে ধরে রাখতে পারে না। হাত-পা দিয়ে মার্‌তে মার্‌তে বসিরের হাত-পাও যেন এখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তাই আজ কাল বসির শোবার সময় বিছানার পাশে একটা বেত রেখে দেয়। ফুলি তার পায়ে হাত দিতেই ঘুমের ঘোরে কোন কোন রাত হয়ত লাথি

মেরেই হাত কেন মানুষ শুদ্ধই দূরে ফেলে দেয়। কিন্তু আবার উঠে এসে হাতটা ওর গায়ে দিয়েছে অথবা হাঁপানী শুরু হয়েছে ত, সে লাফ দিয়ে উঠে বেত দিয়ে একেবারে গরু-পেটা করে ফুলিকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হয়। অতৃপ্ত কামনার প্রেতমূর্ত্তির মত নিশীথ রাতে বাইরে পড়ে ফুলির যে বিলাপ তা বহু রাত পাড়া-পর্শীদের পর্য্যন্ত ঘুমাতে দেয় না। কিন্তু বৌ-মারা দেশের দণ্ডবিধির কোন ধারা মতেই ত অপরাধ নয়—বিশেষত পাড়াগাঁয়ে ওটা গার্হস্থ্য নীতির একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ! ও বিষয়ে কেউ কিছু বলা মানে অনধিকার চর্চা করা। কিন্তু ফুলিকে সাবাস দেওয়া যায়—অত মার খেয়েও মারের চোটে তার সারা শরীর দাগময় হয়ে গেছে—তবুও সে নিজেকে কিছুতেই নিজের শয্যায় যেন ধরে রাখতে পারে না বিশেষত ঘন আঁধারে-ঢাকা রাত্রে।

এক বছরের বাকি আর মাত্র দু'মাস—কিন্তু ফুলিকে তার আয়ু সীমার এত সন্নিকটে দেখেও বসিরের মনে কিন্তু কোন আশার সঞ্চার হয় না। কিন্তু দু'মাস—পূর্ণ ষাট দিন যে কোন কঠিন-প্রাণ লোকের মৃত্যুর জন্যও যথেষ্ট দীর্ঘ—এই যা সান্ত্বনা।

বসির দূরদর্শী লোক। একদিন হাটে বেরোবার প্রাক্কালে সে তার প্রতিবেশী ফুফাতোভাই গুনুকে ডেকে তার হাতে পাঁচটি টাকা দিয়ে চাপা কণ্ঠে বল্লে—আঁই-ত হাডে হাডে থাই—গণক বঅনা যেঁথে খইয়ে খঁত্তে কি অয় খোওয়া নযায়, তুই টেঁয়া পাঁউচ্ছা তোর হাতত্ রাখ।

গুনু বোধ হয় প্রথমে কিছুই বুঝতে পারল না। জিজ্ঞাসা করলো—টেঁয়াদি আঁই কীত্তাম?

বসির চিন্তিত হয়ে বল্লে—তুই খডিয়ার গাধা নাকি! বঅনা গনিয়েরে খইয়েদে, তোর এই ভাজী মাত্র এক বছরের বেশী আর বাঁইছ্ত নয়—আঁই হাডত্তুন্ আইস্তে ত রাইত অয়। আতিক্কা যদি আঁই হাডত থাইক্তে মরে, তোরা কাফন দাফনর টেয়া খডে পাবি? ইতাল্লাই উ-ন্ তোর খাছে রাইখ্তি দিদ্দে।

গুনু এতক্ষণে বোধ করি কথাটা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলে—সে হেসে বলে উঠল—ভাজির মঅৎ যেঁখে ঠিক আছে নমরিয়েরে ত নিস্তার নাই। তানে খই দিলেইত অয় যে—বদ্দা যেঁখে বাড়ী থাইব মেরবাণী গরীয়েরে এঁখে মরিবা।

বসির হতাশভাবে বলে উঠল—অয়, তোঁয়ার ভাজী বড় মরইন্না। আজ দশমাস যারগৈজে, মরিব দূরে থক্, একখেনা মাথা খঁওরী ল-অতি তেইর ন অর্। মাইয়াপোয়া অলর খথা কিল্যাই খঅর—ইত রাত্তেকি আক্কলর খাঁছা আছে না? ন দেখঅরনা এই দশ মাস ধরি আঁরে কে-ন্ জ্বালাই পোড়াই খার্। তারপর দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে ভারটী কাঁধে তুলে বসির হাটের দিকে রওয়ানা দিলে।

ভোরে উঠে রোজকার মত ফুলি উঠান ঝাড়ু দিচ্ছিল—হাঁপানী উঠতেই খুক্ খুক্ খক্ খক্ করে মাটিতে বসে পড়ে, প্রকোপ একটু কমলেই আবার ঝাড়ুটা তুলে ঝাঁট্ দিতে থাকে। গুনুদের দাওয়া থেকে বসিরের উঠান দেখা যায়। সেই দাওয়ায় বসে গুনুর বৌ ছেলেকে মাই দিচ্ছিল। সে হয়ত স্বামীর কাছে—বসির যে বৌয়ের কাফন দাফনের টাকা দিয়েছে—সে কথা শুনে থাকবে। একটু রহস্যের জন্যই যেন সে বলে উঠল—ভাজীর এয়া খ'মাস অইল্? আর খ'মাস বাঁই আছে?

মাসানুসন্ধানের রহস্য প্রত্যেক নারীই বোঝে। ফুলিরও এই রহস্য বুঝতে বেগ পেতে হয়নি। তবুও সে কোন উত্তর দিলে না। কুলসুম উনানের ছাই তুলছিল। কথাটা তার কাণে যেতেই, ফুলির উত্তর শোনার জন্য সে কাণ খাড়া করে রইল। কোন উত্তর যখন এলনা তখন সে আর থাকতে পারলনা। নিজেই বলে উঠল—ভাজীর এখন দশমাস। বসিরের উঠান পেরিয়ে গুনুর দাওয়া থেকেই প্রতিধ্বনি হ'ল—আল্লায়দগ্ এবার আঁর ভাইরর উগ্যা মরৎপোয়া অউক। এই খোঁচা যে কোন নারীর পক্ষেই মর্মান্তিক। সাতাশ বছর পর্য্যন্ত ফুলির বিয়ে হয় নি—সেই দুঃখ সে নীরবে সহ্য করেছিল—এই স্বল্পপরিসর বিবাহিত জীবনে জননী-লক্ষণ প্রকাশ না করা কোন নারীর পক্ষেই অস্বাভাবিক বা বিচিত্র নয়। তবুও আজকের এ সামান্য খোঁচা

ফুলির সারাজীবনের সমস্ত ধৈর্য্যকে যেন মুহূর্তে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। সে হাতের ঝাড়ু কপালে মারতে মারতে গৃহের যে স্থানটিতে বসে সে দিনে পাঁচবার আল্লাকে ডাকে—যে স্থান অজু না করে কাপড় না বদ্‌লিয়ে সে কখনো মাড়ায় না—সেখানে লুটিয়ে পড়ে যুগপৎ কান্না, ফোপানী ও ক্রনিক্ হাঁপানির মৃত্যুযন্ত্রণার মাঝেও হস্তস্থিত ঝাড়ু দ্বারা নিজের কপালে আঘাত করতে করতে কপালকে রক্তাক্ত করে তুল্ল।

গুনুর বৌ ও কুলসুম এ অপ্রত্যাশিত কাণ্ডে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। তারা দৌড়ে এসে জোর করে ধরে ফুলির হাত থেকে ঝাড়ু ছিনিয়ে নিলে। তারপর সান্ত্বনার সুরে বল্লে—অভাজী, আঁরাত এন্ কিছু খারাপ খতা নঅ খই। এক্কানা ঠাট্টা করগিযে না—অভাজী, আইজ তোবা গইল্লাম আর কনঅ দিন ঠাট্টাও ন'গইরগম্।—হাঁপানীও চোখের জলের দ্বন্দ্বের মাঝখানে কোন প্রকারে সে বল্লে—তোঁয়ারার দোষ নাই অ-বু, আঁর খোয়াল্ আঁর খোয়াল্, বলতে বল্‌তে সে আবার দু'হাতে কপাল ধুক্‌তে লাগল।

দেখ্‌কে দেখ্‌তে একাদশ মাস গত হয়ে দ্বাদশ মাস এসে পড়ল। বসির এবার অধিকতর অধৈর্য্য হয়ে উঠলো। কিন্তু এখনো সে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়নি।—অতবড় জ্যোতিষীর কথা একেবারে মিথ্যা হবে এ তার এখনো প্রত্যয় হয় না। তবে অনাবশ্যক দেরী হচ্ছে দেখে তার দুঃখও অস্বস্তির সীমা-রেখা নেই। এমন কি প্রথম তিন স্ত্রীর মৃত্যুর সম্মিলিত দুঃখকেও যেন এ ছাড়িয়ে গেল। ফুলির না মরার দুঃখ ভাবতে গিয়ে কোন কোন দিন রাত্রে তার ঘুমই হয় না। বে-পরওয়া মুহূর্তে ফুলিকে ঘুমন্ত অবস্থায় গলা টিপে ধরার কথাও যে তার মনে হয় নি তা নয়, কিন্তু যার তিন তিনটা বৌ মরেছে ও চতুর্থার মৃত্যু due হয়ে রয়েছে, তার এত বড় দুঃসাহস না হওয়ারই ত কথা। মানুষ হত্যার জন্য রীতিমত সাহস ও মনের জোর দরকার—ডুলা, হাতা, ধামা, কুলা, চালনী বিক্রেতা বসিরের অতখানি সাহস ও মনের জোর আশা করা যায়না। '
বসিরের ত এখন ফুলিকে রীতিমত ভয় হ'তে লাগল। ফুলির মৃত্যুটা এত অবধারিত ও নির্দিষ্ট যে তাকে দেখলেই বসিরের একটা সাক্ষাৎ মৃত্যুর মতই মনে হ'তে লাগল। আজকাল ফুলির কাজ কর্মে

চলাফেরায় সে যেন মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পায়। রাত্রে গাছের একটা পাতা নড়লেই তার মনে হয় ঐ বুঝি আজরাইলের পদধ্বনি, একটী আসন্ন মৃত্যুর বিভীষিকায় যেন তাকে পেয়ে বসল। তার দেউড়ীর পাশ দিয়েই যাতায়াতের পথ—রাত্রে লোক চলাচলের ক্ষীণ পদধ্বনিতে সে কতবার চমকে উঠেছে। ঐ বুঝি সেই পদধ্বনি ক্রমশঃ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে ফুলির ঘরে প্রবেশ করছে। তারপর থেকে প্রহরের পর প্রহর গণে সে সারারাত বিনিদ্র কাটিয়ে দেয়—কিন্তু সকালে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কক্ কক্ খক্ খক্ কাণে যেতেই নৈরাশ্যে তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ে।

এরই মধ্যে একরাত্রে ঘুমের ঘোরে হঠাৎ তার পায়ে ফুলির হস্ত স্পর্শে সে এমন চমকে উঠেছিল যে—আর একটু হলে সে হয়ত মূর্চ্ছিত হয়েই পড়ত, কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য মাত্র। সেই ঘুট্ ঘুটে অন্ধকারেও পার্শ্বস্থিত বেত খুঁজে পেতে তার একটুও দেরী হলনা। তারপর সেই অন্ধকারেই অতি নির্দয় নিষ্ঠুরতার সঙ্গে বেদম বেত চালিয়ে—ঝুটি ধরে ফুলিকে ঘর থেকে বের করে দিলে! সেদিন সারারাত্রিব্যাপী ফুলির ফোঁপানী কান্না হাঁপানীতে আশে পাশের কেউ ঘুমোতে পারেনি। নিশীথ রাত্রের সেই করুণ বিলাপধ্বনির মধ্যে—দৈহিক যন্ত্রণার আভাস কিছু ছিল কিনা কে জানে? কিন্তু একটা ক্ষুধিত ও অতৃপ্ত আত্মার মর্মন্তুদ কাৎরানি গুমরে গুমরে নিস্তব্ধ নৈশ প্রকৃতির বুক ছিঁড়ে যেন দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। সেই থেকে বশির আর অন্ধকারে শোয় না—সারারাত ধরে একটা কুপি জ্বালিয়ে ঘুমায়। তবুও কিন্তু ইতিহাসের পুনরাবর্ত্তনের ব্যতিক্রম হয়না। সেই অতৃপ্ত কামনা ফুলি হয়েই তার ঘরে ঢুকে পড়ে—পরক্ষণে বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত হয়ে খেকী কুকুরের মত কাৎরাতে কাৎরাতেই ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। দেউড়ী ঘরের বাইরে পড়ে থেকে ফোঁপাতে ফোঁপাতেই রাত শেষ করে দেয়।

তিন'শ পঁয়ষট্টি দিন যেদিন গত হয়ে গেল সেদিন বশিরের মন থেকে আশার ক্ষীণরশ্মিরেখাটুকুও নিঃশেষ হয়ে গেল। প্রথমে মনে মনে, পরে পাড়া প্রতিবেশীদের সামনে সে জ্যোতিষীর বাপান্ত করে

ছাড়লে। শরৎ কবিরাজের ওখানে সে বার দুই যাওয়া আসা করেছে তিনি গণকের এক বছর যে একটা আনুমানিক সময়, তা যে দশ এগার থেকে বার চৌদ্দ মাস পর্য্যন্ত হ'তে পারে সে আশ্বাস দিয়ে তাকে বিদায় করে দিলে। কিন্তু বার চৌদ্দ মাসেরও একটা সীমা আছে ত। কালের চাকা ত এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্থির হয়ে নাই। একদিন তার আশার ক্ষীণ রেখার সঙ্গে সঙ্গে বার চৌদ্দমাসও গত হয়ে গেল। কাজেই তার দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল এ কিছুতেই মরবে না। ঝড়ের মুখের বৃক্ষ যেমন আজন্ম ঝড়ের ধাক্কা খেতে খেতেই ঝড়-জয়ী হয়ে ওঠে, ঠিক এর প্রাণটাও যেন আবাল্য হাঁপানির হামান দিস্তায় ধুকা হ'তে হ'তেই একেবারে মৃত্যু-জয়ী হ'য়ে উঠেছে। এখন তার একমাত্র ভাবনা কি করে সারা জীবন সে একে নিয়ে কাটাবে? এই দুশ্চিন্তায় তার আহার নিদ্রারও অনিয়ম হতে লাগল—এমন কি প্রতিদিন হাটে যাওয়াও সে এখন ছেড়ে দিলে, একটা জন্ম হাঁপানী রোগীকে আজীবন খাওয়াবার কথা মনে হলেই সে আর পরিশ্রম করার উৎসাহ পায় না।

একদিন উঠানের একপাশে কুল গাছটার ছায়ায় বসে বসে সে হুঁকা চালাচ্ছিল আর নিজের অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা ভাবতে ভাবতে ঘণ্টা দুই পার করে দিলে। হঠাৎ তার খেয়াল হ'ল কৈ এতক্ষণ ধরে বৌয়ের কাশি ত যে সে একবারও শোনে নি। এ থেকে তার মনে হ'ল আজকাল পূর্ব্বের মত অত ঘন ঘন হাঁপানী ত শোনা যায় না যেন। আর হাঁপানী উঠলেও অত বেশীক্ষণ কক্ কক্ খক্ খক্ করেনা ত। আগে হাঁপানী উঠুক বা না উঠুক তার গলার হঁ হঁ শব্দ অন্য ঘর থেকে পর্য্যন্ত স্পষ্ট শোনা যেত। কিছুদিন ধরে সে রকম শব্দ শুন্‌ছে বলে ত তার মনে হয় না।

তার কি রকম একটা কৌতূহল হ'ল। যা সে কোনদিন করে না আজ তা' সে করলে। হুঁকাটা হাতে নিয়ে সে রান্না ঘরে গিয়ে ঢুকলো। ফুলি যেখানে বসে মেয়ে দু'টিকে ভাত খাওয়াচ্ছিল সেখানে একেবারে ফুলির সামনে গিয়ে বসলে। ফুলি বাম হাতে একখানা পিঁড়ি ঠেলে দিলে। স্বামী স্ত্রীর সংসার—স্বামীর খাবার থেকে পান তামাক পর্য্যন্ত সবই ফুলিকে দিতে হয়। বসিরেরও ভাত তামাক না

খেয়ে, হাত টেনে পানটা না নিয়ে অন্য উপায় নেই—কিন্তু কোনদিন সে স্ত্রীর মুখের দিকে একবার ফিরেও তাকায়নি। এক বছরের ম্যাদি স্ত্রীর দিকে সে একবার ভাল করে তাকাবার প্রয়োজনও হয়ত অনুভব করেনি। আজ কি জানি কেন সে সামনে বসেই ফুলির দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখলে। এ অপ্রত্যাশিত কাণ্ডে ফুলির লজ্জা হওয়ারইত কথা—সে মাথার কাপড়খানা একটু দীর্ঘ করে টেনে দিলে।

চুপ করে কতক্ষণ থাকা যায়। বসির জিজ্ঞাসা করলে—তোর হাঁপানি কি আইজ্ কাইল্ এক্কানা খইম্মে না কি? ফুলি প্রথমে কোন উত্তরই দিলে না। বসির আরও বার দুই জিজ্ঞাসা করার পর বল্লে—খমিলে কি তুঁই খুশী অইবানা! তুঁইত আঁই মইল্লেই খুশী।

খুশী অখুশীর খতা নয়—এ-নে পুছার লইদ্দে—আইজ্ খাইল্ যেন হাঁপানি খম্ উডে পাআন্লারদে।

ফুলি মাটির দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে বল্লে—আল্লার মে-রবাণীয়ে এক্কানা খইম্মে পাআন্লা'র।

ইতার ভিতর কি অষুধ খা-লি-না?

না—

আঁর অ'রী আইস্বেল দে, খনঅ অষুধ আইন্নেল না?

না! মা ত হুধা আঁরে চাইত আইস্বেলদে।

ইতিমধ্যে বসিরের শাশুড়ী এসেছিল। দিন দশেক থেকে গত কাল চলে গেছে।

বসির দেখে বিস্মিত হল যে এতদিন তার স্ত্রীকে সে যত কুৎসিত মনে করত প্রকৃতপক্ষে সে তত কুৎসিত নয়। এখন ত তাকে রীতিমত তার চোখে দশজনের একজন বলেই মনে হচ্ছে। তার চেহারা ও সর্বদেহে আজ বসির যেন একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করল। ফুলির গাল দু'খানির কালিমা ভেদ করেই যেন একটা শ্বেত আভা ফুটি ফুটি কর্‌ছে, চোখ ও কপাল যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ভাটির শেষে জোয়ার আসবার সময় যেমন সাগরের জলস্রোত উজান ফিরে দাঁড়ায়—জরাজীর্ণ

ফুলির দেহেও এবার একটা অনির্বচনীয় লাবণ্য স্বাস্থ্যের সহস্র ধারা বেয়ে তার অঙ্গে অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ার উপক্রম কর্‌ছে যেন।

এই আকস্মিক পরিবর্তনে বসির সত্যেই বিস্মিত হল। তার এ বিস্ময় কাটল দিন কয়েক পরে—যেদিন তার শ্বশুর বাড়ী থেকে তাদের বাড়ীতে দুই ভার গুড়া পিঠা এসে হাজির হল। স্ত্রীর বাপের বাড়ী থেকে গুড়া পিঠা আসার তাৎপর্য্য ও মর্ম সে বাল্যকাল থেকেই জানে। তার জীবনেও এই গুড়া পিঠা-পর্ব যে একাধিকবার না এসেছে তা নয়। কিন্তু আজ এই গুড়া পিঠা দেখে, খুশী হওয়ার পরিবর্তে তার মাথায় যেন আগুন ধরে গেল—তার ইচ্ছা হল একটা মোটা মুগুর নিয়ে গুড়া পিঠার ভাণ্ড ও ফুলির মাথা দুই-ই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়।

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর সকলে যখন ঘুমিয়েছে তখন ফুলি এক বাসন পিঠা নিয়ে ধীরে ধীরে দেউড়ী ঘরে গিয়ে ঢুকল—তখন বসির নিজেকে আর সামলাতে পারল না—লাথি মেরে থালা শুদ্ধ গুড়া পিঠাত সারা ঘরময় ছড়িয়ে ফেল্লে—তারপর বেতটা খুঁজে নিয়ে সপাং সপাং করে ফুলির পিঠের উপর চালাতে চালাতে বল্লে—হারামজাদী ইতাল্লাই না রাতিয়া আঁরে এডেও ঘুম যাইতাম নদ্দিস্ দে? দাঁতে দাঁত ঘসে আবার বল্লে—এই মজব্বত গরগিলি দে না—আঁর এ সর্বনাশ গরিবার লাই না? সপাং সপাং বেত ফুলির পিঠের উপর পড়তে লাগল।

প্রকৃতির আর এক রহস্যই বল্‌তে হবে—এরপর থেকে ফুলির হাঁপানির প্রকোপ কিন্তু দিন দিন কমে এল। কয়েক মাসের মধ্যেই মনে হ'ল সে যেন সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে যাবে। ফুলি যথা সময়ে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করল। বসিরের আর পুত্র সন্তান নেই—মনে মনে একটি পুত্র সন্তান সে চিরকালই কামনা করে এসেছে। কাজেই অবাঞ্ছিতা স্ত্রীর গর্ভে হলেও এই পুত্রের জন্ম সংবাদে তার মনে যে আনন্দ ও পুলকের সঞ্চার হয়নি তা নয় কিন্তু কি একটা লজ্জায় কয়েকদিন সে ফুলির আঁতুর ঘরের কাছেও ঘেঁষল না। মেয়েরা ছেলের মুখ দেখার জন্য তাকে কত সাধাসাধি ও ডাকাডাকি করল, সে কিন্তু এদিক সেদিক লুকিয়ে লকিয়েই দিন কয়েক কাটিয়ে দিলে।

কয়েকদিন পর একরাত্রে সবাই যখন ঘুমিয়েছে তখন সে চুপি চুপি আঁতুর ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে। ফুলি ঘুমিয়ে পড়েছে শিয়রে বাতিটা জল্‌ছে। মায়ের বুকের পাশে নবজাত শিশুটিও অকাতরে ঘুমুচ্ছে। একটা অপূর্ব অপত্য স্নেহে তার সারা বুক ভরে উঠল। তার ছেলে যে এত সুন্দর হতে পারে এ যেন তার বিশ্বাসই হতে চায় না। সে নিজেকে কিছুতেই দমন করতে পারলে না। শিশুর শয্যা পার্শ্বে ধীরে ধীরে হাঁটু গেড়ে বসে সে শিশুটিকে কোলে তুলে নিলে। হঠাৎ শিশুর ওঁা ওঁা কান্না শুনে ফুলি ধড়ফড় করে উঠে বসে দেখে—শিশুটিকে কোলে নিয়ে তার স্বামী হাবার মত তাকিয়ে আছে।

পরদিন বসির পাড়ার লোকজন ডেকে 'পানসল্লা' করে জানিয়ে দিলে—তার এ প্রথম পুত্র লাভ, সে ভাল করে একটা জেয়াফৎ দেবে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে এ আনন্দ সংবাদ পাড়ার এ মাথা ও মাথা ছড়িয়ে পড়ে আবালবৃদ্ধবনিতা সবাইকে উৎফুল্ল করে তুল্ল। পরদিন দীর্ঘজীবী পঞ্চমাকে খুব ভাল ঘর থেকে আনবার জন্য দীর্ঘদিন ধরে যে অর্থ সে সঞ্চয় করেছিল মাটি খুঁড়ে তা সব বের করে নিলে। তারপর বিকেলের দিকে লোকজন নিয়ে সারা মুখে হাসি ছড়াতে ছড়াতে সে হাটের দিকে রওনা হলো।

সকালে উঠানে দু'টা বড় বড় নতুন গরু বাঁধা দেখে ফুলি একেবারে অবাক্ হয়ে গেল। বসির আজকাল আঁতুর ঘর থেকে বেশী দূরে যায় না। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ছেলে কোলে নেওয়া তার যেন একটা বাতিক হয়ে উঠল। বিছানা থেকে ছেলেকে উঠিয়ে নিয়ে বসির উঠানে নাম্‌তেই ফুলি জিজ্ঞাসা করল—

—দু'য়া কিল্লাই আইন্ন দে?

—উগ্‌গা ত ফোওয়ার লাই। আকিকা গরা নপরিবনা?—আর উগ্‌গা আর একজনর লাই।

—এই আর একজন খতন্? বৌ ঠিগ তইরে না? খঁঅজ্জে আনিবা? ফুলি মুখ টিপে টিপে হাস্‌তে লাগল।

—আঁছি নখইয়ম্। বসিরের মুখে দুষ্ট হাসি।

—খঅনা, খঅনা, তোঁয়ার ফঁঅত ধরি খঅনা।

বসির এবার তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল—এত খঅনা, খঅনা ন গর্—এবর হয়াত বইর্গ্যা হাঁপানী ব্যারাম এক্কান্ আল্লায় নিল্ গই, ইতাল্লাই বুঝি আল্লার খন সোখর গরণ ন পরিব? আর উগ্গা আঁত্তে কিঅত্ লার? দুয়া বৌ আঁই কিইর্গম্? বলেই ছেলেকে দুই বাহুর উপর নাচাতে লাগলো।

ফুলি এত বড় সৌভাগ্য জীবনে কখনও আশা করেনি—এ আনন্দের ভার বহন তার পক্ষে যেন সম্ভব নয়। আনন্দে-কৃতজ্ঞতায় তার দু'চোখ পূর্ণ হয়ে উঠল—স্ত্রীর টলটলায়মান চোখের দিকে তাকিয়ে হাবা বসির আজ যেন আরও হাবা বনে গেল।

১৩৪৫

নাটিকা

আলোকলতা ।। প্রথম সংস্করণ

কবির বিড়ম্বনা

(কবি নির্জ্জন কামরায় বসে, কাব্যের মিল তালাশে মশগুল্, সাম্‌নে খাতা, হাতে কলম। পাশে একটা সুবৃহৎ বাংলা অভিধান।)

মা।---(কবি-জননী, ঢুক্‌তে ঢুক্‌তে) এত বেলা হ'ল, তুই কি নাওয়া খাওয়া করবি না নাকি, মনি?

কবি।---(বিরক্ত কণ্ঠে) ধ্যেৎ মা তুমি-ই সব মাটি কর্‌লে।

মা।---(কাছে এসে) বাবা, আগে খেয়ে নে, তারপর লিখিস্।

কবি।---(বাম হাতে টেবিলে কিল্ মেরে) মা, তোমাদের জন্য দেখছি কিছুই করতে পারব না---চুলোয় যাক্ নাওয়া খাওয়া।

মা।---দেখ দেখিন্ বাবা, মুখ শুকিয়ে কত টুকুন্ হয়ে গেছে,---চোখ কোটরে ঢুকে গেছে---

কবি।---(টেবিলের উপর কলম ছুঁড়ে ফেলে, আয়নাটা উঠিয়ে নিয়ে) কোথায় আমার মুখ শুকিয়েছে? এমন ভাসা ভাসা চোখকে মা তুমি কিনা বলো কোটরে ঢুকেছে? এবার ঢাকা গেলে তোমার জন্যে একটা বেশ পাওয়ারওয়ালা চশমা আন্‌তে হবে দেখ্‌ছি।

মা। (পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে) পাগ্‌লামী রাখ্ মনি! আয় বাবা, খেয়ে নে। (বাইরের দিকে তাকিয়ে) ওমা, কে যেন আস্‌ছে। (তিনি ঘোমটাটা আর একটু টেনে দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লেন---মনি আয়না দেখে চুল ঠিক করে কলম তুলে নিয়ে বেশ গম্ভীরভাবে লেখায় মনোযোগ দিলে। জনৈক মোক্তারের প্রবেশ।)

কবি।---কা'কে চাই?

মোক্তার।---মশায়কে দেখে আজ চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হ'ল!

কবি।---কেন?

মোক্তার।---মশায় হচ্ছেন আমাদের দেশের গৌরবের গৌরীশঙ্কর। আপনার যশোকীর্ত্তন দিকে দিকে নিনাদিত হচ্ছে। আপনার কাব্য সাধন-সাফল্যের মন্দ মন্দ সৌরভে দেশের আকাশ বাতাস ভুর ভুর কর্‌ছে---।

কবি।---(কানে হাত দিয়ে) মশায়, সব শব্দের অর্থ জানেন ত?

মোক্তার।---লোকের মুখে শুনি—

কবি।---তাই বুঝি বঙ্গভাষার মাথায় এমনি ক'রে নির্বিকারভাবে গদা ভাঙ্‌ছেন?

মোক্তার।---কোন্ এক বড়লোক না বলে গেছেন: যে দেশে একজন কবি জন্মে সে দেশ ধন্য। আজ আমাদের সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা জন্মভূমি ধন্যা।

কবি।—খোসামোদ জিনিষটি বাসি হয়ে গেছে, জানেন? অন্য কথা থাকে বলুন, না হয়---(বাইরের দিকে ইসারা।)

মোক্তার।—সেদিন 'দিবা-সূর্য্য' মাসিকে আপনার একটা চমৎকার কবিতা পড়লাম—'মধুমক্ষিকার প্রেম'।

কবি।—পড়ে বুঝেছেন ত?

মোক্তার।—চমৎকার কবিতা মশায়, একেবারে গ্রাণ্ড্। আই-এস্‌-সি ফেল্ করার Preparation-এর সময় মনে করতাম: কবিরা কোনো প্রকারে হয়ত মানুষের মনের খবর আন্দাজ করতে পারে---এখন দেখ্‌ছি কীট পতঙ্গ মায় গাছ্‌পালার মনের খবরও কবিরা দিব্যচক্ষে দেখতে পায়। আমাদের এমনি পোড়া চোখ, দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত ঘুরেও মানুষের মধ্যে কোথাও এতটুকু প্রেমের বালাই দেখছিনে---আর আপনি মধুমক্ষিকার প্রেম আলাপন নিজের কানে শুন্‌ছেন।

কবি।—(গম্ভীরভাবে) কবি হওয়া অত সহজ নয়। বহু জন্মের পুণ্যের ফল।

মোক্তার।---সম্পাদক লিখেছেন, কাগজের নাম 'দিবা সূর্য্য' আপনিই নাকি Suggest করেছেন--মার্ভেলাস্ নাম, প্রভাত-সূর্য্য না, রাত্রি-সূর্য্য না, একেবারে দিবা-সূর্য্য। কার মাথায় আস্‌ত বলুন ত?

কবি।---(সঙ্কোচের সহিত) তা ব'লে আর লজ্জা দিবেন না।

মোক্তার।--কবি মাত্রই স্বভাব-লাজুক।

কবি।---তা এ গরীবের দ্বারা মশায়ের কি কোনো উপকার--

মোক্তার।---(বিনীত ভাবে) আমি এবার লোকেল বোর্ডের মেম্বর পদপ্রার্থী---

কবি।---ভোট চান ত? তা আর বল্‌তে হবে না।

মোক্তার।---তা না, জনাব।

কবি।---তবে কি নমিনেশনে যেতে চান? ম্যাজিষ্ট্রেটকে বল্‌তে হবে? তা ম্যাজিষ্ট্রেট ত একটা আস্ত গাধা, কবিতাও বোঝে না, কবির যোগ্য সমাদর করতেও জানে না। বেটা আমাকে সাব্‌রেজিষ্ট্রারের নমিনেশন দিলে না সে-বার।

মোক্তার।--না, সে সব আপনাকে কিছুই করতে হবে না।

কবি।--(উত্তেজিত ভাবে) তবে কি করতে হবে চট্ ক'রে বলে ফেলুন। আমার কবিতার ভাব জুড়িয়ে যাচ্ছে, দেখ্‌ছেন না?

মোক্তার।---(সঙ্কোচের সহিত) অনুগ্রহ করে আমাকে একটা 'ইলেক্‌শন্ মেনিফেষ্টো' লিখে দিতে হবে।

কবি।--কি! কবিকে লিখ্‌তে হবে 'ইলেক্‌শন্ মেনিফেষ্টো'? মাতঃ বসুন্ধরে (উঠে সজোরে) দ্বিধা হও! (মিনিট খানেক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর ব'সে) মশায়, আমি গদ্য লিখতে জানি নে। লেখা দূরে থাকুক, গদ্যে কথা বলতেই আমার ঘাম ছুটে যায়।

মোক্তার।---গদ্যের দরকার নেই; কবিতায় লিখ্‌তে হবে, ছেলেরা যেন রাস্তায় রাস্তায় গেয়ে গেয়ে ক্যান্‌ভাস করতে পারে।

কবি।---(উত্তেজিতভাবে দাঁড়িয়ে) কাব্য-সরস্বতীকে দিয়ে ক্যান্‌ভাসি, স্পর্দ্ধা ত তোমার কম নয় দেখ্‌ছি। বেরো, বেরো! রবি ঠাকুরের কাছে যেতে পার না?

মোক্তার।---(যেতে যেতে) তাঁর কবিতা যে লোকে বোঝে না!

কবি।—বেটারা, আমি সহজ করে লিখি বলেই আমার যত অপরাধ! দেখ্‌ তবে, এবার থেকে আমিও এমন দুর্বোধ্য করে লিখব যেন কারও দন্তস্ফুটনও সম্ভব না হয়---অভিধানেও যেন শব্দার্থ খুঁজে না মেলে!

(মোক্তারের প্রস্থান)

কবি।---(নিজে নিজে হাত নেড়ে কবিতার লাইন আওড়াচ্ছেন:)

"আকাশে এলায়ে এলোচুল এলে তুমি আচম্বিতা।"

চমৎকার লাইনটি এসেছে। রবীন্দ্র-কাব্য মহাসাগর মন্থন করে বের করো ত দেখি এমন একটি লাইন। শুধু নোবেল প্রাইজ পেলেই বড় কবি হওয়া যায় না। এখন 'আচম্বিতা'র একটা মিল ঠিক মতো দিতে পারলেই ব্যাস্‌। (গভীর চিন্তার সহিত মিল তালাস, মুখে আওড়ান--)

"আকাশে এলায়ে এলোচুল এলে তুমি আচম্বিতা।"

(ডিক্‌শনারী তালাস্‌—)

মা।---(দৌড়ে এসে) বাবা, তুমি অমন করছ কেন?

কবি।—(জোরে, রাগের সহিত) মা, একটুখানি চুপ কর না। এই, এল ....(আকাশের দিকে তাকিয়ে)

"আকাশে এলায়ে এলোচুল এলে তুমি আচম্বিতা!

চরণে নূপুর বাজে তব কটি-বাস অসম্বৃতা।"

হাঁ, এবার আর যায় কোথা—

মা।---ওমা, কী হবে গো---

কবি।—হায় রে অপদার্থ বঙ্গ-জননী, তোমার কবির ভাগ্যে এ দুর্গতি।

মা।—বাবা, ভাত খাবি চল্।

কবি।—কী বল্লে মা?

মা।—ভাত।

কবি।—ভাত কি। কবিতা, কবিতা হচ্ছে, মা! ভাত চুলোয় যাক্। আগে কবিতা শোন মা। "আকাশে এলায়ে"—ইত্যাদি।

মা।—কবিতা কি, বাবা?

কবি।—এঁ্যা, কবিতা বুঝ না, মা? ট্রেজিডী, ট্রেজিডী, চমৎকার ট্রেজিডী! কবি-জননী কবিতা কি তা বোঝে না। এমন দেশ জাহান্নামে যাক্। (একটু চুপ থাকার পর) মা, সত্যিই কি তুমি আমার মা?

মা।—ওমা, আমার মনি বলে কি? আমার কি হবে গো। (বাইরের দিকে চোখ পড়াতে হঠাৎ কান্না থামিয়ে) ওমা, আবার কে যেন আসে? (ভিতরে প্রস্থান।)

(এক ডাক্তারের প্রবেশ)

কবি।—(ব্যস্ত হয়ে) কী চাই?

ডাক্তার।—আপনার যশঃগৌরবে আমরা মধুলুব্ধ ভ্রমরের দল—

কবি।—আসল কথা কী, তাই বল?

ডাক্তার।—আপনার কবি-প্রতিভার অক্ষয় জয়-ঢক্কা—

কবি।—চুপ্ রাও, ষ্টুপিড্! সময়ের মূল্য বোঝ না।

ডাক্তার।—আপনার একটু অনুগ্রহ—

কবি।—চট্ করে বলে ফেলো! (আওড়ান) "আকাশে এলায়ে এলোচুল........"

ডাক্তার।—(এলোচুলের সন্ধানে উপরের দিকে ব্যর্থ দৃষ্টি বুলিয়ে নেওয়ার পর) আমি একটি নতুন পেটেণ্ট্ ঔষধ বের করেছি।

কবি।---তা বেশ করেছো। লোক ঠকাবার এর চেয়ে সোজা আর সস্তা উপায় হতেই পারে না। তা আমাকে বুঝি বোকা ঠাওরে এক কৌটা বেচতে চাও?

ডাক্তার।---না, হুজুর।

কবি।---না? তবে বেরো!

ডাক্তার।---বিজ্ঞাপনের জন্য, আমার ঔষধের গুণ বর্ণনা করে একটা কবিতা লিখে দিতে হবে হুজুর।

কবি।---কবিতা! ঔষধের উপর কবিতা! বেটা ইডিয়ট্, বেরো আমার ঘর থেকে! (উঠে গলা ধাক্কা---ডাক্তারের প্রস্থান।)

(লাঠি ঠক্ ঠক্ কর্‌তে কর্‌তে এক কানার প্রবেশ।)

কবি।---ভিক্ষে চাও বুঝি? (ড্রয়ার থেকে একটা টাকা ছুঁড়ে মেরে) যাও, ভাগো!

কানা।---(টাকা কুড়িয়ে নিয়ে) আমার একটি প্রার্থনা, হুজুর!

কবি। যাও, আমি খোদা নই---সব প্রার্থনার মালিক ত ঐ তিনি।

(উপরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ)

কানা।---খোদা কি হুজুর কবিতা লিখ্‌তে জানেন?

কবি।---তোমার আবার কবিতাও চাই নাকি? রস ত উথ্‌লে উঠেছে দেখ্‌ছি বেটার!

কানা।---গেয়ে গেয়ে ভিক্ষে করার জন্যে আমাকে হুজুর একটি কবিতা লিখে দিতে হবে।

কবি।---বেটা নন্‌সেন্স, রাস্‌কেল! (উঠে বেদম প্রহার।) আমাকে পাগল পেয়েছো বেটারা! কবিতা, না খেলা?

(কানার কান্না শুনে 'কি' 'কি' ব'লে অনেকের প্রবেশ। কানাকে ছাড়িয়ে নেওয়া। ছাড়া পেয়ে কানার প্রস্থান। কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে মা'র প্রবেশ।)

মা।—আমার মনি কেন পাগল হ'ল গো! আমি কেমন করে বাঁচবো গো—

কবি।—(রেগে) ষ্টুপিড মা কোথাকার, চুপ করো। তুমি আমার মা নও, অশিক্ষিতা মা শত্রুতুল্য।

মা।—বাবা, তুমি পাগল হয়েছ?

কবি।—মা, আমি কবি হয়েছি।

মা।—আমি ভিতর থেকে সব দেখেছি, বাবা। আমাকে আর ঠকাতে পারবে না। পাগল না হলে তুমি আপনা আপনি শূন্যের দিকে চেয়ে চেয়ে কথা বল্‌বে কেন!

কবি।—আমি পাগল হইনি মা কবি হয়েছি।

মা।—আমার মনি কা'কেও কোনোদিন একটা কটু কথা বলেনি, পাগল না হলে সে আজ অনর্থক এত লোককে অপমান কর্‌লে! বেচারা কানাটাকে অনর্থক এত মার মার্‌লে; টাকা ছুঁড়ে ফেল্লে! আমার কি হবে গো—

সকলে।—আহা, হায় হায়, আফসোস্—।

মা।—(টেবিলের উপর থেকে খাতাটি লোকদের দিকে ঠেলে দিয়ে) তোমরা সব দেখ না, এখানে কি সব লিখছিল, আর হাত নেড়ে নেড়ে বক্‌বক্ করছিল।

সকলে পড়া।—"আকাশে এলায়ে.......!" ইত্যাদি।

সকলে—(আকাশের দিকে তাকিয়ে) কোথায় এলোচুল, কোথায়?

কবি।—তোমরা দেখবে না, দেখবে না। কবি না হলে এসব দেখা যায় না।

সকলে।—নিশ্চয় পরীয়ে পেয়েছে। নিশ্চয়; না হয় আর কিসে আকাশে চুল ছড়াবে? নিশ্চয় ভূতে পেয়েছে।

মা।—আমার মনি গো! আমার কি হবে গো—

কবি।---(রেগে) মা, মা, মা!

মা। তোমরা কেউ শীগ্‌গির ওঝাকে ডাকো!

(একজনের প্রস্থান)

কবি।---মা, তোমরা কি আমাকে পাগল না বানিয়ে ছাড়বে না?

মা।---পাগল হতে আর বাকি কোথায়, বাবা!

কবি।---আমি আর এ বাড়ীতে থাকব না। আমি দেশত্যাগী হ'ব। (বাইরের দিকে দৌঁড় দেওয়ার চেষ্টা)

মা।---ধরো, ধরো। পালাবে। জোরে ধরো। (সকলে মিলে ধরা)

(ওঝার প্রবেশ। লম্বা দাড়ী, লম্বা কোর্ত্তা, হাতে লাঠি ও একটি কেতাব, মাথায় টুপী, পরনে লুঙ্গী।)

মা।---মিঞাজী, আমার মনিকে বাঁচাও! তুমি যা চাও তাই দেব।

ওঝা।---(কিছুক্ষণ ভালো করে দেখার পর) পরীর আছর, অর্থাৎ পরীর দৃষ্টি পড়েছে; আমি দেখেই চিন্‌তে পেরেছি। তোমরা কেউ শীগ্‌গির একটা আমের ডাল আনো ত।

(আমের ডালের জন্য একজনের প্রস্থান)

কবি।---হারামজাদা বেটা, পরীর আছর! আমি তোমার গর্দ্দান নেব।

ওঝা।---তোমরা সকলে ভালো করে ধরো। (আরবীতে মন্ত্র পড়ে' আমের ডালের বাড়ি দিয়ে দিয়ে ভূতের নজর ছাড়াতে লাগল।)

কবি।---(হাত পা ছোঁড়াছোঁড়ি আর গালাগালি) আমি আত্মহত্যা করব, মা, জলে ঝাঁপ দিয়ে ডুবে মরব---

মা।---কখন হঠাৎ পালিয়ে যাবে ঠিক নেই, তখন আমার সর্বনাশ হবে গো, সর্বনাশ হবে গো, সর্বনাশ হবে! দড়ি দিয়ে খুব শক্ত করে

বাঁধো ! (সকলে মিলে দড়ি দিয়ে বন্ধন।) মিঞাজী সাহেব, ঝাড়তে থাকুন। তোমরা কেউ দৌড়ে গিয়ে ওর বাবার কাছে টেলিগ্রাম করে দাও, যেন সহর থেকে বড় ডাক্তার নিয়ে শীগ্‌গির এসে পড়েন। (একজনের প্রস্থান।) আমার কি হবে গো ! ...(খাতাটি টেবিলের উপর থেকে নিয়ে) এ খাতাই যত নষ্টের গোড়া—এর উপর নিশ্চয় পরীর নজর পড়েছে...।

(খাতাটির উপর হারিকেন থেকে কেরোসিন ঢেলে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া)

কবি।---আমার কবিতা ! আমার কবিতা !! (চেঁচিয়ে কান্না।)

যবনিকা

নেভা

(মৃগেন্দ্র স্ত্রী ও ছেলেপুলের ঝঞ্ঝাটে কাব্য লেখা ছাড়িয়া একটা পাঠশালা খুলিয়া বসিয়াছে—সে অনেক দিন। সম্প্রতি সে বিপত্নীক হইয়াছে। বেত্রদণ্ড হস্তে সরস্বতী ও লক্ষ্মীকে শাসন করিয়া যাহা দান ও তদবিনিময়ে যাহা আদায় করিবেন ভাবিয়াছিলেন, তাহা তাহার ভাবানুযায়ী হয় নাই, ফলে তাঁহার ভাবনাই শুধু বাড়িয়াছে। বেত্রদণ্ডকে শুধু যে ভূত ও মানুষেরা ভয় করে তাহা নয়; দেবদেবীরাও তাহাকে ভয় করিয়া এড়াইয়া চলেন। কাজেই সরস্বতীর সঙ্গে তার শিষ্যদের এবং লক্ষ্মীর সঙ্গে তার নিজের রীতিমত হাতাহাতি চলিতেছে। বয়স পঁয়তাল্লিশ পার হয় নাই, কিন্তু সুদীর্ঘ টিকির কৃষ্ণত্ব লোপ পাইয়া তাহাতে শুভ্রতার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইতেছে। মঙ্গলবার। মৃগেন্দ্র এখনো আসিয়া পৌঁছে নাই। দুই একটি করিয়া বিদ্যার্থী বগলে ছেঁড়া চাটাই, হাতে কোণা ভাঙা শ্লেট ও ছেঁড়া বাল্যপাঠ লইয়া ব্যাঘ্র-সন্নিধানে মেষ-শাবকের মতো ধীরে ধীরে ঢুকিতেছে—ঢুকিয়া হাতলভাঙা চেয়ারখানি খালি দেখিয়া এই প্লীহাভারাক্রান্ত আধমরা বঙ্গ-সন্তানগুলি চীৎকারের চোটে গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিল। একটি বড় গোছের ছেলে চালে গুঁজিয়া রাখা সুদীর্ঘ বেত্রদণ্ডটি বাহির করিয়া নিজের ধুতির খুঁট দিয়া মুছিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। ধুতির খুঁট দিয়া মুখের ও গলার ঘাম মুছিতে মুছিতে মৃগেন্দ্র দ্রুত ঢুকিয়া পড়িয়া ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে ততোধিক ভয়ার্ত্ত দণ্ডায়মান বালকগুলির দিকে প্রশ্ন করিল:), ওরে, রাম বাবু এসেছিলেন ?)

বালকগণ (সমস্বরে)।---না, স্যার। না, স্যার।

(কৌতুক করিবার জন্যই বোধ হয় পিছন হইতে একটি কণ্ঠস্বর উঠিল:) এসেছিল, স্যার।

মৃগেন্দ্র।---(ভীত বিস্মিত কণ্ঠে) এঁ্যা,---এসেছিলেন ?

(রাম বাবু স্থানীয় জমিদার---মৃগেন্দ্রের স্কুলে তথা মৃগেন্দ্রকে মাসিক পাঁচ টাকা সাহায্য করেন। নিজের বিদ্যা ও সাহায্যের গর্বে

প্রায়ই তিনি আসিয়া মৃগেন্দ্রকে ধমকাইয়া শাসাইয়া উপদেশ দিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলেন,—কাজেই মৃগেন্দ্র তাঁর ভয়ে সব সময় সন্ত্রস্ত।)

বালকগণ।— (সমস্বরে) না, স্যার। ভোলা মিথ্যে বলছে, স্যার।

মৃগেন্দ্র।—(বেত হাতে নিয়া) কি রে ভোলা? হারামজাদা ষ্টুপিড্! (সব চুপচাপ।) এদিকে এসো। ফাজলামী পেয়েছ? (বলিয়া বেদম্ প্রহার দিলেন।) কাল না পড়িয়েছি: মিথ্যা বলা মহাপাপ। ধর্ কান। বল্ পাঁচ বার: মিথ্যা বলা মহাপাপ। (ভোলা কান ধরিয়া তাহাই করিল। ক্লান্ত মৃগেন্দ্র চেয়ারে বসিয়া ধুতির খুঁট দিয়া বাতাস করিতে করিতে) চেয়ে আছিস্ পাপিষ্ঠ নরাধমগণ, নরকেও তোদের স্থান হবে না। দেখছিস না, গরমে ভিজে যাচ্ছি? বাতাস কর্, বাতাস কর্,—এ কথা রোজ রোজ বলতে হ'বে? (দশ বার জন বালক উঠিয়া আসিয়া কেউ খাতা দিয়া, কেউ শ্লেট দিয়া, কেউ কোট খুলিয়া গুরুদেবকে বাতাস করিতে লাগিল। মিনিট তিনেক বাতাস করার পর, মৃগেন্দ্র শান্তস্বরে বলিল:) যাও। (নিমেষে বালকগণ যথাস্থানে আসিয়া বসিল।) বল্, রবি অর্থ কি?

বালকগণ।—(সমস্বরে) সূর্য্য, স্যার। সূর্য্য, স্যার।

মৃগেন্দ্র।—(বেত হাতে) উঠিয়া মুখ ভেঙচাইয়া) সূর্য্য! আমি কী বলে দিয়েছিলাম? (বলিয়া সপাং সপাং করিয়া ঘরের একপাশ হইতে অন্য পাশ পর্য্যন্ত বেত চালাইতে লাগিল। তারপর যথাস্থানে ফিরিয়া আসিয়া:) রবি মানে মার্ত্তণ্ড, গাধারা।

বালকগণ।—(সমস্বরে)—হাঁ স্যার, মার্ত্তণ্ড, মার্ত্তণ্ড।

মৃগেন্দ্র।—মার খেলেই তবে তোদের বুদ্ধি খোলে। তা আচ্ছা বল্, তিন ত্রিক্কে কত?

বালকগণ।—নয়, নয়, স্যার।

মৃগেন্দ্র।—বেশ, (বেত উঠাইয়া) এই হচ্ছে আসল গুরু, এর স্পর্শ না লাগলে কি বুদ্ধি খোলে? আচ্ছা, সূর্য্য ঘোরে না পৃথিবী ঘোরে?

বালকগণ।---সূর্য্য, স্যার। সূর্য্য, স্যার।

মৃগেন্দ্র।---বেশ। আচ্ছা, রাম বাবু আসলে কি ঘোরে?

বালকগণ।---পৃথিবী, স্যার। পৃথিবী।

মৃগেন্দ্র।---বেশ, বেশ। এখন সব চুপ করে বসে বাইরের দিকে নজর রাখবি। দূরে রামবাবুকে দেখলেই আমাকে জাগিয়ে দিবি। আর ভোলা, দুর্গা, মণ্টু, তোরা এসে তোদের ডিউটি কর্। (বলিয়া মৃগেন্দ্র টেবিলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতে লাগিল---ভোলা, দুর্গা তার গা টিপিতে সুরু করিল। মণ্টু এক একটা করিয়া পাকা চুল উঠাইতে লাগিল। মিনিট দুই চারের মধ্যে বুঝা গেলঃ অভ্যাসমতো মৃগেন্দ্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ছেলেরা গোলমাল করিতে লাগিল। প্রথম মারটা মণ্টুর গায়ে খুব করিয়া লাগিয়াছিল বোধ হয়, হঠাৎ তার মনে একটা দুষ্টামি খেয়াল আসিয়া পড়িল---একটা সরু রশি খুঁজিয়া আনিয়া তাহা দিয়া মৃগেন্দ্রের টিকিখানি চেয়ারের ব্যাকের সঙ্গে বাঁধিয়া দিল। তারপর ভোলা ও দুর্গাকে লইয়া স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া গিয়া হাসিতে লাগিল। হঠাৎ জুতার শব্দ শুনিয়া সকলে সমস্বরেঃ) রাম বাবু, রাম বাবু, স্যার।

(মৃগেন্দ্র লাফাইয়া উঠিতে গিয়া টিকির সঙ্গে বাঁধা চেয়ার সহ একেবারে পড়ি-পড়ি অবস্থায় কোনো প্রকারে মাথা নোয়াইয়া দুই হাত জোড় করিয়া দুয়ারের দিকে একটা নমস্কার করিয়া লইয়া চোখ তুলিয়া ভালো করিয়া তাকাইতেই দেখিলঃ রাম বাবুর পরিবর্ত্তে তাহার বন্ধু হরিশ সংবাদপত্রিকা বগলে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। মৃগেন্দ্র পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মতো গর্জ্জন করিতে করিতে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে অকথ্য গালিগালাজ বর্ষণ করিতে লাগিল। হরিশ তাড়াতাড়ি দৌড়াইয়া আসিয়া চেয়ারখানি খুলিয়া লইল। ছাড়া পাইয়া মৃগেন্দ্র তৎক্ষণাৎ মেষের পালের উপর ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মতো বালকদের মধ্যে লাফাইয়া পড়িল। তারপর পাঁচ মিনিট ব্যাপী সপাং সপাং শব্দ ও বিচিত্র সুরে কান্না ও চীৎকার ছাড়া কিছুই শোনা গেল না। হরিশ পাশে একটা টুলের উপর বসিয়া পড়িয়াছে---মৃগেন্দ্র চেয়ারে বসিয়া কিছুক্ষণ হাঁপাইয়া লইয়া তার পর কথা বলিতে পারিল।)

মৃগেন্দ্র।---যা, কেউ দু'পয়সার বিড়ি নিয়ে আয়। (কেউ উঠিল না।) যাও! (পয়সা বোধ হয় কারও জেবে ছিল না এইবারও কেউ উঠিল না; কাজেই মৃগেন্দ্রকে আবার বেত্র হস্তে উঠিতে হইল।) হারামজাদা বেটারা, কেউ পয়সা আনিস্‌নি? (বলিয়া মার আরম্ভ করিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে সকলে জেবে ট্যাকে হাত দিয়া খুঁজিয়া দেখিতে লাগিল। বিনয়ের জেবে বুঝি একটি পয়সা ছিল ধরা পড়িয়া যাইবার ভয়ে চিনা বাদামের লোভ তাহাকে সংবরণ করিতে হইল।)

বিনয়।---স্যার, আমি নিয়ে আস্‌ছি। (বলিয়া দোকানের উদ্দেশ্যে দৌড় দিল। ফিরিয়া আসিয়া ছেলেটি বিড়ি হাতে দিতেই মৃগেন্দ্র বিড়িশুদ্ধ নিজের হাতখানি উপরের দিকে তুলিয়া বলিল:)

মৃগেন্দ্র।—বেশ, বাবা, এই ত বেশ ছেলে। আশীর্ব্বাদ করি, বাবা, দীর্ঘজীবী হও! (তারপর দুই বন্ধু বিড়ি ধরাইয়া চোঁ চোঁ টানিতে লাগিল।)---আজকে কাগজে কিছু পেলে হরি?

হরি।---না, মাত্র তিন চারিটি কর্ম্মখালি দেখ্‌তে পেলাম, একটাও জুৎ হ'বে না।

মৃগেন্দ্র।---আচ্ছা, 'কর্ম্মখালি' নাম দিয়ে একটা কাগজ বের করলে কেমন হয়?

হরি।—বেশ হয়, কিন্তু টাকা---

মৃগেন্দ্র।---আমার মনে হয়, ঐ রকম একটা কাগজ বের করলে টাট্‌কা সন্দেশের মতো হু হু ক'রে বিক্রী হবে।

হরি।—কিন্তু বলি, টাকাটা দিবে কে?

মৃগেন্দ্র।---বেশ হ'ত কিন্তু, কর্ম্মখালি ছাড়া আর কিছুই ছাপতাম না।

এখন দেশের বৃহত্তম সমস্যা হ'ল, বেকার সমস্যা, আর এই সমস্যার সমাধান নির্ভর কর্‌ছে কর্ম্মখালির উপর। এই কর্ম্মখালি না ছাপিয়ে আমাদের দেশের কাগজগুলি খালি কখন মুসোলিনী হাস্‌ল, কখন কামালপাশা কাঁদল, ডি ভ্যালেরা কখন হুমকি দিল, মহাত্মা ক'দিন

উপোস করলেন, এসব বাজে সংবাদ দিয়েই আগাগোড়া কাগজ ভর্ত্তি করে রাখে। হাঁ, তবে (অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্বরে) তোমার রামবাবুর বিরুদ্ধে প্রথম সংখ্যাতেই একটি বেনামি পত্র আমি ছাপাবই ছাপাব।

হরি।---তুমি একটা আস্ত নিমকহারাম দেখ্‌ছি। রামবাবু তোমাকে পাঁচ টাকা করে সাহায্য করেন, আর তুমি তাঁর বিরুদ্ধে কাগজে লিখ্‌বে?

মৃগেন্দ্র।---আরে, ওঁর জ্বালায় ছেলে পড়ান আমার অসম্ভব হয়ে উঠলো যে। ছেলেদের মারলে তিনি অসন্তুষ্ট হন; পরের ছেলে পিটাবো, তা ওঁর কেন এত মাথা-ব্যথা বল্‌ত? আচ্ছা হরি, তুই-ই ভেবে দেখ্‌, ছেলে-পিলে না পিটালে কি কখনো শায়েস্তা থাকে! ধর্‌ না আজকের ঘটনাটা। আচ্ছা করে না পিটোলে কি এ-রকম রোজ রোজ ঘটবে না?

হরি।---তা ত বটে, তা ত বটে। আরে পিটানো কি, হাড় ভেঙ্গে দিতে হয়। (বলিয়া আর একটি বিড়ি ধরাইল।)

মৃগেন্দ্র।---আরে, তার চেয়েও মজা। তিনি আমাকে ভূগোল শেখাতে চান! হা, হা, বলেন কিনা: সূর্য্য ঘোরে না, পৃথিবী সূর্য্যের চারদিকে ঘোরে। তোর বিশ্বাস হয়? কেন হ'বে? চিরকাল নিজের চোখে দেখে এবং নিজের কানে শুনে এলাম: পৃথিবীর চারদিকে সূর্য্য ঘোরে। আর এখন তোমার রামবাবু মাসিক পাঁচ টাকা সাহায্য দিয়ে আমাকে যেন কিনে ফেলেছেন; বলে কিনা: সূর্য্য ঘোরে না, পৃথিবী ঘোরে; ছেলেদের এ-রকমই শিক্ষাই নাকি দিতে হবে। আচ্ছা, এস, বাইরে এসো। (বলিয়া দুই বন্ধু বাইরে গেল; দাঁড়াইয়া উপরে আকাশের দিকে তাকাইল।) এখন ত সূর্য্য মাথার উপর, সকালে কোথায় ছিল? ওই পূব আকাশের কিনারে ত, এখন সেখান থেকে আস্‌তে আস্‌তে আমাদের মাথার উপর এল; কিছুক্ষণ পর সারা আকাশ পেরিয়ে পশ্চিমাকাশে ডুবে যাবে। তবুও বলব: সূর্য্য স্থির আছে? আর পৃথিবী যদি ঘুরত, তা' হলে নদ নদী খাল নালা ডোবা পুকুর সব কি উল্টে যেত না? (সাম্‌নের পুকুরটি নির্দ্দেশ করিয়া) এই পুকুরটা উল্টে গেলে মাছগুলি কি সব ডাঙায় উঠে পড়ত না? (ঘরে

ফিরিয়া আসিয়া) অথচ তা' ত কোনো দিন হতে দেখ্‌লাম না। হরি সজ্ঞানে ত আর ছেলেপুলেকে ভুল শিক্ষা দিতে পারি না। কাজেই ছেলেদের বলে দিয়েছি, রামবাবু যখন জিজ্ঞেস্ করে, বল্‌বি: পৃথিবী ঘোরে—।

(এই সময় দূরে জুতার শব্দ হইল,—সঙ্গে সঙ্গে একটি ছেলে বলিয়া ফেলিল:) রামবাবু বোধ হয় আসছেন, স্যার।

মৃগেন্দ্র।—(তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া) এই পড়্ পড়্। (জানালা দিয়া তাড়াতাড়ি বেতটা গলাইয়া ফেলিয়া দিলেন। বেত দেখিলে রামবাবু অসন্তুষ্ট হন—ছেলেরাও সুযোগ বুঝিয়া রামবাবু আসিলেই মাষ্টারকে জব্দ করিবার জন্য বেশী করিয়া গোলমাল করিয়া থাকে।) এই, গোলমাল করিস্ না। (বেত না থাকাতে গোলমাল বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।) দোহাই বাবারা, এই হাত জোড় কর্‌ছি, একটু চুপ করে থাক। (আরও গোলমাল।) তোদের পায়ে পড়ি, খালি পাঁচ মিনিটের জন্য চুপ্ কর্! রামবাবু গেলেই বাবারা তোদের চিনে বাদাম খাওয়াব।

বালকগণ।—সত্যি? স্যার, সত্যি খাওয়াবেন?

মৃগেন্দ্র।—সত্যি, বাবারা! (পকেট থেকে একটি টাকা বাহির করিয়া) এই দেখ, এক টাকার চিনে-বাদাম খাওয়াব। (সকলে চুপ। রামবাবুর পরিবর্ত্তে রসিক মহাজনের প্রবেশ।)

রসিক।—নমস্কার মৃগেন্দ্রবাবু।

মৃগেন্দ্র।—ন-ম-স্কা-র! ওহ্ আপনি, বসুন।

রসিক।—মৃগেন্দ্র বাবু, আমরা আর অপেক্ষা করতে পারি না।

মৃগেন্দ্র।—মশায়, সবুরে মেওয়া ফলে।

রসিক।—কাব্য করবার অত অবসর আমাদের নেই, দয়া করে টাকাগুলি দি'ন, যাই।

মৃগেন্দ্র।—সত্যি রসিক বাবু, কাব্য শুনবেন? আহা, ভারী চমৎকার জিনিষ। শুনবে হরি?

(উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই ভাঙা ড্রয়ার হইতে একটা ছেঁড়া কবিতার বই বাহির করিল। যৌবনে পিতার বাক্স ভাঙিয়া মৃগেন্দ্র এই কবিতার বইখানি ছাপাইয়াছিল। কবিতার বই গোড়ায় তার ফটো-সহ বাহির হইল বটে, কিন্তু পিতা করিলেন তাহাকে ত্যাজ্য পুত্র। সেই হইতে মৃগেন্দ্রের দুর্গতি আরম্ভ। এই কবিতার বই এক কপি সব সময় তার হাতের কাছে থাকে, কেউ আসিলেই পড়িয়া শোনায়, কেউ না আসিলে তার অপোগণ্ড ছাত্রদের উপর আবৃত্তির ক্ষুধা নিবৃত্তি করে। ছেঁড়া বইর অভ্যন্তরস্থ আধ-ময়লা ছবিখানি বাহির করিয়া রসিক মহাজনের দিকে উঠাইয়া ধরিয়া বলিল:) দেখুন দেখি একবার চোখ মেলে, যৌবনে কেমনটি ছিলাম। আয়নায় মুখ দেখে মশায় চোখ জুড়িয়ে যেত। গিন্নী স্বর্গে গেছেন, বল্‌তে দোষ কি, কত মেয়ে চিঠি লিখেছিল, মশাই'। (বড় প্রসন্ন হাসি হাসিতে লাগিল।) আচ্ছা শুনুন তবে:

কিশোরী মেয়ের বাঁকা হাসি
রশি-বিনে দেয় যেন ফাঁসি;
জোড়া নয়নের কালো ভুরু
ইঙ্গিং হানে: যৌবন শুরু।

রসিক।---(মৃগেন্দ্রের পড়া শেষ না হইতেই) তা'হ'লে আমরা নালিশ করব, জেনে রাখুন।

মৃগেন্দ্র।---রসিক বাবু, বলুন ত আপনার নামখানি কে রেখেছিলেন? এমন বেরসিক মানুষের নাম রসিকলাল, শুনে হাসি পায়। মশায়, এ যেন ড্রেনের উপর কাব্য লেখা! এমন সুমধুর কাব্যালোচনার সময় আপনি কি করে নালিশ ফালিশ ইত্যাদি শ্রুতিকঠোর শব্দ উত্থাপন করেন! শুনুন আর কাব্য উপভোগ করতে শিখুন।

রসিক।---দূর করুন মশায় আপনার কাব্য, শীগ্‌গির টাকা বের করুন।

(ছেলেরা কেউ হা করিয়া তাকাইয়া আছে, কেউ বই লইয়া গুণ গুণ করিতেছে, কেউ গোলমাল করিতেছে।)

মৃগেন্দ্র।—(হাসিয়া) টাকা কি মশাই? আজ আছে, কাল নেই। এই তুচ্ছ জিনিষের জন্য কেন যে আপনার ঘুম হচ্ছে না, এ তো আমার ভাবনায় আসে না। একেবারে ছোট লোক নাকি আপনারা?

রসিক।—(রাগিয়া) ছোট লোক বল্‌বেন না, বল্‌ছি, ভালো হ'বে না। (দাঁড়াইয়া) আপনি ছোট লোক, আপনার চৌদ্দপুরুষ ছোট লোক। টাকা কি? কচি খোকা কিনা, জানেন না।

মৃগেন্দ্র।—রাগেন ক্যান্ মশায়; (উঠিয়া) মারবেন নাকি? (দুইজনেই আস্তিন গুটাইতে লাগিল।)

রসিক।—আপনি মারবেন নাকি? মারুন দেখি।

(অগত্যা হরি উঠিয়া দুইজনকে ধরিয়া বসাইয়া দিতে দিতে বলিল:)

হরি।—ছি, ছি, এই ছেলেপুলের সামনে আপনারা মারামারি করবেন! বসে পড়ুন।

মৃগেন্দ্র।—এমন বেরসিক চাঁদ দেখেছ, হরি? টাকা? রৌপ্যচক্র? এ আর কে দেখেনি বল ত। (পকেট হইতে টাকা একটা বাহির করিয়া রসিক মহাজনের দিকে ফিরিয়া) এই দেখুন, আমার পকেটে ও একটি রৌপ্যচক্র আছে। আমার বক্তব্য হ'ল: কাব্য, সাহিত্য, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য এ সব বাদ দিয়ে রৌপ্যচক্রই কি সব? টাকায় কি ফুলের হাসি, নক্ষত্রখচিত আকাশ কিন্‌তে পাওয়া যায়, রসিক বাবু? টাকায় কি চাঁদের আলো মিলে? টাকা ত আপনার যথেষ্ট আছে; দেখি লিখুন ত এই রকম একটি কবিতা।

রসিক।—কবিতা লিখে বৌ ত জোটাতে পারেননি, মশায়। তখন ত হাত পেতেছিলেন এই রসিকলালের দুয়ারে। তখন কাব্য নিয়ে এই ফড়ফড়ানী কোথায় ছিল শুনি?

মৃগেন্দ্র।—টাকা দিয়ে ত আমার সর্বনাশটি করেছেন, আবার ওকথা বলছেন? ধরুন, আপনি যদি টাকা না দিতেন আমার বিয়ে করাও হ'ত না- কাজে কাজেই ছেলেপুলের এই বিপুল ঝঞ্ঝাটও আমার

মাথায় এসে পড়ত না ; নির্ভাবনায় বসে বসে দিব্যি কবিতা লেখা যেত। টাকা দিয়ে আমার ফিউচার প্রস্‌পেক্টকে আপনারা জবাই করেছেন, মশায়। (এই সময় মৃগেন্দ্রের নিজের ছেলে ভ্যা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বালকদের মধ্যে মৃগেন্দ্রের নিজেরও দুইটি ছেলে ছিল ; তাহারা বসিয়া বসিয়া মুড়ি খাইতেছিল। কালীর বোধ হয় ক্ষুধা পাইয়া থাকিবে, সে হঠাৎ মৃগেন্দ্রের ছোট ছেলের জেবে হাত দিয়া ত্বরিত এক মুষ্টি মুড়ি তাহার খালি পেটে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। মৃগেন্দ্র লাফাইয়া উঠিল) কি হয়েছে বাবা ? কে মার্‌লে ? কোন্ হারামজাদা।

মৃগেন্দ্রের ছেলে।—কালী আমার মুড়ি খেয়ে ফেলেছে, বাবা। ভ্যা !

মৃগেন্দ্র।—(কালীকে কিল্ চাপড় ও কান টানিয়া দিয়া) হারামজাদা, লুটের মাল পেয়েছিস্ ? তোর বাপের মুড়ি ?

কালী।—(কাঁদিতে কাঁদিতে) কাল আপনি পড়িয়েছিলেন : ক্ষুধার্তকে খাইতে দিলে পুণ্য হয়,—এই দেখুন স্যার, আমি ক্ষুধার্ত কিনা ! (এই বলিয়া বালকটি সার্টের প্রান্তভাগ উঠাইয়া খালি পেটটি দেখাইয়া দিল।)

মৃগেন্দ্র।—(টাস্ টাস্ করিয়া গোটা দুই চড় তার গালে বসাইয়া দিয়া) হারামজাদা, ফের্ কথা ! তাই বলে আমার ছেলের মুড়ি খাবি ?

কালী।—আমার দোষ নেই ; ক্ষুধার্ত অবস্থায় খেলে আপনার ও আপনার ছেলের পুণ্য হ'বে বলেই ত খেয়েছিলাম, গুরুদেব।

মৃগেন্দ্র।—শূয়ার পাজি উল্লুক কোথাকার! আমি লোককে সার জীবন পুণ্য দান করে আস্‌ছি, তুই বেটা আমাকে পুণ্য দান করতে চাস্, নরাধম শিষ্যকুলকলঙ্ক ! দূর্গা পূজার চাঁদা এনেছিস্ ?

কালী।—না।

মৃগেন্দ্র।—(মুখ ভেংচি দিয়া) না না শুনি কেন ? না, পূজোর সময় তোর বাপ গুরুকে চারটি পয়সাও দিতে পারে না ? রসিক বাবু, দেখ্‌লেন ত, ছেলের বাপগুলি কেমন শাইলক্ ?

রসিক।---শাইলক্ টাইলক্ বুঝি না, টাকা---

মৃগেন্দ্র।—ছি ছি, রসিক বাবু, শাইলক কা'কে বলে তাও জানেন না। চিরকালটা টাকার থলের অন্ধকুপেই ডুবে রইলেন। আর কিছুদিন এ-রকম টাকা টাকা করলে আপনিও শাইলক্ হয়ে উঠবেন।

রসিক।---(উঠিতে উঠিতে আস্তিন গুটাইয়া) মুখ সাম্‌লে কথা বল্‌বেন। শ্যালক বল্‌বেন না, ভালো হবে না কিন্তু।

মৃগেন্দ্র।---(হো হো করিয়া হাসিয়া) রসিক বাবু, হাসালেন, হাসালেন আপনি। শ্যালক নয় শ্যালক নয়---শাইলক্, শাইলক্। আপনারি মতো এক অর্থ-পিশাচ কুসীদজীবি--যার কথা কবি সেক্সপিয়র লিখেছেন।

রসিক বাবু।---অর্থপিশাচই হই, আর কুসীদজীবিই হই, গিয়ে দুয়ারে ধর্ণা দিয়েছিলেন কেন? তখন লজ্জা করে নি, নিলর্জ্জ বেহায়া!

মৃগেন্দ্র।---রসিক বাবু, গালাগালি ইতরের ভাষা। ভদ্দর লোকে মিঠে মুখে কথা বলে---

রসিক।---মিঠে কথা আপনার পকেটে রেখে দিন,—টাকা বা'র না করুন ত (জেব হইতে একটা পরওয়ানা বাহির করিয়া) এই দেখুন গ্রেপ্তারী পরওয়ানা,—পুলিশ বাইরে দোকানে বসে চা খাচ্ছে, এখুনি আস্‌বে, ভালো চান ত শীগ্‌গির টাকা বের করুন। হেঁ, এই রসিকলালকে বড় সোজা পাত্তর পাননি। মনে করেছেন এখনো নালিশ করিনি, না? মনে করেন দু'চার কলম কাব্য লিখে একেবারে লর্ড সিংহ হয়ে গেছেন, ধরাকে সরা জ্ঞান করেন। এখন চিন্‌লেন ত এই রসিকলালকে?

মৃগেন্দ্র।—হাঁ, চিন্‌তে পেরেছি।

রসিক।---আরও চিনতে পারবেন; আপনাকে আমি এক্ষুণি গ্রেপ্তার করাব।

মৃগেন্দ্র।—(কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া লইয়া) তা'হলে আপনাকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করব। মশায়, যে দিনকাল পড়েছে, জেলের

বাইরের চেয়ে এখন জেলের ভিতর ঢের ঢের ভালো। নির্বিবাদে নির্ঝঞ্ঝাটে দু'বেলা অন্ন জেলের মতো এমন আর কোথায় মিলে?

(রসিক ডাকিতেই পুলিশ আসিয়া মৃগেন্দ্রকে হাতকড়া লাগাইল।)

মৃগেন্দ্র।—(হরিকে) হরি, তুমি আমার ছেলেমেয়েগুলিকে বাবার কাছে পোঁছে দিও, তা'হলেই আমি নিশ্চিন্ত। আর এই স্কুলটি তোমাকে দিয়ে গেলাম, এগুলিকে পড়িয়ে টড়িয়ে যা পাও তা তোমার। হাঁ, এইদিকে উঠে এস। (এক পাশে লইয়া গিয়া) খবরের কাগজে একটা চিঠি লিখে দিস্। লিখবি রাজদ্রোহ-অপরাধে গ্রেপ্তার হয়েছি, জাতীয় কর্ম্মীকে অপদস্থ করার জন্যই পুলিশ মিথ্যে মোকদ্দমা সাজিয়ে করেছে। হরি, বুদ্ধি চালিয়েই সংসারে চল্‌তে হয়। জেলেই যখন যাবো, নামটা একটু জাহির হউক্। বাইরে আসলে অন্ততঃ সম্মানটা ত বাড়বে। একেবারে নিঃস্বার্থভাবে জেলে যাবো, অত বোকা আমি নই।

পুলিশ।—চলো জী—

মৃগেন্দ্র।—চলো। (ছেলেদের প্রতি) সকলে উচ্চস্বরে বন্দেমাতরম্ বল্। (নিজেও 'বন্দেমাতরম্' বলিল।)

বালকেরা।—(সমস্বরে) বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্।

(পুলিশ তখন মৃগেন্দ্রকে যাইবার জন্য টানিতে লাগিল।)

বালকেরা।—(কাঁদ কাঁদ ভাবে) যাবেন না, যাবেন না গুরুদেব! তা হলে আমরা কার হাতের মার খাবো? আপনার হাতের মার খেতে খেতে আমাদের একরকম সহ্য হয়ে গিয়েছিল, কে এসে আবার অসহ্য মার শুরু করে দেবে?

মৃগেন্দ্র।—চুপ্, বল্ বন্দে মাতরম্।

বালকগণ।—বন্দে মাতরম্। (আবার কাঁদ কাঁদ ভাবে) আমাদের কি হবে গো, কি হবে! আমরা রোজ রোজ কার হাতের মার খাবো গো। তা'হলে আমাদের কি হবে গো।

মৃগেন্দ্রের নিজের ছেলেরা।—বাবা, বাবা, যেও না, যেও না।

মৃগেন্দ্র।—(ফিরিয়া) ষ্টুপিড্ সব, এখন আমি তোদের বাবা নই, আমি এখন দেশের নেতা, সমস্ত দেশের লীডার, দেশের সব নর-নারী এখন আমার সন্তান। (পুলিশ-সহ প্রস্থান।)

বালকের দল। আমাদের চিনে বাদাম, স্যার! গুরুদেব, আমাদের চিনে বাদাম? (উচ্চৈঃস্বরে) চিনে বাদাম চাই, চাই চিনে-বাদাম।

যবনিকা

ভাই ভাই

[সৈয়দ হামীদ আলী চেয়ারে বসে' সমবেত সকলকে উপদেশ দিচ্ছেন। সামনে টেবিলের উপর গুড়গুড়ি, কথার ফাঁকে ফাঁকে তা'তে তিনি দম দেন। শ্রোতৃমণ্ডলী নীচে পাটিতে বসে বসে মনোযোগ দিয়ে শুনছে, তাদের মধ্যেও হুঁকা চল্‌ছে, তবে সেটি মাটির।]

সৈয়দ।---ভাই সব, আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেনঃ ইন্নামাল্ মু'মেনুনা এখওয়াতুন; অর্থাৎ সব মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই, রোমের বাদশাহ্ থেকে পথের ফকির পর্য্যন্ত সব এক বরাবব। এটি আমার, ওটি তোমার বলে মুসলমানে মুসলমানে ফরক্ করা রিলকুল হারাম।

১ম শ্রোতা।---(আশ্চর্য্য হইয়া) বিলকুল হারাম!

সৈয়দ।---ধ্যৎ, ধ্যৎ! (মুখ বিকৃত করে) ইস্‌লামী শব্দগুলি এখন পর্য্যন্ত তোমরা উচচারণ করতেই শিখলে না! এই করে ইস্‌লামের উন্নতি হ'বে না তকচু হ'বে। (কচুর সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলেও তাঁর হাতের দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি উঁচু হয়ে উঠল।) বলো, আমার মুখে মুখেই বলো---বিলকুল হারাম! (হ'য়ের উচচারণ একেবারে কণ্ঠনালীর তলদেশ পর্যন্ত পৌঁছে গেল।)

১ম শ্রোতা।---(সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকে বলে উঠল) বিলকুল হারাম।

সৈয়দ।---(তিনবার মুখে মুখে বলানোর পর) এগুলো হচ্ছে ইস্‌লামী শব্দ, এগুলোর উচচারণ একেবারে হলক্ থেকে করতে হয়।

২য় শ্রোতা।---বে-শক্!

সৈয়দ।---আহ্‌হা, ফের ঐ? বলো, বেশক। (ক-এর সঙ্গে কণ্ঠনালীর বেশ একটু ধ্বস্তাধ্বস্তিই হয়ে গেল।)

(সকলে সৈয়দের মুখে মুখে তিনবার 'বেশক্' বেশ ইস্‌লামী ভাবে উচচারণ করলে।)

সৈয়দ।---মদিনার সে আন্‌সারদের কথা স্মরণ করুন, তাঁরা কি করে তাঁদের মাল-আসবাব মুহাজিরীন ভাইদের ভাগ করে দিয়েছিলেন।

১ম শ্রোতা।---ওহো!

২য় শ্রোতা।—কী ত্যাগ!

৩য় শ্রোতা।—কি ভ্রাতৃভাব!

৪র্থ শ্রোতা।---কী সাম্য-মৈত্রী!

৫ম শ্রোতা।—কী ধর্ম্ম-প্রেম!

৬ষ্ঠ শ্রোতা।---কী ঐক্য!

সকলে।---(সমস্বরে) ওহো! (মাথা দুলিয়ে সকলের বাষ্পউদগীরণ)।

সৈয়দ।---আজ সেই বিশ্ববিজয়ী উদার মহাপ্রাণ মুসলমানের বংশধর আমরা কোথায় পড়ে আছি,—অধঃপতনের কোন্ অতল গহ্বরে!

১ম শ্রোতা।—আফসোস্!

২য় শ্রোতা।---হাজার আফসোস্!

৩য় শ্রোতা।---ছি, ছি!

৪র্থ শ্রোতা।---শেম্, শেম্!

সৈয়দ।---তোবা, তোবা, ইস্‌লামী মজলিসে একেবারে কুফরী শব্দ! এই বেটা তৌবা কর্---কানমলা খা। ওটার অর্থ কি হে?.. (লোকটির কানমলা খাওয়া ও গালে চড় খেয়ে তৌবা করা!)

৪র্থ শ্রোতা।---লজ্জা, হুজুর।

সৈয়দ।---ওঃ, শরম? তবে শেম্ শেম্ করতে গেলি কেন? শরম্, শরম, বল্‌তে পারলি না? বেটা, পাজি না--লায়েক উল্লু কাঁহাকা!

৪র্থ শ্রোতা।---(লজ্জিত হয়ে) আর কখনো ভুল হবে না, হুজুর।

সৈয়দ।—আজ ভাইএ ভাই-এ আমাদের অমিল, ঝগড়া-ফসাদ, মারামারি-কাটাকাটি, মামলা-মোকদ্দমা লেগেই আছে। আজ আমরা ওর সঙ্গে খাচ্ছি না, তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছি না---

১ম শ্রোতা।—ছি, ছি!

২য় শ্রোতা।—আমরা রাজ্যহারা হব না ত কে হবে?

৩য় শ্রোতা।—আমাদের অধঃপতন হবে না ত কা'র হবে?

৪র্থ শ্রোতা।—শরম্! শরম্!

সৈয়দ।—ইসলামের উন্নতির জন্য আমাদের কি কিছু করা উচিত নয়? চিরকাল আমরা লেপমুড়ি দিয়ে কি শুয়ে থাকব?

১ম শ্রোতা।—(গায়ের ল্যাপারখানি ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে) নিশ্চয়ই নয়।

সৈয়দ।—আমাদের খাঁটী মুসলমান হ'তে হ'লে কোরাণের হুকুম মান্‌তে হবে।

২য় শ্রোতা।—(গলায় হাত দিয়ে) কোরাণের হুকুম না মান্‌লে সে কিসের মুসলমান? (কোরানের 'কো' আর হুকুমের 'হু' এমন বোগদাদী কায়দায় উচ্চারণ করলে যে, ক'রেই সে হাঁপাতে লাগ্‌ল);

৩য় শ্রোতা।—আলবৎ।

৪র্থ শ্রোতা।—দেরী করা শয়তানের কাজ। আজ থেকেই আমরা কোরাণের হুকুম পালন করে চল্‌ব।

৫ম শ্রোতা।—এখন থেকেই মান্‌তে হবে।

সৈয়দ।—তা'হলে, আজ থেকে আমরা পরস্পর ভাই ভাই। সকলে প্রতিজ্ঞা কর, ভাই সব,—আজ হতে আমরা ঝগড়া-ফসাদ, মামলা-মোকদ্দমা, ঘৃণা-বিদ্বেষ ভুলে গেলাম। (উৎসাহে সকলে একসঙ্গে হাততালি দিয়ে উঠল।) ছি, ছি, ভাই সব; হাততালি দেওয়া গুনাহ্, গুনাহ্! ওটা বে-দীন্ কাফেরের তরিকা। বলো সবেঃ মারহাবা, মারহাবা।

(সকলে 'হ'-এর এমন আদর্শ উচ্চারণ করলে, যাকে খাস মিসরী উচ্চারণ বলা যেতে পারে।)

সকলে।—(সমস্বরে) আমরা শপথ করছি, আজ থেকে আমরা সকলে ভাই ভাই।

সৈয়দ।—(দুই হাত উর্দ্ধে উঠিয়ে) চল, ভাই সব, আমাদের তরক্কীর জন্য খোদার দরগায় মুনাজাত করিঃ আমীন, এয়া রব্‌বুল আলামীন, এয়া আল্লা, তুমি মুসলমানকে দীন-দুনিয়ার মালিক করো।

কাফেরদের ধ্বংস করো, জাহান্নামে পাঠাও, জলে স্থলে শূন্যে আমাদের খেলাফৎ কায়েম করো, আমীন! এয়া আল্লা, (চুপি চুপি) আমাকে (উচ্চৈঃস্বরে) দুনিয়ার ধনদৌলত দাও, পরকালে বেহেস্ত নসীব করো, আমীন! (সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতৃমণ্ডলীও বল্‌ছেঃ) আমীন। (অপেক্ষকৃতা আস্তে আস্তে) হে আল্লা, আমাকে এবার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডিং কর (জোরে) আমীন (সকলে সমস্বরে) আমীন! (জোরে) এয়া আল্লা, (আস্তে) আমার (জোরে) বিবিগণকে বাল-বাচচা দাও; আমীন! (সঙ্গে সঙ্গে সকলে) আমীন! (জোরে) হে আল্লা, (আস্তে) আমার (জোরে) জমিতে ধান বেশী করে দিও, আমীন! (সঙ্গে সঙ্গে সকলে) আমীন! (খুব জোরে) হে আল্লা, (একেবারে আস্তে) রবিবারের লড়াইয়ে আমার মোষটিকে জিতিয়ে দিও, (উচ্চৈঃস্বরে) আমীন (সমস্বরে) আমীন! হে আল্লা, (আস্তে আস্তে) এই লোকগুলিকে দিন দিন গরীব এবং আমাকে (জোরে) ধনী করিয়ো, আমীন! (সমস্বরে) আমীন! (জোরে) হে আল্লা, তোমার ত অজানা নাই, (আস্তে আস্তে) কাল যে আমার ফৌজদারীর মোকদ্দমার দিন, বৃষ্টি হ'লে বুড়োমানুষ কাছারী যেতে বড় কষ্ট হবে, হে রহ্‌মানুররহীম, কাল সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বৃষ্টিটা একটু বন্ধ রেখো, (উচ্চৈঃস্বরে) আমীন! এয়া রব্‌বুল আলামীন! (সকলে সমস্বরে) আমীন, আমীন!

১ম শ্রোতা।—(চট করে খালি চেয়ারখানি তুলে নিয়ে) তা হ'লে ভাই সা'ব, এই চেয়ারখানি আমিই নিলাম,—আপনার ত অনেক আছে, আমার একখানাও না হলে লোকে আবার আমাকে আপনার ভাই বলে স্বীকার করতেই চাইবে না।

সৈয়দ।—(ভেংচি দিয়ে) কি! পঁচিশ টাকা খরচ করে নতুন চেয়ার বানালাম, বেটার আব্দার মন্দ নয় দেখ্‌ছি। রাখ্‌!

১ম শ্রোতা।—প্রতিজ্ঞা ভাঙ্‌বেন না ভাই, গোনাহ্‌ হবে, গোনাহ্‌ হবে। ওহো, মুসলমান ভাই ভাই। (চেয়ার নিয়ে প্রস্থান।)

২য় শ্রোতা।—(ইজি চেয়ারখানি তুলে নিয়ে) তা'হলে ভাই ইজি চেয়ারখানি আমি-ই নেই, বুড়ো মানুষ, এই বসে বসে একটু হুঁকো

টান্‌তে সুবিধা হবে। আচ্ছা ভাই হুঁকার ইসলামী উচচারণ কি রকম হবে—('হু'-কে একেবারে গলার তলা হইতে থেকে উচচারণ করে) হুঁক্কা না হুঁক্কা?

সৈয়দ।—বেরো, চোর বদমাস সব! (ভেংচি দিয়ে) আবার ইজি চেয়ারও চাই! এত সখ হলে কিনে নাও না কেন? বাজারে কি ইজিচেয়ারের দুর্ভিক্ষ লেগেছে?

৩য় শ্রোতা।—আহা-হা, ভাই হয়ে ভাইকে গালাগাল দিচ্ছেন? ছি, ছি, ছি, ছি!

২য় শ্রোতা।—আমরা ত ভাই কোরান-কেতাব বুঝি না—আপনিই ত এখন বুঝিয়ে দিলেনঃ মুসলমান সব ভাই ভাই—ভাইয়ের মালের উপর ভাইয়ের পুরা হক্‌। ওহো, ইস্‌লাম কী উদার ধর্ম্ম,! (ইজিচেয়ার নিয়ে প্রস্থান।)

(সকলে উঠে যে যা' পারল, ঘরের মাল এক একটি দখল করে উঠিয়ে নিলে।)

৪র্থ শ্রোতা।—(হুঁকাটি উঠিয়ে নিয়ে) বেশ হুঁকাটি, ভাই সা'ব! এইবার আনিয়েছেন বুঝি! (ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে) বাঃ, এই দেখছি আসল জৌনপুরী হুক্কা। আমার হুঁকাটির তলায় ফুটো হয়ে গেছে, কয়দিন ধরে তাই ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছি। ভাগ্যে খেয়ে এদিকে এসেছিলাম। (হুঁকাটি নিয়ে প্রস্থান উদ্যত।)

সৈয়দ।—বেটা হারামজাদারা আমাকে পাগল পেয়েছে! (ঘরের কোণ্‌ থেকে একটি লাঠি নিয়ে মারতে উদ্যত।)

সকলে।—মারবেন না, মারবেন না ভাই। মুসলমান মুসলমানকে মারতে নেই। (সমস্বরে) আমরা সব ভাই ভাই। (এই বলে' সকলে সৈয়দকে ধরে রাখে; লোকটির হুঁকা নিয়ে প্রস্থান।)

সৈয়দ।—(রাগে দাঁত কড় কড় করতে করতে) বেটা হারামজাদারা আমাকে পাগল পেয়েছে। এক্ষুণি মেরে খু'ন করব।

৫ম শ্রোতা।—ঠিক হ'ল না, ভাই, ঠিক হ'ল না, আফসোস্'! আপনিও শেষকালে ভুল করলেন। হায়রে বাঙ্গালী মুসলমান, কবে তোমার উচ্চারণ ঠিক হবে? বলতে হবেঃ পাঘল, পাঘল, খুউন্, খুউন্, খুউন্ করব। (গলার ভিতর থেকে ঘ আর খ উচ্চারণ করতে গিয়ে গলাটার রীতিমতো কসরত হয়ে গেল।)

৩য় শ্রোতা।—দাদা, আমি শীতে কাঁপছি, আর আপনি কাপড়ের উপর কাপড় চড়িয়েছেন—এ কেমন ভ্রাতৃত্ব! (বলে', আলোয়ান খানা সৈয়দের গা থেকে খুলে নিয়ে নিজের গায়ে দিলে। সৈয়দ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল)

১ম শ্রোতা।—(আবার ঢুকে) হায় হায়, ভাই সা'ব, একেবারে তিনটি জামার গরমে ভিজে যাচ্ছেন—আর আমরা আছি কোন্ কর্ম্মে! (বল্‌তে বল্‌তে কোটটি খুলে নিলে; গায়ে দিতে দিতে বল্লেঃ) মুসলমান সব ভাই ভাই, কি বল হে?

৫ম শ্রোতা।—আলবৎ, ইস্‌লামে রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন, বড়-ছোট —সব এক বরাবর। (দলের মধ্যে একজন সবার চেয়ে লম্বা ছিল, তাকে লক্ষ্য করে) কি হে, তুমি লম্বা হয়েছ কেন? পাপিষ্ঠ, নরাধম, মুস্‌লিমকুলকলঙ্ক! ইস্‌লামে জন্মগ্রহণ করে মুসলমানের মধ্যে অনৈক্য ও পার্থক্য সৃষ্টি করছ, তোমার এত বড় আস্পর্দ্ধা! বেটাকে কেটে সমান করে দাও না হে!

৬ষ্ঠ শ্রোতা।—দোহাই বাবা, কাট্‌তে হবে না, আমি নিজেই সমান হচ্ছি। (কুঁজো হয়ে সকলের সমান হয়ে নিয়ে) মুসলমান সব এক বরাবর!

(দলের মধ্যে একজন খুব মোটা ছিল, তাকে লক্ষ্য করে')

৭ম।—কি হে যূথভ্রষ্ট নরাধম, ইস্‌লামের সাম্য ও ঐক্যের শিক্ষাকে পদদলিত করে এমন মুটিয়ে গেছ কেন? লজ্জা করে না?

৮ম।—এই পাষণ্ড ইস্‌লামে বিদ্রোহী, খারেজী। এ-কে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে সমান করে দিতে হবে।

৭ম।—ভাই সব, আমাদের শিরায় শিরায় যদি বিশ্ববিজয়ী পূর্ব্ব-পুরুষের রক্ত এক বিন্দুও অবশিষ্ট থাকে, এর প্রতিকার আমাদের এই মুহূর্ত্তেই করতে হবে।

সকলে।—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। (রোষ-রক্তিম নয়নে মোটাকে লক্ষ্য করে') এই বেটা!

মোটা।—দোহাই বাবা, আমি সমান হচ্ছি। (এই বলে হাত পা গুটিয়ে পেট খালি করে ছোট হবার চেষ্টা।)

৭ম। (নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে) এখনো হয়নি। নো, নো!

৮ম।—(ভুরিতে মুষ্টাঘাত করে) ভুড়ি বেরিয়ে রইল কেন, বেটা পাষণ্ড! (মোটা প্রাণপণে ছোট হবার চেষ্টা করতে লাগল।)

৯ম।—হবে না, হবে না। বেটা পাষণ্ড, ইস্‌লামের সাম্য ও একতা ধ্বংসকারীর নাপাক্ দেহকে ছেঁটে ফেলে তবে পাক করতে হবে।

৭ম।—এই, করাত লও। (বল্‌তে না বল্‌তেই একজনের করাত নিয়ে হাজির। ৫ম-এর আদেশ মতো মোটার কাঁধের উপর করাত রেখে দুইজন দুই দিকে ধরে টান দিতেই—)

মোটা।—ওরে বাবা, গেলাম, গেলাম। মুসলমান ভাই ভাই! (বলে প্রাণপণে পালাতে পালাতে)—সব মুসলমান এক সমান।

সকলে।—(সমস্বরে) কমবখ্‌ত্, পাপী, গুনাহ্‌গার!

৬ষ্ঠ।—(মুখটি কাচু মাচু করে) ভাই, নমাজ পড়ার জন্যে আমার যে একটিও টুপী নেই। (এই বলে ধীরে ধীরে টুপীটি সৈয়দের মাথা থেকে উঠিয়ে নিজের মাথায় পরে।)

৭ম।—ভাই, আমার একটিও শার্ট নেই। (সৈয়দ নির্বাক—একটু ইতস্ততঃ করে সৈয়দের গা থেকে শার্টটি খুল্‌তে আরম্ভ করে দিলে—একা খুল্‌তে না পেরে আর একজনকে লক্ষ্য করে) এই—বোকার মতো চেয়ে আছিস্ কেন, ভাইকে একটু সাহায্য কর্ না—ভাই

সাহেবের হাত দুটো একটু তুলে ধর্। (লোকটি ধর্লে—ও খুলে নিলে।)

৮ম।—ভাই, শার্টটী আমাকে দাও না, আমার যে একটীও নেই।

৭ম।—চুপ্ রাও, বেটা হারামজাদা! বেটার আবদার দেখে বাঁচি না! (নিজেই পরা আরম্ভ করে দিলে।)

৮ম।—না ভাই, আমাকে দিতেই হবে।

৭ম।—ঘুষিয়ে দাঁত ভেঙে দেব বল্‌ছি।

৮ম।—(শার্টের কোণাটা ধরে) দাও না ভাই।

৭ম।—ফের, হারামজাদা? (চলে যেতে যেতে) ওহো,! মুসলমান ভাই ভাই।

৭ম।—দাদা, আপনার ভাইপোটি একটি গেঞ্জীর জন্য আজ তিন মাস ধরে কাঁদছে—পয়সার অভাবে আজও কিনে দিতে পারি নি। যাক্, না হয় একটু বড়ই হবে, দাদারটিই নিয়ে যাই। (ধীরে ধীরে গেঞ্জীটি খুলে নিলে।)

সৈয়দ।—বেটা চোর বদমায়েস্ কাহাঁকা! (বলে পায়ের চটী একখানি ছুঁড়ে মারলে, না লেগে জুতা গিয়ে পড়ল বাইরে।)

৮ম।—আহা, আহা! ফেলে দেবেন না, ভাই! আমার যে একখানাও নেই। (তাড়াতাড়ি পায়েরখানা ছিনিয়ে নিলে—বাইরের পাটি আর একজন তুলে এনে এ পাটিও সে দাবী করতে লাগল।)

৯ম।—আমাকে দাও ভাই, আমার যে নাই।

৮ম।—বাঃ, আমার বুঝি আছে? ঐ পাটিও আমাকে দিয়ে দাও।

(দুইজন—এ বলেঃ আমাকে দাও, ও বলেঃ আমাকে দাও; এই বলে টানাটানি করতে লাগল।)

৭ম।—(বদ্দুরত একজনকে লক্ষ্য করে) তুমি কেমন মুসলমান হে, ভাইকে এক পাটি জুতাও দিতে পার না?

৮ম।—এ বেটা কেমন মুসলমান, আমার মতো একজন বুড়ো ভাইকে এক পাটি পুরান জুতো পর্যন্ত দিতে চায় না? হায়, আফসোস্। (কেউ কাউকে দিলে না, কাজেই যার যার পাটি সে পায়ে দিয়ে পটাস্ পটাস্ করে হাঁটতে লাগল।)

৫ম।—বেশ, বেশ,!

৬ষ্ঠ।—হাঁ, এই ত ভাই-এর মতো কাজ, ভাই-এ ভাই-এ একেবারে সমান ভাগ। একেই ত বলে ইস্লামী ভ্রাতৃত্ব! ওহো! মুসলমান ভাই ভাই।

৫ম।—এই ত আসল মুসলমানী, ঈমানের পরিচয়।

(যে যা' পেল, নিয়ে বেরিয়ে গেল—যাবার সময়ঃ)

সমস্বরে।—জয় ইসলামী ভ্রাতৃত্বের জয়! (বার কয়েক চেঁচিয়ে বেরিয়ে গেল।)

(একজন লাঙ্গল কাঁধে ঢুকে পড়ল—সৈয়দের যেন হঠাৎ চমক ভাঙ্গল।)

সৈয়দ।—কী চাই?

লাঙ্গলওয়ালা।—পশ্চিমের বিলে ভাইসাহেবদের ত চাষের জমি প্রায় দশ বিঘে আছে—

সৈয়দ।—তা' ত আছেই; তা'তে তোমার বাবার কি?

লা।—আমার যে ভাই এক বিঘেও নেই।

সৈয়দ।—তা'তে আমার বাবার কি, বেটা? মর্গে, বেরো—

লা।—(টুপীটা ট্যাঁক থেকে বের করে মাথায় দিতে দিতে) আমি ভাই মুসলমান।

সৈয়দ।—তাতে আমার কি মাথামুণ্ডু?

লা।—অমন কথা বল্বেন না, ভাই। মুসলমান সব ভাই ভাই।

সৈয়দ।—তা তে হয়েছে কি?

লা।—দশ বিঘে ত আর আপনার দরকার নেই, আজ থেকে বিঘে চারেক আমি চাষ করব। ভাই-এর অংশ ভাইকে না দিলে যে গোনাহ্ হবে, ভাই! আমি বেঁচে থাক্‌তে আপনাকে গোনাহ্‌গার হতে দিতে পারি?

সৈয়দ।—ওরে, বেটা পাজি, হারামজাদা, শুয়ার, বেরো, বেরো!

(ভয়ে লাঙ্গলওয়ালার প্রস্থান। এক সঙ্গে ফের তিনজন ঢুকে পড়ল।)

সৈয়দ।—কী চাই?

১ম।—আমি মুসলমান।

২য়।—আমিও মুসলমান ভাই। (টুপীটা ঠিক করে পরতে পরতে)

৩য়।—আমিও ভাই মুসলমান। (দাঁড়ীতে হাত বুলাতে বুলাতে)

সৈয়দ।—মুসলমানের সাত গোষ্ঠী মরুক, কি হয়েছে তাই বল্?

১ম।—আমার মোকদ্দমাটি উঠিয়ে নিন্, ভাই।

২য়।—আমারটিও, ভাই। ভাই হয়ে ভাই-এর সঙ্গে মোকদ্দমা করবেন?

৩য়।—মুসলমানে মুসলমানে মোকদ্দমা করা গুনাহ্—আমারটিও রফা করে দি'ন, ভাই।

সৈয়দ।—সুদে আসলে আদায় করো, বাকী খাজনা সব দিয়ে ফেল, আর ক্ষতিপূরণ বুঝিয়ে দাও—এক্ষুণি উঠিয়ে নিচ্ছি।

১ম।—অমন কথা বল্‌বেন না ভাই—সুদ বিল্‌কুল হারাম। ('ক' আর 'হ'কে বেশ ভালো করে উচ্চারণ করলে।)

২য়।—তৌবা, তৌবা। ভাই হয়ে ভাইয়ের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ নেবেন?

৩য়।—মুসলমান ভাই ভাই—সে কি শুধু মুখের কথা? ভাই-এ ভাই-এ মোকদ্দমা করা খারাপ, গুনাহ্‌র কাজ।

সৈয়দ।—ড্যেম্ গুনাহ্। বেরো, বেরো। (সকলের প্রস্থান।)

[আর একজনের প্রবেশ।]

সৈয়দ।—কী চাই শীগ্‌গির শীগ্‌গির বলো।

আগন্তুক।—আমার একটি ছেলে আছে, ভাই।

সৈয়দ।—তা'র কি কলেরা হয়েছে?

আ।—খোদা হাফেজ; এবার সে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে।

সৈয়দ।—তহশীলদারী চাও?

আ।—না ভাই।

সৈয়দ।—তবে কি চৌকিদারী?

আ।—যদি মর্জ্জি হয়, ভাই সাহেবের মেয়েটি আমার ছেলের জন্যে—

সৈয়দ।—বেটা হারামজাদা, ডেম ব্লাডি। বেটা জোলার ঘরে মেয়ে দেব?

আ।—(জেব থেকে টুপীটা বের ক'রে মাথায় দিতে দিতে) আমি ভাই মুসলমান।

সৈয়দ।—তাতে কি? বেরো, বেরো!

আ।—আপনি-ই ত বলেছেন: সব মুসলমান ভাই ভাই, সব এক সমান!

সৈয়দ।—বেশ বলেছি, পাঁচশ'বার বল্‌ব। তা' বলে আমার মেয়ে জোলাকে দেব নাকি? গলা ধাক্কা না খেতে বেরো বল্‌ছি। (লোকটার প্রস্থান।)

(একটি ছেলে কোলে ও আর একটীর হাত ধরে একটা বুড়োলোক এসে ঢুকল।)

সৈয়দ।—কী চাই? ভিক্ষে? ওরে—

আগন্তুক।—না ভাই। (ছেলেটিকে দুপ্‌ করে মাটিতে রেখে নিজেও বসে পড়ে') অত ব্যস্ত হবেন না। একেবারে থাক্‌ব বলেই এসেছি,—আপনার 'ভাবী'ও ভিতরে গেছে। ঘরে খাবার নেই, হঠাৎ

ভাই-এর কথা মনে হ'ল, ---হে হেঁ। (লোকটি দুই গাল ছড়িয়ে হাস্‌তে লাগল। আর একজন বিরাট গাট্‌রী মাথায় ঢুক্‌ল।)

২য় আগন্তুক।—তা' ভাই সাহেবের তবিয়ৎ কেমন?

সৈয়দ।—তবিয়ৎ টবিয়ৎ দূর করো! বেরো, বেরো—

২য় আগন্তুক।—(গাট্‌রীটা নামাতে নামাতে) ভাই-এর প্রতি ভাই-এর এ কি রকম ব্যবহার! এ যে পবিত্র ইস্‌লামের খেলাপ। ওহো, কি উদার ইস্‌লাম ধর্ম! (বাষ্প উদগীরণ কর্‌তে কর্‌তে বসবার জন্য মাথার গামছা দিয়ে জায়গাটা ঝাড়তে লাগল।)

সৈয়দ।---ভাই টাই আমি চাই না। বেরো, বেরো, এক্ষুণি বেরো।

২য় আগন্তুক।—(বসতে বসতে) আপনি না চাইলে কি হবে? আমরা ত আর ভাই হয়ে ভাই ফেল্‌তে পারি না!

(ছেলেপুলে নিয়ে আরও দু'তিন জন ঢুকে পড়ে এক সঙ্গে কথা শুরু করে দিলে।)

আগন্তুক।---আদাব, আদাব, ভাই সাহেব! শুনলাম ভাই সাহেব একা একা বড় কষ্ট পাচ্ছেন! আমরা থাকতে আপনি একা কষ্ট পাবেন? ভাই আর কোন্ দিনের জন্য। তাই ছেলে পুলে সবাইকে নিয়ে এলাম। ভয় নাই দাদা, এখন আর সহজে যাচ্ছি না। নেহাৎ যেতে যদি য়, তবে এই বর্ষাটা সাবাড় করেই যাবো।

সৈয়দ।—কি?

আগন্তুক।—কুল্লু মুসলমান—

সৈয়দ।—যাও যাও, আমি মুসলমান নই, বেরো, বেরো—

(আরও অনেকে ঢুকে পড়ে, সকলে প্রায় এক সঙ্গে ব'লে উঠল)

সকলে—তৌবা, তৌবা, এ যে গোনাহ্, এ যে ছক্ত গোনাহ্। ভাই সাহেব, দূরদেশের কথা চুলোয় যাক্, এই বাংলাদেশে আমরা সাতকোটী ভাই থাক্‌তে আপনাকে গোনাহ্‌র কাজ কর্‌তে দেব? (সর্দ্দার গোছের একজন বলে উঠ্‌ল:) ভাই সব বসে পড়, আজ একেবারে ভাই সাহেবের

এখান থেকে খেয়েই উঠ্‌ব। (দাঁড়িয়ে এক এক করে গুনে' নিয়ে) বেশী নয় ভাই, মাত্র পনর জনের কোর্মা পোলাওর হুকুম দিন। (এক জনের মুখ থেকে হুঁকাটী কেড়ে নিয়ে গড়্‌ গড়্‌ টানতে টানতে দূরে তাকিয়ে) ঐটি দাদার খাসী না হে? হাঁ নিশ্চয়ই, আর না হয় দাদার বারান্দায় উঠে চুপটি করে বসে থাকবে কেন? (একজনকে ইশারা করে) ওরে, নিয়ে আয়, ধরে নিয়ে আয়, আমরাই জবেহ্‌ করে এখানেই কেটেকুটে দিই—না হয়, দাদা আর ভাবী সাহেবার বড় তক্‌লীফ্‌ হবে। ভাই-এর খাসী ভাইয়েরা না খেয়ে জামাই হারাম-খোরের জন্য রেখে যাব নাকি? (তকলীফের 'ক'কে খ-এর মতো করে গলার ভেতর থেকে উচচারণ কর্‌ল।)

একজন চেঁচিয়ে উঠল।—নিশ্চয়ই নয়, নিশ্চয়ই নয়। জামাই হারামখোরকে খাওয়ান আর বিলাই হারামখোরকে খাওয়ান এক কথা।

সকলে।—আলবৎ, আলবৎ।

(একজন গলায় চাদর জড়িয়ে ছাগলটিকে টানতে টানতে নিয়ে এসে উৎসাহের ছোটে গানই সুরু করে দিলে:) খাসীর গোস্ত, বিলাতী আলু, পরটা খাইবানি..?

আর একজন উঠে।—শালা চুপ্‌ রাও, ঢাকার সব মুসলমান ভাই শুন্‌তে পেলে এক টুক্‌রা করেও পাবি না। চুপ্‌ চুপ্‌।

সকলে সমস্বরে।—হাঁ, চুপ্‌ চুপ্‌! (চুপ করার যেন সমুদ্র-গর্জ্জন শুরু হয়ে গেল। চুপ্‌ চুপ্‌ থামতে অনেকক্ষণ গেল।)

(সত্য সত্যই যখন দা নিয়ে ছাগলটিকে সকলে ধরে চিৎ করার আয়োজন কর্‌লে, তখন সৈয়দের যেন ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে পড়ল।)

সৈয়দ।—(উঠে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল:) শূয়ারকা বাচচা, হারামজাদা বেটারা, এক্ষুণি দেখাব। পুলিস, পুলিস!

সকলে সমস্বরে।—(ভেংচি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল:) পিলিস, পিলিস ফিলিস—

(ছাগলটিকে চিৎ করে ফেলে, মোল্লা গোষ্ঠের একজন "বিস্‌মিল্লাহ্‌, আল্লাহো আক্‌বর" বলে দা উঠাতেই দেখে: বিরাট লাঠি-কাঁধে লাল পাগড়ী মাথায় পুলিস ঢুকছে।)

সকলে।—(ছাগল ছেড়ে দিয়ে, দা ফেলে) বাবা, আমি নই, ও হুজুর।

(এ বলে সে, সে বলে এ, আর 'দোহাই, হুজুর, বাবা' বলতে বলতে যে যেদিকে পারল, পালিয়ে বাঁচলো। লাল পাগড়ীর রক্ত-চক্ষু একবার ঘুরপাক খেয়ে বার কয়েক চেঁচিয়ে উঠল:)—পাক্‌ড়ো।

—যবনিকা—

তা'ত হবেই

(বেলা প্রায় ন'টা বাজে—ভূতেশ্বর কিন্তু এখনো চাদর মুড়ি দিয়ে খাটের উপর সটান শুয়ে আছে। স্ত্রীর প্রবেশ—রাগে তার চোখ মুখ দিয়ে যেন আগুন ছুটছে।)

স্ত্রী—(চেঁচিয়ে) মিন্ষের হ'ল কি? (ধাক্কা দিয়ে) বলি, তুমি না মর্তেই আমার একাদশী করতে হ'বে নাকি?

ভূতেশ্বর—যাও, যাও। ডিস্টার্ব্ ক'রো না ম্যাডাম।

স্ত্রী—বেআক্কেল, বেহাঙ্গাম কোথাকার,—উল্টে আবার মা বাপ তু'লে গাল পাড়ে!

ভূত—কোথাকার একটা ইডিয়ট্ নাকি! গাল দিলাম কোথায়? বল্ছি, তোমার এই বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠে আমার কানের উপর আর এমন সঙ্গীতের সঙ্গৎ ক'রো না। বুঝেছ?

স্ত্রী—বলি, ছেলেপিলে কি উপুস করবে? বেলা ন'টা পর্য্যন্ত মড়ার মতো শু'য়ে শু'য়ে আরাম করতে লজ্জা হয় না?

ভূত—আরাম কর্ছি। কে বলে, আরাম কর্ছি? দেশ সম্বন্ধে ভাব্তে ভাব্তে আমার গা দিয়ে ঘাম ছুটেছে—আর আমার প্রিয়তমা অর্ধাঙ্গিণী বলে কিনা, আমি আরাম কর্ছি!

স্ত্রী—চুলোয় যাক্ তোমার দেশ। আপনি বাঁচলে বাপের নাম। এদিকে পেটের ভিতর চোঁ চোঁ কর্ছে—দোকানে যাবে কিনা বলো? (বল্তে বল্তে চাদরটি কেড়ে নেওয়া।)

ভূত—আহা হা, কর কি, কর কি? (চাদরটি টেনে নিতে নিতে)
পতিরূপ পরম দেবতার সঙ্গে শীতকালে এমন রসিকতা কর্তে তোমার মতো সাধ্বীর লজ্জা হয় না? দোকানওয়ালা আমার শ্বশুর কিনা, বিনি পয়সায় যে আমাকে চা'ল দেবে!

স্ত্রী—মিন্‌ষের কথা শুন্‌লেও গায়ে ঘেন্না ধরে! তোমার শ্বশুর হ'বে কেন, দোকানদার আমার শ্বশুর নিশ্চয়ই—তা' নইলে দু' দু'বার তোমাকে বাকী দেয়? (কানের কাছে মুখ বাড়িয়ে) বলি মিন্‌ষে, ছেলেমেয়েদের কান্না কি তোমার কানে ঢুক্‌ছে না?

ভূত—কেন খামকা ক্যাচ্ ক্যাচ্ করছ! সন্ধ্যায় হরিশ পার্কে 'দেশের নবজাগরণ' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে হ'বে, তাই একটু চাদর মুড়ি দিয়ে ভাব্‌ছি না, অমনি চেঁ চোঁ শুরু করেছ! আরে বক্তৃতার চোটে দেশকে এতখানি জাগিয়ে তুলেছি, খেয়ে না খেয়ে আর কিছুদিন এম্‌নি ক'রে বক্তৃতার হাতিয়ার চালাতে পারলেই ব্যস্। দেশ স্বাধীন, টাকায় আট মণ ক'রে চা'ল! (স্ত্রীর দিকে হাত নেড়ে) কত খাবি খা না —তখন যদি তোমার পেটে রোজ এক মণ ক'রে চা'ল না সেঁধিয়েছি ত আমার নাম ভূতেশ্বর নয় বলে রাখ্‌ছি।

স্ত্রী—বলি, লক্ষীছাড়া পোড়ারমুখো! (হাতের নোয়া খুল্‌তে খুল্‌তে) আমি না হয় একাদশী করব,—ছেলেপিলে কি উপুসে মর্‌বে?

ভূত—মঞ্জুরাণী, তখন চার আনা ক'রে, হ'বে ঘিয়ের সের, এক আনা ক'রে হ'বে মাংস—তখন খা না কত খাবি—হা, হা। দু'দিন না হয় একটু উপুস করলেই বা। আর উপুস করা ত তেমন খারাপ নয়! ডাক্তারেরা ত বলে, মাঝে মাঝে উপুস করলে নাকি স্বাস্থ্য খুব ভালো থাকে।

স্ত্রী—বেশ ভালো কথা, সে তুমিই পালন ক'রে গামা হ'য়ে ওঠ গে। উপুস করিয়ে আমার ছেলেদের শরীর ভালো করাতে আমি চাই না। যাবে কিনা বলো, না হয় কলসী বেঁধে আমাকে ডুবে মর্‌তে হ'বে বলে রাখছি?

ভূত—আহা, অত রাগ কেন? স্বরাজ ত এই এল বলে—

স্ত্রী—হতভাগা পোড়ারমুখো, রাগি কেন? রাগি আমার মাথা আর তোমার মুণ্ডুর জন্য। স্বরাজ এখন আমি তোমার মাথায় ভাঙ্‌ব। (ভিতরে দৌঁড়ে ঢুকে দড়ী কলসী নিয়ে উপস্থিত।)

ভূত—(চাদর ছুঁড়ে ফেলে উঠে) কর কি, কর কি? থাম, থাম। (দড়ী কলসী কেড়ে নেওয়া।) কাল 'প্রলয়ঙ্কর সভা'য় বক্তৃতা দিয়েছি--এখন তার টাকা দিয়ে যাওয়ার কথা। একটু সবুর করো না লক্ষ্মী। (বাহির থেকে ডাক) ভূতেশ্বর বাবু, ভূতেশ্বর বাবু!

ভূত--ঐ এল বুঝি, তুমি একটুখানি সর। (স্ত্রীর ভিতরে প্রবেশ।) (বাইরের দিকে উদ্দেশ করে') আসুন, একেবারে ভেতরেই আসুন।

আগন্তুক—(ঢুক্‌তে ঢুক্‌তে) নমস্কার।

ভূত—ন-ম-স্কার (একটু আশ্চর্য্য) আপনি কি 'প্রলয়ঙ্কর সভা'র সম্পাদকের কাছ থেকে আস্‌ছেন?

আগন্তুক—আজ্ঞে না!

ভূত—তবে?

আগন্তুক—আমি শুধু আপনাকে দেখ্‌তে এলাম।

ভূত—(নিজের শরীরের চারদিকে তাকিয়ে) আমাকে কি মিউজিয়ামে পাঠাবার বয়স হ'ল নাকি! তা' আপনি ত বেশ নিঃস্বার্থ লোক দেখ্‌ছি। ভলাণ্টিয়ার হ'বেন?

আগন্তুক—ভলান্টিয়ারি করেই ত মশায় গলদঘর্ম্ম হচ্ছি—দেশসেবাই তো আমাদের কাজ।

ভূত—তাই নাকি?

আগন্তুক--মশায়, আমাদের দেশের লোক এক্কেবারে অদূরদর্শী। ওহ্, এদেশ দিয়ে কিচ্ছু হ'বে না, হোপ্‌লেস্। ভবিষ্যতের ভাবনা এক্কেবারেই ভাবে না, বোঝেও না।

ভূত--কেমন?

আগন্তুক—এই ধরুন না, আমাদের দেশের লোক যা রোজগার করে, তা' উড়িয়ে দিয়ে একেবারে ফতুর হ'য়ে বসে। যেই তিনি পটল তুললেন, অমনি তাঁর স্ত্রী পুত্রের কাঁধে উঠ্‌ল ভিক্ষের ঝুলি। বলুন দেখি, এমন দশা আর কোন্ দেশে হয়?

ভূত—সত্যিই তো দুঃখের বিষয় তা' হ'লে। এর কি কোনো প্রতিকার নেই?

আগন্তুক—একমাত্র প্রতিকার: সকলে কিছু কিছু সঞ্চয় করা।

ভূত—আজকে হরিশ পার্কের সভায় এ-সম্বন্ধে তা' হ'লে একটি প্রস্তাব করতে হয়। আপনি সেকেণ্ড কর্‌বেন কিন্তু।

আগন্তুক—মশায়, প্রস্তাবে ট্রস্তাবে কিচ্ছু হ'বে না। ও শুধু গবর্ণমেণ্টকে শাসানোর কাজে লাগে। ও বাদ দিয়ে প্রত্যেকে যদি আমরা কিছু কিছু সঞ্চয় করার বন্দোবস্ত করি, তা' হ'লেই ব্যস্‌। ধরুন, আমি নিজে পাঁচ হাজার টাকার ইন্সিওর করেছি; এখন আপনারাও সকলে যদি—

ভূত—(আগন্তুকের কথা শেষ না হ'তেই উঠে) মশায় বুঝি ইন্সিওরেন্স-ক্যান্‌ভাসার—বেরোন, বেরোন। না হয় ঐ দেখ্‌ছেন (দড়ি কলসীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে) গলায় দড়ি কলসী বেঁধে ঐ কুঁয়োয় (বাইরের দিকে ইশারা করে) ছেড়ে দেব। ইন্সিউরেন্স ক্যানভাসারদের বিরুদ্ধে নতুন অর্ডিন্যান্স করার জন্য আমি এজিটেশন্‌ চালাব ভাব্‌ছি; আর আপনি বেশ ভালো মানুষ সেজে চোরের উপর বাটপাড়ি কর্‌তে চা'ন? বেরোন—

আগন্তুক—(উঠ্‌তে উঠ্‌তে বিজ্ঞাপনের ছোট একটি বই চাদরের নীচ থেকে বের করে) যাচ্ছি, মশায়! আচ্ছা, এটি রাখতে ত কোনো আপত্তি নেই? অবসর সময় পড়ে দেখবেন।

ভূত—হাঁ, কোনো আপত্তি নেই। দিয়ে যান—শেভ্‌ করার জন্য মশায় রোজ রোজ কাগজ খুঁজে হয়রান হ'তে হয়।
(বোকার মতো একটুখানি তাকিয়ে থেকে আগন্তুকের প্রস্থান। স্ত্রীর প্রবেশ)

স্ত্রী—দাও, টাকা দাও। তোমার কাছে থাকলে সব মদ খেয়ে উড়িয়ে দেবে; এক্কেবারে একমণ চাল নিয়ে আস্‌তে হ'বে এক্ষুণি।

ভূত—আরে, 'প্রলয়ঙ্কর সভা'র লোক এখনো আসেনি। এ বেটা এক ইন্সিওরেন্স-দালাল। দেখ দিকিন, বেটা দালালী করবার আর যায়গা পেলে না!

স্ত্রী—মিথ্যে কথা দিয়ে কা'কে ভুলাতে চাও? শীগ্‌গির টাকা বের করো বল্‌ছি। এরি মধ্যে গুঁজ্‌লে কোথায়? (বিছানা উল্টান, এখানে ওখানে তালাস, ওর ট্যাঁকে হাতড়ান।)

ভূত—আরে সত্যিই, দিব্যি করে' বল্‌ছি, টাকা পাইনি—

স্ত্রী—দুত্তোর দিব্যি, তোমার আবার দিব্যি। পোড়ারমুখো মরেও না। মর্‌লে অন্ততঃ আমার হাড় জুড়াত—ঝি-গিরি ক'রে হ'লেও ছেলে-পুলের মুখে দু'টো দানা দিতে পারতাম।

ভূত—ভদ্রে! এখন কর না কেন ঝি-গিরি? কে তোমাকে ধরে রেখেছে?

স্ত্রী—পোড়ারমুখোর কথা শুন্‌লেও পিত্তি জ্বলে ওঠে। এখন করলে যে তোমার মুখ পোড়া যাবে, মুখে চূন-কালি পড়বে—সে আক্কেল আছে?

ভূত—পোড়ারমুখী, এখন আমার মুখে খুব চূনকাম হচ্ছে, না? (দু'তিনটি ছেলে-মেয়ের দ্রুত প্রবেশ—পেটে হাত বুলাতে বুলাতে চেঁচাতে লাগ্‌ল।)

সকলে—বাবা, ক্ষিধে পেয়েছে—

বাবা, পয়সা দাও, পেট পুড়ে গেল—

বাবা, চানাচুর খাব—

বাবা, পয়সা—বাবা, পয়সা ইত্যাদি—

(ভূতেশ্বরের হাত, পা, কাপড় ধরে টানাটানি।)

ভূত—হ'য়েছে, হ'য়েছে। আমার বাবাস্বের শ্রাদ্ধ করে ছাড়লে, বাবারা। যাচ্ছি, এক্ষুণি টাকা নিয়ে আস্‌ব। (দ্রুত প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(টল্‌তে টল্‌তে ভূতেশ্বরের প্রবেশ—সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী পুত্র কন্যা সকলের আবির্ভাব।)

স্ত্রী—দাও, টাকা বের করো—

ছেলে---বাবা, পয়সা—

মেয়ে---বাবা, খিদের চোটে বাঁচি না--

ছেলে---মা, ভাত দাও---

(ভূতেশ্বরকে ধরে সকলের টানাটানি—টল্‌তে টল্‌তে ভূতের পতন।)

ভূত—টাকা কোথাও পাইনি, আমি বিষ খেয়েছি।

স্ত্রী---পোড়ারমুখো, আমাকে বুঝি বোকা পেয়েছ? বিষ কি বিনি পয়সায় মেলে নাকি?

ভূত---না গো না, পয়সা যা পেয়েছিলাম, তা' দিয়ে বিষ কিনেছি। তুমি যদি সহমরণের পুণ্য পেতে চাও, তোমায় বিনি পয়সায় দিতে পারি। (ট্যাঁকে হাত বাড়ানো) দেব?

স্ত্রী---আব্দার আর কি! হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া মিন্‌ষের সঙ্গে আবার সহমরণ!

ভূত—সতী! অতটুকু সতীত্বের জোরও তোমার নেই? তবে আর বেঁচে থেকে আমার কী লাভ! বাকীটুকুও আমিই না হয় খেয়ে ফেলি। (ট্যাঁক থেকে নিয়ে কি একটা মুখে পোরা---আর হাত পা লম্বা করতে করতে চোখ বোঁজা) আমি তোমাদের মাফ করে দিলাম। তোমাদের সব অপরাধ ক্ষমা কর্‌লাম।

স্ত্রী---তুমি লক্ষ্মীছাড়া মাফ করার কে? আমরা তোমার অপরাধ কিছুতেই ক্ষমা ক'রব না।

ভূত—তা'ত জানি-ই। (দীর্ঘশ্বাস।)

(ভূতের মৃত্যু ভান—কেউ তার নাড়ী দেখা, কেউ নাকের কাছে হাত দিয়ে দেখা।)

স্ত্রী—টুনু, চিম্‌টী কেটে দেখ্ ত, মিন্‌ষের হ'ল কি? সত্যি হাড় জুড়ালো নাকি আমার?

(ছেলের চিম্‌টী কাটা,---আর একটির চুল ধরে টানাটানি করা।)

স্ত্রী---(ভূতেশ্বরের নাকে হাত দিয়ে, চোখের পাতা উল্‌টিয়ে দেখে' পাশের ছেলেটির গায়ে ঠাস্ করে এক চড় বসিয়ে দিয়ে) হতভাগা, দেখ্‌ছিস্ না মরেছে, মরেছে। কাঁদ, লোকে কি বল্‌বে, সকলে চেঁচিয়ে কাঁদ্ না!

(চেঁচিয়ে কান্না।)

ভূত—(চট্ ক'রে উঠে) হারামজাদী, আমার সাম্‌নে আমার ছেলেকে মারিস্! আমি মরেছি বলেই কি ক্ষমা কর্‌ব নাকি? (স্ত্রীর পিঠের উপর দুম্ দুম্ করে কিল বর্ষণ---তারপর গিয়ে সটান শু'য়ে পড়া।)

স্ত্রী---(কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে) শীগ্‌গির লোকজন ডেকে নিয়ে আয়—শ্মশানে নিয়ে যাক্। মিন্‌ষে ত যেন মর্‌তে না মর্‌তেই ভূত হ'য়ে গেছে। তা' নইলে মরা মানুষ আবার জেগে ওঠে! সার্থক নাম, বাবা!

(ছেলে একটির লোক ডাক্‌তে প্রস্থান---বাকী সবাইর কান্নাকাটি। মিনিট কয়েকের মধ্যেই চার পাঁচজন লোক খাটিয়া নিয়ে হাজির। আপাদমস্তক কাপড় মুড়ি দিয়ে ভূতকে খাটিয়ায় চড়ান, তারপর 'হরিবোল' বল্‌তে বল্‌তে কাঁধে নিয়ে প্রস্থান---ভূতের স্ত্রী পুত্রের ভীষণ কান্না।)

তৃতীয় দৃশ্য

(চিতা সাজিয়ে, কেরোসিন ঢেলে যেই আগুন ধরিয়ে দিয়েছে—ভূতেশ্বরের 'হরিবোল' বলে লাফিয়ে ওঠা—শ্মশান-যাত্রীদের ভয়ে 'ভূত' 'ভূত' বলে পলায়ন।)

ভূত---আমি মরিনি মরিনি। স্ত্রী পুত্রের হাত থেকে বাঁচবার জন্য শুধু একটু ভান করেছিলাম। সত্যি মরিনি---

(কার কথা কে শোনে সব পালিয়ে পগার পার।)

চতুর্থ দৃশ্য

(দু'দিন পর ধীরে ধীরে ভূতেশ্বরের আপন গৃহে প্রবেশ।)

ভূত—ভোঁদা, অ ভোঁদা!

(অন্দরে আলাপ) এ যে বাবার গলা। না!

মিন্‌যে মরে ভূত হয়েছে—

বাবার ভূত—

(অন্দর থেকে ঝাঁটা হাতে স্ত্রী আর লাঠি হাতে ছেলেদের আবির্ভাব।)

ভূত—(হেসে) মঞ্জু আমি ত ফিরে এলাম।

স্ত্রী—পোড়ারমুখো আমার মাথা খেতে এসেছ। বেরো বেরো।

ছেলেরা—বরো বেরো—

ভূত—ওগো, আমি মরিনি, মরিনি—

স্ত্রী—ভূত হ'য়ে মিথ্যা কথা ব'লো না। আমরা নিজের চোখে দেখলাম, তুমি মরেছ—

ভূত—আরে সত্যি-ই আমি মরিনি, শুধু ভান করেছিলাম—

ছেলেরা—(লাঠির গুঁতো দিয়ে) ভূতের গা ত, মা, বেশ মানুষের গা'র মতো—

স্ত্রী—আমার মাথা খাও, বেরো। পোড়ারমুখো, বেরো শীগ্‌গির। আমার ঘরের অমঙ্গল করো না—

ভূত—তোমার বাবার ঘর?

স্ত্রী—ঝাঁটা মেরে পোড়ারমুখোর মুখ ভেঙ্গে দেবো। (ঝাঁটা উত্তোলন)

ছেলেরা—(লাঠি বাগিয়ে) বেরো বেরো—

স্ত্রী—তা' নইলে এখনি আমি চেঁচিয়ে পাড়ার লোক জড় করব। তখন না মরলেও তা'রা তোমাকে মেরে ছাড়বে।

ছেলেরা---বেরো, বেরো বাবা---

স্ত্রী—না মরলে মিন্‌ষে এ দু'দিন কোথায় ছিলে?

ভূত—তোমার সতীনের ওখানে।

স্ত্রী—মর্‌ পোড়ারমুখো।

ভূত—মরেও কি তোমাদের হাত থেকে নিস্তার আছে? (ছোট ছেলেটির চিবুকে হাত দিয়ে) খেয়েছিস্‌ বাবা---?

ছেলে—(কাঁদো কাঁদো ভাবে) না বাবা, সক্কাল থেকে কিচ্ছু খাইনি।

ভূত—রসো বাবা, এক্ষুণি তোমায় রসগোল্লা খাইয়ে দেব।

ছেলেরা---এঁ্যা বাবা, রসগোল্লা, রসগোল্লা? (জিভে জল) কই, বাবা, কই? দাও না বাবা!

ভূত—(কাপড়ের কোণা থেকে দু'টো টাকা খুলে নিয়ে) মঞ্জু, এই দেখ।

স্ত্রী---(ঝাড়ুটা একপাশে ছুঁড়ে ফেলে) তাই ত এতক্ষণ বল না কেন? ভিতরে ভিতরে এত রসিক তুমি, তা ত জানতাম না। (ছেলেদের) সর্‌ সর্‌! (ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম।)

ছেলেরা---বাবা ত দেখছি বেশ ভালো লোক (সকলে ভূতশ্বরের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম।)

স্ত্রী---আরে এস এস, বস। (আঁচল দিয়ে যায়গাটা পরিষ্কার করে দিলে। বস, বস। আহা, ঘেমে ঘেমে একেবারে নাইয়ে গেছো দেখছি! (আঁচল দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিয়ে, আঁচল দিয়েই বাতাস কর্‌তে কর্‌তে) ভোঁদা, শীগ্‌গির পাখাটা নিয়ে আয় ত। (হাস্‌তে হাস্‌তে) টাকা---টাকা কোথায় পেলে, হাঁ গা?

ভূত---সে আর বলো না। চিতা থেকে উঠে এ দু'দিন ধ'রে একটা চাকরীর খোঁজে সারা ঢাকা সহর টো টো করে বেড়ালাম। শেষকালে এক বড় বাড়ীতে ঢুকে দেখি, বড় মজা, সকাল থেকেই সে

বাড়ীর বামুন ঠাকুরের খোঁজ নেই। ব্রাহ্মণ পরিচয় দিতেই আমার আদর দেখে কে! অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা—বল্লাম, দৈনিক এক টাকা না হ'লে আমার চল্‌বে না। তাই সই। ভাগ্যে কিছু দিন তোমার সাগরেদী করেছিলাম, মনে আছে? সেই বিয়ের পর---

স্ত্রী---হেঁ, খুব আছে, খুব মনে আছে। তখন ত তুমি রান্নাঘর থেকে বেরুতেই চাইতে না। ও বাড়ীর বৌদি কত ঠাট্টা কর্‌ত।

ভূত—ওস্তাদ মঞ্জুরাণীর নাম নিয়ে শুরু করে দিলাম আর কি হাঁড়ি ঠেলা।

স্ত্রী--রোজ রোজ এক এক টাকা দেবে ত?

ভূত--হাঁ গো হাঁ। সে একেবারে পাকা করে নিয়েছি।

স্ত্রী---রোজ এসে কিন্তু টাকাটা আমার হাতে দিয়ে যাবে।

ভূত—রোজ?

স্ত্রী---হাঁ, না দিবে ত আবার মরেছ। সবাইকে বলে দেব, তুমি মরে ভূত হয়ে গেছ। বাড়ীতেও ঢুকতে পাবে না।

ভূত—আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে গো, তাই হবে।

স্ত্রী—তোমার জন্য ত তা হ'লে এখানে আর রান্না চড়াতে হবে না?

ভূত---না, তোমাদের জন্যেই আমায় রান্না করে মরতে হবে সারাদিন। তোমরা আর আমার জন্য কোন্ দুঃখে রান্না করবে?

স্ত্রী—বেশ, বেশ। তা হ'লে আর কোন্ শালী বলেঃ তুমি মরেছ!

ভূত—(গম্ভীর, নিস্তব্ধ।)

স্ত্রী—আশীর্বাদ করো, যেন মাথার সিন্দুর আর হাতের নোয়া নিয়ে মরতে পারি।

ভূত—(নির্বাক্।)

স্ত্রী—কি ভাবছ?

ভূত—ভাব্‌ছি: বাবাত্ব আর স্বামীত্ব কায়েম রেখে বেঁচে থাক্‌তে হলে দেখ্‌ছি, রোজ রোজ মাথার ঘাম পায়ে ফেল্‌তে হবে।

স্ত্রী—(নথ নেড়ে) তা'ত হ'বেই।

ছেলে---(হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ঘুরিয়ে) তা' ত হ'বেই!!

মেয়ে---(আঁচল দুলিয়ে) তা' ত হ'বেই!!!.

—যবনিকা—

বোরকা

প্রথম দৃশ্য

(মতি, মহি ও মণি—তিন বেকার বন্ধু। আদালতে লোক নে'য়া হবে শুনে রবিবার সন্ধ্যায় তিন উমেদার এস্-ডি-ও'র বাসায় এসে উপস্থিত। এস্-ডি-ও তখনো বাইরে থেকে ফিরেননি। তিন বন্ধুরই বড় বড় গোঁফ দাড়ি—চুল খাটো করে ছাঁটা, গায়ে কালো জীনের কোট, পরনে সাদা জীনের প্যাণ্ট, পায়ে তলী-ক্ষয় যাওয়া জুতা। এস্-ডি-ও নাই শুনে তিন বন্ধু খোলা বারান্দায় তিনখানা চেয়ার দখল করে চোঁ চোঁ করে বিড়ি টান্‌তে লাগল এবং সঙ্গে সঙ্গে 'বাংলার ভবিষ্যৎ' সম্বন্ধে আলোচনায় স্থান কাল ভুলে উদ্দীপিত হয়ে উঠল।)

মণি—(গোঁফে তা দিয়ে) মতি, আমার মনে হয়, আদর্শহীন দেশ কাণ্ডারীহীন নৌকার মতো।

মতি—না, না। বরং বলো নৌকাহীন কাণ্ডারীর মতো।

মহি—অর্থাৎ, আজ বাঙ্গালীর নৌকাও নেই, কাণ্ডারীও নেই; সে আজ অগাধ কাল-সমুদ্রে পড়ে শুধু নাকানি চোবানি-ই খাচ্ছে।

মতি ও মণি—(একসঙ্গে) সত্যিই তা ছাড়া আর কি?

মহি—জলে-পড়া লোক যেমন যা দেখে তাই ধরে কুল পেতে চায় বাঙ্গালীও আজ চোখের সাম্‌নে যা দেখ্‌ছে তাই গ্রহণ করে বাঁচ্‌তে চাচ্ছে।

মতি—অথচ এই বাঁচা যে মরার চেয়ে খারাপ, এ সে বুঝতে পার্‌ছে না।

মণি—বুঝ্‌তে পারলে কি তৃণারোহণ করে মানুষ সমুদ্র পার হতে চায়?

মহি—কাজের সুবিধার জন্য ইংরেজের কোট প্যাণ্ট না হয় নিলে; (দাড়ি গোঁফে হাত বুলাতে বুলাতে) তাই বলে দাড়ি গোঁফ

ফেলে দিয়ে দেশের যুবকেরা সবাই মেয়ে বনে যাবে—এ কিছুতেই সমর্থন করা যায় না।

মতি—আর মেয়েরা রাস্তায় নেমে পুরুষদের সঙ্গে ফর্ ফর্ করে বেড়াবে! এ যে শুধু আমাদের দেশের সনাতন আদর্শের বিরোধী তা নয়, এতে দেশের সমূহ সর্বনাশও হচ্ছে।

মণি—শুধু সর্বনাশ! রোজ রোজ কত যে দুর্ঘটনা ঘটছে সে খবর রাখ?

মহি—সত্যি-ই। হয়ত সাইকেল, মোটর বাইক, অথবা টেক্সী হাঁকিয়ে চলেছ; হঠাৎ মোড় ফিরতেই সাম্‌নে এসে পড়ল এক পাল মেয়ে, হয়ত নেহাৎ মেয়েই; কিন্তু বিলেতী পাউডার এসেন্সে, কাপড় পরার ঢঙে ও খোঁপা বাঁধার ধরণে হয়ে পড়েছে এক একটি যেন পরী। চোখ না গিয়ে উপায় আছে? ফলে তোমার বাহন গিয়ে পড়ল আর একজনের ঘাড়ের উপর, হয়ত ধাক্কা খেল লাইট পোষ্টে অথবা বাসে..

মতি—এ সব অনর্থের জন্য দায়ী কে?

মণি—কে আবার? দায়ী দেশের লোক।

মহি—আমার মনে হয়, আমাদের সমস্ত সর্বনাশের গোড়া হচ্ছেঃ চক্ষুলজ্জা।

মতি—সত্যি-ই। অনেকেই হয়ত এ-সব পরানুকরণকে নিন্দার চোখেই দেখে, কিন্তু চক্ষুলজ্জায় নিজেরাই আবার সে সব কাজ নির্বিবাদে করে যাচ্ছে।

মণি—কাজেই যারা দেশের মঙ্গল চায়, তাদের সর্বপ্রথম চক্ষুলজ্জা জয় করতে হবে।

মহি—বন্ধুবান্ধবের ঠাট্টা বিদ্রূপ সত্বেও আমরা দাড়ি গোঁফ রেখে চক্ষুলজ্জা জয়ের সর্বপ্রথম আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছি; ভবিষ্যতেও আমরাই দেশের সাম্‌নে নব নব আদর্শের প্রতিষ্ঠা কর্‌ব।

মতি ও মণি—(একসঙ্গে) নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আমরাই ত দেশের নবজন্মের অগ্রদূত, পাইওনীয়ার। আমরাই বাঙালীর সামনে..

(কথা শেষ হ'বার আগেই ঘড়্ ঘড়্ শব্দে একখানি গাড়ী এসে গে'টের বাইরে দাঁড়াল। তিন বন্ধু সন্ত্রস্ত হয়ে মুখের বিড়ি জুতার নীচে পিষে নিবিয়ে ফেল্লে। গে'ট ঠেলে একটি সুন্দরী তন্বী মেয়ে ঢুকলেন; ইনি এস্-ডি-ও'র তৃতীয় পক্ষ। বিরাটকায় প্রৌঢ় এস্-ডি-ও গাড়ী থেকে নামবার জন্য এখনো ধস্তাধস্তিতেই আছেন।—বৌ ঢুকতেই হঠাৎ এই তিন মূর্ত্তিমানকে দেখে খানিকক্ষণ হতভম্ব হয়ে রইলেন। তিন বন্ধু লাফিয়ে উঠে কোথায় যে লুকোবেন, পথ খুঁজে হয়রান। বাড়ীর দু'পাশ্বই বন্ধ, গে'ট ঠেলে বাইরে যাওয়া অথবা ঘরের ভিতর ঢুকে পড়া ছাড়া কোনো উপায়ই নেই। ভিতরে যাওয়া যায় না, আর গেটের সাম্নে ত স্বয়ং হুজুর দাঁড়িয়ে। অগত্যা তিন বন্ধু পূব কোণায় জড় হয়ে দেওয়ালের দিকে মুখ গুঁজে' দাঁড়াল। তাদের সঙ্কোচ জড়তার ভাব দেখ্‌লে মনে হয়ঃ দে'য়ালে ঢুকে যেতে পারলেই যেন তা'রা বাঁচে।)

মনি—(দেয়ালের দিকে মুখ রেখে', অনুচ্চ কণ্ঠে) সিসিম্ খোল্।

(দেওয়াল ফাঁক হ'ল না। শ্রীমতী এস্-ডি-ও' সেণ্ডেল উড়িয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লেন। তিন বন্ধু দেয়ালে মুখ গুঁজে দাঁড়িয়েছেন বটে কিন্তু তিনজনই শ্রীমতী ঢুকবার সময় ঘাড় বাঁকিয়ে কাঁধের উপর দিয়ে এক চক্ষু ফিরিয়ে দেখ্‌তে লাগল। ততক্ষণে এস্-ডি-ও গেটে ঢুকে পড়েছেন তিনি এই না দেখে—)

এস্-ডি-ও—(গর্জ্জন করে) কোন্ হ্যায়?

তিন বন্ধু—(আমতা আমতা করে) আমরা, হুজুর!

এস্-ডি-ও—কা'কে চাই!

তিন বন্ধু—হুজুরকে, স্যার!

এস্-ডি-ও—কেন?

মতি—(মাথা চুলকাতে চুলকাতে) এ, এ, আপনার হাতে নাকি স্যার চাক্‌রী...।

এস্-ডি-ও—চাক্‌রী? কিসের চাক্‌রী? বেরো, বেরো।

মনি—আমরা বড্ড গরীব, স্যার!

এস্-ডি-ও---বেরো, বেরো বল্‌ছি। মহিলার সম্মান করতে জান না, আবার চাক্‌রী। ষ্টুপিড্‌, রাস্‌কেল কতকগুলি। ঘাড় বাঁকিয়ে কী দেখ্‌ছিলে? মেয়েমানুষ দেখনি কোনোদিন? (গেটের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে') বেরো।

(হতবুদ্ধি বন্ধু-ত্রয় অগত্যা মুখ কাঁচুমাচু করে বেরিয়ে গেল।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(দরজীর দোকান। দরজী কল চালিয়ে সেলাই কাজে রত। আশেপাশে আরও দু'তিনজন বিভিন্ন সেলাই কাজে ব্যস্ত। তিন বন্ধু দরজীর দোকানে ঢুকতে ঢুকতে—)

মহি—নারীর ইজ্জৎ রক্ষার জন্যে আমরাই দেশে সর্বপ্রথম নতুন আদর্শের প্রতিষ্ঠা কর্‌ব।

মনি—দেশের ইতিহাস একদিন আমাদের ঋণ স্বীকার করবেই।

(দরজীর দোকানের সবাই কাজ বন্ধ করে আগন্তুকদের প্রতি হা করে তাকিয়ে রইল।)

মহি—এতদিন ধরে মেয়েরা বোরকা পরেছে, এবার থেকে পুরুষেরা বোরকা পরবে?

মতি—মেয়েদের সম্মান রক্ষা করে চল্‌তে হলে পুরুষদের বোরকা পরা ছাড়া এখন আর কি উপায় আছে বল?

মনি--হাটে মাঠে, পথে ঘাটে, সভায় সমিতিতে এখন পঙ্গপালের মতো শুধু মেয়েই; এই পঙ্গপালের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে হলেও ত বোরকা চাই।

মতি—বোরকা পরা থাক্‌লে কি সে-দিন এস্-ডি-ও আমাদের অতখানি অপমান করতে পারতেন?

দরজী—আপনারা...

মহি—বোরকা পূর্বকালে মেয়েদের ইজ্জৎ রক্ষা করে এসেছে, এই যুগে করবে পুরুষদের ইজ্জৎ রক্ষা।

মতি—ধন্য বোরকা, ধন্য হে নরনারীর বিপদভঞ্জন।

মহি—হে মহিয়সী বোরকে। যুগ যুগ ধরে তুমি বেঁচে থাক।

দরজী—আপনারা...

মহি—যে মহাপুরুষ নরনারীর সম্মান রক্ষার এই অপরূপ যন্ত্রটি আবিষ্কার করে মানব-জাতির মহাকল্যাণ সাধন করেছেন তাঁর পুণ্যময় স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমাদের হাজার হাজার সালাম ও সহস্র সহস্র নমস্কার।

মতি—সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের এ্যানিভারসারী হওয়া উচিত।

দরজী—আপনারা কি মনে ক'রে?

মনি—উচিত কাজ আমাদের দেশের লোক কবে করেছে, শুনি?

মহি—করে না বলেই ত এই আত্মবিস্মৃত জাতি আজও অধঃপতনের নিম্নতম গহ্বরে পড়ে আছে।

মতি—দেশের কাজ অন্য কেউ না করলেও আমাদের ত করতেই হয়! চল, আজই সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীতে গিয়ে বোরকা'র আবিষ্কার কর্তার নাম আর জন্ম-মৃত্যুর তারিখটা খুঁজে বের ক'রে আনি।

মনি—(চিন্তান্বিত ভাবে) তাঁর বুদ্ধির তারীফ করতেই হয়...

দরজী—বলি, মশায়রা কি চান?

মতি—(অধিকতর চিন্তিত ভাবে) শুধু বুদ্ধি! বোরকা আবিষ্কারের কথা যতই ভাবি, ততই বিস্ময়ে আমার তাক্ লেগে যায়। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের চেয়ে এই আবিষ্কারের মূল্য কিছুমাত্র কম নয়। ইউরোপ নাকি খুব সভ্য; তাদেরও কোট চাই, প্যাণ্ট্ চাই, সার্ট চাই, টাই চাই, হ্যাট চাই; ভারতবর্ষেরও সেই দশা: ধুতি চাই, চাদর চাই গেঞ্জী চাই, পাঞ্জাবী চাই, আরও কত কি চাই। বোরকা হচ্ছে পোষাকের সেরা পোষাক, আপাদমস্তক একটিতেই ব্যস্। সত্যি-ই, এই বোরকা মানব-সভ্যতার এক বিরাট বিস্ময়!

মহি—বোরকা মানব-ইতিহাসের অষ্টম আশ্চর্য্য!

মনি—আমার মনে হয়, যিনি বোরকা আবিষ্কার করেছেন তিনি একজন বড় অর্থনিতিবিদ্‌ও ছিলেন। বোরকাতে সুবিধা কত, ধুতি প্যাণ্টের মতো পরতে হাঙ্গাম নেই, বোতাম খরচ নেই, বেল্ট লাগাবার কষ্ট নেই; মাথার উপর দিয়ে ছেড়ে দিলেই এক সেকেণ্ডে পরা শেষ। টাকা বাঁচল, সময় বাঁচল। এই যুগে এর বাড়া আর কি চাই?

মহি—আর পনর-আনা ধোপা খরচ বেঁচে গেল, সেও ত কম নয়। কোট প্যাণ্ট ধুতি পাঞ্জাবী পরলেও বোরকা থাক্‌লে তা আর সহজে ময়লা হয় না।

মতি—হলেও বা তা দেখ্‌ছে কে?

(দরজী অনন্যোপায় হয়ে, হুঁকায় তামাক ভরে টিকা জ্বালিয়ে তাদের দিকে বাড়িয়ে দিলে। তিন বন্ধু এক সঙ্গেই হুঁকার নলটি ধরে টানাটানি আরম্ভ করল। এ বলেঃ আমি আগে; ও বলেঃ আমি প্রথম। এ বলে। আমি জ্বালিয়ে দিই; ও বলেঃ তুই পরে খাস্‌ ইত্যাদি।)

মহি—(হুঁকার নলে হাত রেখে), দেখ, এই করলে কারোই তামাক খাওয়া হবে না—অনর্থক তামাকটা জ্বলে যাবে।

মতি—Example is better than precept. বেশ তুমি হাত ছেড়ে দাও।

মহি—হাত ছাড়া মানে আমার দাবী ছাড়া, তা আমি ছাড়তে যাব কেন? তবে আমি বলিঃ এ হচ্ছে Pact-এর যুগ; অটোয়া প্যাক্ট, লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট, নাটো প্যাক্ট, সেণ্টো ইত্যাদি প্যাক্টের উপরই আজ দুনিয়া চল্‌ছে; চল আমরাও একটা প্যাক্ট্‌ করি, তারপর সেই প্যাক্ট-অনুসারে তামাক খাওয়া চলুক।

মনি ও মতি—তা মন্দ না, বেশ তাই হোক।

মহি—কি রকম করতে চাও বলো।

মনি—তুমিই প্যাক্টের কথা তুললে যখন, কি রকম শর্তাদি হওয়া উচিত তুমিই না হয় বলো।

মহি—না, তোমরাই বলো।

মতি—না, তুমিই বলো।

মহি—আমি বলি কি: তামাক খাওয়ার আগে চল আমরা স্মৃতি-বার্ষিকীর কর্ম্মকর্ত্তা ঠিক করে নিই—যে অপেক্ষাকৃত নিম্নপদ গ্রহণ করবে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সে-ই আগে তামাক খাবে।

মতি ও মনি—বেশ, বেশ, ঠিক বলেছ ভাই।

মতি—তা হ'লে আমি প্রস্তাব করি, মনি বোরকা-বার্ষিকীর সভাপতি হোক, আর সে সকলের শেষে তামাক খাবে।

মনি—বেশ, আমি তা'তে রাজী আছি। আর আমি প্রস্তাব করি, মতি বার্ষিকীর সম্পাদক হোক, এবং সে সকলের আগে তামাক খাবে।

(মহি হতাশ ভাবে একবার এর মুখের দিকে, আবার ওর মুখের দিকে তাকায়। মতি ও মনি যখন তার নাম কিছুতেই প্রস্তাব করল না তখন তার হতাশার আর সীমা রইল না।)

মহি—আ-আ-আমার নাম!

মতি ও মনি—কেন, তুমি ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট।

মহি—না, আমি ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট হ'ব না।

মতি—কেন হবে না? না হয় তুমিই প্রথম তামাক খেয়ো!

মহি—কথা ছিল আমরা আমাদের সম্প্রদায় ভুলে যাবো—নিজেদের সর্ব্বাগ্রে বাঙালী মনে করব, কিন্তু দেখ্‌ছি তোমরা সম্প্রদায় ভুল্‌তে পারছ না।

মনি—কি করে বুঝ্‌লে আমরা ভুল্‌তে পার্‌ছি না?

মহি—(স্বগতের মতো) কৌন্সিল আমাদিগকে ডেপুটি প্রেসিডেণ্ট করে, করপোরেশন করে ডেপুটি মেয়র, কংগ্রেস এসিস্‌টেণ্ট সেক্রেটারী। (মতি ও মনিকে লক্ষ্য করে') ভুল্‌তে পারলে তোমরা আমাকে ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট হওয়ার প্রস্তাব করতে না।

মনি—ছি, ছি, তুমি মনে মনে আমাদের বিরুদ্ধে এতখানি সাম্প্রদায়িক বিষ পোষণ করো! মনে করেছিলাম, আমাদের সঙ্গে

থেকে তুমিও জাতীয়তাবাদী হয়ে উঠেছ, এখন দেখছি তোমার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নি।

মহি—সব সময় যদি আমাদিগকে ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট করে রাখতে চাও, তা হ'লে আমরা যে জাতীয়তাবাদী হ'ব না তাতে কোনো সন্দেহই নেই।

মতি—তুমি ডেমোক্রেসী মানো ত?

মহি—তা মান্‌ব না কেন।

মতি—ডেমোক্রেসীর প্রথম নীতি হচ্ছে মেজরিটির হুকুম মানা।

মনি—তিনজনের আমরা দু'জনে বল্‌ছি, তুমিই ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট হবে,—Majority must be granted.

(মতি ও মনি হুঁকাটি ছেড়ে দিয়ে—তাহার পিঠে হাত বুলিয়ে—)

মতি ও মনি—এখন গোলমাল করলে সব পণ্ড হয়ে যাবে, ভাই! তুমি আমাদের ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট, সাম্‌নের বার তুমিই ত প্রেসিডেণ্ট হ'বে—এখন তামাক খাও ভাই, আমরা হিন্দু মুসলমান দু'ভাই মিলে মিশে না থাক্‌লে সমস্ত বঙ্গভূমি যে রসাতলে যাবে!

(অনেকক্ষণ উদাসভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকে—হয়ত ভবিষ্যতের আশায় আশান্বিত হয়েই মহি হুঁকা টানা আরম্ভ করল।)

মহি—(দরজীকে) তুমি বোরকা সেলাই করতে পার?

দরজী—তা আর পারি না, হুজুর? আবা, কা'বা, আস্‌কান পা'জামা শিরওয়ানী .....।

মতি—তোমার আবা কা'বা চুলোয় যাক্—বোরকা সেলাই করতে পার কি না?

দরজী—খুব পারি, হুজুর।

মনি—খুব ভালো বোরকা: প'রে যেন প্রাচ্যে স্ত্রী'র সঙ্গে দেখা করা যায়।

দরজী—খুব পারব, হুজুর।

মতি—তবে মাপ নাও। (ব'লে দাঁড়ালে।)

দরজী—(অবাক বিস্ময়ে) আপনাদের?

মনি—হাঁ, আমাদের মাপ নিলেই চল্‌বে।

দরজী—অত লম্বা কি মেয়ে মানুষ হয়?

মতি—হয় কি না হয় তার জন্য তোমার মাথা-ব্যথা কেন?

দরজী—আচ্ছা, যো হুকুম।

[মাপ দিয়ে সকলের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

(এস্‌-ডি-ও'র বাসা। তিন বন্ধু বোরকা পরে' ঢুক্‌লে। এস্‌-ডি-ও নেই। ভিতর থেকে দেখে' এবং বোরকা-পরা মেয়ে মানুষগুলি এস্‌-ডি-ও'কে চায় শুনে' এস্‌-ডি-ও পত্নীর সন্দেহ। জানালা দিয়ে মুখ বের করে তিনি বল্লেন:)

এস্‌-ডি-ও পত্নী—স্বাগতম বুড়ো মিন্‌ষে তলে তলে এত কাণ্ডও করে বসেছে! মাগীগুলিরও এত আস্পর্দ্ধা, একেবারে বাসায়।

(এস্‌-ডি-ও পত্নী—বারান্দায় ঢুকলেন—তিন বন্ধুর বোরকা-সহ সালাম করা)

এস্‌-ডি-ও পত্নী—(চেয়ারে বসতে বসতে) কা'কে চাই?

মহি—এস্‌-ডি-ও সাহেবকে।

এস্‌-ডি-ও পত্নী—কেন? তাঁর সঙ্গে কি প্রয়োজন?

মহি—তাঁর সঙ্গে আমাদের একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে।

এস্‌-ডি-ও পত্নী স্বগত—একেবারে বিশেষ প্রয়োজন!

মনি—হ্যাঁ, স্যার।

মতি—(অনুচ্চস্বরে) দূর্‌, ম্যাডাম।

মনি—হ্যাঁ, ম্যাডাম!

এস্‌-ডি-ও পত্নী—প্রয়োজনটি কি দিনে না রাত্রে?

মহি—তার মানে?

এস্-ডি-ও পত্নী—(ভেঙচি দিয়ে) তার মানে। সব কচি খুকী কি না। বুড়ো মানষের মাথা চিবোতে লজ্জা করে না?

মনি—বুঝতে পারলেম না, ম্যাডাম।

এস্-ডি-ও পত্নী—বুঝতে পারবে কেন? ওকে বোকা-রাম পেয়েছ বলে মনে করেছ, আমিও বোকা-রাম, না?

মনি—সাহেব কি বাড়ী নেই?

এস্-ডি-ও পত্নী—তর্ সইছে না বুঝি? বুড়ো মানুষকে নিয়ে ঢলাঢলি করতে লজ্জা করে না? ভদ্র মহিলার মতো বোরকাও ত চড়িয়েছো?

(সঙ্গে সঙ্গে এস্-ডি-ও'র প্রবেশ। সিঁড়িতে পা দিয়েই তিনি বলে উঠলেন:)

এস্-ডি-ও—(পত্নীকে লক্ষ্য করে) ওঁদের নিয়ে তুমি ভিতরে বস্‌লে না কেন?

(স্বামীকে দেখ্‌তেই এস্-ডি-ও পত্নীর রাগ বুঝি মাথায় চড়ে বসল। তিনি নিরুত্তরে দুপ্ দাপ্ করে ভিতরে ঢুকে পড়লেন। তিনটি বোরকাবৃতা মেয়ে মানুষ মনে করে সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে এস্-ডি-ও ইতস্তত করতে লাগলেন। অগত্যা দণ্ডায়মান তিন বোরকাবৃতাকে লক্ষ্য করে তিনি বল্লেন)

এস্-ডি-ও—আপনারা ভিতরে গিয়ে বসুন।

(খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করে, তিন বন্ধু এক সঙ্গেই বোরকা মাথা পর্য্যন্ত তুলে, এস্-ডি-ও-কে অভিবাদন জানালেন। ছদ্মবেশী পুরুষ মানুষ এতক্ষণ ধরে তাঁর তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে আলাপ করেছে বুঝতে পেরে তিনি দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেল্লেন। হাতের লাঠি উঁচিয়ে চীৎকার করে উঠ্‌লেন।)

এস্-ডি-ও—চোর, বদমাইস্ সব—শের খাঁ, শের খাঁ, বাঁধ ......।

তিন বন্ধু---আমরা স্যার চা...

এস্-ডি-ও---চুপ্ রাও, চোর ডাকু সব, এক্ষুণি পুলিশে দেব---দারওয়ান, দারওয়ান!... ...

(গতিক ভালো নয় দেখে তিন বন্ধু দ্রুত রাস্তায় নেমে ভোঁ দৌড়। অনেক দূর গিয়ে তবে নিঃশ্বাস নিয়ে থামলে। রাস্তায় বোরকাগুলি খুলে ওয়াটার-প্রুফের মতো ভাঁজ করে বাম হাতে নিলে। হঠাৎ মহি সামনের দিকে চেয়ে' থেমে পড়ে বলে উঠল---ষ্টপ্; রেডী। মতি মনিও সামনের দিকে চেয়ে' বলে উঠলঃ কি? মহি আঙ্গুলের উপর ভর দিয়ে দেখে বল্লে---ঐ দূরে একপাল মেয়ে দেখা যাচ্ছে না! মনিও চেয়ে' দেখে বল্লে---তাই ত মনে হচ্ছে। মতি জেব থেকে চশমাটি বের করে চোখে লাগিয়ে চেয়ে দেখে বল্লে---হাঁ মেয়েই, কুইক্---। বলে' তিনজন মুহূর্তে বোরকা পরে' ফেল্‌ল। কয়েকটি মেয়ে এসে পড়ল। মেয়েরা ওদের দেখে খুব হাসাহাসি করতে লাগল।)

১মা---কোথাকার জঙ্গলী এরা!

২য়া---(সুর করে) ভূতের মতন চেহারা যেমন... ...।

৩য়া---আঁধার রাত্রে দেখলে ভূতও ভয়ে পালাবে।

৪র্থা---অসভ্য!

মহি---(বোরকার ভিতর থেকে) এতদিন তোমরা অসভ্য ছিলে---কালের হাওয়ায় এখন আমাদের অসভ্য করে তুলেছে।

৩য়া---কোন্ জঙ্গল থেকে নামা হয়েছে শুনি?

মনি---কোন জঙ্গল থেকে? দেখবে? দেখ তবে---। (এই বলে গোঁফ পর্য্যন্ত বোরকা উত্তোলন। দেখে মেয়েরা ভয়ে ডরে 'বাবা' রে বলে চীৎকার দিয়ে উঠল। কেউ হুমড়ী খেয়ে মাটিতে পড়ল---কারও ফীট হবার দশা, কেউ ভোঁ দৌড়। মেয়েদের চীৎকার শুনে মোড় থেকে তিন চারজন পাহারাওয়ালা মোটা লাঠি কাঁধে ছুটে এল। পাহারাওয়ালারা "কি, কি" করতে না করতেই ভীতা মেয়েরা আঙ্গুল দিয়ে বোরকাওয়ালাদের দেখিয়ে দিলে।)

১মা—ভূত।

২য়া—ভূত।

পুলিশ—কোন্ হ্যায়?

তিন বন্ধু—আমরা স্যার।

পুলিশ—আদ্মী আছে না ভূত আছে?

তিন বন্ধু—আদ্মী।

পুলিশ—বোরকা খোলো।

(তিন বন্ধু বোরকা খুল্‌তেই—)

পুলিশ—তোম্ লোক্ চোর হ্যেয়, ডাকু হ্যেয়...।

তিন বন্ধু—নেহি, কভি নেহি, হাম্ লোগ নোকরী তালাসে গিছিল।

পুলিশ—ঝুট হে। তোমলোগ ডাকু আছে, বিপ্লবী আছে।

তিন বন্ধু—নেহি, নেহি, নেহি।

পুলিশ—চুপ্ রাও! থানা-মে চলো।

(তিন বন্ধুকে ধরে থানায় নিয়ে গেল।)

চতুর্থ দৃশ্য

(আদালত। এস্-ডি-ও এজলাসে উপবিষ্ট। উকিল, পেশ্‌কার, মুহুরী, সাক্ষী প্রভৃতিতে ঘর ভরপুর। পুলিশ আর সেদিনকার ভয়প্রাপ্তা মেয়েরাও সাক্ষ্য দিতে উপস্থিত। বোরকাবৃতা আসামীরা কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান।)

এস্-ডি-ও—(আসামীদের প্রতি) তোমরা বোরকা খুলে দাঁড়াতে পার।

মহি—ধর্ম্মাবতার! মেয়েরা রয়েছেন, মেয়েদের সাম্‌নে বে-পর্দ্দা হওয়াকে আমরা মেয়েদের প্রতি অসম্মান বলে মনে করি।

এস্-ডি-ও—তোমরা ছদ্মবেশী বদ্‌মাইশ্, এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বদ্‌মাইশী করার মৎলবে আমার বাসায় পর্য্যন্ত তোমরা

ঢুকেছিলে। আর এ-সব অবলা সরলা ভদ্রমহিলাদের প্রতি তোমরা যে প্রকাশ্য দিবালোকে বেআইনী ভাবে আক্রমণ করেছিলে তাও ত অস্বীকার করার যো নেই,—হাতে হাতেই ধরা পড়েছ। তবুও তোমাদের স্বপক্ষে যদি কিছু বলার থাকে বল্‌তে পার।

মহি—ধর্ম্মাবতার। আমরা ছদ্মবেশী, এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বদ্‌মাইশ্‌ বা চোর ডাকাত আমরা নই। ধর্ম্মাবতারের বোধ হয় স্মরণ থাকতে পারে, কিছুদিন পূর্ব্বে চাক্‌রীর সন্ধানে বিনাবোরকায় আমরা একবার হুজুরের বাসায় গিয়েছিলাম। হুজুর তখন মেম সাহেবকে নিয়ে বাইর থেকে ফির্‌ছিলেন—আমরা লুকোবার যায়গা না পেয়ে বারান্দার কোণ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিলাম; হয়ত বা মেম সাহেবকে আমরা দেখে ফেলেছিলাম। তা'তে হুজুর খুব রেগে আমাদের গালাগাল দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। পরদিনই আমরা সঙ্কল্প করি যে, ভবিষ্যতে বিনা বোরকায় আমরা আর কারো সাথে দেখা করতে যাব না। সেই দিনই অর্ডার দিয়ে তিনটা বোরকা তৈয়ার ক'রে নিই এবং সেই বোরকা পরে' কাল হুজুরের সাথে আর একবার দেখা করতে যাই। মেম সাহেব মেয়েলোক ভুল করে আমাদের সঙ্গে আলাপ কর্‌ছিলেন—তখন হুজুর এসে গালাগাল দিয়ে তাড়িয়ে দিলেন। পথে আসতে এই অবলা সরলা ভদ্রমহিলারা আমাদের অনর্থক গায়ে পড়ে' খুব টিটকারী দিচ্ছিল—তাতে আমরা বোরকাটা মুখ পর্য্যন্ত তুলতেই তাঁরা ভয়ে চীৎকার দিয়ে ওঠেন। আর তাই শুনে পুলিশ আমাদিগকে গ্রেপ্তার করে। এই হুজুর আমাদের সম্পূর্ণ ইতিহাস—এতে যদি অপরাধ হয়ে থাকে আমরা অবনত মস্তকে শাস্তি গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি হুজুর।

(এই অপূর্ব্ব জবানবন্দী শুনে আদালত-শুদ্ধ লোক হেসে খুন। এস্‌-ডি-ও'র মনের বোঝা হাল্কা হয়ে গেল। হাস্‌তে হাস্‌তে তিনি বল্লেন:)

এস্‌-ডি-ও—মেয়েদের সম্মানের জন্য আপনাদের এই অপূর্ব্ব ত্যাগ স্বীকার দেখে আমি সত্যই আনন্দিত। শুধু খালাস দিলে আপনাদের ত্যাগের পুরস্কার হয় না; আজই যা'তে আপনাদের চাক্‌রী হয় আমি তার ও বন্দোবস্ত করব।

তিন বন্ধু—(বোরকার ভিতর থেকে) সাধু! সাধু!! সাধু!!!

পঞ্চম দৃশ্য

(তিন বন্ধু একই বাড়ীর পাশাপাশি তিন্‌টি ঘর ভাড়া করে' থাকে। বেলা তখন ১০ ঘটিকার মতো হবে--খাওয়ার পর তিন বন্ধু বারান্দায় বসে বিড়ি ও গল্পে মস্‌গুল। তিন্‌টি হুকে বোরকা তিনটি ঝুলানো।)

মনি---দেখ, বোরকার দৌলতে আমাদের এই সৌভাগ্য---এমন বেকার-সমস্যার দিনে বোরকার কল্যাণে কত সহজে এক সঙ্গে তিন বন্ধুর চাক্‌রী হয়ে গেল। (বোরকাগুলির দিকে চেয়ে') হে চিরকল্যাণময়ী বোরকে, আমরা তোমার কাছে চির ঋণী।

মহি---হে লজ্জাহারী, হে অগতির গতি বোরকে, তুমি এই অধম ভক্তের সহস্র কদমবুসী গ্রহণ করো।

মতি---মা বোরকে, তুমি দীন-বান্ধবী, তুমি আশ্রয়হীনের আশ্রয়দাত্রী, দীনাতিদীন সন্তানের প্রণাম গ্রহণ করো মা। বলো ভাই সবঃ বোরকা মা-ই কী জয়!

(মনি ও মহির জয়ধ্বনিতে যোগদান।)

মহি---বাস্তবিকই যদি আমরা অকৃতজ্ঞ না হয়ে থাকি, তা'হলে আমাদের উচিত বোরকার স্থায়িত্ব ও বিস্তৃতির জন্য যথাসাম্য চেষ্টা করা।

মনি ও মতি---আলবৎ! "মানুষ আমরা, নহি তো মেষ..।"

মহি---আমি বলি, চল আমরা 'বোরকা' নামে এক পত্রিকা বের করি এবং তার দ্বারা বাংলার ঘরে ঘরে বোরকার সর্বাঙ্গীন উপকারিতা প্রচার করি। পত্রিকা ছাড়া কোনো ভালো জিনিষের প্রচার বা কোনো অনুষ্ঠানই টিকে থাক্‌তে পারে না।

মনি---আমি বলিঃ পত্রিকা বের করার আগে, চল আমরা একটা 'বোরকা-সমিতি' স্থাপন করি---সেই সমিতির প্রত্যেক সভ্যকেই বোরকা পরার শপথ গ্রহণ করতে হবে, বোরকা প্রচারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। আজকালকার দুনিয়ায় রাজনীতিই বলো আর সমাজ-নীতিই বলো প্রথমে সমিতি ছাড়া কিছুই হয় না।

মতি—তা তুমি মন্দ বলনি। মাঝে মাঝে সমিতির পক্ষ থেকে লেণ্টার্ণ লেক্‌চার ইত্যাদির দ্বারা বোরকার নৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক উপকারিতা সম্বন্ধে জোর প্রপাগাণ্ডা করা যাবে।

মতি—আমি বলি: সমিতির গঠন বা পত্রিকা প্রচারে হাত দেওয়ার আগে বোরকার প্রতি সমগ্র দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে খুব সহসা একদিন—'অল্ বাংলাদেশ বোরকা দিবস' পালন করা হোক।

মনি ও মহি—ঠিক বলেছ ভাই, ঠিক বলেছ।

মতি—সেইদিন প্রসেশন্ করে সমস্ত বড় বড় রাস্তা ঘুরে 'জয় বোরকা মা-ই কি জয়' প্রচার করাতে হবে। সন্ধ্যায় পল্টন মাঠে সব মিছিল একত্রিত হয়ে বোরকা Hoisting Ceremony করে' সকলকে বোরকা ব্যবহারের শপথ গ্রহণ করাতে হবে; আর ঘোষণা করতে হবে: জনসাধারণের আদর্শ হোক গান্ধীর চরকা নয় বরং বোরকা।

মনি ও মহি—আলবৎ।

মনি—(আপন মনে) বাংলার বোরকা, চিজ্ ঘরকা, ধন্য হউক, ধন্য হউক।

মহি—(ঘড়ির দিকে চেয়ে') উঠে পড়, এসেই সব ঠিক করা যাবে। আফিসের মাত্র পনর মিনিট বাকী।

(তিন বন্ধু কাপড় পরার জন্য ভিতরে প্রবেশ করল।)

(তখন তিন বৌ একসঙ্গে বারান্দায় এসে আলাপ শুরু করলে।)

মনির বৌ—ঠাট্টা বিদ্রূপ ত আর সহ্য হয় না ভাই।

মতির বৌ—সেদিন দারগার বৌ ত শুনে হাস্‌তে হাস্‌তে ফীট্ হওয়ার উপক্রম।

মনির বৌ—এত করে' বলি: আমরা ত মেয়ে মহলে আর মুখ দেখাতে পারি না; তা কিছুতেই শুন্‌বে না। আরও বলে কি, ভালো কাজ করতে গেলে পৃথিবীতে ঐ রকম বহু ঠাট্টা বিদ্রূপ সহ্য করতেই হয়।

মতির বৌ—ভাই, আমার আর কিছুতেই সহ্য হচ্ছে না। সেদিন হেড ক্লার্কের বাড়ী যাচ্ছি, রাস্তার সব ছেলেমেয়েরা আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে চেঁচাতে লাগল: বোরকাওয়ালার বৌ, বোরকাওয়ালার বৌ।

মনির বৌ—আমি ত কারও বাড়ী যাওয়া ছেড়েই দিয়েছি।

মতির বৌ—পথে, ঘাটে, রাস্তায়, আফিসে সব খানেই লোকের হাসাহাসি ঠাট্টা বিদ্রূপ—তবুও মিন্‌ষেগুলির আক্কেল হয় না।

মহির বৌ—(কি একটা চিন্তা করে নিয়ে) আমি এক বুদ্ধি ঠাউরেছি। পার্‌বি তা করতে? পারলে কিন্তু এই লজ্জা থেকে বাঁচা যেতে পারে।

মতির বৌ ও মনির বৌ—কি, কি, খুলেই বল্ না। পারব, খুব পারব।

মতির বৌ—কেন পারব না? তোমাদের বলিনি, আমি ত মনে মনে দড়ী কল্‌সী বাঁধবার সঙ্কল্প করেছিলাম। কাজেই, যতই দুরূহ হোক পারব।

মহির বৌ—চল তবে, ভিতরে আয়।

(তিন বৌ-এর ভিতরে প্রবেশ। সঙ্গে সঙ্গে তিন বন্ধু বাইরে এসে হুক্ থেকে বোরকা নিয়ে পরে' বের হচ্ছে, তখন পিছন থেকে তিন বৌ ধীরে ধীরে তিনটে জ্বলন্ত চেলা কাঠ নিয়ে এসে বোরকায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে চুপে চুপে ভিতরে সরে পড়ল। আগুন ধরে উঠ্‌তেই তিন বন্ধু চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—)

তিন বন্ধু—আগুন, আগুন, (লাফালাফি) শীগ্‌গির শীগ্‌গির জল, জল, পানি, পানি।

(তিন বৌ তিন কলস জল নিয়ে ঢুকলে।)

তিন বৌ—হায়, হায়, আগুন লাগল কি করে? জল, জল, পানি, পানি।

তিন বন্ধু—(লাফালাফি আর বোরকা নিয়ে টানাটানি করতে করতে) শীগ্‌গির জল ঢালো, শীগ্‌গির।

তিন বৌ—বোরকা আর পরবে না বলো। না হয় জল ঢালবো না।

তিন বন্ধু—আর পরব না, পরব না। তোমাদের মাথা খাই, আর কখনো পরব না, পরব না।

(তিন বৌ তিন বন্ধুর মাথার উপর তিন কলস জল ঢেলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা পতন।)

—যবনিকা—

প্রগতি

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(স্থান--বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্রগ্রেসিভ মেস'। সময়--রবিবারের বিকাল। জাফর --পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের যুবক; এম. এ. আর ল'এর ছাত্র; মোটা সোটা আরাম-আয়েশী চেহারা, পরিশ্রমের কোন চিহ্ন শরীরের কোথাও নেই; বাটারফলাই গোঁফ জোড়া বেশ সযত্নে ছাটা; ডোরা কাটা পায়জামা, আর ঐ কাপড়ের কোট প্যাটার্নের শার্ট পরনে; বাঁ হাতে সিগারেট; ডান হাতে সংবাদপত্রের একধার তুলে অন্যমনস্কভাবে একবার সংবাদপত্রের দিকে, একধার দরজার দিকে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় তাকাচ্ছে। একটি বালক-চাকর এক এক ক'রে খান কয়েক চেয়ার রেখে যাচ্ছে। শেষ চেয়ার রেখে চাকর বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাফর দরজার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল:)

জাফর--(উঠে বস্‌তে বস্‌তে) আরে এস, এস।

(মনির, ওয়াহেদ, জলিল এবং আরো চার পাঁচজন মেসের ছেলে ঢুকে কেউ কেউ চেয়ারে কেউ কেউ বা জাফরের বিছানার উপর বসে পড়ল।)

মনির—(ঢোকা মাত্রই) কি হে, 'প্রগতি সঙ্গ' আবার কবে থেকে হ'ল? অত বড় দুর্ঘটনা আমাদের অজ্ঞাতেই ঘটে গেল?

জাফর—আজকেই হবে। সে জন্যেই ত তোমাদের ডাকা হ'ল।

মনির—রাম না হতেই রামায়ণ!

ওয়াহেদ--তবে যে 'ফাউণ্ডার প্রেসিডেণ্ট' বলে নোটিশে সই মেরেছ? কে তোমায় প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত করেছে শুনি?

জাফর--নির্বাচন পরে হবে। এখন কাজ চালাবার, মিটিং ইত্যাদি ডাকবার লোক চাই ত একজন!

মনির—তা হ'লে বলো, তুমি নিজেই নিজেকে নির্বাচন করে নিয়েছ!

ওয়াহেদ—তাই যদি হয় তা' হ'লে শিগ্‌গীর চায়ের অর্ডার দাও। নইলে এক্ষুণি আমরা তোমার বিরুদ্ধে 'নো-কন্‌ফিডেন্স' পাশ করাবো বলে দিচ্ছি।

উপস্থিত সবাই সমস্বরে—আলবৎ, আলবৎ, প্রাণের কথা বলেছ ভাই। প্রাণের কথা বলেছ।

জাফর—(কিছুটা বিরক্তভাবে) এখন ও-সব কথা থাক্ না, বাপু। ঘাবড়াও কেন, চায়ের অর্ডার হবেই। ততক্ষণ না হয় যে জন্য ডেকেছি তারি জবাব দাও।

মনির—এই ত চাই, ফাউণ্ডার-প্রেসিডেণ্টের উপযুক্ত কথা। তা হ'লে আমাদের আর কিছুমাত্র আপত্তি নেই। এবার স্বচ্ছন্দে বলে যাও তোমার বক্তব্য।

জাফর—(বেশ গম্ভীরভাবে) বলি, তোমরা কি সব মড়ার মতো চুপ করে থাকবে?

সিকান্দর—তোমার একজনের চীৎকারেই মেসে তিষ্ঠানো দায় হয়ে পড়েছে। তার উপর আমরাও সবাই মিলে যদি চীৎকার করতে থাকি, তা হলে এই বাড়ী যে পাগলা-গারদ হয়ে উঠবে।

জাফর—(সিকান্দরের টিপ্পনীতে কান না দিয়ে) ঘরবাড়ী ছেড়ে', এই দূর প্রবাসে টাকা-পয়সা খরচ ক'রে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এত সব যে কৃচ্ছ্রসাধনা, এ-সবের একমাত্র লক্ষ্য ত সংসারে বড় হওয়া। সেই বড় হওয়ার একমাত্র উপায়, একমাত্র 'সিসেম্ খোল্' ঐ—(বলে', তর্জ্জনী দ্বারা দেয়ালে টাঙানো কাঁচে-বাঁধানো এমিয়েলের দুই ছত্র লেখার প্রতি ইঙ্গিত করলে।)

শোন জাফর—শয়নে-স্বপনে, নিদ্রায়-জাগরণে মনে রাখতে হবে: আমাদের বড় হতে হবে। ভুললে চলবে না: বড় না হলে আমরা ছোট হয়ে পড়ব। বড় হ'তে হলে প্রগতিশীল হতে হবে, নিজের ঢাক নিজেকে পিটাতে হবে। শুধু 'মটো' মুখস্থ করলে কী ফল হবে? ঐ লেখানুযায়ী কাজ করতে হ'বে; কাজ করলেই ত বড় হতে পারবে।

মনির—বেশ ভালো কথা, কী করলে সহজে বড় হওয়া যাবে তাই বলো? কোনো শর্ট কাটের সন্ধান পেয়ে থাক ত' বলে দাও। তবে বলে রাখছি, ডার্বির টিকেট আর কিনব না। তোমার পাল্লায় পড়ে এবার শুদ্ধ পাঁচবার।

জাফর—আরে, ডার্বি টার্বি চুলোয় দাও। বড় বাজারের ক্রোড়পতি মাড়ওয়ারীকে কয়জনে চেনে, পান্নালাল আর ওয়াসেল মোল্লার নাম ত বিজ্ঞাপন পড়ুয়াদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মনে রেখ, চুপ করে থাকার দিন গত হয়েছে। আজকের দুনিয়ায় যে যত চেঁচাতে পারবে সেই তত বড় হবে।

মনির—তা হ'লে চল আমরা সকলে মিলে চেঁচাই—।

(বলতে না বলতেই জাফর ছাড়া ঘরের আর সবাই)—এ এ এ এঁ, ও ও ও ওঁ, অ আ আ আঁ—(বলে চেঁচিয়ে উঠল।)

জাফর—দূর পাগল সব! ও করে কী হয়? সঙ্ঘবদ্ধভাবে চেঁচাতে হবে।

মনির—তবে সবাই মিলে বলো থ্রি চিয়ার্স ফর আস্ (us) হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে। (সকলে সমস্বরে বার তিনেক হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে দিলে।)

জাফর—তোমাদের আস্ (us) দূর থেকে লোকে শুনবে এস্ (ass), তা'রা মনে করবে যত সব ass-রাই থ্রি চিয়ার্স ফর গাধা বলে চেঁচাচ্ছে। তার চেয়ে বরং বলো—থ্রি চিয়ার্স ফর প্রগতি সঙ্ঘ।

(সকলে সমস্বরে বার-কয়েক তাই কতক্ষণ চেঁচালে। উৎসাহের চোটে কেউ কেউ চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে পড়েছিল, এবার চেয়ার থেকে তা'রা নেমে বসল।)

মনির—(ধপ্ করে নেমে জাফরের বিছানার উপর বসে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে) খুব যে চেঁচিয়েছি এখন তা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারবে না। এখন বলো কতটুকু বড় আমরা হলাম, আর কতদূর প্রগ্রেস-ই বা করতে পারলাম।

জাফর—(বেশ জোর গলায়) নিজেদের ঘরের কোণায় বসে ষাঁড়ের মতো চেঁচালে এতটুকু বড়ও হতে পারবে না এবং হতে হবে না। এক

কানাকড়িও লাভ। সব কিছু আইনানুগতভাবে, নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে, আনুষ্ঠানিকভাবে করতে হবে। সঙ্ঘ করতে হবে, সভা ডাক্‌তে হবে, বক্তৃতা দিতে হবে। আর সে-সব বক্তৃতা ও সভার বিবরণ কাগজে কাগজে ছাপাতে হবে। তারপর দেখ্‌বে (বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গে) অল্প দিনের মধ্যে আমাদের কেউ কেউ হয়ত অল্ বেঙ্গল, আর কেউ কেউ অল্ এশিয়ায় পৌঁছে গেছি। বাইরে রিপোর্ট পাঠাবার ও ছাপাবার ব্যবস্থা করতে পারলে, চাই কি, কন্টিনেণ্টেও নাম পড়ে যাবে।

ওয়াহেদ—অত কথায় মাথা ঘামাবার আমাদের সময়ও নেই, অবসরও নেই। চায়ের যখন অর্ডার হয়ে গেছে, তখন তোমার সব প্রস্তাবেই আমরা রাজী। কি বল হে তোমরা?

(সকলে সমস্বরে)—হাঁ হাঁ, আসল ত চা, চা। (একজন) সঙ্গে কেক্‌ও চাই কিন্তু। (আর একজন) পান সিগারেট বাদ গেলেও চল্‌বে না।

মনির—(জাফরকে) এখন তোমার কি প্রস্তাব তাই পেশ করো দেখি শুনি।

জাফর—(গম্ভীরভাবে) আমি প্রস্তাব করি: ওয়াহেদকে ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ও মনিরকে সেক্রেটারী, বাদ বাকী মেসের সবাইকে সভ্য করে 'প্রগতি সংঘ' নামে এক সংঘ প্রতিষ্ঠা করা হউক।

সিকান্দর—(জাফর শেষ না করতেই) আমি তার সঙ্গে যোগ করতে চাই মিঃ জাফর হোসেন এই সংঘের ফাউণ্ডার-প্রেসিডেণ্ট হউক।

সকলে—(সমস্বরে) আলবৎ, আলবৎ। সে ত বলাই বাহুল্য। তা কি আর বল্‌তে হয়। (একজন) আগে চা'টা আসুক না। পরে জাফর betray করবে না ত? (আর একজন) Veto-power ত আমাদের হাতেই রইল। (আর একজন) No-confidence ত যখন তখন দেওয়া যেতে পারে।

জাফর—(অধিকতর গম্ভীরভাবে) আপনাদের (Inspired মুহূর্তে জাফর সকলকে 'আপনি' বলে) সম্মিলিত ইচ্ছাকে অবহেলা করার শক্তি

বা সাহস আমার নেই। আমি নত মস্তকে আপনাদের আদেশ শিরোধার্য্য করছি। তা'হলে এই প্রস্তাবে কারোই কোনো আপত্তি নেই?

সকলে—না, না। নো আপত্তি, নো আপত্তি।

একজন—চা'টা ত' এখনো এলো না!

জাফর—এক্ষুণি আসবে, ভাই। (জোর গলায়) তা হ'লে সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল।

সকলে—পাশ, পাশ, পাশ!

কেউ কেউ—ফাঁস, ফাঁস, ফাঁস।

হালিম—(শুধু সদস্যপদে সে খুশী হয়নি) আচ্ছা, সংঘ করে অত সব হাঙ্গামে কী লাভ? বড় হওয়াই যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, আগে প্রমাণ করো আমরা ছোট কিসে? বড়লোকের কোন্ লক্ষণটা আমাদের ভিতরে নেই? বেলা আটটার আগে আমরা কেউ ঘুম থেকে উঠি? উঠি না। ডিস্‌পেপ্‌সিয়া আমাদের সকলেরই তো আছে! ব্লাড-প্রেসার তো এরই মধ্যে কারও কারও দেখা দিয়েছে। ভুড়িও...।

জাফর—(হালিমের কথা শেষ না হতেই) আমরা শুধু বড় হতে চাই না বিখ্যাত হ'তেও চাই।

হালিম—তা হ'লে টাকা দুই খরচ ক'রে, বড় বড় হরপে "বিখ্যাত প্রগ্রেসিভ জাফর এণ্ড কোং" ছাপিয়ে শহরের রাস্তায় রাস্তায় বিলি করলেই তো পার।

জাফর—শুধু হ্যাণ্ডবিল পড়ে লোকে বিশ্বাস করবে কেন? সে সব করার আগে রীতিমত একটা সংঘ চাই, বক্তৃতা চাই, তার প্রোগ্রাম চাই, সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো একটা আদর্শও চাই—।

হালিম—(উঠে পড়ে) তোমাদের এ সব সংঘ-টংঘে আমার কিছুমাত্র বিশ্বাস নেই। আমি তোমাদের সদস্যপদ ত্যাগ করলাম এবং প্রতিবাদস্বরূপ আমি 'ওয়াক্ আউট' করছি। (বলে সে বেরিয়ে গেল।)

ওয়াহেদ—(রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে) "বড় হওয়ার পথের দুঃখ এখন হতেই শুরু হ'ল।"

জাফর—কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না। এই সামান্য আঘাতে দম্‌লে চলবে না।

মনির—আচ্ছা, সঙ্ঘের আদর্শ কি হবে, তা ত' বলনি।

জাফর—(মাথা চুলকিয়ে, ঢোক গিলে) আমাদের আদর্শ হবে, এক কথায়, আগে চল্‌, আগে চল্‌।......

করিম—জাফর, ভুলে যাচ্ছ, পৃথিবীটা গোল। আগে চলার কোন মানেই হয় না। যে-দিকেই চলা আরম্ভ কর না কেন, শেষমেষ ঘুরে একই জায়গায় ফিরে আসতেই হবে। এই গোলাকার পৃথিবীতে আগ্ পিছ্ কিছু নেই।

জাফর—দেখ, তোমার মতো স্থূলবুদ্ধি লোক নিয়ে প্রগতি-আন্দোলন হয় না। আমরা প্রগ্রেসিভ হতে চাচ্ছি আইডিয়ায়, ভাবে, মতামতে।

মনির—আইডিয়া ও মতামতে আমরা কার চেয়ে অনগ্রসর, জিজ্ঞেস্ করি ?

ওয়াহেদ—কোনো সংস্কার আমাদের নেই, কারও মতামতের ধার আমরা ধারি না, খাদ্যাখাদ্য বিচার করি না, তবু আমাদেরে অনগ্রসর বলতে চাও ?

জাফর—আমি বল্‌তে চাই না। কিন্তু আমরা যে প্রগতিশীল এ কথা পৃথিবীকে জানাতে হবে তো ? আর জানাতে হলে আগে একটা সঙ্ঘ চাই, সঙ্ঘের একটা মুখপত্র চাই। আপাতত সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি না হলে অথবা কিছু মোটা চাঁদা পাওয়া না গেলে মুখপত্র হতে পারে না। কিন্তু সঙ্ঘ হতে তো কোনো বাধা নেই।

মনির—সঙ্ঘ হলেই তার একটা উদ্দেশ্য চাই ত? উদ্দেশ্যটা একটু অভিনব ও নূতন হওয়া চাই। তা হলে সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে।

ওয়াহেদ—মুশকিল এই যে, পৃথিবীতে এত সঙ্ঘ, এত সভা-সমিতি ও প্রতিষ্ঠান হয়ে পড়েছে যে কোনো নূতন আদর্শ খুঁজে বের করাই দুষ্কর।

সিকান্দর—নূতন কোনো জুৎসই আদর্শ না পাওয়া যায় ত ফরাসী-বিপ্লবের আদর্শটাই না হয় আমরা নিই না কেন? তা পুরোনো হলেও তার প্রতি এখনো মানুষের যথেষ্ট মোহ আছে। কাজেই ওতে আমাদের সঙ্ঘের সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধিরও একটা ভালো উপায় হবে।

জাফর—অগত্যা মন্দের ভালো হিসেবে তাই না হয় নে'য়া যাক।

মনির—কোন্‌টা? সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার কথাই বলছ তো?

সিকান্দর—হাঁ।

মনির—বেশ! কিন্তু জেলে যেতে কে কে রাজি আছ, আগে শুনি?

জাফর—(চক্ষু ছানা-বড়া ক'রে) কেন?

মনির—কেন? সাম্য প্রচার করলে তুমি যে সাম্যবাদী, কর্তৃপক্ষের এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহই থাকবে না, ফলে জেলে না গেলেও চাকরীর আশা ত্যাগ করতেই হবে। আর স্বাধীনতার কথা বলতে গেলে কালাপানি যে পার হতে হ'বে, এ ত' জানা কথাই। এই সবে যদি রাজি থাকো, বেশ স্বচ্ছন্দে সাম্যও করতে পারো, স্বাধীনতাও জপতে পারো, কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু আগেই বলে রাখছিঃ আমার দ্বারা এই সব হবে টবে না।

প্রায় সকলে—ঠিক কথা। এ আমরাও পারবো না। ওতে আমাদেরও সম্মতি নেই। পুলিশের হাঙ্গামে কে পড়তে যাবে, বাবা!

জাফর—আচ্ছা, মৈত্রীতে ত কোনো আপত্তি হতে পারে না।

মনির—না, উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে ঐটিই একমাত্র নিরীহ, নির্দ্দোষও নিরাপদ। সহজ ভাষায় যাকে বলে innocent।

জাফর—তা হ'লে সাম্য ও স্বাধীনতাকে বাদ দিয়ে আমরা শুধু মৈত্রীকে আমাদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করি না কেন? মৈত্রীর পথেই চল আমরা অগ্রসর হই। পৃথিবীব্যাপী দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যে মারামারি ও ঝগড়া-কোন্দল চল্‌ছে তাতে এই আদর্শ হয়ত অনেকেরই মনঃপূত হবে। আশা করি, এই আদর্শ গ্রহণ সম্বন্ধে উপস্থিত কারো কোনো আপত্তি নেই?

সকলে—না, না। নো-আপত্তি।

জলিল—চা না আসা পর্য্যন্ত আমার আপত্তি (জলিলের কথা শেষ না হতেই ট্রে হস্তে বয়ের প্রবেশ। সকলে ফের সমস্বরে—) পাশ, পাশ, নো আপত্তি, নো আপত্তি। (বলে টেবিল, কেউ কেউ বা পার্শ্ববর্ত্তীর পিঠ চাপড়াতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(সময়ের ছেদ বোঝাবার জন্য মাঝখানে গান বা নৃত্যগীতের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।)

(সপ্তাহ দুই পরে। প্রগতি-সঙ্ঘের কর্ম্ম-সংসদের সভা, অর্থাৎ প্রগ্রেসিভ মেসের প্রায় সভ্যই জাফরের ঘরে উপস্থিত।)

জাফর—দেখ, কাল থেকে কিন্তু আমাদের সঙ্ঘ সম্বন্ধে আমাকে এক নূতন ভাবনায় ধরেছে। আমরা এই দুই সপ্তাহে দু'দুটা সাধারণ সভা করলাম; স্বীকার করতেই হবে আমাদের কোনো সভাই সফল হয়নি।

সিকান্দর—অর্থাৎ ঐ দুই সভায় আমরাই বক্তা, আমরাই শ্রোতা ছিলাম।

জাফর—ভেবে ভেবে শ্রোতার অভাবের কারণও আমি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি। আমার মনে হয়, শুধু সভ্যের দ্বারা কোনো সঙ্ঘই কৃতকার্য্য হতে পারে না। কিছু সংখ্যক সভ্যাও চাই। যে সব বড় বড় প্রতিষ্ঠান আমরা দেখছি, তা শুধু সভ্য সংখ্যার দ্বারা গড়ে ওঠেনি, সভ্যাদের উপস্থিতিও তার মূলে চুম্বকের কাজ করেছে।

মনির—কথাটার পেছনে যুক্তি যেমন আছে, ঐতিহাসিক সত্যও আছে, স্বীকার করি। তবে আমরা মেয়ে-সভ্য কোথায় পাবো?

জাফর—আচ্ছা, যে সব মেয়ে পাশ টাশ করে বেরুচ্ছে, তাদের কয়েকজনকে একবার অনুরোধ ক'রে দেখলে কেমন হয়? না হয় বলব—আপনারা সভায় রীতিমত না আসুন, অন্তত আপনাদের নামে আমরা যেন আমাদের সঙ্ঘের বিজ্ঞাপন দিতে পারি, এটুকু সম্মতি দি'ন। এইটুকু সম্মতিও যদি তাঁরা দেন, আমার মনে হয় অনেকটা কাজ হবে।

মনির—এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পত্রালাপ করার জন্য আমরা সভাপতিকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ করছি।

অনেকে—(এক সঙ্গে)—আমরা এই প্রস্তাব অনুমোদন কর্‌ছি।

জাফর—তা'হলে বলি, শুনুন। এখন বল্‌তে আপত্তি নেই। আপনাদের সম্মতি পাবো এই ভরসায় পুরোনো গেজেটে মেট্রিক, আই,এ, ও বি, এ'র রেজাল্ট দেখে অনেকগুলি মেয়ের কাছে আমি চিঠি দিয়েছিলাম। কিন্তু অনেক দুঃখের সঙ্গে বল্‌ছি, আমাদের দেশের মেয়েরা পাশ করে বটে, কিন্তু এখনো তা'রা যে ব্যাকওয়ার্ড সেই ব্যাকওড়ার্ডই আছে। তাদের ঘরকুণো স্বভাব এখনো কিছুমাত্র কমেনি, ফলে আমার চিঠির কোনো উত্তরই পাইনি। রিমাইণ্ডার পর্য্যন্ত দিয়েছি, তবুও কোনো সাড়া মেলেনি। এতে অভিভাবকদের কারসাজিও থাকতে পারে। চিঠিগুলি হয়ত মেয়েদের হাত পর্য্যন্ত পৌঁছুতেই দেয়নি; হয়ত অভিভাবকরাই মাঝ পথে গায়েব ক'রে দিয়েছেন। আমাদের দেশের অভিভাবকরা যা ভীরু ও ব্যাকওয়ার্ড!

সিকান্দর—তাঁরা মনে করেন, আমরা এক একটি রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

মনির—আর তাঁদের মেয়েরা এক একটি মেষ-শাবক।

ওয়াহেদ—ব্যাকরণ ভুল কর কেন হে। বলো শাবিকা, মেষশাবিকা। (সকলের হাস্য।)

মনির—এখন উপায়?

জাফর—Where there is a will, there is a way. উপায় আছে বৈকি। আদৎ কথা, মেয়েরা মেয়েই, তাদের কোনো বিষয়েই initiative নেই, সব কাজেই তাদের উপর জোর খাটাতে হয়। জোর করে লাগিয়ে দিতে পারলে যে কোনো কাজ মেয়েদের দিয়ে করানো যায়। তবে পরের বৌ-ঝিয়ের উপর জোর খাটাবার কোনো অধিকার ত' আমাদের নেই। তাই আমার অনুরোধ, যে সব সভ্যের মনে এই সঙ্ঘকে সফল করে তোলবার আন্তরিক আগ্রহ আছে, তাঁ'রা যেন যথাসম্ভব শীঘ্র বিয়ে করে ফেলেন এবং স্ব স্ব স্ত্রীকে এই সঙ্ঘের সভ্যা-শ্রেণীভুক্ত করেন।

ওয়াহেদ—Example is better than precept

মনির—আশা করি, সভাপতি স্বয়ং এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেখিয়ে আমাদের পথ প্রদর্শন করবেন।

সকলে—অবশ্য, অবশ্য। আলবৎ, আলবৎ। We support, we support.

জাফর—আপনাদের (Inspired মুহূর্ত্তে সে সবাইকে 'আপনি' বলে।) অনুরোধ পালন করার যথাসাধ্য চেষ্টা আমি করব। তবে আপনারাও নিশ্চেষ্ট থাকবেন না।

অনেকে (এক সঙ্গে)—আমরা নিশ্চয়ই তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করব।

জাফর—তবে এই বিষয়ে আমার আর একটি অনুরোধ, আশা করি কন্যা পসন্দের ভার আপনারা আপনাদের অভিভাবকদের উপর ছেড়ে দেবেন না। নিজের স্ত্রী নিজেই পসন্দ ক'রে ঠিক করবেন। আর দেখবেন, প্রগতি সঙ্ঘের সভ্যা হওয়ার যোগ্যতা যেন তাঁর থাকে।

অনেকে—(এক সঙ্গে) নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

মনির—বৌ হওয়ার যোগ্যতা থাক বা না থাক, প্রগতি সঙ্ঘের সভ্যা হওয়ার যোগ্যতা তাঁর থাকা চাই-ই। First & foremost condition হ'ল এই-ই।

সকলে (সমস্বরে)—তা তো বটেই, তা তো বটেই।

—যবনিকা—

তৃতীয় দৃশ্য

(যবনিকা উঠতেই দেখা যাচ্ছেঃ প্রগতি সংঘের সবাই ষ্টেজের উপর দাঁড়িয়ে কবি নজরুল ইসলামের "আগে চল্ আগে চল্" গানটি সুরে বেসুরে চেঁচিয়ে গাচ্ছে। গানের শেষ কলিতে জাফর এসে ঢুকল। টুল, চেয়ার ইত্যাদি প্রস্তুত ছিল, গান শেষ হতেই সবাই বসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে জাফর জিজ্ঞাসা করলঃ)

জাফর—কেন ডেকেছি, বলতে পারিস?

মনির—বোধ করি, চা খাওয়াবে বলেই ডেকেছ। কেমন, না?

জাফর—উহুঁ। ঠিক হয়নি।

ওয়াহেদ—তবে বোধ হয় সন্দেশ খাওয়াবে বলেই ডেকেছ। কেমন, এইবার ঠিক ত?

জাফর—নেই হুয়া। (বলে সে ডানে বাঁয়ে ঘাড় দোলাতে লাগল।)

মনির—আলবৎ হুয়া। এতদিন Thought Reading চর্চা করলাম না হয়ে যায়?

জাফর—বিয়ে করব হে, বিয়ে করব। সব ঠিক।

মনির—তা হ'লে আমাদের Thought Reading বেঠিক হ'ল কোথায়? বিয়ে মানেই ত খাওয়া, সে তোমার চা-সন্দেশই হউক, আর কোর্ম্মা-পোলাওই হউক।

ওয়াহেদ—বাড়ীর চিঠি পেয়েছিস্ বুঝি?

জাফর—(বিস্মিত কণ্ঠে) বাড়ীর চিঠি ভরসা ক'রে প্রগতি সঙ্ঘের সভাপতি বিয়ে করে? করে না।

মনির—সেই ত আমাদের সবাইর গৌরবের কথা। কিন্তু কথা হচ্ছে, তোমার যে বিয়ে, সেই কথা আজকে হঠাৎ কী ক'রে আবিষ্কার ক'রে বসলে?

জাফর—কেন? আমাদের সেদিনের সভায় কী স্থির হয়েছিল? বাঃ এরি মধ্যে ভুলে বসেছ? প্রগতি সঙ্ঘকে টিকিয়ে রাখতে হ'লে বিয়ে ক'রে হলেও সঙ্ঘের সভ্য সংগ্রহ করতে হবে।

সিকান্দর—জীবনের এত বড় একটা সমস্যা, তুমি আজ এক মুহূর্ত্তেই তা সমাধান ক'রে বসলে! তোমাকে ত' আমার মহাপুরুষ, অর্থাৎ সোজা কথায় যাকে বলে Great man, তাই মনে হচ্ছে হে।

জাফর—জীবনের যত সব মহৎ কাজ, যেমন ধরো কবিতা লেখা, অনশন করা, সন্ন্যাসী হওয়া, Masterpiece স্থষ্টি করা, সবই মুহূর্ত্তের inspirationয়েই হয়ে থাকে। Inspired মুহূর্ত্তে যারা মহৎ কাজ করতে সক্ষম তাঁদেরই ত বলা হয় মহাপুরুষ। আমিও আজ বিয়ের Inspiration অনুভব করছি, আমার শিরায় শিরায়, প্রতি অণু-পরমাণুতে।

ওয়াহেদ—তা হলে তোমারও মহাপুরুষ হতে আর বেশী বাকী নেই, দেখছি। আশা করি, এটাই তোমার জীবনের masterpiece হবে।

জাফর—সত্যিই। যে Pieceটি আনতে সঙ্কল্প করেছি, সেটা স্রষ্টার মেয়ে-সৃষ্টির মধ্যে masterpieceই বটে।

মনির—সেই masterpieceটির নাম ও পরিচয় আমরা জানতে পারি কি, হুজুর? (ব্যঙ্গমিশ্রিত স্বরে)

জাফর—কেন পারবে না? তাঁর নাম হচ্ছে (গম্ভীর ও তন্ময়ভাবে উর্দ্ধ দিকে চেয়ে) তাহেরা, তাহেরা, তাহেরা।

ওয়াহেদ—তাহেরা? ইতিপূর্বে ঐ নাম ত তোমার মুখে কোনদিন শুনিনি হে।

জাফর—জাহেদুল ইসলাম সাহেবের মেয়ে, যাঁর বাসায় থার্ড ইয়ারে মাস দুই আমি ছিলাম। মনে পড়ে?

মনির—ওঃ, সে মেয়ে ত কালো বলেছিলে যেন।

জাফর—এখনো কালোই বল্‌ছি।

ওয়াহেদ—শেষ কালে একটী কালো মেয়েই masterpieceএর সার্টিফিকেট পেয়ে গেল!

জাফর—(সুর করে) "কালো চুল সাদা হলে কাঁদো কেন তবে, কালো যদি এতই মন্দ হবে?"...হ্যাঁ. মেয়ের রূপ গুণ ও যোগ্যতা বিচারের ভার আমার উপরে। সে নিয়ে তোমাদের কিছুমাত্র মাথা ঘামাতে হবে না। মেয়েটিকে ত বিয়ে আমিই করব। অন্তত প্রগতি সঙ্ঘের মুখ চেয়ে আমাকে বিয়ে করতেই হবে।

মনির—(আর একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে) পাত্রী-পক্ষের সম্মতি পাওয়া গেছে ত?

জাফর—আমি এখনো তাঁদেরে আমার সম্মতির কথাও জানাইনি।

ওয়াহেদ—তোমার অভিভাবকরা রাজি আছেন?

জাফর—তাঁদের রাজি অ-রাজিতে আমার কি যায় আসে, শুনি?

মনির—কিছুই এসে যায় না? উত্তম। এ মাসের মনি-অর্ডারটা ফেরৎ দিয়েছ ত?

ওয়াহেদ---যাকে বলে, গাছে কাঁটাল গোঁফে তেল। মনির, একটা মৌলভী সাহেব ডেকে নিয়ে আয় না, জাফরের inspiration টা থাক্‌তে থাক্‌তেই বিয়েটা হয়ে যাক্‌। জাফর শিগ্‌গীর টাকা বের করো; হালিম গিয়ে মিষ্টি ইত্যাদি কিনে নিয়ে আসুক।

ওয়াহেদ—এ-রকম inspired হ'লে মেয়ে উপস্থিত না থাকলেও উপস্থিত আছে এ-কথা মনে করে বিয়ে করে ফেলা যায়।

মনির---সত্যিই বেশ হবে। জাফর বিয়ের জন্য যে-রকম মরিয়া হয়ে উঠেছে, নিজেকে যে-কোনো মুহূর্ত্তে বর মনে করতে তার কিছুমাত্র বেগ পেতে হবে না। জাফর, স্যুটকেশ থেকে আসকান পা'জামা বের ক'রে পরে বর সেজে বসো দিকিন! আর চোখ বন্ধ করে মনে করো তোমার সামনে কনে অর্থাৎ সেই masterpieceটী বেশ সেজে-গুজে বসে আছেন। বিয়েটা আরব্যোপন্যাসের বার্ম্মেসাইড ভোজের মতো হবে বটে, কিন্তু আমাদের ভোজটি বার্ম্মেসাইড ধরণে হলে চলবে না, সে কথা আগেই বলে রাখলাম।

মনির—এবং (বেশ জোর দিয়ে) কাল 'এসোসিয়েটেড প্রেস'কে জানিয়ে দিতে হবে: "প্রগতি দলের তরুণ নেতা অমুকের সঙ্গে আধুনিকতম আধুনিকা অমুকার শুভ-পরিণয় ক্রিয়া বিনা খরচায়, বিনা শাড়ী ও বিনা গহনায় অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই দারুণ দুর্দ্দিনে ও দারুণতম বস্ত্রসঙ্কটের দিনে ইহাই আধুনিকতম আদর্শ বিবাহ"—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

জাফর---দেখ মনির, ফাজলামি রাখ্‌। ফাজলামি করার জন্যে তোদের ডাকিনি। যদি কোনো সুপরামর্শ দিতে পারিস, ভালো, নয় ত বেরিয়ে যা। আমার বিয়ে আমি একাই করতে পারব; বিয়ের ব্যাপারে আমি কারো তোয়াক্কা রাখি না।

ওয়াহেদ---(কপট গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে তর্জ্জন ক'রে উঠল) মনির তুই থাম্‌। বিয়ে ইত্যাদি serious ব্যাপার তুই কি বুঝিস্‌ যে, অনর্থক বক্‌ বক্‌ করছিস্‌! তোর বড় ভাই এখনো বিয়ে করেনি, তোর শ্বশুর বিয়ে করেছে কিনা সন্দেহ, আর তুই আসিস্‌ জাফরকে বিয়ে সম্বন্ধে পরামর্শ দিতে! আর আমি? ছাত্র জীবন শেষ না হতেই এক বৌ

সাবাড় করে আর এক বৌ-এ পা দিয়েছি। বিয়ে সম্বন্ধে মতামত দিতে হয়, অর্থাৎ যাকে বলে expert opinion, তা একমাত্র আমিই দিতে পারি। কি বলিস জাফর?

জাফর—(শার্টের বুক পকেট থেকে একখানি কাগজ বের করে) ফাজলামী রেখে মনোযোগ দিয়ে সবাই শোন দিকিন্ একবার, চিঠিখানা কেমন হ'ল।

ওয়াহেদ—কা'কে লিখছ? একেবারে masterpiece-টিকেই নাকি?

জাফর—না। ভাবী শ্বশুরকে একবার আগে এত্তেলা দিয়ে দেখি না। প্রয়োজন হ'লে বিবি মজকুরাকে না হয় পরে লিখব।

মনির—সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না হে, সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না।

জাফর—দেখাই যাক না। আঙুল ত আমার নিজের, বাঁকা করতে আর কতক্ষণ। শোন (কাগজখানা খুলে নিয়ে সে এবার পড়তে আরম্ভ করল)

সবিনয় নিবেদনঃ

বিশেষ প্রয়োজনে...

মনির—ভাবী শ্বশুরকে "সবিনয় নিবেদন!" শ্রদ্ধাষ্পদেষু না, বখেদমতেষু না, লক্ষ লক্ষ সালাম না, কোটি কোটি কদমবুচী না! তোমার কপালে এই বৌ যদি জোটে, আমার নাম বদলে রাখব।

মমতাজ—বৌ যদি না জোটে, বৌএর হাতের সম্মার্জনী ত জুটতে পারে জাফরের কপালে।

ওয়াহেদ—তোমরা চুপ করো। শোনাই যাক না, সে কি লিখেছে। পরে না হয় মতামত ঝাড়বে। পড়ে যাও দেখি জাফর।

জাফর—সম্প্রতি আমার ধারণা হয়েছে যে, বলাবাহুল্য, বিশেষ বিবেচনার পর আমি এই ধারণায় উপনীত হয়েছি—আপনার কন্যা তাহেরার সঙ্গে আমার বিয়ে হলে আমাদের উভয়ের জীবন বিশেষ সুখের

হবে। তাহেরার জন্য বিত্তশালী বরের অভাব হবে না জানি; কিন্তু আপনি জানেন বিত্তের কিছুটা অভাব আমার থাক্‌লেও চিত্তের অভাব আমার নেই। আর এ তো জানা কথা, দাম্পত্য সম্পর্ক মধুর করতে বিত্তের চেয়ে চিত্তেরই বেশী প্রয়োজন। তাহেরাকে আমি শুধু ভালবাসি না, তার বুদ্ধি ও স্বভাবকে আমি শ্রদ্ধাও করি। কাজেই ভ্রমরধর্ম্মী বিত্তশালী স্বামীর চেয়ে আমার মতো চিত্তধর্ম্মী স্বামীই কি অধিকতর কাম্য নয়?

আমার গুণাগুণ ও যোগ্যতা সম্বন্ধে এখন এইটুকু জানালেই হয়ত চল্‌বে..

মনির—অর্থাৎ, As regards my qualification & fitness for the job.

জাফর— E. B. C. S. দিচ্ছি, ডেপুটি ত হবই। আর, হাতের পাঁচ 'ল' ত আছেই। বিয়ের সফলতার জন্যে স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক উপযোগিতাই যে সব চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় এ কথা বলাই বাহুল্য; আমার দৈহিক উপযোগিতার প্রমাণ স্বরূপ, ই, বি, এস্-এর জন্যে যে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট নিয়েছিলাম তার একটি ট্রু কপি এ সঙ্গে পাঠালাম। উক্ত পরীক্ষার প্রয়োজনেই আমার ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল ও দু'জন গেজেটেড অফিসারের কাছ থেকে চরিত্র-সার্টিফিকেট ও নিয়েছিলাম, তারও কপি এই সঙ্গে পাঠালাম। জনহিতকর ও গঠনমূলক কাজের যোগ্যতার প্রমাণ স্বরূপ বলতে পারি: বলা বাহুল্য, গার্হস্থ্য ও পারিবারিক জীবন ও জনহিতকর ও গঠনমূলক কাজেরই অন্তর্গত;......

মনির—অর্থাৎ, As regards my public activity & organizing capacity.

জাফর—আমি নিখিল বাংলাদেশ প্রগতি সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি, অল্ বাংলাদেশ ব্যয়বিহীন বিবাহ-সমিতির ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট।

আপনি নিশ্চয়ই তাহেরার হিতাকাঙ্খী। তাই আপনাকে আমার শেষ অনুরোধ, তাহেরার বিবাহিত জীবন সুখ শান্তিময় হউক এ যদি আপনি কামনা করেন—পিতা হয়ে এ কামনা যে কেন করবেন না তাও ত বুঝতে পারছি না, তা হ'লে যে তাকে ভালবাসে তার হাতে তাকে সমর্পণ ক'রে তাকে সুখী হওয়ার সুযোগ দিন।

পুনশ্চঃ—আশা করি চিঠিখানি তাহেরাকে দেখাবেন। তাই তাকে আমি স্বতন্ত্র চিঠি লিখলাম না। ইতি, বিনীত—

(সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে) বলো এখন কেমন লাগল তোমাদের?

ওয়াহেদ—(অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠে) নিখুঁত ও অনবদ্য! যে কোনো প্রথম শ্রেণীর মাসিকে স্থান পাওয়ার যোগ্য।

ওয়াহেদ—একমাত্র আধুনিক গল্পের আধুনিক নায়করাই এ-রকম চিঠি লিখতে পারে।

মনির—চিঠিখানি কি মাসিকে পাঠাবে ব'লেই লিখেছ, না, সত্যি সত্যিই মেয়ের বাবাকে পাঠাচ্ছো?

জাফর—বিয়ে টিয়ে ইত্যাদি জটিল ব্যাপার নিয়ে কারও সঙ্গে ফাজলামী করার প্রবৃত্তি আমার নেই—ঐ স্বভাবই আমার নয়। (এই বলে পকেট থেকে খাম বের ক'রে তার উপর জাহেদুল ইস্‌লাম সাহেবের নাম ও ঠিকানা লিখে চিঠিখানা পুরে খাম বন্ধ করে' দিলে।)

ওয়াহেদ—তুমি দেখছি একটা কেলেঙ্কারী না করে ছাড়বে না!

জাফর—বাঃ। কেলেঙ্কারী তুমি কোথায় দেখলে?

ওয়াহেদ—বিয়ে করা যদি তোমার এতই সখ হয়ে থাকে, আর ঐ মেয়েই যদি তোমার একান্ত কাম্য হয়, এ-রকম পাগলামি না করে' তোমার মা বাবাকে লিখলেই ত পারো। মেয়ের বাবা ত শুনেছি তোমার বাবার পরিচিত ও বন্ধু।

জাফর—(উত্তেজিত কণ্ঠে) তোমরা একটা যা-ইচ্ছে-তা, কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞানের বালাই যদি তোমাদের থাকত? এতদিন ধরে এত progressive movement করলাম, 'প্রগ্রেসিভ' বলে 'আধুনিক' বলে 'মডার্ণ' বলে কত কী-ই না আমরা দাবী করে থাকি—আর বিয়ের সময় পুর্নমুষিকো ভব। মামুলী ধরণে সেই পিতামাতার মুখের দিকে হা করে তাকিয়ে থাকবো, তৃতীয় পক্ষের মারফৎ তাঁদেরে আমার মৎলব জানাবো, পিতা হয়ত শুনে গোড়াতেই 'না' করে দেবেন, অথবা কন্যাপক্ষের দুয়ারে করযোড়ে দাঁড়াবেন, তাঁরা হয়ত হাজার কয়েক টাকার

অলঙ্কার ও ততোধিক টাকার কাবিন চেয়ে বসবেন—শুনে হয়ত পিতা ম্লান মুখে বাড়ী ফিরে আসবেন! নতুবা দীর্ঘকালব্যাপী দর-কষাকষি চল্‌বে। ভাগ্যে শিকে ছিঁড়লে ছিঁড়তেও পারে, না ছিঁড়লে না ছিঁড়তেও পারে। বাবাকে বল্লে এই ত হবে! চিরকাল ধরে এই ত হয়ে এসেছে। মেয়েকে যে আমি ভালবাসি তাকে যে আমি বিয়ে করতে চাই, এ খবর হয়ত মেয়ের কান পর্য্যন্ত পৌঁছলই না—বাইরে থেকেই পত্রপাঠ বিদায়। যারা প্রগ্রেসিভ্ ও আধুনিক বলে দাবী করে, তা'রা অন্তত এ-রকম হৃদয়হীন ব্যাপার কিছুতেই সমর্থন করতে পারে না। যাকে বিয়ে করার সঙ্কল্প করেছি, তাকে পাবার শেষ চেষ্টা না দেখে আমি অন্তত ফিরব না—অতখানি coward, অতখানি ভীরু আমি নই। এখনো বোধ হয় ডাক নিয়ে যায় নি—চিঠিটা দিয়ে আসি। (দ্রুত প্রস্থান। সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা।)

দ্বিতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

(জাফরের ঘর। পাশের ঘর মনিরের। জাফর উচ্চরবে মনিরকে ডাক দিলে।)

জাফর—মনির, মনির।

মনির—(ব্যঙ্গস্বরে) জি হুজুর।

জাফর—শিগ্‌গীর শুনে যা।

(মনির একগালে সাবান আর এক গালে অর্ধশেভ্ করা অবস্থায় ক্ষুর হাতে আবির্ভূত হতেই—)

জাফর—দেখ্, তোরা যা-ই বলিস্, আমি কিন্তু রাজনীতি থেকে গার্হস্থ্য নীতি পর্য্যন্ত কোথাও 'আবেদন আর নিবেদনে' বিশ্বাস করি না।

মনির—আবার কোথায় আবেদন পাঠালে?

জাফর—সেই যে সেদিন আমার ভাবী শ্বশুর সাহেবের কাছে পাঠিয়েছিলাম।

মনির—উত্তরে দু'খানা ছেঁড়া জুতো খামে ভরে পাঠিয়ে দেয়নি ত!

জাফর—তিনি মনে করেছেন: আমি নাবালক, একেবারে খোকাটী, পিঠে হাত বুলিয়েই তিনি আমাকে বিদায় ক'রে দেবেন।

মনির—অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দাও যে, তিনি তোমার নামে মানহানির মোকদ্দমা করেননি।

জাফর—দেখ্, আমি চিরদিন সব ব্যাপারে বামপন্থী; যাকে বলে leftwinger.

মনির—(ক্ষুর চালাতে চালাতেই আলাপ চলছে) বামপন্থী তোমাকে কে বল্‌বে? বামাপন্থী বল্লে বরং ঠিক হয়!

জাফর—শুধু ভদ্রলোকের তথাকথিত ইজ্জতের খাতিরেই আমি তাহেরাকে না লিখে তাঁকে লিখেছিলাম। নয় তো আমার বিয়েতে যেমন আমার পিতা-মাতার মতামতের কোনো মূল্য নেই, তেমনি আমি জানি তাহেরার বিয়েতে তার পিতামাতার মতামতেরও এক কানাকড়ি দাম নেই।

মনির—ভদ্র মহিলার সম্মতির বয়েস হয়েছে ত? নয় তো বিপদে পড়বে।

জাফর—তা ঠিক আছে, অত কাঁচা ছেলে পেয়েছ আমাকে? ঐ ত আমার হাতে যাকে বলে ব্রহ্মাস্ত্র।

মনির—জাহেদ সাহেব কোন উত্তর দিয়েছেন?

জাফর—ভদ্রলোক তাঁর বিশ লাইনের চিঠিখানিতে অন্তত দশবার আমাকে 'বাবা' সম্বোধন করেছেন। তাঁর 'বাবা' পড়তে পড়তে আমার মনে হচ্ছিল তিনি যেন ভয়ে হাম্বা হাম্বা করছেন। আমার মা বাবা ভাই বোন চৌদ্দ পুরষকে জানিয়েছেন তাঁর সালাম, দোওয়া, আশীর্ব্বাদ, অর্থাৎ ঐ ধরণের অবান্তর যত কিছু হতে পারে। লিখেছি বি. সি. এস্. দিচ্ছি, তবুও পড়াশোনার উপদেশ দিয়েছেন; মেডিক্যাল রিপোর্টের কপি দিয়েছি, তবুও জিজ্ঞাসা করেছেন: কেমন আছি। মোট কথা, আগাগোড়াই beating about the bush. সব চেয়ে হাস্যাস্পদ কথা লিখেছেন, তাঁর মেয়ে নাকি আমাকে বড় ভাইয়ের মতো ভক্তি করে—কথাটা পড়ে এক চোট একা একাই হেসেছি। চৌদ্দপুরুষ ধরে দুই পরিবার কোনদিন এক ঘাটের পানি খাইনি; চার বছর ধরে তাহেরার সঙ্গে চাক্ষুষ দেখা নেই; আজ 'হঠাৎ একি শুনি মন্থরার মুখে!' সেই তাহেরা নাকি আমাকে বড় ভাইয়ের মতো ভক্তি করে। ভালো যে বাসে, সেই কথাটা লিখ্তে এত আপত্তি কেন? ভালবাসা ছাড়া ভক্তি হয় নাকি? আর এই বুড়োগুলো ফাঁকিবাজও নেহাৎ কম নয়। এইদিকে আমাকে লিখেছে, তাহেরা এইবার আই. এ. দেবে, আর দু' বছরের জন্যে তার বি. এ. টা তিনি নষ্ট করতে চান না, একেবারে বি.এ-র পরেই তার বিয়ে দেবেন। অথচ আমি সরজমিন থেকেই জেনে এলাম,

আমার চিঠি পাওয়ার পর তিনি মেয়েকে পাত্রস্থ করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন।

মনির—তুমি কী ক'রে জেনে এলে? তুমি দেখি গভীর জলের মাছ্।

জাফর—গতবার যে দিন চারেকের জন্য বাড়ী গিয়েছিলাম মনে আছে? বাড়ী ত যাই নি, গিয়েছিলাম ঢাকায়। দূর থেকে দেখে এলাম মানসীকে, আর জেনে এলাম মানসীর মুরুব্বিদের হাবভাব গতিবিধি।

মনির—কি বুঝ্লে?

জাফর—ঐ ত চিঠিতেই প্রকাশ। এইবার আমি সোজা তাহেরাকে চিঠি লিখ্ছি। সে রাজি থাক্লে স্বয়ং আজরাইলেরও সাধ্য নেই আমাকে বাধা দেয়। সে রাজি না থাকে, ব্যাস্, এখানেই শেষ।

মনির—চিঠি লিখেছ্?

জাফর—ড্রাফ্ট্ একটা খাড়া করেছি, শুনবে?

মনির—দাঁড়া, ওয়াহেদকে ডেকে নিয়ে আসি। এক সঙ্গে শোনা যাবে। (মনির গালের সাবান মুছে, ওয়াহেদকে নিয়ে ঢুকল দু'এক মিনিটের মধ্যেই।)

ওয়াহেদ—কি হে, আর এক bomb-shell ছুঁড়বে নাকি?

জাফর— Bomb shell কি, এইবার একাধারে এটম আর H.

মনির— Target কি জাহেদ সাহেব, না তাঁর কন্যা?

জাফর—এইবার কন্যার হৃদপিণ্ড। বাজে কথা রাখ, শোনো তারপর বলো: এই চিঠি এটমের কাজ করবে, না রাডারের?

(জাফর চিঠি বের ক'রে পড়তে আরম্ভ করল।)

"রাণী, মিথ্যাকে প্রচার করতে বিজ্ঞাপনের ভেরী-তুরী বাজাতে হয়. ভেরী-তুরীর আওয়াজে সত্যের মুখের জ্যোতি ম্লান হয়ে যায়। তোমাকে আমি ভালবাসি, এতদিন এ-কথা প্রকাশ করা দূরে থাক, কোনোদিন মনের ভিতরও উচচারণ করেছি বলে ত মনে হয় না।

অথচ আমার শিরা-উপশিরা থেকে আমার শিয়রের বালিশগুলি পর্য্যন্ত জানে যে, আমি তোমাকে ভালবাসি।

জীবনের দুর্লভ সম্পদ এই প্রেমকে অবহেলা করো না লক্ষীটি। এই প্রেমের ফলেই হয়ত একদিন তোমার জীবনে সোনা ফল্‌তে পারে।"

মনির—তা'হলে অলঙ্কারের ভাবনা আর তোমাকে ভাবতে হয়না, না?

জাফর—"যে ফুল কোনো নারীর জীবনে ফোটেনি, এই প্রেমের স্পর্শে তোমার জীবনে হয়ত সেই ফুল ফুটে উঠবে।"

ওয়াহেদ—আল্লার মেহেরবাণীতে অচিরে ফলও ধরবে।

জাফর—"এমন দুর্লভ সৌভাগ্য এদেশের কজন নারীর ভাগ্যে জোটে? দেশে নারীর জীবনে ভালবেসে ভালবাসা পাওয়ার ক্ষেত্রে তুমিই হবে Pioneer—রেকর্ড-প্রতিষ্ঠাত্রী। কাজেই এর গৌরব থেকে তোমার নিজেকে ও তোমার দেশকে বঞ্চিত করো না।"

মনির—আর বঞ্চিত করোনা আমাদেরে, অর্থাৎ প্রগতি সঙেঘর সভ্যদের।

জাফর—"আমি জানি তুমি অসাধারণ; প্রভূত শক্তি তোমার মাঝে ঘুমিয়ে আছে। আমাদের প্রগতি সঙেঘর প্রেরণায় সেই সুপ্ত শক্তি হয়ত একদিন পুষ্পের মতো বিকশিত হয়ে উঠবে, বীণার মতো বেজে উঠবে। প্রগতিসঙেঘর সভানেত্রীর আসন তোমার অপেক্ষায় শূন্য পড়ে আছে।"

ওয়াহেদ—আমাদের সভাপতির হৃদয় সিংহাসনও। (হাসি)।

জাফর—চিঠিটা কেমন হয়েছে তাই বল্।

মনির—এই চিঠি পড়ে যে কোনো পাষাণ-হৃদয় মেয়েও sure হার্টফেল করবে।

(ওয়াহেদের হাসি না থাম্‌তেই মেসের জনকয়েক ছেলে ঢুকে পড়ে চেঁচিয়ে উঠল: চল্, চল্, খেলার সময় হয়েছে; গিয়ে হয়ত টিকেটই পাওয়া যাবে না।)

ওয়াহেদ ও মনির—চল্ রে চল্ রে চল্।

(যবনিকা)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(তাহেরা কলেজের ঠিকানায় জাফরের চিঠি পেয়েছে। বাসায় ফিরে হাতের বইগুলি টেবিলের দিকে ছুঁড়ে ফেলে সে ফরফর করতে করতে একবার আয়নার সাম্নে দাঁড়িয়ে দুই পাশের দোদুল্যমান কেশগুচ্ছ কানের উপর তুলে দিয়ে ছোট ভাইয়ের হাত থেকে দড়িটা কেড়ে নিয়ে স্কিপিং শুরু করে দিলে। যবনিকা উঠ্‌বার পর থেকেই দেখা যাচ্ছে, তাহেরার ছোট ভাই---যার বয়স দশ বার বছরের বেশী হবে না, স্কিপিং করছে। তাহেরার পোষাক পরিচ্ছদ সাধারণ কলেজ-গার্লের মতো। হঠাৎ এতবড় ধিঙ্গি বুবুর স্কিপিং দেখে ফারুক তো হেসেই কুটিকুটি। মা পাশের কামরার বারান্দায় বসে তরকারী কুটছিলেন। ফারুকের হাসি শোনে মা ব'লে উঠলেন)

মা---কি রে ফারুক, অত হাসছিস্ কেন?

ফারুক—মা, দেখ না এসে---

তাহেরা---চুপ, বাঁদর, বলিস না।

ফারুক—(চেঁচিয়ে) বুবু, স্কি-ই-ই—

তাহেরা—চুপ, বাঁদর কোথাকার! (ব'লে তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে তার মুখ চেপে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে ফারুক তাহেরার ব্লাউজের ভিতর রক্ষিত চিঠিখানা টেনে নিয়ে ছুটে টেবিলের ও-পাশে চলে গেল। টের পেয়ে তাহেরাও মণি-হারা ফণীর মতো ধরতে ছুটে গেল। টেবিল চেয়ারের চতুর্দ্দিকে ভাই-ভগ্নিতে কিছুক্ষণ বেশ ছুটাছুটি চল্ল। তাহেরা ছুটছে আর মিনতি করছেঃ দে ভাই, দে ভাই লক্ষ্মীটি। ফারুক বলছেঃ দেব না, কিছুতেই দেব না। বালকের সঙ্গে তাহেরা পারবে কেন, অচিরেই হাঁপাতে লাগল।)

তাহেরা—(অত্যন্ত মিনতির সঙ্গে) দে ভাই, তোকে চকলেট কিনে দেব।

ফারুক—কার চিঠি বলো! আমি একবার পড়ে দেখি। (বলে সে চিঠিখানি খুলতে চেষ্টা করল। তাহেরা তাকে ধরবার জন্যে আবার ছুটল। এইভাবে কিছুক্ষণ ছুটাছুটি চল্ল।)

মা---(পাশের ঘর থেকে) ফারুক, কি হয়েছে? অত গোলমাল কিসের?

তাহেরা---দে না, লক্ষ্মীটি! তোকে সিনেমা দেখার পয়সা দেব।

ফারুক---পয়সায় হবে না। এক টাকা দিতে হবে।

তাহেরা---আচ্ছা, তাই দেব, দিয়ে দে।

ফারুক—নগদ দিতে হবে, বাকি হ'লে ফাঁকি। তাতে, আপা, আমি রাজি না। এক হাতে টাকা নেব, অন্য হাতে চিঠি দেব।

তাহেরা—আচ্ছা নে। (ব্লাউজের ভিতর থেকে ক্ষুদ্র একটি মানি বেগ বের করে একটি টাকা নিয়ে ফারুকের দিকে বাড়িয়ে দিলে; ফারুকও সন্ধি-শর্ত্ত মতো এক হাতে টাকা নিলে ও অন্য হাতে চিঠিটা দিয়ে দিলে; সঙ্গে সঙ্গে পট পরিবর্ত্তন। দেখা যাচ্ছে, তাহেরার মা জোহরা তরকারি কুটছেন, তাহেরা হাসি ও খুশী ছড়াতে ছড়াতে ঢুকল!)

তাহেরা—(ঢুকেই) মা সরো তুমি, আমি কুটে দিচ্ছি। (বলে সে বঁটিটা টেনে নিয়ে তরকারী কুটতে লেগে গেল।)

জোহরা—(বিস্মিত কণ্ঠে) ওকি, কাপড় ছাড়বি না? হাত মুখ ধুবি না? হাত মুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নে আগে।

তাহেরা—(আনন্দোৎফুল্ল মুখে) এখন খাব না, মা। আজ খিদে পায়নি। (বলে ক্ষিপ্র হস্তে সে তরকারী কুটতে লাগল।)

ফারুক—(ঢুকে, দূর থেকেই) বুবু, মা'কে বলে দেব?

জোহরা—কি?

ফারুক—(তাহেরার দিকে চেয়ে) বলব? বলব? চি---ই--ঠি---ই।

তাহেরা—(বঁটি হাতে উঠে) বাঁদর কোথাকার, বেরো এখান থেকে। (ফারুক বাইরের দিকে ভোঁ দৌড় দিলে। কিছুক্ষণ মা মেয়ে উভয়েই নীরব। মা তাহেরার মুখের দিকে চেয়ে যেন তার মন পড়বার চেষ্টা করছিলেন।)

তাহেরা—(কিছুক্ষণ নীরবে তরকারী কুটবার পর) মা, বাপজান আসেন নি!

জোহরা—না, কেন বল্ত!

তাহেরা—(একটুখানি নীরব থাকার পর নতমুখে) আজ জাফর ভাই এক চিঠি লিখেছেন।

জোহরা—জাফর? তোমাকেই?

তাহেরা—(অধিকতর নতমুখে) হাঁ।

জোহরা—তোমার বাবাকেও নাকি কিছুদিন আগে এক চিঠি দিয়েছিল। ও'র চিঠি পাওয়ার পর থেকে তোর বাবা ত তোর বিয়ের জন্য একেবারে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তিনি যে এবার ঢাকা গেছেন, আমার বিশ্বাস, আমজাদ সাহেবের সঙ্গে পাকা কথা বলার জন্যই গেছেন। ওরা বিলাতের খরচ চাচ্ছিলেন, এতদিন তিনি রাজি ছিলেন না, এবার বোধ হয় রাজি হবেন। তা, ও কি লিখেছে?

তাহেরা—(কিছুক্ষণ নীরব থেকে) অ—নে—ক—ক—থা।

জোহরা—তা তোর মনে আছে জাফরের কথা? সে ত আমাদের বাসায় মাত্র অল্পদিন ছিল। আমার ত বেশ লাগত ছেলেটিকে। তোর বাবা কিন্তু ওকে দু'চোখে দেখতে পারেন না।

তাহেরা—বেশ মনে আছে। বাঃ মনে থাকবে না? দু'তিন মাস ধরে পড়ালেন; বাপজান যেতে পারলেন না বলে ইডেনে ভর্ত্তি হওয়ার দিন তিনিই ত আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

জোহরা—হাঁ, ঠিক। আমারও এখন মনে পড়ছে। জরুরী ক্লাস ছিল বলে সে দশটায় কলেজে চলে গিয়েছিল, বলেছিল গাড়ী ক'রে তোকে সেখান দিয়ে পাঠিয়ে ক্লাস থেকে ওকে ডেকে নিতে, না?

তাহেরা—হাঁ, মন্নান ভাইও আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন। তিনি ক্লাস থেকে বেরুতে বডড দেরী করেছিলেন বলে আমি তাঁকে সেদিন খুব বকেছিলামও।

জোহরা—(হাসতে হাসতে) সত্যি?

তাহেরা— (লজ্জাবনত মুখখানি আরো নত করে) হাঁ
(যবনিকা)

তৃতীয় দৃশ্য

(ওয়াহেদের ঘর। সে একটা ভাঙ্গা হারমোনিয়ম নিয়ে পেঁ পোঁ আর কণ্ঠে আ-া-া-া করছিল। হঠাৎ মূর্তিমান ঝড়ের মতো জাফর আবির্ভূত হয়ে হারমোনিয়মটা কেড়ে নিল।)

জাফর—তুই আবার কি গান করবি? দে আমায়—।

ওয়াহেদ—(বিস্ময় প্রকাশ করে) তুমি গান করবে? (জাফরের কণ্ঠস্বর কর্কশ। তার কথা শুনলেই মনে হয় তার বুঝি বার মাসই সর্দ্দি করে আছে।) ওরে মনির, সবাইকে ডেকে নিয়ে শিগগীর আয়, গান হচ্ছে, ওস্তাদের গান। (চেঁচিয়ে সে বল্ল। সঙ্গে সঙ্গে মনির ও আরো অনেকের প্রবেশ।) বস, আর মডার্ণ তানসেনের গান শোন।

মনির—(ঠোঁট থেকে সিগারেট নামিয়ে) তুমি যদি গান ধর, সবাই মনে করবে, এখান থেকে ছাত্রদের মেস্ উঠে গেছে এবং ধোপারাই এ বাড়ী ভাড়া নিয়েছে।

জাফর—(উচ্চরবে) আলবৎ আমি গান করব। ওয়াহেদ কি গানের monopoly পেয়ে গেছে নাকি?

মনির—প্রিয়ার হৃদয় লক্ষ্য ক'রে তুমি ছুঁড়ছ চিঠির উড়ন্ত বোমা, আর প্রিয়ার হৃদয়তল লক্ষ্য করে ওয়াহেদ চালাচ্ছে অনবরত গানের টর্পেডো। কে আগে ঘায়েল করতে পারো দেখি—I mean your respective প্রিয়াকে।

জাফর—দেখে নিও, আমিই আগে successful হব। (এই বলে সত্যই যখন জাফর মুখব্যাদান করল, ওয়াহেদ চেঁচিয়ে উঠল।)

ওয়াহেদ—দোহাই, একটু থাম্, একটু থাম্। আগে কানে তুলো দিয়ে নিই, না হয় তালা লাগবে যে কানে। (এখানে ওখানে বিছানার নীচে তুলা সন্ধান, তুলার অভাবে সবাই দু'হাতের আঙ্গুল দিয়ে কর্ণ বিবর বন্ধ করল।)

জাফর—(উচ্চরবে সুর করে')

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি,
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।

(হারমোনিয়মের সঙ্গে তার গলার শব্দের কোনো মিলই হচ্ছে না, তবুও সে বেসুরোভাবে এই লাইন দুইটি বারবার আবৃত্তি করতে লাগল। কিছুক্ষণ পর ওয়াহেদ কান থেকে আঙ্গুল নামিয়ে—)

ওয়াহেদ—ওরে ধোপার গাধা, ঐটি কি গান?

জাফর—গান কা'কে বলে স্যার, জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

ওয়াহেদ—যাকেই বলুক, অন্তত তুমি যা আবৃত্তি করলে তা কিছুতেই গান নয়।

জাফর—কেন নয় শুনি?

ওয়াহেদ—কেন নয়, তা অবশ্য বুঝিয়ে বলা শক্ত। তবে তুমি যা এই মাত্র চেঁচালে, তা কবিতা। গানে সুর থাকে, কবিতায় না থাকলেও চলে।

জাফর—বেশ, তা হলে কবিতায় সুর দিলেই ত গান হয়ে গেল। ই ত সোজা নিয়ম জানি।

মনির—সুর কা'কে বলে জানিস্?

জাফর—এই মাত্র সুরের একটা practical demonstration দেওয়ার পরও জিজ্ঞাসা করছিস্, সুর কা'কে বলে জানি কিনা।

মজিদ—অর্থাৎ, গলা ছেড়ে দিয়ে খুব টানতে পারলেই সুর হয়ে গেল, না? যেমন—হৃ-ই-ই-ই ই দ-অ-অ-অ-য় আ-া-া-া-া জ-ই-ই-ই-ই, ঈ-ঈ, তাই না জাফর?

জাফর—আলবৎ। তা ছাড়া আর কি? লক্ষৌ, মুর্শিদাবাদ ও ঢাকায় কত ওস্তাদই ত দেখলাম, সবই ত আ-া-া-া—(সে রাজহংসের মতো গ্রীবা দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর করে স্বরটাকে কিছুক্ষণ ধরে কণ্ঠনালীর ভিতর কাঁপিয়ে ওস্তাদী আ-া-া-া'র একটা demonstration দিয়ে দিলে। তারপর হঠাৎ সুর বদলিয়ে বলল) চল্, বেড়িয়ে আসা যাক।

ওয়াহেদ---সিনেমায় চল ত যেতে পারি।

জাফর—বেশ, স্বচ্ছন্দে

মজিদ—খাওয়াটাও হবে ত?

মনির—আলবৎ হবে।

জাফর—দেখা যাবে, চলই না। (জেবটা একবার সজোরে নাড়া দিলে; ঝন-ঝনাৎ শব্দ হ'ল। বাইরে ভিখারীর শব্দ শোনা গেল "একটো পয়সা দেলা দে, বাবা, একটো পয়সা দেলা দে। লাইল্লাহা ....।" জাফর তাড়াতাড়ি পকেট থেকে নিয়ে একখানা সিকিই ছুঁড়ে দিলে।)

মনির—(জাফরের অপ্রত্যাশিত ঔদার্য্যে বিস্মিত হ'য়ে) এতই যখন দাতা সেজেছিস্, চার আনা পয়সা একজনকে না দিয়ে অন্তত আটজন ভিখিরীকে দিতে পারতিস্।

জাফর—ওতে শুধু ভিক্ষা দেওয়ার ভান করা হত, কাঁকেও সাহায্য করা হত না।

মনির—ও লোকটা এখনি গিয়ে হয়ত পেট ভরে তাড়ি খাবে।

জাফর---চার আনা পয়সা আটজনকে দিলে কারো পেট ভরত না; একজনকে দিলে সে তাড়িই খাক আর ভাতই খাক, অন্তত পেট ভরে খেতে পারবে।

(জাফর কিন্তু সব সময় তার শার্টের বুক-পকেটে হাত দিচ্ছে একটা জিনিষ স্পর্শ ক'রেই আবার হাত বের করে নিচ্ছে। হঠাৎ হাতের পোড়া-সমাপ্ত সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে একটা দশ টাকার নোট মজিদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বল্লঃ) এক দৌড়ে ভালো একটিন সিগারেট নিয়ে আয় ত best in the market হওয়া চাই, কাছে না পেলে রেলওয়ে stall পর্য্যন্ত দৌড়াবে; দরকার হয় ট্যাক্সিতে যাবে আসবে। (কৈফিয়ত স্বরূপই যেন সে আপনা-আপনিই বল্লে) শুধু সাহেবগুলোই দুনিয়ার সব ভালো জিনিষ ভোগ করে যাবে, তার কি মানে আছে? আমাদেরও কি মাঝে মাঝে মুখ পরিবর্তন করার সখ জাগে না?

মজিদ—তোমরা এইদিকে আমাকে ফেলে সিনেমায় চলে যাবে না ত!

মনির—দূর পাগল! দুপুরে সিনেমা দেখে ত বাসার ঝি চাকরেরা, ভদ্রলোক আবার দুপুরে সিনেমা দেখে নাকি?

জাফর—(ধীরে ধীরে বুক-পকেট থেকে একখানা সবুজ খাম বের করে, তার দু'দিকে দু'টো দীর্ঘ চুমু দিয়ে ওয়াহেদ ও মনিরের দিকে খামটি উঁচু করে জিজ্ঞাসা করল) কার চিঠি বল ত? বলতে পারলে নবলগ কুড়ি টাকা।

মনির ও ওয়াহেদ—(সমস্বরে উৎফুল্লকণ্ঠে) তাই বল! অত স্ফূর্তির কারণ এতক্ষণেই বোঝা গেল।

ওয়াহেদ—বলছি, টাকাটা আগে মনিরের হাতে জমা দে। (জাফর দু'খানা নোট মনিরের হাতে দিয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে ওয়াহেদ চেঁচিয়ে উঠল: তাহেরার, তাহেরার।

মনির—কবে পেলে?

জাফর—আজ সকালের ডাকে।

ওয়াহেদ—দেখি হাতের লেখাটা।

জাফর—(একটু দূরে সরে গিয়ে) না, নেই হোগা, আগে অজু করে পাক সাফ হয়ে এস, তারপর এই (তন্ময়ভাবে বুকের উপর রেখে) সুপবিত্র বস্তুতে হাত দিতে পারবে!

মনির—পড়, শোনা যাক্। প্রগতি সংঘের সভানেত্রী হওয়ার যোগ্যতা আছে কিনা, বিচার করে দেখতে হবে ত।

জাফর—সব শোনাবো না; কিছু কিছু শুনতে পারো।

ওয়াহেদ—তোমার যা ইচ্ছা, যতটুকু ইচ্ছা পড়ে যাও। আমরা বিন্দুতে সিন্ধু দেখতে পাবো।

জাফর—(চিঠি পাঠ)..."যেদিন তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা, সেদিনই দেখেছি তোমার দৃষ্টিতে বিদ্যুৎ..."

মনির—(ব্যস্ত সমস্তভাবে) থাম, আমরা একটু দেখি (ওয়াহেদের চশমাটা কেড়ে নিয়ে, শার্টের প্রান্তে মুছে) কই বিদ্যুৎ দূরে থাক, আমরা ত একটা খাদ্যোৎও দেখতে পাচ্ছি না তোমার চোখে বা চোখের আশেপাশে।

জাফর—"হাসিতে চাঁদের আলো..." (পড়তেই মুখে হাসি ফুটে উঠল।)

ওয়াহেদ—(চশমাটা মনিরের চোখ থেকে নিজের চোখে লাগিয়ে) আমরা ত তোমার হাসিতে একটা বাতির আলোও দেখছি না। শ্রীমতীর চশমার 'পাওয়ার' কত হে? ধন্য মেয়ে, এমন ডাহা মিথ্যা কথাও লিখতে পারে!

জাফর—তোমরা গোলমাল করলে আমি এই পড়া বন্ধ করলাম। (চুপ করে রইল ও কিছুক্ষণ।)

মনির ও ওয়াহেদ—আচ্ছা, আমরা চুপ করলাম। এইবার পড়।

জাফর—"বাক্যে ফুলের সুরভি, (মনির ও ওয়াহেদ নাক দিয়ে বাতাস শুঁকে, মুখ বিকৃত করে' নাকে রুমাল দান।) দেহে যৌবনের বসন্তোৎসব, তোমার চরণে দেখেছি মুক্তি—"

মনির—আর আমরা দেখছি সেণ্ডেল, আর মাঝে মধ্যে পাম্পসু—

জাফর—(উপেক্ষার ভঙ্গিতে)—"গতিতে দেখেছি ফাল্গুন উষার দক্ষিণা বাতাস। তুমিই ত আমার ধ্যানের রাজা, কল্পলোকের সুন্দর। তোমার চিঠির উত্তর একমাত্র চোখের জলেই দেওয়া যায়। চোখের জল তোমার কাছে পৌঁছাবার কোনো উপায় নেই বলে কাগজে কলমে মনের ব্যথাকে কথার আকার দেবার চেষ্টা করছি। প্রিয়তম, বুক চিরে দেখাবার কোন উপায় নেই, না হয় দেখতে পেতেঃ আকৈশোর একটু একটু করে কার ধ্যান-মূর্তি গঠন করে হৃদয়ের নিভৃত অন্তরে লালন করেছি, পূজা দিচ্ছি।"

ওয়াহেদ—এই ত রীতিমত পৌত্তলিকতা। শেষকালে একটা পৌত্তলিক বিয়ে করে দোজখে যাবে নাকি তুমি?

মনির—বাবা রে বাবা! স্বার্থের খাতিরে মেয়েরা এত মিথ্যা তোষামোদও করতে পারে!

জাফর—চুপ, শোন আরো কি লিখেছে...,"অভিভাবকের ভয়ে তুমি এত সন্ত্রস্ত হচ্ছ কেন? বুড়ো অন্ধের দল আজ যৌবন-ধর্ম্মকে যদি ভুলে গিয়ে থাকে, যৌবনের রঙীন স্বপ্ন, চল-চঞ্চল গতি, শক্তি ও আলোকে যদি তারা প্রত্যাখ্যান করে বসে, তাতে ক্ষুব্ধ না হয়ে তাদের কুসংস্কারকে বরং করুণা করাই উচিত।"

মনির—বেড়ে বলেছে ত।

ওয়াহেদ—অর্থাৎ বাবাকে বাপান্ত করে ছেড়েছে, এই ত?

জাফর—বাবাটিও কম চালাক নাকি? এই দিকে আমাকে লিখেছেন: এখন তিনি মেয়ের বিয়ে দেবেন না, বি. এ. পাশ করার পর দেবেন; ঐদিকে তলে তলে কি ঠিক করেছেন, তাঁর মেয়ের জবানীতেই শোন—"আমার পায়ে বেড়ী লাগাবার জন্যে খুব তোড়জোড় চল্‌ছে, বাবা আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে উঠে পড়ে লেগেছেন। কাজেই, হে সুন্দর, তুমি এসে আমায় মুক্ত করো। শৃঙ্খলের ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ শুনতে পাচ্ছি, কাজেই শুভস্য শীঘ্রং, হে প্রিয়তম!"—বলো, এই আবেদনে আমি সাড়া না দিয়ে পারি, কোনো পুরুষ পারে? জাহেদ সাহেবের চিঠিও ত তোমাদের দেখিয়েছি; তিনি শুদ্ধ রাজি হয়ে যে ভালয় ভালয় বিয়ে হবে, তার কোনো সম্ভাবনা নেই। কাজেই এখন আমাকে নিজের পথ নিজেকেই দেখ্‌তে হবে।

মনির—তোমার বাবাকে লেখ না কেন? তিনি গিয়ে ধরে পড়লে জাহেদ সাহেব হয়ত না করতে পারবেন না।

জাফর—একে ত প্রগতিশীল হিসেবে, প্রোগ্রেসিভ্‌ হিসেবে, সেই ধরণের বিয়েতে আমার ঘোরতর আপত্তি; তার উপর মেয়ে যখন রাজি তখন আমি খামখা কাপুরুষের মতো ব্যাক-ডোর পলিসি গ্রহণ করতে যাব কেন?

ওয়াহেদ—তবে কী করবে?

জাফর—মেয়ের মতিগতি বুঝ্‌লে ত? ইচ্ছে করলে এখন আমি যা তা করতে পারি, অন্তত elope যে করতে পারি তাতে ত কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তা আমি করব না, কারণ তাতে আমাদের 'প্রগতি সংঘের' বদনাম হবে। তার উপর, মেয়েদের ব্যাপারে unchivalrous হওয়া আমি উচিত মনে করি না।

মনির---কী উচিত মনে কর, তাই না হয় বলো শুনি।

জাফর—ইচ্ছে করেছি, তোমাদের দু'জনকে নিয়ে এই week-end-এ জাহেদ সাহেবের কাছে যাবো এবং মুখোমুখী তাঁর সঙ্গে আলাপ করে ব্যাপারটার একটা হেস্তন্যস্ত করে ফেলব। তারপর নিজেদের plan ঠিক করে, যা করবার করব।

ওয়াহেদ—তা অবশ্য নেহাৎ মন্দ হয় না। তবে আমরা কেন? বিয়ে করবে তুমি, পিঠে যদি তোমার হাতুড়ীও ভাঙ্গে তাতেও তোমার দুঃখ করবার থাকবে না, কিন্তু আমরা কেন ফর নাথিং মার খেয়ে বেইজ্জৎ হতে যাবো? কথায় বলে, পেটে খেলে পিঠে সয়; পেটে না খেয়ে আমাদের পিঠে সইবে না, ভাই।

জাফর—মার খাওয়া অত সোজা ব্যাপার নয় হে। তোমরা বাংলাদেশের বয়স্থা মেয়ের পিতার মনস্তত্ত্ব জান না বলেই অত ভয় পাচ্ছ। মারামারি কি কোনো গণ্ডগোল করতে গেলেই ত কথাটা পাড়াময় রাষ্ট্র হয়ে পড়বে, হয়ত আদালত পর্য্যন্ত গড়াতেও পারে, গণ্ডগোলের কার্য্যকারণ খুঁজতে তখন কত উর্ব্বর মস্তিস্কই ত গবেষণায় লেগে যাবে। ফলে মেয়েকে কেন্দ্র করে কত সম্ভব অসম্ভব কাহিনী রচিত হবে, যাকে বয়স্কা কন্যার পিতা যমের চেয়েও বেশী ভয় করেন। কাজেই নির্ভয়ে তোমরা আমার সহযাত্রী হতে পারো। আমি একা গেলে জাহেদ সাহেব হয়ত আমাকে আমল দিতেই চাইবেন না, দু'তিন জন একসঙ্গে থাকলে অত সহজে উড়িয়ে দিতে পারবেন না, কোনো গোলমাল হলে তোমরা অন্তত আমার পক্ষে সাক্ষী ত হতে পারবে। ঘটনা যেভাবে turn নিচ্ছে, তারও ত প্রয়োজন হতে পারে।

মনির---চা টা আগে আনাও; খেয়ে দেয়ে সুস্থির হয়ে ভেবে দেখি।

জাফর---এক্ষুণি আনাচ্ছি। সন্ধ্যায় সিনেমা, এখন পরটা আর চপ্ কাটলেট, বুঝেছ? কুড়ি টাকায় না কুলোয়, আরো মঞ্জুর করা যাবে। বয় বয়........

সকলে---থ্রি চিয়ার্স ফর আওয়ার প্রেসিডেণ্ট, হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে।

(সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা।)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(জাহেদ সাহেব তাঁর আফিস-ঘরে বসে ডাক দেখছেন। এমন সময় জাফর, ওয়াহেদ ও মনির সেই ঘরে ঢুকে তাঁকে সালাম করে দাঁড়ালো। চোখ তুলে দেখে জাহেদ সাহেব ত যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বিস্ময়ের আতিশয্যে হাত তুলে সালাম গ্রহণের ভদ্রতাটুকুও যেন ভুলে গেলেন। প্রকৃতিস্থ হতে তাঁর মিনিট দুই লাগল। তারপর বল্লেন)

জাহেদ সাহেব---বস, কখন এলে?

জাফর---(সকলে আসন গ্রহণ করার পর) কাল সন্ধ্যেয় এসেছি!

জাহেদ সাহেব---কোথায় উঠেছ?

জাফর---ডাক-বাংলোয়।

জাহেদ সাহেব---ডাক-বাংলোয় উঠলে কেন? কারও সঙ্গে এসেছ বুঝি?

জাফর---না। আমার এই বন্ধু দু'টি আমার সঙ্গে এসেছেন।

জাহেদ সাহেব---এই পথে অন্য কোথাও বেড়াতে যাচ্ছ তা'হলে?

জাফর---না। আপনার কাছেই এসেছি।

(জাহেদ সাহেবের মুখ অধিকতর কালো হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ মৌন থেকে বল্লেন:)

জাহেদ সাহেব---তবে এখানে না উঠে ডাক-বাংলোয় উঠলে কেন? চাকরটাকে নিয়ে জিনিষপত্রগুলো না হয় আনিয়ে নাও।

জাফর---না, থাক! আপনার সঙ্গে কথা শেষ হলে আমরা আজকেই ফিরে যাবো।

জাহেদ সাহেব---এঁরা তোমার সঙ্গে পড়েন বুঝি?

জাফর---হাঁ; এরা আমার বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু। এদের সামনে অসঙ্কোচে আলাপ করা যাবে, কিছু গোপন করার দরকার হবে না।

জাহেদ সাহেব---চা খাবে?

জাফর---না, এইমাত্র চা খেয়ে বেরুলাম। (জাফর গলা খাকারি দিয়ে কথাটা পাড়বে ভাব্‌ছে, এমন সময় জাহেদ সাহেব বলে উঠলেন)

জাহেদ সাহেব---পড়াশোনা কেমন চল্‌ছে?

জাফর---ভালই। আপনার চিঠি পেয়েছি।

জাহেদ সাহেব---তোমার বাবা মা কেমন আছেন?

জাফর---(হতাশভাবে) ভালোই। (তাড়াতাড়ি ঢোক গিলে আবার বলে উঠল) আমি বলছিলাম বিয়েটা হলে এমন কি আর ক্ষতি হ'ত?

জাহেদ সাহেব---তোমার বাবা বুঝি পেনসন্‌ নিয়েছেন?

জাফর---(মরিয়া হয়ে) তাহেরার সঙ্গে...

জাহেদ সাহেব---তিনি কি এখন তোমাদের দেশের বাড়ীতেই থাকেন?

জাফর---(অধিকতর মরিয়া হয়ে) আমাদের বিয়েটা হলে এমন কি আর ক্ষতি হ'ত?

জাহেদ সাহেব---এ সব ব্যাপারে তোমার বাবার সঙ্গে আলাপ হলেই ত বোধ হয় ভালো হয়। (সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলেন) প্র্যাক্‌টিস্‌ করবে, না চাকরী-বাকরীর তদ্বির করবে ভাব্‌ছ?

জাফর---আগে বি. সি. এস্‌টা দিয়ে দেখব, নয় ত অগত্যা 'বার ত খোলাই রয়েছে। (সঙ্গে সঙ্গে আবার বলে উঠল) আমার মতে, বিয়েটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। এর ভিতর বাপ মাকে টেনে আনা উচিত নয়। কারণ, বৌ ত আমার জন্যই, বাবার জন্যে নয় যে বাবা পসন্দ করবেন বা মতামত দেবেন। দরকার হলে তাঁর পরামর্শ নিতে পারি।

জাহেদ সাহেব—দেখ, আমরা সেকেলে লোক! (বড় অসহায়ভাবেই তিনি কথাটা বল্লেন। কারণ, পোষাক-পরিচ্ছদে তিনি কিন্তু একেলে।) আমরা বিয়ের ব্যাপারে উভয় পক্ষের মা বাপের মধ্যে আলাপ আলোচনা হওয়াই উচিত মনে করি।

জাফর—আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে, আপনার মেয়েও একেলে, আর যে তাকে বিয়ে করতে চাচ্ছে সেও একেলে; কাজেই একেলে ধরণেই তাদের বিয়ে হওয়া উচিত।

জাহেদ সাহেব—একেলে ধরণ মানে যদি এ রকম বেহায়াপনা হয়, তবে তাকে আমি অন্তত প্রশ্রয় দিতে পারব না।

জাফর—বুঝতে পারছেন জন্মের বিরুদ্ধে কিছু করবার আমাদের হাত ছিল না। কি করব আমরা একেলে জন্মেছি, কাজেই আপনাদের কাছে যত বেহায়াপনাই মনে হউক না কেন, একালের ধরণ-ধারণ আমাদের মেনে চলতেই হবে।

ওয়াহেদ—যদি অপরাধ না নেন, জিজ্ঞাসা করি, সেকালের দোহাই দিয়ে আমরা একালের বিষাক্ত গ্যাস্ বা বোমার আতঙ্ক থেকে, অর্ডিন্যান্সের হাত থেকে, এমন কি বীমা দালালের কবল থেকেও কি রক্ষা পাচ্ছি?

ওয়াহেদ—গাল জ্বালা কর্‌লেও কন্‌কনে শীতের ভোরে ঘুম থেকে উঠে গালে ধারাল কিম্বা ভোঁতা রেজার বা ব্লেড যা থাকে তাই ঘষতে হয়, কেননা এইটি একেলে সভ্য মানুষের একটি অভ্যাস। আপনি নিজেকে যতই সেকেলে বলুন, একালের হাত থেকে কি নিজেকে বাঁচাতে পারেন?

জাফর—কাজেই মেয়ের ব্যাপারেও আপনাকে একেলে হতেই হবে।

জাহেদ সাহেব—(উত্তেজিত কণ্ঠে) অত কথা কাটাকাটির কি দরকার, বাপু . এম. এ. আর ল' পড়ছ, এই সোজা কথাটা বুঝতে পার না: তোমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার আদৌ আমার ইচ্ছা নেই।

জাফর—আপনার ইচ্ছা না থাকলেই ত সমস্ত ব্যাপার ফুরিয়ে গেল না। আমাদের বিয়ের ব্যাপারে আপনার বা আমার বাবা মা'র ইচ্ছা

অনিচ্ছা সে গৌণ ব্যাপার। এই ব্যাপারে তাঁহেরা ও আমার ইচ্ছা অনিচ্ছাই ত যাকে বলে deciding factor।

জাহেদ সাহেব—আমার কন্যা কিছুতেই আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবে না।

জাফর—এ-কথা কি আপনি জেনে শুনে বল্‌ছেন?

জাহেদ সাহেব—জানার দরকার নেই। আমার মেয়ে আজন্ম কোনদিন আমার মতের বিরুদ্ধাচরণ করেনি, আজও কর্‌বে না।

জাফর—অন্য বিষয়ে না করতে পারে, কিন্তু বিয়েটা তার নিজস্ব ব্যক্তিগত ব্যাপার; এ-বিষয়ে পিতার অন্যায় রুলিং সে না-ও মানতে পারে।

জাহেদ সাহেব—আমার মেয়েকে বোধ করি অন্যের চেয়ে আমিই ভালো জানি।

জাফর—সেটা সত্য না-ও হতে পারে। না জেনে মেয়েদের স্বাভাবিক লজ্জা ও ভীরুতার সুযোগ নিয়ে আপনারা তাদের যেখানে সেখানে পাত্রস্থ করে তাদের জীবনকে দুর্বিষহ ও চির-নিরানন্দ করে রাখেন।

জাহেদ সাহেব—অত সব বাজে কথায় লাভ কি? আমি ত বলে দিয়েছিঃ তোমার হাতে আমি মেয়ে দেব না।

জাফর—আপনার মেয়ে যখন স্বয়ং আমার হাতে আসার জন্যে এ-রকম আগ্রহ দেখাচ্ছে, তখন আপনি কেন তাকে আমার হাতে দিতে ফর নাথিং আপত্তি করছেন, বঝুতে পারছি না।

জাহেদ সাহেব—বুঝবার শক্তি থাক্‌লেই বুঝতে পারতে!

জাফর—অমত করবার আগে আপনার উচিত কোথায় আমার অযোগ্যতা সেটা আমাকে দেখিয়ে দেওয়া। আমার সার্টিফিকেটের কপিগুলি সম্বন্ধে যদি আপনার কোন সন্দেহ থেকে থাকে তবে যাচাই করে নিন্, অরিজিন্যাল কপিগুলো আমার সঙ্গেই রয়েছে মিলিয়ে দেখে নিন্ না। (পকেট থেকে সে কয়েকটি কাগজ বের করলো।)

জাহেদ সাহেব—ও-সব রাবিশ আমি দেখ্‌তে চাই না।

জাফর—(রেগে) আপনি যদি নেহাৎ হৃদয়হীন না হতেন, তা'হলে বুঝ্‌তে পারতেন—দুইটি যুবক-যুবতী পরস্পরকে ভালবেসে যদি বিবাহাবদ্ধ হ'তে চায় তাতে কিছুমাত্র অসম্মান নেই—তাদেরও না, তাদের পিতামাতারও না।

জাহেদ সাহেব—আমার মেয়ে তোমাকে ভালবাসে এটা স্রেফ্ গাঁজাখুরী গল্প ছাড়া আর কিছুই না। এ-রকম গাঁজাখুরী গল্প যে বিশ্বাস করে, পাগলা-গারদই তার উপযুক্ত স্থান।

(জাফর ধীরে ধীরে পকেট থেকে তাহেরার চিঠিখানি বের করল, তারপর সেখানি সাম্‌নে খুলে ধরে বল্লে—)

জাফর—হাতের লেখা বোধ করি চিন্‌তে পারছেন।

(হতভম্ব জাহেদ সাহেব মুহূর্তে বুঝি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে বসলেন। মুখ তাঁর মড়ার মতো সাদা হয়ে গেল। জাফর চিঠিখানি তাঁর সামনে টেবিলের উপর রেখে দিয়ে বল্লে) পড়ে দেখুন, কোন আপত্তি নেই। ওতে ভালবাসার কথা ছাড়া অন্য কোন আপত্তিকর কথা কিছু নেই। আপনি স্বচ্ছন্দে পড়ে দেখতে পারেন। আমার বিশ্বাস, তাহেরাও এতে আপত্তি করবে না।

(অত্যন্ত অনিচ্ছায়, নেহাৎ বিমর্ষভাবে, খুব নিরানন্দ মনে, অতি তাচ্ছিল্যের সাথে জাহেদ সাহেব চিঠিখানি পড়ে গেলেন। কন্যার অপঘাত মৃত্যু-সংবাদেও বুঝি তিনি এতখানি আঘাত পেতেন না। অনেকক্ষণ পরে তিনি ধীরে ধীরে ম্লান মুখে বল্লেন:)

জাহেদ সাহেব—এত সব আমি কিছুই জান্‌তাম না। কয়েকদিনের মধ্যেই আমি মন স্থির করে তোমাকে চিঠি লিখে আমার মতামত জানাব। আচ্ছা, আজ তা'হলে এসো। আমাকে এক্ষুণি একটু বের হতে হবে কি না! (উঠে দাঁড়ালেন। জাফরেরা সালাম ক'রে বেরিয়ে যাওয়ার পর জাহেদ সাহেব ইজি চেয়ারে নিজেকে ঢেলে দিলেন —তাঁর দু'চোখের কোণায় দু'টী বৃহৎ অশ্রু-ফোঁটা চক্‌চক্ করে উঠল। তারপর—যবনিকা—)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(শুক্রবার সন্ধ্যার পর। জাহেদ সাহেবের বাড়ী---বিবাহ-মজলিস্। বিবাহ পড়াবার জন্যে আচকান জোব্বা পরে' ও পাগড়ি মাথায় মৌলভী সাহেব বসেছেন। তাঁর সামনে বর এবং উভয় পক্ষের ছেলে বুড়ো বহু লোক উপবিষ্ট। জাহেদ সাহেবও একপাশে আছেন।)

মৌলভী সাহেব---মেয়ের এজিন (সম্মতি) নিয়ে সাক্ষীরা এখনো এলো না যে (তখন দু'জন লোক ঢুকল।) এই ত আপনারাই এজিন নিতে গিয়েছিলেন না?

দু'জনের একজন—হাঁ।

মৌলভী সাহেব—মেয়ে এজিন দিয়েছে?

(সাক্ষী দু'জন পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ী করতে লাগল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর—)

একজন---তুমি বলো।

অপর জন—তুমিই বলো।

প্রথম জন---না, আমি না, তুমি বলো।

দ্বিতীয় জন—না, আমি না, তুমিই বলো।

মৌলভী সাহেব---আপনাদের দু'জনকেই বলতে হবে। সাবালিকা মেয়ের এজিন ছাড়া বিয়ে হতে পারে না এবং তা দু'জন সাক্ষীর সাম্‌নে দিতে হয়। দু'জনেই বলুন।

দু'জন এক সঙ্গে—মেয়ে রাজি আছে, এজিন দিয়েছে।

(সঙ্গে সঙ্গে জাফর, মনির, ওয়াহেদ, আরো তিন-চারজন যুবক ভিড় ঠেলে ঢুকে পড়ল।)

জাফর—(বাইর থেকেই প্রায় চেঁচিয়ে উঠল:) জনাব, সাক্ষীরা মিথ্যা কথা বল্‌ছে, এই বিয়েতে পাত্রী রাজী নেই।

(ঘরের সমস্ত লোক বিস্ময়ে হতবাক্ জাহেদ সাহেবের মুখ লজ্জায় এতটুকুন হয়ে গেল।)

এক ব্যক্তি---(উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে) আপনি কে?

জাফর---(বিস্মিত কণ্ঠে) আমাকে চেনেন না? (সঙ্গীদের উদ্দেশ করে বল্লে) এই, বলে দে না আমি কে।

ওয়াহেদ---এঁর নাম জানতে চান, না পরিচয়?

পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি---নাম এবং পরিচয় দুই-ই জানালে উপকৃত হ'ব।

ওয়াহেদ---ইনি স্বনামধন্য মিঃ জাফর হোসেন বি. এ. এবং সুবিখ্যাত 'নিখিল বাংলাদেশ প্রগতি সংঘের সভাপতি।

পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি---(জাফরকে) তা আপনি কি করে জানেন যে, মেয়ে এই বিয়েতে রাজী নেই?

জাফর---আমি যে জানি সে-বিষয়ে আপনার সন্দেহ থাক্‌তে পারে, কিন্তু পাত্রীর পিতার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। থাক্‌লে এই প্রশ্ন আপনি না করে তিনিই করতেন।

(ঘরের ভিতর কানাঘুষা চলতে লাগল। কেউ কেউ মন্তব্য করল---মাথা খারাপ। কেউ কেউ বল্ল---মাথায় ছিট আছে।)

পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি---(নরম হয়ে ভদ্রভাবে) আপনি বসুন, আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আপনার মতো দেশ-বিখ্যাত লোক আজ এখানে উপস্থিত হয়েছেন। আচ্ছা, আগে বিয়েটা হয়ে যাক, পরে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে আপনার সঙ্গে আলাপ করা যাবে।

জাফর---(বিদ্রূপ-মিশ্রিত কণ্ঠে) আপনি ত বেশ লোক দেখছি! (গম্ভীরভাবে) ইসলামের বিধান হ'ল সাবালিকা মেয়ের সম্মতি নিয়েই তার বিয়ে দিতে হয়, আর আপনারা সব মুসলমান হয়েও এক সাবালিকা মেয়ের মতের বিরুদ্ধে তার বিয়ে দিচ্ছেন; আর আমরা তা চুপ করে সহ্য করব, এ কি করে আপনারা আশা করেন? আমরা প্রগতি আন্দোলন করছি কি শুধু লোক দেখাবার জন্যে?

হায়দর ইমাম---(বর। উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল) আপনি দয়া করে আপনার প্রগতি আন্দোলন বাইরে প্রশস্ত মাঠে গিয়েই করুন গে;

ঘরের ভিতর স্থান এত সঙ্কীর্ণ যে বেশী অগ্রসর হতে গেলেই দেয়ালে ঠোকর খাবেন।

(বরের মন্তব্যে উপস্থিত সকলে হো হো করে হেসে উঠল।)

জাফর—(হাসির রোল থামতেই) বাইরে আপনাকেই যেতে হবে। পরের টাকায় বিলাত যাওয়ার সঙ্কল্প ত' করেছেন; একটা মেয়েকে তার বিনা সম্মতিতে বিয়ে করতে লজ্জা হয় না? সেখানকার মেয়েরা শুন্‌লে যে শেম্ শেম্ করবে।

হায়দর ইমাম—আরও কিছুদিন ভদ্রতা শিখে তবে কথা বল্‌তে আসবেন। আপনি কি করে জানেন যে, বিনা সম্মতিতে বিয়ে করতে যাচ্ছি?

জাফর—আমি জানি না ত কে জানে? এই দেখুন, (বলে, জেব থেকে সে একখানি চিঠি বের করে দেখালো।) আজকের ডাকেই পেয়েছি। আপনার জন্যে তাহেরার ঘুম হচ্ছে না কিনা, তাই লিখেছেঃ "শুক্রবার আমাকে বলি দেবার ব্যবস্থা হয়েছে, বাঁচান।"

(উপস্থিত সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ী করতে লাগল। জাহেদ সাহেব লজ্জায় মুখ তুলতেই পারলেন না।)

জাফর—আর এই চিঠি জাল বা মিথ্যা বলে যদি আপনাদের সন্দেহ হয়, তবে তাহেরা ত এখানেই রয়েছে, তাকে ডেকে আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন। (মৌলভী সাহেবকে লক্ষ্য করে) আচ্ছা মৌলভী সাহেব, সাবালিকা মেয়ের বিয়ে তার সম্মতি ছাড়া কি জায়েজ হয়?

মৌলভী সাহেব—নাউজুবিল্লাহ্, তা কি করে হবে? এটা ত শরিয়তের হুকুম।

জাফর—(বরকে) দেখলেন হায়দর সাহেব। আমাকে ধন্যবাদ দিন যে, আপনাকে এত বড় গোনাহ্‌র কাজ থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছি।

ওয়াহেদ—শুধু ধন্যবাদ দিলে চলবে না, ভালো করে খাইয়েও দিতে হবে।

মৌলভী সাহেব---(জাহেদ সাহেবের দিকে তাকিয়ে) এখন কি করা যায়?

জাফর—(কেউ উত্তর দিবার আগেই বলে' উঠল:) কেন, বিয়ে পড়াতে এসেছেন, বিয়েই পড়াবেন। বিয়ে আজ হতেই হবে।

মৌলভী সাহেব---মেয়ে রাজী না হলে কি ক'রে বিয়ে হবে?

জাফর---মেয়ে যার সঙ্গে রাজী তার সঙ্গে বিয়ে হতে ত' কোনো আপত্তি নেই? সে ভদ্রলোক ত' আপনার সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন।

ওয়াহেদ---সঙ্গীদের লক্ষ্য ক'রে (চেঁচিয়ে উঠল) বসে পড়ো হে, কাঁহাতক আর দাঁড়িয়ে থাকা যায়! ওঁরা ভদ্রতা করে বস্‌তে নাই বা বল্লেন, আমাদের ত ভদ্রতা-জ্ঞান আছে! অতএব বসে পড়। (সবাই বসে পড়ল।)

জাফর---(মৌলভী সাহেবের সামনে এগিয়ে এসে বরকে উদ্দেশ করে বল্লে) কাইণ্ডলি একটু সরে বসুন ত, কিছু মনে করবেন না। (অনিচ্ছা সত্ত্বেও বর একটু সরে বসল। জাফর কিছুমাত্র দেরী না করে বরের পরিত্যক্ত আসনে বসে পড়ল।) মৌলভী সাহেব, তাড়াতাড়ি বিয়েটা পড়িয়ে দি'ন। আমাদের দশটার গাড়ী ধরতেই হবে। বন্ধুরা গাড়ী নিয়ে ষ্টেশনে অপেক্ষা করবেন। (মৌলভী সাহেবকে চুপ করে থাক্‌তে দেখে ফের বলে উঠল) পাত্রী যে সর্বান্তঃকরণে রাজী, তাতে যদি আপনাদের কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে, তবে এই চিঠিগুলি পড়ে দেখুন। (এই বলে পকেট থেকে কতকগুলি চিঠি বের করে সে সামনে রাখলে।)

মৌলভী সাহেব—চিঠির সম্মতিতে বিয়ে জায়েজ হবে কিনা ভাব্‌ছি।

জাফর---ভাববার কী দরকার? তাহেরা নিজ মুখে বল্লে জায়েজ হবে ত? (সঙ্গে সঙ্গে সে 'তাহেরা, তাহেরা, তাহেরা' বলে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই পর্দার অন্তরালে চুড়ীর মৃদু রিনিঝিনি শব্দ শোনা গেল। বরের ধৈর্য্যের বাঁধ বুঝি এবার ভাঙল। উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল)।

হায়দর ইমাম---আপনার বিরুদ্ধে আমি ডিফামেশন আনব।

জাফর---জাহেদ সাহেবের পয়সায় ত?

হায়দর ইমাম---আপনাকে পুলিশে দেওয়া উচিত।

জাফর---আপনারাই ত এইমাত্র বে-আইনী কাজ করে পুলিশে যাওয়ার পথ পরিষ্কার করছিলেন। ভাগ্যে আমরা এসে পড়েছিলাম। যাক্, ও-সব পুরোনো কথা। আমার মনে হয়, সব চেয়ে উত্তম ব্যবস্থা forgive & forget. (পর্দার দিকে তাকিয়ে) তাহেরা এসেছ?

তাহেরা---(মৃদু উত্তর ভেসে এল) হাঁ।

জাফর---সবই ত শুনেছ, এখন বলো আমার সঙ্গে বিয়েতে তুমি রাজী আছ ত? তোমার বয়স হয়েছে, তুমি লেখাপড়া শিখেছ, তোমার বুদ্ধি ও মননশক্তি অসাধারণ, কাজেই আশা করি কোনো প্রকার লজ্জা-সঙ্কোচ ও ভয় না করেই তুমি তোমার মতামত জানাবে।

তাহেরা---আমি সর্বান্তঃকরণে সম্মত আছি।

(মৌলভী সাহেব কোরাণের একটি সংক্ষিপ্ত আয়াৎ পাঠ করার পর, যথোপযুক্ত দেন-মোহরে উভয়ে পরস্পরকে স্বামী ও স্ত্রী রূপে গ্রহণ করতে রাজি আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। উভয়েই সম্মতি জানাল। তারপর মৌলভী সাহেব একটি সংক্ষিপ্ত মোনাজাত করে স্বামী-স্ত্রীর সুখময় দীর্ঘজীবন কামনা করলেন।)

জাফর---(দাঁড়িয়ে তাহেরাকে লক্ষ্য করে) চলো, বাইরে মোটর দাঁড়িয়ে আছে। (হাতঘড়ির দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে ফের বল্ল) মাত্র আধ ঘণ্টা সময়, জিনিষপত্র বাজে লটবহর নিয়ে কি হবে? জীবনের নতুন অধ্যায়, একেবারে নতুন জিনিষপত্তর দিয়ে আরম্ভ করাই ভালো। এসো, মাকে সালাম করে এসেছ ত? চলো, নানাকেও সালাম করে নেওয়া যাক! (তাহেরা ও জাফর জাহেদ সাহেবের কাছে গিয়ে তাঁর পায়ে হাত দিতেই তিনি পা সরিয়ে নিলেন না বটে, কিন্তু মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলেন। জাফর বেরিয়ে যাওয়ার পূর্বে হায়দর ইমামের হাত নিজের হাতে নিয়ে ঝাঁকানি দিয়ে বল্লে) নেভার মাইণ্ড! অত বিমর্ষ হলে চল্‌বে কেন? চিয়ার আপ্ ইয়ংম্যান!

জীবনে এ-রকম কত নৈরাশ্যই ত আসবে। সে-সবকে মনে রেখে চিরস্থায়ী করে রাখলে ত জীবন চলে না। নৈরাশ্য ও দুঃখকে পর মুহূর্ত্তে ভুলে গিয়ে নতুন আশায় নীড় বাঁধতে হয় এবং এই ত মানব-জীবন। ঢাকা থেকে কখন রওয়ানা দিচ্ছেন জানাবেন, যদি পারি তাহেরাকে নিয়ে আপনাকে 'ভন ভরজ' জানিয়ে আসব। আচ্ছা (আর একটা ঝাঁকানি দিয়ে) গুড্ বাই। (অন্য সকলকে) আদাব, আদাব আসি তা হ'লে (বলে তাহেরার হাত ধরে বাইরে দণ্ডায়মান মোটরের দিকে অগ্রসর হ'ল। মোটর দেখা না গেলেও চলবে; বাইরে শুধু হর্ণের শব্দ করলেই হবে। সঙ্গে সঙ্গে তার বন্ধুরা, হয়ত সেই সঙ্গে উপস্থিত তরুণ দলও চেঁচিয়ে উঠল) থ্রি চিয়ার্স ফর আওয়ার প্রেসিডেণ্ট এণ্ড হিজ ব্রাইড্ হিপ হিপ হুর্‌রে, হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে।

এক কিশোর---থ্রি চিয়ার্স ফর প্রগ্রেসিভ বৌ, হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে।

(সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা।)

জীবন-কথা

বিদ্রোহী কবি নজরুল

প্রস্তাবনা

বর্তমান বাংলার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম সাধারণত 'বিদ্রোহী কবি' নামেই পরিচিত। তাঁহার কবি-আত্মা ও কাব্যাদর্শের পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে তাঁহার রচিত বিখ্যাত 'বিদ্রোহী' নামক কবিতায়। প্রধানত এই কারণেই তাঁহার নামের সহিত 'বিদ্রোহী' আখ্যা একান্তভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার রচনা, মতবাদ, আচার-ব্যবহার, চালচলন, রীতিনীতি এক কথায় সব কিছুর মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় এই 'বিদ্রোহী' নামের সার্থকতা। লেখায় ও জীবনে তিনি কখনো গতানুগতিকতার অনুসরণ করেন নাই---সব সময় প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে তিনি করিয়াছেন বিদ্রোহ। গতানুগতিকতার বাঁধা-পথ ছাড়িয়া নতুন নতুন পথে তিনি রচনা করিয়াছেন সাহিত্য, পা বাড়াইয়াছেন সাধনার নানা বিচিত্র পথে। সংসারের নিত্য সংগ্রাম ও কর্মক্ষেত্র হইতে দূরে কুঞ্জবনে বসিয়া শুধু বাঁশী বাজাইয়া গান গাহিয়া আরামের বিলাস-জীবন তিনি কখনো যাপন করেন নাই।

কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ শুধু 'কবি-জীবনে' বিরক্ত হইয়া একদিন লিখিয়াছিলেন 'এবার ফিরাও মোরে'---

> "যেদিন জগতে চলে আসি,
> কোন্ মা আমারে দিলি শুধু এই খেলাবার বাঁশী।
> বাজাতে বাজাতে তাই মুগ্ধ হ'য়ে আপনার সুরে
> দীর্ঘ দিন দীর্ঘ রাত্রি চ'লে গেনু একান্ত সুদূরে
> ছাড়ায়ে সংসার-সীমা।"

কিন্তু বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম 'বিদ্রোহী' হইয়াও বরণ করিয়া লইয়াছেন এই সংসারের সীমানাকে, তাই তিনি লিখিয়াছেন সংসারের নিত্যসঙ্গী 'দারিদ্র্য' সম্বন্ধে কবিতা ও জিজ্ঞাসা করিয়াছেনঃ

> "কে বাজাবে বাঁশী?
> কোথা পাব আনন্দিত সুন্দরের হাসি?
> কোথা পাব পুষ্পাসব? ধুতুরা গেলাস
> ভরিয়া করেছি পান নয়ন-নির্য্যাস।"

বাংলা-সাহিত্যে নজরুলের আবির্ভাব অনেকটা ধূমকেতুর মত, একাধারে অপ্রত্যাশিত ও অভিনব, সুন্দর কিন্তু ভয়ঙ্কর। নজরুলের যখন আবির্ভাব তখন বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ একচ্ছত্র কবিসম্রাট। তাঁহার অসাধারণ কবি-প্রতিভার প্রভাব এড়াইয়া যাওয়া তখন কাহারো পক্ষে ছিল না সম্ভব। তাই সেই যুগের সব কবিই রবীন্দ্র নাথের অনুসরণে কবিতা লিখিতেন এবং তাহাই ছিল যুগোপযোগী রীতি বা রেওয়াজ। সেই রবি-করোজ্জ্বল বাংলা সাহিত্যে নজরুল করিলেন সর্বপ্রথম নতুন আলোকপাত, ফুটাইয়া তুলিলেন নতুন সুর, ধ্বনিয়া তুলিলেন নতুন বাণী। যাহার অভিনব সৌন্দর্যে রসগ্রাহী বাংলা ভাষাভাষী মাত্রেই মুগ্ধ না হইয়া পারিল না।

নজরুল ইসলামের মত এমন করিয়া কোন কবি নিজের দেশকে, দেশের জনগণকে ভালবাসেন নাই, জনগণের ভালবাসাও এমন করিয়া আর কেহই পান নাই। দেশের ও মানবতার এই দুর্ভাগ্যের দিনে যখন সর্বত্র একটা সর্বগ্রাসী ঈর্ষা, বিদ্বেষ, হানাহানি ও কাটাকাটি চলিয়াছে, রক্তস্রোতে যখন বাংলা দেশের সবুজ মাটি পর্যন্ত লাল হইয়া উঠিয়াছে, তখনো বাংলার হিন্দু ও মুসলমান একই সঙ্গে নজরুলের নামে সাড়া না দিয়া পারে নাই। এই বিবদমান দুই সম্প্রদায়ের গুণী ও গুণগ্রাহীগণ একই সুরে একই ভাবে কবির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা, প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা না জানাইয়া থাকিতে পারে নাই। এই যুগে এত বড় গৌরবের অধিকারী আর কে? নজরুল ইসলাম কবি, মানুষের কবি, মানবতার কবি তাই শত দুঃখে জর্জরিত বিভ্রান্ত বাঙালীর আত্মা ক্ষণিকের জন্য হইলেও সমস্ত হিংসা বিদ্বেষ ভুলিয়া কবির জন্ম দিবসে সাড়া না দিয়া পারে না। তাই হিন্দু বলিতেছে—নজরুল আমাদের কবি, মুসলমান দাবী করিতেছে, নজরুল আমাদের। আসলে নজরুল সব বাঙালীর, সব মানুষের। মানবাত্মার নানা আকুতি, বেদনা ও বিচিত্র অনুভূতি নানা সুরে, নানা ছন্দে, গদ্যে-পদ্যে গানে-কবিতায়, কোমলে-কঠোরে কত ভাবেই না তাঁহার লেখনী-মুখে রূপ পাইয়াছে। দাসত্বের বিরুদ্ধে, পরাধীনতার বিরুদ্ধে, কুসংস্কার, নির্যাতন ও গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে এই কবি একদিন বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করিয়াছেন বিদ্রোহ। কিন্তু তিনি খাঁটি কবি ও খাঁটি মানবতার কবি, তাই তাঁহার অগ্নি-বীণায় শুধু অগ্নি বরিষণ হয় নাই, সঙ্গে সঙ্গে পুষ্প বৃষ্টিও হইয়াছে। 'অগ্নি-বীণা', 'বিষের বাঁশী' ও 'ভাঙার গানের' পাশে পাশে এই কবির লেখনী রচনা করিয়া চলিয়াছে 'ব্যথার দান', 'দোলন চাঁপা', 'বুলবুল' ও 'চোখের চাতক'। জাতীয়তার ও বীররসের কবিতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কবি কালের কণ্ঠে পরাইয়াছেন অজস্র

গানের মালাও, যাহা আজ মহানগরীর প্রমোদকক্ষ হইতে সুদূর পল্লী গ্রামের কুঁড়ে ঘর পর্যন্ত সমভাবে জনপ্রিয় ও আদৃত।

কবি-জীবনের আরম্ভ হইতে যাঁহার হয়ত একটি দিনও ব্যর্থ যায় নাই, প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে যিনি নানা সুরে নানা ছন্দে কত বিচিত্র বাণী-মূর্তির ভাঙা-গড়া করিতেছিলেন, অদৃষ্টের কি নির্মম বিধান, সেই মহা-প্রতিভা আজ তাঁহার সৃষ্টিকর্মের মাঝখানেই স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে; কালব্যাধির আক্রমণে জীবন মধ্যাহ্নেই এই অফুরন্ত ও মুখর কবি-প্রতিভা আজ নীরব ও বোবা হইয়া গিয়াছে। ইহা যেন আগ্নেয়গিরিকে মুহূর্তে পাহাড়-চাপা দেওয়া, সমুদ্রকে যাদুমন্ত্রে বন্দী করিয়া রাখা! মানুষের জীবনে এত বড় ট্রেজেডী কল্পনাই করা যায় না। ধূমকেতুর মত যিনি একদিন আমাদের ভাগ্যাকাশে উদয় হইয়াছিলেন, আজ ধূমকেতুর মতোই আবার তিনি যবনিকার অন্তরালে সরিয়া গিয়াছেন। তিনি আজও বাঁচিয়া আছেন, অথচ আমরা আজ তাঁহার কণ্ঠ, তাঁহার সঙ্গ, তাঁহার গান, কবিতা ও তাঁহার গভীর উদাত্ত আহ্বান হইতে বঞ্চিত, ইহার চাইতে বড় দুঃখ, বড় দুর্ভাগ্য আমাদের আর কি হইতে পারে? তবুও বিশ্ববিধাতার বিধান আমাদিগকে নত মস্তকে মানিয়া লইতে হইবে এবং আমাদের হৃদয়ের সমস্ত ফরিয়াদ তাঁহার কাছেই পৌঁছাইতে হইবে। প্রার্থনা করি, কবি নিরাময় হউন, দীর্ঘায়ু হউন, আমাদের আজিকার নব জাগরণ ও আজাদী আবার তাঁহার কলকণ্ঠে মুখরিত হইয়া উঠুক।

প্রথম অধ্যায়

জীবন কথা

নানা পরিচিত নাম ও ধ্বনির সাহায্যে ছন্দ মিলাইতে গিয়া কবি গোলাম মোস্তফা একবার লিখিয়াছিলেন:

> কাজী নজরুল ইসলাম
> বাসায় একদিন গিছলাম।
> ভায়া লাফ দেয় তিন হাত,
> হেসে গান গায় দিন রাত,
> প্রাণে ফূর্তির ঢেউ বয়,
> ধরায় পর তার কেউ নয়।

অনেকখানি খেয়ালের বশে রচিত হইলেও, নজরুল ইসলামের সঙ্গে যাঁহারা সাক্ষাৎভাবে পরিচিত, তাঁহারা জানেন, এই ছড়ার প্রত্যেকটি কথাই অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

হাসি গান আনন্দ উল্লাসের ভাণ্ডারী এই কবির জন্মস্থান পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান জেলা। বর্ধমান জেলার আসানসোল কয়লাখনির জন্য প্রসিদ্ধ। আসানসোলের অন্তর্গত চুরুলিয়া গ্রামে ১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে নজরুলের জন্ম। কবির পূর্বপুরুষগণ পাটনার অধিবাসী ছিলেন, সম্রাট শাহ আলমের সময় পাটনা হইতে চুরুলিয়ায় আসেন। কবির পিতার নাম কাজী ফকির আহমদ ও পিতামহের নাম কাজী আমিনুল্লাহ্। কবির মাতার নাম জাহেদা খাতুন ও মাতামহের নাম মুন্সী তোফায়েল আলী। নজরুলের পিতা খুব স্বাস্থ্যবান ও সুপুরুষ ছিলেন। যৌবন কালে যাঁহারা কবিকে দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন কি রকম বলিষ্ঠ ও স্বাস্থ্যবান তিনি ছিলেন। কাজেই দৈহিক সৌন্দর্য ও

আছে তিনি যে পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কবি শৈশবেই পিতৃহীন হন। তাঁহার পিতা ১৩১৪ সালের ৭ই চৈত্র দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মা মারা যান ১৩৩৫ সালের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে। মৃত্যুকালে তাঁহার মা'র বয়স হইয়াছিল ৫৫ বৎসর। কাজী ফকির আহমদের ৭ পুত্র ও ২ কন্যা। জ্যেষ্ঠ সাহেবজানের পর ফকির আহমদের ৪ পুত্র অকালে লোকান্তরিত হয়। তারপর নজরুলের জন্ম হইলে তাঁহার ডাক নাম রাখা হয় 'দুখু মিয়া'। অপরিসীম দুঃখের মধ্যেই নজরুলের বাল্যজীবন অতিবাহিত হইয়াছে।, তাঁহার অন্তিম জীবনেও দেখা যাইতেছে অবিচ্ছিন্ন দুঃখের ভ্রূকুটি। তাঁহার 'দুখু মিয়া' নাম এমন ভাবে সার্থক হইবে তাহা কে জানিত?

নজরুলদের বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বে রাজা নরোত্তম সিংহের গড় এবং দক্ষিণ পার্শ্বে 'পীর পুকুর' নামে একটি প্রকাণ্ড পুকুর আছে। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, হাজী পাহ্‌লোওয়ান নামে এক জবরদস্ত পীর ঐ পুকুরটি খনন করাইয়াছিলেন, তাই উহার নাম হইয়াছে পীর পুকুর। পীর পুকুরের পূর্ব পাড়ে হাজী পাহ্‌লোওয়ানের মাজার ও পশ্চিম পাড়ে একটি মসজিদ আছে। কবির পিতা-পিতামহ আজীবন ঐ মাজার শরীফ ও মসজিদের তত্ত্বাবধান করিয়া গিয়াছেন। ফকির আহমদ সাহেব নাকি বেশ ধর্মপরায়ণ ছিলেন—প্রত্যহ মাজার শরীফে সাঁঝবাতি দেওয়া এবং মসজিদে বসিয়া এ'শার নামাজ পর্যন্ত তস্‌বিহ্ তেলাওয়াত্ করা নাকি তাঁহার একটি অভ্যাসে পরিণত হইয়াছিল।

কবির পিতার মৃত্যুর পর তাঁহাদের সংসারে বিষম বিপর্যয় দেখা দেয় এবং কবির পড়াশোনায়ও অতিশয় ব্যাঘাত ঘটে। ১৩১৬ সালে ১০ বৎসর বয়সে কবি গ্রামের মক্তব হইতে নিম্ন-প্রাথমিক পরীক্ষা পাশ করেন। তারপর এক বৎসরকাল ঐ মক্তবে শিক্ষকতাও করেন, এই সময় তিনি মাঝে মাঝে হাজী পাহ্‌লোয়ানের মাজারে খাদেমগিরি এবং ঐ মসজিদে ইমামতিও করিতেন।

কবির এক পিতৃব্য কাজী বজলে করিম ভাল পার্শী জানিতেন ও কবিতা চর্চা করিতেন। সম্ভবত তাঁহার দেখাদেখিই নজরুলও

বাল্যকালে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। অত অল্প বয়সে কবিতা লেখার বাতিক ও চালচলনে ঔদাসীন্য দেখিয়া পাড়াপর্শীরা তাঁহার নাম দিয়াছিল 'খ্যাপা'।

রবীন্দ্রনাথ হয়ত এমন 'খ্যাপাদের' লক্ষ্য করিয়াই লিখিয়াছেন 'খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ পাথর'। আমাদের এই 'খ্যাপা' কবিও হয়ত সেই শৈশবকালেই কোন এক পরশ পাথরেরই সন্ধান করিতে-ছিলেন। তাই দেখা যায়, পরীক্ষার হলে যখন অন্য ছেলেরা একমনে লিখিয়া চলিয়াছে, হয়ত মুখস্থ বিদ্যাই উদ্‌গীরণ করিতেছে, তখন আমাদের এই বালক-কবি বাহিরে আকাশের দিকে ও শূন্য দিগন্তের পানে তাকাইয়া তাকাইয়াই ঘণ্টা দুই কাটাইয়া দেন। হঠাৎ ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টার শব্দ হইল, ঘণ্টার শব্দে কবির যেন হুঁশ হইল---কল্পনার রথে আকাশ বিহার ছাড়িয়া কবি খাতার দিকে তাকাইয়া দেখেন এক কলমও লেখা হয় নাই। আজ তাঁহার রচনার পরীক্ষা। রচনা লিখিতে তাঁহার হাতের কলম ত থামিয়া থাকিবার কথা নহে। মুহূর্তে লিখিতে শুরু করিলেন, কিন্তু কলমের মুখে যাহা অনর্গল লেখা হইয়া চলিল তাহা গদ্য নহে, রীতিমত কবিতা। খাতা পাইয়া মাস্টার ত অবাক। পরদিন অবজ্ঞা মিশ্রিত কণ্ঠে সহকর্মীদের বলিলেন---'নজরুল নামে যে ছেলেটা ক্লাশে বসে দুষ্টুমি করে, শিশ্ দেয়, স্কুল পালায়, সে আবার কবিতাও লেখে।' সেদিন কে ভাবিয়াছিল এই দুষ্টু ছেলেই ভাবীকালে বাংলা ভাষার গৌরব বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামে পরিণত হইবে।

ছোটকালে নজরুল নাকি অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন। মনের মত বই পাইলে অবশ্য তিনি পড়াশোনায়ও ডুবিয়া থাকিতে পারিতেন। কিন্তু স্কুলের বাঁধা ধরা নিয়ম-কানুন তাঁহার মোটেই ভাল লাগিত না। কাজেই স্কুল পালানো তাঁহার এক রকম অভ্যাসে পরিণত হইয়াছিল। স্কুলে যাওয়ার চাইতে বরং 'লেটোর' * নাচের দলে ভর্তি হইয়া গান

* "লেটো" সম্ভবতঃ 'নেটো' শব্দেরই অপভ্রংশ। আর "নেটো" হয়ত 'নট' বা 'নট্ট' শব্দেরই পরিবর্তিত রূপ। এক সময় বর্ধমান ও বীরভূম জেলায় 'লেটো বা 'নেটোর' নাচের খুব প্রচলন ছিল। কবিগানের সঙ্গে 'লেটো' গানের কিছুটা সাদৃশ্য আছে।

গাওয়া আর হৈ চৈ করা এই সবই তাঁহার ঢের ভাল লাগিত। নাচের দলের যিনি মাতব্বর ছিলেন তিনি নজরুলকে আদর করিয়া 'ব্যাঙাচি' বলিয়া ডাকিতেন এবং প্রায়ই নাকি বলিতেন—'আমার ব্যাঙাচি বড় হলে সাপ হবে'। ব্যাঙাচির বয়স তখন বার কি তের। সেই বয়সেই তিনি কয়েকখানি 'লেটো' নাচের উপযোগী নাটক লিখিয়া ফেলেন। পড়িয়া সবাই ত বিস্ময়ে অবাক।

একদিন স্কুল হইতে পলাইয়া নজরুল সোজা আসানসোল চলিয়া আসিলেন। আসানসোল তখন তাঁহার পক্ষে অপরিচিত জায়গা। কাজেই সমস্যা হইল থাকিবেন কোথায়? কিন্তু যেই ব্যাঙাচির ভবিষ্যতে সাপ হইবার সম্ভাবনা তাহার এই সামান্য বাধায় দমিলে চলিবে কেন? মনে মনে বলিলেন, 'কুছ্ পরওয়া নেই', স্টেশনের কাছেই একটি রুটির দোকান ছিল, তাহাতেই তিনি মাসিক পাঁচ টাকা মাহিনায় চাকুরী গ্রহণ করিয়া বসিলেন। খুব ভোর বেলায় উঠিয়া ময়দা মাখেন, দিনের বেলায় রুটি বানান ও বিক্রি করেন। আর রাত্রে অবসর সময় দোকানের খুঁটিতে হেলান দিয়া বসিয়া বই পড়েন। এই বালক-বয়সেও তিনি বেশ ভাল গাহিতে পারিতেন এবং যন্ত্র-সঙ্গীতেও বেশ কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিলেন।

ধরিতে গেলে 'লেটোর' দলেই নজরুলের সাহিত্যে হাতে খড়ি হয়। 'লেটো' এক ধরণের যাত্রাভিনয় ছাড়া আর কিছুই নয়। পল্লীকবিরা পালা নাটক লিখিতেন আর পল্লী অভিনেতারা নৃত্যগীত সহকারে সেই যাত্রা-নাট্যকে মঞ্চে রূপ দিতেন। নজরুল এগার বার বৎসর বয়স হইতেই 'লেটো' দলের জন্য বহু গান, নাটক ও প্রহসন লিখিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার কবি-প্রতিভা সেই জীবন প্রভাতেই এমন পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল যে, পার্শ্ববর্তী কয়েকটি পল্লীর 'লেটোর' দল তাঁহার কাছে পালা লিখাইতে আসিত। এই করিয়া তাঁহার বেশ দু'পয়সা রোজগারও হইত।

নজরুল মক্তবের প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রাবস্থা হইতেই 'লেটোর' গান রচনা আরম্ভ করেন ও অতি অল্প বয়সেই 'লেটোর' দলের ওস্তাদী পদপ্রাপ্ত হন। পার্শ্ববর্তী নিমশা গ্রামের দলে কবি

প্রায় তিন চার বৎসর ধরিয়া ওস্তাদী করিয়া ছিলেন। 'লেটোর' ওস্তাদ অর্থে শুধু কবি বা নাট্যকার নয়, সঙ্গীত-রচনা, সুর-সংযোজনা, নাটকাদি পরিচালনা ইত্যাদি সবই ওস্তাদজীর কর্তব্য কর্মের সামিল। ঐ অল্প বয়সে কবি এককালে একাধিক দলে ওস্তাদের কাজ অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেন। অনেক সময় কবিকে দুই দলের পাল্লার সময় নিজ দলের পক্ষে আসরে নামিয়া অংশ গ্রহণও করিতে হইত। কারণ বিপক্ষ দলের সঙের পাল্টা প্রশ্নের উত্তর সঙ্গে সঙ্গেই দিতে হইত। আর ঐ সবে নজরুলের কৃতিত্ব ছিল অসাধারণ। প্রয়োজন হইলে কবি পাল্লার সময় স্বরচিত গান বা উর্দু গজল গাহিয়া আসর মাত করিয়া দিতেন।

তিনি ছিলেন দলের মধ্যমণি, সকলের প্রিয়। তাই নিম্‌শা ত্যাগের পর তাঁহার বিরহে ব্যথিত-চিত্ত নিম্‌শার দল একদিন করুণ সুরে গাহিত, হয়ত আজিও গাহিয়া থাকে:

"আমরা এই অধীন, হয়েছি ওস্তাদহীন,
ভাবি তাই নিশিদিন, বিষাদ মনে।
নামেতে নজরুল ইসলাম, কি দিব গুণের প্রমাণ," ইত্যাদি।

বলাবাহুল্য কবি আর 'লেটোর' দলে ফিরিয়া যান নাই।

* * *

নজরুল জীবনে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পান নাই। কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। অতি শৈশবে গ্রাম্য মক্তবে অধ্যয়নের সময় হইতেই তাঁহার মেধা ও বুদ্ধি-শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। মক্তবে তিনি শুধু পড়িতেন না পড়াইতেনও। এই কারণে মক্তবের ছাত্ররা কবিকে "ছোট ওস্তাদজী" বলিয়া সম্বোধন করিত। একবার নাকি তাঁহাদের মক্তবে পশ্চিম দেশীয় কয়েকজন মৌলভী, মৌলানা ও উচ্চ শ্রেণীর কয়েক জন ছাত্র মিলিয়া এক সঙ্গে কোরাণ তেলাওয়াত করিতে আরম্ভ করেন। কবি তখন দশ-এগার বছরের বালক মাত্র। কিন্তু দেখা গেল সর্বাগ্রে কবিই কোরান পাঠ সমাপ্ত করিলেন। উপস্থিত

পশ্চিম দেশীয় জনৈক মৌলানা বাঙালীর মুখে এমন নির্ভুল ও দ্রুত কোরান পাঠ শুনিয়া নাকি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া প্রস্তাব করিয়াছিলেন—"ইস্ লড়কেকো মেরে সাত্ ছোড়্ দিজিয়ে, বহুত বড়া আলেম বানায়েঙ্গে"।

শোনা যায়, শৈশবে নজরুল খুব নমাজ-রোজা পালন করিতেন। পরবর্তীকালে যোগী-জীবন তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল এবং রচনা করিয়াছেন তিনি বহু ভক্তিমূলক আধ্যাত্মিক সঙ্গীত। তাই মনে হয়, হয়ত এক গভীর ভক্তি ধারা অতি শৈশব হইতেই তাঁহার অন্তরে ফল্গুধারার মত প্রবাহিত ছিল, যাহার ফলে তাঁহার বাল্য রচনায়ও স্থান পাইয়াছে এমন সব ভাব; যাহা আমরা সাধারণত বৃদ্ধ লোকের মুখেই শুনিতে অভ্যস্ত। যেমনঃ

"নজরুল ইসলাম বলে, কর ভাই বন্দেগী,
খোয়াইওনা আজন্ম গোনাতে জিন্দেগী—
সার্মেন্দেগী হবে হাশরের মাঝে।"

আবার ঐ বয়সেই (আনুমানিক ১১ বৎসর) এই অসাধারণ শিশু-প্রতিভা লিখিয়াছেন ইংরেজী বাংলায় মিশাইয়া কমিক গান। যেমনঃ

রব না কৈলাসপুরে,
আই এ্যাম্ ক্যাল্কাটা গোইং।
যত সব ইংলিশ ফেসেন্,
আহা মরি কি লাইটনিং।।
ইংলিশ ফেসেন সবি তার
মরি কি সুন্দর বাহার
দেখলে বন্ধু দেয় চেয়ার
কানন্ ডিয়ার গুড্ মর্ণিং।
বন্ধু আসিলে পরে
হাসিয়া হেন্ড্শেক করে
বসায় তারে রেস্পেক্ট্ করে
হোল্ডিং আউট এ মিটিং।।

তার পর বন্ধু মিলে
ড্রিঙ্কিং হয় কৌতূহলে
খেয়েছে সব জাতিকুলে
নজরুল ইস্‌লাম ইজ্ টেলিং।।

যে কোন প্রতিভার একটি বড় ধর্ম হইল বৈচিত্র্য। নজরুলের সাহিত্যালোচনার সময়ও আমরা এই বৈচিত্র্য দেখিতে পাইব। তাঁহার বাল্য রচনায়ও এই বৈচিত্র্যের অভাব ছিল না।

আসানসোলের রুটির দোকানে যখন তিনি মাসিক পাঁচ টাকা মাহিনায় চাকুরী করিতেছিলেন, তখন সেখানকার তৎকালীন পুলিশ সাব্-ইন্সপেক্টর কাজী রফিকউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ঘটে। সুদর্শন ও তীক্ষ্মধী নজরুল সহজেই দারোগা সাহেবের স্নেহ-দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিছু দিন পর নজরুলের পড়াশোনার সুব্যবস্থা করিবার মতলবে দারোগা সাহেব কবিকে তাঁহার স্বগ্রাম ময়মনসিংহ জেলার কাজীর সিমলা গ্রামে লইয়া আসেন। দারোগা সাহেবের সাহায্যে নজরুল ১৩২০ সালে দরিরামপুর হাইস্কুলে ভর্তি হন। নজরুলের 'অগ্নিগিরি' নামক সুবিখ্যাত গল্পে 'বীররামপুর' গ্রামের উল্লেখ আছে। বোধ হয় দরিরামপুর নামটিই গল্পে 'বীররামপুর' হইয়াছে।

আগেই বলা হইয়াছে নজরুলের জ্ঞান-পিপাসা ছিল অদম্য কিন্তু স্কুলের বদ্ধ-জীবন তাঁহার বরদাস্ত হইত না। ফলে স্কুলে যাইবার নাম করিয়া তিনি বাড়ী হইতে বাহির হইতেন বটে, কিন্তু স্কুলে যাইবার পরিবর্তে সারা দুপুর নদীতে মাছ ধরিয়া, অথবা লোকের ফসল নষ্ট করিয়াই কাটাইতেন। স্কুলে যাইবার মাঝ পথে প্রকাণ্ড এক বট গাছ ছিল, তাহাতে ঝুলানো থাকিত হুঁকা ও কল্কে এবং হয়ত বাকি উপকরণ থাকিত শিশু-কবির পকেটে! পরবর্তী জীবনে কিন্তু দেখিয়াছি নজরুল ধূমপান করেন না মোটেও কিন্তু ভালবাসেন অতিমাত্রায় পান ও চা।

কবির কাজীর সিমলার জীবন কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। এক বৎসর পরেই তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন এবং ১৩২১ সালে রাণীগঞ্জের সিয়ারসোল হাইস্কুলে ভর্তি হন। 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী'

নজরুলের প্রকাশিত সর্বপ্রথম রচনা, তাহাতে রাণীগঞ্জ সিয়ারসোল স্কুলের উল্লেখ আছে। তিনি সেই স্কুলে তিন বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছেন। স্বনামখ্যাত কথাশিল্পী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ঐ স্কুলে তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। ১৩২৪ সালে (১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে) নজরুল ৪৯নং বাঙালী পল্টনে যোগ দিয়া করাচি গমন করেন। যুদ্ধ যাত্রার সময় তিনি দশম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষা ম্যাট্রিক পাশ করাও কবির অদৃষ্টে ঘটে নাই। শোনা যায়, তাঁহার বন্ধু শৈলজানন্দও তাঁহার সৈনিক জীবনের সঙ্গী হইতে সংকল্প করিয়াছিলেন কিন্তু ঘটনা চক্রে তাহা সম্ভব হয় নাই। পল্টনে গিয়া নজরুল যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন এবং অল্প কালের মধ্যেই তিনি হাবিলদারের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। সৈনিক থাকা অবস্থায় তিনি যে সব লেখা বিভিন্ন কাগজে পাঠাইতেন তাহাতে লেখকের নাম থাকিত --হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম।

সৈন্য বিভাগে যোগ দেওয়ার পরও নজরুল কাব্য-চর্চা ও জ্ঞানচর্চা অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। 'রুবাইয়াতে হাফিজ' নামক কাব্য পুস্তকের মুখবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, 'আমি তখন স্কুল পালিয়ে যুদ্ধে গেছি। সে আজ ১৯১৭ সালের কথা। সেখানে প্রথম আমার হাফিজের সাথে পরিচয় হয়। আমাদের বাঙালী পল্টনে একজন পাঞ্জাবী মৌলভী সাহেব থাকতেন। তাঁর কাছে ক্রমে ফার্সী কবিদের সমস্ত বিখ্যাত কাব্যই পড়ে ফেলি'। নজরুলের 'রিক্তের বেদন' সৈনিক জীবনে লেখা গল্প সমষ্ঠি। তাহাতে 'সালেক' নামক যে গল্পটি আছে, সেই গল্পটিতে হাফিজের একটি গজলের ভাবকেই রূপ দেওয়া হইয়াছে। যুদ্ধ শেষে বাঙালী পল্টন ভাঙ্গিয়া দিবার পর কবি ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে দেশে ফিরিয়া আসেন। দেশে ফিরিয়া আসিবার পরও তিনি বিক্ষিপ্তভাবে হাফিজের কিছু কিছু বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার অনূদিত 'রুবাইয়াতে হাফিজ' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

কবি দেশে ফিরিবার কয়েক বৎসর পূর্বে কলিকাতায় 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র প্রতিষ্ঠা হয় এবং ঐ সমিতির মুখপত্র হিসাবে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' নামে একটি ত্রৈমাসিক সাহিত্য-পত্রিকাও প্রকাশ

করা হয়। ঐ পত্রিকার ১৩২৬ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় নজরুলের 'মুক্তি' নামে গাথা-জাতীয় একটি দীর্ঘ কবিতা প্রকাশিত হয়। সম্ভবত সাময়িক পত্রিকায় ঐটিই তাঁহার প্রথম প্রকাশিত কবিতা। ঐ কবিতার ফুটনোটে লেখা ছিল---'ইহা সত্য ঘটনা'। কবিতাটির নীচে 'কাজী নজরুল ইসলাম, হাবিদার বঙ্গবাহিনী, করাচী' এই ঠিকানা দেওয়া ছিল। কবির প্রথম প্রকাশিত কবিতা হিসাবে কবিতাটির যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য আছে। এখানে কবিতাটির প্রথম কয়েক লাইন উদ্ধৃত হইল:

"রাণীগঞ্জের অর্জুনপটির বাঁকে,---
সেখান দিয়ে নিতুই সাঁজে ঝাঁকে ঝাঁকে
রাজার বাঁধে জল নিতে যায় শহরে বৌ কলস কাঁখে---

সেই সে বাঁকের শেষে
তিন দিক হ'তে তিন্‌টে রাস্তা এসে
ত্রিবেণীর ত্রিধারার মত গেছে একেই মিশে'
তেপথার সেই 'দেখা শুনা' স্থলে
বিরাট একটা নিমগাছের তলে,
জটাওয়ালা সে সন্ন্যাসীদের জট্‌লা বাঁধত সেথা,
গাঁজার ধূঁয়ায় পথের লোকের আঁতে হোত বেথা,"
ইত্যাদি।

কবি যখন যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দেশে ফিরিয়া আসেন তখন "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির" কার্যভার ন্যস্ত ছিল নীরব কর্মী মুজাফ্‌ফর আহমদের উপর। তিনি সাহিত্য সমিতির আফিসেই থাকিতেন। কবি নজরুলও সেখানে আসিয়া উঠিলেন। সে-দিনের একটি চিত্র, যাহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে নজরুলের জীবন ও স্বভাবের এক বিশিষ্ট রূপ, তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু বিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল:

"ভিতরের দিকে মুজাফ্‌ফর থাকতেন। সেই ঘরের দিক থেকে ভাঙ্গা হারমোনিয়ামের বেসুরো আওয়াজ কানে এল। ভিতরে গিয়ে

দেখি একটি প্রাণবন্ত তরুণ বসে বসে ভাঙা হারমোনিয়ামের সাহায্যেই সুর ভাঁজছেন। গায়ে তাঁর একটি নতুন কেনা ধোলাই গেঞ্জী, পরণেও একটি রঙিন লুঙ্গি। প্রসন্ন জিজ্ঞাসু দৃষ্টীতে আমার দিকে তাকালেন। আমি বললামঃ হাবিলদার কবিকে চাই। তরুণ সহাস্য মুখে লাফ দিয়ে উঠেই আমার দু'হাত চেপে ধরলেন, সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন এলঃ আপনিই কি পবিত্র গাঙ্গুলী*? আমার জবাবের পূর্বেই কখন যে তাঁর আলিঙ্গনে পিষ্ট হলাম, আজ এতদিন পর তা মনে করতে পারছিনে। মিনিট কয়েকের মধ্যেই 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে এসে পৌঁছলাম এবং যখন দু'জনের ছাড়াছাড়ি হল তখন উভয়ে এই ধারণা নিয়ে ফিরলাম যে, আমাদের পরিচয় অনন্তকালের। সেই সঙ্গে আমি এই ধারণাটি ফাউ হিসেবে নিয়ে এলাম যে, এতদিন যাদের চিনেছি, জেনেছি এ তাদের স্বগোত্রীয় নয়, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, ভিন্ন জগতের, ভিন্ন জাতের।

প্রতিদিন আমাদের আড্ডা চলতে লাগল। সে আড্ডায় মুজাফ্ফর,[১] আফজাল,[২] শৈলজানন্দ,[৩] নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ,[৪] মঈনুদ্দিন হোসেঈন[৫] খান মঈনুদ্দিন,[৬] কবি শাহাদৎ হোসেন, মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, (পরে ডক্টর), মোজাম্মেল হক,[৭] গোলাম মোস্তফা (কবি), আরো অনেকে এসে জুটতে লাগলেন। গান হাসি ঠাট্টায় বাড়ীটা যেন কাঁপতে থাকত। অমন প্রাণ-খোলা অট্টহাসি কারুর মধ্যে দেখিনি। রাত নেই, দুপুর নেই, সকাল নেই, সন্ধ্যা নেই, নজরুলের অট্টহাসি ও গান লেগেই আছে। শান্তি ভঙ্গের অজুহাতে বাড়ীওয়ালারা (তাঁরা ভিতরের দিকে থাকতেন) শাসাতে লাগলেন। কিন্তু প্রাণপ্রচুর তরুণ কবির হুঁস নেই।

* উভয়ের এই প্রথম সাক্ষাৎ। পূর্বে শুধু পত্রালাপ ছিল।—লেখক

১। কমরেড মুজাফফর আহমদ। ২। আফজালুল হক---'মুসলিম ভারত' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক, ৩। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়---বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ও সিনেমা শিল্পী, ৪। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়---সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও বেতার শিল্পী।

৫। জাতীয়তাবাদী সাংবাদিক ও পুস্তক প্রকাশক, ৬। কবি, সাংবাদিক ও লেখক। ৭। জাতীয় মঙ্গল নামক কাব্য গ্রন্থের লেখক।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গান তখন আমাদের আড্ডার বিষয়-বস্তু, আর নজরুল তার মধ্যমণি।'

এই হাসি গান ও বে-পরওয়া উল্লাসের ভিতর দিয়া কবির জীবন স্রোত বহিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু কবি-প্রতিভার যিনি অধিকারী, সাহিত্য স্বষ্টির প্রতিভা লইয়া যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, শুধু আনন্দ ও উল্লাসে তাঁহার তৃপ্তি হইবে কেন? শুধু খুশীর খোসরোজে ডুবিয়া থাকিলে তাঁহার চলিবে কেন? তাই দেখিতে পাই এই অফুরন্ত আনন্দ উল্লাসের সঙ্গে সঙ্গে তিনি দুই হাতে রচনা করিয়া চলিয়াছেন---গদ্যে ও পদ্যে। লেখার কিছু মাত্র বিরাম ছিল না। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ভাষা ও ছন্দ' নামক কবিতায় কবি-প্রতিভা সম্বন্ধে এক অতি সত্যবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন:

'—অলৌকিক আনন্দের ভার
বিধাতা যাহারে দেয়, তার বক্ষে বেদনা অপার,—
তার নিত্য জাগরণ! অগ্নিসম দেবতার দান
ঊর্দ্ধশিখা জ্বালি চিত্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ!'

বিধাতার দুর্লভ দান কবি-প্রতিভারূপ 'অলৌকিক আনন্দের ভার, নজরুলের ছিল জন্মলব্ধ। তাই গদ্যে পদ্যে, গানে, কবিতায়, গল্প ও উপন্যাসে তিনি নিজেকে অজস্র ও অশ্রান্ত ভাবে প্রকাশ করিয়াও যেন তৃপ্তি পাইতেছিলেন না।—হাসি, উল্লাস ও আনন্দের মধ্যেও তিনি নিজেকে ঢালিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সুবিখ্যাত কাব্য-গ্রন্থ 'অগ্নিবীণার' অধিকাংশ কবিতা এ যুগেই রচিত—আবার সঙ্গে সঙ্গে 'বাঁধনহারা' নামক পত্রোপন্যাসও এ সময় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছিল 'মোসলেম ভারত' নামক মাসিক পত্রে। বলা বাহুল্য, ঐ পত্রিকাতেই তাঁহার 'বিদ্রোহী' ও 'কামাল পাশা' নামক কবিতাদ্বয় একই সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়া বাংলা-সাহিত্যে এক বিরাট আলোড়নের স্বষ্টি করিয়াছিল। ঐ দুই কবিতা, বিশেষ করিয়া 'বিদ্রোহী' প্রকাশের পর হইতেই কবির খ্যাতি দেশব্যাপী ছড়াইয়া পড়ে। এই সময় শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক 'নবযুগ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ঐ পত্রিকা সম্পাদনার ভার পড়িয়াছিল দেশকর্মী কম্‌রেড্ মুজাফ্‌ফর আহমদের

উপর, নজরুল তখন মুজাফ্‌ফর সাহেবের সহকর্মী হিসাবে ঐ পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কিছু দিন কাজ করিয়াছিলেন।

কিছু দিন পর নজরুল একদিন হঠাৎ কলিকাতা হইতে অন্তর্ধান করিলেন। বন্ধু ও সহবাসীরা কেহই কিছু জানেন না, কোথায় গিয়াছেন সেই খবরও অনেক দিন ছিল অজ্ঞাত। পরে অবশ্য খবর পাওয়া গেল নজরুল কুমিল্লায় আছেন। কেন হঠাৎ কুমিল্লা গেলেন, কুমিল্লায় কত দিন থাকিবেন, কলিকাতায় কখন ফিরিবেন, এইসব খবর কেহই জানে না, তিনি কাহাকেও টুঁ শব্দটিও বলিয়া আসেন নাই। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কাটিয়া যায় তবুও কবির আর কোন খোঁজ খবর নাই। লোকমুখে ভালমন্দ সত্যমিথ্যা নানা রকম গুজব রটিতে লাগিল। শোনা যায়, সেই সময় তিনি ত্রিপুরা জেলার দৌলৎপুর* গ্রামেও কিছুদিন ছিলেন। দৌলৎপুর হইতে কুমিল্লা শহরে ফিরিয়া আসিয়া কবি শহরটিকে একেবারে মাতাইয়া তোলেন। 'ছায়ানট' 'পূবের হাওয়া' ও 'ঝিঙে ফুলের' কিছু কিছু কবিতা এ সময় কুমিল্লা ও দৌলৎপুরে বসিয়াই তিনি রচনা করেন। সেই সময় (১৯২১ খ্রীঃ) প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ ভারত ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। কংগ্রেস সেই উপলক্ষে ঘোষণা করিয়াছিল দেশব্যাপী হরতাল। প্রতিবাদ মিছিলে গাহিবার উপযোগী একটি গান লিখিয়া দিবার জন্য কুমিল্লার কংগ্রেস্ কর্তৃপক্ষ নজরুলকে অনুরোধ করেন। নজরুল শুধু যে এ অনুরোধ পালন করিলেন তাহা নহে, স্বয়ং হারমোনিয়ম গলায় বাঁধিয়া মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে সারা শহরময় টহল দিয়া নিজে সেই গান গাহিয়া চলিলেন:

'ভিক্ষা দাও, ভিক্ষা দাও, ভিক্ষা দাও
ওগো পুরবাসী,
সন্তান দ্বারে উপবাসী।
চাই মানবতা ভিক্ষা দাও।
পুরুষ সিংহ জাগোরে
সত্য মানব জাগোরে
তন্দ্রা অলস জাগোরে
একবার ভুলে ফিরিয়া চাও।' ইত্যাদি

---

* জনশ্রুতি তিনি ওখানে নার্গিস নামের এক মেয়েকে বিয়েও করেছিলেন। এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। বিয়ে যদি হয়েও থাকে তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। লেখক।

অনতিবিলম্বে মৌলানা মোহাম্মদ আলি ও মৌলানা শওকত আলিকে যখন গ্রেপ্তার করা হইল, তখন নজরুল আবার বজ্র নির্ঘোষে গাহিয়া উঠিলেন:

'জাগেন সত্য ভগবান
ওরে আমাদের (ও) এই বক্ষমাঝ;
তোরা আল্লার গলে কে দিবি শিকল,
দেখে নেবো মোরা তাহাই আজ।' ইত্যাদি

ইহার কয়েক মাস পর কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া নজরুল নিজেই 'ধূমকেতু' (১৩২৯) নাম দিয়া এক অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির করেন। রবীন্দ্রনাথ ধূমকেতুকে আশীর্বাদ জানাইয়া লিখিলেন:

'আয় চলে আয়রে ধূমকেতু
আঁধারে বাঁধ অগ্নি-সেতু
দুর্দিনের এই দুর্গ শিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয়-কেতন,
অলক্ষণের তিলকরেখা—
রাতের ভালে হোক না লেখা
জাগিয়ে দেরে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধ চেতন।'

ধূমকেতুর সম্পাদক কবি, কাজেই ধূমকেতুতে যে সব সংবাদ ছাপা হইত তার শিরোনামাও ছাপা হইতে লাগিল কবিতায়। অদ্ভুত সব মিল দিয়া, সরকার ও সরকারের খয়েরখাঁ-দের খোঁচা দিয়া, ছড়ার ছন্দে এইসব শিরোনামা রচিত হইত, এই ভাবে 'ধূমকেতুর' প্রতি সংখ্যায় তিনি দেশদ্রোহীদের করিতে লাগিলেন নাজেহাল। সম্পাদকের পরিবর্তে লেখা হইত, 'সারথি'। আর ধূমকেতু-সারথি' প্রতি সংখ্যায় গদ্যে ও পদ্যে সম্পাদকীয় প্রবন্ধের নামে বর্ষণ করিতে লাগিলেন আগুণ। কাজেই অল্প দিনের মধ্যেই 'ধূমকেতু' রাজরোষে পতিত হইল। সম্পাদক ওর্ফে 'সারথি' হইলেন কলিকাতার চীফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত। বিচারে

কবির এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইল। এই সময় কবি আদালতে যে 'জবানবন্দী' দিয়াছিলেন তাহা নানা কারণে উল্লেখযোগ্য, তাহাতে তাঁহার কবি-আত্মার যে নির্ভীক প্রকাশ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার তুলনা অন্যত্র বিরল। তাই সেই 'জবান বন্দীর' কিয়দংশ এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে সন্নিবেশ করা হইল। দণ্ডের পর কবিকে কিছুদিন আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে রাখা হইয়াছিল। তারপর হুগলী জেলে পাঠানো হয়। সেখানে জেল কর্তৃপক্ষের অন্যায় ও অসঙ্গত ব্যবহারের প্রতিবাদে কবি আরম্ভ করেন অনশন-ধর্মঘট। ফলে প্রতিদিনই কবির উপর প্রয়োগ হইতে লাগিল নূতন নূতন শাস্তি। কারাগারের আইনে কয়েদীদের জন্য যত রকম শাস্তির ব্যবস্থা আছে, তাহার সব কয়টিই একে একে কবির উপর পরীক্ষা করা হইল। কিন্তু 'বিদ্রোহী' কবি তাহাতে বিন্দুমাত্রও দমিলেন না। বরং তিনি নিত্য নূতন নূতন ব্যঙ্গ সঙ্গীত রচনা করিয়া ও সদলবলে তাণ্ডব নৃত্য সহযোগে তাহা গাহিয়া জেল কর্তৃপক্ষকে করিয়া তুলিলেন ব্যতিব্যস্ত ও অতিষ্ঠ। জেলখানায় রচিত এই ধরণের সঙ্গীতগুলির মধ্যে 'শিকল পরার গান' তখন জেলখানার বাহিরেও অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সুপরিচিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহা হইতে কয়েকটি লাইন নিম্নে উদ্ধৃত হইল:

এ শিকল পরা ছল মোদের
        এ শিকল পরা ছল।
এই শিকল পরেই শিকল
        তোদের করবো রে বিকল॥
তোদের বন্ধ কারায় আসা
        মোদের বন্দী হতে নয়।
ওরে ক্ষয় করতে আসা
        মোদের সবার বাঁধন ভয়।
এই বাঁধন পরেই বাঁধন ভয়কে
        করবো মোরা জয়,
এই শিকল-বাঁধা পা নয়
        এ শিকল ভাঙা কল॥

কবির অনশনের সংবাদে দেশব্যাপী একটা দারুণ উদ্বেগের সঞ্চার হয়, এবং শিক্ষিত বাঙালী মাত্রই বিচলিত হইয়া পড়েন! দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট বড় কবির অনেক হিতৈষী ও বন্ধু তাঁহাকে অনশন ত্যাগ করাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হন নাই। ব্যারিষ্টার ডঃ স্যার আবদুল্লাহ সোহ্‌রওয়ার্দী তখন বে-সরকারী জেল পরিদর্শক ছিলেন। নজরুলের বন্ধু ও দেশের কয়েক জন বড় বড় নেতার অনুরোধে তিনিও হুগলী জেলে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া কবিকে অনশন ভঙ্গের অনুরোধ করেন, কিন্তু তিনিও বিফলকাম হন। অবশেষে অনশনের উনচল্লিশ দিনের দিন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সভাপতিত্বে কলিকাতায় এক বিরাট জনসভা ডাকা হয় এবং ঐ সভায় জেল কর্তৃপক্ষের আচরণের প্রতিবাদের সঙ্গে সঙ্গে সর্বসম্মতিক্রমে অন্য এক প্রস্তাবে নজরুলকে অনশন ত্যাগের জন্য দেশবাসীর পক্ষ হইতে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়। রবীন্দ্রনাথ তখন শিলঙে ছিলেন, নজরুলের অনশন সংবাদে তিনিও অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়েন এবং জেল কর্তৃপক্ষের ঠিকানায় নজরুলকে নিম্নলিখিত তার করেন:

"Give up hunger-strike. Our literature claims you." কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয়, কর্তৃপক্ষ ঐ তার নজরুলের হাতে না দিয়া, এমন কি ঐ বিষয়ে তাঁহাকে কিছু না জানাইয়া রবীন্দ্রনাথকে "Addressee not found" লিখিয়া ফেরৎ পাঠাইয়া দেন। তাঁহার অনশন ভাঙ্গাইবার জন্য তাঁহার মাতা জাহেদা খাতুনও জেলে তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, তাঁহার মাতাকে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। তাঁহার মা এই দুঃখ আ-মৃত্যু ভুলিতে পারেন নাই। ১৩২৬ সালের পর মাতা পুত্রে আর সাক্ষাৎ হয় নাই। ১৩৩৫ সালের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ তাঁহার মা লোকান্তর গমন করেন।

চল্লিশ দিন পরে নজরুল অনশন ভঙ্গ করিয়াছিলেন। তিনি জেলে থাকিতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'বসন্ত' নাটিকাটি নজরুলের নামে উৎসর্গ করেন।

হুগলী জেল হইতে নজরুলকে স্থানান্তরিত করা হয় বহরমপুর জেলে। জেল হইতেও কবি বিভিন্ন সাময়িক পত্রে বহু কবিতা পাঠাইতেন। তখনকার দিনে কবিতার সাহিত্যিক মূল্য যাহাই থাকুক না কেন আর্থিক মূল্য কিছুই ছিল না। এই বিষয় এক মাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন রবীন্দ্রনাথ অর্থাৎ এক মাত্র রবীন্দ্রনাথের কবিতারই মূল্য দেওয়া হইত। কিন্তু নজরুলের বেলায় 'প্রবাসী' মাসিকপত্রের সুযোগ্য সম্পাদক পরলোকগত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অত্যন্ত গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি নজরুলকে ছোট বা বড় প্রত্যেকটি কবিতার জন্য দশ টাকা হিসাবে মূল্য দিয়া কবি ও কবিতার সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন।

বহরমপুর জেলে থাকিতেই নজরুলের 'দোলন চাঁপা' কাব্যপুস্তক প্রকাশিত হয়। জেল হইতে মুক্তি পাইবার পর ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল, শুক্রবার কবির বিবাহ হয়। বিবাহের পূর্বে তাঁহার স্ত্রীর নাম ছিল আশালতা সেনগুপ্তা পরে নামকরণ হয় কাজী প্রমীলা নজরুল। বিবাহ মুসলমান ধর্মানুসারেই হইয়াছিল। 'মা ও মেয়ে' নামক উপন্যাসের লেখিকা মিসেস্ এম্, রহমান সাহেবার উদ্যোগেই এই বিবাহকার্য সম্পন্ন হয়। পরবর্তীকালে কবি মিসেস্ এম্, রহমানের নামে তাঁহার 'বিষের বাঁশী' নামক প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করেন। বিবাহের পর নজরুল কিছুকাল সপরিবারে হুগলীতে ছিলেন। ১৩৩২ সালের ১লা পৌষ 'শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ-সম্প্রদায়ের' সাপ্তাহিক মুখপত্র রূপে 'লাঙল' প্রকাশিত হয়। নজরুল ছিলেন ঐ পত্রিকার প্রধান পরিচালক, যদিও সম্পাদক হিসাবে নাম ছাপা হইয়াছিল অন্যলোকের। 'লাঙলের' প্রথম সংখ্যায় নজরুলের বিখ্যাত কবিতা 'সাম্যবাদী' প্রকাশিত হইয়াছিল। কবি এই কবিতায় অত্যন্ত দৃপ্তকণ্ঠে মানবাত্মার মহিমা ও মনুষ্যত্বের জয় ঘোষণা করিয়াছেন। সুবিখ্যাত ঐ 'সাম্যবাদী' কবিতায় তিনি বলিয়াছেন:

'সাম্যবাদী স্থান,
নাইক এখানে কালা ও ধলার আলাদা গোরস্থান
নাইক এখানে ধর্মের ভেদ,- শাস্ত্রের কোলাহল,
পাদরী-পুরুত-মোল্লা-ভিক্ষু এক গ্লাসে খায় জল'।
ইত্যাদি।

ইহার কিছুদিন পর নজরুল হুগলী হইতে বাস তুলিয়া সপরিবারে কৃষ্ণনগর চলিয়া আসেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল হইতে কলিকাতায় এক ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হয়। এই হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার আবহাওয়ায় কবি তাঁহার বিখ্যাত গান 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' রচনা করেন এবং কৃষ্ণনগরে কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনে গানটি সর্বপ্রথম গাওয়া হয়। কৃষ্ণনগরে অবস্থানকালে তাঁহার অনেকগুলি বিখ্যাত কবিতা ও গান রচিত হয়। আর রচিত হয় কৃষ্ণনগরকে পটভূমি করিয়া তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস 'মৃত্যুক্ষুধা'।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট 'লাঙল' পত্রিকার নাম পরিবর্তন করিয়া 'গণ-বাণী' রাখা হয় এবং সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন কমরেড্ মুজাফফর আহমদ। 'লাঙল' ও 'গণ-বাণীর' যুগে নজরুলের রাজনৈতিক মতবাদ কিছুটা নূতন রূপ পরিগ্রহ করে। এখন হইতে তাঁহার রচনায় নিরন্ন ও নিগৃহীতের দুঃখ অনেকটা নূতন ও জোরালো ভঙ্গিতে ফুটিয়া উঠিতে থাকে। তাঁহার 'ফণি মনসা', 'সর্বহারা', 'প্রলয়শিখা' ও 'সন্ধ্যা' কাব্যে এর সুস্পষ্ট পরিচয় রহিয়াছে।

বহু কবির মতো নজরুলকেও সমুদ্র আকর্ষণ না করিয়া পারে নাই। তিনি বার কয়েক চট্টগ্রামের অদূরে বঙ্গোপসাগরে গিয়া সমুদ্র-দৃশ্য ও সমুদ্র-স্নান পরম আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করিয়াছেন। এই অঞ্চলের 'সাম্পান' ও 'সাম্পানের মাঝি' জোগাইয়াছে তাঁহার মনে বহু গানের প্রেরণা। সমুদ্রের সৌন্দর্যে কবি মাঝে মাঝে এতই মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন যে, তিনি নাকি বার কয়েক ইংরেজ কবি শেলীর মত তাঁহারও যেন সমুদ্র-সমাধি ঘটে এই কামনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার 'সিন্ধু হিন্দোল' ও 'চক্রবাকের' অধিকাংশ কবিতা সমুদ্র-প্রেরণায় রচিত। চির-সঙ্গীত-প্রিয় নজরুল এই সময় যেন সঙ্গীতের নূতন রাজ্য খুঁজিয়া পাইলেন। তাঁহার বিশিষ্ট-বন্ধু বিখ্যাত গায়ক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার লিখিয়াছেন: 'এই সময় নজরুল রয়েছেন একদিন আমার বাড়ীতে। দু'টি হিন্দুস্থানী ভিখারী—একজন পুরুষ, অপরটি নারী, হারমোনিয়ামের সঙ্গে উর্দু গজল গেয়ে উর্ধমুখে চলেছে সারা পল্লীতে

মধুবর্ষণ করিতে করিতে। নজরুলের আগ্রহে আমার বৈঠকখানায় তাদের ডেকে এনে গান শোনার ব্যবস্থা হলো। অনেকগুলো গান শুনিয়ে তারা বিদায় নিল। নজরুল বসলেন গান লিখতে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই লিখে ফেল্‌লেন গান। তাঁর গজল গান লেখার শুরু এখান থেকে। গজল গানের নেশা তাঁকে যেন পেয়ে বসলো।' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার গানের যে একটা বিপুল অর্থকরী দিক আছে তাহার প্রতি লুব্ধ দৃষ্টি পড়িল গ্রামোফোন রেকর্ড ব্যবসায়ীদের। মোটা বেতনের লোভ দেখাইয়া তাঁহারা নজরুলকে তাঁহাদের ব্যবসার-ফাঁদে বাঁধিয়া ফেলিলেন। এই ভাবে নজরুল-দোহনের একটা পাকা ব্যবস্থা তাঁহারা করিয়া বসিলেন। ইহাতে নজরুলের আর্থিক সমস্যার কিছুটা সমাধান হইলেও বাংলা সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্থ হইল চিরতরে।

নলিনীবাবু লিখিয়াছেন, 'গ্রামোফোন রেকর্ডের জন্য লেখা অধিকাংশ গানই তাঁর প্রাণের প্রেরণায় নয়—পেটের জ্বালায় লেখা। অমুক গায়ক বা গায়িকার জন্য, এই ধরণের গান, এই জাতীয় সুরের কাঠামোতে, এতটুকু পরিসরে, এতটা সময়ের মধ্যে বেঁধে দিতে হবে—সেই ধরণের ফরমাইশে রচিত পাইকারী গানে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়ে তিনি অচিন্তিতপূর্ব শক্তির পরিচয় দিয়েছেন কিন্তু নজরুল--প্রতিভার প্রকাশ স্বাধীন-প্রেরণা সম্ভূত স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারল না, বাংলাদেশের এই দুঃখ চিরকাল রয়ে যাবে।'

এই সময় হঠাৎ নজরুলের সংসারে এক মহা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। তাঁহার চারি বৎসরের পুত্র সুদর্শন ও মধুর-স্বভাব 'বুলবুল' বসন্ত রোগে মারা গেল। শোকে নজরুল ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। এই শোকের আঘাত কিছুতেই ভুলিতে না পারিয়া তিনি শেষ কালে অধ্যাত্ম-রাজ্যে শান্তির সন্ধান করিতে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার মন আকৃষ্ট হইল নানা যৌগিক সাধনার দিকে। এই পথে তাঁহার সৃজনী প্রতিভারও যেন নূতন করিয়া উন্মেষ হইল। বহু লুপ্ত প্রায় রাগ রাগিনী তিনি সঙ্গীত বিশেষজ্ঞদের কাছ হইতে উদ্ধার করিয়া সেই সব সুরে নূতন নূতন গান রচনা করিতে লাগিলেন। জীবনে যখন আবার নূতন

করিয়া নব সৃষ্টির জোয়ার আসিয়াছে, তখন চির-আনন্দমুখর নজরুল পারিবারিক অশান্তিতে পীড়িত ও বিপর্যস্ত। স্ত্রী দীর্ঘ দিন ধরিয়া পক্ষাঘাত রোগে পঙ্গু, অজস্র অর্থব্যয় ও সম্ভব অসম্ভব সব রকম চিকিৎসায়ও যখন কোন ফল পাওয়া গেল না, তখন কবি এক এক দিন নৈরাশ্যে দিশাহারা হইয়া পড়িতেন। অনেকে মনে করেন, কবির বর্তমান অসুখের উদ্ভব এইসব কারণেই। কবির বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে লিখিতে যাইয়া কবি আবদুল কাদির লিখিয়াছেন 'তাঁর বলিষ্ঠ দেহশ্রী বিনষ্ট হয়েছে, সেই আয়ত চক্ষুতে আর অতলস্পর্শী দৃষ্টী নেই, মুখে উচ্ছল হাসির ফোয়ারা স্তব্ধ হয়ে গেছে, কণ্ঠের অনর্গল বাণী মুর্চ্ছাহত, স্মৃতিশক্তি লুপ্তপ্রায়। দীর্ঘ রোগ ভোগের পর স্ত্রীর হয়েছে মৃত্যু। আয়ের সকল পথ বহুদিন থেকে বন্ধ, সংসারের সকল দিকে অভাব-রাক্ষসী মুখব্যাদান করে আছে। তাঁর দুরারোগ্য রোগ ও দুরবস্থার সংবাদ মহাকবি মাইকেল মধুসূদনের অন্তিম জীবনের দুঃখ স্মরণ করিয়ে দেয়।'

দ্বিতীয় অধ্যায়
মানুষ নজরুল

মানুষ হিসাবে নজরুলের মত এমন সরল, এমন আত্মভোলা, এমন বন্ধু ও এত বড় উদার মহাপ্রাণ কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার প্রাণখোলা হাসি যিনি একবার শুনিয়াছেন, তিনি তাহা কখনো ভুলিতে পারিবেন না। সমস্ত মানুষের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা শুধু তাঁহার রচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে, প্রতিদিনের আচার-ব্যবহারে, আলাপ ও কথোপকথনেও তার পরিচয় মেলে। তাঁহার পরিচিত, ভক্ত-অনুরক্ত, পাঠক ও অন্যান্য সাহিত্যসেবিগণ তাঁহার সম্বন্ধে যে সব রচনা লিখিয়াছেন ও নানা সভা সমিতিতে তাঁহার সম্বন্ধে যে সব মন্তব্য করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটিতেই তাঁহার উদার হৃদয়ের কথা, মহাপ্রাণতার কথা, বন্ধু প্রীতির কথা, সর্বোপরি তাঁহার স্বদেশ ও মানব প্রেমের কথা অকুণ্ঠিত ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। কেহই তাঁহাকে এতটুকু সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দিতে কখনো দেখে নাই।

সাহিত্যিক ও কবি সমাজে দলাদলি, হিংসা, বিদ্বেষ, ঈর্ষা ও উপদলীয় ঝগড়া বিশেষ কোন নূতন কথা নহে। সব দেশের সব যুগের সাহিত্যের ইতিহাসে ইহার নজির পাওয়া যায়। আমাদের দেশও তাহার ব্যতিক্রম নহে। এক সময় রবীন্দ্রনাথও ঈর্ষা-কাতর সাহিত্যিকদের আক্রমণের লক্ষ্য হইয়াছিলেন। ব্যক্তিগত ও উপদলীয় ঈর্ষার আঘাত নজরুলের উপরও কম হয় নাই। কিন্তু নজরুল কখনো আঘাতের পরিবর্তে প্রতি-আঘাত করেন নাই। সুপ্রসিদ্ধ কবি কালিদাস রায় (কবি শেখর) এই বিষয়ে মন্তব্য করিতে যাইয়া নজরুল সম্বন্ধে অত্যন্ত সত্য কথাই বলিয়াছেন: "কাজী ছিল অসূয়ার অতীত।"

মানুষ-নজরুল ইসলামের সঠিক পরিচয় পাইতে হইলে, তাঁহার সঙ্গে যাঁহারা অন্তরঙ্গভাবে মিশিয়াছেন, তাঁহার জীবন ও মনের সঙ্গে

যাঁহাদের ঘটিয়াছে ঘনিষ্ঠ সংযোগ, তাঁহাদের মুখ ও লেখনী হইতেই তাহার পরিচয় সংগ্রহ করিতে হইবে। তাই, বিশেষ করিয়া এই পরিচ্ছেদে আমরা সেই পন্থাই অনুসরণ করিয়াছি।

স্বনামধন্য কবি-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু নজরুল সম্বন্ধে লিখিয়াছেনঃ "বিশ্ববিদ্যালয়ের"* সিংহদ্বারে একটি মুসলমান অধ্যাপকের বাসা, সেখান থেকে নজরুলকে ছিনিয়ে নিয়ে আমরা কয়েকটি উৎসাহী যুবক চলেছি আমাদের প্রগতির আডডায়। বিকেলের ঝকঝকে রোদ্দুরে সবুজ রমনা জল্‌ছে। হেঁটেই চলেছি আমরা, কেউ বাইসাইকেলটাকে হাতে ধরে ঠেলে নিয়ে চলেছে। জন-বিরল সুন্দর পথ আমাদের কলরবে মুখর, নজরুল একাই একশো। চওড়া মজবুত জোরালো শরীর, বড়ো বড়ো লাল-ছিটে লাগা মদির তাঁর চোখ, মনোহর মুখশ্রী, লম্বা লম্বা ঝাঁকড়া চুল তাঁর প্রাণের ফুর্তির মতোই অবাধ্য, গায়ে হলদে কিংবা কমলা রঙের পাঞ্জাবী এবং তার উপর কমলা কিম্বা হলদে রঙের চাদর--দুটোই খদ্দরের। 'রঙিন জামা পরেন কেন?' 'সভায় অনেক লোকের চট করে চোখে পড়ে, তাই--'! বলে ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় হো হো করে হেসে উঠলেন।

আমাদের টিনের ঘরে নিয়ে এলাম তাঁকে, তারপর হারমোনিয়ম চা, পান, গান, গল্প, হাসি। কখন আডডা ভাঙ্গলো মনে নেই--নজরুল যে ঘরে ঢুকতেন সে ঘরে ঘড়ির দিকে কেউ তাকাতো না। আমাদের প্রগতির আডডায় বার কয়েক এসেছেন তিনি, প্রতিবারেই আনন্দের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। এমন উদ্দাম প্রাণশক্তি কোন মানুষের মধ্যে আমি দেখিনি। দেহের পাত্র ছাপিয়ে সব সময় উছলে পড়েছে তাঁর প্রাণ, কাছাকাছি সকলকেই উজ্জীবিত ক'রে, মনের যত ময়লা, যত খেদ, যত গ্লানি সব ভাসিয়ে দিয়ে। সকল লোকই তাঁর আপন, সব বাড়িই তাঁর নিজের বাড়ী। জোর করে একবার ধরে আনতে পারলে নিশ্চিন্ত। আর উঠবার নাম করবেন না—বড়ো বড়ো জরুরি এনগেজমেণ্ট ভেসে যাবে। ঝোঁকে পড়ে, দলে পড়ে, সবই করতে পারেন। একবার কলকাতার খেলার মাঠে বুঝি মোহনবাগান জিতেছিল, না কি

* ঢাকা।

এমনি আশ্চর্য কিছু ঘটেছিলো, ফূর্তির ঝোঁকে কল্লোল-দলের চার পাঁচজন খেলার মাঠ থেকে শেয়ালদা ষ্টেশনে এবং শেয়ালদা থেকে একবারে ঢাকায় চলে এলেন—নজরুলকেও ধরে নিয়ে এলেন সঙ্গে। হয়ত দু'দিনের জন্য কলকাতার বাইরে কোথাও গান গাইতে গিয়ে সেখানেই একমাস কাটিয়ে এলেন।"* সত্যই প্রথম যৌবনে নজরুল ছিলেন এই রকম বে-পরওয়া। সংসার-কর্তব্যের কোন শৃঙ্খলই তাঁহাকে তখন বাঁধিয়া রাখিতে পারিত না।

সুকবি শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় নজরুল সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে নজরুল চরিত্রের এক অসঙ্কোচ, নির্ভীক ও বেপরওয়া ভাবেরই পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন: "জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবার সময় তেমন তেমন বড়লোককেও সমীহ করে যেতে দেখেছি—অতি বাক্‌পটুকেও ঢোঁক গিলে কথা বলতে শুনেছি—কিন্তু নজরুলের প্রথম ঠাকুর বাড়ীতে আবির্ভাব সে যেন ঝড়ের মত। অনেকে বল্‌ত, তোর এ-সব দাপাদাপি চলবে না জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে, সাহসই হবে না তোর এমনি ভাবে কথা কইতে। নজরুল প্রমাণ করে দিলে যে সে তা' পারে। তাই একদিন সকালবেলা—"দে গরুর গা ধুইয়ে" এই রব তুল্‌তে তুল্‌তে সে কবির ঘরে গিয়ে উঠল—কিন্তু তাকে জানতেন বলে কবি বিন্দুমাত্রও অসন্তুষ্ট হলেন না। শুনেছি, অনেক কথাবার্তার পর কবি নাকি বলেছিলেন—'নজরুল, তুমি নাকি তলোয়ার দিয়ে আজকাল দাড়ি কামাচ্ছ ক্ষুরই ও-কার্যের জন্য প্রশস্ত এ-কথা পূর্বাচার্যগণ বলে গেছেন।'

নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটুকুতে রহিয়াছে নজরুলের সর্বজন-হৃদয় জয় করিতে পারার এক অদ্ভুত পরিচয়। অতি বড় গোঁড়া মানুষেরও অকৃত্রিম স্নেহ, প্রীতি ও শ্রদ্ধা নজরুল লাভ করিয়াছিলেন নিজের অকৃত্রিম হৃদয়ঔদার্য ও মহাপ্রাণতার গুণেই। তাই সাবিত্রীবাবু লিখিয়াছেন: 'নজরুল ধর্মের চেয়ে মানুষকে বড় করে দেখেছে সব সময়,—তাই ধর্ম নির্বিশেষে নজরুলকে ভালবাসতে কারো বাঁধেনি। কতদিন

---

* কবিতা: কার্তিক—পৌষ ১৩৫১

আমাদের বাড়ীতে গানের মজলিস বসেছে, খাওয়া দাওয়া করেছি আমরা এক সঙ্গে, গোঁড়া বামুনের ঘরের বিধবা মা, নজরুলকে নিজের হাতে খেতে দিয়েছেন—নিজের হাতে বাসন মেজে ঘরে তুলেছেন, বলেছেন, ও ত আমারও ছেলে, ছেলে বড় না আচার বড়?'

অনুরূপ আর একটি ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন যুগান্তর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়—'একদিন সন্ধ্যাবেলা বসে আছি তাঁর (নজরুলের) ঘরে। একদল ছেলে এলো—আমার চেয়ে বয়সে বড়। ছেলেরা একে একে নজরুলকে প্রণাম করলো, তাঁর পায়ের ধূলো মাথায় নিলো। আমি বিস্মিত। কেননা এমন দৃশ্যের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। ব্রাহ্মণের ঘরের ছেলে আমি। কাজেই পায়ের ধূলো সম্পর্কে জ্ঞান টনটনে। পরিচয়ে জানলাম, শ্রীরামপুর কলেজের ছাত্রদল শ্রদ্ধা জানাতে এসেছে নজরুলকে। হিন্দুর ছেলে, ব্রাহ্মণের ছেলেরা মুসলমানকে প্রণাম করে গেল। বললে, কবিদের কোন জাত নেই।'

সব রকম মানুষের হৃদয় নজরুল নিজ গুণেই জয় করিয়াছিলেন। কারাগারের কঠিনহৃদয় প্রহরীদের মন পর্যন্ত তিনি আপন স্বভাব-মাধুর্যে কি ভাবে গলাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহার এক মনোজ্ঞ চিত্র দিয়াছেন নজরুল-সখা শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার: "আমার একবার ইচ্ছা হ'লো বহরমপুর জেলে নজরুলকে দেখতে যাবার, গেলাম বহরমপুরে। জেলা কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করলাম। বিনা আয়াসেই আবেদন মঞ্জুর হ'লো। বেলা দশটা। হাজির হলাম জেলের ভেতরকার আফিস ঘরে। নজরুলের কাছে জেলের একজন কর্মচারী খবর পাঠালেন। কয়েক মিনিট পরেই এল নজরুল। এসেই তিনি হুকুম করলেন জেলকর্মচারীর উপর আমার চা ও জলযোগের জন্যে। আমি তো হা। এ আবার কি রকম কয়েদী রে বাবা। জেল-আফিস ঘরেই অফিসারদের সম্মুখে আমাদের বিশ্রাম্ভালাপ শুরু হ'লো। কলকাতা থেকে অন্তর্ধানের পর সে-দিন পর্যন্ত আদ্যোপান্ত ইতিহাস। হুগলীর জেল কর্তৃপক্ষকে যে-সব গান গেয়ে ক্ষেপিয়ে ছিলেন সেই গানগুলোও গাইতে আরম্ভ করলেন। জেলখানার আফিসে বসে গেল গানের আসর।"

নজরুলের হাত এবং দিল দুই-ই ছিল অত্যন্ত দরাজ। দরাজ হস্তের জন্য তিনি প্রচুর অর্থোপার্জন করিয়াও দুর্দিনের জন্য এক পয়সাও সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। আর তাঁহার দরাজ দিলের কথা কে না জানেন? তাঁহার এই দরাজ দিলের সুযোগ লইয়াই অনেকে তাঁহার পুস্তক প্রকাশ ও বিক্রয় করিয়া নিজেরা হইয়াছেন বড়লোক আর কবি রহিয়া গিয়াছেন চির-কপর্দকহীন।

সাহিত্যিকগণকে, বিশেষ করিয়া তরুণ সাহিত্যসেবীদের, শক্তি ও প্রতিভা নির্বিশেষে সকলকেই তিনি প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতেন, আর অকুণ্ঠিত কণ্ঠে সকলকে দিতেন উৎসাহ। এই গ্রন্থের লেখকের যখন মাত্র একটি কি দুইটি গল্প সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তখন নজরুল ঢাকা মুসলিম হল হইতে তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিয়া প্রচুর উৎসাহ দিয়াছিলেন এবং তাঁহার 'নবাব আমির বাদশাহ' গল্পটি যখন 'সওগাতে' প্রকাশিত হয় (পৌষ, ১৩৩৫), তখন কবি ছিলেন চট্টগ্রামে, ঐ গল্পটি তাঁহার হাতে পড়িতেই তিনি যে শুধু আগ্রহ করিয়া সমবেত তরুণ সাহিত্যিকদেরে গল্পটি নিজে পড়িয়া শুনাইলেন, তাহা নহে, গল্পটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া লেখককেও করিলেন উৎসাহিত। তাঁহার 'রুবাইয়াতে হাফিজ' যখন প্রকাশিত হইল তখন তার এক কপি এই লেখককে উপহার দিয়াছিলেন এবং তাহাতে নিজ হস্তে লিখিয়া দিয়াছিলেন—"অনাগত কথা-শিল্পীকে।" বলা বাহুল্য এই লেখকের তখন কোন পুস্তকই প্রকাশিত হয় নাই! এই ভাবে কত তরুণ সাহিত্য-সেবীকে তিনি যে কত ভাবে উৎসাহিত করিয়াছেন তাহার কোন ইয়ত্তা নাই। কবি মহীউদ্দিন লিখিয়াছেনঃ—" ...একদিন ভোর বেলা একটি লোক এলেন। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। সুগঠিত শরীর। সিংহের মত চেহারা। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি আমাদের মাঝে একটা মুক্তছন্দ ঝড়ের তোলপাড় তুলে দিলেন, কি তার প্রাণখোলা হাসি। প্রাণের ঐশ্বর্য যেন উপচে পড়ছে। আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন মুজাফফর আহমদ (কমরেড্)। বললেন, কবিতা লেখে। "কবিতা! কই দেখি!" তারপর আমার ছোট্ট বেতের বাক্সটি খুলে তিনি আমার খাতাখানা বের করে কবিতাগুলি

দেখ্‌লেন। নিজে আবৃত্তি করলেন এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় আমাকে অভিভূত করে দিলেন। তারপর বহুবার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে। যখনই দেখেছি কোন একটি কবিতা তাঁর ভাল লেগেছে তখন তিনি উৎসাহে লাফিয়ে উঠেছেন। সেই খ্যাত অথবা অখ্যাত কবির উদ্দেশে প্রাণখোলা প্রশংসা ঢেলে দিয়েছেন।"

নজরুলের জীবনে কোন দিন কোন রকমের গোঁড়ামী, সংকীর্ণতা ও ধর্মান্ধতা স্থান পায় নাই। তাঁহার মন ও জীবন সব সময় ছিল, আকাশের মত সীমাহীন, সাগরের মত উদার। 'কিশোর বাংলা' সম্পাদক স্বামী প্রেমঘনানন্দ তাঁহার সহিত কবির প্রথন পরিচয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন:—"নজরুল আমাকে সাদরে কাছে ডেকে নিলেন। প্রথম আলাপটা হয়েছিল আমাদের ধর্ম সম্পর্কে। আমি যা আশা করেছিলুম, দেখলুম, নজরুল তার চেয়ে অনেক উদার ও গভীরতা সম্পন্ন। শুধু ধর্মের কূট তর্ক করেই তাঁর ধর্ম বিশ্বাস শেষ হয় না। তিনি সেটিকে তাঁর জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়ে নিয়েছেন। আমি মনে মনে ভাবতে লাগলুম নজরুলকে হিন্দু বলব না মুসলমান বলব? দেখলাম, তাঁর মাঝে কোন রকম গোঁড়ামি বা সংকীর্ণতা নেই। হিন্দুদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পাবার মোহে তিনি মুসলমান ধর্মের মূল নীতিটুকু ছেড়ে দেননি।"* 'যুগান্তর'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁহার সঙ্গে কবির প্রথম পরিচয়ের বর্ণনা দিয়েছেন এই ভাবে: 'আমি চেহারা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম—বড় বড় বাব্‌রিকাটা চুল, বড় বড় চোখ, উজ্জ্বল এবং তীক্ষ্ণ। গোল মুখ। সুগঠিত দেহ। সামনে এসে দাঁড়ালেন কবি, না সন্ন্যাসী, না বাউল! হঠাৎ বিদ্যুৎ-ঝলকের মত আমার কিশোর চিত্তে খেলিয়া গেল এই প্রশ্নটা! আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠ্‌লেন নজরুল—"ওঃ বুঝেছি, তোর নাম বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, না রে? তোর হাত তো চমৎকার, এ বয়সে এত ভাল কবিতা লিখতে পারিস?" আমি ত হতভম্ব! আলাপ নেই, পরিচয় নেই, জীবনে কোন দিন দেখা হয়নি। এক অখ্যাত অপরিচিত বালক আমি। কি করে নজরুল ইসলাম আমাকে দেখা মাত্র

* গুলিস্তাঁ—নজরুল-সংখ্যা

চিনলেন? বিস্ময়ের আমার অবধি রইল না। এই সেই 'বিদ্রোহী' কবি?---যাদুবিদ্যাও কিছু জানেন নাকি?*

নজরুলকে কত জনে কতভাবে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু গোটা নজরুলকে, মানুষ-নজরুলকে কেহই সম্পূর্ণ রূপ দিতে পারেন নাই। সেই রূপ দেওয়াও এক দুরূহ ব্যাপার। এত সর্বতোমুখী প্রতিভা ও জীবনের এত সর্বতোমুখী দিক্ বাংলা দেশে আর কাহারও আছে কিনা সন্দেহ। তাই অন্ধের হাতী দেখার মত নজরুল-জীবন ও নজরুল-প্রতিভারও যিনি যে দিক্‌টি দেখিয়াছেন, তিনি শুধু সেই দিকটিতেই মাত্র আলোকপাত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। নজরুলের সক্রিয় কবি-জীবন খুব দীর্ঘ নহে, তবুও মানুষ-নজরুল বাংলা দেশের এত জায়গায় এতভাবে ছড়াইয়া আছেন যে, একক কোন ব্যক্তির পক্ষেই তাহার সমগ্রটা সংগ্রহ করা কিছুতেই সম্ভব নহে। সাহিত্যের সব শাখা-প্রশাখায় নজরুলের গতি ছিল স্বচ্ছন্দ, অবাধ ও সহজ। আমাদের সাহিত্যের সব শাখা-প্রশাখা তাঁহার দানে হইয়াছে সমৃদ্ধ। কিন্তু মানুষ-নজরুল আরো বড়, তাঁহার সাহিত্যের অপেক্ষাও বড়। শ্রীযুক্ত বিমল বসু নজরুল প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"কলিকাতা বেতারের স্টুডিও—মহরা ঘরে গেলাম। দেখলাম, জন-প্রিয় শিল্পী আর বাদকদের, তার মাঝে বসে আছেন গৈরিক টুপি আর বেশধারী একটি মানুষ। অবাক হলাম-মানুষটির এ-বেশ কেন? যাঁরা তাঁর পাশে বসে আছেন, তাঁরা গল্প গুজব করছেন, তাঁদের মাঝে নিস্তব্ধ ধ্যান গম্ভীর মূর্তিটি ভালো লাগলো। মুখে তাঁর কোন কথা নেই, সামনের দিকে তাকিয়ে আছেন, ভাবব্যাকুল দৃষ্টিতে। দীর্ঘ বাবরি চুল ঘন হয়ে এসেছে ঘাড়ের উপর। একটা হাত হারমোনিয়মের উপর রাখা। ভারী ভাল লাগলো। সঙ্গীতে সুর আরোপ করবেন তাই সুরের সমুদ্রে অবগাহন করছেন স্থির নিস্তব্ধ-ভাবে। একজন বন্ধু বল্লেন, 'উনি কবি নজরুল।'---অবাক হয়ে রইলাম। মনে পড়তে লাগলো: সৈনিক কবির নানা কবিতার চরণ, বিদ্রোহীর কবি, সাম্যের কবি, মানুষের কবি। এই মানুষটি। সৈনিক পরেছে গৈরিক বেশ!' *

---

* গুলিস্তাঁ-নজরুল-সংখ্যা

* যুগান্তর

আগেই বলিয়াছি, সাহিত্যিকদের প্রতি নজরুলের ভালবাসা ও দরদ ছিল অপরিসীম। কনিষ্ঠ সাহিত্যসেবীদের সব রকম উপদ্রব তিনি হাসিমুখেই সহ্য করিতেন আর পূরণ করিতেন তাহাদের সব রকম আব্দার। তাঁহার নিকট হইতে কাহাকেও বড় একটা নিরাশ হইয়া কখনো ফিরিতে হয় নাই।

দেখিয়াছি অদ্ভূত তাঁহার একাগ্রতা ও মনঃসংযোগ করিবার ক্ষমতা। যেখানে সেখানে দারুণ হট্টগোলের মাঝখানে বসিয়াও তাঁহাকে দ্রুত কবিতা লিখিতে দেখিয়াছি। তাঁহার মন ও হাতের কলম দুইয়েরই গতি ছিল দ্রুত। 'অঞ্জলি' সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ দাস একদিনের কথা লিখিয়াছেন---'আষাঢ়ের এক বাদল-ধারা দিনে বা'র হলুম অভিযানে।.....ভিজে ঢোল হয়ে অবশেষে এসে দাঁড়ালাম, ৫৩।৪, হরিঘোষ স্ট্রীটের দরজায় (নজরুলের বাসা)।.. —সামান্যক্ষণ বোসে মাত্র কড়ি কাঠগুলোর গুণ্‌তি শেষ করেছি এমন সময়, আমার মতো ভিজে কাক হয়ে, আরো দু'জন ভদ্রলোক এসে ঘরের কাষ্ঠাসন অলংকৃত করলেন।—প্রবেশ করলেন কবি। সৌম্যমূর্তি মাথায় টুপি গেরুয়ার, চোখে চশমা, পরণে গেরুয়া বসন। এমন একটা স্বর্গীয় ভাব তাঁর মধ্যে ফুটে উঠেছে, তাঁকে যে দেখবে সে-ই অবাক হয়ে তাকিয়ে বিস্ময়ের সঙ্গে প্রকাশ করবে---'ইনিই! ইনিই সেই!'—পাশের ভদ্রলোকটির কাছ থেকে একটি ঝরণাকলম নিয়ে লিখে চল্‌লেন তিনি সাদা পাতাটার উপর—রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দেখতে লাগলাম তাই। নদীর চলন্ত স্রোতের মতো কী অবাধ গতি তাঁর লেখার--দ্বিধামুক্ত তুরঙ্গের মতো এগিয়ে চল্‌ল কলম। আমার বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখের সাম্‌নে মুহূর্তের মধ্যে জন্ম হোলো কবিতার: 'হে তরুণ! কোন্‌ অঞ্জলি দিতে এই যুগে আসিয়াছ?' মুক্তোর মতো আখরে কবিতাটি লেখা শেষ হোলো আর সব শেষে দেখা দিলো নাম—নজরুল ইসলাম।' 'যুগান্তর'* পত্রিকার ছোটদের পাততাড়ি-সম্পাদক 'স্বপন বুড়ো' লিখিয়াছেন —'তখন নজরুল গ্রামোফোন কোম্পানীর জন্য গান রচনা করতেন।

* গুলিস্তাঁ---নজরুল সংখ্যা।

আমার একটি পরিকল্পনা ছিল—ছোটদের জন্য 'খেলাঘর' নামে একটি বার্ষিকী প্রকাশ করবো। গিয়ে হাজির হলাম গ্রামোফোন-রিহার্সেল রুমে। কাজি-দা গান রচনায় ব্যস্ত। পাশে দু'টি মেয়ে বসে আছেন —তারা সেই গান শিখবে। আমি পাকড়াও করলাম—'খেলাঘর' নামে কবিতা লিখে দিতে হবে। কাজি-দা প্রথমে আপত্তি জানালেন, অন্যদিন হবে। কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা, বল্লাম, এক্ষুণি আপনাকে কবিতা রচনা করতে হবে। কাজি-দা বুঝলেন, ছাড়ান পাওয়া অসম্ভব। গানের খাতা সরিয়ে রেখে 'খেলাঘর' রচনায় মন দিলেন। কবিতা যখন শেষ তখন মেয়েরা আমার উপর রাগ করে চলে গেছেন এবং আকাশের মধ্যাহ্ন গগনও তপ্ত।'

নজরুল-চরিত্রের আর একটি বিস্ময়কর দিক উদঘাটন করিয়াছেন কবি-বন্ধু সুগায়ক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার। তিনি 'বিশ্বাসী নজরুল' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"নজরুলের স্ত্রী অবশাঙ্গ রোগে শয্যাশায়িনী। কোমর থেকে তাঁর অর্ধনাঙ্গ অসাড়। এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী প্রভৃতি নানা চিকিৎসায় ব্যর্থ হয়ে নজরুল দিশাহারা। নজরুলের বিশ্বাস এ দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি নিরাময় হবেই। কোথায় কোন্ সাধু ভরসা দিয়াছেন, কোথায় কোন্ যোগী মহাপুরুষ এই রোগ সারানোর জন্য আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়ার নির্দেশ দিয়াছেন—নজরুল একান্ত অনুগতের মতো সকল শ্রেণীর ব্যক্তির সর্বপ্রকার আদেশ পালন করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি, অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করেছেন। রোগের অবস্থা কিন্তু দিনের পর দিন জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠলো। নজরুলের কাছে খবর এল, বীরভূম জেলার 'বেলে' নামে একটি গ্রামে এই রোগের দৈব ঔষধ পাওয়া যায়। সে-ঔষধে নাকি অনেকে অলৌকিকরূপে সেরেছে। শোনামাত্র নজরুল একজন বন্ধু সঙ্গে নিয়ে রওনা হলেন বীরভূমের সেই গাঁয়ের উদ্দেশে। বেলে'য় পৌঁছে সেখানকার দেবস্থানের প্রতিনিধিদের নির্দেশ মতো নজরুল একটি এঁদো পচা পুকুরে অবগাহন স্নান ক'রে পবিত্র হ'য়ে সেই পুকুরের শ্যাওলা ও সেখানকার তৈল প্রভৃতি নিয়ে কলকাতায় ফিরলেন। চললো দৈব ঔষধের চিকিৎসা। রোগীর কোন পরিবর্তন হ'লো না।'

যে যাহাই বলিতে নজরুল তাহাতেই করিতেন বিশ্বাস। জাতি ধর্মনির্বিশেষে সব রকম মানুষের উপর ছিল তাঁহার আস্থা। কোন ব্যাপারেই মানুষকে অবিশ্বাস করার কথা তিনি মনে আমল দিতে পারিতেন না। একবার কে একজন নাকি তাঁহার কাছে আসিয়া বলিয়াছিল--কলিকাতা হইতে পনর মাইল দূরে ডায়মণ্ড হারবার রোড হইতে তিন মাইল পশ্চিমে একজন সাধক আছেন, তিনি ভূতসিদ্ধ ও অদ্ভূত ক্ষমতার অধিকারী! মন্ত্রবলে তিনি নাকি ঘরভরা লোকের সামনে ভূত হাজির করিতে পারেন ইত্যাদি ইত্যাদি। শোনামাত্র নজরুলের বিশ্বাস করিতে এক মুহূর্তও দেরী হইল না এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেই ভূতসিদ্ধ সাধকের কাছে লোক পাঠাইয়া দিলেন। চুক্তি হইল, রোগ সারিলে পাঁচশত টাকা দিতে হইবে। কিন্তু প্রথম দিন সালামী দিতে হইবে পঁচিশ টাকা। নজরুল তাহাতেই রাজী হইলেন এবং একদিন দুই বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া স্বয়ং সেই ভূতসিদ্ধ সাধুর ঘরে গিয়া হাজির হইলেন। সেই শীতের রাত্রির ভীষণ শীত ও মশার কামড় সহ্য করিয়া ও ভূত আবির্ভাবের অপেক্ষায় সবান্ধব কবি বসিয়া আছেন, এই দৃশ্য সত্যিই অদ্ভূত। কবির সেই অভিযানের অন্যতম সঙ্গী নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় সেই সাধক বাবাজীর যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাও কৌতুকপ্রদ।---'চেহারা, গাত্রচর্ম, চর্মের উপরকার বর্ণ, অঙ্গসৌষ্ঠব ও অঙ্গকান্তি দেখে মনে হলো যেন তিনি জমি চাষ করতে করতে লাঙ্গল বলদ ফেলে সদ্য সদ্য ছুটে এসেছেন।' আশ্চর্যের বিষয়, তবুও নজরুলের বিশ্বাস এতটুকু শিথিল হইল না। বাবাজী কিন্তু চালাকিতে কিছুমাত্র কম ছিলেন না। ঘরে ঢুকিয়াই তিনি আদেশ করিলেন, আপনাদের যার যার পকেটে দেশলাই ও টর্চ আছে তা আমার কাছে জমা রাখুন। বলা বাহুল্য, উপস্থিত সকলেই প্রভুর সেই আদেশ অত্যন্ত অনুগত ভৃত্যের মতোই পালন করিলেন। ঘুট ঘুটে অন্ধকার গৃহে পাছে কাহারও হঠাৎ ভূত দেখিবার লোভ দুর্নিবার হইয়া উঠে, সেই ভয়েই হয়ত বুদ্ধিমান বাবাজী সকলের দেশলাই ও টর্চ আগে থাকিতেই নিজে হাত করিয়া রাখিলেন।--- আলো জ্বালা হইলে দেখা গেল, ঘরের চারি কোণে চারিখানি সদ্যতোলা শিকড়। পূর্ণ বিশ্বাস লইয়াই নজরুল সেই শিকড় লইয়া আসিলেন

এবং পূর্ণতর বিশ্বাস লইয়া এইভাবে তিনি স্ত্রীর ভৌতিক চিকিৎসাও করাইলেন। কিন্তু কবিজায়ার অবশাঙ্গ ব্যাধি আজও সারে নাই। উপরন্তু কবি আজ এক দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধির আক্রমণে সম্বিত হারা।'

কবির অসাধারণ আত্মমর্যাদা বোধের এক চমৎকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিয়াছেন প্রথিতযশা সাহিত্যিক কাজী আবদুল ওদুদ। 'আমি আপনারে ছাড়া করিনা কাহারে কুর্ণিশ'—এই শিরোনামায় তিনি লিখিয়াছেন "প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে ঢাকার কয়েকজন খ্যাতনামা খানবাহাদুর একবার নজরুলের সঙ্গে আলাপ আলোচনার আয়োজন করেছিলেন। ঠিক হয়েছিল, বুড়িগঙ্গার এক বজরায় তাঁরা কবির সঙ্গে মিলিত হবেন। নির্দিষ্ট সময়ে খানবাহাদুরেরা সেই বজরায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। কিন্তু কবির দেখা নেই। অনেক কষ্টে কবিকে উদ্ধার করা গেল তাঁর এক বন্ধু সম্মেলন থেকে---তাঁর উচ্চ হাসি হয়ত দিয়েছিল তাঁর সন্ধান। কিন্তু যখন কবিকে বলা হলো, সম্মানিত খানবাহাদুরেরা অনেকক্ষণ ধরে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন, তখন কবি বললেনঃ 'আমি দেশের কবি, খানবাহাদুরেরা আমার জন্য অপেক্ষা করবেন না তবে কি করবেন? আমি রাজপথ দিয়ে চলবো, দেশের খানবাহাদুর রায়বাহাদুরেরা রাস্তার দুই পাশ থেকে আমাকে কুর্ণিশ জানাবেন; আমি সেই কুর্ণিশ গ্রহণ করতে করতে এগিয়ে যাব, এই ত আমাদের মধ্যকার সত্যকার সম্বন্ধ।' নিঃস্ব গুণীর এমন আত্মমহিমাবোধের ইতিহাসবিশ্রুত দৃষ্টান্ত বেটোফেন। আমাদের দেশে নজরুল ভিন্ন আর কোন দরিদ্রগুণী এমন কথা বলতে পেরেছেন বলে আমার জানা নেই। কবি যে বলেছিলেনঃ 'আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্ণিশ' এটি তাঁর এক খেয়ালী কথা নয়; এটি তাঁর ভিতরকার একটি স্থায়ীভাব--শ্রেষ্ঠভাব। বলা বাহুল্য, এমন আত্মমহিমাবোধ অতি দুর্লভ, খুব উঁচুদরের প্রতিভার মধ্যেই এর সন্ধান মেলে।' এই স্তাবকবাদ-প্রপীড়িত দেশে এই দৃপ্ত আত্মমর্যাদাবোধের তুলনা সত্যই বিরল। যত দৃষ্টান্ত ও নজিরই উদ্ধৃত করিনা কেন, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে কখনো মানুষ নজরুলের সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া সম্ভব হইবে না।

হিন্দু মুসলমানের মিলন ও এই দুই বৃহৎ সম্প্রদায়ের সমন্বয় সাধনের জন্য নজরুল জীবনে ও সাহিত্যে, কাব্যে, গানে ও সাংবাদিকতায় যে অকৃত্রিম ও অশ্রান্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং যে অফুরন্ত আবেদন জানাইয়াছেন, তাহা আজ কাহারো অবিদিত নাই। জীবনে এক মুহূর্তের জন্যও তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও মানবতার ধ্রুব পথ হইতে বিচ্যুত হন নাই।

সু-সাহিত্যিক পরিমল গোস্বামী কবির এই দুরারোগ্য ব্যাধির পূর্বেকার (১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দ) একটি দিনের যে-বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতেই কবির মহত্তর জীবন সঙ্কল্পের পরিচয় আরো পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—'সেদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে তিনি (নজরুল) গান গাওয়া শেষ করেছেন। পাশে হারমোনিয়ম পড়ে আছে। সম্মুখে চায়ের বাটি, কিন্তু ধ্যানমগ্ন মুদিত চক্ষু কবির বাইরের কোন জ্ঞান নেই। প্রায় মিনিট পাঁচেক এই রকম কাটল, তারপর চোখ খুলে আমার দিকে তাঁর সেই বিশাল দু'টি চোখ মেলে হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, জানেন, আমি ভিতরে ভিতরে কি অনুভব করি? আমি অনুভব করছি একটা বিরাট কর্তব্য আমার ঘাড়ে এসে পড়েছে। সে হচ্ছে হিন্দু-মুসলমানের মিলন। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে ভিতর থেকে এই তাগিদ আস্‌ছে।'

নজরুল ইসলাম একাধারে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও অসাধারণ প্রতিভারই অধিকারী। এক শোকাবহ দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিতে আক্রান্ত না হইলে হয়ত এই মহৎ কাজ জীবনে তিনি সাফল্য মণ্ডিত করিয়া তুলিতে পারিতেন। কাজী আবদুল ওদুদ তাঁহার 'আজ্‌কার কথা' নামক গ্রন্থে নজরুলকে এই যুগের বাঙালী জাতির প্রতিনিধি বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন। মনে হয়, নজরুলের ইহা এক যথার্থ ও সার্থক পরিচয়। 'নজরুল এ-যুগের বাঙালী জাতির প্রতিনিধিত্ব করেছেন প্রধানত জড়তার বিরুদ্ধে বার বার সংগ্রাম ঘোষণা করে ও নির্যাতিত জনসাধারণের পক্ষ সমর্থন করে; আর মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তাদের মনে নব নব আশা-উদ্দীপনার সঞ্চার করে, বিশেষ

করে বাংলার বা ভারতের আবহমান প্রাণধারার সঙ্গে তাদের প্রেমের নিবিড় যোগ স্থাপন করবার আহ্বান জানিয়ে।'*

নজরুলের নিকট-সংস্পর্শে আসিয়াছেন এমন বহুজনের জবানিতে এখানে মানুষ-নজরুলের কিছুটা পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা হইল মাত্র। তবুও, আমাদের মনে হয় মানুষ-নজরুলের পরিচয় রহিয়া গিয়াছে অসম্পূর্ণ। নজরুল জীবনের অসংখ্য দিক এখনো কোন রকম আলোচনার বিষয়ীভূত হয় নাই। শুনিয়াছি, দাবা খেলায়ও নজরুলের কৃতিত্ব ছিল অসাধারণ, বাংলাদেশে তিনি নাকি অন্যতম শ্রেষ্ঠ দাবা খেলোওয়াড়। দাবা খেলা-প্রীতি ও সে অভিজ্ঞতা তাঁহার 'শিউলীমালা' নামক গল্পের আবহাওয়া ও পটভূমি জোগাইয়াছে। হস্ত-রেখা পাঠে তাঁহার ধৈর্য ও পারদর্শিতা দেখিয়া অনেককে বিস্মিত হইতে দেখিয়াছি। তদুপরি নির্মল ব্যঙ্গ বিদ্রূপে তাঁহার কোন জুড়ি আছে কিনা সন্দেহ। তাঁহার হাসি ঠাট্টার খ্যাতি সর্বজনবিদিত।—নোয়াখালী জেলার লোকেরা 'ফেনী'কে সাধারণত 'হেনী' উচচারণ করে, কাজেই তাহারা 'হোটেল'কেও নিশ্চয়ই 'ফোটেল' বলে। এই গল্প বলিয়া কতবার তিনি অট্টহাসিতে আমাদের মাতাইয়া তুলিয়াছেন। 'ফ' যদি 'হ' হইতে পারে, 'হ' কেন 'ফ' হইবে না ইহাই তাঁহার রসিকতার তাৎপর্য! কবির বিবাহের কিছুদিন পরে, কবির পরম স্নেহ ভাজন তরুণ কবি আবদুল কাদির একদিন কবিকে ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন, 'কবি-দা যাই বলুন, আমাদের বৌ-দি কিন্তু আপনার যোগ্য হয়নি—।' সুবৃহৎ চক্ষু তারকা বিস্ফারিত করিয়া কবি জিজ্ঞাসা করিলেন—'কেন, বল ত—?' কিছুটা সঙ্কোচের সঙ্গে আবদুল কাদির বলিয়া ফেলিলেন,—'আপনি যে-রকম সুপুরুষ, বৌ-দি কিন্তু ঠিক তেমনটি নয়—।' অপরিসীম গাম্ভীর্যের সঙ্গে কবি তক্ষুণি বলিয়া উঠিলেন—'ওঃ বুঝেছি, তাহ'লে তোদের আর কবিতা লেখার জন্য অন্যত্র যেতে হত না, না?' অপ্রস্তুত আবদুল কাদির চক্ষু অবনত করিলেন। কিন্তু কবির অট্টহাস্যে ঘরের ছাদ যেন ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। অপরে হাসিবার অপেক্ষা না

---

* সাক্ষকার কথা

করিয়াই এমনি নিজের রসিকতায় নিজে হাসিয়া ফাটিয়া পড়িবার এক অদ্ভুত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন নজরুল। আজ স্মরণ করিতেও প্রাণ হাহাকার করিয়া ওঠে, সেই অফুরন্ত হাসির ফোয়ারা এক নিষ্ঠুর কাল-ব্যাধির আক্রমণে আজ সম্পূর্ণ স্তব্ধ ও মূক হইয়া গিয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়

কবিতা

কথিত আছে, কোন এক সভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করিতেছিলেন। তিনি নজরুলকে দেখিতে পাইয়া ডাকিয়া বলিলেন, 'কাজী, তুমি আমার ডান পাশে এসে বসো।' এই ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্যে বাংলা সাহিত্যে কবি হিসাবে নজরুলের আসন কোথায় তাহার এক সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে। সত্যই বাংলা সাহিত্যের রবীন্দ্র-যুগে রবীন্দ্রনাথের পার্শ্বে স্থান গ্রহণ করিতে পারার মত একমাত্র নজরুল ইসলাম ছাড়া অন্য কোন কবিই জন্মগ্রহণ করেন নাই। এই কথা বলিলে কিছুমাত্র অতি-ভাষণ করা হইবে না যে, বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী প্রতিভার একমাত্র উত্তরাধিকারী হইতেছেন নজরুল ইসলাম। নজরুলের সক্রিয় কবি-জীবন বড় জোর মাত্র কুড়ি বছরের। রবীন্দ্রনাথের মত দীর্ঘ, সুস্থ ও সক্রিয় জীবনের উত্তরাধিকার-সৌভাগ্যও যদি তাঁহার হইত, তাহা হইলে তাঁহার প্রতিভার সর্বতোমুখিনতার এক বিকশিত ও স্ব-সম্পূর্ণ পরিচয় গ্রহণ করা সহজ হইত ও তখনই একমাত্র সম্ভব হইত উভয়ের কোন রকম তুলনামূলক আলোচনার। রবীন্দ্র-প্রতিভার যেমন রহিয়াছে বিভিন্ন দিক, বাংলার জীবিত কবিদিগের মধ্যে একমাত্র নজরুলেই দেখা গিয়াছে কবি-প্রতিভার সে রকম বহুধা-বৈচিত্র্য ও বিভিন্নমুখিনতা। রবীন্দ্রনাথ একই সঙ্গে রচনা করিয়াছেন কবিতা, গান, হাসি ও ব্যঙ্গ-কৌতুক, গল্প-উপন্যাস, নাটক ও নানারকম প্রবন্ধ। রবীন্দ্রনাথের তুলনায় এই সংক্ষিপ্ত সাহিত্যিক জীবনে নজরুলও আমাদের সাহিত্যের ঐ সব বিভাগ ও শাখা-প্রশাখাকে নিজের সাধনা ও স্বকীয় প্রতিভার দানে করিয়া তুলিয়াছেন সমৃদ্ধ ও পুষ্ট। এই সঙ্গে ইহাও স্মরণ করা যাইতে পারে যে, বাংলার জীবিত কবিদের মধ্যে

একমাত্র নজরুলের নামেই রবীন্দ্রনাথ নিজের কবিতা-পুস্তক উৎসর্গ করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা জানাইতে গিয়া নজরুল নিজেই কবির এই দান স্বীকার করিয়াছেন:

'দেখেছিল যারা শুধু মোর উগ্ররূপ,
অশান্ত রোদন সেথা দেখেছিলে তুমি!
হে সুন্দর, বহ্নি-দগ্ধ মোর বুকে তাই
দিয়াছিলে 'বসন্তের' পুষ্পিত মালিকা।'*

একদিন রবীন্দ্রনাথ পরিহাসচ্ছলে তাঁহাকে যে-উপদেশ দিয়াছিলেন, নজরুলের কাব্য-প্রেরণা হইতে তাহাও বাদ যায় নাই।

'বলেছিলে হেসে এক দিন,
"তরবারি দিয়ে তুমি চাঁছিতেছ দাড়ি!
যে জ্যোতি করিতে পারে জ্যোতির্ময় ধরা
সে জ্যোতিরে অগ্নি করি হ'লে পুচ্ছ-কেতু!'
হাসিয়া বলিলে পরে, 'এই যশঃ-খ্যাতি
মাতালের নিত্য সান্ধ্য নেশার মতন!
এ মজা না পেলে মন ম্যাজ্ ম্যাজ্ করে
মধু-র ভৃঙ্গারে কেন কর মদ্যপান?'*

বহু সাময়িক ব্যাপার ও ঘটনা অবলম্বন করিয়াও নজরুল কবিতা লিখিয়াছেন। রাজনৈতিক ও সামাজিক যে-সব বিষয় সাধারণত বক্তৃতা ও গদ্য রচনার বিষয়ীভূত তাহাও নজরুলের বহু কবিতার প্রেরণা ও বিষয়বস্তু হইয়াছে। উপরোক্ত মন্তব্যে নজরুলের সেই সব লেখার প্রতিই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অপরূপ বাকপটুতার সাহায্যে নজরুলের দৃষ্টি

* রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে তাঁর 'বসন্ত' নাটিকা উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহারই ইঙ্গিত করা হইয়াছে এখানে।

* অশ্রুপুষ্পাঞ্জলি।

আকর্ষণ করিয়াছেন। যশ-খ্যাতির প্রলোভন যে অনেকখানি নেশার মত এবং যে কবি-প্রতিভার চিরকালের মধু-ভাণ্ড রচনার শক্তি রহিয়াছে, তাহার পক্ষে মদের নেশায় প্রলুব্ধ হওয়া যে শক্তির অপব্যবহার ও অপপ্রয়োগ তাহাই ছিল রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের মর্ম। কিন্তু কবি-গুরুর সাবধানবাণী বা উপদেশ পালন করা নজরুলের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কারণ, খ্যাতির মোহে না হউক, নিজের আত্ম-প্রেরণা ও কবি-ধর্মের তাগিদেই তাঁহাকে হইতে হইয়াছে নিজ জাতি ও যুগের প্রতিনিধি। তাই আমাদের জাতীয় জীবনে যাহা কিছু ঘটিয়াছে তাহাই তাঁহার কবিতার বিষয়-বস্তু না হইয়া পারে নাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব প্রকৃতির সৌন্দর্যানুভূতি, চিরন্তন মানব ধর্ম, কাল ও বিশ্বাতীত অধ্যাত্ম-বোধ এই সবও যে তাঁহার কাব্য-প্রেরণার খোরাক যোগাইয়াছে, সেই বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই।

অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় নজরুলের যে-সমস্ত বাল্য-রচনা এ যাবৎ সংগৃহীত হইয়াছে তাহাতেও দেখা গিয়াছে, ঐ সব রচনায় বাল-সুলভ চাপল্য ও লঘু-চিত্ততা কোথাও স্থান পায় নাই। যেমন তাঁহার তের বৎসর বয়সের রচনায় লেখা হইয়াছেঃ

'চাষ কর দেহ জমিতে
হবে নানা ফসল এতে।
নামাজে জমি উগালে,
রোজাতে জমি সামলে,
কলেমায় জমিতে মই দিলে,
চিন্তা কি হে এই ভবেতে।'*

বালক-কবির এই গান, ভক্তকবি রামপ্রসাদের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। পরবর্তী জীবনে অবশ্য নজরুল রামপ্রসাদী ভজন, কীর্তন ও অসংখ্য ইসলামী সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। যে সব গানের মর্মকথা

* 'চাষার সং' নামক নাটিকা—সংগ্রাহক কাজী আনওয়ারুল ইসলাম। আজাদ ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৪।

কবি-চিত্তের আধ্যাত্মিক আকুতি ও তার বিচিত্র অভিব্যক্তি। কবির আর একটি বাল্য-রচনা 'রাজপুত্র'* নামক নাটিকা। এই নাটিকার আরম্ভ হইয়াছে এই ভাবে:

'চল ওহে মন্ত্রীসূত স্বরাজ্যে ফিরে
ঈশ্বরের অপার মহিমা দেখি নাই দেশ
দেশান্তরে।

অসংখ্য গ্রাম নগরাদি,
দুর্গগুহা পর্বত্ আদি, কত নদ নদী,
দেখিলাম কিন্তু নিরবধি স্বদেশ জাগিছে
অন্তরে।'

পরবর্তী জীবনে নজরুল হইয়াছিলেন স্বদেশ প্রেমের চারণ-কবি। সেই স্বদেশ প্রেমের বীজ এই ভাবে তাঁহার বাল্য-রচনার মধ্যেই যে নিহিত ছিল তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ উদ্ধৃত লাইনগুলি। কিন্তু নজরুল-প্রতিভার সত্যকার উন্মেষ ও তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছে আরো অনেক পরে, যখন কবি ফিরিয়া আসিয়াছেন যুদ্ধ-ক্ষেত্র হইতে। রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনে যেমন 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ', নজরুলের কবি-জীবনেও তেমনি 'বিদ্রোহী'। 'বিদ্রোহী' রচনার সময় নজরুলের জীবন ছিল পুরা মাত্রায় বিদ্রোহীর জীবন এবং দেহ ও মনে তখন তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ যৌবনের অধিকারী। সেই বে-পরওয়া যৌবন ও মানবাত্মার চির-বিদ্রোহের বাণী তাঁহার 'বিদ্রোহী' কবিতায় এক অপরূপ ভাষায় ও অভিনব ছন্দে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এমন দুর্মর যৌবনের জয় ঘোষণা ও চির অপরাজেয় বিদ্রোহীর রূপ ইতিপূর্বে আর কখনো বাংলা ভাষায় দেখা যায় নাই। এই বিদ্রোহ শক্তিমদমত্তের উদ্দেশ্যবিহীন অকারণ বিদ্রোহ নহে---ইহার পেছনে রহিয়াছে কবি আত্মার এক নবতর, সুন্দরতর ও পূর্ণতর জগৎ-সৃষ্টির প্রেরণা। 'বিদ্রোহীর' সমসাময়িক রচনা 'প্রলয়োল্লাসে' কবি ঘোষণা করিয়াছেন:

* সংগ্রাহক—কাজী আনওয়ারুল ইসলাম। আজাদ---ঐ।

'ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর?—প্রলয় নূতন সৃজন-বেদন!
আসছে নবীন—জীবন-হারা অ-সুন্দরে করতে ছেদন।'

তাই তাঁহার বিদ্রোহ শুধু অবাস্তব খেয়ালি-পনা বা মানসিক বিলাস মাত্র নহে। তাঁহার বিদ্রোহ যাহা কিছু নব-সৃষ্টির অন্তরায় তাহার বিরুদ্ধে এবং সব রকম অত্যাচার উৎপীড়ন ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে। তাই তাঁহার অকুণ্ঠিত কণ্ঠের ঘোষণা ঃ

'মহা-বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি—সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি—সেই দিন হব শান্ত।'

যুদ্ধক্ষেত্র হইতে কবি কানে ও মনে বহন করিয়া আনিয়াছিলেন সৈনিকদের মার্চের সুর। 'কামাল পাশা' নামক কবিতায় কবি সেই মার্চের সুরে, এক অপরূপ ভাষা ও ছন্দে, যৌবনের উল্লাসের সঙ্গে যুদ্ধ জয়ের আনন্দ মিশাইয়া এক অভিনব কবিতা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার 'বিদ্রোহীর' মত সেই কবিতারও জুড়ি বাংলা ভাষায় তখনো ছিল না, এখনো নাই। সৈনিকদের তালে তালে পা ফেলিবার সুর, অভিনব ভাষা ও ছন্দ সেই কবিতাকে দিয়াছে এক অপরূপ 'সামরিক' আবহাওয়া। আর কী চমৎকার ভাবেই না এই কবিতায় একাত্ম হইয়া গিয়াছে, বাংলা, উর্দু ও ইংরেজী বচন ও বাক্‌ভঙ্গিমা, যেমন।—

'মার্ দিয়া ভাই মার্ দিয়া
দুশ্‌মন সব হার গিয়া!
কিল্লা ফতে হো গিয়া!
পরওয়া নেহি যানে দো ভাই যো গিয়া!
কিল্লা ফতে হো গিয়া!
হুরেরা হো!
হুরেরা হো!'

নজরুল ইসলামের আবির্ভাবের বহু পূর্ব হইতেই বাংলা ভাষায় অজস্র আরবী, পারশি ও উর্দু শব্দের প্রবেশ ঘটিয়াছে। বহু কবিই তাঁহাদের কাব্যে আরবী, পারশি ও উর্দু শব্দের ব্যাপক ব্যবহার করিয়াছেন। রবীন্দ্র-যুগের কবিদের মধ্যে বিশেষ করিয়া 'ছন্দ-রাজ' সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন এই বিষয়ে অত্যন্ত উদার ও বে-পরওয়া। তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে সব রকম আরবী-পারশী শব্দকে নিজের ভাব ও ছন্দের করিয়াছেন বাহন। কিন্তু এই বিষয়ে সম্ভবত নজরুলের সমকক্ষতার দাবি কেহ-ই করিতে পারিবেন না। রচনায় আরবী-পারশি শব্দের আনুপাতিক সংখ্যার দিক হইতে এই কথা বলা হইতেছে না। ঐ সব শব্দের মনোজ্ঞ ও যথাযথ ব্যবহার ও প্রয়োগের দিক হইতেই এই মন্তব্য করা হইতেছে; এবং ইহাই হয়ত স্বাভাবিক, কারণ আরবী, পারশি ও উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে নজরুলের যেমন ছিল গভীরতর ও ব্যাপকতর পরিচয়, তাঁহার পূর্ববর্তী বা সমকালীন কোন কবিরই সেই রকম ছিল না। তাই তাঁহার মতো বিদেশী শব্দের ও বাক্যের এমন নির্ভুল ব্যবহার কদাচিৎ দেখা গিয়াছে। তাঁহার 'খেয়াপারের তরণী' নামক কবিতাটি প্রকাশিত হইবার পর, তাহাতে বহু অপরিচিত আরবী পারশি শব্দ থাকা সত্বেও অনেক গোঁড়া সাহিত্য-সমালোচকও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা না করিয়া পারেন নাই। সেই কবিতার নিম্নলিখিত স্তবকটিতে একটি আস্ত আরবী বাক্যের কি চমৎকার প্রয়োগই না কবি করিয়াছেন:

> 'আবুবকর উস্‌মান উমর আলী হায়দর
> দাঁড়ী যে এই তরণীর, নাই ওরে নাই ডর।
> কাণ্ডারী এই তরীর পাকা মাঝি মাল্লা,
> দাঁড়ী-মুখে সারি-গান---লা-শরীক আল্লাহ্।'

সুকবি শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদারের মত চির নজরুল-বিরোধী সমালোচককেও এই কবিতার, বিশেষ করিয়া এই স্তবকটির আরবী শব্দসমষ্টির সুষ্ঠু ও নিপুণ প্রয়োগের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতে দেখিয়াছি। সত্যই নজরুলের এই ধরণের সব কবিতাতেই ভাবের সঙ্গে ভাষা ও ছন্দের ঘটিয়াছে এক অপূর্ব সমন্বয়।

কোন কবি বা সচেতন লেখক-ই নিজের সমসাময়িক কাল ও পরিবেশকে ভুলিয়া থাকিতে পারেন না, আর পারেন না বৃহত্তর মানবতাকে বিসর্জন দিয়া শুধু জাতীয় গোঁড়ামী ও অহমিকার বাহন হইতে। নজরুলও ইহার ব্যতিক্রম নহেন। জাতি ও দেশের দুঃখ দুর্দশা, কুসংস্কার ও গোঁড়ামী, পঙ্গুতা ও জড়তা কিছুই তাঁহার কবি-প্রতিভার সহানুভূতি ও আঘাত হইতে রেহাই পায় নাই। তিনি 'আমার কৈফিয়ৎ' নামক কবিতায় নিজের সম্বন্ধে লিখিয়াছেনঃ

'বড় কথা বড় ভাব আসে নাক মাথায়, বন্ধু, বড় দুখে!
অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু, আছ সুখে!'

কাজেই নিজের চতুষ্পার্শ্বে সুখ দুঃখ, জ্বালা যন্ত্রণা ও অভাব অভিযোগকে উপেক্ষা করিয়া গভীর ও বড় বড় তত্ত্ব কথার 'অমর কাব্য' লিখিয়া অমরতা অর্জনের জন্য তিনি কখনো প্রলুব্ধ হন নাই। অসঙ্কোচে ও অকুণ্ঠিত-কণ্ঠে তিনি নিজের যে ভূমিকা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা এইঃ

'বর্তমানের কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই 'নবি'।
কবি ও অকবি যাহা বল মোরে মুখ বুঁজে তাই সই সবি!

* *

দুষিছে সবাই, আমি তবু গাই শুধু প্রভাতের ভৈরবী!'

তাই আমরা দেখিতে পাই নজরুল স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছেন চারণ-কবির ভূমিকা।—দেশের ঘুমন্ত চিত্তকে জাগাইয়া তুলিবার জন্য তিনি অক্লান্তভাবে রচনা করিয়াছেন অজস্র জাতীয় কবিতা ও গান এবং নিজেই তাহা গাহিয়া ফিরিয়াছেন দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত। বাংলাদেশ হিন্দু ও মুসলমানের দেশ এবং কবির জন্ম বাংলাদেশের এক মুসলমান পরিবারে। তাই কবিকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে বৃহত্তর বাংলাদেশ ও মুসলমান সমাজকে একই সঙ্গে জাগাইয়া

তুলিবার ভার ও দায়িত্ব। এই দায়িত্ব যে তিনি অত্যন্ত অপক্ষপাত যোগ্যতার সঙ্গে সম্পন্ন করিয়াছেন সেই বিষয়ে কোন মতভেদের সম্ভাবনা নাই।

বাংলা সাহিত্যে নজরুলের আবির্ভাব-কাল বাংলাদেশ ও ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে অসহযোগ ও খেলাফৎ আন্দোলনের যুগ। কাজেই তখন দেশের সর্বত্র ছিল আন্দোলন ও দেশাত্মবোধের আবহাওয়া। সেই আবহাওয়ায় নজরুল-প্রতিভা যেমন পাইয়াছে অফুরন্ত খোরাক, তেমনি তাঁহার কবি-প্রতিভা দেশ ও জাতীয় আন্দোলনকেও দিয়াছে অভূতপূর্ব প্রেরণা। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের প্রতিও নজরুলের ছিল অত্যন্ত আন্তরিক সহানুভূতি। তাই দেখিতে পাই, তিনি তাঁহার প্রথম কবিতা-পুস্তক 'অগ্নি-বীণা' উৎসর্গ করিয়াছেন বিপ্লবী যুগের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে।

ভণ্ডামী ও ফাঁকা দেশাত্মবোধকে কবি চিরকাল করিয়াছেন ঘৃণা ও বিদ্রূপ। সরল ও আন্তরিক দেশপ্রীতি ও নিঃস্বার্থ সেবার প্রতি কবি উচ্চারণ করিয়াছেন প্রশংসার বাণী ও জানাইয়াছেন শ্রদ্ধা। তাই দেশ-সেবকদের লক্ষ্য করিয়া কবি একদিন লিখিয়াছেনঃ

> 'বন্দী থাকা হীন অপরাধ'! হাঁকবে যে বীর তরুণ,
> শির-দাঁড়া যার শক্ত তাজা, রক্ত যাহার অরুণ,
> সত্য মুক্তি স্বাধীন জীবন লক্ষ্য শুধু যাদের
> খোদার রাহায় জান দিতে আজ ডাক পড়েছে তাদের।
> দেশের পায়ে প্রাণ দিতে আজ ডাক পড়েছে তাদের,
> সত্য মুক্তি স্বাধীন জীবন লক্ষ্য শুধু যাদের।'
>
> —সেবক

পরাধীন ভারতকে কবি আশার বাণী শুনাইয়াছেন তাঁহার 'বোধন' নামক কবিতায়,---

> 'দুঃখ কি ভাই হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
> দলিত শুষ্ক এ মরুভূমি পুনঃ হয়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে।।*

---

* 'বোধন কবিতাটি পারশ্য কবি হাফিজের একটি গজলের ভাবালম্বনে লিখিত। মূল কবিতাটিতে সুদিনের পরিবর্তে আছে 'য়ুসুফ' আর ভারতের পরিবর্তে আছে 'কেনান'।—লেখক।

অসহযোগ ও খেলাফৎ আন্দোলনের যুগে হিন্দু মুসলমানের মিলন ও উভয় সমাজের ত্যাগ ও দেশের জন্য কারাবরণের ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে কবির 'বন্দনা' গানে---

'কাঁদিব না মোরা, যাও কারা-মাঝে যাও তবে বীর-সংঘ হে,
মুক্তির লাগি মিলনের লাগি আহুতি যাহারা দিয়াছে প্রাণ
হিন্দু-মুসলিম চলেছি আমরা গাহিয়া তাদেরই বিজয়-গান।।'

অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচীতে চরকার ছিল একটি বিশিষ্ট স্থান। ভারতবাসীকে অন্যান্য বস্তুর মত, পরিধেয় বস্ত্রের জন্যও নির্ভর করিতে হয় বিদেশের উপর, তাই বস্ত্রে দেশকে স্বাবলম্বী করার জন্য, অসহযোগ আন্দোলনের নেতা মহাত্মা গান্ধী চরকার উপর দিয়াছিলেন বিশেষভাবে জোর। এই চরকা পর্যন্ত নজরুলের কাব্য-প্রেরণা হইতে বঞ্চিত হয় নাই---

'ঘোর্---
ঘোর্ রে ঘোর্ ঘোর্ রে আমার সাধের চরকা ঘোর্
ঐ স্বরাজ রথের আগমনী শুনি চাকার শব্দে তোর।।
তোর ঘোরার শব্দে ভাই
সবাই শুনতে যেন পাই
ঐ খুল্‌ল স্বরাজ-সিংহ-দুয়ার, আর বিলম্ব নাই।
ঘুরে আসল ভারত-ভাগ্য রবি, কাট্‌ল দুখের রাত্রি ঘোর।'

---চরকা

জাতিভেদ প্রথা, ছুঁৎমার্গ ইত্যাদি কুসংস্কারের বিরুদ্ধেও কবি ঘোষণা করিয়াছেন বিদ্রোহ ও আঘাত হানিয়াছেন বিদ্রূপ-মেশা তীক্ষ্ণ ভাষায়---

'জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেল্‌ছ জুয়া
ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতে নয় ত মোয়া ।।
হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি, ভাব্‌লি এতেই জাতির জান,
তাই ত বেকুব, করলি তোরা এক জাতিকে একশ' খান।
এখন দেখিস্‌ ভারত জোড়া
পচে আছিস্‌ বাসি মড়া,
মানুষ নাই আজ, আছে শুধু জাত-শেয়ালের হুক্কাহুয়া ।।'

---জাতের বজ্জাতি

১৯২৬-এ কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমানের ভয়াবহ দাঙ্গার ফলে যখন দেশের নেতৃবৃন্দ হইয়া পড়িয়াছেন বিভ্রান্ত ও দিশাহারা---দেশের সাম্‌নে দেখা দিয়াছে ঘোর সঙ্কট ও দুর্দিনের ভ্রূকুটি, জাতীয় আন্দোলন যখন এক চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন, তখন কবি উচচারণ করিয়াছেন অসন্দিগ্ধকণ্ঠে সাবধান বাণী ও দেশের যুব-শক্তিকে দিয়াছেন সত্যের ইঙ্গিত।--

'দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ?
কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার ।।'

o o o o o

'হিন্দু না ওরা মুস্‌লিম্‌?'' ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?
কাণ্ডারী! বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র।'

দেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে, সর্বপ্রকার সত্যও কল্যাণ জিজ্ঞাসার সঙ্গে সম্পর্ক রহিয়াছে দেশের যৌবন-শক্তির। যুব-শক্তিকে বাদ দিয়া কোন দেশে কোন আন্দোলন সফল হয় নাই। জাতি গঠনের কাজে সব দেশে সব যুগে দেশের যুব-শক্তিই হইয়া থাকে অগ্রণী। তাই নজরুল-সাহিত্যে যৌবনের জয় ঘোষিত হইয়াছে

বারংবার। গদ্যে পদ্যে কবিতায় ও গানে নজরুল দেশের যৌবন-শক্তিকে জানাইয়াছেন বারে বারে আহ্বাণঃ

'চল্ চল্ চল্!
ঊর্ধ গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণী তল,
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল্‌রে চল্‌রে চল্
চল্ চল্ চল॥'

অন্যত্র দৃপ্ত-যৌবনের কি বলিষ্ঠ প্রকাশই না ঘটিয়াছে তাঁহার লেখনী মুখেঃ

'এই যৌবন-জল-তরঙ্গ রোধিবি কি দিয়া বালির বাঁধ?
কে রোধিবি এই জোয়ারের টান গগনে যখন উঠেছে চাঁদ?

O O O O O

যুগে যুগে ধরা করেছে শাসন গর্বোদ্ধত যে যৌবন
মানেনি কখনো, আজো মানিবেনা বৃদ্ধত্বের শাসন।
আমরা সৃজিব নতুন জগৎ, আমরা গাহিব নতুন গান,
সম্ভ্রমে-নত এই ধরা নেবে অঞ্জলি পাতি মোদের দান।
যুগে যুগে জরা বৃদ্ধত্বেরে দিয়াছি কবর মোরা তরুণ---
ওরা দিক গালি, মোরা হাসি খালি বলিব---'ইন্না---
রাজেউন!'*

কত অসংখ্য গান ও কবিতায় নজরুল যে যৌবনের জয়গান করিয়াছেন তাহার কোন ইয়ত্তা নাই। তাই কেহ কেহ তাঁহাকে 'যৌবনের কবি' বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন। কবি নিজেই বলিয়াছেনঃ

---

* কাহারো মৃত্যু সংবাদ শুনিলে মুসলমানেরা উচচারণ করিয়া থাকে---'ইন্নালিল্লাহে অইন্নাইলাইহে রাজেউন।' ইহার অর্থ---'আমরা আল্লার জন্য, আমাদের প্রত্যাবর্তনও হইবে আল্লার নিকট।'

'আমি গাই তারি গান
দৃপ্ত-দম্ভে যে-যৌবন আজ ধরি অসি খরশান
হইল বাহির অসম্ভবের অভিযানে দিকে দিকে।'

কবি-কল্পনার এই নব-যৌবন মিথ্যা ও অসুন্দরের বিরুদ্ধে শুধু অভিযান করিয়াই ক্ষান্ত হয়না, সৃষ্টিও করে সুন্দরতর জগৎ, শোনায় আশার বাণী:

'ভরসার গান শুনাই আমরা ভয়ের ভূতের এই দেশে,
জরাজীর্ণেরে যৌবন দিয়া সাজাই নবীন বর-বেশে।
মোদের আশার উষার রঙে গো রাতের অশ্রু যায় ভেসে।
মশাল জ্বালিয়া আলোকিত করি ঝড়ের নিশীথ-শর্বরী।।"

কবি শুধু যৌবন শক্তির নয়, দেশের সব রকম শক্তির-ই উদ্বোধন সঙ্গীত গাহিয়াছেন। শ্রমিক ও কৃষকশক্তি, ছাত্রসমাজ ও নারীশক্তিও তাঁহার কবি মানসে যোগাইয়াছে কাব্যের প্রেরণা। সর্বহারার দুঃখে কবির হৃদয় বিগলিত অশ্রুধারা তাঁহার 'সর্বহারা' নামক কাব্য-পুস্তকের প্রতি ছত্রকে করিয়াছে অশ্রুসিক্ত:

'দেখিনু সেদিন রেলে,
কুলি ব'লে এক বাবুসা'ব তারে ঠেলে দিলে নীচে ফেলে।
চোখ ফেটে এল জল,
এমনি করিয়া কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল?

কবিরা চিরকালই আশাবাদী। ভবিষ্যতের সুখস্বপ্ন বহু কবিকে করিয়াছে মুগ্ধ। নজরুলের কবিতারও একটি বড় বৈশিষ্ট্য এই 'আশাবাদ'। শত দুঃখ লাঞ্ছনায় জর্জরিত দেশ ও মানুষকে তিনি শুনাইয়াছেন অশেষ আশার বাণী। নজরুলের লেখনীতে পরাজিতের হতাশ্বাস বা নৈরাশ্যের বিলাপ কখনো স্থান পায় নাই। সর্বহারা কুলি মজুরকেও তিনি শোনাইয়াছেন আশ্বাসের বাণী, দিয়াছেন অকুণ্ঠ কণ্ঠে উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের ভরসা:

'আসিতেছে শুভদিন,
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা শুধিতে হইবে ঋণ!
হাতুরি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙ্গিল যারা পাহাড়
পাহাড়-কাটা সে পথে দু'পাশে পড়িয়া যাদের হাড়,
তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর মুটে ও কুলি।

তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি,
তারাই মানুষ তারাই দেবতা, গাহি তাহাদেরি গান,
তাহাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান!'

বাংলার সর্বহারা চাষীর দুঃখে কবির লেখনী রচনা করিয়াছে বহু মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য:

'চাষীরে! তোর মুখের হাসি কই?
তোর গো-রাখা রাখালের হাতে বাঁশের বাঁশী কই?
তোর খালের ঘাটে পাট পচে ভাই পাহাড়-প্রমাণ হয়ে,
তোর মাঠের ধানে সোনা রং-এর বান যেন যায় বয়ে,
সে পাট ওঠে কোন্ লাটে?
সে ধান ওঠে কোন্ হাটে?
উঠানে তোর শূন্য মরাই মরার মত প'ড়ে---
স্বামী-হারা কন্যা যেন কাঁদছে বাপের ঘরে!
তোর গাঁয়ের মাঠে রবি-ফসল ছবির মত লাগে,
তোর ছাওয়াল কেন খাওয়ার বেলা নূন লঙ্কা মাগে?"

আর তাঁহার সেই বিখ্যাত সঙ্গীত, যাহা গাহিয়া আজও বহু কৃষক সভার করা হয় উদ্বোধন এবং বাংলার কৃষক আন্দোলনে চিরকাল থাকিবে অবিস্মরণীয় হইয়া:

'ওঠ্‌রে চাষী জগদ্বাসী ধর্ কসে লাঙ্গল।
ও ভাই আমরা ছিলাম পরম সুখী, ছিলাম দেশের প্রাণ

তখন গলায় গলায় গান ছিল ভাই গোলায় গোলায় ধান,
আজ কোথায় বা সে গান গেল ভাই কোথায় সে কৃষাণ?"

নারী শক্তির বন্দনা গানেও কবির কণ্ঠ হইয়াছে মুখর:

'এ বিশ্বে যত ফুটিয়াছে ফুল, ফলিয়াছে যত ফল,
নারী দিল তাহে রূপ-রস-মধু-গন্ধ সুনির্মল।

তাজমহলের পাথর দেখেছ, দেখিয়াছ তার প্রাণ?
অন্তরে তার মমতাজ নারী, বাহিরেতে সাজাহান!'

নজরুলের কবি-কণ্ঠে ছাত্রদের আশা-আকাঙ্খা ও ছাত্র-জীবনের মর্মবাণী ধ্বনিয়া উঠিয়াছে এক অপরূপ ভাষায়:

'আমরা শক্তি আমরা বল
আমরা ছাত্র দল।
মোদের পায়ের তলায় মূর্চ্ছে তুফান
উর্ধ্বে বিমান ঝড় বাদল!
আমরা ছাত্র-দল।।

O O O O

আমরা রচি ভালবাসার আশার ভবিষ্যৎ,
মোদের স্বর্গ-পথের আভাস দেখায় আকাশ ছায়া-পথ!
মোদের চোখে বিশ্ববাসীর স্বপ্ন দেখা হোক সফল
আমরা ছাত্রদল।'

বাঙালী হিসাবে নজরুল যেমন দেশের নব জাগরণকে দিয়াছেন রূপ ও প্রেরণা, তেমনি মুসলমান হিসাবে বাঙালী মুসলমানকেও শোনাইয়াছেন নব জাগরণের বাণী। তাহাদের জীবন হইতে সর্বপ্রকার জড়তা দূর করিয়া, ইসলামের সত্যকার সৌন্দর্য ও মর্মবাণী উপলব্ধির আহ্বান জানাইয়াছেন কবি অসংখ্য কবিতা ও গানে। মুসলমানের পর্ব উৎসবগুলি যে শুধু মামুলী আচার পালন নহে, সেই সবের

অন্তরালে যে গভীরতর শিক্ষা ও ইঙ্গিত রহিয়াছে তাহার প্রতি এক অভিনব তেজোময় ছন্দ ও ভাষায় তিনি তাঁহার স্ব-সমাজের দৃষ্টি করিয়াছেন আকর্ষণ। কবির 'কোরবাণী' নামক কবিতায় কোরবাণীর সত্যকার মর্মবাণী কী এক অপরূপ বাণী-মূর্তিই না লাভ করিয়াছে:

'ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্বোধন!
জোর চাই, আর যাচ্‌না নয়,
কোরবাণী-দিন আজ না ওই?
বাজ্‌না কই? সাজ্‌না কই?
কাজ না আজিকে জান্‌মাল দিয়ে মুক্তির উদ্ধরণ?
বল্‌ "যুজ্‌বো জান্‌ ভি পণ।"

মুক্তি আন্দোলনের চারণ-কবি শুধু প্রাণহীন আচার পালনে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাই তাঁহার বজ্রকণ্ঠের জিজ্ঞাসা—আজ চরম ত্যাগের দিনে নিজের জানমাল দিয়া দেশের মুক্তি সাধন-ই কি আমাদের কর্তব্য নহে?

'মোহর্‌রম' কবিতায়ও কবি সত্যকার ত্যাগ ও আত্মমর্যাদার ছবি-ই মুসলমান সমাজের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। জীবনে অর্থহীন ও প্রাণহীন শোকের কতটুকুই বা মূল্য? তাই কবি-কণ্ঠের স্পষ্ট বাণী:

"ফিরে এলো আজ সেই মোহর্‌রম মাহিনা,—
ত্যাগ চাই, মর্সিয়া * ক্রন্দন চাহিনা!"

তিনি কাব্যের ভাষায় বহন করিয়া আনিয়াছেন বাঙালী মুসলমানের জন্যে কারবালার বীর শহীদবৃন্দের দৃপ্ত আত্মমর্যাদার বাণী:

"দ্রিম্‌ দ্রিম্‌ বাজে ঘন দুন্দভি দামামা,
হাঁকে বীর, "শির দেগা, নেহি দেগা আমামা!"

---

* মর্সিয়া—শোকগীতি।

* আমামা—শিরস্ত্রাণ, পাগড়ী।

'আনওয়ার নামক কবিতায় কী কঠোর কণ্ঠেই না তিনি স্বজাতিকে দিয়াছেন নির্মম ধিক্কার:

'আনওয়ার! আনওয়ার!
যে বলে সে মুস্‌লিম জিভ ধরে টানো তার!
বেইমান জানে শুধু জানটা বাঁচানো সার!
আনওয়ার! ধিক্কার!
কাঁধে ঝুলি ভিক্ষার—
তলওয়ারে শুরু যার স্বাধীনতা শিক্ষার!"

চাকুরী-লোভী মুসলিম তরুণদেরও তিনি ভর্ৎসনা করিয়াছেন কঠোরতম কণ্ঠে:

'কপালের পানে চাহিয়া আমার নয়নে আসিল বারি,
বাদশা হ'তে পারিত যে হায়, পেয়েছে সে জমাদারী!
দলে দলে আসে, কারও বুকে, কারও পেটে, কারও হাতে লেখা
আজাদীর চিন্‌---অর্থাৎ কিনা চাকুরীর মসী-লেখা!
কাঁদিয়া কহিনু,—ওরে বে-নসীব, হতভাগ্যের দল,
মুসলিম হয়ে জনম লভিয়া এই কি লভিলি ফল?
অন্যেরে দাস করিতে, কিংবা নিজে দাস হ'তে, ওরে
আসেনিক দুনিয়ায় মুসলিম, ভুলিলি কেমন করে?'

ভোট-ভিখারী তথাকথিত নেতা ও তাহাদের ভাড়াটিয়া তরুণরাও তাঁহার কশাঘাত হইতে রেহাই পায় নাই:

'হায় গণ-নেতা ভোটের ভিখারী, নিজের স্বার্থ তরে
জাতির যাহারা ভাবী আশা, তারে নিতেছ খরিদ করে।'

মুসলিম ইতিহাসের অতীত ও বর্তমান বহু বীর ও মহাপুরুষ সম্বন্ধে নজরুল যে-সব অবিস্মরণীয় কবিতা লিখিয়াছেন তাহাতেও ইসলামের এক তেজোময় মর্মবাণীই উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। তদুপরি কবি ঐসব

কবিতায় মুসলিম ভারতের বর্তমান নিষ্ক্রিয়-জড়তাকে করিয়াছেন কঠোর আঘাত। তাঁহার 'উমর ফারুক' 'খালেদ', 'চিরঞ্জীব জগলুল', 'আমানুল্লাহ্', 'রীফ সরদার', প্রভৃতি কবিতা বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এই সব কবিতায় ঐ সব মহাপুরুষদের চরিত্র-মাহাত্ম্যকে তিনি উদঘাটন করিয়াছেন এক অপরূপ ছন্দ ও জোরালো ভাষায়। মুসলমানের আত্ম-চেতনাকে জাগাইবার জন্য বারে বারে তিনি এই সব মহাপুরুষের ত্যাগ ও মহত্ত্বের দিকে স্ব-সমাজের দৃষ্টি করিয়াছেন আকর্ষণ।

ঈদের দিনের মহামিলন, সাম্য মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের ছবি আঁকিয়াছেন কবি তাঁহার 'ঈদ মোবারক' কবিতায়:

'আজি ইসলামী-ডঙ্কা গরজে ভরি জাহান,
নাই বড় ছোট—সকল মানুষ এক সমান,
রাজা-প্রজা নয় কারো কেহ!
কে আমীর তুমি নওয়াব বাদশাহ বালাখানায়?
সকল কালের কলঙ্ক তুমি; জাগালে হায়
ইসলামে তুমি সন্দেহ।
ইসলাম বলে, সকলের তরে মোরা সবাই।
সুখ দুঃখ সমভাগ ক'রে নেব সকলে ভাই,
নাই অধিকার সঞ্চয়ের!
কারো আঁখি-জলে কারো ঝাড়ে কিরে জ্বলিবে দীপ?
দুজনার হবে বুলন্দ-নসিব, লাখে লাখে হবে বদ্‌নসিব?
এ নহে বিধান ইসলামের।'

দিকে দিকে দেশে দেশে ইসলামের যে নবজাগরণ আজ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তাহাও হইয়াছে কবির বহু কবিতার বিষয়-বস্তু ও প্রেরণার উৎস। আশাবাদী কবি মুসলিম তরুণদের সামনে ধরিয়াছেন নিজের আত্মপ্রত্যয়-জাত এক উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের স্বপ্ন ও ঘোষণা করিয়াছেন এক বলিষ্ঠ সঙ্কল্প:

'উষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা টুটাব তিমির রাত,
বাধার বিন্ধ্যাচল।
আমরা গড়িব নতুন করিয়া
ধূলায় তাজমহল।
চল্ চল্ চল্॥'

নজরুল মানুষের দুঃখ দুর্দশার ছবি আঁকিয়াছেন অত্যন্ত অকৃত্রিম
রিকতার সঙ্গে। দূরে বসিয়া নেহাৎ নির্বিকার ও নির্লিপ্তের মতো
দুঃখের দৃশ্য তিনি দেখেন নাই। দুঃখের অগ্নি-দাহনের মধ্যেই
র জীবন কাটিয়াছে। তাই তাঁহার কবিতায় যে দুঃখের চিত্র
া উঠিয়াছে তাহা কল্পনাবিলাসীর নিছক ভাববিলাস নহে, তাহা
র সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতারই ছন্দোময় বাণী-রূপ।

নিজের রচনা সম্বন্ধে নজরুল নিজেই বলিয়াছেন---'আমি উঁচু
র উপর সোনার সিংহাসনে বসে কবিতা লিখিনি। যাদের মূক
া কথাকে আমি ছন্দ দিতে চেয়েছি, মালকোঁচা মেরে সেই তলার
ষর কাছে নেমে গেছি। 'দাদারে'---বলে দু'বাহু মেলে তারা
য় আলিঙ্গন দিয়েছে। আমি তাদের পেয়েছি, তারা আমায়
ছে।"*

কবির উপরোক্ত কথায় কিছুমাত্র অতিরঞ্জন নাই। তাঁহার
ভূতি ও কাব্য প্রেরণা তাঁহার সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা হইতেই আহৃত,
তাহা সহজেই পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে---তাহা 'কানের ভিতর
মরমে' গিয়া পোঁছে এবং তাই তাঁহার কবিতা পাঠ করিতে
তে কবির অনুভূতির সঙ্গে পাঠকের অনুভূতিও একাত্ম হইয়া
ত কিছুমাত্র দেরী লাগে না বা কিছুমাত্র চেষ্টা চরিত্র করিতে হয়

উদ্দীন

চতুষ্পার্শ্বের মানুষের দুঃখকষ্ট, সামাজিক গ্লানি, পরাধীনতা ও অর্থনৈতিক অব্যবস্থা ইত্যাদি যেমন তাঁহার কাব্যের বিষয়-বস্তু হইয়াছে, তেমনি চতুর্দিকের বিশ্বপ্রকৃতি ও তাহার বিচিত্র সৌন্দর্য্যও তাঁহাকে কম আকৃষ্ট করে নাই।

সমুদ্র সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন একাধিক উৎকৃষ্ট কবিতা। তাঁহার কবি কল্পনায় সমুদ্র দেখা দিয়াছে নানা মূর্তিতে। একবার লিখিয়াছেন--

'হে সিন্ধু, হে বন্ধু মোর, হে চির-বিরহী
হে অতৃপ্ত! রহি রহি
কোন্ বেদনায়
উদ্বেলিয়া ওঠ তুমি কানায় কানায়?
কি কথা শুনাতে চাও, কারে কি কহিবে বন্ধু তুমি?
প্রতীক্ষায় চেয়ে আছে ঊর্ধ্বে নীলা নিম্নে বেলাভূমি!
কথা কও, হে দুরন্ত, বল,
তব বুকে কেন এত ঢেউ জাগে, এত কল কল?"

'বিদ্রোহী কবি' সিন্ধুকেও কল্পনা করিয়াছেন 'বিদ্রোহী' রূপে,---

'হে সিন্ধু হে বন্ধু মোর
হে মোর বিদ্রোহী।
রহি' রহি'
কোন্ বেদনায়
তরঙ্গ-বিভঙ্গে মাতো উদ্দাম লীলায়!
হে উন্মত্ত, কেন এ নর্তন?
নিষ্ফল আক্রোশে কেন কর আস্ফালন
বেলাভূমে পড় আছাড়িয়া!'

সেই সমুদ্রকেই কবি আবার কল্পনা করিয়াছেন চির ক্ষুধিতরূপে---

'হে ক্ষুধিত বন্ধু মোর, তৃষিত জলধি,
এত জল বুকে তব, তবু নাহি তৃষার অবধি!

এত নদী উপনদী তব পদে করে আত্মদান,
বুভুক্ষু! তবু কি তব ভরিল না প্রাণ?
দুরন্ত গো মহাবাহু,
ওগো রাহু
তিনভাগ গ্রাসিয়াছে—এক ভাগ বাকী!" ইত্যাদি।

চট্টগ্রামের 'কর্ণফুলী' নদীও তাঁহার কবি প্রেরণা হইতে বাদ পড়ে নাই ঃ

'ওগো কর্ণফুলী!
তোমার সলিলে পড়েছিল কবে কার কান-ফুল-খুলি?
তোমার স্রোতের উজান ঠেলিয়া কোন্ তরুণী কে জানে,
"সাম্পান" নায়ে ফিরেছিল তার দয়িতের সন্ধানে?
আনমনা তার খুলে গেল খোঁপা, কান-ফুল গেল খুলি
সে ফুল যতনে পরিয়া কর্ণে হলে, কি কর্ণফুলী?"

নির্বাক গুবাক তরুর সারিও কবির সহানুভূতি ও কাব্য-প্রেরণার হইয়াছে উৎস। তাই 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি' নামক কবিতায় তিনি লিখিয়াছেন ঃ

'মলিন মাটির বন্ধনে বাঁধা হায় অসহায় তরু,
পদতলে ধূলি, উর্ধে তোমার শূন্য গগন-মরু।
দিবসে পুড়িছ রৌদ্রের দাহে, নিশীথে ভিজিছ হিমে,
কাঁদিবারও নাই শকতি, মৃত্যু-আফিমে পড়িছ ঝিমে!'

অগ্রহারণ মাসে যখন পাকা ধানের সুবাসে পল্লীর প্রতি গৃহআঙ্গিনা হইয়াছে ভরপুর, চির অভাবগ্রস্ত বাংলার পল্লী-জীবনেও বহিয়া চলিয়াছে আনন্দের বন্যা; সেই অভাবহীন আনন্দ-মুখর পল্লীর হাসি-খুশীর কী মনোরম চিত্রই না কবি আঁকিয়াছেন তাঁহার অতুলনীয় ও অননুকরণীয় ভাষায় ঃ

'ঋতুর খাঞ্চা ভরিয়া এল কি ধরণীর সওগাত?
নবীন ধানের আঘ্রাণে আজি অঘ্রাণ হ'ল মাৎ।

O O O

হল্লা করিয়া ফিরিছে পাড়ার দস্যি ছেলের দল।
ময়নামতীর শাড়ী-পরা মেয়ে গয়নাতে ঝলমল।
নতুন পৈঁচি বাজুবন্দ্ প'রে
চাষা-বৌ কথা কয়না গুমোরে,
জারিগান আর গাজীর গানেতে সারা গ্রাম চঞ্চল!
বৌ করে পিঠা 'পুর'-দেওয়া মিঠা, দেখে জিভে সরে জল।'

ঈশ্বরানুভূতিও কবির কাব্যপ্রেরণা হইতে বাদ যায় নাই:

"বহু পথে বৃথা ফিরিয়াছি প্রভু
আর হইব না পথহারা।
বন্ধু স্বজন সব ছেড়ে যায়
তুমি একা জাগো ধ্রুবতারা।"

অন্যত্রও তিনি এ ভাবে আল্লায় করিয়াছেন আত্মনিবেদন:

'মার কাছে মার খেয়ে
শিশু যেমন মাকে ডাকে,
যত দাও দুখ শোক,
ততই ডাকি তোমাকে।'

নজরুলের জীবন যেমন ছিল হাসি হুল্লোড় ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপে ভরপুর তেমনি তাঁহার রচিত সাহিত্যেও স্থান পাইয়াছে প্রচুর হাস্য-রস। তাঁহার মন ছিল রস ও রসিকতার অফুরন্ত উৎস---সেই উৎস হইতে প্রচুর হাস্য-রস-ধারা তাঁহার গদ্য ও পদ্য রচনায় ও অসংখ্য হাসির গানে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। বলাই বাহুল্য, সেই নিরঙ্কুশ নিষ্কলুষ হাসি তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের মত তাঁহার সাহিত্যের এক বিরাট অংশ দখল করিয়া আছে। হাসির গান হিসাবে তাঁহার 'দে গরুর গা ধুইয়ে'

গানটি বহুল পরিচিত। হাস্য-রসের অন্তরালে দেশের চিত্রও যে তাহাতে না ফুটিয়াছে তাহা নহে:

'চর্মকার আর মেথর চাঁড়াল ধর্মঘটের কর্ম-গুরু।
পুলিশ শুধু করছে পরখ্ কার কতটা চর্মপুরু!
চাটুয্যেরা রাখছে দাড়ি,
মিঞারা যান নাপিত বাড়ী!
খোঁটকাগন্ধী ভোজপুরী কয় বাঙালীকে—'মৎছুঁইয়ে!'
কোরাস্—দে গরুর গা ধুইয়ে।'

হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন না ঘটিলে সেই মিলন যে কিছুতেই দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না ইতিহাসে তাহার প্রমাণের অভাব নাই। আন্তরিক মিলনের চেষ্টা না করিয়া আমাদের দেশে হিন্দু মুসলমানের পারস্পরিক স্বার্থরক্ষার নামে বহু 'প্যাক্ট্' স্বাক্ষরিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ সব তথাকথিত 'প্যাক্ট্' সামান্য অজুহাতে ভাঙ্গিয়া যাইতেও দেরী লাগে নাই। নজরুলের মত অকপট দেশ-প্রেমিকের মনে এই সব ক্ষণভঙ্গুর 'প্যাক্টের' প্রতি তাই কোন দিন আস্থা জাগে নাই। বরং এইসব 'প্যাক্ট্' জোগাইয়াছে তাঁহার মনে হাসি ও বিদ্রূপের প্রেরণা। এবং এই প্রেরণারই সাক্ষাৎ ফল তাঁহার 'প্যাক্ট্' নামক সুপ্রসিদ্ধ হাসির গান:

'বদ্না-গাড়ুতে গলাগলি করে, নব প্যাক্টের আস্নাই,
মুসলমানের হাতে নাই ছুরি, হিন্দুর হাতে বাঁশ নাই॥

O O O

বাবু কন্, 'খাই তোমারে তুষিতে ঐ নিষিদ্ধ কুকঁড়ো!
মিঞা কন, 'মিল আরো জমে দাদা, যদি দাও দুটো টুক্রো!
বাদশাহী গেছে, আছিল মুর্গী, দাদা, তাও হ'ল শুদ্ধি?
দর্মা খুলিয়া তাও নিয়া গেলে, আর কার জোরে যুদ্ধি!'
বাবু কন, 'পরি লুঙ্গি বি-কচ্ছ তোমাদের দিল্ তুষিতে!'
মিঞা কন, 'ফেজে রাখি চৈতনী ঝাণ্ডা সেই সে খুশীতে!'

কিন্তু বালির বাঁধের মত এই কৃত্রিম ও আন্তরিকতাহীন মিলন মুহূর্তের সামান্য উত্তেজনার মুখে ভাঙ্গিয়া চূরমার হইয়া গেল:

'সারা-রারা-রারা' সহসা অদূরে উঠিল হোরির হর্‌রা
শম্ভু ছুটিল বম্বু তুলিয়া, ছক্কু মিঞা নিল ছোর্‌রা!

'প্যাক্টের' কাগজ পাশে সরাইয়া রাখিয়া এইভাবে শুরু হইল দাঙ্গা---দেশের ইতিহাসে আর একটি কলঙ্কময় অধ্যায়!

'শ্রীচরণ ভরসা' নামক গানে হাস্য বিদ্রূপ মিশাইয়া কবি দেশবাসীর ভীরুতাকে করিয়াছেন আঘাতঃ

'থাকিতে চরণ মরণে কি ভয়, নিমেষে যোজন ফরসা।
মরণ-হরণ নিখিল-শরণ জয় শ্রীচরণ ভরসা।।'

মেয়েদের সম্মতির বয়স বাড়াইবার উদ্দেশ্যে যখন 'সারদা আইন' ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় উথাপিত হইল তখন গোঁড়া ও রক্ষণশীলরা তুলিলেন তাহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ।

রক্ষণশীলদের এই গোঁড়ামিও নজরুলের বিদ্রূপবাণ হইতে রেহাই পায় নাইঃ

'ডুবু ডুবু ধর্মতরী, ফাট্‌ল মাইন্‌ 'সরদা'র।
সামাল সামাল পড়ল সাড়া ব-মাল মেয়ে মর্দার।
এ কোন এল বালাই, এবে পালাই বল কোন দেশ,
গাছের নীচে ঘড়ে'ল শেয়াল, কাকের মুখে সন্দেশ!
কন্যা-ডোবা বন্যা এল, ভাস্‌ল-বুঝি ঘর দ্বার।।'

আর বেশী বয়সে মেয়েকে বিবাহ দিতে হইবে সেই ভাবনায়ঃ

'দোক্তা ফেলে গিন্নি কাঁদেন, কর্তা করেন ঘর বার।।'

আমাদের কলম-পেশা কেরানীদের লক্ষ্য করিয়াও তিনি রচনা করিয়াছেন হাসির গানঃ

''নখ-দন্ত-বিহীন চাকুরী অধীন আমরা বাঙালী বাবু।
পায়ে গোদ, গায়ে ম্যালেরিয়া,
বুকে কাশি লয়ে সদা কাবু।।

ঢিলে-ঢালা কাছা কোঁচা সামলায়ে
ভুঁড়ি বয়ে দুটি নিট্‌পিটে পায়ে,
আফিসে কসিয়া কলম পিশিয়া
ঘরে এসে খাই সাবু।।"

আমরা জানি কবি নিজে অত্যন্ত চা-ভক্ত। তাই চা-বন্দনা করিতে যাইয়া, কবি পরিবেশন করিয়াছেন প্রচুর হাস্য-রসঃ

"চায়ের পিয়াসী পিপাসিতচিত আমরা চাতক দল।
দেবতারা কন সোমরস যারে সে এই গরম জল।।
চায়ের প্রসাদে চার্ব্বাক ঋষি বাক-রণে হ'ল পাশ
চা নাহি পেয়ে চার-পেয়ে জীব চর্ব্বণ করে ঘাস।
লাখ কাপ্‌ চা খাইয়া চালাক
হয়, সেই প্রমাণ চাও কত লাখ?
মাতালের দাদা আমরা চাতাল, বাচাল বলিস্‌ বল্‌।।
O O O
চা চেয়ে চেয়ে কাকা নাম ভুলে পশ্চিমে চাচা কয়,
এমন চায়ে যে মারিতে চাহে সে চামার সুনিশ্চয়।
চা করে করে ভৃত্য নফর
নাম হারাইয়া হইল চাকর,
চা নাহি খেয়ে বেচারা নাচার হয়েছে চাষা সকল।।"

বাংলাদেশের মত, সম্ভবত সব দেশেই 'শালার' সঙ্গে সম্পর্কটি চির-রস-মধুর। কাজেই 'শ্যালক' নামক মধুর সম্পকিত ব্যক্তিটিও কবির কবিত্ব রসের স্পর্শে হইয়াছে ধন্য এবং এই ব্যঙ্গ মধুর গানে হাস্য-রস পরিবেশন করিতে যাইয়া কবি তাঁহার শব্দ প্রয়োগ নৈপুণ্যের দেখাইয়াছেন পরাকাষ্ঠা। গানটি এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইলঃ

"গিন্নির ভাই পালিয়ে গেছে গিন্নি চ'টে কাঁই।
আমার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে কাঁদিছেন সদাই।।
কোথায় শালা শালা কোথায় কেবল ভদ্রলোক,
ডাক্‌তে গিয়ে জিভ্‌ কেটে ভাই ফিরিয়ে নি চোখ।
ভ্যালা ফ্যাসাদ হ'ল দাদা শালায় কোথায় পাই।।

খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে দেখতে গেলুম সম্মুখে আট-শালা,
আটশালাতে মোর শালা নাই, বসেছে পাঠ-শালা
গো-শালাতে গরু বাঁধা, আমার শালা নাই ৷৷
খুঁজতে গেলুম শহর, দেখি শালার ছড়াছড়ি।
পান-শালাতে পান ক'রে যায় মাতাল গড়াগড়ি,
ধর্ম্মশালা অতিথ-শালা শালার অন্ত নাই ৷৷
হাতী-শালা, ঘোড়া-শালা, রাজার ডাইনে বাঁয়ে,
হঠাৎ দেখি যাচ্ছে বাবু দো-শালা গায়ে,
দো-শালা ত চাইনে বাবা, এক শালাকে চাই ৷৷
দশ-শালা ব্যবস্থা ঝুলে গরীব চাষার ভাগ্যে,
দিয়াশালাই পেয়ে ভাবি, শালাই পেলাম যাক্ গে!
চাইনু শালা, মুদি দিল গরম মশালাই ৷৷
ঢেঁকি-শালায় ঢেঁকি শুয়ে, পাক-শালাতে ছাই,
হায় শালায় কোথায় পাই ৷৷"

'দাড়ি-বিলাপ' নামক সুদীর্ঘ কবিতায়ও কবি যথেষ্ট হাস্য-রসের অবতারণা করিয়াছেন। এই কবিতাটির ফুটনোটে লেখা আছে, "কোন প্রফেসার বন্ধুর দাড়ী কর্তন উপলক্ষ্যে রচিত"। কবিতাটির সূচনা হইয়াছে এই ভাবেঃ

"হে আমার দাড়ি!
একাদশ বর্ষ পরে গেলে আজি ছাড়ি,
আমারে কাঙাল করি, শূন্য করি বুক!
শূন্য এ চোয়াল আজি শূন্য এ চিবুক!"

মুখে দাড়ি গজাইবার পূর্বাবস্থাও কবির স্মরণে জাগিয়াছেঃ

"তখনো এ গাল ছিল সাহারার মরু,
বে-পাল মাস্তুল কিম্বা বি-পল্লব তরু!"

এই কবিতায় কবি স্বদেশবাসী সম্বন্ধে দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেনঃ

"বাঙালীর দাড়ি
বাঙালীর শৌর্য্য-সাথে গিয়াছে ছাড়ি।"

এবং দাড়ির শোকে কবি করিয়াছেন এক দীর্ঘ বিলাপ:

> "ভোজপুরী দারোয়ান তারও দাড়ি আছে,
> চলিতে সে দাড়ি যেন শিখী-পুচ্ছ নাচে!
> পাঞ্জাবী, বেলুচি, শিখ, বীর রাজপুত,
> দরবেশ, মুনি, ঋষি, বাবাজি অদ্ভুত,
> বোকেন্দ্র-গন্ধিত ছাগ সেও দাড়ি রাখে,
> শিম্পাজী, গরিলা---হায় বাদ দিই কা'কে!
> এমন যে বটবৃক্ষ তারও নামে ঝুরি,
> ঝুরি নয় ও যে দাড়ি করিয়াছে চুরি
> বনের মানুষ হতে! তাই সে বনস্পতি আজ!
> দাড়ি রাখে গুল্ম-লতা রসুন পেঁয়াজ!
>
> O O O
>
> হায় রে কাঙালী
> রহিলি তুই-ই রে হয়ে মাকুন্দা বাঙালী।"

নজরুল ছোটদের জন্যও লিখিয়াছেন বহু কবিতা। কিশোরদের উপযোগী কবিতাগুলির মধ্যে 'সাতভাই চম্পা' কবিতা-গুচ্ছ, 'দেখ্‌ব এবার জগৎটাকে' প্রভৃতি কবিতা ত কিশোর বয়স্ক ছাত্র সমাজের খুবই সুপরিচিত। নিম্নলিখিত লাইনগুলোতে কিশোর মনের চির-আকাঙ্খিত সঙ্কল্প ফুটিয়া উঠিয়াছে এক জোরালো ভাষায়:

> "থাকব না'ক বদ্ধ ঘরে দেখ্‌ব এবার জগৎটাকে
> কেমন করে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘুর্ণি পাকে।
> দেশ হতে দেশ-দেশান্তরে
> ছুট্‌ছে তারা কেমন করে
> কিসের নেশায় কেমন করে মরছে বীর লাখে লাখে
> কিসের আশায় করছে তারা বরণ মরণ যন্ত্রণাকে!"

কবির শিশু-পাঠ্য রচনার সংখ্যাও নেহাৎ কম নহে। তাঁহার 'ঝিঙেফুল' ও 'পুতুলের বিয়ে' চিরকালই শিশু মহলে আদরের সঙ্গে পঠিত হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

নতুন শিশুর জন্ম চিরকালই সব পরিবারেই বহন করিয়া আনে নতুনের আনন্দ। সংসারের নতুন অতিথির আবির্ভাবে সংসার হইয়া ওঠে মধুময়। 'শিশু-যাদুকর' কবিতায় কবি কী সুন্দর ভাবেই না সেই ভাবটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন:

"কোন্ রূপলোকে ছিলি রূপকথা তুই,
রূপ ধরে এলি এই মমতার ভুঁই।

o o o

ছোট তোর মুঠিভরি আনিলি মণি,
সোনার জিয়ন-কাঠি, মায়ার ননী।
তোর সাথে ঘর ভরে এল ফাল্গুন,
সব হেসে খুন হোল কি জানিস্ গুণ!"

'ঝিঙেফুলের' বর্ণনাটিও হইয়াছে মনোরম:

"গুল্মে পর্ণে
লতিকার কর্ণে
ঢল ঢল স্বর্ণে
ঝলমল দোলো দুল
ঝিঙেফুল।

o o o

পউষের বেলা শেষ
পরি জাফরাণী বেশ
মরা মাচানের দেশ
করে তোল মশগুল
ঝিঙেফুল।"

তাঁহার 'মা' 'প্রভাতী' 'লিচু-চোর' 'খুকী ও কাঠ-বেড়ালী' প্রভৃতি কবিতা বাংলা দেশের শিশুমহলে সর্বজন পরিচিত ও সবিশেষ জনপ্রিয়। ঈর্ষাকাতর খুকী পেয়ারা ভক্ষণরত কাঠবেড়ালীকে একই সঙ্গে দিতেছে অভিশাপ ও জানাইতেছে মিনতি:

"পেটে তোমার পিলে হবে! কুড়ি-কুষ্টি-মুখে!
হেই ভগবান! একটা পোকা যাক্ পেটে ওর ঢুকে!
ইস্! খেয়োনা মস্তপানা ঐ সে পাকাটা ও।

o o o

আমিও খুবই পেয়ারা খাই যে। একটা আমায় দাও।"

"খোকার বুদ্ধি" কবিতাটিতে খোকার বীরত্ব বর্ণনা করা হইয়াছে এইভাবেঃ

"সাত লাঠিতে ফড়িং মারেন এমনি পালোয়ান;
দাঁত দিয়ে সে ছিঁড়লে সেদিন মস্ত আলোয়ান।।"

"খোকার গল্প বলা" কবিতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে শিশুর অভিনব কল্পনাশক্তিঃ

"একদিন না রাজা—
ফড়িং শিকার করতে গেলেন খেয়ে পাঁপড়-ভাজা!
রাণী গেলেন তুল্‌তে কল্‌মি শাক
বাজিয়ে বগল টাক্‌ডুমাডুম টাক্।
রাজা শেষে ফিরে এলেন ঘরে
হাতীর মতন একটা বেড়াল - বাচচা শিকার করে।"

'চিঠি' কবিতাটিতে ভাই লিখিতেছেন ছোট বোন্‌কে পত্র, গদ্যে নহে ছন্দ মিলাইয়া পদ্যে। জোর করিয়া বলা যায়, যে কোন বোন্ এই রকম মজার চিঠি পাইলে খুশীতে বাড়ী করিয়া তুলিবে তোলপাড়:

"দিইনি চিঠি আগে,
তাইতে কি বোন্ রাগে?
হচ্ছে যে তোর কষ্ট
বুঝ্‌তেছি খুব পষ্ট।
তাইতে সদ্য সদ্য
লিখতেছি এই পদ্য।"

চিঠির শেষটাও কম মনোজ্ঞ নহে:

মা মাসীমা'য় পেন্নাম
এখান হতেই করলাম।
স্নেহাশিস্ এক বস্তা,
পাঠাই, তোরা ল'স্ তা!
সাঙ্গ পদ্য সবিটা,
ইতি। তোদের কবি-দা।"

এই ধরণের বহু মনোজ্ঞ কবিতাই স্থান পাইয়াছে কবির ঐ 'ঝিঙেফুল' নামক কবিতা পুস্তকে। তাঁহার "পুতুলের বিয়ে" নামক নাটিকাটি ছেলেমেয়েদের অভিনয়-উপযোগী করিয়াই লেখা হইয়াছে। তাহাতে 'কমলির' চিনে পুতুল ডালিমকুমারের সঙ্গে 'টলির' মেমপুতুল ও 'বেগমে'র জাপানী পুতুলের বিবাহ ব্যাপারটি নানা ঘটনার সমাবেশে বেশ উপভোগ্য হইয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই বইখানিতে কয়েকটি হাসির গানও স্থান পাইয়াছে।

"নামতা পাঠ" কবিতাটিতে আছে:

"আমি যদি বাবা হতুম, বাবা হতো খোকা,
না হলে তার নামতা পড়া মারতাম মাথায় টোকা।"

"সাতভাই চম্পা" নামক কবিতা সমষ্টিতে শিশুমনের আশা-আকাঙ্খা ফুটিয়া উঠিয়াছে এক অভিনব ভঙ্গিমায়---

প্রথম ভাই মা-কে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে:

"আমরা যদি না জাগি মা, কেমনে সকাল হবে?
তোমার ছেলে উঠ্‌লে মাগো, রাত পোহাবে তবে।"

আর চতুর্থ ভাইয়ের সঙ্কল্প হইতেছে:

"আমি সাগর পাড়ি দেব, আমি সওদাগর,
সাত সাগরে ভাসবে আমার সপ্ত মধুকর।"

বর্ণনার চাতুর্য্যে আর ছন্দ ও ভাষার কারুকার্য্যে এই সমস্ত কবিতা হইয়া উঠিয়াছে বেশ মনোজ্ঞ ও হৃদয়গ্রাহী। আমাদের বিশ্বাস বাংলার শিশু সাহিত্যে নজরুলের এই অবদানও থাকিবে অবিস্মরণীয় হইয়া।

চতুর্থ অধ্যায়

গল্প ঃ উপন্যাস ঃ নাটক ঃ

'বিদ্রোহী কবি' নজরুল ইসলাম দেশ বিদেশে কবি হিসাবেই সমধিক পরিচিত। কবিতা ছাড়া তিনি যে-সব গল্প, উপন্যাস ও নাটক নাটিকা লিখিয়াছেন যদিও তাহা সংখ্যায় অল্প তাহারও সাহিত্যিক মূল্য নেহাৎ কম নহে। তাঁহার গল্পগুলি---'ব্যথার দান,' 'রিক্তের বেদন' ও 'শিউলি মালা,' নামক তিনখানি গল্পগ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে। উপন্যাসও লিখিয়াছেন তিনি গোটা তিনেক—'বাঁধন হারা', 'মৃত্যুক্ষুধা' ও 'কুহেলিকা'। শিশু-নাটিকা 'পুতুলের বিয়ে' ছাড়া তাঁহার নাট্য-গ্রন্থ হইতেছে সংখ্যায় মাত্র দুইখানি---'ঝিলিমিলি' ও 'আলেয়া'। ছোট গল্প বা উপন্যাসের ক্ষেত্রে নজরুল হয়ত অবিস্মরণীয় কৃতিত্বের দাবী করিতে পারিবেন না। কিন্তু তাঁহার রচনার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য, ভাষা ও বর্ণনা ভঙ্গি এই রচনাগুলিকেও দিয়াছে এক অনন্যসাধারণ অভিনবত্ব ও আকর্ষণ। ব্যথার দান ও রিক্তের বেদনকে গদ্য-ভাষায় কবিতা বলিলেও বিশেষ অত্যুক্তি করা হইবে না। তরুণ কবির প্রথম যৌবনের নানা আবেগ, ব্যথা-বিরহ, মান-অভিমান ও চঞ্চল মনের নানা আকুলি ব্যাকুলি এক অভিনব কবিত্ব-মণ্ডিত ভাষায় এই দুই গ্রন্থের গল্পগুলিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। গল্পে---বিশেষ করিয়া ছোট গল্পে একটি মাত্র ভাবেরই সুসংহতও সুপরিমিত প্রকাশই ঘটিয়া থাকে। তাই সার্থক ছোট গল্প লিখিতে হইলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন রচনায় অতিমাত্রায় সংযম ও পরিমিতি জ্ঞান। কবি মাত্রেই সাধারণত হইয়া থাকেন কিছুটা আবেগপ্রবণ---নজরুলের রচনায়ও এই আবেগের আধিক্য সহজেই গোচরীভূত। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া সফল ও সার্থক গল্প---বিষয়-বস্তু ও আঙ্গিকে উচচাঙ্গের ছোট গল্প অন্য কোন বড় কবি-ই রচনা করিতে পারেন নাই। একমাত্র 'শিউলি মালার' গল্প কয়টি ছাড়া নজরুলেরও প্রায় সব গল্পই আবেগের

আতিশয্যে ভারসাম্য হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাঁহার এই সব গল্পে গল্পাংশ বিশেষ না থাকিলেও অথবা যদিও না ঘটিয়া থাকে গল্পের সুসংহত পরিণতি, তবুও পাঠকের পক্ষে কিছু মাত্র মনঃক্ষুণ্ণ বা হতাশ হইবার কোন কারণ ঘটে না। কারণ তাঁহার ভাষা ও বর্ণনার অভিনব মাধুর্য্য, কবিত্বময় সৌন্দর্যই পাঠককে শেষ পর্যন্ত আকর্ষণ ও মুগ্ধ করিয়া রাখে।

নজরুলের প্রথম প্রকাশিত গল্প-গ্রন্থ হইতেছে 'ব্যথার দান।' কবির যুদ্ধ-জীবনের পটভূমি অবলম্বন করিয়াই এই গ্রন্থের ও এর পরবর্ত্তী গ্রন্থ 'রিক্তের বেদনের' অধিকাংশ গল্প রচিত হইয়াছে। দেশাত্মবোধের চারণ-কবির গল্প গ্রন্থেও রহিয়াছে স্বদেশ প্রেমের বহুল পরিচয়। 'ব্যথার দান' গল্পের সূচনাতেই গল্পের নায়ক 'দারা' আত্ম-জবানীতে বলিতেছে, "দূ একদিন ভাবি হয়তো মায়ের এই অন্ধ স্নেহটাই আমাকে আমার এই বড়-মা দেশটাকে চিন্‌তে দেয়নি। বেহেশ্‌ত্‌ হ'তে আবদেরে ছেলের কান্না মা শুন্‌তে পাচ্ছেন কিনা জানিনে, কিন্তু এ আমি নিশ্চয় করে বল্‌তে পারি যে, মা-কে হারিয়েছি বলেই---মাতৃস্নেহের ঐ মস্ত শিকলটা আপনা হ'তে ছিঁড়ে গিয়েছে বলেই আজ মার চেয়েও মহিয়সী আমার জন্মভূমিকে চিন্‌তে পেরেছি। তবে এও আমাকে স্বীকার করতে হবে---'মা'কে আগে আমার প্রাণভরা শ্রদ্ধা-ভক্তি ভালবাসা অন্তরের অন্তর থেকে দিয়েই আজ মা'র চেয়েও বড় জন্মভূমিতে ভালবাসতে শিখেছি। মা'কে আমি ছোট করছি নে। ধরতে গেলে মা-ই বড়। ভালবাস্‌তে শিখিয়েছেন তো মা। আমার প্রাণে স্নেহের সুরধুনী বইয়েছেন তো মা।"

ঐ গ্রন্থের 'হেনা' গল্পটি বাংলা সাহিত্যে বহন করিয়া আনিয়াছে পুরোপুরি যুদ্ধের চিত্র ও আবহাওয়া। ঐ গল্পে যৌবনের উল্লাস ও মান অভিমানের সঙ্গে মিশিয়াছে মনোরম বর্ণনা কৌশল ও বাঙালী পাঠকের অপরিচিত যুদ্ধ পরিবেশ। এই গল্প একদিন তরুণ পাঠকদের করিয়া তুলিয়াছিল আনন্দ-মুখর। সুসাহিত্যিক হবীবুল্লাহ্ বাহার লিখিয়াছেন—'একদিন (বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায়) পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে একটা গল্পের উপর চোখ পড়ল। গল্পটির নাম

'হেনা'। লেখকেরও অদ্ভুত নাম কাজী নজরুল ইসলাম, হাবিলদার, বঙ্গ বাহিনী, করাচী। কয়েক লাইন পড়েই লাফিয়ে উঠলাম। .....তারপর ছায়াচিত্রের মত চোখের সামনে ভেসে উঠলো 'সিন নদীর ধারে তাম্বু, ফ্রান্স, 'প্যারিসের পাশে ঘন বন,' 'হিণ্ডেন্‌বার্গ লাইন', 'কোয়েটার দ্রাক্ষা কুঞ্জ,' 'ডাক্কা ক্যাম্প,' কাবুল, ইত্যাদি'। এই গল্প আরম্ভ হইয়াছে এইভাবেঃ "ভার্দ্দুন ট্রেঞ্চ, ফ্রান্স—ওঃ। কি আগুন বৃষ্টি। আর কি তার ভয়ানক শব্দ। গুড়ুম দ্রুম্‌-দুম। আকাশের একটুও নীল দেখা যাচ্ছে না, যেন সমস্ত আস্‌মান জুড়ে আগুন লেগে গেছে। গোলা আর বোমা ফেটে ফেটে আগুনের ফিনকি এত ঘন বৃষ্টি হচ্ছে যে, অত ঘন যদি জল ঝরত আসমানের নীল চক্ষু বেয়ে, তা'হলে এক দিনেই সারা দুনিয়া পানিতে সয়লাব হয়ে যেত। আর এম্‌নি অনবরত যদি এই বাজের চেয়েও কড়া দ্রুম্‌-দুম শব্দ হত, তা'হলে লোকের কানগুলো একেবারে অকেজো হয়ে যেত। আজ শুধু আমাদের সিপাইদের সেই 'হোলি' খেলার গানটা মনে পড়ছে,—

"আজু তল্‌ওয়ারসে খেলেঙ্গে হোরি
জমা হো গেয়ে দুন্‌য়া কা সিপাই।
ঢালোঁ ও কি ডঙ্কা বাদন লাগি, তোঁপওকে পিকচকারী
গোলা বারুদ কা রঙ্গ বনি হেয়, লাগি হেয় ভারী লড়াই।"

বাস্তবিক এ গোলা-বারুদের রঙে আসমান জমিন লালে লাল হয়ে গেছে! সবচেয়ে বেশী লাল, এ বুকে বেয়নেট-পোরা হতভাগাদের বুকের রক্ত! লালে লাল। শুধু লাল আর লাল! এক একটা সিপাই শহীদ হয়েছে আর যেন বিয়ের নওশার মত লাল হয়ে শু'য়ে আছে।" এই গল্প গুলিতে গল্প বলার কিছুমাত্র চেষ্টা কবি করেন নাই। গীতি-কবিতার মত কবি-চিত্তের এক দুর্দ্দমনীয় আবেগ এক অপূর্ব্ব ভাষায় এই গল্পগুলিতে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাই এইসব গল্পের প্রধান আকর্ষণ গল্পগুলির ভাষা ও বর্ণনা চাতুর্য্য।

'অতৃপ্ত কামনা' নামক গল্পে অতীতের সুখস্মৃতি কবি একটি মাত্র বাক্যে কী মনোরম ভাবেই না প্রকাশ করিয়াছেন—"সেই দিল-মাতানো স্মৃতিটি মাঝি-হারা ডিঙির মত আমার হিয়ার যমুনায় বারে বারে ভেসে উঠছে।"

পূর্বেও একবার বলা হইয়াছে, বাংলা সাহিত্যে নজরুলের আবির্ভাব যেন অনেকটা ধূমকেতুর মত---তাঁহার নিজের জীবনও ছিল অনেকটা ধূমকেতুর অনুরূপ। তিনি নিজে যে অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করিয়াছিলেন তাহার নাম ছিল 'ধূমকেতু' এবং লিখিয়াছেন তিনি ধূমকেতু সম্বন্ধে এক দীর্ঘ কবিতা। 'ধূমকেতু' কবিতার সঙ্গে তাঁহার 'বিদ্রোহী' কবিতার রহিয়াছে ভাষাগত ও মর্ম্মগত সাদৃশ্য।---

"আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু
এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু!"

'বিদ্রোহ' 'বিপ্লব' 'ধূমকেতু' ইত্যাদি শব্দের প্রতি নরুজলের রহিয়াছে এক বিশেষ পক্ষপাত এবং তাঁহার চিন্তা ও মনোজগতের সঙ্গে এই সব শব্দের রহিয়াছে নিবিড় সংযোগ। তাঁহার 'ব্যথার দান' গল্প গ্রন্থের শেষ গল্প হইতেছে 'রাজবন্দীর চিঠি' এবং এই চিঠির শেষে সই করা হইয়াছে যে নাম তাহা হইতেছে ---'শ্রীধূমকেতু।" এইসব সুস্পষ্ট নিদর্শন ও সঙ্কেত হইতে তাঁহার কবি-মানসের প্রবণতা সম্বন্ধে সহজেই আঁচ করা যায়। এই জন্যই বোধ করি জীবনে তিনি কোনদিন সুস্থির হইতে পারেন নাই ধূমকেতুর মত অস্থির চিত্তে 'বিপ্লব' আর 'বিদ্রোহের' বাণী প্রচার করিয়া ফিরিয়াছেন তাঁহার কবি-জীবনের এক সুদীর্ঘ যুগব্যাপী। এবং এ একই কারণেই হয়ত দেখা গিয়াছে বাংলার সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি তাঁহার এক বিশেষ পক্ষপাত ও সহানুভূতি। সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি শুধু যে কাব্যে ও গানে তিনি উল্লসিত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন তাহা নহে, তাঁহার পরবর্তী রচনা 'কুহেলিকা' নামক উপন্যাসেও সন্ত্রাসবাদ ফেলিয়াছে ছায়া ও দখল করিয়া আছে ঐ গ্রন্থের এক বড় অংশ।

'রিক্তের বেদন' গল্পটিতে কবি হয়ত নিজেরই যুদ্ধ-যাত্রার আনন্দ-স্মৃতি এক সুগভীর আবেগ ও পুলক মিশ্রিত ভাষায় আঁকিয়া রাখিয়াছেন:

"আঃ! একি অভাবনীয় নতুন দৃশ্য দেখলাম আজ? জননী জন্মভূমির মঙ্গলের জন্যে সে-কোন অদেখা-দেশের আগুনে প্রাণ আহুতি দিতে একি অগাধ-অসীম উৎসাহ নিয়ে ছুটেছে তরুণ বাঙালীরা---

আমার ভাইরা! খাকি পোষাকের ম্লান আবরণে এ কোন্ আগুনভরা প্রাণ চাপা রয়েছে।---তাদের গলায় হাজার ফুলের মালা দোল্ খাচ্ছে, ওগুলো আমাদের মায়ের-দেওয়া ভাবী-বিজয়ের আশিস্‌মাল্য, বোনের দেওয়া স্নেহ-বিজড়িত অশ্রুর গৌরবোজ্জ্বল-কমহার!" এই গল্পে তাঁহার এই বাক্যটিও চমৎকার অর্থ-দ্যোতক---"রণজিৎ অনেকেই হতে পারে, কিন্তু মনজিৎ ক'জন হয়?"

অনেকেই বলিয়াছেন, 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী'-ই নাকি নজরুলের রচিত সর্ব্বপ্রথম গল্প! এই গল্পের গোড়ায় বন্ধনীর মধ্যে লেখা আছে---(বাঙালী পল্টনের একটি বয়াটে যুবক আমার কাছে তাহার কাহিনী বলিয়াছিল নেশার ঝোঁকে, নীচে তাহাই লেখা হইল। সে বোগদাদ গিয়া মারা পড়ে। এ ভাষা ও বর্ণনাসর্বস্ব গল্পগুলির সৌন্দর্য্য উপলব্ধির জন্য দীর্ঘ উদ্ধৃতির প্রয়োজন। এখানে এ গল্পের প্রথম অনুচ্ছেদটি মাত্র উদ্ধৃত হইলঃ

"কি ভায়া! নিতান্তই ছাড়বে না? একদম এঁটেল মাটির মত লেগে থাকবে? আরে, ছোঃ! তুমি যে দেখ্‌ছি চিটে গুড়ের চেয়েও চামচিটেল! তুমি যদিও হচ্ছ আমার এক গ্লাসের ইয়ার, তবুও সত্যি বলতে কি, আমার সে সব কথাগুলো বলতে কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ হয়। কারণ খোদা আমায় পয়দা করবার সময় মস্ত একটা গলদ করে বসেছিলেন, কেন না চামড়াটা আমার করে দিলেন হাতীর চেয়েও পুরু, আর প্রাণটা করে দিলেন কাদার চেয়েও নরম। আর কাজেই দু'চার জন মজুর লাগিয়ে আমার এই চামড়ায় মুগুর বসালেও আমি গোঁপে তা দিয়ে বল্‌ব, 'কুচপরওয়া নেই,'। কিন্তু আমার এই 'নাজোক্' জানটায় একটু আঁচড় লাগলেই ছোট্ট মেয়ের মত চেঁচিয়ে উঠব! তোমার 'বিরাশী দশ আনা' ওজনের কিলগুলো আমার এই স্থূল চর্ম্মে স্রেফ্ আরাম দেওয়া ভিন্ন আর কোন ফলোৎপাদন করতে পারে না, কিন্তু যখনই পাক্‌ড়ে বস, 'ভাই তোমার সকল কথা খুলে বল্‌তে হবে,' তখন আমার অন্তরাত্মা ধুকধুক করে ওঠে,---পৃথিবী ঘোরার ভৌগোলিক সত্যটা তখন হাড়ে হাড়ে অনুভব করি। চক্ষেও যে সর্ষপ পুষ্প প্রস্ফুটিত হতে পারে বা জোনাকী পোকা জ্বলে উঠ্‌তে পারে

তা আমার মত এই রকম শোচনীয় অবস্থায় পড়লে তুমিও অস্বীকার করবে না।"

'রিক্তের বেদন' বইটির 'রাক্ষুসী' নামক গল্পটি লেখা হইয়াছে বীরভূমের বাগদীদের ভাষায় এবং এই গ্রন্থের শেষ লেখাটি হইতেছে একটি 'কথিকা,' নাম---"দুরন্ত পথিক।" রূপকের সাহায্যে এই কথিকায় যৌবনের-কবি চির যৌবনেরই দুর্জয় রূপ ভাষাবন্দী করিয়া রাখিয়াছেন। লাভ-লোকসানের হিসাব-দক্ষ সাবধানী জড়তা যখন বলিয়া উঠিল---"হায় এ-দুর্গম পথে তরুণ পথিকের মৃত্যু যে অনিবার্য্য।" তখন যৌবন---"অমনি লক্ষ কণ্ঠের আর্ত্ত ঝঙ্কারের গর্জ্জন করিয়া উঠিল, চোপরাও ভীরু! এই তো মানবাত্মার সত্য শাশ্বত পথ। পথিক দু'চোখ পুরিয়া এই কল্যাণ-দৃষ্টির শক্তি হরণ করিয়া লইল। তাহার সুপ্ত যত কিছু অন্তরের সত্য, এক অঙ্গুলী পরশে সাধা বীণার ঝঙ্কারের মত সাগ্রহে সাড়া দিয়া উঠিল, ---'আগে চল'। বনের সবুজ তাহার অবুঝ তারুণ্য দিয়া পথিকের প্রাণ ভরিয়া দিয়া বলিল---"এই তোমায় যৌবনের রাজটিকা পরিয়ে দিলাম, তুমি চির-যৌবন চির-অমর হলে।"

এই গ্রন্থেরও বহু জায়গায় বহু চমৎকার কথা ও বাক্য ইতস্ততঃ ছড়াইয়া রহিয়াছে। "মনের তার ঠিক না থাকলে বীণার তারও ঠিক থাকে না। মন যদি তার বেসুরা বাজে, তবে যন্ত্রেও বেসুরা বাজবে, এ হচ্ছে খুব সাচচা আর সহজ কথা।" (৬২ পৃষ্ঠা)। অন্যত্র "মধু খুব মিষ্ট, কিন্তু বেশী খাওয়ালেই গা জ্বালা করে" (১৪১ পৃষ্ঠা) ইত্যাদি।

নজরুলের তৃতীয় গল্প-গ্রন্থ 'শিউলি মালা' নিঃসন্দেহে গল্প হিসাবে অপেক্ষাকৃত উচচাঙ্গের সৃষ্টি। এই গ্রন্থে তাঁহার চারটি গল্প স্থান পাইয়াছে---পদ্মগোখ্‌রো, জিনের বাদশাহ, অগ্নি-গিরি ও শিউলি মালা। নজরুল যখন এইসব গল্প লিখিতেছেন তখন বাংলা সাহিত্যে ব্যাপকভাবে সমাজ সচেতন দৃষ্টি-ভঙ্গি লইয়া মনস্তত্ত্ব-মূলক গল্প উপন্যাস লেখার রেওয়াজ প্রায় সু-প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু নজরুলকে বেশী করিয়া আকর্ষণ করিয়াছে ঘটনার অভিনবত্ব ও চরিত্রের বৈচিত্র্য। 'ব্যথার দান' ও 'রিক্তের বেদনের' অত্যধিক আবেগ, মান অভিমান ও বিরহ কাতরতা এই গল্প চতুষ্টয়ে বিশেষ স্থান পায় নাই। ভাষাও হইয়া উঠিয়াছে

অনেকটা সংযত, গদ্যের উপযোগী ও গল্প-ধর্ম্মী। মনে হয় ইহার পরও যদি কবি গল্প লেখার অভ্যাস অব্যাহত রাখতেন অথবা না হইতেন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত তাহা হইলে নিঃসন্দেহে তাঁহার দ্বারা উচচাঙ্গের নিখুঁত গল্প সৃষ্টিও সম্ভব হইত। এই সম্ভাব্যতার প্রচুর নিদর্শন ও আভাস শিউলি-মালার গল্পগুলিতে আছে।

'পদ্ম-গোখ্‌রা' গল্পের ঘটনা ও পাত্রপাত্রী দুই-ই অসাধারণ। দুই বাস্তুসর্পের সহিত সেই বাড়ীর এক সন্তানহারা তরুণী মাতার বুক-ভরা দরদ ও মৃত্যুভয় ডিঙ্গাইয়া যে অস্বাভাবিক সহানুভূতি ও বোঝাপড়ার সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহারই নিখুঁত ছবি অতি সুকৌশলে কবি এই গল্পে আঁকিয়াছেন। সেই ছবি একাধারে ভয়াবহ ও কৌতূহলোদ্দীপক। ঐ গল্প হইতে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতাংশটুকু পাঠ করিলেই গল্পটির বিষয়-বস্তু বোধগম্য হইবে। "জোহরার (গল্পের নায়িকা) বিবাহের এক বৎসরের মধ্যে তাহার দুইটি যমজ সন্তান হইয়াই আঁতুড়ে মারা যায়। জোহরার স্মৃতিপটে সেই শিশুদের ছবি জাগিয়া উঠে। তাহার ক্ষুধাতুর মাতৃচিত্ত মনে করে, তাহার সেই দুরন্ত শিশু-যুগলই যেন অন্য রূপ ধরিয়া তাহাকে ছলনা করিতে আসিয়াছে। তাহাদের মৃত্যুতে যে-দংশন-জ্বালা সহ্য করিয়া সে আজও বাঁচিয়া আছে, ইহারা যদি দংশনই করে তবুও তাহার অপেক্ষা ইহাদের দংশন-জ্বালা বুঝি তীব্র নয়। স্নেহ-বুভুক্ষু তরুণী মাতার সমস্ত হৃদয় মন করুণায় স্নেহে আপ্লুত হইয়া উঠে। ভয় ডর কোথায় চলিয়া যায়, আবিষ্টের মত সে ঐ শিশুদের লইয়া আদর করে। ঘুম পাড়ায়, সস্নেহ তিরস্কার করে।" গল্পটির সমাপ্তি ঘটিয়াছে এই ভাবেঃ

'মরণোন্মুখ জোহরা স্বামী আরিফকে জিজ্ঞাসা করিল---"আমার পদ্ম-গোখ্‌রো---আমার খোকারা কোথায় বল?" আরিফ বলিল---'তোমার বাবা তাদের মেরে ফেলেছেন!" জোহরা---"এ্যাঁ খোকারা নাই?" বলিয়াই অজ্ঞান হইয়া পড়িল। ভোর হইতে না হইতে গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল, মীর সাহেবদের সোনার বৌ জোড়া মরা সর্প প্রসব করিয়া মারা গিয়াছে।" দ্বিতীয় গল্প 'জিনের বাদশাহ'---এই গল্পেরও কাঠামো এবং গল্পাংশ বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। গল্পের নায়কের নাম 'আল্লারাখা'।

লেখক বলিয়াছেন—"গ্রামে কিন্তু এর নাম কেশরঞ্জন বাবু। এ নাম এর প্রথম দেয় ঐ গ্রামের একটি মেয়ে। নাম তার চান ভানু অর্থাৎ চাঁদ ভানু।" এই চান ভানুর বাপের নাম হইতেছে নারদ আলী শেখ। নজরুলের গল্প ও উপন্যাসের পাত্র পাত্রীদের নামের প্রতি লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে অদ্ভুত ও কিম্ভূত-কিমাকার নামের প্রতি কবির মোহ যেন মজ্জাগত, বুঁচি, ভূনী, কুম্ভীর মিঞা, প্যাঁকালে, হিড়িম্বা, গজাল, ইত্যাদি সবই কবির রচিত গল্পের পাত্রপাত্রীদের নাম। চাঁন বানুদের ঘরে আল্লারাখার আবির্ভাবের একটি দিনের দৃশ্য কবি এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন : "চানবানু তখন দাওয়ায় বসে একরাশ পাকা কয়্‌মচা নিয়ে বেশ করে নুন আর কাঁচালঙ্কা ডলে পরিপূর্ণ তৃপ্তির সাথে টাকরায় টোকার দিতে দিতে তার সদ্ব্যবহার করছিল। সে তার টানা চোখ দুটো বার দুয়েক পাকিয়ে আল্লারাখার তিন তেরিকাটা চুলের দিকে কটাক্ষ করে বলে উঠল, "কেশরঞ্জন বাবু আইছেন গো, খাড়ুলিডা লইয়া আইও। বলেই সুর করে বলে উঠল—

এস কুড়ুম বইয়ো খাটে
পা ধোও গ্যা নদীর ঘাটে,
পিঠ ভাঙ্‌বাম্‌ চেলা কাঠে।

বলেই হি হি করে হেসে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল।"

আল্লারাখা 'জিনের বাদশা'র ছদ্মবেশধারণ করিয়া কিভাবে চাঁনভানু ও নারদ আলীকে ভয় দেখাইয়াছিল তাহারও চমৎকার বর্ণনা এই গল্পটিকে দিয়াছে এক অপূর্ব্ব কৌতুকময় রূপ।

তৃতীয় গল্প 'অগ্নিগিরিতে' কবি আঁকিয়াছেন এক বিষাদময় চিত্র। একটি লাজুক ও 'যাকে বলে সাত চড়ে রা বেরোয়না' তেমন ছেলের ছবি তিনি আঁকিয়াছেন। কবি নিজে তাঁহার এই চরিত্রটির পরিচয় দিয়াছেন এই ভাবে "ছেলেটি নামেও সবুর, কাজেও সবুর শান্তশিষ্ট গোবেচারা মানুষটি। ছেলেটি অতি মাত্রায় বিনয়াবনত। তার হাব-ভাব যেন সর্বদাই বল্‌ছে—আই হ্যাভ্‌ দি অনার টু বি স্যার ইওর মোষ্ট্‌ ওবিডিয়েণ্ট্‌ সারভেণ্ট্‌।" পাড়ার দুষ্ট ও শয়তান ছেলেগুলি দলবদ্ধ হইয়া এই নিরীহ সবুর ছোকরাটিকে রোজ খেপায়। শুধু তাহা

নহে, ওকে তাহারা 'প্যাঁচা মিঞা' বলে। আর তাহাকে উদ্দেশ করিয়া কাটে নানা রকম ছড়া। তার একটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল:

"প্যাঁচা, একবার খ্যাচ্ খ্যাচাও।
গর্ত্ত থাইক্যা ফুচ্‌কি দাও।
মুচ্‌কি হাইস্যা কও কথা,
প্যাঁচারে মোর খাও মাথা!"

তবুও সবুর শয়তানদের এই সব দৌরাত্ম্যও নীরবে সহ্য করিয়া যায়। যে বাড়ীতে থাকিয়া সবুর লেখা পড়া করে সেই বাড়ীর কর্ত্তার নাম হইতেছে আলী নসীব। কবি তাঁহার পরিচয় দিয়াছেন এইভাবে: "আলী নসীব মিঞার সকল দিক দিয়েই আলী নসীব। বাড়ী গাড়ী ও দাড়ীর সমান প্রাচুর্য্য!---তাঁকে একমাত্র দুঃখ দিয়াছে---নিমকহারাম দাঁত ও চুল। প্রথমটা গেছে পড়ে, দ্বিতীয়টির কতক গেছে উঠে, আর কতক গেছে পেকে। এই বয়সে এই দুর্ভোগের জন্য তাঁর আফসোসের অন্ত নেই। মাথার চুলগুলোর অধঃপতন রক্ষা করবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেননি; কিন্তু কিছুতেই যখন রুকতে পারলেন না, তখন এই বলে সান্ত্বনা লাভ করলেন যে, সম্রাট সপ্তম এড্‌ওয়ার্ডেরও টাক্ ছিল!" এই আলী নসীব মিঞার কন্যা নূরজাহান। সবুরের অহেতুক লাঞ্ছনা দেখিয়া সহানুভূতিতে তাহার সুকোমল হৃদয় হইল ব্যথিত। একদিন সে সবুরকে তীব্র কণ্ঠে ভর্ৎসনা করিয়া বলিল---"আপনি বেডা না? আপনারে লইয়া ইবলিশা পোলাপান যা তা কইব আর আপনি হুইন্যা ল্যাজ গুটাইয়া চইল্যা আইবেন? আল্লায় আপনারে হাত মুখ দিছে না?" সম্ভবত ইহারই ফলে সবুরের ধৈর্য্যের বাঁধ সত্য সত্যই একদিন ভাঙ্গিয়া পড়িল। প্রতিরোধ করিতে যাইয়া ঘটিয়া গেল রক্তারক্তি কাণ্ড। দুষ্ট ছেলেদেরই একজন অত্যন্ত আকস্মিকভাবে নিজেরই হাতের ছুরি বিদ্ধ হইয়া গেল মারা। বিচারে কিন্তু শাস্তি হইল সবুরের। গল্পের শেষে দেখা যাইতেছে সবুর চলিয়াছে সাত বছরের জন্যে জেলে আর বিষাদ ভারাক্রান্ত অন্তরে আলী নসীব মিঞারা পিতাপুত্রীতে চলিয়াছে মক্কায়!

এই গল্পের প্রধান তিনটি চরিত্র---সবুর, আলী নসীব মিঞা ও নুরজাহান বেশ সজীব ও জীবন্ত হইয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শেষ গল্প 'শিউলি মালার' শেষ ও বিষাদময় বিচ্ছেদ। এই গল্পে পরিচয় পাওয়া যায় কবির দাবাখেলার প্রীতির ও জানা যায় দাবাখেলা সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান কত গভীর ও কত সূক্ষ্ম! কিন্তু চরিত্রগুলি খুব জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠে নাই, গল্পের গাঁথুনীও কিছুটা শিথিল। দাবাখেলা ও গান দুই-ই নজরুলের অত্যন্ত প্রিয়—এই দুইয়ের আনন্দোজ্জ্বল আবহাওয়ায় এই গল্পটি লেখা হইয়াছে কিন্তু সারা গল্পব্যাপী ফল্গুধারার মত বহিয়া চলিয়াছে একটি বিষাদের সুর।

গল্পের মত নজরুলের উপন্যাসগুলিরও প্রধান আকর্ষণ কবিত্বময় ভাষা, বর্ণনা চাতুর্য্য ও বচন ভঙ্গিমার অপূর্ব্বতা। তাঁহার 'বাঁধনহারা' নামক পত্রোপন্যাসখানি, 'ব্যথার দান' ও 'রিক্তের বেদনেরই' সমসাময়িক রচনা---আবহাওয়াও প্রায় একই রকম। গল্পাংশ অতি তুচ্ছ, নাই বলিলেও চলে। কিন্তু তরুণ বয়সের আবেগ-উদ্বেলিত চিত্তের মান অভিমান ও বিরহ-ব্যথা ঐ রচনাকেও করিয়া তুলিয়াছে তরুণ পাঠকদের বিশেষ আকর্ষণের বস্তু।

কবির দীর্ঘতর গদ্য রচনাগুলির মধ্যে 'বাঁধনহারা-'ই প্রকাশিত হইয়াছে সর্ব্বাগ্রে, অবশ্য সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায়। এই গ্রন্থটিতে তরুণ চিত্তের হাসি খুশী ও ব্যথা বিরহের প্রকাশ ঘটিয়াছে তাহা নহে, তখনকার সামাজিক ও পারিবারিক চিত্রও কিছু কিছু ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেকালের শরীফ ঘরে মেয়েদের লেখাপড়াকে কী রকম সন্দেহের চক্ষে দেখা হইত তাহারও এক পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে নিম্নলিখিত পত্রাংশে —যাহা এই গ্রন্থের এক পাত্রী লেখিয়াছেন অন্য এক পাত্রীকেঃ

"......সময় কাট্‌বে বলে ভাবিজীর কাছ্ হ'তে দু'চারটে বই আর মাসিক পত্র সঙ্গে এনেছি, এই না দেখে এরা ত আর বাঁচে না! গালে হাত দিয়ে কত রকমেরই না অঙ্গভঙ্গী করে জানায় যে, রোজ্-কেয়ামত্ এইবারে একদম নিকটে! একটু পড়তে বসলেই চারদিক থেকে ছেলে-মেয়ে বুড়ীরা সব উঁকি মেরে দেখ্‌বে আর ফিস্ ফিস্ করে কত কি যে বল্‌বে তার ইয়ত্তা নেই। আমি নাকি আমার বিদ্যে জাহির করতে তাদের দেখিয়ে দেখিয়ে বই পড়ি, তাই তারা রটনা করছে যে, আমি দু'দিন বাদে মাথায় পাগড়ী বেঁধে কাছা মেরে জজ ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে

য়্যা চেয়ারে বসবো গিয়ে। আমি ত এদের বলবার ধরন দেখে আর হেসে বাঁচিনে। মেয়েদের চিঠি লেখা শুনলে ত এরা যেন আকাশ থেকে পড়ে! মাত্র নাকি এই কলিকাল, এঁরা বেঁচে থাকলে কালে আরও কত কি তাজ্জব ব্যাপার চাক্ষুষ দেখ্‌বেন! তবে এঁরা যে বেশীদিন বাঁচবেন না, এই একটা মস্ত সান্ত্বনার কথা!"

এই গ্রন্থের কোন কোন চিঠিতে পারিবারিক চিত্রও ফুটিয়া উঠিয়াছে অত্যন্ত চমৎকার ভাবে। নিম্নলিখিত পত্রাংশে একটি ছোট্ট মেয়ের চিত্র, পাঠকের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠে ছবির মত এক অপূর্ব মনোহারিত্ব লইয়া :

"......এই মেয়েটা কী পাকা বুড়ী বুন, তোর চিঠিটা না হাতে করে সে মুখকে মালসার মত গম্ভীর করে আধঘণ্টাখানিক ধরে যা-তা বক্‌তে লাগলো আর পেন্সিলটা যেখানে সেখানে বুলিয়ে প্রমাণ করতে লাগলো যে, সেও লেখা জানে! আমার ত আর হাসি থামে না। হাসলে আবার তিনি অপমান মনে করেন কি না। কারণ, তাঁর আত্মসম্মানবোধ এই বয়সেই ভয়ানক রকম চাগিয়ে উঠেছে, তাই তাঁর কাণ্ড দেখে হাসলে তিনি একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেন। ঠোঁট ফুলিয়ে, কেঁদে কেটে খাম্‌চিয়ে কাম্‌ড়িয়ে একেবারে তস্‌নস্‌ করে ফেলবেন! এই চিঠি লেখবার সময়ও ঠিক ঐ রকম যোগাড় হয়েছিল, হয়ত আজকে আর এটা লেখাই হতনা,---ভাগ্যিস সেই সময় আমাদের সেই বেঁড়ে বিড়ালীটা নাদুস নুদুস বাচচা চারটে নিয়ে সপরিবারে আমার কামরায় দুর্গতিনাশিনীর মত এসে হাজির হ'ল তাই রক্ষে। নৈলে হয়েছিল আর কি! বেড়াল-ছানাগুলো দেখে খুকী একেবারে আত্মহারা হয়ে সব ছেড়ে তাদের পেছন পেছন দে ছুট্‌। শ্রীমতী বিড়াল-গিন্নী সে সময়ের মত সে স্থান থেকে অন্তর্দ্ধান হওয়াই সমীচীন বোধ করলেন। খুকী বাচচাগুলোর কানে ধরে ধরে বুঝাতে চেষ্টা করে যে সে ঐ বাচচা চতুষ্টয়ের মাসীমা বা খালাজি।"

এই গ্রন্থের নায়ক নূরুল হুদার চরিত্র মনে হয় যেন তরুণ কবির নিজের প্রতিচ্ছবি। কবির মত সেও গিয়াছিল যুদ্ধে এবং তাহারও

লেখনীমুখে অর্থাৎ চিঠিগুলিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে 'বিদ্রোহ'। মান অভিমান ও ব্যথা বেদনার যত চিত্রই এই রচনায় থাকুক না কেন, কিন্তু এই রচনার সর্ব্বত্র ফুটিয়া আছে কবির নবীন তারুণ্যের এক টগবগায়মান রূপ যাহাতে মনের প্রসন্নতা ও হাস্যরসেরও ঘটিয়াছে মণি-কাঞ্চন সংযোগ।

'কুহেলিকায়' প্রেম ও ভালবাসার অভাব নাই সত্য কিন্তু পটভূমি ও আবহাওয়া হইতেছে স্বদেশপ্রেমমূলক সন্ত্রাসবাদের। গ্রন্থের নায়কের পৈত্রিক নাম বখ্‌তে জাহাঙ্গীর কিন্তু ডাকনাম উল্‌ঝলুল্‌। অন্য একটি চরিত্রের নামকরণ হইয়াছে---কুম্ভীরমিঞা। এইসব নাম কবির অভিনবত্ব-প্রীতির-ই নিদর্শন--কবি চরিত্রগুলিও ফুটাইয়া তুলিয়াছেন কিছুটা অভিনব করিয়া। বহু বিপ্লবী নরনারীর উল্লেখ এই গ্রন্থে করা হইয়াছে কিন্তু কাহারো চরিত্র বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিবার সুযোগ পায় নাই। মনে হয়, স্বদেশপ্রেমের তীব্র আবেগের কাছে চরিত্র-অঙ্কন পড়িয়াছে চাপা। স্বদেশ ও স্বদেশের মানুষের প্রতি যে অকৃত্রিম দরদ নজরুলের কাব্য-রচনার ছত্রে ছত্রে আমরা দেখিয়াছি, তাহা এই উপন্যাসেও বহিয়া চলিয়াছে এক দুর্দ্দমনীয় বেগে। এই গ্রন্থের এক পাত্র জাঁহাঙ্গীর অন্য পাত্র হারুণকে বলিতেছে----"এই ধূলো আর ধূচ্ছিনে পথে। বাঙলার পথের ধূলো, আমার জন্মভূমির বেদনাতুর পথিকের পায়ের ধূলো---ও শুধু বুক পর্যন্ত কেন, মাথা পর্যন্ত উঠলে আমি ধন্য হয়ে যেতাম। পবিত্র ধূলি কি অত তাড়াতাড়ি মুছ্‌তে আছে ভাই?......আজ এই মাঠের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে, এর চেয়ে ভাল কবিতা তোমাদের কোন কবিই লিখে যেতে পারেননি। এই মাঠের আলের ছন্দোবদ্ধ লাইনের বন্ধনে কখনো সবুজ কখনো সোনার রঙে যে কবিতা লেখা হয়, তার কি তুলনা আছে! ঐ কৃষকের লাঙ্গলের চেয়ে তোমাদের কালি-ভরা লেখনী কি বেশী ফুলের ফসল ফলাতে পারে? ঐ মাঠের খাতায় নিরক্ষর কবির সৃষ্টির কাছে তোমাদের জগতের সবচেয়ে বড় কবি কি তাঁর পুঁথির বোঝা নিয়ে দাঁড়াতে পারেন?...সত্যি ভাই, এরাই সত্যিকার ফুলের কবি, আমরা কথার কবি। আমরা যখন ঘরের আঁধার কোণে বসে মাকড়সার মত কথার ঊর্ণা বুনি, এরা তখন সারা দেশকে ফুলের ফসলে সুন্দর রঙ্গিন করে তোলে। এদের শ্রমেরই ত ধরণীর এত ঐশ্বর্য্যসম্ভার,

এত রূপ, এই যৌবন! ......এরা যেন উদাসীন আত্মভোলার দল, সকলের জন্য সুখ সৃষ্টি করে নিজে ভাসে দুঃখের অথই পাথারে। এরা শুধু কবি নয় হারুণ্, এরা মানুষ! সর্ব্বত্যাগী তপস্বী দরবেশ; এরা নমস্য;"

যে বিপ্লব দলের উল্লেখ এই বইতে করা হইয়াছে তাহার নেতা হইতেছে প্রমত্ত। প্রতিদ্বন্দ্বী আর এক বিপ্লব দলের অধিনায়ক নাকি একবার বলিয়াছিল---"আমরা ডান হাত দিয়ে তাড়াব ফিরিঙ্গী এবং বাম হাত দিয়ে খেদাব নেড়ে! সন্ধি করব লণ্ডন আর মক্কা অধিকার করে।"

এই অসম্ভব কল্পনা বিলাসের কথা শুনিয়া প্রমত্ত সেই অধিনায়ককে লক্ষ্য করিয়া উত্তর দিয়াছে এই ভাবে।---"তিনি বলতে গেলে হয়ে আসবেন টঁ্যাস্স্, খেয়ে আস্‌বেন হ্যাম্, নিয়ে আসবেন মেম! আর মক্কা গেলে হয়ে আসবেন হাজী, খেয়ে আসবেন গোস্‌ত এবং নিয়ে আসবেন দাড়ি। সন্ধিপত্র আর আনতে হবে না।"

প্রমত্তের ভারতবর্ষ কবির লেখনীতে এইভাবে হইয়াছে চিত্রিত---"আমার ভারত এ মানচিত্রের ভারতবর্ষ নয় রে আনিস, আমি তোদের চেয়ে কম ভাবপ্রবণ নই, তবু আমি শুধু ভারতের জলবায়ু মাটি পর্বত অরণ্যকেই ভালোবাসি নাই। আমার ভারতবর্ষ---ভারতের এই মূক দরিদ্র নিরন্ন পরপদদলিত তেত্রিশ কোটি মানুষের ভারতবর্ষ। আমার ভারত ইণ্ডিয়া নয়, হিন্দুস্থান নয়, গাছ্‌পালার ভারতবর্ষ নয়---আমার ভারতবর্ষ মানুষের যুগে যুগে পীড়িত-মানবাত্মার ক্রন্দন-তীর্থ।" প্রমত্তের এই ভারতবর্ষ যে কবিরও ভারতবর্ষ এবং প্রমত্তের প্রতি-ই যে কবির সহানুভূতি এ কথা বোধ করি না বলিলেও চলে।

'মৃত্যুক্ষুধা' নজরুলের শেষ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। জীবনের ছবি এবং চরিত্র দুই-ই এই গ্রন্থে অধিকতর সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। এক কালে কিছুদিনের জন্য কবি কৃষ্ণনগরে বাস করিয়াছিলেন। 'মৃত্যুক্ষুধা' কৃষ্ণনগরকে পটভূমি করিয়াই রচিত হইয়াছে। দরিদ্র মুসলিম রাজমিস্ত্রিদের দুঃখের জীবন, খ্রীষ্টান মিশনারীদের পাল্লায় পড়িয়া

কাহারও কাহারও ধর্মান্তর গ্রহণ, তাহার ফলে বহু পারিবারিক জীবনে যে-দু ঃখ বিচ্ছেদ দেখা দিয়াছে তাহার করুণ চিত্র এই গ্রন্থে বহু জায়গায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

গ্রন্থটির সূচনা হইয়াছে এইভাবে—"পুতুল খেলার কৃষ্ণনগর। যেন কোন খেয়ালী শিশুর খেলা শেষের ভাঙ্গা খেলাঘর।" কলতলায় পাড়ার মেয়েরা জল লইতে আসিয়া যে-সব কুৎসিত ঝগড়া করে তাহার একদিনের এক নিখুঁত ছবি কবি এই বইতে ধরিয়া রাখিয়াছেন। সেই দৃশ্য শুধু কৌতুকাবহ নহে, অত্যন্ত করুণও বটে। কবি অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গেই এই চির দুঃখী নর-নারীদের জীবন আঁকিয়াছেন। ইহাদের এই চিত্র সত্যই মর্ম্মান্তিক। কবির নিজের ভাষায় বলা যায়— "এরা যেন মৃত্যুর মাল-গুদাম। অর্ডারের সাথে সাথে যেন সাপ্লাই! মাথার ওপরে তেড়ীর মত এদের মাঝে দু'চার জন 'ভদ্দরনুক'-ও আছেন। কিন্তু এতে তাদের সৌষ্ঠব বাড়লেও গৌরব বাড়েনি। এটেই যেন ওদের দুঃখকে বেশী উপহাস করে।"

এই গ্রন্থের নায়ক আনসার মনে হয় কবির নিজের বন্ধন-মুক্ত জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। সে-ও স্বদেশ প্রেমিক এবং সন্ত্রাসবাদী দলেরই অন্তর্ভুক্ত। আনসারের কামনা—"সে মানুষের জন্যে সর্ব্বত্যাগী হবে, সকল দুঃখ মাথা পেতে সহ্য করবে, তারা দুঃখী, তারা পীড়িত বলে নয়, তারা সুন্দর বলে।" সৌন্দর্য্যের প্রতি এই আবেগ প্রবণ পক্ষপাতিত্ব নজরুলের সব কথা ও নাট্য গ্রন্থেরই বৈশিষ্ট্য। আনসারের চা-প্রীতি কবির নিজের চা-ভক্তির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। চায়ের প্রস্তাব শুনিয়া আনসার বলিয়া উঠিল—"আঃ! কি নাম শুনালিরে বুঁচি! চা! চা! আঃ! আগে চা নিয়ে আয় ত, তারপর সব হবে! বলেই গুণ গুণ করে গাইতে লাগল:

কাপ্-কেট্‌লি বাসিনী সিদ্ধিবিধায়িনী
মানস-তামস-হারিণী হে!
দুগ্ধ ও শর্করা-মিশ্র শ্বেতাম্বরা
চীনা-ট্রে বাহিনী জাড্য হরা!"

আনসারের রাজনৈতিক মতপরিবর্ত্তনের মধ্যে হয়ত আমরা খুঁজিয়া পাইব কবির নিজের মত পরিবর্তনেরও ইতিহাস।—

আনসার জিজ্ঞাসা করিল---"বুঁচি, এখনো চরকা কাটিস্?" লতিফা (বলা বাহুল্য লতিফারই ডাকনাম বুঁচি) হেসে বল্লে---'না দাদু, এখন আমার চারটি ছেলে মিলে আমাকেই চর্কা ঘোরা করে। এখন আপনার চরকাতে তেল দেবার ফুরসৎ পাইনে, তা দেশের চরকা ঘুরাব কখন! আনসার হেসে বল্লে---হুঁ এখন তা হ'লে চরকার সুতো ছেড়ে কোলের সূতদের নিয়েই তোর সংসারের তাঁত চালাচ্ছিস। দেখ ও-ল্যাঠা ছেড়ে দিয়ে ভালই করেছিস্ ভাই! আমি এখনি বলছিলাম না যে আমার মত বদলে গেছে? এখন আমার মত শুনলে তুই হয়ত আকাশ থেকে পড়বি। বাঁক বোঝাই করে করে চরকা বয়ে বয়ে যার কাঁধে ঘাঁটা পড়ে গেছে, তোর সেই চরকা-দাদু আনসারের আজকার মত কি শুনবি? সে বলে, সুতোয় কাপড় হয়, দেশ স্বাধীন হয় না।"

এই গ্রন্থে প্যাঁকালে এবং মেজ বৌ-এর চরিত্র দুইটি বেশ জীবন্ত হইয়া ফুটিয়াছে। যাহাদের ছবি ও জীবন এই গ্রন্থে আঁকা হইয়াছে তাহাদের মুখের জবান ও শব্দের নির্ভুল ব্যবহার সত্যিই কবির গভীর পর্য্যবেক্ষণ শক্তি ও বাস্তববোধেরই পরিচায়ক। ইহাদের মুখে ভদ্রলোক হইয়াছে 'ভদ্দরনুক,''রোমান ক্যাথলিক' পরিণত হইয়াছে 'ওমান ক্যাতলি'তে, "প্রোটেষ্টাণ্ট্পাড়া হইয়াছে 'ছিটেন পাড়া' রাম প্রসাদ রূপ নিয়াছে 'আমফেসাদ' ইত্যাদি ইত্যাদি। সম্ভবতঃ এই একটি মাত্র গ্রন্থেই নজরুল ঔপন্যাসিকের সংযম ও বাস্তববোধের কিছুটা সার্থক পরিচয় দিতে সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু প্রচুর কথ্য ও লৌকিক শব্দ ব্যবহার সত্ত্বেও এই গ্রন্থেও তাঁহার ভাষা রহিয়া গিয়াছে কাব্য-ধর্ম্মী।

নজরুলের নাট্য-গ্রন্থ হইতেছে মাত্র দুইটি—'ঝিলিমিলি' ও 'আলেয়া'। 'ঝিলিমিলিতে'---ঝিলিমিলি, সেতুবন্ধ, শিল্পি ও ভূতের ভয়---এই চারটি একাঙ্ক নাটিকা স্থান পাইয়াছে। আলেয়া স্বসম্পূর্ণ, তিনাঙ্ক নাটক। কিন্তু তাঁহার কোন নাটকই ঘটনা বা কার্যকারণ সম্ভুত পরিণতির উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হয় নাই। সব কয়টিই রূপক নাটক এবং সব কয়টি নাটকেই কবির রচিত বহু অনবদ্য সঙ্গীত স্থান পাইয়াছে।

ঘটনা বা চরিত্র চিত্রণ কোন নাটকেরই লক্ষ্য নহে বলিয়াই এই সব নাটকের কোনটিতে গল্পাংশের বা চরিত্রের বিকাশ ঘটে নাই। তবে সব কয়টি রচনাই অত্যন্ত কবিত্ব-মণ্ডিত ভাষায় রচিত বলিয়া দৃশ্য অপেক্ষা পাঠ্য নাটক হিসাবেই এইগুলি অধিকতর জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে এক ''আলেয়া' ছাড়া অন্য কোনটি-ই আদৌ অভিনীত হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। 'আলেয়া' অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে কলিকাতার বিখ্যাত রঙ্গ-মঞ্চ 'নাট্য-নিকেতনে' অভিনীত হইয়াছিল (১ম অভিনয় রজনী—৩রা পৌষ, ১৩৩৮)।

'সেতুবন্ধ' নাটিকাটি রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' নাটকের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। উভয় নাটকেরই প্রতিপাদ্য-বিষয় প্রকৃতির সঙ্গে যন্ত্রশক্তির সংঘর্ষ। 'সেতুবন্ধে' কবি দেখাইয়াছেন প্রকৃতির হাতে যন্ত্র-শক্তির পরাজয়। 'ভূতের ভয়' নাটিকায় কবি রূপকের সাহায্যে দেশাত্মবোধের কথা প্রচার করিয়াছেন এবং তাহার চিরপ্রিয় বিপ্লব-শক্তির করিয়াছেন বন্দনা। কয়েকটি প্রাণ-মাতানো সঙ্গীতের সাহায্যে এই নাটিকায় কবি দেশের নির্য্যাতীত সুপ্ত শক্তিকে জানাইয়াছেন নবজাগরণের আহ্বাণ:

''মোরা মারের চোটে ভূত ভাগাব
মন্ত্র দিয়ে নয়।
মোরা জীবন ভরে মার খেয়েছি
আর প্রাণে না সয়।

০ ০ ০

ওরে মন্ত্র দিয়ে হয় কি কভু
বনের পশু জয়॥
ওরে দৈন্যরে তোর সৈন্য করে
রণের করিস্ ভান,
খরস্রোতের মুখে খড় ভেসে কয়—
'সাগর অভিযান'!

আর একটি সঙ্গীতে দেশের যৌবন-শক্তি বীরত্বপূর্ণ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছে জীবনের জয়:

"বজ্র-আলোকে মৃত্যুর সাথে
হবে নব পরিচয়!
জয় জীবনের জয়।।
শক্তিহীনের বক্ষে জাগাব
শক্তির বিস্ময়।
জয় জীবনের জয়।।"

'আলেয়ার' বিষয়-বস্তু বা প্রতিপাদ্য কবি নিজের ভাষায় যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতেছে এই—"এই ধূলির ধরায় প্রেম ভালবাসা—আলেয়ার আলো। সিক্ত হৃদয়ের জলাভূমিতে এর জন্ম। ভ্রান্ত পথিককে পথ হ'তে পথান্তরে নিয়ে যাওয়াই এর ধর্ম্ম। দুঃখী মানব এরই লেলিহান শিখায় পতঙ্গের মত ঝাঁপিয়া পড়ে। তিনটি পুরুষ, তিনটি নারী—চিরকালের নর-নারীর প্রতীক—এই আগুনে দগ্ধ হল, তাই নিয়ে এই গীতিনাট্য।" কাজেই ইহাও প্রতীক নাটক—ইহাতেও নাই সাধারণ নাটকের মত ঘটনা বা গল্পাংশ। আছে কবিত্বময় ভাষা ও বর্ণনা, আর আছে অনেকগুলি অনবদ্য সঙ্গীত। কবির রচিত গীতিনাট্য, কাজেই সঙ্গীতের অভাব হইবার কোন কারণও নাই। কোমল ও মধুর ভাবের সঙ্গীতের সঙ্গে যুদ্ধযাত্রী সৈন্যদলের উপযোগী বীর রসের সঙ্গীতও এই রচনায় লাভ করিয়াছে স্থান। যেমনঃ

"টলমল টলমল পদ ভরে—
বীর দল চলে সমরে।।
খরধার তরবার কটিতে দোলে,
রণন ঝনন রণ ডঙ্কা বোলে।
ঘন তূর্য্য-রোলে শোক মৃত্যু ভোলে,
দেয় আশিস্ সূর্য সহস্র করে।।
টলমল টলমল পদ ভরে—
বীরদল চলে সমরে।।" ইত্যাদি

এই গ্রন্থের আর একটি চমৎকার গানে হাসির খোরাকও আছে যথেষ্ট :

"তাহারে দেখ্‌লে হাসি, সে যে আমার দেখন-হাসি,
(ওগো আমি কচি, সে যে ঝুনো, আমি উনিশ
সে-উন-আশি।।
সে যে চিল আমি ফিঙে, আমি বঁটি সে যে ঝিঙে।
আমি খুশী সে যে খাসি, সে যে বাঁশ আমি বাঁশী।
ও সে যত রাগে, অনুরাগে পরাই গলে তত ফাঁসি।।"

সঙ্গীত যেমন নিজে না শুনিলে তাহার রস ও মাধুর্য্য উপলব্ধি করা যায় না, তেমনি নজরুলের গল্প উপন্যাস ও নাটকের সঙ্গে সত্যকার পরিচয় সাধন করিতে হইলে প্রত্যেক পাঠককেই তাহা নিজে পাঠ করিতে হইবে। কারণ, তাঁহার রচনার সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও বৈশিষ্ট্য নিহিত রহিয়াছে তাঁহার প্রতিটি কথায় ও বাক্যে, বর্ণনা ও বচনভঙ্গিমায়। নিজে পাঠ করা ছাড়া সেই সবের উপলব্ধির দ্বিতীয় কোন পন্থা নাই।

পঞ্চম অধ্যায়

সঙ্গীত

যে-আশা-সম্ভাবনার অরুণালোক নজরুলের জীবন প্রভাতে এক দীপ্তি-উজ্জ্বল গৌরবময় ভবিষ্যতের সূচনা করিয়াছিল, সার্থক ও স্বাভাবিক পরিপূর্ণতার মধ্যে তাহার পরিণতি লাভ সম্ভব হয় নাই। যে অপূর্ব্ব সম্ভাবনাময় প্রতিভার নব উন্মেষ দেখিয়া সকলে বিস্ময় পুলকে তাহার পরিপূর্ণ বিকাশের প্রতীক্ষা করিতেছিল, অপ্রত্যাশিত এক কালব্যাধির আক্রমণে তাহার আর ক্রমবিকাশ বা পূর্ণতা লাভের সুযোগ ঘটে নাই। তাই তাহার প্রতিভার পরিপক্কতার ঐশ্বর্য্য, পূর্ণাঙ্গতার সৌন্দর্য্য ও গভীরতর জীবন-জিজ্ঞাসা হইতে বাংলা সাহিত্য হইয়াছে চির-বঞ্চিত।

কিন্তু এই অভাব ও অপূর্ণতার কিছুটা ক্ষতিপূরণ ঘটিয়াছে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে, গানের রাজ্যে। এখানে নজরুল নিজেকে দিয়াছেন উজাড় করিয়া এবং তাঁহার শক্তি ও প্রতিভা পাইয়াছে এখানে অধিকতর মুক্তি ও বিকাশ। তাই গানের ক্ষেত্রে নজরুল এখনো অপ্রতিদ্বন্দী ও অনতিক্রম্য। নজরুলের রচিত গানের সংখ্যা নাকি প্রায় তিন হাজার, বলাবাহুল্য এত গান স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও রচনা করেন নাই। শুধু তাহা নহে, পৃথিবীতে কোন কবি বা সঙ্গীত রচয়িতাই নাকি একক এতগুলি গান রচনা করিতে সক্ষম হন নাই। নজরুলের সুস্থ ও সক্রিয় কবি জীবন যদি আরো বিলম্বিত ও দীর্ঘ হইত, তাহা হইলে হয়ত চিরকালের জন্যই তিনি পৃথিবীতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অপরাজেয় সঙ্গীত রচয়িতার আসন দখল করিয়া থাকিতে পারিতেন এবং তাহা হইলে বাংলা ভাষার ভাগ্যে ঘটিত এক মহান গৌরবের অধিকার।

যৌবনের সীমা অতিক্রম না করিতেই নজরুল হইয়াছেন কালব্যাধির শিকার। ফলে, সাহিত্যে হইয়াছেন তিনি অক্ষয় যৌবনের

অধিকারী। যৌবনের কবি'-র সমগ্র সাহিত্য-কীর্ত্তি এই ভাবে অবরুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে তাঁর যৌবন-সীমানার মধ্যেই! যৌবনের আশা-আকাঙ্খা ও দুর্দ্দমনীয় আবেগ তাঁহার কবিতা ও গানে বহু বিচিত্র ভাবেই পাইয়াছে রূপ। দেশের পরাধীনতা ও সমাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁহার যে অভিযান তাহা চিরকাল বাংলা সাহিত্যের গর্ব্বের বস্তু হইয়াই থাকিবে। কিন্তু এত সব 'বিদ্রোহ' 'বিপ্লব' ও যৌবন-শক্তির জয় ঘোষণার অন্তরালে তাঁহার সমস্ত সাহিত্য-স্থষ্টির মূলে সক্রিয়-প্রেরণা যোগাইয়াছে তাঁহার সংবেদনশীল হৃদয়। এই হৃদয়ের প্রকাশ ও ঘোষণা তাঁহার সব রকম রচনারই মূল উপাদান---কি গদ্য কি কাব্য বা গান সর্ব্বত্রই তাঁহার হৃদয়ানভূতিই প্রধান হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। তাই তাঁহার কোন রচনাতেই বুদ্ধিজীবীর মস্তিষ্ক কণ্ডূয়নের কোন পরিচয় নাই। পরিচয় আছে হৃদয়ের, যে হৃদয় আবেগপ্রবণ, সূক্ষ্ম অনুভূতির মালিক ও অতিমাত্রায় সংবেদনশীল। যে-সংবেদনশীল হৃদয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতি হইতেছে সব রকম সঙ্গীতের ভিত্তি, প্রেরণা ও উপকরণ। তাই নজরুল হইতে পারিয়াছেন সার্থক সঙ্গীত-স্রষ্টা। কবিত্ব-শক্তির সঙ্গে যদি সঙ্গীত প্রতিভার ঘটে সমন্বয়, তাহাতে যে অপূর্ব্ব মণিকাঞ্চন সংযোগ ঘটে, বাংলা সাহিত্যে তাহার সার্থক দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলাম। খ্যাতনামা সঙ্গীত-বিশেষজ্ঞ শ্রী নারায়ণ চৌধুরী এই প্রসঙ্গে যে যুক্তি-পূর্ণ সত্য-ভাষণ করিয়াছেন তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল---"বোধ করি, কাজী নজরুলই আধুনিক বাংলার একমাত্র স্রষ্টা যার স্জনক্ষমতা কাব্য ও সঙ্গীত এই উভয় ক্ষেত্রেই সমান লীলায়িত হয়েছে; এবং এ থেকে এই কথাটাই আবার নতুন করে প্রমাণ হয়, কাব্য ও সঙ্গীতের মূল প্রেরণা এক ও দু'টি বস্তু অভিন্ন। বাংলা সাহিত্যে এই মণিকাঞ্চন যোগাযোগের দৃষ্টান্ত খুব বেশী নেই। যাঁরা কাব্য চর্চা করেন তো কাব্য চর্চাই করেন, যাঁরা সঙ্গীত চর্চ্চা করেন তো সঙ্গীত চর্চাই করেন। খুব কম ব্যক্তির মধ্যেই এই উভয় গুণের একত্র সমাবেশ দেখা যায়। আমরা লক্ষ্য করি কবি দ্বিজেন্দ্রলাল, কান্ত-কবি রজনীকান্ত, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে এসে কাজী নজরুল ও দিলীপকুমার ছাড়া আর কারো মধ্যে সঙ্গীত

কাব্যের সফল যোগাযোগ ঘটেনি। আবার এদের ভেতর রবীন্দ্রনাথ ও কাজী নজরুলের মধ্যে এই যোগাযোগ যত স্পষ্ট ও সম্পূর্ণ এমন আর কারো মধ্যে নয়। দ্বিজেন্দ্রলাল মুখ্যত কবি তারপর সুরকার; কান্ত-কবি রজনীকান্ত সম্পর্কেও সেই কথা। উল্টো দিকে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রধানত গায়ক, তারপর সাহিত্যিক। অতুলপ্রসাদের সুরের আবেদন যত মনোরম, বাণীর আবেদন ততো নয়; দিলীপ কুমারের গানে কথা দুর্ব্বল কিন্তু সুর সমৃদ্ধ। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ও কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গীত সম্বন্ধে বলা যায় যে, তাঁদের সুর ও বাণী দুই-ই সমান ঐশ্বর্য্যপূর্ণ এবং তাহাদের গান একটি সুসমঞ্জস ঐক্যের মধ্যে এসে পরিণতি লাভ করেছে। যেমন রবীন্দ্রনাথের গানে তেমনি কাজী সাহেবের গানে, কথার আবেদন বেশী কি সুরের আবেদন বেশী বলার উপায় নেই, দু'টির অঙ্গাঙ্গী সমণ্বয়েই তাঁদের গান গান হয়ে উঠেছে। কাজেই রবীন্দ্র-সঙ্গীত, কিম্বা নজরুল-গীতির বিচার করতে হলে সুরকে খাটো করে বাণীকে প্রাধান্য কিম্বা বাণীকে খাটো করে সুরকে প্রাধান্য দিলে চলবে না ও দু'টি বস্তুর মিলিত অভিন্ন রূপের বিচারই তাঁহার গানের প্রকৃত বিচার।"

নজরুলের জীবন-কথা আলোচনার সময় আমরা দেখিয়াছি, শৈশব হইতে কবি ছিলেন নানা রকম পল্লী সঙ্গীতের সঙ্গে সুপরিচিত। কবিগান, জারী গান, লেটো গান, যাত্রা গান, নানা মারফতী সঙ্গীত ইত্যাদির সঙ্গে তাহার যোগাযোগ ছিল আবাল্যের এবং তাহা ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। পরবর্ত্তী জীবনে এই পরিচয় ও যোগাযোগ তাঁহার সঙ্গীত সাধনায় দিয়াছে রকমারি বৈচিত্র্য এবং তাঁহার রচিত গানের পরিধিকে দিয়াছে ব্যাপ্তি ও বিস্তার।

সঙ্গীত রচনায় নজরুলের অদ্ভূত ক্ষমতা সম্বন্ধে বিখ্যাত গায়ক ও সুর-শিল্পী আবদুল আহাদ লিখিয়াছেন---"বৃষ্টি ধারার মত তিনি (নজরুল) গান লিখে চললেন্ গ্রামোফোন কোম্পানীর ফরমাশ অনুযায়ী। সকাল থেকে রাত্রি অবধি নজরুল ইসলামকে দেখা যেত গ্রামোফোন কোম্পানীর রিহের্সাল রুমে। সামনে পানের ডিবা, কাপের পর কাপ চা আস্ছে। কাজী সাহেব গান লিখছেন আর সুর করছেন। ফরমাশী

গান লিখতে নজরুল ইসলাম এমনি হাত পাকিয়েছিলেন যে, তাঁর ক্ষমতা দেখে অবাক হয়ে যেতে হ'ত। কেউ এসে বল্‌ল, কাজীদা, একটা গজল চাই। কেউ বল্ল যে, প্রেম সঙ্গীত চাই। কেউ বল্ল যে, ইসলামী গান চাই, শ্যামাসঙ্গীত চাই। একই সময়ে বসে তিনি এত ধরণের গান লিখে ফেলতেন আর তাতে সুর করতেন। এখন পর্য্যন্ত কাউকে দেখিনি যে একদিনে এত ধরনের গান লিখতে এবং সুর করতে পারে।"

নজরুল লিখিয়াছেন নানা রকমের সঙ্গীত, গজল, কীর্ত্তন, ভজন, হাসির গান, ভাটিয়ালী, খেয়াল, ঠুংরী, ধ্রুপদ ইত্যাদি অসংখ্য রকমের গানে, নানা সুর ও রাগ-রাগিণীতে তিনি তাহার অন্তর-লোকের করিয়াছেন উদঘাটন, বহু বিচিত্র অনুভূতিকে দিয়াছেন নানা সুরে এক অপূর্ব্ব বাণীমূর্ত্তি—যাহা হয়ত কালের কণ্ঠে চিরকালই মালা হইয়াই বিরাজ করিবে।

যুদ্ধ-ফেরত কবি একদিন জাতীয় সঙ্গীতে দেশকে তুলিয়াছিলেন মাতাইয়া এবং গানের সাহায্যে দেশের সব রকম সুপ্ত-শক্তির করিয়াছিলেন উদ্বোধন। তাঁহার—

"দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাপার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীতে, যাত্রীরা হুশিয়ার।"

এই দেশের জাতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তারপর—

"আমার দেশের মাটি
ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি।।
এই দেশেরই মাটি জলে
এই দেশেরই ফুলে ফলে
তৃষ্ণা মিটাই মিটাই ক্ষুধা
পিয়ে এরি দুধের বাটি।।"

এবং—
"স্বপ্নে দেখেছি ভারত-জননী
তুই যেন রাজ রাজেশ্বরী।

নবীন ভারত! নবীন ভারত!
স্তব-গান 'ওঠে ভুবন ভরি।
শস্যে ফসলে ডেকেছে মা বান,
মাঠ ও খামারে ধরে নাকো ধান,
মুখ-ভরা হাসি, হাসি ভরা প্রাণ,
নদী-ভরা যেন পণ্য তরী।।

অথবা---"গঙ্গা সিন্ধু নর্ম্মদা কাবেরী যমুনা ঐ
বহিয়া চলেছে আগের মতন
কইরে আগের মানুষ কই।।"

এই ধরণের বহু গান কবির দেশপ্রেমের অক্ষয় স্মৃতি হইয়াই চিরকাল বিরাজ করিবে। আর একটি সঙ্গীতে, যে সঙ্গীতের সুরের নাম দিয়াছেন কবি 'পেগ্যান', জাতির জন্য তিনি বিশ্বজাতি সভায় কামনা করিয়াছেন এক মহিমাময় আসন ঃ---

"জগতে আজিকে যারা আগে চলে ভয় হারা
ডেকে যায় আজি তারা, চল্‌রে সুমুখে চল্‌।
পিছু পানে চেয়ে মিছে পড়ে আছি সব নীচে,
চাস্‌নে রে তোরা পিছে অগ্র পথিক দল।।
চলার বেগে উঠবি জেগে রচবে নূতন পথ,
বর্ত্তমানের পানে মোদের চল্‌বে অরুণ রথ,
অতীত আজি পতিত্‌ রে ভাই, রচ্‌ব ভবিষ্যৎ,
স্বর্গ আমরা আন্‌ব, না হয় যাব রসাতল।।

রইবনা পিছে পড়ে
অতীতের কঙ্কাল ধরে,
বইবে নব জীবন স্রোত
যৌবন-চঞ্চল।
বিশ্ব-সভাঙ্গণে সকল জাতির সনে
বসিব সম আসনে গৌরব-উজ্জ্বল।।"

বাংলার সঙ্গীত-সাহিত্যে নজরুল আমদানী করিয়াছেন বহু নতুনত্ব। সৈনিকদের মার্চের সুরে গান রচনারও প্রথম প্রবর্ত্তক নজরুল।

এই সুরের প্রেরণা তিনি ইউরোপীয় সুর হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনি তাহাকে রূপ দিয়াছেন সম্পূর্ণ স্বদেশী ভাব ও আবহাওয়ায়। বাংলা ভাষায় গজল গানের প্রবর্ত্তক ও যে নজরুল তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বিদেশী সুরের আশ্রয়ে রচিত তাঁহার গানের সংখ্যাও নেহাৎ কম নহে। দূর প্রাচ্যদ্বীপের অনুকরণে—'দারু চিনি দেশের মেয়ে', 'দূর দ্বীপবাসীনী' ইত্যাদি বহু গানও তিনি বৈদেশিক সুরে রচনা করিয়াছেন। তুরস্ক দেশ হইতে রেকর্ড আনাইয়া সেই সুরেও তিনি রচনা করিয়াছেন গান। এমন কি আরবী সুরেও তিনি রচনা করিয়াছেন বাংলা সঙ্গীত। সেই রকম একটি সঙ্গীতের কয়েকটি লাইন এখানে উদ্ধৃত হইলঃ

"শুকনো পাতার নূপুর পায়ে
নাচিছে ঘূর্ণিবায়।
জল-তরঙ্গে ঝিল্‌মিল্ ঝিল্‌মিল্
ঢেউ তুলে সে যায়।।'

শুধু কণ্ঠ-সঙ্গীত বা রেকর্ড সঙ্গীতেই তাঁহার সঙ্গীত প্রতিভা নিঃশেষ হয় নাই, বহু সিনেমা চিত্রেরও তিনি রচনা করিয়াছেন গান, গানে দিয়াছেন নতুন নতুন সুর। বহু জনপ্রিয় বাংলা-নাটকের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করিয়াছে নজরুলের স্ব-রচিত গান। শুধু তাহাই নহে অন্যের রচিত বহু গানেও দিয়াছেন নজরুল সুর। 'ধ্রুব' সিনেমা চিত্রে কবি অভিনয় করিয়াছেন নারদের ভূমিকায়। সম্ভবতঃ ছবির পর্দ্দায় উহাই কবির একমাত্র অভিনয়।

বাংলার মুসলমান সমাজ সঙ্গীতের প্রতি ছিল এতদিন বিমুখ। নজরুল ইসলামী-গানের এক নতুন ধারা প্রবর্ত্তন করিয়া অজস্র গানে দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ভাসাইয়া দিলেন এক নতুন ভাববন্যায়। ফলে, মুসলমান সমাজে সঙ্গীত লাভ করিল অসাধারণ জনপ্রিয়তা ও এক আকাঙ্খিত মর্যাদার আসন। আর ঘরে ঘরে হোটেল ও রেস্তোঁরাঁয়, দিনরাত্রি বাজিতে লাগিল নজরুলের ইসলামী-গানের রেকর্ড। ইসলামী গানের অন্যতম সুপরিচিত গায়ক আবদুল আহাদ

লিখিয়াছেন —"বাঙ্গালার মুসলমান সমাজকে তিনি কত বড় দান দিয়ে গেছেন তা কেউ ভেবে দেখে কিনা জানি না। মানুষের মন কোন্ স্তরে পৌঁছুলে, কতখানি অনুভূতি থাকলে তবেই এই রকম গান লেখা যায়, অন্তর দিয়ে খোদাকে তিনি কতখানি কাছে পেয়েছিলেন তাঁর গানগুলিই তার সাক্ষ্য। এখন পর্য্যন্ত একটি লোকও দেখলামনা সে ধরনের গান লিখতে পারল। এত মধুর এত মনোরম করে তিনি এ গানগুলো লিখেছেন যে, ধর্ম্মে যাদের আস্থা নেই তাদের মনেও এ গান ক্ষণিকের জন্য ধাক্কা দেয়। কাজী সাহেব হলেন সুর-পাগল ফকির।" সত্যিই শেষের দিকে নজরুল যেন ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন সত্যকার ও পূর্ণ ফকিরীর দিকে। তাই তাঁহার শেষের দিকের রচনাগুলিতে আধ্যাত্মিকতা পাইয়াছে এক অপরূপ কাব্যরূপ।

নজরুলের ইসলামী-গানের সংখ্যা বহু ও দেদার। উদ্ধৃতির সাহায্যে তাহার সঙ্গে আংশিক পরিচয়ও সম্ভব হইবে না। ছবি এবং ভাবের এক অপুর্ব সমন্ময় ঘটিয়াছে তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত গানটিতে। গানটির বিষয়-বস্তু হজরত মোহাম্মদের ধরাধামে আবির্ভাব।

'তোরা দেখে যা, আমিনা মায়ের কোলে।
মধু পূর্ণিমারই সেথা চাঁদ দোলে।।
যেন ঊষার কোলে রাঙা রবি দোলে।।
কুল-মখ্লুকে আজি ধ্বনি উঠে, কে এল ঐ,
কলেমা শাহাদতের বাণী ঠোঁটে, কে এল ঐ,
খোদার জ্যোতি পেশানিতে ফোটে, কে এল ঐ,
আকাশ গ্রহ তারা পড়ে লুটে,---কে এল ঐ,
পড়ে দরুদ ফেরেশ্‌তা,
বেহেশ্‌তে সব দুয়ার খোলে।।
মানুষে মানুষের অধিকার দিল যে জন,
এক আল্লাহ্ ছাড়া প্রভু নাই কহিল যে জন,
মানুষের লাগি চির-দীন বেশ নিল যে জন,
বাদশা ফকিরে এক সামিল করিল যে জন,
এল ধরায় ধরা দিতে সেই সে নবী,

ব্যথিত মানবের ধ্যানের ছবি,
আজি মাতিল বিশ্ব নিখিল মুক্তি কলরোলে।।"

তাঁহার--- "ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে
এল খুশীর ঈদ।"

এই গানটিও চিরকাল মুসলিম সমাজে জনপ্রিয় হইয়াই থাকিবে। মুসলিম ধর্ম্ম-গ্রন্থ 'কোরান শরীফের' মুখ-বন্ধ 'সূরা ফাতেহা,' যাহা মুসলমানগণ প্রতি নামাজের সময় পাঠ করিয়া থাকে, তাহার ভাবালম্বনেও নজরুল রচনা করিয়াছেন সঙ্গীত। সেই সঙ্গীতটিও নিম্নে উদ্ধৃত হইল:

"তোমারি মহিমা সব বিশ্বপালক করতার।
করুণা কৃপার তব নাহি সীমা নাহি পার।
বিশ্বপালক করতার।।
রোজ হাশরের বিচার দিনে
তুমিই মালিক এয় খোদা,
আরাধনা করি প্রভু
আমরা কেবলি তোমার,
বিশ্বপালক করতার।।
সহায় যাচি তোমারি নাথ
দেখাও মোদের সরল পথ,
তাদের পথে চালাও খোদা
বিলাও যাদের পুরস্কার।
বিশ্বপালক করতার।।
অবিশ্বাসী ধর্ম্মহারা যাহারা সে ভ্রান্ত-পথ,
চালায়োনা তাদের পথে
এই চাহি পরওয়ারদেগার।
বিশ্বপালক করতার।।

কবি যদি হন নিজে সুরকার তাহা হইলে সঙ্গীত যে কী অপূর্ব্ব হইতে পারে তাহার অজস্র নিদর্শন রহিয়াছে নজরুলের গানে—কথা এবং ভাবের এমন মণিকাঞ্চন সংযোগ সত্যই দুর্ল্লভ। ঝর্ণাধারা সম্বন্ধে

একটি গানের কয়েকটি লাইন নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইহাতেও ঘটিয়াছে কথা, ভাব ও বিষয়ের এক সার্থক সমণ্বয়ঃ---

"পাষাণ গিরির বাঁধন টুটে
নির্ঝরিণী আয় চলে আয়!
ডাক্‌ছে উদার নীল পারাবার
আয় তটিনী আয় নেমে আয়।
বেলা-ভূমে আছড়ে প'ড়ে
কাঁদছে সাগর তোরি তরে,
তরঙ্গেরি নূপুর প'রে
জল-নটিনী আয় নেমে আয়।।"

নজরুলের গান শুধু যে সুর-সমৃদ্ধ বা শুধু যে ভাষার ঐশ্বর্য্যেই হৃদয়গ্রাহী তাহা নহে, তাঁহার গান পাঠক, গায়ক ও শ্রোতার কল্পনার সাম্‌নে তুলিয়া ধরে এক মনোজ্ঞ ছবি, প্রায় চিত্রের মতোই বলা যায়। এইভাবে ভাবের সঙ্গে চিত্রের সমন্বয় সাধন তাহাও কবি-মানসের এক দুর্লভ শক্তিরই পরিচায়ক।

কবির রচিত হাসির গানের কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে একটি মাত্র হাসির গানের কিছুটা অংশ উদ্ধৃত হইলঃ

"ওরে হুলোরে তুই রাত বিরেতে ঢুকিস্‌নে হেঁসেল্‌
কবে বেঘোরে প্রাণ হারাবি বুঝিস্‌নে রাস্কেল।।
স্বীকার করি শিকারী তুই গোঁফ দেখেই চিনি,
গাছে কাঁঠাল ঝুলতে দেখে দিস্‌ গোঁফে তুই তেল।।
ওরে ছোঁচা ওরে ওঁচা বাড়ী বাড়ী তুই হাঁড়ি খাস,
নাদ্‌নার বাড়ী খেয়ে কোন্‌ দিন ধনে প্রাণে বা মারা যাস,
কেঁদে মিয়াও মিয়াও বলে বিবি বেরালী
করবে রে হার্টফেল্‌।।"

নজরুলের গান সম্বন্ধে হাবীবউল্লাহ্‌ বাহারের নিম্নোদ্ধৃত কথা কয়টিও অত্যন্ত খাঁটি—"দুইটি মহাযুদ্ধের মাঝখানে মাত্র বিশ বছরের স্বল্প পরিসর কবি-জীবন। ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে এই বিশ বছরে তিনি তাঁহার সাহিত্য-রস বিলিয়েছেন। বিশ বছর সভা সমিতির উদ্বোধন

হয়েছে তাঁর গান দিয়ে। মজলিস জমেনি তাঁর গজল না হলে। রেডিও, সিনেমা, থিয়েটার, গ্রামোফোন অচল হয়ে যায় তাঁকে না পেলে। গানের রাজা রবীন্দ্রনাথ। গানের সংখ্যার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথকেও হার মানিয়েছেন নজরুল।" এ প্রসঙ্গে স্বনামধন্য কবি কালিদাস রায়ের মন্তব্যও স্মরণযোগ্য:

"কাজী ছিল আমাদের মজলিসের তান্‌সেন। কাজী তার স্বরচিত গান---বিশেষত গজল গানে আমাদের বহুদিন ধরে মুগ্ধ করেছে। সঙ্গীতে কাজীর দান বঙ্গের রস-ভাণ্ডারে অভিনব সম্পদ। বাংলার গানে সে দিয়েছে নূতন সুর, নূতন ঢঙ, নূতন রং। কাজীর পর কত অক্ষম কবি বাংলায় গজল সুর, ভাটিয়ারী সুর প্রবর্ত্তন করতে চেষ্টা করেছে কিন্তু কাজী এখনো অপরাজেয় হয়েই আছে।

কাজী তার কাব্য ও সঙ্গীতে হিন্দুর সংস্কৃতি ও মুসলমানের সংস্কৃতির অপূর্ব্ব মিলন ঘটিয়েছে ছন্দে, ভাষায়, অলঙ্কারে এবং রসাদর্শে কেবল উভয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলেই এটা সম্ভব হয়না। কাজীর চেয়ে উভয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে হয়ত অনেকের ঢের বেশী জ্ঞান আছে কিন্তু উভয় সংস্কৃতির প্রতি এত দরদ, এত উদার সর্ব্ব-সংস্কারমুক্ত মন আর কার আছে? প্রকৃত কবির চিত্ত সর্ব্বসংস্কারমুক্ত। কাজী সে চিত্তের অধিকারী বলেই কাব্যের দরবারে হিন্দু-মুসলমানের মিলন ঘটাতে পেরেছে।*

---

* গুলিস্তা--নজরুল সংখ্যা।

পরিশিষ্ট

কবির জবানবন্দী

রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত কবি বিচারকের সামনে যে জবানবন্দী
ৃলেন তাহার অংশ বিশেষ কবি-সম্পাদিত "ধূমকেতু" হইতে নিম্নে
হইল।]

আমার উপর অভিযোগ, আমি রাজ-বিদ্রোহী! তাই আমি আজ
কারাগারে বন্দী এবং রাজদ্বারে অভিযুক্ত। একধারে—রাজার
; আর ধারে—ধূমকেতুর শিখা। একজন রাজা, হাতে রাজদণ্ড;
জন সত্য, হাতে ন্যায়দণ্ড। রাজার পক্ষে—রাজার নিযুক্ত রাজ
ভোগী রাজ কর্ম্মচারী। আমার পক্ষে—সকল রাজার রাজা,
বিচারকের বিচারক, আদি অন্তকাল ধরে সত্য—জাগ্রত ভগবান।
। বিচারককে কেহ নিযুক্ত করে নাই। এ মহা-বিচারকের দৃষ্টিতে
প্রজা, ধনি-নির্ধন, সুখী-দুঃখী সকলে সমান। এঁর সিংহাসনে
মুকুট আর ভিখারীর একতারা পাশাপাশি স্থান পায়। এঁর
—ন্যায়, ধর্ম্ম। সে আইন কোনো বিজেতা মানব কোনো বিজিত
জাতির জন্য তৈরী করে নাই। সে আইন বিশ্ব-মানবের সত্য
ৗ হ'তে সৃষ্ট। সে আইন সার্ব্বজনীন সত্যের, সে আইন
ভৌমিক ভগবানের। রাজার পক্ষে—পরমাণু পরিমাণ খণ্ড-সৃষ্টি; আমার
—আদি অন্তহীন অখণ্ড স্রষ্টা। রাজার পেছনে ক্ষুদ্র, আমার
া—রুদ্র। রাজার পক্ষের যিনি, তাঁর লক্ষ্য স্বার্থ, লাভ অর্থ;
পক্ষের যিনি তাঁর লক্ষ্য সত্য, লাভ পরমানন্দ। রাজার বাণী
আমার বাণী সীমাহারা সমুদ্র। আমি কবি, আমি অপ্রকাশ
ক প্রকাশ করিবার জন্য অমূর্ত্ত সৃষ্টিকে মূর্ত্তি দানের জন্য ভগবান-
প্রেরিত। কবির কণ্ঠে ভগবান সাড়া দেন। আমার বাণী
প্রকাশিকা। সে বাণী রাজ-বিচারে রাজদ্রোহী হতে পারে,

কিন্তু ন্যায়বিচারে সে বাণী ন্যায়দ্রোহী নয়, সত্য-দ্রোহী নয়। সে বাণী রাজদ্বারে দণ্ডিত হ'তে পারে, কিন্তু ধর্মের আলোকে, ন্যায়ের দুয়ারে তাহা নিরপরাধ, নিষ্কলুষ, অম্লান অনির্ব্বাণ সত্য স্বরূপ। সত্য স্বয়ং প্রকাশ। তাহাকে কোনো রক্ত আঁখি রাজদণ্ড নিরোধ করতে পারে না। আমি সেই চিরন্তন স্বয়ম্-প্রকাশের বীণা যে বীণায় চির সত্যের বাণী ধ্বণিত হয়েছিল। আমি ভগবানের হাতের বীণা। বীণা ভাঙ্গলেও ভাঙ্গতে পারে, কিন্তু ভগবানকে ভাঙ্‌বে কে? এ কথা ধ্রুব-সত্য যে, সত্য আছে, ভগবান আছেন---চিরকাল ধ'রে আছে এবং চিরকাল ধ'রে থাকবে। যে আজ সত্যের বাণীকে রুদ্ধ করেছে, সত্যের বীণাকে মূক করতে চাচ্ছে, সে-ও তাঁরই এক ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র স্থষ্টি-অণু। তাঁরই ইঙ্গিত আভাসে, ইচ্ছায় সে আজ আছে কাল হয়ত থাক্‌বে না। নির্বোধ মানুষের অহঙ্কারের আর অন্ত নাই; সে যাহার স্থষ্টি, তাহাকেই সে বন্দী কর্‌তে চায়, শাস্তি দিতে চায়। কিন্তু অহঙ্কার একদিন চোখের জলে ডুব্‌বেই ডুব্‌বে। যাক্, আমি বলছিলাম, আমি সত্য প্রকাশের যন্ত্র। সে যন্ত্রকে অপর কোনো নির্ম্মম শক্তি অবরুদ্ধ কর্‌তে পারে, ধ্বংস করলেও করতে পারে। কিন্তু সে যন্ত্রে যিনি বাজান, সে বীণায় যিনি রুদ্র বাণী ফোটান, তাঁকে অবরুদ্ধ কর্‌বে কে? সে বিধাতাকে বিনাশ করবে কে? আমি মর কিন্তু আমার বিধাতা অমর। আমি মর্‌ব, রাজাও মর্‌বে, কেননা, আমার মতন অনেক রাজ-বিদ্রোহী মরেছে, আবার এমনি অভিযোগ আনয়নকারী বহু রাজাও মরেছে,---কিন্তু কোনো কালে কোন কারণেই সত্যের প্রকাশ নিরুদ্ধ হয়নি---তার বাণী মরেনি। সে আজও তেমনি করে নিজেকে প্রকাশ কর্‌ছে এবং চিরকাল ধরে কর্‌বে! আমার এই শাসন-নিরুদ্ধ বাণী আবার অন্যের কণ্ঠে ফুটে উঠবে। আমার হাতের বাঁশী কেড়ে নিলেই বাঁশীর সুরের মৃত্যু হবে না; কেননা আমি আরেক বাঁশী নিয়ে বা তৈরী করে তাতে সেই সুর ফুটাতে পারি। সুর আমার বাঁশীতে নয়, সুর আমার মনে এবং আমার বাঁশী স্থষ্টির কৌশলে। অতএব দোষ বাঁশীরও নয়, সুরেরও নয়; দোষ আমার, যে বাজায়; তেমনি যে বাণী আমার কণ্ঠ দিয়ে নির্গত হয়েছে, তার জন্য দায়ী আমি নই। দোষ আমারও নয়, আমার

বীণারও নয়; দোষ তাঁর যিনি আমার কণ্ঠে তাঁর বীণা বাজান। সুতরাং রাজ-বিদ্রোহী আমি নই। প্রধান রাজবিদ্রোহী সেই বীণা-বাদক ভগবান। তাঁকে শাস্তি দিবার মত রাজ-শক্তি বা দ্বিতীয় ভগবান নাই। তাঁহাকে বন্দী করবার মত পুলিস বা কারাগার আজো সৃষ্টি হয় নাই।

o o o o

আজ ভারত পরাধীন। তার অধিবাসীবৃন্দ দাস। এটা নির্জ্জলা সত্য। কিন্তু দাসকে দাস বল্‌লে, অন্যায়কে অন্যায় বল্‌লে এ রাজত্বে তা হবে রাজদ্রোহ। এ ত ন্যায়ের শাসন হতে পারে না। এই যে জোর করে সত্যকে মিথ্যা, অন্যায়কে ন্যায়, দিনকে রাত বলানো---একি সত্য সহ্য কর্‌তে পারে? এ শাসন কি চিরস্থায়ী হতে পারে? এতদিন হয়েছিল, হয়ত সত্য উদাসীন ছিল বলে। কিন্তু আজ সত্য জেগেছে, তা চক্ষুষ্মান জাগ্রত আত্মা মাত্রই বিশেষরূপে জান্‌তে পেরেছে। এই অন্যায় শাসনক্লিষ্ট বন্দী সত্যের পীড়িত ক্রন্দন আমার কণ্ঠে ফুটে উঠেছিল বলেই কি আমি আজ রাজদ্রোহী?

আমি জানি আমার কণ্ঠের ঐ প্রলয় হুঙ্কার একা আমার নয়, সে যে নিখিল আর্ত্ত পীড়িত আত্মার যন্ত্রণা-চীৎকার। আমায় ভয় দেখিয়ে মেরে এ ক্রন্দন থামানো যাবে না। হঠাৎ কখন আমার কণ্ঠের এই হারা-বাণীই তাদের আরেকজনের কণ্ঠে গর্জ্জন করে উঠ্‌বে।

o o o o

আমি পরম আত্ম-বিশ্বাসী। তাই যা অন্যায় বলে বুঝেছি, তাকে অন্যায় বলেছি, অত্যাচারকে অত্যাচার বলেছি মিথ্যাকে মিথ্যা বলেছি, ---কাহারো তোষামোদ করি নাই, প্রশংসার বা প্রসাদের লোভে কাহারো পিছনে পোঁ ধরি নাই,---আমি শুধু রাজার অন্যায়ের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করি নাই, সমাজের, জাতির, দেশের বিরুদ্ধে আমার সত্য তরবারীর তীব্র আক্রমণ সমান বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে,---তার জন্য ঘরের বাইরের বিদ্রূপ অপমান, লাঞ্ছনা, আঘাত আমার উপর অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে বর্ষিত হয়েছে, কিন্তু কোন কিছুর ভয়েই নিজের সত্যকে, আপনার ভগবানকে

হীন করি নাই, লাভ লোভের বশবর্ত্তী হয়ে আত্ম-উপলব্ধিকে বিক্রয় করি নাই, নিজের সাধনালব্ধ বিপুল আত্ম-প্রসাদকে খাটো করি নাই, কেননা, আমি যে ভগবানকের প্রিয় সত্যের হাতের বীণা, আমি যে কবি, আমার যে সত্যদ্রষ্টা ঋষির আত্মা।

প্রবন্ধ

পরম প্রীতি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে
ঢাকা মুস্‌লিম সাহিত্য সমাজের বন্ধুগণকে
দিলাম ।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

যে-সব বিষয় নিয়ে এই রচনাগুলির জন্ম, সে-সব বিষয়ে এখানে শেষ কথা বলা হয়েছে, এমন দাবী এ লেখাগুলির নেই। একজন দেশ ও সাহিত্য-প্রিয় মানুষের মনের বিশেষ মুহূর্ত্ত বা অবস্থার কিছু পরিচয় এই লেখাগুলিতে হয়ত ফুটে উঠেছে। লেখাগুলি দেশ, সমাজ ও সাহিত্য সম্বন্ধে লেখকের দৃষ্টি ভঙ্গির আংশিক পরিচয়ও যদি পাঠকদের দরবারে পৌঁছাতে পারে, তাতেই তাদের প্রকাশের সার্থকতা সূচিত হবে।

আমাদের মফঃস্বল সহরগুলিতে মুদ্রণ-শিল্প এখনো আশানুরূপ উন্নত হয়নি; ফলে বইটির মুদ্রণ-সৌষ্টবে অনেক ত্রুটি লক্ষিত হবে। আর মুদ্রা-যন্ত্রের সর্বজন স্বীকৃত ভূতের উপদ্রব যে কত যায়গায় কত ভাবে হয়েছে তারও কোন ইয়ত্তা নেই। পাঠকদের অযাচিত মার্জ্জনা ছাড়া এর কোন গত্যন্তর নেই।

'সেভয় প্রেস'-এর সত্ত্বাধিকারী পরম স্নেহভাজন ডাক্তার বাহারউদ্দীন ও তাঁর সহকর্ম্মীগণ বইটী ছেপে বের করতে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করেছেন, তাঁদের সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। চট্টলার অকৃত্রিম সাহিত্য-সেবী আমার অগ্রজ প্রতিম শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় কিছু কিছু প্রুফ দেখে দিয়ে আমার অনেক শ্রম লাঘব করেছেন, মামুলী ধন্যবাদে তাঁর স্নেহ ও প্রীতির ঋণ শোধ হবে না। বন্ধু আবদুল হক ফরিদী সাহেবের প্রীতির ঋণও এই বইর সঙ্গে জড়িত রইল।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭

আবুল ফজল

আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের ধারা

আমাদের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা ইংরেজের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ। রাষ্ট্রনৈতিক সম্বন্ধের প্রতি আমার ঈঙ্গিৎ নয়, কারণ বিদেশের সঙ্গে বঙ্গদেশের রাষ্ট্রনৈতিক সম্বন্ধ বহুদিনের। এই সম্বন্ধ বহু দেশের ও বহু জাতির সঙ্গে বাঙলার তথা ভারতের ভাগ্যে বার বার ঘটেছে; কিন্তু বারবারই বৈদেশিক রাষ্ট্রশক্তির বিজয়-রথ এই দেশের পিঠের উপর দিয়ে নির্ব্বিবাদে চলে গেছে মাত্র। দেশের চিত্তলোকে, মানসিক জগতে কোন সাড়া, কোন বিপ্লবের সৃষ্টি করতে পারেনি। ইসলামের একেশ্বরবাদ ও সামাজিক উদারতা এদেশের বহু ধার্মিক, সাধু চরিত্র লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তাতে সন্দেহ নেই, যার ফলে নানক, কবীর, রাম মোহন ইত্যাদির জীবনের কথা উল্লেখ করা যায়। কিন্তু এই প্রভাব যে কত সীমাবদ্ধ, তা আজকের ইতিহাস ও আদমশুমারীর রিপোর্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই বুঝা যাবে।

ইংরেজ আমলের পূর্বে আমাদের জীবন ছিল সীমাবদ্ধ—সাহিত্য ছিল ততোধিক ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ। সে দিন রামায়ণ, মহাভারত, পুঁথি, যাত্রা, কথকতা, কিম্বদন্তী, পাঁচালী ইত্যাদিই শান্তিপ্রিয় অলস বঙ্গসন্তানের রসবোধ পরিতৃপ্ত করতো, জীবনের কোন বৃহত্তর সমস্যা, সামাজিক কোন দ্বন্দ্ব তখনো আমাদের মানসিক জীবনকে আলোড়িত করে তোলেনি। আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাস এ দেশে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারেরই ইতিহাস। ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজী সাহিত্য আমাদিগকে শুধু ইংরেজ চিন্তা নায়কদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়নি, বরং ইংরেজীর মারফৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানপুষ্ট সমগ্র নব্য ইউরোপের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছে। সে পরিচয়ে আমাদের মানসিক জগতে কি উন্মাদনা, কি বিপ্লবের সৃষ্টি হয়েছিল, তা হিন্দু কলেজের

ইতিহাস, অথবা আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের প্রবর্ত্তক মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী পাঠকমাত্রেই জানেন।

ইউরোপীয় ভাবধারায় আকণ্ঠ পরিপূর্ণ মাইকেল মধুসদন থেকে যে সাহিত্য ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে, মাত্র অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যেই যে তা বিশ্ব সাহিত্য স্রোত-ধারায় স্থান পাবে, সেদিন একথা কে ভাবতে পেরেছিল ?

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ইউরোপের চিত্তদূতরূপে ইংরেজ এত ব্যাপক ও গভীরভাবে আমাদের কাছে এসেছে যে আর কোন বিদেশী জাত কোন দিন এমন করে আসতে পারেনি। ইউরোপীয় চিত্তের জঙ্গম শক্তি আমাদের স্থাবর মনের উপর আঘাত করল, যেমন দূর আকাশ থেকে আঘাত করে বৃষ্টি ধারা মাটির পরে ভূমিতলের নিশ্চেষ্ট অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে প্রাণের চেষ্টা সঞ্চার করে দেয়, সে চেষ্টা তখন বিচিত্ররূপে অঙ্কুরিত বিকশিত হতে থাকে--।" ইংরেজী সাহিত্যের তথা ইউরোপীয় সাহিত্যের বৃষ্টি ধারায় আমাদের মনও যে অঙ্কুরিত ও বিকশিত হয়ে উঠেছে তা মাইকেল, বঙ্কিম, হেম, নবীন, দীনবন্ধু, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ, শরচন্দ্র, মোহিত লাল, নজরুল, বিভূতি, বুদ্ধদেব, জসীম পর্যন্ত বঙ্গ-সাহিত্যের বিচিত্র ইতিহাসই সাক্ষ্য দেবে। বাঙ্গালীর তীক্ষ্ম গ্রহন শক্তি ও সব কিছুকে নিজস্ব করে নেওয়ার অদ্ভুত প্রতিভা বাঙ্গালীকে নকল-নবিশীর হীনতা থেকে রক্ষা করেছে। স্বীকার করি, মাইকেল থেকে আজ পর্যন্ত যে অবিচ্ছিন্ন সাহিত্য ধারা বয়ে চলেছে, তা ইউরোপীয় ভাবধারায় স্নাত, তবুও সে সাহিত্য যে ইউরোপীয় সাহিত্য নয় তা যে কোন স্থূলবুদ্ধি লোকও বুঝতে পারে। সূর্য্যমুখী, ভ্রমর, অচলা, সাবিত্রী, লাবণ্য, শ্রীকান্ত, সন্দীপ, এদের গাউন, বনেট্, কোট্-প্যাণ্ট পরিয়ে দিলেও কেউ মেম বা সাহেব বলে ভুল করবেনা। এমন কি অমিট্রে, কেটি মিত্তির, শেষ প্রশ্নের কমলকেও না। প্রতিভার সাফল্য ত এখানেই। কোন কোন আধুনিক সমালোচক আধুনিক লেখকদের এ বলে খোটা দিয়ে থাকেন যে, এরা ইউরোপের নকল করছেন। অথচ এই সব সমালোচক মাইকেল, বঙ্কিম,

রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা করতে বিমুখ নন্। ইউরোপীয় ভাবধারায় স্নাত হয়ে সাহিত্য রচনা করে মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ যদি অশ্রদ্ধেয় না হয়ে থাকেন তবে অগ্রজদের পদাঙ্কানুসারী অনুজ তরুণদের অপরাধ কেন তাদের চোখে, এত মারাত্মক হয়ে উঠেছে তা বুঝতে পারা যায় না। মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের, সাহিত্য কি রামায়ণ, মহাভারত, যাত্রা, কথকতা, পাঁচালীর Continuation? এঁরা কি কালিদাস, ভবভূতি, বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাসের মানসপুত্র? বরং বঙ্গ সাহিত্যের সঙ্গে যাঁর সামান্য পরিচয়ও আছে তিনিই স্বীকার করবেন এরা মিল্টন, ওয়াল্টর স্কট, সেক্সপিয়ার, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, বায়রণ, কীটস্, ব্রাউনিং, শেলীরই বরং সগোষ্ঠী। আজকের বঙ্গ-সাহিত্যের তরুণ সারথীগণও যদি আধুনিক ইউরোপের চিন্তা নায়কদের সঙ্গে মিতালী করে থাকেন, তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। বার্ণাডশ, ওয়েলস, রোঁলা, হামসুন, বুয়ার, লরেন্স এমন কি ফ্রয়েড, য়ুঙ্গের সঙ্গেও যদি আজ আমাদের বন্ধুত্ব ঘটে থাকে, তাতে আমি এ ভেবে গৌরবান্বিত যে আজ আমি একা নই, এক ঘরে নই! আমার চতুর্দিকে রক্ষণশীলতার প্রাচীর তুলে নিজেকে আমি কূপমণ্ডূক করে রাখিনি। প্রদেশ ও দেশের সীমা রেখা ছাড়িয়ে আমি নিজেকে বিশ্ব স্রোত ধারায় মিশাতে পেরেছি। পেরেছি বলেই আজ আমার মনের ক্ষুদ্রতা, চিত্তের অনুদারতা ঘুচেছে, অনুদারতা ঘুচেছে বলেই আজ আমি মানুষের মনুষ্যত্বকে স্বীকার করছি। একদিন আমরা স্বহস্তে জীবন্ত মানুষকে আগুনে পুড়িয়ে নিজে অসৎ হয়েও সতী মাহাত্ম্য প্রচার করতে দ্বিধা বোধ করিনি। সাগর বক্ষে সন্তান বিসর্জ্জন দিয়ে পুণ্যের ভাণ করেছি। নিজে ইন্দ্রিয় ভোগের কিশোরী ভজনে আকণ্ঠ ডুবে থেকেও দ্বাদশ বছরের বালিকার সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রামকে আজীবনের জন্য ধর্মের কুলুপ এঁটে পরিতৃপ্তি পেয়েছি।...দাসত্ব শৃংখলের ভারে যখন দেশ জননীর ঘাড় নুইয়ে মাটিতে ঠেকছিল তখনো আমি নিশ্চিন্ত আরামে দিবা নিদ্রা উপভোগ করেছি, কিন্তু কোন্ এক সোনার কাঠির যাদুস্পর্শে আমি হঠাৎ জেগে উঠলাম! সমস্ত মোহ ও সংস্কারের বন্ধন আমার এক মুহূর্ত্তে কেটে গেল, অনন্ত সম্ভাবনাময় অমূল্য মানবজীবনকে অগ্নিদাহ করে পুণ্য সঞ্চয়ের তুচ্ছতা আমি এক মুহূর্ত্তে বুঝে নিলাম। বিধবার

বিবাহ দিয়ে তা আজ খবরের কাগজে ছাপিয়ে দিতেও আমি লজ্জিত নই। নিপীড়িত মানুষের জন্য আজ আমার চোখে অশ্রু ঘনিয়ে ওঠেছে। দেশের জন্য কিছু না করাকে আমি আজ পাপ মনে করি। সুদূর আমেরিকায় নিগ্রো দাসদের দুঃখে আমি বেদনা বোধ করি। সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত রাশিয়ান দেশভক্তের জন্য আমার মন হাহাকার করে ওঠে, জার্মেন নির্ব্বাসিত য়ুহুদিদিগকে আমার স্বগৃহে আশ্রয় দিতেও আজ আমি কুণ্ঠিত নই। অথচ কিছুদিন পূর্ব্বেও আমি এদের ছায়া মাড়ানকেও পাপ মনে করতাম। এ সমস্ত কি করে সম্ভব হল? সম্ভব হয়েছে, আমি আজ সাহিত্যের যথার্থ অর্থ বুঝতে পেরেছি তাই। সাহিত্যের প্রাণ-বাণী সহযোগ, আজ আমি মানুষের সঙ্গে সহযোগিতা করতে শিখেছি, মানুষের মনুষ্যত্বকে আজ আমি স্বীকার করছি, ঘরে বাইরে সকল মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গে আজ আমার সুখ দুঃখ একাকার হয়ে মিশে গেছে। মানুষের এ সুখ দুঃখ নিয়ে মাইকেল, বঙ্কিম সাহিত্য রচনা করেছেন। এ সুখ দুঃখ রবীন্দ্র ও শরৎ সাহিত্যের প্রাণবস্তু। এবং অতি আধুনিক সাহিত্যিকদের সাহিত্যের বুনিয়াদও এর বিপরীত বা এর চেয়ে আলাদা কিছুর উপর নয়। পরিবর্ত্তন যা কিছু, সে কেবল চেহারারই পরিবর্ত্তন। মহাসমরের পূর্ব্ব ও পরবর্তী ইতিহাসের সঙ্গে যার পরিচয় আছে, তিনিই স্বীকার করবেন, এই পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। বঙ্কিম যুগে যে সমাজে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বাস করতেন, সে সমাজ কি এখন টিকে আছে? যে অর্থনৈতিক স্বচ্ছন্দতার মধ্যে তারা ছিলেন সে সচ্ছন্দতা এখন কোথায়? মহাসমর বিশ্বব্যাপী মানুষের মানসিক জগতে যে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, তাতে মানুষের মনের শান্তি, দেহের অবসর, তার নির্ভাবনার অন্নজল, সবই ভস্মীভূত হয়ে গেছে। ধর্ম, ঈশ্বর, প্রেম, আইন, সত্য, নীতি, সতীত্ব, মাতৃত্ব, পিতৃত্ব এক কথায় একদিন মানুষের কাছে যা কিছু শ্রেয় ও প্রেয় বলে গণ্য ছিল, তার সম্বন্ধে আধুনিক যুবকের মনে সন্দেহ জেগেছে। শত সমস্যার শত প্রশ্নে আজ তার মন ক্ষত বিক্ষত। একদিন মাথার কাপড় ঘাড়ে নেমে এলেই আমরা মেয়েদের সতীত্বে সন্দেহ প্রকাশ করতাম, আজ বন্ধুর সঙ্গে স্ত্রীকে থিয়েটারে পাঠিয়ে আমরা নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারি। নিজের

বয়স্কা কন্যাকে পুরুষ মাষ্টারের স্কুলে পাঠালেও আমাদের আফিসের কাজে বা দিবা-নিদ্রায় কোন ব্যাঘাত হয় না। বিপদ ঘাড়ে না নিয়ে কোন সমস্যারই সমাধান সম্ভব নয় বলেই আমরা এ বিপদ ঘাড়ে নিয়েছি; নিতে বাধ্য হয়েছি। এতে অসাধারণ ঘটবার খুবই সম্ভাবনা। এ অসাধারণকে নিয়েই চিরকাল সাহিত্য রচনা চলেছে এবং চিরকাল রচিত হবে, (Hamlet ও othello অভিনয়, নৌকাডুবি বা গৃহদাহ, মানব-জীবনে রোজ হয় না, হলে লেটরিন ও রান্নাঘরকে নিয়েই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম মহাকাব্য রচিত হ'ত।) তাই বুদ্ধদেব যদি আজ ছাত্রী মাষ্টারের প্রেম কাহিনী, অথবা বন্ধু-পত্নীর প্রেম নিয়ে গল্প লেখেন, তাতে বিস্মিত হবার কোন কারণ নেই। বরং এ গল্প যদি বঙ্কিমী যুগে লিখিত হ'ত তা হলেই বিস্ময়ের কারণ ঘটত, সে যুগের আমাদের কোন প্রপিতামহ যদি আজ হঠাৎ কবর ছেড়ে উপস্থিত হন, তা'হলে তিনি যে শুধু আমাদের সাহিত্য পড়ে বিস্মিত হ'বেন তা নয়, আমাদের চেহারা ও চাল-চলন দেখেও কম বিস্মিত হ'বেন না। যখন তিনি তাঁর প্রপৌত্রীকে উন্মুক্ত গ্রীবা ও অর্দ্ধ-উন্মুক্ত বাহু নিয়ে খদ্দর হস্তে পুরুষ ভলাণ্টিয়ারদের সঙ্গে রাস্তায় পিকেটিং করছে দেখবেন, তখন তাঁর অবস্থাটা কল্পনা-নেত্রে একবার দেখে নিতে পারেন। অথচ এ মেয়েদের নিয়ে গল্প লিখেছেন বলে অচিন্ত্য ও বুদ্ধদেব অশ্লীল আখ্যাত হয়েছেন। বর্ত্তমান অর্থনৈতিক ও মানসিক অবস্থা দেশের অগণিত যুবক যুবতীকে ঘরছাড়া করেছে। জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে আজ নারী পুরুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, বাঁচতে হ'লে না দাঁড়িয়ে উপায় নেই বলে। নর-নারীর হৃদয়কে বিধাতা আর যন্ত্র করে তৈয়েরী করেন নি। প্রেম ভালবাসা ত ঘড়ীর কাঁটা নয় যে বিয়ের চাবি পড়া মাত্রই তা ঢং করে বেজে উঠবে, আর না হয় নিশ্চল হয়ে থাকবে।

অথচ এ অবিবাহিত যুবক যুবতীর প্রেম নিয়ে সাহিত্য লিখেছেন বলে তরুণ সাহিত্যিকের ভাগ্যে আজ অশ্লীল আখ্যা জুটেছে। দৈবক্রমে আরও পঞ্চাশ বছর যদি আমরা বেঁচে থাকি, অথবা কবর থেকে উঠে আসতে পারি তা হ'লে সে দিনও যে আমরা সেকালের সাহিত্যিকদের অশ্লীল আখ্যা দিয়ে নিজেদের বিজ্ঞতা প্রকাশ করব তাতে কোন

সন্দেহ-ই নেই। কারণ, সে দিনের আদর্শ সেই দিনের রুচি, সেই দিনের নীতিবোধ, আমাদের আদর্শ, রুচি ও নীতিবোধের সঙ্গে খাপ খাবে না। সে দিন হয়ত যুবক যুবতী পাশাপাশি বসে কলেজে অধ্যয়ন করবেন, পাশাপাশি বসে আফিস চালাবেন। হয়ত অবিবাহিত যুবক যুবতী মিলে একই উড়ো জাহাজে চড়ে ভারত মহাসাগরের উপর দিয়ে non-stop প্রতিযোগিতায় নামবেন। সে দিন দৈনন্দিন জীবনে কত আসাধারণ ঘটবার সম্ভাবনাই না এসে পড়বে। সে অসাধারণ সম্ভাবনাকে নিয়ে সে দিনের সাহিত্যিক যখন সাহিত্য রচনা করবেন তখন আমরা ও আমাদের মত সে কালের প্রাচীনপন্থীরা তাঁদের প্রতি কত অভিশাপই না হানব!

আধুনিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনে আর একটা প্রশ্ন স্বতই মনে জাগে। যদি আধুনিক ইউরোপীয় ও আধুনিক বাঙ্গালী সাহিত্যিকগণ এলিজাবেথীয় ও বঙ্কিমী আদর্শে সাহিত্য রচনা শুরু করতেন, তা'হলে তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়ত উঠত না। কিন্তু তাঁদের সেই সাহিত্য কি আগা গোড়া ফাঁকি ও মিথ্যাচার হ'ত না?

পরিপার্শ্বিকতা ও যুগের মানসিকতাকে অস্বীকার করে অতীতকে আদর্শ ধরে (সে অতীত যতই গৌরবময় হউক না কেন) তরুণেরা আজ পেছনের দিকে পথ চলা আরম্ভ করেনি ব'লে যাঁরা নির্ব্বিচারে অভিশাপ হানছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁদের বলেছেন সনাতনী। রবীন্দ্রনাথের কথা---"যে আর্ট অতীত ইতিহাসের স্মৃতি-ভাণ্ডারের নিশ্চল পদার্থ নয়, সজীব বর্তমানের সঙ্গে তার নাড়ীর সম্বন্ধ, তার প্রবণতা ভবিষ্যতের দিকে; সে চলছে সে এগোচ্ছে তার সম্ভূতির শেষ হয় নি। তার সত্ত্বার পাকা দলিলে অন্তিম স্বাক্ষর পড়েনি। আর্টের রাজ্যে যারা সনাতনীর দল, তারা মৃতের লক্ষণ মিলিয়ে জীবিতের জন্য শ্রেণী-বিভাগের বাতায়নহীন কবর তৈয়ারী করে।" আমাদের সাহিত্য সমালোচকগণও কি তরুণ সাহিত্য বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎ চন্দ্রের আদর্শে হচ্ছে না বলে তাদের জন্য কবর তৈয়ারীর ব্যবস্থা করছেন না? বার্ণাডশকে যদি সেক্সপীয়রের আদর্শে এবং রবীন্দ্রনাথকে যদি কালিদাসের

আদর্শে নাটক লিখতে বলা হয়, তাতে কি তাঁদের জীবন্ত সমাধির আয়োজন করা হয় না?

রবীন্দ্রনাথের আর একটি বাণী, "সাধারণের অভ্যাসের বাঁধা জোগানদার হবার লোভ সামলাতে না পারলে, সেই লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।" এই সাধারণ পাঠকের জোগানদার হ'তে গিয়ে তরুণ সাহিত্যিকগণ অকালে মৃত্যু বরণ করেন নি—বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি কামীগণের পক্ষে সত্যিই এইটি আনন্দের সংবাদ। সহস্র অপবাদকে মাথা পেতে নিয়ে এরা নিজের কালকে অমরতা দানের সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। আমি যে কালে জন্মগ্রহণ করেছি সে কাল মহাকালের অক্ষয় পটে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমার যুগের সুখ-দুঃখ সমস্যা জিজ্ঞাসা, জয় পরাজয় আশা আকাঙ্খাকে যাঁরা অক্ষয় স্মৃতি ভাণ্ডারে ধরে রাখবার চেষ্টা করছেন তাঁরা আমার নমস্য। অসীম দুঃখে আজ মানুষ ভগবানের ন্যায় বিচারে সন্দেহ কর্‌ছে, প্রেম ভালবাসায় তার সন্দেহের অন্ত নেই। বিচিত্র দুঃখ তার চিরকালের সংস্কারকে ধূলিসাৎ ক'রে দিয়েছে। তাই নারী আজ সম্পত্তির অধিকার চায়, তালাকের অধিকার চায়। এই দুঃখের কাহিনী আমি নজরুলের লেখায় দেখেছি। প্রেমেন্দ মিত্রের অপরূপ কাহিনীতে শুনেছি। হাজার হাজার নর নারী শুধু দু'মুঠো অন্নের জন্য কল-কারখানায়, ফ্যাক্টরীতে ও খনিতে দিন রাত্রি মাথার ঘাম পায়ে ফেল্‌ছে। অগণিত মানব সন্তান বড় বাবুর প্রসন্ন দৃষ্টির উপর যাদের সর্ব্বস্ব নির্ভর করে,. তাদের কাছে কঠোর নীতিবোধ কি করে আশা করা যেতে পারে? যে নারী শুধু পেটের দায়ে আজ সহস্র পুরুষের সামনে এসে পড়েছে, তার কাছে আমরা সীতার সতীত্ব কি করে আশা করতে পারি? শৈলজানন্দের মায়াময় লেখনী এদের হাসি অশ্রুর বিচিত্র কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছে। আজ মধ্যবিত্ত ঘরের শিক্ষিত বেকার যুবকের ট্র্যাজেডি কার চোখের উপরই না ভাস্‌ছে? অন্নহীন, বস্ত্রহীন, শান্তিহীন এই দুঃখের ট্র্যাজেডি অচিন্ত্য কুমারের লেখনীতে ধরা দিয়েছে। প্রবোধ সান্ন্যাল এ'কে রূপ দিতে চেষ্টা পেয়েছেন। আজকের দিনের শিক্ষিতা স্বাধীনা নারীর হাল্কা

বিলাসীতাময় জীবনের ছবি, তাদের জীবনের আশা-আকাঙ্খা ও ব্যর্থতা বুদ্ধদেবের লেখনীতে মূর্ত্তি নিয়েছে। কি সব সামাজিক রীতিনীতি, সংস্কার ও আচার ব্যবহার আমাদের পরিপূর্ণ বিকাশের অন্তরায় হচ্ছে তার রূপ প্রবোধ সান্ন্যালের লেখায় ফুটে উঠেছে। যে স্বল্প সংখ্যক যুবক বুদ্ধি ও ইন্‌টেলেক্ট দিয়ে আজকের সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হতে চাচ্ছেন তাঁদের অন্তরকে চিত্রিত করবার প্রয়াস অন্নদাশঙ্করের লেখায় দেখা যায়। ভাস্কর ধর্ম্মী মোহিতলালের লেখায় ক্ল্যাসিকেল সৌন্দর্য্য রূপ নিয়েছে। ইংরেজী শিক্ষা প্রভাবাধীন আজকের বঙ্গ পল্লীর চিত্র বিভূতিভূষণ এঁকেছেন। স্বাদেশীকতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত যে অসংখ্য যুবক যুবতী সে পথ ধরে অকুতোভয়ে চলেছে, তাদের দুর্গম পথের বাণী নজরুলের বীণায় ধরা দিয়েছে। চিরকালের যুবক যুবতীর বিরহ বিধুর মনের সুখ-দুঃখকে তিনি সঙ্গীতের আকার দিয়েছেন। বঙ্গ-পল্লীর নিরাবিল প্রেম জসীম উদ্দিনের লেখায় ফুটে উঠেছে। ইউরোপীয় আদর্শে আকণ্ঠ পরিপূর্ণ ইউরোপ প্রত্যাগত ইউরোপ-প্রবাসী ভারতীয় যুবকদের মানসিক জীবন দিলীপ কুমার এঁকেছেন। যে সাহিত্যের এ বিচিত্র অঙ্কুর আমার চোখের সামনে ভাসছে সে সাহিত্যকে আমি উপেক্ষা করতে পারি না। আমি আধুনিক কালের মানুষ, আমি আধুনিক কালকে ভালবাসি। কারণ এর চেয়ে সত্য কোন কাল আমার জন্য নেই। অতীত ও ভবিষ্যতের উপর আমার কোন হাত নেই। আধুনিক সাহিত্য আধুনিক কালেরই সাহিত্য। এ যুগের আশা আকাঙ্খা, এ যুগের সুখ-দুঃখ সে সাহিত্যের বুনিয়াদ। এ কালের চেহারা যদি বিকৃত হ'য়ে থাকে তার জন্য সাহিত্যিকের চেয়ে এ যুগের রাষ্ট্রীক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষানৈতিক জীবনই বেশীর ভাগ দায়ী। মানব জীবনে সেক্সের প্রভাব সর্ব্বজন স্বীকৃত, অতীতে সেক্সকে কেন্দ্র ক'রে যত সাহিত্য বা আর্ট সৃষ্টি হয়েছে মানুষের অন্য কোন Instinct নিয়ে অতখানি শিল্প ও সাহিত্য গড়ে ওঠেনি। আধুনিক সাহিত্যেও যদি সেক্সের প্রভাব লক্ষিত হয়, তাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছু নেই। আজ আমাদের যৌন-জীবন যতখানি উন্মুক্ত এবং অদুর ভবিষ্যতে আরও যতখানি উন্মুক্ত হ'বে, অতীতে কোনদিন ঐ

রূপ উন্মুক্ত ছিল না। কাজেই আজকের সাহিত্যে যৌন-জীবন যে অনেকখানি খোলাখুলিভাবে চিত্রিত হ'বে এ ত নেহাৎ স্বাভাবিক ব্যাপার। বাস করব ১৯৩৪ সালে, আর সাহিত্যে যৌন-জীবন আঁকব ১৪১৪ সালের, এ যে অত্যন্ত শিশু সুলভ মানসিকতা।

ভালয়-মন্দয়, পাপে-পুণ্যে মানব জীবন। এই জীবনকে আধুনিক বঙ্গ সাহিত্য স্বীকার করেছে। তাই পতিতা নারীর মধ্যে সে মনুষ্যত্ব দেখেছে, চোর, ডাকাত, কুলি, মজুর, চামার, মেথর কারও মনুষ্যত্ব তার কাছে খাটো নয়। অবস্থার দুর্বিপাকে পড়ে মানুষ আজ জীবনের বিচিত্র স্তরে গিয়ে পৌঁছেচে। বিভিন্ন অবস্থায় বিচিত্র মানুষের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির সঙ্গে আজ তার পরিচয়। কি করে মানুষের জীবন আজ একটানা একখাদে প্রবাহিত হবে? যে সত্যবাদী সে যে চিরজীবন সত্যবাদী থাকবে, এর মূলে কোন অলংঘণীয় বিধি নেই। জীবনে যার কিছুমাত্র উপলব্দি আছে, সে কিছুতেই পাপীকে চিরদিনের জন্য পাপী ভাব্তে পারে না। জীবনের এ বিচিত্র অভিজ্ঞতা অপরূপ উপলব্ধি ও অনন্ত সম্ভাবনার আভাস বিশ্বের জ্ঞানস্রোতে আমাদের নিজেদের মিশাতে পেরেছি বলেই আমাদের লাভ হয়েছে, না পারলে আমরা চির কূপমণ্ডুক, চির-দীন ও চির-ক্ষুদ্র হ'য়ে থাকতাম। বিশ্ব স্রোত ধারায় নিজেকে মিশাতে না পারাকে রবীন্দ্রনাথ বর্ব্বরতার সঙ্গে তুলনা করেছেন। সত্যই যে নিজেকে বিশ্বের সঙ্গে মিশাতে পারবে না, সে বর্ব্বর ছাড়া আর কি? দুর্গম পার্ব্বত্য অঞ্চলের গহনবনবাসী কোল ভীলেরা বিশ্বের-স্রোত-ধারায় নিজেদের মিশাতে পারেনি বলে তারা আজও সভ্য হ'তে পারেনি। পৃথিবীর দিকে পিঠ ফিরিয়ে সূর্য্যকে ঢাকা দিয়ে নিজের ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখকে অবলম্বন ক'রে ক্ষুদ্রতর গৃহের অন্ধকারে মুখ বুঁজে থাকবার দিন গেছে। যে তেমনি ভাবে পড়ে থাকবে সে জীবনের অনন্ত স্বাদ থেকে বঞ্চিত হ'বে। আমি চলব না বলেই যে বিশ্বের সমস্ত স্রোত-ধারা বদ্ধ হয়ে অচল থাকবে, এই মনে করা মানে আকাশ কুসুম কল্পনা করা। এ অনন্ত প্রবহমান স্রোত-ধারায় কেউ দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। যে

দাঁড়াবে সে ঢেউয়ের আঘাতের পর আঘাতে জর্জ্জরিত হ'বে। যে এই স্রোত-ধারায় নিজেকে মিশাবে, সে চল্‌তে চল্‌তে চলার শক্তি পদে পদেই সঞ্চয় করবে। সেই শক্তির জোরে একদিন না একদিন এ অনন্ত স্রোত ধারার মধ্যে তার নিজস্ব স্রোতের সৃষ্টি হ'বে। সে স্রোত ধারার মালিক সমস্ত বিশ্ব, যেমন সমস্ত বিশ্ব স্রোত-ধারার মালিক সে।

আবার রবীন্দ্রনাথের আশ্রয় নিচ্ছি:—"সচল মনের প্রভাব সজীব মন না নিয়ে থাকতেই পারে না। এই দেওয়া নেওয়ার প্রবাহ সেখানেই নিয়ত চলেছে যেখানে চিত্ত বেঁচে আছে চিত্ত জেগে আছে।"

আমাদের চিত্ত বেঁচে আছে বলেই, আমরা বিশ্বের সাথে নিজেদের যুক্ত করতে পেরেছি। পেরেছি বলে আমাদের অস্তিত্ব আজ পৃথিবী ব্যাপী স্বীকৃত হয়েছে। পেরেছি বলে পিয়ার্সন, এণ্ডরুজ, ম্লেড ইত্যাদি আজ আমাদের রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর শিষ্য শিষ্যা। আজ গান্ধীর জীবনী লিখ্‌ছেন ফরাসী মনীষী শ্রেষ্ঠ রোঁমা রোঁলা, রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ করছেন টমসন। এই দেওয়া নেওয়ার উপরই ভবিষ্যতের সুসামঞ্জস্যময় সুন্দরতম পৃথিবীর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হ'বে। রবীন্দ্র পরবর্ত্তী তরুণ লেখকদের লেখায় এই সাফল্যের বীজ নিহিত আছে বলেই আমি এত আশান্বিত। আমার যুগের মানুষ, আমার সব কিছু, এঁদের লেখায় রূপায়িত হচ্ছে—এঁদের লেখায় আমার যুগ স্মরণীয় হ'য়ে থাকছে; এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আমার জন্য আর কি হ'তে পারে?

এঁদের লেখাকে উপেক্ষা করে এঁরা এখনো সর্বকালের ও সর্বদেশের চিরন্তনবাণী শুনাতে পারেনি বলে অভিশাপ হানবার ধৃষ্টতা আমার নেই। কারণ, আমি জানি, সেক্সপীয়র গ্যেটে রবীন্দ্রনাথ মৌসুমী ফুল নয়। প্রতিভার জন্ম দৈবের হাতে যে দৈবের উপর কোন কালের, কোন মানুষের হাতে নেই।*

---

* রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রকে আধুনিক লেখকদের থেকে বিচ্ছিন্ন দেখবার সময় এখনো আসেনি। "শেষের কবিতা" ও "শেষ প্রশ্নের" চেয়ে আধুনিকতম কোন বই বাংলা সাহিত্যে এখনও লিখিত হয়নি।

কার্ত্তিক, ১৩৪১

মুসলমান কথা-সাহিত্যের গতি ও পরিণতি

মানুষের এক বড় সৃষ্টি তার সাহিত্য---তার বৈচিত্র্যময় জীবনের অনন্ত-ধারা দিয়ে মানুষ সাহিত্যের নানা শাখাকে নানা রসে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। যুগ যুগ ধরে মানুষের এই অন্তর-জীবনের সাধনা চলেছে—এ সাধনার শেষ নেই, এর চরম বিকাশ নেই। মানুষের মনোরাজ্যের লীলাখেলা কল্পলোকের বিচিত্র সুরধুনী হয়েছে---সাহিত্য-সৃষ্টির গোড়া। মানুষের চিন্তা-রাজ্যের এই জয়যাত্রা রুদ্ধ হ'তে পারে না---যেখানে যে মানুষের মধ্যে এই চিন্তার স্রোত রুদ্ধ হয়ে এসেছে, সেখানে তার জীবনও স্থবির হয়ে গেছে। গতিহীন যে, সে ত সম্মুখে অগ্রসর হ'তে পারে না---তার অকাল মৃত্যু অনিবার্য্য। সাহিত্যিকের মস্তিষ্ক জাতির শক্তি-উৎস বা Power House—সাহিত্যিক চিন্তার তড়িৎ--রেখায় জাতির পথ নির্দ্দেশ করেন। ইঞ্জিনের বাষ্প যেমন ট্রেনের বিরাট দেহকে টেনে নিয়ে যায়---সে রকম মানুষের ভিতরের চিন্তাশক্তি তার বাহিরের দেহকে ঠেলে নিয়ে যায়। যেখানে আগুন নিভে গিয়েছে বা চিন্তা রুদ্ধ হ'য়ে এসেছে---সেখানে ট্রেন বন্ধ---জাতির পথ রুদ্ধ। এই যে চিন্তার নব নব খেলা---মানুষের জীবনের বৈচিত্রময় বিকাশ---তা সব চাইতে পরিণতি পেয়েছে কথা-সাহিত্যে—তাই কথা-সাহিত্য আজ বিশ্ব-সাহিত্যের সর্বপ্রধান অংশ। সাহিত্যের এ অদরকারী ভাগ যতখানি মানুষের চিত্তে স্থান পেয়েছে---সাহিত্যের অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় শাখাগুলি ততখানি স্থান পায় নি। তার একমাত্র কারণ, আমার মনে হয়, কথা-সাহিত্যের মত সাহিত্যের অন্য কোন বিভাগে মানুষের চিন্তা এমন বল্গা-হারা মুক্তি পায়নি ব'লে তার সুখ-দুঃখের হাসি-অশ্রুময় মূর্ত্তি আর কোথাও এমন মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠেনি ব'লে। নর-নারীর জীবনের সকল স্তরের মনোবৃত্তি---তার অন্তর-রাজ্যের লীলাখেলা আর কোথাও এমন প্রতিবিম্বিত হ'য়ে ওঠেনি।

ইতিহাস তা'কে অতীতের সংবাদ দিতে পারে, ভূগোল তা'কে নানান্ দেশের বিবরণ জানাতে পারে, বিজ্ঞান তা'কে আজগুবী জিনিষ দেখাতে পারে, কিন্তু তা'র অন্তরের ঘাত-প্রতিঘাত—তা'র আশা-আকাঙ্খার লীলাখেলা ত সেখানে ফুটে উঠেনি। মানব জীবনের সুখ দুঃখ হাসি-অশ্রুর আলোছায়াময় অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ত আর কোথাও মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠেনি। তাই সে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞানের দিকে প্রয়োজনের খাতিরে যতখানি যায় তা'র অন্তরের আনন্দে ততখানি যায় না। অবশ্য কোন বিশেষ মানুষ যে কোন বিশেষ বিষয়ে আনন্দ পায় না তা বল্‌ছি নে। কিন্তু বেশীর ভাগ মানুষের জন্য আমাদের আগের কথাই সত্য। কিন্তু এ অভাব পূরণ করে কথা-সাহিত্য। তাই আজ কথা-সাহিত্য সব চাইতে বেশী আদৃত এবং শক্তিশালী। টলষ্টয় প্রমুখ কথা-সাহিত্যিকের কলমের খোঁচায় রুশের জনশক্তি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, 'Uncle Toms Cabin' আমেরিকার তৎকালীন দাস-ব্যবসায়কে উৎপাটন কর্‌তে কতখানি সাহায্য করেছে তা' ইতিহাস পাঠকের অজ্ঞাত নয়। আমাদের দেশের অমর কথা-সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' বাংলার হিন্দু সমাজে স্বাদেশিকতার বন্যা বইয়ে দিয়েছে। আজ রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের কথা-সাহিত্য বাঙ্গালী হিন্দুর ধর্ম্ম-চেতনাও সমাজ-জীবনে ওলট-পালট এনেছে।

কথা-সাহিত্য মানুষের অন্তর-রাজ্যের ইতিহাস---কাজেই এর প্রভাবও মানুষের অন্তরে বেশী গিয়ে পড়ে। নর-নারীর চির-রহস্যময় সম্বন্ধ তাঁদের অন্তরের ঘাত প্রতিঘাতের বিশ্লেষণ-কথা-সাহিত্যের প্রধান বিষয়বস্তু। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্য ধর্ম্ম' প্রবন্ধে লিখেছেন--- "স্ত্রী-পুরুষের মিলন আহার-ব্যাপারের উপরের কোঠায়, কেননা ওর সঙ্গে মনের মিলনের নিবিড় যোগ। জীবধর্ম্মের মূল প্রয়োজনের দিক থেকে এ'টা গৌণ, কিন্তু মানুষের জীবনে তা' মুখ্যকে বহু দূর ছাড়িয়ে গেছে। প্রেমের মিলন আমাদের অন্তর বাহিরকে নিবিড় চৈতন্যের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত ক'রে তোলে। বংশরক্ষার মুখ্য তত্ত্বটুকুতে সেই দীপ্তি নেই।....তাই কাব্যে ও সকল প্রকার কলায় সে এতটা জায়গা জুড়ে বসেছে।"

কথা-সাহিত্যকে বর্ত্তমানে দু'ভাগে ভাগ করা হ'য়ে থাকে—Realistic ও Idealistic. Idealistic তথা আদর্শবাদী সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য আদর্শ-স্থষ্টি করা হলেও তা বাস্তবতাকে ছাড়িয়ে যে'তে পারে না—কাজেই Idealistic সাহিত্যও Realism-কে বাদ দিয়ে চলতে পারে না। অবাস্তব আজগুবী জিনিষ যতই উচচ আদর্শের হউক না কেন তা মানুষের অন্তরে অনুভূতির স্থষ্টি করে না। আদর্শবাদী যদি তা'র আদর্শের কল্পনায় বাস্তবকে অবজ্ঞা করেন তা'তে তাঁর স্থষ্টি ব্যর্থ হ'য়ে যায়। আরব্যোপন্যাস মানুষকে আনন্দ দিতে পারে—মানুষের অন্তরে বিস্ময় উৎপাদন কর্‌তে পারে, কিন্তু অন্তরে অনুভূতির স্থষ্টি কর্‌তে পারে না। Realistic সাহিত্যিক তাঁ'র নিষ্করুণ তুলিকায় সমাজের বাস্তব জীবনকে পাঠকের সম্মুখে রূঢ়ভাবে খুলে ধরেন—ভাল-মন্দের বক্তৃতা করবার অবসর তাঁ'র নেই—পাঠক নিজের অন্তর দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে তাঁ'ক বিচার করে নেবেন। তিনি শুধু চিন্তার তড়িৎ-রেখায় পাঠকের সুপ্ত চিন্তার রুদ্ধ দ্বারে ঘা দিয়ে যাবেন। কথা-সাহিত্যের লেখক যেখানে বাস্তবকে ছাড়িয়ে বক্তৃতা আরম্ভ করেন সেখানে তিনি আর্টকে জবে' ত করেন-ই—সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের অন্তরের দ্বারকেও রুদ্ধ করে দেন—এতে কথা-সাহিত্যের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হ'য়ে যায়। শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' বাংলার একটী হিন্দু-পল্লীর হুবহু চিত্র—পল্লীর বাস্তব জীবনকে তিনি পাঠকের সম্মুখে খুলে ধরেই ক্ষান্ত হয়েছেন—চিত্রটীর প্রতি প্রথম নজরেই ভালমন্দ ঠিক ক'রে নিতে পাঠকের একটুও বেগ পেতে হয় না। আদর্শকে আমি বাদ দিতে বলছি নে বা ছোট কর্‌ছি নে—আমার কথা হ'চ্ছে আদর্শ বাস্তবের অবলম্বনেই বেড়ে উঠবে—তা'র আধার খোঁজবার জন্যে স্বর্গে যেতে হ'বে না—এই ধরণীর ধূলা-মাটির দোষে গুণে রক্তমাংসের জীবই চাই—তা'হলে পাঠকের চিনে নিতে কষ্ট হয় না—ধর্‌তে বেগ পেতে হয় না। রবীন্দ্রনাথের গোরা, শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত, রাজলক্ষী (শ্রীকান্ত); সুরেশ, সাবিত্রী (চরিত্রহীন); এরা এক একটী বড় বড় আদর্শের প্রবর্ত্তনা—কিন্তু শিল্পী রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের হাতে পড়ে এরা কেউ তা'দের মানবত্ব হারায়নি; এ'দের চিনে নিতে কা'রও

কষ্ট হয় না---এরা পাঠকের মতই রক্তমাংসের দোষে-গুণে মানুষ।

এখন দেখা যাক্ মুসলমান সাহিত্য কথা-সাহিত্যের দিক দিয়ে কতখানি উন্নতিলাভ করেছে। আধুনিক মুসলমানের সর্বাঙ্গীন দুরবস্থার সঙ্গে সঙ্গে তা'র সাহিত্যেরও দুরবস্থা হয়েছে সত্য, কিন্তু এককালে মুসলমান সাহিত্য খুব বিরাট জিনিষ ছিল---সে অতীত সাহিত্যের উপর ভর দিয়ে আজও মুসলমান জগতের বিভিন্ন সভ্যতার পাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বিশ্ব-সাহিত্যে মুসলমানের অতীত দান বড় কম নয়---ইতিহাস, কাব্য, ভূগোল, অঙ্ক, জ্যামিতি, বীজগণিত, ভ্রমণ, চিকিৎসা শাস্ত্র প্রভৃতি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মুসলমান তা'র হক্ আদায় করে গেছে। কিন্তু এ বিরাট সৃষ্টির মধ্যে অতি তাজ্জবের সঙ্গে একটি জিনিষ লক্ষ্য কর্‌বার আছে---এই সাড়ে তের শত বৎসরের মধ্যে আমাদের উল্লেখযোগ্য কথা-সাহিত্য গড়ে ওঠে নি। তবে এ কথা বলা যেতে পারে যে বর্ত্তমানে কথা-সাহিত্য বল্‌তে যা বুঝায় তা খুব প্রাচীনকালের জিনিষ নয়--তবে এ কথাও সত্য যে, এ কথা-সাহিত্য একেবারে বিংশ-শতাব্দীর জিনিষও নয় (অবশ্য আমাদের দেশে তা'র বয়স খুব কম)। কয়েক শত বৎসর আগে থেকেই কথা-সাহিত্য চলেছে এবং আধুনিককালে তা' খুব বেশী ক'রে পরিণতি পেয়েছে। আধুনিককালে কথা-সাহিত্যে কোন মুসলমান কৃতিত্ব লাভ করেছেন ব'লে শুনি নি। প্রাচীনকাল থেকে আমাদের সাহিত্যে গল্পের অভাব নেই, বরং বিশ্বসাহিত্যের অনেক শ্রেষ্ঠ গল্প মুসলমানের দান। কিন্তু সে গল্প আর কথা-সাহিত্যে ঢের তফাৎ। 'আরব্যোপন্যাস', 'এখ্‌ওয়ানুস্‌সাফা', 'কালিলা দমনা' এবং পরবর্তী আরবী লেখকদের 'মকামা' প্রভৃতি আরবী গল্প-পুস্তক পৃথিবীর সব সাহিত্যের গৌরবের বস্তু হ'তে পারে। কিন্তু এগুলি কিছুতেই কথা-সাহিত্যের স্থান পূরণ কর্‌তে পারে না। এগুলি অত্যাশ্চর্য্য ঘটনার বৈচিত্রময় জটিলতায় মানুষের কল্পনায় ধাঁ ধাঁ লাগাতে পারে, আনন্দ দিতে পারে, কিন্তু কথা-সাহিত্যের মত প্রাণে অনুভূতির সৃষ্টি কর্‌তে পারে না---অনুপ্রেরণা জোগাতে পারে না। তা'র ভিতর সে যুগের মানব-মনের জোয়ার-ভাটা প্রতিফলিত হ'য়ে ওঠে নি।

আরবী, পার্শী, উর্দ্দু, বাংলা সব সাহিত্যে এ রকম তাজ্জবজনক গল্পের অভাব নেই---কিন্তু অভাব র'য়ে গেছে কথা-সাহিত্যের। অন্যান্য দেশের মুসলমান-সাহিত্যের (মুসলমান-সাহিত্য অর্থে আমি মুসলমানের সৃষ্ট সাহিত্য মনে কর্‌ছি) বিশেষ সংবাদ জানা নেই--যত দূর জানা আছে তা'তে মনে হয় বর্ত্তমানে মিসরে আরবী-সাহিত্য এবং হিন্দুস্থানে উর্দ্দু-সাহিত্য স্থানীয় মুসলমানদের দ্বারা খুব উন্নতি লাভ কর্‌ছে—ইতিহাস, ধর্ম্ম-পুস্তক, জীবনী-সাহিত্য, কাব্য, অনুবাদ প্রভৃতি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় আরবী ও উর্দ্দু সাহিত্য ভরপূর হ'য়ে উঠেছে, কিন্তু সে সব সাহিত্যের বিশেষ করিয়া কথা-সাহিত্যের খ্যাতি সে দেশের সীমা ছাড়িয়ে আমাদের কানে এসে পৌঁছয় নি যেমন করে আমাদের দেশের কথা-সাহিত্যিক বঙ্কিম, শরৎচন্দ্রের খ্যাতি আমাদের দেশের সীমা ছাড়িয়ে তা'দের দেশে পৌঁছেছে। মুসলমানেরা কথা-সাহিত্য লিখ্‌ছে না বল্লে মিথ্যা বলা হ'বে--বর্ত্তমানে আরবী, উর্দ্দুতে ঢের ঢের গল্প, উপন্যাস লেখা হচ্ছে, কিন্তু কথা হচ্ছে, সৃষ্টি এবং রচনার দিক্ দিয়ে সেগুলি উচচ মানের হচ্ছে না। হয়'ত বলা যেতে পারে যুগ-প্রবর্ত্তক মৌলিক-প্রতিভা নিয়ে শক্তিশালী সাহিত্য-স্রষ্টা জন্মগ্রহণ করেনি ব'লে এ দশা হয়েছে। এর উত্তরে এ কথা বল্লে বোধ হয় ভুল হ'বে না যে, সমাজের দৈনন্দিন জীবনকে সত্য-মূর্ত্তি দান কর্‌তে—তা'র বর্ত্তমানকে খুলে ধর্‌তে যুগ-প্রবর্ত্তক প্রতিভা না হ'লেও চলে। নূতন সৃষ্টি নাই বা হ'ল, কিন্তু বর্ত্তমান মুসলমানের বাস্তব জীবন-যাত্রাকে সত্য-মূর্ত্তি দিতে কোন আপত্তি নেই। বাঙ্গালী হিন্দু সমাজের কথা-সাহিত্যে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎ এঁরা যুগ-প্রবর্ত্তক সাহিত্যিক, কিন্তু এঁদের থেকে ঢের ঢের কম প্রতিভার আরও কত সাহিত্যিক আছেন যাঁ'রা কথা-সাহিত্য সৃষ্টিতে কৃতকার্য্য হয়েছেন---বাঙ্গালী হিন্দু-সমাজকে কথায় ফুটিয়ে তুলেছেন---চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, নিরুপমা দেবী, অনুরূপা দেবী, নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, নরেশ সেন, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় আরও কত নাম বলা যেতে পারে, যাঁ'রা হিন্দুর সমাজ-জীবনকে, জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। বিরাট মুসলমান সমাজে কি এ রকম প্রতিভার লোকও

নেই—তা' ত মনে হয় না। তথাপি মুসলমান সমাজে এ রকম কথা-সাহিত্যিকেরও জন্ম হচ্ছে না কেন? অনেকে বল্‌বেন মুসলমানরা সমগ্রভাবে যথোপযুক্ত উচচ-শিক্ষা ও culture পাচ্ছে না ব'লে। সাহিত্য স্বষ্টির জন্য উচচ-ডিগ্রী-শিক্ষার চাইতে জীবনের অভিজ্ঞতা, সমাজ জীবন-অধ্যয়ন ও সুষ্ঠু কল্পনা-শক্তিই বেশী দরকার। অনেকেই জানেন হিন্দু সমাজে অনেক বড় বড় সাহিত্যিকের উচচ-শিক্ষায় বিশেষ কোন খ্যাতি নেই—তাঁ'দের জীবনের বিরাট অভিজ্ঞতাই তাঁ'দের সাহিত্য-স্বষ্টিকে সার্থক করে তুলেছে। শরৎ বাবুর 'শ্রীকান্ত' 'চরিত্রহীন'কে অনেকে খানিকটা আত্মজীবনীও ব'লে থাকেন।

আমার মনে হয় মুসলমানদের কথা-সাহিত্য স্বষ্টিতে অকৃতকার্য্যতার প্রধান কারণ, মুসলমান সাহিত্যিকেরা সমাজের সর্বাঙ্গীন জীবনকে জান্‌তে পার্‌ছেন না ব'লে। আগেই একবার বলেছি নর-নারীর চির-রহস্যময় সম্বন্ধই কথা-সাহিত্যের বেশীর ভাগ মাল-মশলা জুগিয়ে থাকে। নরনারীর সম্বন্ধ ছাড়া কথা-সাহিত্য একেবারে হ'তে পারে না তা বল্‌ছিনে —বরং ইউরোপের একজন বড় সাহিত্য সমালোচক বলেছেন,—"There is little in life which may not be made theme for literature", কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে নর-নারীর এই বিচিত্র সম্বন্ধ চিরদিন মানুষের মনে কৌতূহলের স্বষ্টি করেছে—বিশ্ব-স্বষ্টির এই সর্বপ্রধান রহস্য কৌতূহলী মন চিরদিন আলোচনা করে এসেছে। নর-নারীর মনস্তত্ত্ব কথা-সাহিত্যের বিষয় না হ'য়ে পারেনি।

"...The novel owes its existence to the interest which men and women everywhere and at all times have taken in men and women and in the great panorama of human passion and action. This interest...has always been one of the most general and most powerful of the impulses behin the literature, and it has thus given rise, according to changing social and artistic circumstances to various modes of expression—here to epic and there to drama, now to ballad and now to romance. Latest to develop all these modes, the novel is also the largest and fullest of them."*

* **Henry Hudson.**

মনস্তত্ত্বের সঠিক আলোচনার জন্য নর-নারীর জীবন সম্বন্ধে গভীর অধ্যয়ন থাকা দরকার, বয়স ও ঘটনার ক্রম-পরিবর্ত্তনে নর-নারীর মনোবৃত্তি কখন কিভাবে বিকাশ পাচ্ছে, তা'র সম্বন্ধে সূক্ষ্ম জ্ঞান থাকা আবশ্যক। শুধু পুরুষের বা শুধু নারীর জীবন সম্বন্ধে জ্ঞান থাক্‌লে সাহিত্য-সৃষ্টি সার্থক হ'তে পারে না---উভয়ের সম্মিলিত জীবন নিয়ে সমাজ---সেই সম্মিলিত জীবনের প্রকাশই উচচাঙ্গের সাহিত্য। এই যে মানব-জীবনকে প্রকাশ করা---তা'র জন্যে কি মানুষের ভিতর বাহিরের সমস্ত খবর রাখা আবশ্যক নয়? অনেক সময় সাহিত্যিক তাঁর সৃষ্টির ভিতর দিয়ে তাঁ'র নিজের ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করেন সত্য, কিন্তু তাঁ'র ভিতর দিয়ে শুধু তাঁ'র নিজের মনোবৃত্তির কথা বল্লে হ'বে না---বিশ্বের নরনারীর মনোবৃত্তি এবং তা'দের বাস্তব-জীবনও সেই সুরে জুড়ে দিতে হ'বে---না হয় তাঁ'র সৃষ্টি মানুষের প্রাণে বেঁচে থাক্‌বে না। সাহিত্যিকের পারিপার্শ্বিক তাঁর ভিতর দিয়ে কথা ব'লে উঠ্‌বে---তা'দের অপ্রকাশ-জীবন তাঁ'র ভিতর দিয়ে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠবে। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের বহিঃপ্রকাশ তার সাহিত্য বল্লে একেবারে ভুল বলা হয় না---তাই অনেকের জীবন-কথা না জান্‌লে তাঁদের সাহিত্য বুঝাই মুশ্‌কিল হয়ে পড়ে— Goethe ও Danteর জীবনের ইতিহাস না জান্‌লে তাঁদের লেখার প্রাণ খুঁজে পাওয়াই মুশ্‌কিল---Goethe এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'His works were but fragments of a great personal confession ---এ কথা ত Goethe নিজেই বলে গিয়েছেন।

জীবনকে প্রকাশের জন্য চাই মানুষের জীবন সম্বন্ধে গভীর পরিচয়। এখন বিবেচনা করে দেখতে হবে আমরা মুসলমানেরা মানব-জীবন সম্বন্ধে কতখানি পরিচয় পাচ্ছি। আমাদের সমাজের পুরুষেরা নারীর জীবন সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ। নারীরা পুরুষের জীবন সম্বন্ধে ততোধিক অজ্ঞ। গোটা কয়েক রক্ত সম্পর্কের নিকট-আত্মীয়ের সঙ্গে ছাড়া কারও সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করবার অধিকার নেই। এ দু'চার জন মাত্র নর-নারীর জীবনে বিভিন্ন মানব মনের বিচিত্র মনোবৃত্তির বিকাশ আশা করা কি ঘরে বসে ভূ-প্রদক্ষিণ করার মতই নয়? দেশের ও সমাজের সমস্ত চিন্তা-ধারা, সমস্ত সমস্যা, বাস্তবতা একটি বা দু'তিনটি

পরিবারের মধ্যে দেখ্‌তে পাবার আশা করা নিছক আহাম্মকী ছাড়া আর কি? বিভিন্ন পরিবারে বিভিন্ন অবস্থা, বিভিন্ন শিক্ষা-দীক্ষা ও বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে নারীর জীবন কি ভাবে অতিবাহিত হচ্ছে---কি ভাবে তার মনোবৃত্তির বিকাশ হচ্ছে তা পুরুষের জানবার সাধ্য নেই,---সেই রকম পুরুষের জীবন সম্বন্ধেও নারীর জানবার ক্ষমতা নেই, তাই হয় আমাদের সাহিত্য অস্বাভাবিক, অবাস্তব হয়ে উঠ্‌ছে অথবা যে সমাজের নর-নারীকে আমরা দেখবার সুযোগ পাচ্ছি---জানবার সুবিধে পাচ্ছি, মুসলমান নামের ছদ্মবেশে তারাই আমাদের সাহিত্যে ফুটে উঠ্‌ছে?

বিদেশের কথা বলে প্রবন্ধকে ভারাক্রান্ত করে তুলব না। বাংলা দেশের কথাই বল্‌ছি, বাংলার কোন মুসলমান পুরুষকে যদি বাঙ্গালী মুসলমান নারীর সম্বন্ধে বলতে বলা হয়, তা হ'লে তাঁকে ফিরে তাকাতে হয় তাঁর পরিবারে দু' একটি নারীর জীবন-যাত্রার দিকে। ঠিক সেই রকম নারীকে যদি পুরুষ সম্বন্ধে বলতে বলা হয়, তা' হলে তাঁকেও ফিরে তাকাতে হয় তাঁর নিকট-আত্মীয় দু'একটি পুরুষের জীবনের দিকে। বিশাল বাংলার মুসলমান নারীর বিচিত্র জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে--তাদের আশা-আকাঙ্খা, তাদের সমস্যা-সমাধান সম্বন্ধে কারও জানবার উপায় নেই। এই নিরুপায়ের মধ্যে প'ড়ে মুসলমান সাহিত্য একেবারে পঙ্গু হয়ে পড়েছে। সাহিত্য যে মানুষের জীবনেরই সমালোচনা---Mathew Arnold বলেছেন, 'Literature is a criticism of life' অজানা জিনিষ সম্বন্ধে সমালোচনা করতে যাওয়া কি বাতুলতা নয়? আজ পরের মুখে ঝাল খাওয়াই হয়েছে আমাদের সাহিত্য স্বষ্টি! বহুদিন আগে থেকে মুসলমানেরা বাংলা ভাষার সাধনা আরম্ভ করেছে, কিন্তু সে সাধনা এখনও কোনদিকে সার্থক হয়ে ওঠেনি, প্রাচীন কালের পুঁথি-সাহিত্য হয় ত সে কালের খুব উপযোগী ছিল, কিন্তু একালের কথা-সাহিত্যের পাশে সেগুলি দাঁড়াতে পারে না। আধুনিক মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা কথা-সাহিত্য রচনায় হাত দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে কেউই কৃতকার্য্যতা লাভ করেন নি। মুসলমান-বাংলার সত্যিকার চিত্র কেউই সঠিকভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেননি---মুসলমানের আশা-আকাঙ্খা---তার বর্ত্তমান জীবন--যাত্রা--

সমস্যা---সামাজিক অবস্থা—কারও লেখনী মুখে ফুটে উঠেছে বলে মনে হয় না। যুগসন্ধিক্ষণে বাঙালী মুসলমানের মনের Struggle---তার অন্তরের ভাব-রাজ্যের জোয়ার-ভাটা বাংলা সাহিত্যে প্রতিভাত হয়নি, এর জন্যে সাহিত্যিকদের দোষ দেওয়া যায় না---তাঁরা সমগ্র সমাজকে জানবার সুযোগ পাচ্ছে না---তাঁরা যা জান্‌ছেন তা বাইরের সু-উচ্চ প্রাচীর দেখে ভিতরের কয়েদীদের অবস্থা জানার মতই। তার ভিতরের মানুষগুলি কেমন ভাবে জীবন যাত্রা করছে---তাদের মনে কি কি আশা-আকাঙ্খা ও সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে---তা ত জানবার সুযোগ নেই। বাংলার মুসলমান সাহিত্যিকের জন্য মুসলমান সমাজের কল্পলোকের রঙমহল আজ তালাবন্দী, তাই আমাদের দ্বারা যথার্থ সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে না---যা হচ্ছে তা হয় অসম্ভব কল্পনা অথবা পরানুকরণ।

মুসলমান-লিখিত সব উপন্যাসগুলি পড়ে দেখলে আমার কথার সত্যতা উপলব্ধি হবে। সেদিন মৌলভী একরামদ্দীন সাহেবের 'সওগাতে' ধারাবাহিক প্রকাশিত উপন্যাস 'জীবন পণ' পড়ছিলাম---ভদ্র গৃহস্থের সদ্য-বিবাহিতা কন্যার অপূর্ব সাহস--- Portiaর মত অসঙ্কোচে আদালতে জবানবন্দী দান---অজানা হিন্দু মোক্তারের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক—একলা ট্রেনে যত্রতত্র ভ্রমণ---আমরা বিস্মিত হচ্ছিলাম লেখকের বাহাদুরী দেখে। পাশের এক বন্ধু বলে উঠলেন,---'এ ত মুসলমান সমাজের মেয়ে নয়!' সত্যই ভেবে দেখলাম এ রকম up to date মেয়ে ত মুসলমান সমাজে নজরে পড়ে না---আজন্ম পর্দ্দার অন্তরালে বদ্ধিতা নারীর পক্ষে এ যে অসম্ভব! এ চিত্র ব্রাহ্ম অথবা খৃষ্টান সমাজের হ'লে মানাত ভাল! অসম্ভব আকাশ-কুসুম প্রেমের কাহিনীতে আজ আমাদের সাহিত্য ভ'রে উঠেছে---নরনারীর যেই দেখা---যেই চারি চক্ষুর মিলন অমনি গভীর প্রেমে পতন—Love at first sight —তারপর নায়ক-নায়িকার সম্ভব অসম্ভব ত্যাগে এ প্রেমকে আর দুনিয়ার রক্ত-মাংসের মানব-মানবীর প্রেম রাখে না---তাকে একেবারে 'স্বর্গীয়' ক'রে তোলে। দুনিয়ার পাঠকের মনে তথাকথিত 'স্বর্গীয়' প্রেমের প্রভাব কতখানি, তা ভাববার বিষয়। তথাকথিত 'স্বর্গীয়' প্রেমমূলক গল্প সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) মহাশয় সেদিন তাঁর

স্বভাব-সুন্দর বীরবলী ভাষায় বলেছেন---"এ গল্প আগা গোড়া আর্ট। সে ত গল্প নয়, নায়ক-নায়িকার হৃৎপিণ্ড নিয়ে অপূর্ব Ping-pong খেলা। সে হৃৎপিণ্ড দু'টি এক মুহূর্ত্তের জন্যও পৃথিবী স্পর্শ করেনি, বরাবর শূন্যেই ঝুলে ছিল---সূর্য্য, চন্দ্র, যেমন আকাশে আকাশে ঝুলে থাকে পরস্পরের প্রেমের টানে। শেষে এ প্রেমের খেলার ফল হয় Draw."

একরামদ্দীন সাহেবের 'কাচ ও মণি' উপন্যাস হিসাবে খুব ভাল হয়েছে বলে অনেকেই বলেছেন---যারা 'কাচ ও মণি' পড়েছেন তাঁরা জানেন---তার নায়ক-নায়িকা মুসলমান সমাজ থেকে গ্রহণ করা হয়নি। গ্রন্থকার হয় ত মুসলমান নায়ক-নায়িকা বাদ দিয়ে এখানে বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন---এ না কর্‌লে চিত্রগুলিকে এমন ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয় ত তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। কারণ যে সমাজ থেকে তিনি নায়ক-নায়িকা নিয়েছেন তাঁদেরে জানবার ও দেখবার সুযোগ হয়, কিন্তু ঐ রকম অবস্থার মুসলমান মেয়ের অঞ্চলাগ্রভাগ দেখাও সম্ভব নয়; কাজেই তাঁর 'জীবন-পর্ণে'র মত 'কাচ ও মণি'ও অসম্ভব হয়ে উঠবার আশঙ্কা ছিল। তিনি 'জীবন-পর্ণে'ও নায়িকার নাম বদলে দিলে বোধ হয় ভালই করতেন।

শাহাদৎ হোসেন সাহেব সমাজের বাস্তব জীবনকে বাদ দিয়ে অন্য জিনিষের উপর জোর দিতে গিয়ে তাঁর সব লেখাগুলাকে অস্বাভাবিক ক'রে তুলেছেন। গোলাম মোস্তফা সাহেবের নায়িকাগুলি নামান্তরে স্কুলে-পড়া ব্রাহ্ম মেয়ে বই নয়। পরলোকগত নজিবর রহমান সাহেবের 'আনোয়ারা' সমাজের এক শ্রেণীর পাঠকের কাছে খুব আদৃত হয়েছে, কিন্তু এখানেও দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় আনোয়ারা চরিত্রকে তিনি যত বড় করেই সৃষ্টি করুন না কেন---ঐটী কিন্তু মুসলমান সমাজের বাস্তব চিত্র নয়। বইতে পড়া অন্য সমাজের মেয়েকে তিনি মুসলমান সমাজের আদর্শ-মেয়ে সৃষ্টি কর্‌তে প্রয়াস পেয়েছেন---কিন্তু আদর্শকে তিনি মুসলমান সমাজ থেকে গ্রহণ করেননি বা গ্রহণ করবার সুযোগ পান্‌নি। আনোয়ারাতে অনেক অস্বাভাবিকতা আছে, তা ছৈয়দ এমদাদ আলী প্রমুখ সাহিত্যিকেরা দেখিয়েছেন---আনোয়ারা শিক্ষিত হিন্দু পরিবারের মেয়ে হ'লে খাপ খেতো ভাল। সমালোচকের চোখ

দিয়ে যাঁরা আনোয়ারা পড়েছেন, তাঁরা জানেন স্বর্গীয় গ্রন্থকার আনোয়ার' চরিত্রের আদর্শ নিয়েছেন সীতা, সাবিত্রী থেকে—মুসলমান সমাজ ব' মুসলমান ইতিহাস থেকে গ্রহণ করা হয় নি---তাই আনোয়ারাকে বাস্তব সমাজে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না---আনোয়ারা কল্পনার সামগ্রী, বাস্তবের নয়। আদর্শের দিক্ দিয়ে দেখ্‌তে গেলেও আনোয়ারা মুসলমান-নারীর আদর্শ হতে পারে কিনা সন্দেহ---স্বামী ছাড়া আনোয়ারার নিজের কোন ব্যক্তিত্ব নেই---অন্য কোন সত্ত্বা নেই---আদর্শ মুসলমান নারী স্বামী-ভক্তির নামে স্বামীর পদতলে নিজের ব্যক্তিত্বকে, আপনার স্বতন্ত্র সত্ত্বাকে বিসর্জ্জন দেবেন এ আমাদের কল্পনায় আসে না। স্বামীগত প্রাণা আনোয়ারার স্বামী-ভক্তি আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে, কিন্তু আদর্শ মুসলমান নারী বল্‌তে অন্তরে ত্যাগ-কল্যাণের ফল্গু-ধারা নিয়ে যে দৃঢ়, পূর্ণাঙ্গ, বলিষ্ঠা, ধর্ম্মিষ্ঠা নারীর উজ্জ্বল চিত্র আমাদের সম্মুখে ভেসে ওঠে তা' আনোয়ারাতে কই? এ অভাবের জন্য লেখককে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না---সমাজের বর্ত্তমান অবস্থাই এর জন্য বেশী দায়ী। তিনি যদি সমাজ-জীবনকে জান্‌তে পার্‌তেন—আনোয়ারার মত অবস্থার, মুসলমান নারীকে দেখার, জানার সুযোগ পেতেন, তা'হলে আমাদের মনে হয় আনোয়ারা তাঁর হাতে আদর্শ হয়ে না ওঠলেও বাস্তব হয়ে চিত্রিত হতে পার্‌ত।

সমাজের নর-নারীর সত্যিকার মূর্ত্তি জানার অভাবে শক্তিশালী লেখকদের হাতে পড়েও সাহিত্য অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে এর দৃষ্টান্ত বিরল নয়। নজরুল ইসলামের 'বাঁধন হারা'র চমৎকার ভাষা ও রচনাভঙ্গী আমাদের মুগ্ধ করে, কিন্তু চরিত্রগুলি একটিও মুসলমান সমাজের নয়—তারা সব ছদ্ম-নামে উচচ-শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে, তাদের হাবভাব, কথা-বার্ত্তা, শিক্ষা-দীক্ষা, আমাদের প্রতিবেশী ব্রাহ্ম-পরিবারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়---রাবেয়া, সোফিয়া বই-এর বাইরে সমাজে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। আমাদের সমাজের নারীদের আমরা জান্‌তে পারিনি বলে তাদের চিত্র আঁকতে গিয়ে আঁকা হয় যাদের আমরা সাহিত্যের ভিতর দিয়ে অথবা নিজেদের চোখ কান দিয়ে জান্‌বার সুযোগ পাচ্ছি তাদের চিত্র---এতে তাজ্জব হবার কিছু নেই। আমাদের

কথা-সাহিত্যে কত যে অস্বাভাবিকতা ঢুকেছে, তা' এখানে বলে খতম করা যাবে না। আমাদের সাহিত্যিকেরা সব শিক্ষিত মেয়ের পক্ষপাতী, সমাজে থাক্ বা না থাক্, তাতে কিছু এসে যায় না ---নায়িকার কিন্তু চিঠি-পত্র লিখ্‌তে জানা চাই! উপন্যাসের শতকরা এক শত জন নায়িকাই শিক্ষিতা---কিন্তু কল্পনার বাইরে বাস্তব জীবনে শিক্ষিতা মেয়ে শতকরা একজনও না। এর একমাত্র ব্যতিক্রম দেখেছি কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের 'নদীবক্ষে'। তার কথা পরে বল্‌ছি।

আর প্রায় উপন্যাসে দেখা যায় স্বামী স্ত্রী পরস্পর নাম ধরে ডাকাডাকি কর্‌ছে---এ যে কত বড় মিথ্যা এবং অসম্ভব, তা' যাঁরা মুসলমান সমাজকে বিন্দুমাত্রও জানেন, তাঁদের আর নূতন করে বলে দিতে হবে না। বিশাল মোস্‌লেম-বাংলায় স্বামী-স্ত্রী নাম ধরে ডাকাডাকি করে এ-রকম দু'একটা পরিবারও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

এই সব অবাস্তবতার একমাত্র কারণ সমাজ-জীবন সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা---সমাজের অর্দ্ধভাগ আজ প্রাচীরের অন্তরালে আবদ্ধ, তাদের হাসি-অশ্রুর বেগ বাইরে কারও কানে এসে পৌঁছবার উপায় নেই, তাই তাদের চরিত্র আজ সাহিত্যে ফুটে উঠবার সুযোগ পাচ্ছে না এবং তার পরিবর্ত্তে আমাদের সাহিত্যিকরা অন্য সমাজের সাহিত্যিকদের অনুকরণ করে চলেছে। অনুকরণের যে বিপদ তা পূরামাত্রায় আমাদের সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হ'চ্ছে। আমাদের প্রতিবেশী সমাজে আমাদের চাইতে পর্দ্দা-প্রথা অনেকটা শিথিল। তাঁদের পরস্পরকে জানবার, দেখবার সুযোগ আছে, তাঁদের সাহিত্যিকরা সমাজ-জীবনকে অধ্যয়ন করবার সুবিধে পাচ্ছেন---তাই তাঁ'দের চরিত্র-সৃষ্টিতে অস্বাভাবিকতা বেশী মাত্রায় ঢুকতে পারেনি। বঙ্কিমচন্দ্রের 'ভ্রমর' 'সূর্য্যমুখী'; রবীন্দ্রনাথের 'বিনোদিনী' (চোখের বালি), আনন্দময়ী, 'সুচরিতা, 'ললিতা' (গোরা), 'বিমলা', (ঘরে-বাইরে); শরচন্দ্রের 'কিরণময়ী', 'সাবিত্রী', 'সুরবালা', (চরিত্রহীন), 'রাজলক্ষী', 'অভয়া', (শ্রীকান্ত), অনুরূপা দেবীর 'মনোরমা', 'ব্রজরাণী,' 'শরৎশশী' এরা সকলে বাঙালী হিন্দু ঘরেরই মেয়ে—এদের চিনেনিতে কারও বেগ পেতে হয় না।

এর মধ্যে কোনটি Idealistic, কোনটি Realistic সৃষ্টি; কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয়---এরা কেউ কল্পনার রথে বাস্তবতার সীমা ছাড়িয়ে যায়নি। গ্রন্থকারদের বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে কল্পনা মিশে এগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। মুসলমান-সাহিত্যে এ-রকম সৃষ্টি নাই বল্‌লেই হয়। কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের 'নদী-বক্ষে' ঔপন্যাসিক আর্ট হিসাবে খুব বড় সৃষ্টি নয়, কিন্তু এতে একটা জিনিষ পাঠককে খুব আরাম দেয়, তিনি কোথাও বাস্তবতাকে ছাড়িয়ে যাননি। একটি গরীব সরল চাষী পরিবারের কথা খুব সহজ সরলভাবে তিনি খুলে ধরেছেন, কোন চরিত্র তাদের অবস্থাকে ডিঙিয়ে যায়নি। দারিদ্রক্লিষ্ট সব চরিত্রগুলি জীবনের সুখ-দুঃখ হাসি-অশ্রু নিয়ে ফুটে উঠেছে---মেয়েরা ধান ভানে, রান্না করে, স্বামী-পুত্রকে খাইয়ে নিজে খায়, পুরুষেরা মাঠে সারাদিন হাড়-ভাঙা পরিশ্রম করে, চব্বিশ পঁচিশ বৎসরের ছেলে লালু এখনও নামাজ শেখেনি, কর্ম্মক্লান্ত বৃদ্ধ জমির শেখ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেন, গরীব নায়ক তার ভালবাসার পাত্রীকে হারিয়ে প্রেমের খাতায় দেউলিয়া নাম লিখিয়ে সন্ন্যাসী না হয়ে হৃদয়ের ব্যথাকে চেপে রেখে উদরান্নের জন্য দিন-রাত পরিশ্রম করে চলেছে। এই রকম অভাবগ্রস্ত পরিবারে যেমনটী হয় ঠিক তেমনটীই। লালু, মতি, লালুর মা, মতির মা, জমির শেখ এদের আমরা আমাদের পারিপার্শ্বিক জীবনে প্রতিদিনই দেখ্‌ছি। এখানে বলা যেতে পারে, কাজী সাহেবের হাতে এ চরিত্রগুলি বাস্তব হয়ে উঠলো কেমন করে? তার উত্তরে একমাত্র জবাব এই যে, 'নদীবক্ষে' যাদের চরিত্র স্থান পেয়েছে, তারা সমাজের খুব নিম্নস্তরের লোক---তাদের মধ্যে পর্দ্দা অবরোধ কিছুই নেই, তাদের জীবনযাত্রা সকলের সম্মুখে খোলাই রয়েছে। কাজেই এদের জীবন-অধ্যয়নে কোন রকমের প্রতিবন্ধকতা নেই। মুসলমান সাহিত্যিকরা কাজী সাহেবের মত সমাজের এই নিম্নস্তরের চরিত্র আঁকবার চেষ্টা করলে হয়ত কৃতকার্য্য হতে পার্‌তেন, কিন্তু আমাদের সাহিত্যে এখনও আভিজাত্যের মোহ যায়নি, তাই এখনও কথা-সাহিত্যের পাত্র-পাত্রীরা সব মধ্যবিত্ত অথবা বড় ঘরের ছেলে মেয়ে, অথচ এদের মধ্যে পর্দ্দা এত কঠোর যে, এদের জীবন সম্বন্ধে জানা এক রকম অসম্ভব বললেই হয়।

বোরকার অন্তরালে, প্রাচীর-ঘেরা অবরোধের মধ্যে দিনে দিনে কত পাপ, কত পুণ্য সৃষ্টি হচ্ছে, কত হাসি অশ্রু জমাট বাঁধছে, কত আশা-আকাঙ্খা গুম্‌রে মরছে, তা জান্‌বার অধিকার কারও নেই। মানুষের জীবন-বিকাশের পক্ষে এ যে কত বড় অন্তরায় তা বুঝবার সময় কি এখনও আসেনি? ইস্‌লামের শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ সমাজের নর-নারীর জীবনে কি ক্রীড়া করছে---বহু-বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার আইন প্রভৃতি নর-নারীর জীবনে কতখানি হাসি-অশ্রু জমিয়ে তুলেছে, কোথায় কোন্ কল্যাণী নারীর হৃদয়-নিঙড়ানো ত্যাগে মুসলমান পরিবার স্বর্গ হয়ে উঠেছে, কোথায় নারীর স্বার্থ-পরতায় পরিবার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, এ সব আমাদের সাহিত্যে ফুটে উঠবার সুযোগ পাচ্ছে না। মোট কথা, মুসলমান নারীর অন্তরের রঙমহল আজ তালাবন্দী---তাতে বাইরের আলো-বাতাস প্রবেশের অধিকার নেই।

পর্দ্দার বাইরে আস্‌লে নারী সোজা পাপের সদর রাস্তায় গিয়ে উঠ্‌বে, এ হীন ধারণা করবার কি কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে? আজ পর্দ্দার ভিতর কোন পাপ হচ্ছে না, এ কথা কি জোর ক'রে বলা যায়? পাপ যে ক'র্‌বে তাকে বাইরের পর্দ্দা রুখে রাখ্‌তে পার্‌বে না। মানুষ হিসাবে নর-নারীর পরস্পরকে জানবার যে একটা অধিকার আছে, সার্ব্বিক মঙ্গলের জন্য এ অধিকারকে ত অস্বীকার করা যায় না।

রক্ত সম্পর্ককে বাদ দিয়ে স্বামী-স্ত্রী ছাড়াও যে নর-নারীর অন্য কোন পবিত্র সম্বন্ধে হতে পারে, এ ধারণা আজিকার সমাজের নরনারীর মনে আসে না। পাপ-পথে না গিয়েও যে নর-নারীর মধ্যে পরিচয় হ'তে পারে---বন্ধুত্ব হতে পারে, এ ধারণা এ দেশের, এ যুগের নর-নারীরা ধারণা ক'রতে পারে না। স্বামী-স্ত্রী ছাড়া নর-নারী একত্র হ'লে তারা যে পাপ-পথে চলেছে, এ সম্বন্ধে কারও বিন্দু মাত্র সন্দেহ থাকে না। এমনিই আমাদের মনের অধঃপতন হয়েছে। যেখানে মন এত সঙ্কীর্ণ হয়ে গিয়েছে, জ্ঞান সীমাবদ্ধ হয়ে এসেছে, সেখানে সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব নয়। সাহিত্যিক নিজের চোখে যা দেখ্‌বে এবং নিজের অভিজ্ঞতায় যা শিখ্‌বে তারই প্রকাশ সাহিত্য। Henry Hudson তাঁর

"An Introduction to the Study of Literature"-এ লিখ্‌ছেন,—
"A great book grows directly out of life, in reading it, we are brought into large, close, and fresh relations with life and in that fact lies the final explanation of its power. Literature is a vital record of what men ever seen in life, what they have experienced of it, what they have thought and felt about those aspects of it which have the most immediate and enduring interest for all of us. It is thus fundamentally an expression of life through the medium of language,"

আজকাল জাতীয় সাহিত্য ব'লে একটা কথা খুব বেশী শোনা যাচ্ছে; কিন্তু জাতীয় সাহিত্য অর্থে এঁরা কি বুঝেন জানিনে। বাংলাদেশের লোকের লেখা হ'লেই কি তা বাঙালীর জাতীয় সাহিত্য হবে যদি না তাতে বাঙালীর প্রাণ ও চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে? তেমনি শুধু মুসলমান নাম-ধারী সাহিত্যিকের লেখা হ'লেই তা মুসলমানের জাতীয় সাহিত্য হ'তে পারে না, যদি না তাতে মুসলমানের জাতীয় জীবন ফুটে ওঠে। উক্ত ইংরেজ লেখক অন্যত্র লিখেছেন,—
"A nation's literature is not a miscellaneous collection of books which happen to have been written in the same tongue or within a certain geographical area. It is the progressive revealation, age by age, of such nation's mind and character."*
উপন্যাস জাতির দেহ ও মনের বাস্তব চিত্র---একজন নারী উপন্যাসকে Pocket theatre বলেছেন। উপন্যাসকে শুধু কল্পনার সামগ্রী মনে ক'রলে ভুল করা হবে---উপন্যাস-বর্ণিত ঘটনাটি কাল্পনিক হ'তে পারে, কিন্তু তার সম্ভাবনা কাল্পনিক নয়---তার প্রতিরূপ সমাজে বিদ্যমান থাক্‌বেই। কিন্তু এর জন্যে গভীর অভিজ্ঞতা দরকার। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়া কোন বড় উপন্যাস লেখা হ'তে পারে না, একথা জোর ক'রে বলা যায়। লেখককে সব কিছু দেখ্‌তে হবে, জান্‌তে হবে, শিখতে হবে, তারপর সেগুলিকে হজম ক'রে নিজের চিত্র গ'ড়ে তুল্‌তে হবে।....

* **Henry Hudson.**

... No novel can be pronounced, I will not say great, but even excellent in its degree, whatever that may be, if it lacks the quality of "authenticity." Whatever aspects of life the novelist may choose to write about he should write of them with the grasp and thoroughness which can be secured only by familiarity with his material "*

আগেই বলেছি আমাদের সাহিত্যিকরা সমাজকে জান্‌বার সুযোগ পাচ্ছেন না। এক বিরাট প্রাচীর সমাজের মধ্যভাগে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে---এ-কূল ও-কূলের পরস্পর জানবার জো নেই---নর ও নারী আজ ভিন্ন জাত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এমতাবস্থায় দু'জনের সম্মিলিত জীবনের বিকাশ হ'তে পারে না---সাহিত্যেও ফুটে উঠতে পারে না। তার পর বড় সৃষ্টির জন্যে চাই বিভিন্ন চরিত্রের অবতারণা---তাদের তুলনামূলক আলোচনা। Maxmuller বলেছেন,---"all higher knowledge is gained by comparison." শক্তির স্ফুরণের জন্য যেমন প্রতিযোগিতা দরকার, সে রকম চরিত্রের বিকাশের জন্য তুলনামূলক চরিত্রসৃষ্টির দরকার। কিন্তু এর জন্যে চাই বিভিন্ন জীবন ও চরিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়---তাদের আশা-আকাঙ্খা ও অন্তর-বিপ্লবকে উপলব্ধি। কিন্তু তা ত আমাদের সমাজে এখনো হবার জো নেই।

আশ্বিন ১৩৩৪

---

* An Introduction to the Study of Literature.

রবীন্দ্র জীবন

রবীন্দ্র-জীবনের পাঠকমাত্রই স্বীকার কর্‌বেন, রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তি নহেন, তিনি একটি যুগ বিশেষ; কাজেই তাঁর জীবনী কোন একজন ব্যক্তি বিশেষের জীবন-কথা নয়, বরং একটি জাতির যুগ বিশেষের ইতিহাস। বাঙলা ও ইংরেজীতে রবীন্দ্র-সাহিত্যের খণ্ড বিশ্লেষণ একাধিকবার করা হয়েছে সত্য, কিন্তু বিপুল ঐশ্বর্য্যময় রবীন্দ্র-সাহিত্য যে পট-ভূমিকাকে অবলম্বন করে একটির পর একটি দল মেলেছে, সেই পট-ভূমিকার বিস্তৃত ইতিহাস এই বোধহয় আমরা সর্ব্ব প্রথম শ্রীযুক্ত প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হাত থেকেই পেলাম। রবীন্দ্র-সহচর ও রবীন্দ্র-সাহিত্যানুরাগীদের মধ্যে সুপণ্ডিত ও শক্তিশালী সাহিত্য-সাধকের অভাব নেই। আশ্চর্য্যের বিষয়, তবুও যে আলোক-সামান্য প্রতিভা আজ পৌনে একশতাব্দী-ব্যাপী বাঙলা দেশের জীবনেতিহাসকে উজ্জ্বল করে রেখেছে সে প্রতিভার একটা অখণ্ড ইতিহাস উদঘাটনের কোন চেষ্টাই ইতিপূর্ব্বে হয়নি। রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভিতর দিয়ে সে সাহিত্যের স্রষ্টার মনের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা'তে এ-কথা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না যে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে নবীন সেনের 'আমার জীবনী'র মত বই লেখা সম্ভব। কাজেই তাঁর হাত থেকে 'জীবনস্মৃতি' নামে যে বইখানি আমরা পেলাম তা তাঁর বিস্তৃত জীবনী না হয়ে, হয়ে উঠেছে এক অত্যুকৃষ্ট সাহিত্য-সৃষ্টি। তা' পড়ে আমাদের সাহিত্য-ক্ষুধা পরিতৃপ্ত হয় সত্য কিন্তু যে জীবনকে অবলম্বন করে এই বিপুল ও বিচিত্র সাহিত্য-পুষ্প বিকশিত হয়ে উঠেছে, তার ক্রমবিকাশের বিচিত্র ইতিহাস ও তার সৌরভসুষমামণ্ডিত অস্তিত্বের খুঁটিনাটি জানবার যে স্বাভাবিক কৌতূহল ও ঔৎসুক্য তার কিন্তু নিবৃত্তি হয় না।—নৈর্ব্যক্তিক লেখার যতই জয়-ঘোষণা করা হোক না কেন, অতীত ও বর্ত্তমানের বিখ্যাত সাহিত্য ও শিল্পস্রষ্টাদের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে জানা গেছে,

আসলে মানুষ কদাচিৎ নৈর্ব্যক্তিক হ'তে পারেন। গ্যেটে, শেলী বায়রন সবারই সাহিত্য তাঁদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, এবং প্রভাত বাবুর রবীন্দ্র-জীবনী পড়ে মনে হ'ল রবীন্দ্রনাথও এর ব্যতিক্রম নন্। আগে তাঁর জীবনের সঙ্গে পরিচয় করে না নিলে গ্যেটের অনেক লেখাই ত ভাল করে বোঝা যায় না। ফুলদানীতে পুষ্পের যে পরিচয় সে অতি খণ্ডপরিচয়, সখের পরিচয়; তার সার্থকতাও স্বীকার করি। কিন্তু যে অনুসন্ধিৎসু জ্ঞান-ক্ষুধাতর, তা'তে সন্তুষ্ট না হয়ে, কোন্ গাছের কোন্ বৃত্তে সেই ফুলটির জন্ম, কোন্ মাটির রস গ্রহণ করে, কোন্ আবহাওয়ার স্পর্শে সেই গাছটি পল্লবিত ও মুঞ্জরিত হয়ে উঠেছে তার বিস্তারিত পরিচয় জানবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেন, তাঁর অনুসন্ধিৎসার দামও ত কম নয়।

কোন কবিতা বিশেষের শব্দার্থ মিলিয়ে তার মানে করতে পারাকে হয়ত কবিতা বোঝা বলা যেতে পারে, কিন্তু তাকে কাব্যের রসাস্বাদন বলা যায় না। কবির মনোলোক ও বহিঃপ্রকৃতির কোন্ শুভযোগে সেই কাব্যপুষ্পটীর উদগম হ'ল তার সাথে পরিচয় না ঘটলে কাব্যের পরিপূর্ণ রসাস্বাদনে যে ব্যাঘাত হয় তা কাব্যপাঠক-মাত্রেই স্বীকার করবেন।

'সোনার তরী'র 'গানভঙ্গ' কবিতাটীই ধরা যাক। কবিতাটীর ইতিহাস না জেনে এম্‌নি পাঠ করলেও তার রসাস্বাদনে বাধা হয় না সত্য, কিন্তু এই অপূর্ব কবিতাটীর পেছনে রবীন্দ্রনাথের যে-স্বপ্নটী রয়েছে তার সঙ্গে পরিচয় ঘট্‌লে কবিতাটীর ট্র্যাজিডি কি পাঠকের মনে আরও নিবিড় হয়ে ওঠে না? স্বপ্নটী এই রকম "কোথায় এক জায়গায় লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর আসিয়াছেন, তাঁর অভ্যর্থনা উপলক্ষে উৎসব হইতেছে। অন্যান্য নানা রকম আমোদের মধ্যে একটা তাম্বুতে একজন বিখ্যাত বৃদ্ধ গাইয়ে গান গাহিতেছে, হঠাৎ গাইতে গাইতে সে এক জায়গায় ভুলে গেল। দুবার সেটা ফিরিয়া ফিরিয়া মনে করিবার চেষ্টা করে, তৃতীয়বার নিরাশ হইয়া গানের কথাগুলি ছাড়িয়া সে সুর কর্‌তে লাগিল, ক্রমে সেটা কান্নায় পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তার কান্না শুনে যেন দ্বিজেন্দ্রনাথ 'আহা আহা' করে উঠ্‌লেন।" এই

ক্ষুদ্র গল্পটি অবলম্বন করেই, সুদীর্ঘ ও অপরূপ 'গানভঙ্গ' কবিতাটি রচিত। এই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্ত কবিতার এই লাইন কয়টি পড়া যেতে পারেঃ---

'গানের পদ তবে ছাড়িয়া দিয়া
রাখিল সুরটুকু ধরি,
সহসা হা হা রবে উঠিল কাঁদি
গাহিতে গিয়া হা হা করি।
কোথায় দূরে গেল সুরের খেলা,
কোথায় তাল গেল ভাসি,
গানের সুতা ছিঁড়ি পড়িল খসি'
অশ্রু মুকুতার রাশি।"

'স্মরণে'র কবিতাগুলির ছত্রে ছত্রে যে বিষাদের ছায়া, যে শান্ত সমাহিতচিত্ত বিরহীর মর্ম্মবেদনা অননুকরণীয় রূপ নিয়েছে, তার পেছনে কবির জীবনের যে শোকের ইতিহাস রয়েছে তার সঙ্গে পরিচয় না থাক্‌লে তার পরিপূর্ণ মর্ম্মোদ্‌ঘাটন সম্ভব নয়।

"গেলে যদি একেবারে গেলে রিক্ত হাতে?
এ ঘর হইতে কিছু নিলে না কি সাথে?
বিশ বৎসরের তব সুখ-দুঃখ ভার
ফেলে রেখে দিয়ে গেলে কোলেতে আমার।"

অথবা ঃ

'দেখিলাম খান কয় পুরাতন চিঠি—
স্নেহমুগ্ধ জীবনের চিত্র দু'চারিটি'

মনে হয় রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা ও গদ্য লেখার পেছনে এরকম ইতিহাস আছে---প্রভাত বাবু বহু আয়াস ও যত্নে সেই ইতিহাস সঙ্কলনের চেষ্টা করেছেন। শুধু কাব্যের রসাস্বাদনের জন্যই যে এ ইতিহাসের প্রয়োজন তা নয়, সত্যিকার কবি-প্রতিভা প্রকৃতির কোন্ ইঙ্গিৎ থেকে 'জীবনের কোন্ ক্ষুদ্রতম হিল্লোল থেকে' আদি-অন্তহীন অলীক স্বপ্ন থেকে পর্য্যন্ত কি করে অত্যুৎকৃষ্ট কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করে,

এ ইতিহাস তারও বিস্ময়কর সত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়ে দেয়। কবে রবীন্দ্রনাথের এক কৈশোর দিনে (মাত্র সতর বছর বয়সে) তিনি তাঁর দাদা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে আহ্‌মদাবাদের এক বাদশাহী আমলের নির্জ্জন প্রাসাদে কিছুদিন বাস করেছিলেন, তারই স্মৃতি নিয়ে আরও সতর বছর পরে তিনি তাঁর অপূর্ব্ব গল্প 'ক্ষুধিত পাষাণ' রচনা করেন। স্রষ্টার সৃষ্টিকাহিনী এম্‌নি বিস্ময়কর! রবীন্দ্রনাথ বাঙালী-জীবনের ব্যতিক্রম---তাঁর জীবন যেন আমাদের ইতিহাসে ছন্দপতন। সৌন্দর্য্য ও ভাবসম্পদে তাঁর সাহিত্যের যেমন তুলনা নেই, তাঁর সুসংবদ্ধ কর্ম্মবহুল নিরলস জীবনও তুলনাহীন। বাঙ্গালী জীবনের স্বাভাবিক কুঁড়েমী ও দীর্ঘসূত্রতা, অপরিচ্ছন্ন চিন্তা ও ভাঁড়ামী, দায়িত্ব গ্রহণে ভীরুতা ও ঔদাসিন্য তাঁর জীবনে কোন দিন দেখা যায়নি। প্রভাতবাবু তাঁর বইয়ের ভূমিকায় সত্যই বলেছেন, "সংসারে কোন দায়িত্বকেই রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেন নাই।" পূর্ণাঙ্গ মানুষের একটি লক্ষণ, সাহস ও বীর্য্যের সাথে এই দায়িত্ববহুল জীবনের প্রত্যেক দায়িত্বের সম্মুখীন হওয়া। সাধারণ বাঙ্গালী পূর্ণাঙ্গ নয়, জীবনের দায়িত্বকে সে ছলনা করে, ফলে তার জীবন পঙ্গু, খণ্ডিত ও দুর্ব্বল। রবীন্দ্রনাথ কবি, তবুও যখনই জীবনে যে আহ্বান এসেছে তাকেই তিনি অম্লানবদনে বরণ করে নিয়েছেন। পাটের কারবারে নেমেছেন, জমিদারী শাসনের বিরক্তিকর দায়িত্ব নিতে দ্বিধা করেন নি, স্কুল চালিয়েছেন, রাজনীতি ও ধর্ম্মান্দোলনে যোগ দিয়েছেন, বেদীতে বসে পৌরোহিত্য করেছেন, পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন, (শুন্‌তে পাওয়া যায় বাইওকেমি এবং হোমিওপ্যাথিও চর্চা করেন') আরও কত কি। এসবের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে চিত্রাঙ্গদা, সোনার তরী, চিত্রা, নৈবেদ্য, বিসর্জ্জন, গল্পগুচ্ছ, চোখেরবালি, প্রাচীন সাহিত্য, শিক্ষা, শব্দতত্ব ইত্যাদি। বিস্ময়ের বিষয় নয় কি? তাঁর এই সুদীর্ঘকালব্যাপী জীবনে দেশে এমন কোন অনুষ্ঠান, এমন কোন আন্দোলন আসেনি যার সাথে রবীন্দ্রনাথের মন সাড়া দেয়নি, যা তাঁর প্রতিভার স্পর্শে সমৃদ্ধ হয়নি। তাই বল্‌ছিলাম রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তি নহেন, তিনি আমাদের ইতিহাসের একটি যুগ। তাঁর জীবনকাহিনী সেই যুগেরই ইতিহাস। সেই ইতিহাস ছাড়া তাঁর জীবনের

পূর্ণ পরিচয় সম্ভব নয়। সুখের বিষয় প্রভাতবাবু তাঁর 'রবীন্দ্র জীবনী'তে সেই ইতিহাস দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্র সাহিত্যের মত রবীন্দ্র-জীবনও এক বিস্ময়কর ব্যাপার। সেই বিস্ময়কর জীবন ও সাহিত্যকে বুঝতে হ'লে শুধু তাঁর অত্যুৎকৃষ্ট সৃষ্টির সঙ্গে পরিচয় ঘটলেই চলবে না। তার ধারাবাহিকতা ও ক্রমবিকাশকেও উপলব্ধি করতে হবে। প্রভাতবাবু রবীন্দ্রনাথের বাল্য ও যৌবনের বহু দুষ্প্রাপ্য লেখা উদ্ধৃত করেছেন এবং বিস্তারিত আলোচনাসহ তার সঙ্গে পাঠকের পরিচয়-সাধনের সুযোগ করে দিয়ে ভালই করেছেন। এই জীবনী সংগ্রহে তিনি যে শ্রম ও শক্তি ব্যয় করেছেন তার জন্য বঙ্গ-সাহিত্যানুরাগী মাত্রই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। ভবিষ্যতে যিনিই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা করতে যাবেন তাঁকেই এই কৃতজ্ঞতা ও ঋণ পদে পদে অনুভব করতে হবে।*

---

* রবীন্দ্র-জীবনী—প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়--বিশ্বভারতী।

আমার এক পরিচিতার নাম হাসিনা; হাসিনা সুন্দরী, উচচ-শিক্ষিতা ও তদুপরি আধুনিকা ও অতি-আধুনিকার মাঝখানে দোদুল্যমানা। সাহিত্য-করা সংক্রামক ব্যাধিবিশেষ, সাহিত্যিকদের সংস্রবে আসিলে নিজের মনেও সাহিত্যিক হওয়ার বদ্‌খেয়াল আপনা আপনিই জাগে—কাজেই আমার দেখা-দেখি আমার এই আত্মীয়াটীর মনেও যে এই বদ্‌খেয়াল জাগিবে তা আর বিচিত্র কি? নিজের খেয়ালে বাঁচি না—এরি মধ্যে একদিন হাসিনা আসিয়া অসঙ্কোচে বলিয়া ফেলিল—মামুন-দা, কি লিখ্‌ব বলে দাও।

খাতা হইতে চোখ তুলিয়া বিস্ময়ের সঙ্গে বলিলাম—তার মানে?

—সবাই লিখ্‌ছে, আমিও গল্প টল্প কিছু লিখ্‌ব মতলব করেছি।

—আরে পাগ্‌লি, বর্ণাশুদ্ধি বাঁচিয়ে বাংলা লিখ্‌তে পারলেই কি সাহিত্যিক হওয়া যায় নাকি?

—কি করে হওয়া যায় তা' জান্‌বার জন্যেইত তোমার কাছে এলাম।

আমার নিজের নায়িকাকে লইয়া তখন আমার কাহিল অবস্থা —মঞ্জুলেখা সবে মাত্র চৌদ্দয় পা দিয়াছে, এখন তাহাকে যে-কোন প্রকারে একটা প্রেমে না ফেলিতে পারিলে গল্প আর কিছুতেই অগ্রসর হইতেছে না, অথচ বাংলা দেশের নায়িকা এম্‌নি অপদার্থা যে সে নিজে একটু চেষ্টা চরিত্র করিয়া প্রেমে পড়িবে যে তাহাও তাহার দ্বারা হইয়া ওঠে না। লেখক কাঁহাতক যোগাড় যন্ত্র করিয়া, কারণে অকারণে নায়িকার বাপের বাসা বদলাইয়া, কোন মেসের ধারে অথবা এমন বাড়ীর কাছে, যেখানে প্রেমে পড়ার সমস্ত সুবিধা আছে অথচ অসুবিধা একটিও নাই, লইয়া যাইতে পারে? সামান্য এক আধটু অসুবিধা থাকিলে তাহাও লেখককেই কল্পনার বলে দূর করিতে হয়—না হয় নায়িকা

'আঙ্গুর টক'-মার্কা সতীত্বের মুখোস পরিয়া এম্‌নি অথর্ব্ব হইয়া বসিবেন যে তাহাকে দিয়া রান্না বান্না করান ছাড়া গল্পের নায়িকা আর কিছুতেই করা যায় না। এ যেন ছোট ছেলে মেয়েকে ভাত খাওয়ানো, মাছের কাঁটাটা, মাংসের হাড়টা বাছিয়া, গ্রাসটা বানাইয়া দিলে তবে খুকী মুখে পুরিবেন। আমার নায়িকা মঞ্জুলেখাকে লইয়া আমারও হইয়াছে এই বিপদ---কাল রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত, আজও সকালে শেভ্ না করিয়াই বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছি; তিন কলম লিখি নাই অথচ তিন ঘণ্টা ধরিয়া ভাবিতেছি, তবুও কি করিয়া যে মঞ্জুলেখার বাপের বাসা কোন মেসের ধারে লইয়া আসা যায় তাহা ঠিক করিতে পারি নাই---কলিকাতায় আমার জানা যতগুলি মেস আছে সবগুলি নিয়াই এক একবার গল্প লিখিয়া সারিয়াছি--কাজেই বিপদ সামান্য নয়। এই হেন দুঃসময়ে হাসিনার এই উৎপাত। কাজেই সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বসিয়া বসিয়া গল্প করার দুর্নিবার মোহ ত্যাগ করিতেই হইল। তাহাকে সহসা বিদায় দিবার জন্য বলিলাম---সাহিত্যিক হ'তে চাও ত খুব কষে হিন্দু কাগজে মুসলমানদের গালাগাল দাও, আর মুসলমান কাগজে হিন্দুদের গালাগাল দাও; লেখাও বড় বড় কাগজে ছাপা হবে, বিনিময়ে কিছু অর্থও মিল্‌বে।

মূর্খ মেয়ে বলে কিনা---আমি দেশদ্রোহিনী হ'তে চাই না।

শাস্ত্রে বলে মেয়েদের বুদ্ধি পঙ্গু, কাজেই হাসিনা আমার সদুপদেশ গ্রাহ্য করিবেই বা কেন? অগত্যা শেল্ফ্ হইতে একটা ইংরেজী বই টানিয়া লইয়া তার হাতে দিয়া বলিলাম,---আগে এটা অনুবাদ করে নিয়ে এস, দেখা যাক্ কিছু হবার আশঙ্কা আছে কিনা!

মাস ছয় পরে সে যখন আবার আসিল তখন আমাকে রীতিমত অবাক হইতে হইল---বইটী যে সে শুধু আগাগোড়া অনুবাদ করিয়া ফেলিয়াছে তাহা নয় সেইটাকে সে 'সর্ব্বনাশী' নাম দিয়া ছাপাইয়াও ফেলিয়াছে A Dawn of Life-এর বাংলা অনুবাদ 'সর্ব্বনাশী'। ইউরোপীয় পাত্র পাত্রীরা সব নাম বদলাইয়া বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছে; মূল লেখকের নাম কোথাও নাই; শুধু বই-এর শেষে বর্জ্জাইসে ফুটনোটে লেখা হইয়াছে ইংরেজীর ছায়া অবলম্বনে। এবং ততোধিক আশ্চার্য্যের বিষয় বইটী আমাকে উৎসর্গ করিয়াছে। খুসি হইব কি

দুঃখিত হইব সহসা ঠিক করিতে পারিলাম না, তবুও মঞ্জুলেখার দাম্পত্য-প্রেমের কূজন থামাইয়া তার পরিশ্রম ও উদ্যমের প্রশংসা করিতে হইল। হয়ত উৎসাহ পাইয়াই সে বলিয়া ফেলিল,---মামুন-দা, আমি আর অনুবাদ করব না, এবার অরিজিনেল লিখব, কি লিখ্‌ব বলে দাও দেখি।

--বলো কি! মেয়ে মানুষ হয়ে কি আবার অরিজিনেল লিখ্‌বি; বাংলাদেশের মেয়ে, জীবনে কোন অরিজিনেলিটি ত নেই, সাহিত্যে কি করে অরিজিনেলেটি সৃষ্টি কর্‌বি!

--তোমার সব কথাতে খালি সিনিসিজম্‌, মেয়েরা বুঝি মৌলিক কিছু লিখ্‌তে পারে না?

---কবেই বা পেরেছে, এক কাজ কর আমার শেল্‌ফ্‌ থেকে রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়া'টা নিয়ে যাও,---ঐ ছাঁচে ফেলে খুব করে কতকগুলি কবিতা লিখে ফেল, মেয়ে-মানুষের নাম দেখ্‌লেই ব্যস্‌, সম্পাদক বুড়ো হউক, আর তরুণই হউক--সব কাগজে তোমার লেখা ছাপ্‌বেই। এ বিষয়ে তুমি নিঃসন্দেহ থাক্‌তে পার। আর যত বেশী রবীন্দ্রনাথের ছাঁচে কবিতা লিখ্‌বে তত শীঘ্রই রবীন্দ্রনাথের সার্টিফিকেট তোমার যোগাড় হয়ে যাবে,---রবীন্দ্রনাথ যদি তোমাকে কবি বলে সার্টিফিকেট দেন্‌ তবে বাংলাদেশে কার সাধ্য তোমাকে কবি বলে অস্বীকার করে?

আদুরে মেয়ের মত সে গ্রীবা বাঁকাইয়া বলিল---না মামুন-দা, ছন্দের সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মারপ্যাঁচ রক্ষা করে কবিতা লেখা আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। আমি এবার গল্প লেখায় হাত দিতে চাই।

—গল্প লিখ্‌বে। গল্প হ'লো জীবনে ছন্দপতনের ইতিহাস, তোমার জীবনে কেন বাংলাদেশের কোন্‌ মেয়ের জীবনেই-বা ছন্দপতন আছে যে তুমি তা নিয়ে গল্প লিখ্‌বে? বানিয়ে কল্পনা করে লেখাকে কাঁহাতক আর প্রাণবান করা যায় বল, তাই দেখ্‌ছনা বাংলাদেশের সব মেয়ের লেখা একেবারে কেমন প্রাণহীন একঘেঁয়ে।

—চেষ্টা করে দেখ্‌তে আপত্তি কি, না হয় না হবে---তুমি শুধু প্লট্‌টা বলে দাও।

তার জিদ্ দেখিয়া রীতিমত রাগ হইল। এদিকে মঞ্জুলেখার সবে মাত্র বিবাহ দিয়া সারিয়াছি। বিবাহ না দিয়া কি করি;---হতভাগ্য রণেনটা মঞ্জুকে দেখিয়া তার পছন্দ হওয়া সত্ত্বেও কোথায় ঝুপ্ করিয়া প্রেমে পড়িবে, দিস্তার পর দিস্তা কবিতা লিখিবে, কোথায় রাত্রির পর রাত্রি বিরহানলে দগ্ধ হইতে হইতে বিনিদ্র রজনী কাটাইবে, ভাল-ছেলে হওয়া সত্ত্বেও পরীক্ষায় ফেল্ করিবে, তা নয় মেয়েটিকে দেখিয়াই সে পরদিন মেয়েটীর বাপের কাছে ঘটক পাঠাইয়া দিয়াছে।---হায়রে হতভাগ্য বাংলা উপন্যাসের নায়ক! তোমাকে পাষণ্ড, নরাধম বলিয়া গালি দিতেও ইচ্ছা হয় না। রণেন এম্‌নি করিয়া যথা সময়ে নায়িকা মঞ্জুলেখাকে বিবাহ করিয়া আমার গল্পের পায়ে কুঠারাঘাত করিয়া বসিল। এখন কোন প্রকারে পাশের বাড়িতে একটি বাল-বিধবা আমদানী করিতেই হইবে এবং তার সঙ্গে মঞ্জুর স্বামীর প্রেম ঘটাইতে না পারিলে এই গল্পের গলায় যে কুঠারাঘাত পড়িবে। লিখিতে হইবে বাঙ্গালী পাঠকের প্রিয় জিনিষ ট্রেজেডী, অথচ স্ত্রীকে ছাড়িয়া অন্যত্র প্রেম না হইলে ট্রেজেডী ঘনীভূত হইবে কি করিয়া? ট্রেজেডী ঘনীভূত না হইলে পাঠক পাঠিকার চোখে জল আসিবেই বা কেন, আর বই পড়িতে পড়িতে যদি চোখে জল না আসে; বাংলাদেশের পাঠক তাহা টাকা দিয়া কিনিবেই বা কেন! অতএব আমার পক্ষে মঞ্জুলেখার জীবনকে ট্রেজেডী না করিয়া উপায় নাই। ট্রেজেডী করিতে গেলেই তাহার স্বামীকে অন্যাসক্ত দেখাইতে হয় এবং তাহাতেই মঞ্জুলেখার জীবনে হইবে দুঃখের আরম্ভ, সেই দুঃখ পড়িয়া পড়িয়া বাংলাদেশের পাঠক পাঠিকা লেখকের শক্তি দেখিয়া অবাক হইবে; আর নিজেরা কাঁদিয়া কাঁদিয়া বুক ভাসাইবে। পাঠক যত বেশী কাঁদিবে আমার বইও তত বেশী কাট্‌তি হইবে। কাজেই মঞ্জুলেখার জীবনে কান্নার বন্যা বহাইবার জন্য আমি যখন কলম হাতে ফোঁপাইতেছি তখন হাসিনা কিনা বলে, সে গল্প লিখিবে!

রাগিয়া বলিলাম,---তোমার নিজের জীবনে কোন ছন্দপতন হয়েছে?

—দূর্! বলিয়া সে মুখ ফিরাইল।

দূর নয়, যার জীবনে ছন্দ পতনের অভিজ্ঞতা নেই তার পক্ষে গল্প লিখে কৃতকার্য্য হওয়া অসম্ভব, তোমার জীবনে যদি ছন্দপতন থাকে তাই লিখে এনো, আছে কিছু?

সে এইবার নিরুত্তর।—ঠোঁটে সলজ্জ মুচ্‌কি হাসি দেখিয়া একটু সন্দেহ হইল। বলিলাম,—গল্প লেখার আগে, তোমার জীবনে ছন্দপতনের যে অভিজ্ঞতাটুকু হয়েছে তাহাই নিখুঁতভাবে লিখে ফেল। মনে রাখ্‌বে, যে-লেখায় নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার রশ্মিপাত হয়নি সে-লেখা কায়াহীন ছায়ামাত্র, গ্যেটে থেকে শ্রীকান্তের লেখক পর্য্যন্ত আমার এই কথার সমর্থন করবেন। তবে যা' লিখ্‌বে তা' যেন খাঁটি এবং নিখুঁত হয়, নিজকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করোনা, ফাঁকি দিয়ে সতী নাম কেনা যায় বটে; কিন্তু সাহিত্যে স্থান পাওয়া যায় না। ধর, ঘরে বসে হয়ত পাশের বাড়ীর কলেজ-ছাত্রটীর কথা ভাব্‌ছ লিখ্‌বার সময় হয়ত লিখ্‌লে তিন দিস্তাব্যাপী পতিভক্তির উপকারিতা; অথবা তোমার হয়ত এখনো বিয়েও হয়নি, আর তুমি ফেঁদে বস্‌লে মাতৃত্বের মহিমা সম্বন্ধে এক বিরাট উপন্যাস; সত্যি, এ' করে খাঁটি সাহিত্য হয় না।

এক চোটে অনেকখানি উপদেশ বর্ষণ করার পর তবে থামিলাম।

এত বড় জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতার পর সে বলে কিনা---দূর, নিজের জীবন লিখে কি গল্প হয়, ও হ'বে জীবনী, আমার জীবনী কেই বা পড়্‌বে?

বিস্মিত হয়ে বল্‌লাম---কোন দিন প্রেমে ট্রেমে পড়োনি?

ঠোঁটে আঁচল চাপা দিয়া সে বলিল---দূর্, এসব অশ্লীল কথা বল্লে তোমার কাছে আর আস্‌বই না।

---হায়রে বঙ্গ-ললনা! প্রেমে পড়াকে বল তুমি অশ্লীল! প্রেমে না পড়েও তুমি প্রেমের গল্প লিখ্‌তে চাও। বিরহ অনুভব না করেও বিরহের ট্রেজেডী লিখ্‌বে।

—প্রেম, বিরহ ছাড়া কি আর গল্প হতে পারেনা?

—হ'তে খুব পারে; কিন্তু তা' প্রেমে পড়ার চেয়ে ঢের বেশী দুরূহ। পার্‌বে ন্যুট হ্যাম্‌সুনের মত ট্রামের কাণ্ডাকটারী করতে?

পারবে রবীন্দ্রনাথের মত জমিদারীর ম্যানেজারী করতে, পারবে শরৎ চার্য্যের মত বর্ম্মার অলিতে গলিতে ঘুর্‌তে? দস্তভক্কীর মত কন্‌কনে শীতের মধ্যে দাঁড়িয়ে পারবে শুন্‌তে নিজের মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা? তাই বলছিলাম সহজতম পথ হচ্ছে প্রেমে পড়া, অন্ততঃ তা ভাঙিয়ে কিছুটা সাহিত্য করা চলে।

---তা' হ'লে চল্লাম।

কেন, গল্প লিখ্‌বে না? এই পৌণে এক কুড়ি বছরের জীবনে কিছু মাত্র পুঁজি নেই? চৌদ্দ থেকে উনিশ পর্য্যন্ত পাঁচটা বছর এমনি ফাঁকা নষ্ট করেছ---সমস্ত হৃদয়টা বই-চাপা দিয়ে পিষে মেরেছ? বসন্তের দক্ষিণা বাতাস, কোকিলের কুহু রব তাতে একদিনের জন্যও প্রবেশ করতে দাওনি? কোনদিন প্রেমে পড়ার ইচ্ছে, প্রেম পাওয়ার লোভও মনে জাগেনি? তাই যদি হয় তবে সাহিত্যিক হওয়ার দুরাশা ত্যাগ করো।

আসন ছাড়িয়া উঠিতে উঠিতে হাসিনা বলিল,---বুঝেছি এই জন্যই তোমাকে আত্মীয় স্বজনরা বাইর বাড়িতেই স্থান দেয়, ভিতরের গেট পার হ'তে দেয় না।

বুঝ নাই লক্ষী, তুমি যদি এই দুঃখটা বুঝ্‌তে অন্ততঃ তুমি ত আমার প্রেমে পড়ে এই শুষ্কং কাষ্ঠং বাংলাদেশে একটি উপন্যাসের প্লট সৃষ্টি করতে পারতে---অতখানি 'মরাল কারেজ্‌' ত নেই!

এইবার সে এত রাগিয়াছে যে কোন কথা না বলিয়াই নিরুত্তরে বাহির হইয়া গেল। চেঁচাইয়া বলিলাম---হাসিন, দোহাই, আমার উপর রেগে কিন্তু সহসা বিয়ে করে ফেলোনা---স্বামী দিয়ে খুব সহসা জননী হওয়া যায় বটে; কিন্তু সাহিত্যিক হওয়া যায় না।

কথাটি সে শুনিল কিনা জানিনা;---কিন্তু একবার পশ্চাৎ ফিরিয়াও চাহিল না। যাক্‌ বঙ্গের ভবিষ্যৎ লেখিকাকে লইয়া আর মাথা ঘামাইয়া লাভ নাই। হতভাগা রণেনটা আমাকে একেবারে নিরাশ করিয়াছে; কলেজে-পড়া কাব্যচর্চাকারী ফিট্‌ফাট্‌ ছেলে, মনে করিয়াছিলাম টুক্‌ টুক্‌ প্রেমে পড়িতে পারিবে; কিন্তু একেবারে বাজে, অকর্ম্মণ্য। তার

বাড়ীর পাশে বাল-বিধবা যোগাড় করিয়াদিলাম, কলমের জোরে আধ-ঘণ্টার মধ্যে সেই বাল-বিধবাটিকে যৌবনে টলটলায়মান করিয়া তুলিলাম; মেয়েটী ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া কতদিন তার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, হতভাগাটা কিনা সেইদিকের জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া, বৌকে রান্না-ঘর হইতে টানিয়া আনিয়া 'উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম' পড়া শুরু করিয়া দেয়। বৌ-এর প্রতি যার এত টান তাকে দিয়ে আর যাই করা যাক, গল্পের নায়ক করা চলে না।

কাজে কাজেই 'মহাপুরুষ মহাজন, যে পথে করেছে গমন'—

এই গল্পের নায়ক নায়িকা যে কোন একজনকে হত্যা করিয়া এই গল্পের ট্রেজিডী করা ছাড়া ট্রেজেডী করার আর উপায় কোথায়? বাংলা সাহিত্যের সব মৃত্যুগুলির মধ্যে দেবদাসের মৃত্যুটাই বেশ স্মরণীয় —শরৎ বাবু পাকা হত্যাকারী, তাই দেবদাসের মৃত্যুটা এমন করিয়া জমিয়াছে। পড়িয়া না কাঁদিয়া থাকিবার যো নাই বলিয়াই ত অনেক পাঠক মনে করেন, দেবদাস শরৎচন্দ্রের একটি ভাল বই। দেবদাসে নায়ক মরিয়াছে, কে আবার কখন বলিয়া বসে, শরৎচন্দ্রের অনুকরণ করিয়াছি—অত হ্যাঙ্গামে কাজ নাই, মঞ্জুলেখাকে মারিয়া ফেলিলেই ট্রেজেডীটা চমৎকার জমিবে। পুরুষের পক্ষে থাইসিস্ হইয়া মরাটাই খুব nice ও গভীর tragic, নারীর পক্ষে কেরোসিনে গাত্র-বস্ত্র সিক্ত করিয়া জ্বলিয়া মরাই হইতেছে beautiful ও serio-tragic; অতএব একদিন বিনাকারণে ও আমার গল্পের সম্পূর্ণ প্রয়োজনে, মঞ্জুলেখা নিজের কাপড়ে কেরোসিন ঢালিয়া দিয়া আগুন ধরাইয়া দিল। মেয়েটির tragedy-জ্ঞান চমৎকার; আগুন ধরাইবার পূর্ব্বে সে সমস্ত দরজাগুলি বন্ধ করিয়া ভিতর দিকের খিল আঁটিয়া দিয়াছে এবং যখন আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল তখন পাশের বাড়ীর দিকের জানালাটীর গরাদে মাথা ধুঁকিয়া ধুঁকিয়া সে পুড়িয়া মরিতে লাগিল। বাহির হইতে যাহারা এই দৃশ্য দেখিল তাহারা হায় হায় করিয়া কান্না শুরু করিয়া দিল!

লেখকের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যাঁহারা এই tragedy পাঠ করিবেন অনুগ্রহ করিয়া তাঁহারাও সকলে হু হু করিয়া কাঁদিবেন। তাহা হইলেই আমার পরিশ্রম, সময়, কাগজ ও কালি খরচ সার্থক মনে হইবে।

১৩৪০

বাহাই ধর্ম্ম

বাহাই ধর্ম্ম সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যে বিশেষ কিছু লিখিত হয় নাই—কিছু হইয়া থাকিলেও তাহা এতই সামান্য যে তাহা হইতে কোন বাঙ্গালীর পক্ষে পৃথিবীর এই নূতনতম ধর্ম্মটী সম্বন্ধে একটী মোটামুটী ধারণা করাও অসম্ভব। ধর্ম্মমতের সূতিকাগার (১) প্রাচ্যের বুকে এই নব ধর্ম্মের জন্ম হইলেও পাশ্চত্য দেশেই এর বেশী আলোচনা হইয়াছে। এবং পাশ্চত্য দেশবাসীই এশিয়ার এই ধর্ম্ম-শিশুটীর প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছে। ইহাতে আমরা প্রাচী ও প্রতীচীর মনোবৃত্তিরও একটা পরিচয় পাই। প্রতীচী পৃথিবীর ধন-ভাণ্ডার লুণ্ঠনের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ডার লুণ্ঠনেও চিরতৎপর। তার চিরচেতন সজাগ আত্মা—পৃথিবীর কোন্ ক্ষুদ্র কোণে কোন্ ক্ষুদ্র ঘটনাটীর অভিনয় হইয়া যাইতেছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতেও চিরউন্মুখ; এবং তাহার রসধারা নিজের সাহিত্যে প্রবাহিত করিয়া নিজের জাতীয় জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করিতে চির-উৎসাহশীল। আর প্রাচী এখনও জ্ঞান-সমুদ্রের বেলাভূমিতে; মাঝ দরিয়ায় কি অপূর্ব্ব অশ্রুত তরঙ্গ-ভঙ্গের সৃষ্টি হইতেছে, সে খবর তাহার কাণে আসিয়া পৌঁছে না। Plato বলিয়াছেন "Man differs from animals in aiming at some goal." মানুষের জীবনের এক বিরাট লক্ষ্য আছে। মানব-জীবন সাগরের বুদ্বুদ নয়; অথচ আমাদের কমলাকান্তের বর্ণিত গাছের ফলও নয় যে, শুধু পাকিয়া ঝরিয়া পড়িয়াই তার সমাপ্তি। শুধু খাইয়া, পরিয়া, নিদ্রা যাইয়া আর সন্তান উৎপাদন করিয়াই জীবন কাটানো যদি মানব-জীবনের পরিণতি হইত, তাহা হইলে মানুষের জীবনে আর অন্যান্য প্রাণীদের জীবনে কোন পার্থক্যই থাকিত না। অনন্তকাল হইতে মানব-জীবন এক মহা লক্ষ্যের পানে ছুটিয়া চলিয়াছে। সৃষ্টির আদি

১। The world's creeds were born in Asia.
F,—H. Strine

হইতে যুগের পর যুগ ধরিয়া মানুষের জ্ঞানের অভিযান চলিয়াছে—এই অভিযান কখনো শেষ হইবে না।

পৃথিবীর অতি শৈশবকাল হইতে মানব-জাতির ইতিহাসে একটি জিনিষ অপরিবর্ত্তিত দেখা যায়। সেইটী এই—মানুষ সকল অবস্থায়, তার সমস্ত সুখ-দুঃখের মধ্যে একটী শক্তিকে মানিয়া চলিয়াছে। সহস্র সহস্র বৎসরের সাধনায়ও সেই অদৃশ্য শক্তির স্বরূপ এখনও নির্ণীত হয় নাই। তথাপি সেই শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে মানুষের বাধে নাই। কোন ধর্ম্ম মানে না—পৃথিবীতে এমন মানুষের অভাব নাই; কিন্তু এই অদৃশ্য শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে না, এমন মানুষ আছে কি না, তাহা আমাদের জানা নাই। একজন ইয়োরোপীয় লেখক লিখিয়াছেন:—"A man may have no religion, but he always has a god." (২) এই অদৃশ্য শক্তিকে যুগে যুগে মানুষ দেশ-কাল-পাত্র ভেদে বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছে; এবং বিভিন্ন রকমে এই অদৃশ্য শক্তির পায়ে মাথা নত করিয়া আসিয়াছে। ধর্ম্ম কি? এই অদৃশ্য শক্তির পায়ে মাথা নত করাই কি আবহমান কাল হইতে পৃথিবীর প্রচলিত ধর্ম্ম নয়?

'Belief in the existence of supernatural power, and a sense of dependence thereon.' --এই ত মানুষের ধর্ম্ম। শুধু শিক্ষিত লোকেরা এই অদৃশ্য শক্তির কাছে মাথা নত করে নাই—অশিক্ষিত পাহাড়ীরাও যাহাদিগকে সভ্য ভাষায় বর্ব্বর বলা হয়—এই অদৃশ্য শক্তিকে মানিয়া চলিয়াছে। আগেই বলিয়াছি, স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে এই অদৃশ্য শক্তির পরিকল্পনায়ও বিভিন্নতা ঘটিয়াছে। শিক্ষিত লোকেরা যেখানে এক নিরাকার ভগবানের পরিকল্পনা করিয়াছেন, সেখানে অশিক্ষিত লোকেরা হয় ত কোন শক্তিধর পশু বা কোন প্রাচীন বৃক্ষ বিশেষের মধ্যে এই অদৃশ্য শক্তির কল্পনা করিয়া তাহাকে পূজা নিবেদন করিয়া আসিয়াছে। এই যে অনন্ত সুষমার আধার সৌন্দর্য্য-লক্ষী প্রকৃতি—ইহাকে ছাড়াইয়া তাহাদের চিন্তা হয়ত আর উর্দ্ধে উঠিতে পারে নাই। এরই মধ্যে তাহারা সেই রহস্যময় অদৃশ্য শক্তির

(২) F. H. Strine.

বিচিত্র লীলা খেলা দেখিয়াছে। তাই সে এই প্রকৃতির পূজা করিয়াই নিজের চিত্তক্ষুধা মিটাইতেছে। উপাসনা মানুষের প্রাণের আহার। উপাসনা ছাড়া মানুষ বাঁচিতে পারেনা---মানুষের আত্মা তৃপ্ত হইতে পারে না,---সে যে প্রকারের উপাসনাই হউক। যাহাদের চিন্তা আরও কিছু উর্দ্ধে উঠিয়াছে---তাহারা নিজেদের কল্পনানুযায়ী সেই অদৃশ্য শক্তির একটী মূর্ত্তি গড়িয়া তাহারি পায়ে মস্তক নত করিয়া আসিয়াছে। আর কেহ বা কোন বাহ্যিক মুর্ত্তি না গড়িয়া সেই কাল্পনিক অদৃশ্য শক্তির উদ্দেশ্যে ভক্তি নিবেদন করিয়া আসিয়াছে। প্রত্যেকে নিজের ইচ্ছানুরূপ ভগবানের কল্পনা করেন Every one makes his God after his own image. প্রাচীন জগতের কোন পয়গম্বর বা সাধু শ্রেণীর লোক মেষ চরাইতে চরাইতে বলিয়াছিলেন, 'যদি ভগবানের একটী মেষ থাকিত, আমি তাহা চরাইতাম'। কি সুন্দর সহজ, সরল ভক্তি!

স্বষ্টির আদি হইতে যুগে যুগে মানুষ সেই অদৃশ্য শক্তির স্বরূপ নির্ণয় করিতে এবং তাহার মনস্তুষ্টির বিচিত্র বিধি-বিধান নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। তাই এত বিভিন্ন ধর্ম্মমতের স্বষ্টি। তাই প্রাচীন কালের Animism হইতে আরম্ভ করিয়া Totemism, Polytheism Dualism, Pantheism, Aerthetism, Agnosticism, Parasitism, Mysticsm ইত্যাদি হইতে আজিকার Bhaism পর্য্যন্ত এত ism-এর স্বষ্টি। এই যে অনন্ত কাল হইতে সুদূর অনন্ত কাল পর্য্যন্ত মানুষের জ্ঞানের অভিযান চলিয়াছে---সাধনার জয়-যাত্রা শুরু হইয়াছে, তার পশ্চাতে কি কোন আদর্শ, কোন বৃহৎ লক্ষ্য নাই?---মানুষ চায় পৃথিবী আরও উন্নত হউক, মানব জাতি আরও সুখী হউক---কোন্দল-কলহের পরিবর্ত্তে মানুষ মানুষের ভাই হউক। বিশ্ব রহস্যের দ্বারোদ্-ঘাটন করিয়া মানুষ এই বিরাট তথ্যের সমাধান করিতে চায়। কিন্তু এই প্রবীন পৃথিবীর এত ism প্রসবের পরেও আমাদিগকে Mrs. Stannard এর মত জিজ্ঞাসা করিতে হয় Has humanity advanced ? মানুষ কি সুখী হইয়াছে? মানব জীবন কি আশানুরূপ উন্নত হইয়াছে? মানুষ কি মানুষের ভাই হইতে পারিয়াছে? এখনও ত কোন কোন মানুষের জীবন দেখিলে তাহাকে পশু হইতে শ্রেষ্ঠ ভাবিতে সঙ্কোচ হয়।

"Man is not man because he has a body: he is man in that he possesses a soul .Its perishable clothing assimilates him to the animals; the soul distinguishes him from them." (৩)

বাহাইরা বলিতেছেন মানবাত্মার উন্নতি হয় নাই, মানুষে মানুষে মিলন হয় নাই; মানব-জাতির কল্যাণ হয় নাই। জাতিতে জাতিতে কোন্দল, ধর্ম্মে ধর্ম্মে হানাহানি, দেশে দেশে রেষারেষি, মানুষে মানুষে মারামারি—এই ত পৃথিবীর নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। তাই মানবজাতির কল্যাণের জন্য আরও উন্নত ধরণের উদার ব্যাপক ধর্ম্ম মত সৃষ্টির কি দরকার হয় নাই? 'প্রত্যেক মানুষ ভাই ভাই' এই বিশ্বমানবতা প্রচারে কি সময় আসে নাই? পৃথিবীর এই ঘোর রেষারেষির সময়ে এই নব বাণী প্রচারের দরকার হইয়া পড়িয়াছিল, the time was ripe for a more effectual reformation and again light shone from the East (৪) তাই ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে পারশ্যের শীরাজ নগরে এই নব বাণী প্রচারের অগ্রদূত বাবি বা বাহাই-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মির্জ্জা আলী মোহাম্মদের আবির্ভাব হয়। এই নব ধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত আভাষ এই ক্ষুদ্র নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

এই নব ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক সৈয়দ আলী মোহাম্মদ ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে শীরাজ নগরের কোন দরিদ্র মুদীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে হজরত মোহাম্মদের মত ইনিও বাল্যকালে কোন বিদ্যাশিক্ষা পান নাই। তাই বাবিরা মুসলমানদিগকে বলিয়া থাকে—কোরাণ যদি হজরত মোহাম্মদের পয়গম্বরীর অন্যতম নিদর্শন হইয়া থাকে, তবে মির্জ্জা আলী মোহাম্মদ লিখিত 'বয়ান' কেন তাঁহার পয়গম্বরীর নিদর্শন হইবে না? অথচ কোরাণের ভাষা হজরত মোহাম্মদের মাতৃভাষা; আর 'বয়ানের' ভাষা আরবী, যাহা মির্জ্জা আলী মোহাম্মদের মাতৃভাষা ত নহেই, বরং সেই ভাষা শিক্ষা করিবার সুযোগও তিনি কখনো পান নাই। ১৯ বৎসর বয়সে এই বালক 'বাব' নাম ধারণ করিয়া এক নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিতে

(৩) Address by Abdul Baha in Paris, November 1911.

(৪) F. H. Strine.

আরম্ভ করেন। 'বাব' আরবী শব্দ---তাহার অর্থ দরওয়াজা। দরওয়াজা অর্থে তিনি এই মনে করিয়াছিলেন যে, তাহার মধ্য দিয়ে মানুষ দ্বাদশ ইমাম বা ইমাম মেহদীর শিক্ষা পাইবেন। এইটি জানা কথা যে, পারশ্যের মুসলমানেরা শিয়া মতাবলম্বী। এই শিয়া মতবাদের প্রভাবের উপরই 'বাব' ধর্ম্মের ভিত্তি। কাজেই বাব ধর্ম্মের গোড়ার কথা জানিতে হইলে, শিয়াদের মতামত সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার। শিয়াদের মতে হজরত মোহাম্মদ তাঁহার মৃত্যুর সময় তদীয় জামাতা হজরত আলীকে খলিফা পদে মনোনীত করিয়া যান। অন্যায় পক্ষপাতের ফলে হজরত আবুবকর, ওমর, ওসমান ক্রমাণ্বয়ে খলিফা-পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। হজরত ওস্‌মানের মৃত্যুর পর যদিও হজরত আলী খলিফা-পদে বৃত হইয়াছিলেন কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই গুপ্ত ঘাতকের হস্তে তিনি নিহত হন। এবং অতি অল্প দিনের মধ্যে তৎপুত্র ইমাম হাসান হোসেনও অতি নির্দ্দয়রূপে নিহত হন। কারবালার মরুপ্রান্তরে কনিষ্ঠ ইমাম হোসেনের অপূর্ব্ব আত্ম-দান হইতে শিয়াদের, তথা সমগ্র মোসলেম-জগতের, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শোকোৎসব মহরমের সৃষ্টি। ইমাম হোসেনের বংশধর আরও নয়জন ইমাম ক্রমাণ্বয়ে জন্মিয়া, আব্বাসীয় খলিফাগণের দ্বারা নিহত হইয়াছেন বলিয়া শিয়াদের ধারণা। শিয়া মতবাদ পারশ্যে অধিকতর জনপ্রিয় হইবার আরও একটী বিশেষ কারণ আছে। পারশ্যবাসীদের বিশ্বাস 'কাদেসিয়া' সমরে পারশ্যের 'সাসনীয়' বংশের শেষ সম্রাট তৃতীয় ইজদ্‌জোরদের কন্যা বন্দী হইয়া আরবে প্রেরিত হয় এবং তদ্‌সঙ্গে ইমাম হোসেনের বিবাহ হয় ;---এই সমস্ত ইমামেরা এই কন্যারই বংশধর। ধর্ম্মগুরু হজরত মোহাম্মদ এবং পারস্যের রাজপরিবারের বংশধর বলিয়াই হয়ত ইমামেরা পারশ্যে এত জনপ্রিয়। তাই শিয়াদের মত "Whosoever dies without recognizing the imm of his time, dies the death of pagan"। সুন্নীদের মত, কেয়ামতের পূর্ব্বে ইমাম মেহদী আবির্ভূত হইয়া আবার ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবেন। শিয়াদের মতে ইমাম হাসান হোসেনের বংশের দ্বাদশ বংশধরই ইমাম মেহদী। তিনি ৯৪০ (৫) খৃষ্টাব্দে লোকচক্ষু হইতে গা ঢাকা দিয়াছেন বটে কিন্তু

(৫) এই সমস্ত তারিখ লইয়া বিভিন্ন ঐতিহাসিকের মধ্যে মতানৈক্য আছে। আমি প্রচলিত মতই গ্রহণ করিয়াছি।

তিনি আজিও বাঁচিয়া আছেন, এবং এক দিন আবির্ভূত হইয়া পৃথিবীতে ন্যায় ও ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিবেন। তাই শিয়াগণ আজিও তাঁহার নাম উচচারণের সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া থাকে, আজুলাল্লাহ্ ফরজুহু (খোদা শীঘ্রই তাঁহার আবির্ভাব করুন)। শিয়াদের মতে ইমাম মেহদীর নিরুদ্দেশের পর ৬৯ বৎসর যাবৎ চারিজন মধ্যস্থ ব্যক্তির মধ্য দিয়া তিনি তাঁর শিক্ষাদীক্ষা শিয়াদের কাছে পাঠাইতেন। এই চারিজন প্রত্যেকেই "বাব" নামে পরিচিত ছিলেন। বাবিদের মতে মির্জ্জা আলী মোহাম্মদ অন্যতম বাব, ইমাম মেহদীর শিক্ষা প্রচারের জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন। এই বাবি-মতের মূল অনুসন্ধান করিতে গেলে আমাদিগকে আরও একটু পিছাইয়া যাইতে হয়। ইতিপূর্বে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে শেখ আহামদ আল্-আহ্সায়ী (১৭৩৩---১৮২৬) নামক এক ব্যক্তি শেখ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। ইঁহাদেরও মত ছিল ইমাম মেহ্দী এবং তাঁহার অনুসরণকারিগণের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের জন্য একজন মধ্যস্থ ছিল, যাহাকে তাহারা বাবের পরিবর্তে "শিয়াইকামেল" (পূর্ণ শিয়া) বলিত। শেখ আহামদের মৃত্যুর পর ছৈয়দ কাজেম নামক এক ব্যক্তি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। মির্জ্জা আলী মোহাম্মদ ও বাবি সম্প্রদায়ের অন্যতম নেত্রী পারশ্যের খ্যাতনামা মহিলা কবি কুররতোল আইন্ প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ বাবি নেতা এই শেখ সম্প্রদায়ের শিষ্য ছিলেন। সৈয়দ কাজেমের মৃত্যুর পর উনবিংশবর্ষীয় নবীন যুবক মির্জ্জা আলী মোহাম্মদ 'বাব' নাম ধারণ করিয়া ২৩শে মে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে সেই সম্প্রদায়ের নেতা হইয়া বসেন। কিন্তু সমস্ত শেখেরা তাঁহাকে ধর্মগুরু বলিয়া মানিয়া লয় নাই। যাহারা মানিয়া লয় নাই তাহারা শেখ নামে আজিও পারশ্যে টিকিয়া আছে। আর যাহারা তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিল, তাহারা ভবিষ্যতে বাবি নামে পরিচিত হইয়াছে। বাবীরা পৃথিবীর সমস্ত পয়গম্বর বা অবতারে বিশ্বাস করে; কিন্তু মুসলমানদের মত হজরত মোহাম্মদেই পয়গম্বরী খতম্ এই কথা বিশ্বাস করে না। তাহাদের মতে চিরকাল ধরিয়া যুগে যুগে পৃথিবীকে কল্যাণের বাণী শুনাইবার জন্য নব নব পয়গম্বর বা অবতারের সৃষ্টি হইবে। মির্জ্জা আলী মোহাম্মদ এই যুগের একজন

অবতার। পৃথিবীর সব ধর্ম্মকেই গোড়াতে অন্যান্য মতাবলম্বীগণের হাতে অত্যাচার উৎপীড়ন ও নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে। এই ধর্ম্মের ইতিহাসও তাহা হইতে মুক্ত নহে---পারশ্যের ওলামা সম্প্রদায় ও তাঁদের প্ররোচনায় পারশ্য সরকারের আদেশে শত শত বাবিকে শৃগাল কুক্কুরের মত প্রকাশ্য রাজপথে বড়ই নিষ্ঠুরতার সহিত হত্যা করা হইয়াছে। মির্জ্জা আলী মোহাম্মদ অর্থাৎ 'বাব' তাঁর ধর্ম্মপ্রচারের প্রথম বৎসর মক্কা পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। তথা হইতে ফিরিবার সময় 'বুশয়র' নগরের লোকেরা তাঁহার ধর্ম্মমতের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া নব উদ্যমে তিনি ধর্ম্ম-প্রচারে লাগিয়া পড়েন এবং শীরাজনগরে পৌঁছিয়া ঘোষণা করেন---হজরত মোহাম্মদের 'মিসন্' শেষ হইয়াছে এবং তিনি নব মত প্রচারের জন্যে প্রেরিত হইয়াছেন। ইহাতে শীরাজবাসীরা উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং তাঁহার গৃহ আক্রমণ করিয়া অতি নির্দয়ভাবে প্রহারের পর তাঁহাকে বন্দী করে। ১৮৪৫-এর সেপ্টেম্বর হইতে ১৮৪৬-এর মার্চ পর্য্যন্ত তিনি শীরাজ নগরে বন্দী ছিলেন। তথা হইতে কোন প্রকারে পলাইয়া ইস্পাহানে যান। সেখানে আবার ধৃত হইয়া মাকুতে (Maku) প্রেরিত হন। তথা হইতে আবার চিহরিক্ (Chihrik) নগরে তাঁহাকে স্থানান্তরিত করা হয়। অত্যাচার উৎপীড়ন যতই বাড়িতে লাগিল, তাহাতে সুবিধা এই হইল যে, ধীরে ধীরে বাবিমত চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ইহা পারশ্য সরকারের সহ্য হইল না। তাই এই ধর্ম্মকে সমূলে উৎপাটনের জন্য, তাহার প্রবর্ত্তক মির্জ্জা আলী মোহাম্মদকে তাহারা ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ্য রাজপথে গুলি করিয়া হত্যা করিল। কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্য সফল হইল না। বাবের মৃত্যুর সময় তিনি মির্জ্জা এহিয়া নামক একটী উনবিংশবর্ষীয় যুবককে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া যান। এই যুবক পরে 'সুবেহ্-এজেল্' নামে পরিচিত হন। তিনি বালক বলিয়া তাঁর পরিবর্ত্তে তাঁর বৈমাত্রেয় বড় ভাই মির্জ্জা হোসেন আলী---যিনি পরে বাহাউল্লাহ নামে পরিচিত হন---সমস্ত সম্প্রদায়কে পরিচালনা করিতেন। ১৮৫২ খৃঃ কয়েকজন বাবি পারশ্যের

তদানীন্তন সম্রাট নাসিরউদ্দিন শাহকে (৬) হত্যা করিবার চেষ্টা করে। এই হইতে বাবিদের উপর অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়িয়া যায়। এই সময় মহিলা বাবি 'কুররতোল আইন' সহ প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বাবিদিগকে হত্যা করা হয়। পারশ্যের প্রত্যেক সম্প্রদায় এই হত্যা-যজ্ঞে যোগ দিয়াছিল। এই সময় কোন প্রকারে সুবেহ্ এজেল ও বাহাউল্লাহ্ বাগদাদ পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করেন। ১৮৫৩ হইতে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাগদাদ বাবি সম্প্রদায়ের কেন্দ্রভূমি ছিল। এখানে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে সুবেহ্ এজেল এবং বাহাউল্লার মধ্যে মতবিরোধ জাগিয়া উঠে। 'বাব' অর্থাৎ মির্জ্জা আলী মোহাম্মদ শেষ বয়সে ঘোষণা করিয়াছিলেন---তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহা হইতেও শ্রেষ্ঠ এক মহাপুরুষ আবির্ভূত হইবেন, যাঁহার অগ্রদূত মাত্র তিনি। এখন মির্জ্জা হোসেন আলী অর্থাৎ বাহাউল্লাহ্ 'বাব' কথিত সেই মহাপুরুষ বলিয়া দাবী করিয়া বসিলেন। আগেই বলা হইয়াছে---সুবেহ্ এজেলের অল্পবয়স্কতার জন্য বাহাউল্লাহ্ সমস্ত সম্প্রদায়ের পরিচালনা করিতেন। কাজেই সমস্ত সম্প্রদায় তাঁহারই প্রভাবাধীন হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং তাঁহার এই নূতন দাবীকেও অধিকাংশ শিষ্য মাথা পাতিয়া লইল। সুবেহ্ এজেলের নেতৃত্বে যাহারা টিকিয়া রহিল, তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য ছিল। এই দুই দলের মত-বিরোধ ক্রমে বিবাদে পরিণত হয়। তখনও বাগদাদ তুরস্কের অধীন ছিল। Mandatoryর নামে এই নাবালক দেশটির উপর মুরুব্বিয়ানা করিবার খেয়াল তখনও ফরাসীরা কার্য্যে পরিণত করিতে পারে নাই। তুরস্ক গভর্ণমেণ্ট একই সম্প্রদায়ের এই বিবদমান শাখা দুইটিকে বাগদাদ হইতে বিতাড়িত করিয়া দেয়। প্রথমে ইহারা তুরস্কের রাজধানী কনষ্টাণ্টিনোপলে নীত হয়। পরে সেখান হইতে তাহাদিগকে আদ্রিয়ানোপলে নির্ব্বাসিত করা হয়। এখানেই বাহাউল্লাহ সুবেহ্ এজেলের সঙ্গে সমস্ত বন্ধন ছেদন করিয়া ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে নিজেকে বাবকথিত অবতার বলিয়া ঘোষণা করেন। এখন হইতে উভয় মতাবলম্বীদের মধ্যে বিবাদ ঘোরতর হইয়া উঠে। ইহাতে তুরস্ক সরকার বিরক্ত

---

(৬) ১৮৯৬ খৃঃ ১লা মে মির্জ্জা মহম্মদ রেজা নামক এক ব্যক্তি ইহাকে হত্যা করে। Persian Revolution by E. G. B.

হইয়া এজেলীদিগকে সাইপ্রাসে এবং বাহাইদিগকে সিরিয়ার এক্কা (Acre) নগরীতে নির্ব্বাসিত করেন। বলা বাহুল্য, সুবেহ্ এজেলের অনুসরণকারীগণকে আজলী এবং বাহাউল্লার অনুসরণকারীগণকে বাহাই বলা হয়। আজলীদের সংখ্যা খুবই নগণ্য ছিল, এমন কি তাদের সংখ্যা ত্রিশের অধিক ছিল না। কিন্তু বাহাইদের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিল এবং দেখিতে দেখিতে এক্কা নগরী বাহাই ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হইল। সমস্ত বাবি সম্প্রদায় এই হইতে বাহাই নামে অভিহিত হইতে লাগিল। আজলীদিগকে No changers বলিলে ঠিক বলা হয়। ইহারা বাব-প্রচারিত রীতিনীতির বাহিরে পা দিতে অনিচ্ছুক আর বাহাইরা ছিল পরিবর্ত্তনশীল। বাহাউল্লাহ বাব-প্রচারিত মতামতের উপর নিজের সাধনালব্ধ অনেক স্বাধীন চিন্তা যোজনা করিয়া বাহাই ধর্ম্মকে আরও উদার ও ব্যাপক করিয়া তুলিয়াছেন।

বাবি এবং পারশ্য সরকারের মধ্যে যখন ঘোর কোন্দল চলিতেছিল—অসংখ্য বাবির রক্তদানেও যখন পারশ্য সরকারের জিঘাংসাবৃত্তি চরিতার্থ হইল না, তখন বাহাউল্লাহ নিজের শিষ্যদের মধ্যে অহিংসা মন্ত্র প্রচার করেন। তিনি বলিলেন, 'সত্য এবং ধর্ম্ম প্রচারের জন্যে মারামারি করা কিছুতেই উচিত নয়---বিশ্বাসীদের আত্মদানের উপর সত্যের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়িবে। অন্যের রক্তপাতের পরিবর্ত্তে নিজের রক্ত দানই শ্রেয়। এই হইতে বাহাইরা আর সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাধা দেয় নাই; বরং দলে দলে অম্লান বদনে ধর্ম্মের জন্য আত্মদান করিয়াছে। এই নির্ব্বিকার নিঃস্বার্থ আত্মদান বাহাই ধর্ম্মের প্রতি মানুষকে অধিকতর আকৃষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। ইসলামের শৈশব জীবন যেমন তাহার অনুরক্ত ভক্তগণের নিঃস্বার্থ আত্মদানের ঔজ্জ্বল্যে উজ্জ্বল ও মহীয়ান হইয়া রহিয়াছে—এই নব ধর্ম্মের শৈশব জীবনও সেই একই অনুবৃত্তির গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া আছে। ইহারা অসহিষ্ণু অত্যাচারীর হাতে অম্লান বদনে নিজের শেষ রক্তবিন্দুটি পর্য্যন্ত দান করিয়াছে; তথাপি নিজের ধর্ম্মবিশ্বাস ত্যাগ করে নাই। ইহারা নিজের ধর্ম্মগুরুকে এত বেশী ভক্তি করিত যে, তাঁহার

জন্য যে কোন মুহূর্ত্তে, এমন কি অতি অবিবেচনার সহিতও প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকিত। যখন আজলীদিগকে সাইপ্রাসে এবং বাহাইদিগকে একাতে নির্ব্বাসিত করা হয়, তখন তুরক সরকার একজন বাহাইকে আজলীদের সঙ্গে তাদের কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণের জন্য সাইপ্রাসে যাইতে বলেন। ইহাতে সে নিজের ধর্ম্মগুরুর সঙ্গে বিচ্ছেদের আশঙ্কায় নিজের গলায় ছুরি বসাইয়া দিয়া এই আদেশের প্রতিবাদ করে; এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই আদেশ প্রত্যাহৃত হয় নাই ততক্ষণ পর্য্যন্ত ক্ষতস্থানে ঔষধ প্রয়োগ বা ব্যাণ্ডেজ করিতে দেয় নাই। একবার এক বৃদ্ধ শেখ অনেকগুলি চিঠি সহ সরকারের হস্তে বন্দী হন। চিঠিগুলি বিভিন্ন বাহাই কর্ত্তৃক তাঁদের নেতার উদ্দেশে লেখা। চিঠিগুলি ধরা পড়িলে লেখকগণের নাম ঠিকানা সরকার জানিতে পারিয়া শাস্তি দিতে পারে এই আশঙ্কায় এবং চিঠিগুলিকে অন্য কোন প্রকারে ধ্বংস করিতে না পারিয়া—বৃদ্ধ শেখ এক একটি করিয়া চিঠিগুলি গিলিয়া ফেলেন। কাগজ চিবাইবার যাদের অভ্যাস আছে তারা জানে ইহা মুখরোচক কিছুতেই হয় নাই। চিঠির সংখ্যাও নেহাৎ কম ছিল না। তদুপরি একখানি চিঠি নাকি খুব প্রকাণ্ড ছিল—যাহা গিলিতে ভদ্রলোককে বেজায় বেগ পাইতে হইয়াছিল। সে যাই হউক, বহু কষ্টের পর নিজের পৈতৃক জীবনকে বিপন্ন করিয়া তিনি সব চিঠিগুলি গলাধঃকরণ করিয়াছিলেন।

বাহাউল্লাহ বিশ্ব-মানবের ভ্রাতৃত্ব ঘোষণা করেন। মানুষ মানুষের ভাই ইহাই তাঁহার মত। ধর্ম্ম এবং দেশের গণ্ডিকে ডিঙ্গাইয়া মানুষ এক হউক ইহাই তাঁহার মিশন। তিনি লিখিয়াছেন:—

"Ye are all leaves of the same tree, and drops of one ocean, We desire only the good of the world and the happiness of the nations, that they may become one in faith and all men may live together as brothers; that the bonds of affections and unity between the sons of men may be strengthened; that diversities of religions may cease, and difference of race be annulled; mankind becoming one kindred and one family, Let not a man glory in that he loves his country, let him rather take pride in this—that he loves his kind."

বাহাউল্লাহ তাঁহার ধর্ম্মমত গ্রহণের জন্যে তদানীন্তন বিভিন্ন রাজন্যবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। পারশ্যের নাসিরউদ্দিন শাহ, মহারাণী ভিক্টোরিয়া, রুশিয়ার জার, ফ্রান্সের তৃতীয় নেপোলিয়ন, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সভাপতি এবং ইটালীর পোপকে এক একটি স্বতন্ত্র পত্র লিখিয়া তাঁহার মিশন গ্রহণের জন্যে আহ্বান করিয়া পাঠান। পারশ্য সম্রাট নাসিরউদ্দিন শার কাছে যে দূত এই পত্র বহিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহার দুঃসাহসের জন্য সম্রাটের আদেশে তাহাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হইয়াছিল। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাহাইদের উপর পারশ্য সরকারের অত্যাচারের মাত্রা অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু তথাপি বাহাইরা নিজেদের মত প্রচারে নিরস্ত হয় নাই। বরং তাহারা এই সময় হইতে আরও নব উদ্যমে বিভিন্ন দেশে বিশেষ করিয়া ইউরোপ আমেরিকায় তাহাদের ধর্ম্মমত প্রচারের চেষ্টা করে; এবং ইহাতে তাহারা আশাতিরিক্ত কৃতকার্য্যও হইয়াছে। একজন ইংরেজ লেখক লিখিয়াছেন। "Persia, Syria and Egypt are full of the leaven of Bahaism, from every European countries engineers and proselytes are flocking to its standard, The United States of America is a specially favourable culture-ground for the beneficient microbe or brotherhood." আমেরিকায় এই নব ধর্ম্ম খুব দ্রুত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে—অল্প দিনের মধ্যেই কয়েক সহস্র আমেরিকান এই নব ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। চিকাগো শহরের নিকটেই ইহাদের বৃহৎ ভজনালয় নির্ম্মিত হইয়াছে। বাহাইরা প্রায় সকলেই শিক্ষিত এবং বিদ্যোৎসাহী। তাই অল্প দিনের মধ্যেই ধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা নিজেদের একটী সাহিত্যও গড়িয়া তুলিয়াছে। এমন কি আমেরিকার দীক্ষিত বাহাইরাও নিজেদের একটী আলাদা সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে। ১৮৯২ খৃঃব্দের ১৬ই মে বাহাউল্লার মৃত্যু হয়। তৎপুত্র আব্বাস এফেন্দী—যিনি আবদুল বাহা নামে পরিচিত—তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। বাহাউল্লার মিশন প্রচারের জন্যে আবদুল বাহা ১৯১১ খৃষ্টাব্দে একবার ইউরোপে গিয়াছিলেন—এবং প্যারিসের এক সাধারণ সভায় তিনি ইয়োরোপকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন—"Let us serve the cause of human unity treating all men as brothers and

equals.'' ইহাই বাহাই ধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এখন ইহাদের কয়েকটী মতামত ও আচার-পদ্ধতির উল্লেখ করিয়া আপনাদিগকে এই ধৈর্য্যের পরীক্ষা হইতে রেহাই দিব।

বিশ্বমানবের একতা ও মিলন বাহাই ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। এ মিলন যাহাতে সম্ভব হয় সে জন্য বাহাউল্লাহ্ সমস্ত পৃথিবীর জন্য এক সাধারণ ভাষা সৃষ্টির উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীর শান্তির জন্য রাজশক্তিগুলিকে নিরস্ত্রীকরণ (disarmament) আবশ্যক এমন কি, কোন ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষেও যুদ্ধের সময় ছাড়া অস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ বলিয়াছেন। বিভিন্ন শক্তিসমূহের বিবাদ মীমাংসার জন্য শক্তিসমূহের প্রতিনিধি লইয়া এক সালিশী বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। 'বাব' ভগবানে পঁহুছিবারই বাব (দরওয়াজা)। একজন বাবের প্রচারিত শিক্ষা দীক্ষা যুগের অনুপযোগী হইলে অন্য একজন বাব নূতন মিশন লইয়া আবির্ভূত হয়। কোন শিশুকে তার অপরাধের জন্য শাস্তি দেওয়া নিষেধ। কারণ, হয়ত এই শিশুতেই ভবিষ্যতের বাব সুপ্ত আছে—কে বলিতে পারে এই শিশুই ভবিষ্যতের 'বাব' নহে! পৌরহিত্য ইহাদের সমাজে নাই—বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, ভিক্ষাবৃত্তি এই সমস্তকে কঠোর ভাবে বর্জ্জন করা হইয়াছে। কর্মকে উপাসনা মনে করিতে হইবে---সকলকেই কোন না কোন ব্যবসা করিতে হইবে। এই রকমে পৃথিবীতে বেকার-সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। বালক-বালিকাকে সমানভাবে বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া ধর্ম্মের মত মনে করিতে হইবে। যাদের নিজেদের সন্তান-সন্ততি নাই—তারা অন্য কারও একটি ছেলের শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করিবে। প্রত্যেকে নিজের আয়ের কতকাংশ দান করিবে। সেই দানভাণ্ডার হইতে নির্ব্বাচিত বোর্ড কর্ত্তৃক বিধবা, অসমর্থ, রোগা ও এতিমদের শিক্ষা-দীক্ষা ও লালন পালনের জন্য অর্থ ব্যয়িত হইবে। নারী-পুরুষের অধিকার সমান বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে; এবং নারীকে স্বাধীনতা দিতে হইবে। বিবাহ এক স্ত্রীতেই সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে। দাসত্ব, পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা, নেশাভাঙ ইত্যাদি একেবারেই নিষিদ্ধ। কাহাকেও জোর করিয়া ধর্ম্মে দীক্ষিত করা বা কাহাকেও ভিন্ন ধর্ম্মমতের জন্য শাস্তি দেওয়া নিষিদ্ধ।

ইহাদের কাছে ১৯ সংখ্যাটা খুবই পবিত্র। কারণ, শিয়াদের মতে হজরত আলী না কি বলিয়াছেন সমস্ত কোরাণের সারাংশ সুরা ফাতেহাতেই (৭) নিবদ্ধ এবং সুরা ফাতেহার তথা সমস্ত কোরাণের সারাংশ এক বিশ্মিল্লাতেই সংবদ্ধ। এই "বিশ্মিল্লাহি রহমানির রহিম"-এ ১৯টি অক্ষর আছে। তিনি না কি আরও বলিয়াছেন, সমস্ত, বিশ্মিল্লার সারাংশ বিশ্মিল্লার 'বে' অক্ষরের নক্তাতেই নিবদ্ধ। কাজেই তাহাদের মতে এই নক্তাতেই সমস্ত কোরাণের সারাংশ নিহিত আছে। তাই বাবি বা বাহাইরা তাদের ধর্ম্মগুরুকে নক্তা বা Point'ও বলিয়া থাকে। আবার এই নক্তার সঙ্গেও ইহারা ১৯এর একটা সংযোগ করিয়াছে। 'বে'তে এই নক্তা মাত্র এক্‌টি। একের আরবী "ওয়াহেদ"। আরবীতে বর্ণাক্ষরের সংখ্যা নির্ণয়ের একটা হিসাব আছে; তাহাকে আবজাদী হিসাব বলে। অনেকেই দেখিয়াছেন, মুসলমানেরা চিঠির উপর আরবীতে (৭৮৬) লিখিয়া থাকে। ইহা সমস্ত বিশ্মিল্লার অক্ষরগুলির সংখ্যা। এই আবজাদী হিসাবে "ওয়াহেদের" সংখ্যাও হয় ১৯ (যেমন ওয়া---৬; আলেপ---১; হে---৮; দাল---৪; মোট ১৯)। তাই ১৯ ইহাদের কাছে খুবই পবিত্র। ১৯ দিনে ইহাদের মাস হয় এবং ১৯ মাসে ইহাদের বৎসর। ইহারা রোজাও রাখে ১৯টা। ইহারা নমাজ পড়ে দিনে তিন বার সকালে, সন্ধ্যায় ও দুপুরে---প্রত্যেক ওক্তে তিন রাকাৎ মাত্র। ইহারা মক্কার দিকেই মুখ করিয়া নমাজ পড়ে অর্থাৎ মক্কা ইহাদেরও কেব্‌লা। প্রবাসে শুধু একবার 'সুবহানল্লাহ্' বলিলেই সারে। ইহাদের এক জানাজার নমাজ (অর্থাৎ সমাধির সময়ের নমাজ) ছাড়া আর সব নমাজ জমাতের পরিবর্ত্তে একলা পড়াই নিয়ম। নমাজ জমাতে না পড়িলেও মসজিদ নির্ম্মাণের হুকুম আছে।

ইহাদের পুরুষেরা সালাম করে "আল্লাহো আক্‌বর" (আল্লাই সর্ব্বপ্রধান) বলিয়া; আর উত্তর দেয়, আল্লাহো আজম (আল্লাই সর্ব্বশক্তিমান)। মেয়েরা সালাম করিবার সময় আল্লাহো আজমল্‌ (আল্লাহ্ সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর) আর উত্তর দেয় আল্লা সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল বলে।

(৭) কোরাণের মুখবন্ধ।

বাহাইদের মতে অন্যের জন্য খোদার কাছে ক্ষমা চাওয়া নিষেধ। অপরাধী যে সে নিজেই অনুতপ্ত হইয়া খোদার কাছে ক্ষমা চাহিবে। চুরি করিলে প্রথম দুই একবার জেলে দেওয়া হইবে; তার পরও যদি চুরি করে তবে তার কপালে এমনভাবে দাগ কাটিয়া দিতে হইবে, যাতে সে যেখানে যায়, সেখানে লোকে তাকে চোর বলিয়া চিনিতে পারে। মাথার চুল একেবারে মুড়াইয়া ফেলা নিষেধ; তবে বগলের নীচেও যাতে না যায়। তবে সুখের বিষয় দাড়ী মুড়ান নিষেধ নহে। গান বাজনা করারও অনুমতি আছে। অপ্রচলিত অর্থাৎ dead language পড়া নিষেধ। এবং প্রত্যেক বই ২০২ বৎসর পরে এক একবার নূতন করিয়া লেখা উচিত। কোন বাবি বা বাহাইর সংসর্গে আসিবার সুযোগ আমাদের ঘটে নাই—কারণ বাংলাদেশে কোন বাহাই আছে কি না আমরা জানি না। যাঁহারা বাহাইদের সঙ্গে মিলিবার সুযোগ পাইয়াছেন তাঁহারা তাহাদিগকে খুব উদার, কুসংস্কারবর্জ্জিত ভদ্র বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। একজন আরমেনিয়ান লিখিয়াছেন---
I like the Babis because of their freedom from prejudice, and openhandedness ; they will give you anything you ask them for without expecting it back, though on the other hand they will ask you for anything they want and not return it unless you demand it. তাদের এই স্বভাবের জন্য কেহ কেহ তাহাদিগকে communist বলিয়াও ধারণা করিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা communist নয়। প্রাচ্যবিদ্যায় সুপণ্ডিত, Literary History of Persia ও Persian Revolution প্রভৃতি গ্রন্থের খ্যাতনামা লেখক মনীষী E.G. Brown লিখিয়াছেন—"I have found the Babis as a general rule men of learning reasonable and humane." মানবজাতির চিন্তা-ধারার এই নব প্রসূনটি জগতের কতখানি কল্যাণ করিবে, তাহার হিসাব-নিকাশ করিবার সময় এখনও আসে নাই; কারণ, মাত্র ৭০।৮০ বৎসর একটি ধর্মের জীবনে কিছুই নয়। তবে এই কথা সত্য যে, বিশ্বের ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক এই নব ধর্ম্মকে উপেক্ষা করিতে পারিবে না।

মাঘ, ১৩৩৩

অবনীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পর থেকে দেশীয় চিত্রশিল্পের পুনর্জ্জন্ম লাভ ঘটেছে---এইটী হ'ল আমলের প্রচলিত মত। সঙ্গে সঙ্গে এই মন্তব্যও শোনা যায় যে, এই চিত্র-শিল্পের অর্থকরী সাফল্য তেমন হচ্ছে না। অন্যান্য সভ্যদেশে চিত্রশিল্পের যে চাহিদা ও আদর, তার তুলনায় এদেশে তার চাহিদা ও আদর অতি নগণ্য। কাজেই চিত্র-শিল্প এ দেশে আশানুরূপ পৃষ্টপোষকতা পাচ্ছে না। এই আর্থিক পৃষ্টপোষকতার অভাবে দেশীয় চিত্র-শিল্পের উন্নতি ব্যাহত হচ্ছে এবং প্রতিভাবান শিল্পীদেরও বাধ্য হয়ে চাকরী করে জীবিকার্জ্জন কর্‌তে হচ্ছে। অথবা স্বল্প পুঁজি ও সঙ্কীর্ণ আয়োজনের মধ্যে নিজেদের আশা-আকাঙ্খা কল্পনা ও সাধনাকে সীমাবদ্ধ রেখে কায়ক্লেশে দিন কাটাতে হচ্ছে। ভারতীয় চিত্র-শিল্প সম্বন্ধে এই সব মন্তব্য যে কিছুমাত্র অতিরঞ্জন নয়; এ বোধ করি সকলেই স্বীকার করবেন।

স্বদেশের নব-জাগ্রত চিত্র-কলার প্রতি দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এই যে অবহেলা ও অনাদর এর মূলে, আমার মনে হয়, আমাদের কলা-শিল্প-জ্ঞানের অভাব ও অজ্ঞতাই দায়ী। অবশ্য, শিল্প-ভাকর্য্য ইত্যাদি সুকুমার কলা কোনদিনই জন-প্রিয় ছিল না, হয়ত কোনদিন জনপ্রিয় হবেও না। তবুও বোধ হয়---এসব শিল্পকলার সমজদারের সংখ্যা আমাদের দেশের মত এত শোচনীয়রূপে সীমাবদ্ধ অন্য কোন দেশেই নয়। মনে হয় চেষ্টা কর্‌লে আমাদের দেশেও শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে শিল্প-সমজদার ও শিল্প-বোদ্ধার সংখ্যা সহজেই বাড়ানো যেতে পারে। এবং এও বোধ হয় সত্য যে এই সমজদারের সংখ্যা বৃদ্ধির উপরই ভারতীয় চিত্র-শিল্পের ভবিষ্যৎ নির্ভর কর্‌ছে। অবনীন্দ্রনাথের সামর্থ্য, নন্দলালের বিশ্বভারতীর আনুকূল্য, উকিল-ভ্রাতৃদ্বয়ের সুযোগ, দেবীপ্রসাদ, অসিতকুমার, মুকুল দে, আবদুর রহমান চাঘ্‌তাই

ইত্যাদির মত চাকুরী লাভ, চিরকাল ধরে সব শিল্পীর ভাগ্যে জুটবে, এ কিছুতেই কল্পনা করা যায় না। অথচ সাধারণ লোকের মত শিল্পীদের জীবনেও তেল নুন্ লাকড়ী'র ভাবনা কিছুমাত্র কম নয় এবং ভাল ছবি আঁকতে পারেন বলেই যে কোন দোকানদার এঁদের কাছ্ থেকে 'তেল নুন্ লাকড়ী'র দাম এক কড়া ক্রান্তিও কম নেবেন, এও আশা করা যায় না। কাজেই চিত্র-শিল্পের মূল্যের উপরই শিল্পীদের নির্ভর করতে হবে, এবং তা দিয়েই তাঁদের বাঁচতে হবে।—অথচ শিক্ষিত সাধারণের মনে যদি শিল্প-বোধ না জাগে, তাঁরা যদি ছবির অর্থ বুঝতে না পারেন, তাঁদের কাছ্ থেকে কোন ছবির যথাযথ মূল্য কিছুতেই আশা করা যায় না। শুধু গৃহ-সজ্জার জন্যে তাঁরা অবনীন্দ্রনাথের 'শাহজাহানের মৃত্যুশয্যা'ও 'পথ-চলার শেষ', বা নন্দলালের 'সতী'র চেয়ে হলিউডের অভিনেত্রীদের ছবিই যে বেশী পছন্দ করবেন---এতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে! মাঝে মাঝে আমাদের দেশের কোন কোন শিক্ষিত লোকের মুখে রাফেল, দা-ভিঞ্চি ইত্যাদি বিদেশী নামজাদা, শিল্পীদের সুপ্রসিদ্ধ দু-একখানি ছবির নামও শুন্‌তে পাওয়া যায়, অথচ এঁরা অবনীন্দ্রনাথ বা নন্দলালের কোন ভাল ছবির নাম করতেও পারেন না! সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করে দেখ্‌লে এই বিষয়ে আমাদের শোচনীয় অজ্ঞতা অধিকতর পরিস্ফুট হবে। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল এমন কি অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত ও কম শক্তিমান লেখকদের লেখার সঙ্গে আমাদের যে পরিচয়, সে পরিচয় দেশের শিল্প-কলার সঙ্গে আমাদের নেই;---আমাদের সাহিত্যের ভাল বই, গল্প-কবিতা এমন কি চরিত্রের নামও অধিকাংশ শিক্ষিত লোক (স্কুল কলেজের ছাত্রদের মধ্যেও অনেকেই) করতে পারবেন; অথচ দেশের বড় বড় শিল্পীদের আঁকা ভাল ভাল ছবিগুলির নাম শিক্ষিত সমাজের হাজার-করা একজন ও কর্‌তে পারবেন কিনা সন্দেহ। অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিতরা যদি চিত্রকলার অর্থ না বোঝে তা'তে বিশেষ দুঃখ করার থাকে না, কিন্তু দেশের শিক্ষিত মণ্ডলী, বিশেষতঃ কবি-সাহিত্যিক, শিক্ষক-অধ্যাপক, সম্পাদক, দেশনেতা ও অভিজাত সম্প্রদায়, যাঁরা দেশের সমৃদ্ধ ও বিদগ্ধ মনের প্রতিনিধি, তাঁরা যদি দেশের শিল্প-কলার সঙ্গে পরিচয় না রাখেন এবং

স্বদেশের বড় বড় শিল্পীদের আঁকা ছবির অর্থ বুঝতে ও তার কদর করতে না জানেন তা হ'লে সত্যিই পরিতাপের বিষয় বই কি।

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্যের কলিকাতা অধিবেশনের শিল্প-বিভাগের সভাপতি সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী দেবীপ্রসাদ--ছবির সঙ্গে কাব্যের তুলনা করেছিলেন, মনে পড়ে। তিনি সেই প্রসঙ্গে আরও বলেছিলেন—কাব্যে অস্বাভাবিক উপমা পড়ে আমরা বিস্ময় প্রকাশ করি না, অথচ ছবিতে অস্বাভাবিকতা দেখ্‌লে আমরা 'ওরিয়েণ্টাল্ আর্ট' ব'লে হাসি আর নাক সিঁট্‌কাই। তাঁর ভাষা আমার স্মরণ নেই, তবে এই ধরণের অভিযোগ তিনি করেছিলেন তা মনে পড়ে। অভিযোগটী যে সত্য সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মনে হয় ছবি ও কাব্যের প্রতি পাঠকের এই যে বিভিন্ন ব্যবহার তার মূলেও একই কারণ বিদ্যমান। কাব্যের অর্থ ভাষা ও ছন্দ আমরা বুঝি, না বুঝ্‌লেও বুঝিয়ে দেওয়ার লোকের অভাব হয় না। কিন্তু ছবির অর্থ ভাষা ও টেকনিক আমরা বুঝি না এবং সারা শহর খুঁজেও বুঝিয়ে দেওয়ার লোক পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

ভারতীয় শিল্পের একটা নিজস্ব ভাষা আছে এবং প্রত্যেক শিল্পীর আলাদা স্বকীয় টেক্‌নিক আছে। এবং আছে বলেই ইউরোপীয় ছবি থেকে জাপানী ছবি আর জাপানী ছবি থেকে ভারতীয় ছবি বিশিষ্টরূপে পৃথক;---এবং একই 'স্কুল' ও আদর্শভূক্ত হওয়া স্বত্বেও অবনীন্দ্রনাথের ছবি থেকে নন্দলালের ছবি বা নন্দলালের ছবি থেকে অসিত কুমারের ছবি পৃথক ও আলাদা---যেমন পৃথক ও আলাদা রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে শরৎচন্দ্রের রচনা---বা শরৎচন্দ্রের রচনা থেকে নজরুল ইসলামের রচনা।---তাই মনে হয়, ছবি বুঝতে হ'লে ছবির ভাষা ও শিল্পীর টেক্‌নিকের সঙ্গে ছবি-পাঠকের পরিচয় থাকা দরকার। দেশের শিল্পানুরাগীদের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত---এবং শিক্ষিত সমাজ যাতে আমাদের দেশের বড় বড় শিল্পীদের ভাল ভাল ছবিগুলোর পরিচয় পেতে পারেন তার ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয়। আমার মনে হয় দেশের সাময়িক পত্রিকাগুলো এ বিষয়ে কিছুটা দায়িত্বগ্রহণ করতে পারে। তাঁরা যদি মাসে মাসে অবীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, দেবীপ্রসাদ ইত্যাদি বড় বড় শিল্পীদের

ভাল ভাল ছবিগুলোর প্রতিলিপি ও সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত শিল্পসমজদারদের লেখা ঐ সব ছবির বিস্তৃত পরিচয় ছাপেন তা'হলে শিক্ষিত সমাজে ছবিগুলো সহজে পরিচিত হতে পারে এবং দেশের মানুষের মনে শিল্পবোধ জাগাবারও একটা সুযোগ হয়।

রবীন্দ্রনাথের ছবি বিদেশে, শিল্প-সমজদারদের সমাদর লাভ করেছে অথচ শিল্প-ভাষা-জ্ঞানের অভাবে, আমাদের শিক্ষিত মহলে ঐ গুলো এখনো হাসির বিষয় হয়েই আছে।

জাতীয় চিত্র-শালা, জাতীয়-চিত্র-শিল্পকে অমরত্ব দানের অন্যতম উপায়। কিন্তু জাতীয় চিত্র-শালা এখনো আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। ভারতীয় চিত্র-কলার এই যে নূতন যুগ তার প্রবর্ত্তক বাংলাদেশ এবং আজও বাংলাদেশের কৃতী শিল্পীরাই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এই শিল্পের পৌরোহিত্যে রত। কাজেই এতদিনে অন্ততঃ বাংলাদেশে, একটি জাতীয় চিত্র-শালা প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু মনে হয় যতদিন চিত্র-শিল্প শিক্ষিত সমাজে দুর্ব্বোধ্য থেকে যাবে ততদিন পর্য্যন্ত চিত্র-কলার জন্য তাঁদের কাছ থেকে কোন প্রকার অর্থকরী পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া যাবে না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কর্পোরেশন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল ইত্যাদি বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলি যদি সমবেতভাবে সহযোগীতা করেন তাহ'লে কলিকাতায় একটা জাতীয় চিত্র-শালা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ভবিষ্যতে সরকারী রাজস্ব-নিয়ন্ত্রণের ভার যদি দেশীয় লোকদের হাতে আরও ব্যাপকভাবে আসে, সরকারের পক্ষেও এই জাতীয় দাবীর প্রতি বেশী দিন উদাসীন থাকা তখন সম্ভব হবে না। বর্ত্তমানে সরকারী স্কুল-কলেজগুলিতে, লাইব্রেরীর সাহায্য বাবদ সরকার কিছু কিছু অর্থ সাহায্য দিয়ে থাকে। সেই সঙ্গে কর্ত্তৃপক্ষ যদি প্রত্যেক স্কুল-কলেজে ছোট-খাট এক একটি চিত্রশালা (স্কুল লাইব্রেরী বা কমন রুমেও তা হতে পারে) প্রতিষ্ঠার আদেশ ও সেই বাবদ কিছু কিছু অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা করে তা'হলে আমাদের দেশের ছেলে মেয়েদের স্কুল-কলেজ থেকেই শিল্প-শিক্ষা আরম্ভ হ'তে পারে। সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়-গুলিতে ড্রইং শিক্ষকের যে-পদ আছে সেগুলির মূল্য যদি আরও বাড়ানো হয়, এবং আধুনিক ভারতীয় চিত্র-কলার জ্ঞান ও পরিচয় আছে এমন

লোক যদি ঐ পদে নিযুক্ত হন, তাহলে শিক্ষার গোড়া থেকেই শিক্ষার্থীরা ভারতীয় চিত্র-শিল্পের ভাষা ও টেকনিকের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেতে পারে। এবং ভারতীয় চিত্র-শিল্প অজ্ঞলোকের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ থেকেও রেহাই পেয়ে একটা স্থায়ী উন্নতির উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে।

১৩৩৪ (আনুমানিক)

যৌন-জ্ঞান

এই পৃথিবীর বুকে মানব-সৃষ্টি সম্বন্ধে আমরা এখনও নিঃসন্দেহ হ'তে পারিনি। প্রাচীন হিব্রু মতবাদ যা কালক্রমে খৃষ্টান ও ইসলামের সমর্থন পেয়ে এসেছে, তা'তেও ডারউইন পন্থীরা সন্দেহের অবতারণা করেছেন। অথচ ডারউইন পন্থীদেরও আমরা দ্বিধাশূন্য অন্তরে স্বীকার করে নিতে পারছি না। কাজেই আরও বহুবিধ রহস্যের মত মানব-ইতিহাসে মানবের উৎপত্তিও এখন বিরাট রহস্যই রয়ে গেছে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, যে ভাবেই মানুষ এই পৃথিবীতে আসুক না কেন, সৃষ্টির আদি হ'তে আজ পর্য্যন্ত মানুষের জীবনে যৌন-আকাংখা ও তার তীব্রতা সমানভাবেই চলে আস্‌ছে। এই যৌন সম্পর্ক যদিও মানব জীবনে একটি তীব্রতম পুলকের অভিজ্ঞতা, তবুও এর প্রধান কাজ মানব-বংশের ধারাবাহিকতা ও স্থায়িত্ব রক্ষা করা। উদ্ভিদ ও জগতের প্রত্যেক স্তরেও এই যৌন-সম্পর্ক কোন-না-কোন প্রকারে বিদ্যমান আছে। না থেকে উপায় নেই, কারণ এর উপর প্রত্যেক species এর আয়ু নির্ভর করে। তাই সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে চির কৌমার্য্য শুধু যে অস্বাভাবিক তা নয়, স্বজাতিদ্রোহিতাও বটে।

ক্ষুধার চেয়েও কাম প্রবৃত্তি তীব্রতর ও দুর্দ্দমণীয়। তাই এই বৃত্তি মানব-চরিত্রের ভিত্তিভূমিকে পর্য্যন্ত ওলট-পালট করে দেয়। এই বৃত্তির মহত্তর নিয়ন্ত্রণ মানুষকে অতি মানবে, সুনিয়ন্ত্রণ মানুষকে স্বাভাবিক মানুষে ও বিকৃতি মানুষকে হীন মানুষে পরিণত করে। যৌনাকর্ষণ যেখানে মহত্তরলোকে উন্নীত হয়েছে sublime হতে পেরেছে, সেখানে তা মানব সভ্যতার উন্নতি ও বিকাশে সহায়তা করবে। এ কে না জানে যে, এই মহত্তর যৌনাকর্ষণ মানুষের সাহিত্য, শিল্পস্থপতি ও ভাস্কর্য্যকে নব নব রূপে বিভূষিত করেছে? সুনিয়ন্ত্রিত যৌনজীবনের শ্রেষ্ঠ পরিচয় সুস্থ সন্তান সন্ততিপূর্ণ সুখী দম্পতির পারিবারিক

জীবন। বিকৃত যৌনাকর্ষণের ভয়াবহ পরিণাম, ধর্ষণ, বলাৎকার, বেশ্যাগমন, মদ্যপান ও মারাত্মক যৌনব্যাধি ইত্যাদি।

যুগ-পরিবর্ত্তনের সংগে সংগে মানুষের বাহ্যিক আচার-ব্যবহার, সামাজিক রীতি-নীতি, এমন কি নৈতিক আদর্শগুলি পর্য্যন্ত দ্রুত পরিবর্ত্তন হয়ে যাচ্ছে। কালে মানব সমাজে বিবাহের আদর্শও হয়ত পরিবর্ত্তিত হবে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত বিবাহের চেয়ে নির্বিঘ্ন ও সুবিধাজনক কোন যৌন-ব্যবস্থাই আবিষ্কৃত হয়নি। কাজেই অধিকতর উপযোগী ও নিরাপদ অন্য কোন ব্যবস্থা আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত বিবাহকেই বংশরক্ষার শ্রেষ্ঠ আদর্শ হিশেবে মেনে চলতে হবে। তাই সমস্ত যৌনবিজ্ঞানের আদর্শ হবে--অন্ততঃ হওয়া উচিত--বিবাহিত জীবনের সুখ ও স্বাস্থ্য বৃদ্ধির উপায় নির্দ্ধারণ। যুগে যুগে কৌতূহলী ও যৌন-জীবনে সুখান্বেষীদের অন্তরে এই বিষয়টি যে অনুসন্ধিৎসা জাগায়নি তা নয়। প্রাচীন ভারতের বাৎস্যায়ণ ও কোকা পণ্ডিতের নাম আজও শুনতে পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রীস আর রোমেও যৌন-রহস্য আলোচিত হয়েছিল। অ্যরিষ্টটলের Experienced Midwife নাকি এই বিষয়ে মূল্যবান গ্রন্থ। সারাসেনীয় হাকিমগণ চিকিৎসা শাস্ত্রে এমন কোন বই লিখেননি যাতে যৌনালোচনা স্থান পায়নি। ভারতে মুসলমান আমলে রচিত 'লজ্জৎউন্নেসা' নামক যৌনগ্রন্থ এখনও গোপনে পঠিত হয়।

একদিন এশিয়া ছিল সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূতিকাগার। কালের চক্র পরিবর্ত্তিত হয়েছে, আজ ইউরোপ হয়েছে সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের শুধু সূতিকাগার নয়, কেন্দ্রভূমিও বটে। তাই জ্ঞানের অন্যান্য শাখার ন্যায় যৌন-বিজ্ঞানেও সে নিয়েছে আজ নেতৃত্বের ভার। বহু বৈজ্ঞানিকের জীবনের সাধনা এই বিষয়ে বিস্ময়কর সাফল্যের পরিচয়ও দিয়েছে। বাংলায় আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রে ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত লোকের অভাব নেই, তবুও আজ পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যে যৌন-বিষয়ে কোন ভাল বই লিখিত হয়নি। যে কয়খানি বই লিখিত হয়েছে তাদের আলোচ্য বিষয় এত সীমাবদ্ধ ও নির্দ্দেশ এত অনির্দ্দিষ্ট যে তার থেকে আনাড়ী পাঠকের পক্ষে সংযম সম্বন্ধে খানিকটা নৈতিকতাপূর্ণ উপদেশ

ছাড়া কিছুই লাভ হয় না। অধিকাংশ লেখক যৌন-ব্যাপারকে শুধু একটা বিশেষ শারীরিক ক্রিয়া হিসাবেই দেখেছেন, তাও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখেননি--ফলে অধিকাংশ বই কামোদ্দীপক অশ্লীলতায় পূর্ণ বললেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না।

সম্প্রতি যৌন বিষয়ে একটি অপ্রত্যাশিত বইয়ের সঙ্গে দেখা হল। বইটির নাম 'যৌন-বিজ্ঞান'। বইটী লিখেছেন ভারতীয় পুলিশ-সার্ভিসের মিঃ আবুল হাস্‌নাৎ। বইটীর সর্ব-সংস্কার-মুক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গি আমাকে মুগ্ধ করেছে। প্রাচীন আলোচনার ফলাফল থেকে আধুনিকতম গবেষণা-পরীক্ষার খবর পর্য্যন্ত লেখক তাঁর বইতে অতি নৈপুণ্যের সহিত সন্নিবেশ করেছেন। যৌন-জীবনকে স্বাস্থ্য-প্রদ সুখের করার বা করতে পারার বহু বৈজ্ঞানিক ইঙ্গিৎ এই বইটীতে আছে।

(২)

ইংরাজী Sex শব্দের প্রতি শব্দ বাংলায় নেই, তবুও দেখা যায় Sexual শব্দের পরিবর্ত্তে বাংলা 'যৌন' শব্দ সাহিত্যে এক রকম সচল হয়ে উঠেছে। আমিও অন্য প্রচলিত শব্দের অভাবে আমার এই নিবন্ধের শিরোনামায় Sexual অর্থেই যৌন শব্দ লিখলাম। Sex কোন বিশেষ অঙ্গকে বুঝায় না, তার সম্পর্ক মানুষের শরীর মন উভয়ের সঙ্গে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। প্রসিদ্ধ যৌন-বৈজ্ঞানিক Havelock Ellis বলেছেন :

"Sex penetrates the whole person ; a man is what his sex is."

রাশিয়ান মনীষী অধ্যাপক উস্‌পেনস্কি (ouspensky) তাঁর 'A New Model of the Universe' গ্রন্থে লিখেছেন :

"This attraction of the sexes to one another, 'love', constitutes one of the chief motive-forces is life, and its intensity, and the forms of its manifestation determine almost all other characteristics and qualities in man."

যৌনবৃত্তির তীব্রতার হ্রাসবৃদ্ধি, বিকৃতি ও স্বাভাবিকতার উপর ব্যক্তি বিশেষের চরিত্র ও জীবন গঠিত হয়। সুস্থ ও স্বাভাবিক যৌনভোগ মানুষের দেহ-মনকে সমান তৃপ্তি দান করে, আবার যৌন-অতৃপ্তি বা বিকৃত ভোগ মানুষের দৈহিক ও মানসিক অসুস্থতার কারণ ঘটায়। কাজেই যে বৃত্তির সুনিয়ন্ত্রণের উপর মানব-জীবন ও চরিত্র এতখানি নির্ভর করে, তার সম্বন্ধে কোন প্রকারের অজ্ঞতা সত্যিই অমার্জনীয়। যৌন-জীবনকে অধিকতর সুস্থ ও সুখপ্রদ করতে হ'লে, এই বিষয়ে আমাদের দেশে যে লুকোচুরিনীতি চলে আসছে তা পরিহার করে, যৌন-জ্ঞানকেও অবশ্য জ্ঞাতব্য অন্যান্য বৈজ্ঞানিক বিষয়ের মত গণ্য করতে হবে। যৌন-জীবনের অজ্ঞতা শুধু যে দাম্পত্য জীবনের সুখকে ব্যাহত করে তা নয়, তা আমাদের বহুবিধ ব্যাধিরও কারণ ঘটায়। যৌন-ব্যাধির পরিণাম ভয়াবহ—অনেক স্থলে এই ব্যাধি নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক বিকৃতির কারণ। অনেক ক্ষেত্রে এসব মারাত্মক ব্যাধি বংশানুক্রমে সংক্রমিত হয়। কাজেই গোড়া থেকেই যদি সঠিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাহায্যে ছেলে মেয়েদের যৌন-জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করা যায়, তা হ'লে তাদের জীবন ও চরিত্র শুদ্ধ ও স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠ্‌বার সুযোগ পাবে। এই বিষয়ে লজ্জানুভব করবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। জন্ম-মুহূর্ত থেকেই যৌন-অঙ্গ মানব-সন্তানের দেহে বিধাতার দান এবং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার ক্রমবিকাশও অতি স্বাভাবিক, কাজেই Havelock Ellis-এর ভাষায় বল্‌তে হয়:

"We should not be ashamed to speak of what God was not ashamed to create."

অধ্যাপক উস্‌পেনস্কির মত:

"With regard to normal sex, there is no laughter in it. The function of sex cannot be comic, it cannot be an object cf joke."

অথচ সন্তান-সন্ততিকে এসব বিষয়ে জ্ঞান-দানকে আমরা এতকাল অশ্লীল বলে ভেবে এসেছি। আমাদের দেশে স্কুলে যে Hygiene পড়ানো হয়, তাহাতে যৌন-স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নেই। শরীর

বিজ্ঞানে জ্ঞানকে পূর্ণতর করতে হ'লে যৌন-জ্ঞানকে এইভাবে অস্পৃশ্য ভা বলে চলবে না। হাত, পা, চক্ষু কর্ণের জ্ঞানের মত, যৌন-অঙ্গের জ্ঞানকেও অপরিহার্য্য ভাবতে হবে---বিশেষত যৌন ব্যাপার যখন নিজেদের দৃষ্টিপথ থেকে দূরে রাখা কিছুতেই সম্ভব নয়, যৌনবোধ মানব মনে অতি অল্প বয়সেই জাগ্রত হয়, তদুপরি গৃহপালিত পশুপক্ষীর যৌন-ক্রীড়া তারা অহরহই দেখতে পায়।

(৩)

Ignorance is bliss—অন্য যেখানেই খাটুক না কেন শরীর বিজ্ঞানের বেলায় খাটে না। অধিক্ষণ না খেয়ে থাকলে ক্ষুধানুভব হয়, আর খেলে ক্ষুধার পরিতৃপ্তি হয়, শুধু এইটুকু জ্ঞা সম্বল করে সুস্থ জীবন যাপন সম্ভব নয়। খাদ্য-সংগ্রহনীতি, খাদ প্রস্তুত ও বিভিন্ন খাদ্যের উপাদান সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানের উপর সুস্থ জীবন যাপন অনেকখানি নির্ভর করে। নর নারীর জীবনে যৌনাকর্ষণ সহজ প্রবৃত্তিমূলক (instinctive) বটে, কিন্তু মানব জীবনে যৌন-ব্যাপার শুধু আঙ্গিক ক্রিয়া নয় বলে, শুধু পরস্পরের যৌন-অঙ্গে অবস্থান ও তার গঠন সম্বন্ধে মোটামোটি জ্ঞান থাকলেই যৌন-ক্রিয়া পরিপূর্ণ পুলক অনুভব করা যায় না। যৌন-অঙ্গ ছাড়াও এমন বহুবি শারীরিক ও মানসিক জ্ঞানের দরকার যার উপর যৌন ক্রিয়া পুলকানন্দের হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ভর করে। Havelock Ellis ইত্যা যৌন-বৈজ্ঞানিকরা এই মতের প্রচারক।

সমাজে সচরাচর দেখতে পাওয়া যায়, জ্ঞানী ও সুস্থ দম্পতি মধ্যেও অনেক সময় বনিবনাও হয় না, বাইর থেকে এর কোন যুক্তিসঙ্গ কারণ খুঁজে না পেয়ে আমরা বিস্মিত হই। কিন্তু যৌন-বৈজ্ঞানিক হয়ত এর কারণ নির্দেশ করবেন যৌন-অঙ্গের তথা ক্রিয়ার অসমতা সুতরাং দাম্পত্যজীবনকে সুখের করতে হ'লে অন্যান্য বিষয়ের ম বর-কনের দৈহিক উপযোগিতাও অভিভাবকদের দেখতে হবে। শুধু ভা পাত্রের উপার্জন-ক্ষমতা ও পাত্রীর রূপ গুণ কোন দাম্পত্য-জীবনে সুখী করতে পারে না। যৌন জীবনের অজ্ঞতা বহু দম্পতির নিরান জীবনের জন্য দায়ী। এই কারণেই বোধ করি কেউ কেউ বলছেন :

"Marriage is a blessing to a few, a course to many and a great uncertainty to all."

এক হাজার বিবাহিত দম্পতিকে তাঁরা সুখী কিনা প্রশ্ন করে জানা গেছে, স্বামীদের শত করা ৫১ আর স্ত্রীদের শতকরা ৪৫ জন মাত্র সুখী। দু'হাজার বেশ্যাকে তাদের বেশ্যাবৃত্তি গ্রহনের কারণ জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল--তার মধ্যে প্রায় এক চতুর্থাংশ উত্তর দিয়েছে, তাদের বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণের কারণ যৌন-বাসনায় অতৃপ্তি। কাজেই মানব-সমাজকে দুরারোগ্য ব্যাধি ও নিদারুণ অধঃপতনের হাত থেকে বাঁচাতে হ'লে, দাম্পত্যজীবনের অসন্তোষ যাতে দূর হয় তা দেখতে হবে। দাম্পত্য-জীবনের প্রাথমিক বুনিয়াদ---দম্পতির যৌন-জীবন। এই যৌন-জীবনে যদি স্বামী-স্ত্রী কেউ অকৃতকার্য্য হয়, তা'হলে তাদের জীবনে সুখ আশা করা যায় না।

Norman Haire সম্পাদিত Encyclopaedia of Sexual knowledge গ্রন্থে লেখা হয়েছে:

"It is not question of mere virility either, there are sexual athletes who in the course of one night can establish impressive numerical records, while leaving the woman unsatisfied; conversly, rather weakly endowed men may satisfy their mate completely, because where sex is concerned, it is not quantity but quality that counts."

এই যৌন-জ্ঞান ও সাধনার সবচেয়ে বিস্ময়কর আবিষ্কার বোধ করি জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া। এই আবিষ্কার ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের জীবনে অন্য লাভ ক্ষতি যাই করুক না কেন, কিন্তু আজকের জগতের সব সমস্যার সেরা সমস্যা অর্থনৈতিক সমস্যার নিয়ন্ত্রণে যে সহায়তা করবে তাতে সন্দেহ নাই। তদুপরি জন্মনিয়ন্ত্রণের উপর দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি অনেকখানি নির্ভর করে। সন্তানের জন্মের সঙ্গে মাতার স্বাস্থ্যের ও পিতার আর্থিক স্বচ্ছলতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। স্বেচ্ছালব্ধ পিতৃত্ব-মাতৃত্ব যেমন পিতা-মাতার নিকট পরম আনন্দ-দায়ক। অনাকাঙ্খিত পিতৃত্ব-মাতৃত্ব তেমনি পীড়াদায়ক।

জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে আমাদের দেশে এখনো একটা বিভীষিকা আছে। অনেকেই জন্মনিয়ন্ত্রণকে অস্বাভাবিক ও শিশু-হত্যার মতই পাপ মনে করে থাকেন।

মানুষের গৌরব তার বুদ্ধি---এই বুদ্ধির জোরে সে অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃতিকে জয় করেছে তাকে নিজের সুবিধা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছে। এই ক্ষেত্রেও মানুষ বুদ্ধির আশ্রয় নিয়েছে। এই বুদ্ধি বলেই প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে সে সন্তান-জন্মকে ইচ্ছাধীন করতে চায়।

(৪)

ঔষধ ও যন্ত্র প্রয়োগ ছাড়াও জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ভারতীয় যৌগিক প্রক্রিয়াই নাকি এ বিষয়ে উত্তম ব্যবস্থা। ঢাকার শ্রীমদন মোহন সাহা লিখিত 'বিন্দু সাধন' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। মিঃ আবুল হাসনাতও তাঁর বইয়ে এই সব যৌগিক প্রক্রিয়ার কথা লিখেছেন। কিন্তু যৌগিক প্রক্রিয়া দীর্ঘদিনব্যাপী সাধনা সাপেক্ষ। এই যৌগিক প্রক্রিয়ায় সিদ্ধকাম হতে পারলে উর্ধ্বরেতা-সুপণ্ডিত হীরেন্দ্র নাথ দত্তের ভাষায় 'যৌনাতীত' ও উসপেনস্কির ভাষায় supra-sex হওয়া যায়।

আধুনিক শরীর বিজ্ঞানের মতে মানুষের শরীরে কতকগুলি glands বা গণ্ড আছে---সেই glands গুলির secretion-এর উপর আমাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে। কোন কোন ডাক্তার নেপোলিয়ান যে ওয়াটারলু যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন তার কারণ--তাঁর Pituitory glands থেকে ভাল secretion হয়নি বলেই নির্দেশ করেছেন। গণ্ডগুলি বহিঃস্রাবী, অন্তঃস্রাবী ও উভস্রাবী নামে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিভক্ত। উভস্রাবী গণ্ডের মধ্যে যৌনগণ্ড বা Sex glandsই প্রধান। অধ্যাপক উস্‌পেনস্কি বলেছেন:

"It is established by physiology that the sex glands are at the same time glands of external and of internal secretion."

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত লিখেছেন :

"যদি যৌনগণ্ডের ক্ষরণকে সম্পূর্ণ অন্তর্মুখ করিতে পারি, তাহা হইলেই যোগের অনুমোদিত backward flowing method বা উর্দ্ধরেতা হওয়ার প্রণালীতে উপনীত হই। ইহাই যৌগিক প্রক্রিয়ায় জন্মনিয়ন্ত্রণ।"*

যৌনগণ্ডের অন্তর্মুখী secretion এর উপর আমাদের পৌরুষভাব ও নারীভাব অনেকখানি নির্ভর ক'রে :

"The characteristic masculine or feminine behaviour is due to the hormones produced by these glands." †......"When internal secretion ceases or is impaired, secondary characters disappear or become modified, and a man becomes a degenerate type of infera sex." (Ouspensky).

সুতরাং কোন কোন সময় যে পুরুষের নারী ও নারীর পুরুষ হয়ে যাওয়ার সংবাদ শুন্‌তে পাওয়া যায়, তাকে একেবারে অসম্ভব গাজাখুরী গল্প বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এডিনবারা বিশ্ববিদ্যালয়ের Animal breeding Depantment এর Head ডাঃ ক্রু লিখেছেন :

"An individual of one determined sex can be so trans formed at a later period that it will fulfil its life as a member of the opposite sex."

আমাদের দেশে ছেলে তৈরীর সুপ্রচলিত পদ্ধতি মারধর। কাজেই অভিভাবক ও শিক্ষকদের মানব-দেহের কোথায় কোন gland অবস্থিত তার সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান থাকা দরকার। এবং ছেলে-মেয়েদের মারধর করা যদি অপরিহার্য্যও হয়ে পড়ে, অন্তত এইসব gland গুলি যাতে আঘাত না পায় সেই বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিৎ। নতুবা ছেলে মেয়ের gland পরিবর্তন হউক বা না হউক, অন্তত তারা Infera-sex হবেই, তাতে কোন সন্দেহ নেই। অর্থাৎ

---

* যৌনাতীত—পরিচয়, ১৩৪০।

† Educational Psychology by Sandiford.

পুরুষ-ছেলের পুরুষত্ব আর মেয়ে ছেলের নারীত্ব তেমন অবস্থায় কখনও পূর্ণতা পাবে না।

যদিও পুরুষের নারীর প্রতি ও নারীর পুরুষের প্রতি আকর্ষণই স্বাভাবিক যৌনাকাঙ্খা, তবুও এর বিকার বহু প্রাচীনকাল থেকে মানব-সমাজে চলে আস্‌ছে। এমন কি, বিশ্ববিশ্রুত যৌন-বৈজ্ঞানিক ফ্রয়েডের সুস্পষ্ট ও দৃঢ় অভিমত এই যে, এমন কোন রতিশক্তি সম্পন্ন স্বাস্থ্যবান মানুষ নেই যার মধ্যে কোন না কোন যৌনবিকৃতি বিদ্যমান নেই।

বস্তুতঃ মানব জীবনে যৌন বিকৃতির কোন সীমা পরিসীমা নেই। অনেক বিকৃতি সহানুভূতির সঙ্গে যৌন-জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে পারলে দূর হতে পারে। অনেক বিকৃতি চিকিৎসা সাপেক্ষ।

১৩৪১

'ওবেদি-বিয়োগ' চট্টগ্রামের মরহুম খান বাহাদুর আবদুল আজিজ সাহেব কর্ত্তৃক প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে রচিত একখানি ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তক। কবিতাগুলি ডাঃ আবদুল্লাহ্ সোহরাওয়ার্দীর পিতা মরহুম মৌলানা ওবেদুল্লাহ্ আল্ ওবেদি সাহেবের মৃত্যুতে ভক্ত-হৃদয়ের শোকোচ্ছ্বাস। ব্যক্তিগত কবিতা বা লেখা, শোনা যায় অনেকের কাছে ভাল লাগেনা। কথাটা সত্য বলিয়া মনে হয় না; কারণ সাহিত্যের অনেক শ্রেষ্ঠ সম্পদই ব্যক্তিগত। বিষয় লইয়া সাহিত্যের বিচার নয়---বিষয়ের প্রকাশ লইয়াই সাহিত্যের মূল্য নির্দ্ধারণ। আর ব্যক্তিগত বিষয়ে কবি নিজেকে বা নিজের প্রতিভাকে যে রকম revealed করিতে পারেন--অন্য কোথাও সেই রকম পারেন বলিয়া মনে হয় না। ব্যক্তিগত বিষয়ে আমরা কবিকে স্ব-স্বরূপে পাই---অন্য বিষয়ে অনেক সময় মুখোস-পরা হইয়া থাকেন তিনি। ব্যক্তিগত বিষয়ে মিথ্যা দিয়া কিছু ঢাকিতে হয় না কবির ভিতরকার সত্যকার feelingই তখন প্রকাশ পায়। সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে ছন্দের বন্ধনে রবীন্দ্রনাথের যে শোকোচ্ছ্বাস, তাহা অনাবিল, অতুলনীয়। এর প্রধান কারণ, এই feeling রবীন্দ্রনাথকে create করিতে হয় নাই--এইগুলি সত্যকার রবীন্দ্রনাথ। 'গোরা'র মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ এত অনাবিল ভাবে নিজেকে প্রকাশ করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। ব্যক্তিগতের অজুহাতে Shelleyর Adonais, Tennyson -এর In Memorium ও নজরুল ইসলামের 'ইন্দ্রপতন'কে ভাল লাগে না বলিলে রসবোধের পরিচয় দেওয়া হয় না।

খান বাহাদুর আবদুল আজিজের বাহিরের মূর্ত্তিকে জানিবার অসংখ্য নিদর্শন আছে; তাঁহার প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রামের ত্রিতল ভিক্টোরিয়া ইসলাম হোষ্টেল, মুসলমান শিক্ষা সমিতি, কবিরউদ্দীন মেমোরিয়াল হল, নারী

শিক্ষার জন্য তাঁহার আজীবনের সাধনা, রাজপ্রদত্ত উপাধি, চাকুরী জীবন, তাঁহার বংশধর, বন্ধুবান্ধব ও শিষ্যবর্গ।

কিন্তু ভিতরের আবদুল আজিজকে, তাঁহার সুকুমার অনুভূতির সঙ্গে যে আবদুল আজিজ মিশিয়া আছে, তাঁহাকে চিনিবার এই ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক ছাড়া অন্য কিছুই নাই। শান্তিনিকেতন হইতে গীতাঞ্জলি বলাকা-নৈবেদ্যের রবীন্দ্রনাথ অনেক বড়। মরহুম আজিজ সাহেবেরও ভিতরের দিক হয়ত তাঁহার হোষ্টেল, শিক্ষা সমিতির চাইতেও অনেক বড় ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাহা প্রকাশের পথে এক অপ্রত্যাশিত প্রতিবন্ধকতা আসিয়া পড়িয়াছিল। তিনি শৈশব হইতে সাহিত্য-সাধনা করিতেন---গদ্য এবং পদ্যে তিনি অনেক পুস্তক লিখিয়াছেন। তাঁহার বন্ধু-বান্ধবদের মুখে শোনা যায় সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর ধরিয়া তিনি কবিবর হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের সঙ্গে প্রতিযোগীতা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতা ছিলেন অন্য মতাবলম্বী..'যে জন সেবিবে ও পদযুগল সেই সে দরিদ্র হবে'; পাছে সাহিত্য সাধনা করিতে যাইয়া তাঁহার পুত্রও আর্থিক সঙ্কটে পড়ে--- এই আশঙ্কা করিবার যথেষ্ট কারণও ছিল; 'যে জন সেবিবে ও পদ-যুগল সেই সে দরিদ্র হবে' তার সাক্ষাৎ নিদর্শন মাইকেল ও হেমচন্দ্রের জীবন তাঁহার সম্মুখেই ছিল; কাজেই তিনি পুত্রকে সাহিত্য সাধনা হইতে বিরত হইতে আদেশ করিলেন। নিষেধে যখন কোন ফল হইল না তখন তিনি একদিন পুত্রকে এই জন্য খুব করিয়া ভর্ৎসনা করিলেন। অভিমানী পুত্র ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না---তিনি নিজের প্রকাশিত সমস্ত পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি যেখানে যাহা পাইলেন সংগ্রহ করিয়া বঙ্গোপসাগরের অতল জলধিতলে নিক্ষেপ করিয়া তবে পিতৃ-সমীপে উপস্থিত হইলেন। এই হইতে তিনি আর কখনো সাহিত্য রচনা করেন নাই।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি তাঁহার সুযোগ্যা সহধর্ম্মিনী তাঁহার অগোচরে যক্ষের ধনের মত রক্ষা করিয়াছিলেন। খাঁন বাহাদুর সাহেবের মৃত্যুর পরেই পুস্তকখানি অন্যান্য আত্মীয়দের সম্মুখে বাহির হয়।

অর্দ্ধশতাব্দী-পুর্ব্বে-রচিত এই ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তকখানিতে যে সুন্দর মার্জিত ভাষা, বেগবান ছন্দ ও ভাব আছে সেকালের মুসলমান রচিত সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই---সেই ভাব, ভাষা, ছন্দ হেম নবীনের প্রতিযোগীর অযোগ্য নয়।

ইতিহাসের দিক হইতেও এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানির মূল্য অত্যন্ত বেশী; সেই পুঁথি সাহিত্যের দোভাষী-ভাষা-প্রপীড়িত পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে দাঁড়াইয়া এমন সুন্দর, সাধু, মার্জ্জিত বাংলা লেখা সে যুগের মুসলমান লেখকের পক্ষে সত্যই বিস্ময়কর। এই কবিতাগুলি সেকালের যে কোন শ্রেষ্ঠ হিন্দু লেখকের লেখার সঙ্গে তুলিত হইতে পারে। বাংলার মুসলমান সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস-লেখক এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিকে কখনো ভুলিতে পারিবেন না।

এই ছত্র কয়েকের ছন্দ-বন্ধনের মধ্যে আমরা মরহুম খান বাহাদুরের অন্তর-পুরুষের সাক্ষাৎ পাই---বাহিরের আবদুল আজিজের যে বিরাট চরিত্র, যে অসাধারণ কর্ম্ম-প্রচেষ্টা আমরা দেখিতেছি, এই ছত্র কয়টীর মধ্যে তাহার মূল উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁহার ভক্তি, ভালবাসা, বন্ধুপ্রীতি সমাজ ও দেশ প্রেমের সুস্পষ্ট ছাপ এই পুস্তকখানির প্রত্যেক লাইনে-লাইনে পাওয়া যায়। আগেই বলিয়াছি ব্যক্তিগত বিষয়ে মানুষ স্ব-স্বরূপে প্রকাশ পায়---বিশেষত শোক ও আনন্দের সময়। মানুষ ভান করিয়া অনেক কিছু করিতে পারে; কিন্তু হাসিতে ও কাঁদিতে পারে না---ভাণ করিয়া কাঁদা ও হাসা মানে নিজকে লোকের কাছে হাস্যাস্পদ করা।

খান বাহাদুর আবদুল আজিজ হাস্যাস্পদ কাজ করেন নাই। তাই তাঁহার সমস্ত সুকুমার অনুভূতি এখানে এই 'ওবেদি-বিয়োগে' আপন মূর্ত্তিতেই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার আত্ম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইহার মধ্যে যে অসাধারণ কবিত্ব-শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে তাহা সত্যই বিস্ময়কর। স্থানে স্থানে এমন সব লাইন ও উপমা আছে যাহার তুলনা হয় না। এই গুলি পড়িলে মনে হয় ভিতরে ভিতরে খান বাহাদুর পূর্ণ মাত্রায় কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁহার সাহিত্যিক-

জীবনে অপ্রত্যাশিত বাধা না আসিলে তিনি হয়ত বাংলা সাহিত্যে একটা বিশিষ্ট স্থান রাখিয়া যাইতে পারিতেন। তাঁহার রচিত 'কবিতা কলিকা' ও 'মুসলমানের অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত' নামক আরও দুই খানি বইর নাম পাওয়া গিয়াছে---কিন্তু এখনো এই দুইখানির কোন কপির সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

'ওবেদি-বিয়োগের' সঙ্গে কবির রচিত গদ্য লেখা ভূমিকা আছে--তাহাতে খুব সুন্দর সাধু ভাষায় মরহুম ওবেদুল্লাহ্ আল্ ওবেদি সাহেবের পরিচয় আছে। আজিজ সাহেবের মার্জ্জিত ও শক্তিমান ভাষায় গদ্য ও পদ্য রচনা দেখিলে আফ্সোস্ হয় তাঁহার বাণী অকালে সিন্ধুগর্ভে বিসর্জিত না হইলে হয়ত আজ সাহিত্যের কোন একটা অংশ আমরা ভরাট দেখিতে পাইতাম। শুনিতে পাওয়া যায় শেষ বয়সে তিনি আবার বাংলা-সাহিত্য অধ্যয়নের দিকে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন; রবীন্দ্রনাথ, শরৎ চন্দ্রকে শেষ করিয়া তিনি অতি-আধুনিক সাহিত্যিকদের লেখা পর্য্যন্ত পড়া শুরু করিয়াছিলেন। হয়ত বা আবার তাঁহার সাগর-জলে বিসর্জিতা বাণী অন্তরলক্ষীর করুণ আহ্বান তাঁহার কানের ভিতর দিয়া মরমে পৌঁছিয়া থাকিবে। কিন্তু বিধির বিধান! সেই সময় পরপারের শেষ পরওয়ানা আসিয়া হাজির হইল---হৃদয়ের রুদ্ধ বেদনা ফরিয়াদ করিয়া উঠিল 'বন্ধু বড় অবেলায়'!

পিতৃ-শাসনে তাঁহার হৃদয়ের নির্য্যাতিত বাণী, অন্তরের বেদনা-লক্ষ্মী হৃদয়ের পাষানতলে বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া শুধু গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিয়াছে। নিরুদ্ধ বাণীর অশ্রুজলে যে 'নির্ঝরের' সৃষ্টি হইয়াছিল আজ তাঁহার দৌহিত্র বাহার ও দৌহিত্রী নাহারে তাহার 'স্বপ্ন-ভঙ্গ' হইলে সুখের বিষয় হইবে। ১লা জানুয়ারী, ১৯২৯

'নিয়ন্ত্রিতা'

অধুনালুপ্ত 'নওরোজে'র পৃষ্ঠায় এ লেখাটী যখন প্রথম পড়ি তখন মনে যথেষ্ট সন্দেহ হইয়াছিল যে, যে-নামের আড়ালে লেখাটী বাহির হইতেছে তাহা নিশ্চয়ই কোন শক্তিশালী লেখকের ছদ্মনাম। পরে জানিতে পারিলাম ইহার লেখিকা, সেলিমা বেগম ওরফে আখতার মহল সৈয়দা খাতুন নাম্নী কোন সম্ভ্রান্ত মহিলা, কিন্তু শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলাম তিনি আজ পরলোকে।

নিয়ন্ত্রিতা ছোট উপন্যাস বড় গল্প বলিলেও বলা যাইতে পারে। পড়িয়া মনে হইল মানুষের বেদনার অনুভূতি চিরন্তন, চির-নূতন। পশ্চিমের আলোপথচারী কবির কথা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিলাম—Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts. নিয়ন্ত্রিতা আগাগোড়া একটি বেদনার ইতিহাস; কয়েকটী নর-নারীর বেদনা-দগ্ধ অন্তরের যে প্রতিচ্ছবি অপূর্ব সাবলীল ও শক্তিমান ভাষা লইয়া ইহাতে ফুটিয়াছে তাহা অপূর্ব্ব। এই বেদনার ইতিহাস পাঠককে বিস্মিত করে না, তাহার অন্তর ভাঙিয়া চৌচির করিয়া দিয়া যায়; এই বই শেষ হইলেই সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাঙা অন্তর জোড়া লাগে না, তাহাকে গুছাইয়া ঠিক করিয়া লইতে আরও বহু দেরী লাগে। লেখিকা যে পারিপার্শ্বিকতার সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা মুসলমান পাঠকের পরিচিত, তাঁহাদেরই চতুর্দ্দিকের প্রাচীর বেষ্টিত গৃহ-প্রাঙ্গন, নায়ক-নায়িকা তাঁহাদেরই অতি পরিচিত মানব মানবী। লেখিকা অশ্রু ছল ছল চোখে যে বেদনার ছবি আঁকিয়াছেন তাহা হইতে তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না; অপরের বেদনা এমন করিয়া নিজের মধ্যে মূর্ত্ত হইতে পারে, ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, অথচ তাঁহাকে বেদনাময়ী 'নিয়ন্ত্রিতা' ভাবিতে ততোধিক কষ্ট হয়। যাহাই হউক, 'নিয়ন্ত্রিতা'-আয়শা মুসলমান সমাজে অসংখ্য, তাহাদের লাঞ্ছিত দুঃখ-বেদনার জীবন লেখিকার

ভিতর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে---ইহা খেয়ালী বেদনা না হইয়া, মানুষের জীবনের বেদনা হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে; ইহাই সাহিত্যের লাভ।

এই লেখাটীর ভাষা শক্তিমান, এত শক্তিমান ভাষা অন্য কোন মুসলমান লেখিকার মধ্যে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না---বর্ণনা-ভঙ্গী চমৎকার ও বেগবান, ঘটনার পরিকল্পনা সুন্দর গতি-মুখর, পাঠককে নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া যাইতে হয়; আগাগোড়া একটী অপূর্ব্ব intensity আছে। ভাব ও কল্পনা সুষ্ঠু মার্জ্জিত, অস্বাভাবিকতা কোথাও নাই। সর্ব্বোপরি লেখাটীর আগাগোড়া একটা গভীর আন্তরিকতা বিদ্যমান। মধ্যবিত্ত মুসলমান পরিবারের নর-নারী যেই রকম, ঘটনা ও চরিত্রগুলিতে তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। স্থানে স্থানে চরিত্রগুলির মনস্তত্ত্বের যে বিকাশ পাইয়াছে তাহাও বেঠিক হয় নাই।

মুসলমান লেখকদের কথা-সাহিত্য স্বষ্টিতে অনেক অসুবিধা আছে। সর্ব্বপ্রধান অসুবিধা অবরোধ প্রথা, এই অবরোধ প্রথা বিদ্যমানে মুসলমানের দ্বারা কথা-সাহিত্যে কোন বড় স্বষ্টি সম্ভব হইবে কিনা সন্দেহের বিষয়। নরনারীর জীবনই কথা-সাহিত্যের ভিত্তি---মুসলমান লেখক লেখিকাদের পক্ষে পরস্পরের জীবন জানিবার কোন উপায় নাই, প্রাচীরের গায়ে আঘাত পাইয়া তাঁহাদের চোখ ফিরিয়া আসে। তাই মুসলমান সাহিত্যে অস্বাভাবিক চরিত্র স্বষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে। ইহার জন্য লেখক নয়, সমাজের প্রচলিত রীতিই দায়ী। সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে প্রেম বা পর্ব্বরাগ যদি হইয়া থাকে তাহা আত্মীয় পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, যেমন খুড়তুতো, জেঠ্তুতো, মামাতো ইত্যাদি বা অন্য রকম সম্পর্কিত ভাই বোনদের মধ্যেই প্রেম বা পূর্ব্বরাগ সম্ভব, অনেক পরিবারে অবরোধ এত কঠোর যে তাহাও অসম্ভব, আর Love at first sight জিনিষটা দুনিয়াতে ক্বচিৎ ঘটে, কাজেই যেই সমস্ত লেখক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের মেয়েদের লইয়া বাহিরের লোকের সঙ্গে প্রেম করান তাহার নাম দুঃসাহসিকতা ছাড়া আর কি দেওয়া যায়। 'নিরন্ত্রিতার' লেখিকা এই দুঃসাহসিকতার পরিচয় দেন নাই---তাঁহার

Plot একই পরিবারের আত্মীয়দের মধ্যে সীমাবদ্ধ কাজেই কোন একটী ঘটনা বা চরিত্র ও অস্বাভাবিক হয় নাই।

আবদুল লতীফ সাহেব উকিল---তাঁহার সহধর্ম্মিনী ফাতেমা বিবি মৃত্যুর সময় দুইটী কন্যা ও তিনটী পুত্র রাখিয়া যান। বড় কন্যা আমেনা ও বড় পুত্র সাদিকুল আলম বিবাহিত। নুরুল আলম ও জানে-আলম নবম ও পঞ্চমবর্ষীয়', আর গ্রন্থের নায়িকা আয়শা মাত্র তের বৎসরের। লতীফ সাহেব আবার বিবাহ করিয়াছেন।

প্রকৃত গল্পের যখন আরম্ভ তখন আয়শা 'ত্রয়োদশী কিশোরী', কবে তার বালিকা জীবনের ভিতর দিয়া তাহার ফুফুতো ভাই আনোয়ার হোসেনের অনিন্দ্য সুন্দর মূর্ত্তি তাহার নয়ন-মন মুগ্ধ করিয়াছিল, আজ কৈশোর-জীবনে সেই মূর্ত্তি কেমন করিয়া তাহার হৃদয় ছুঁইয়া অপূর্ব্ব রঙ্গীন স্বপ্নের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা সে জানে না ; নির্ম্মল জ্যোৎস্নার মধ্যে তেমনি নির্ম্মল আনন্দোজ্জ্বল অন্তর লইয়া মুগ্ধা কিশোরী সেই আনন্দ-রাজ্যের দিকে অনিমেষে চাহিয়াছিল। দুঃখ নাই, চিন্তা নাই, নিরাশা নাই, দুনিয়া ভরা শুধু আশা, শুধু আনন্দ, শুধু হাসি। রমজান-পূর্ণিমার পুণ্য-হাসিতে আকাশ পৃথিবী ভাসিতেছিল। নারিকেল গাছের পাতার মুকুটে যেন হীরক জ্বলিতেছিল, দূর গ্রামগুলি মৌন জ্যোৎস্নালোকে যেন স্বপ্ন-রাজ্য বলিয়া মনে হইতেছিল, সামনের দীঘিটীতে হাজার শ্বেত পদ্মের সোপান বাহিয়া চন্দ্র যেন আজ অবগাহনে নামিয়াছে। আপন-হারা পিকের উন্মনা গানে আর নিশীথের পুষ্পসৌরভে আয়শার মুগ্ধ হৃদয়ে ঘন শিহরণ জাগিতেছিল। মূর্চ্ছিতা ধরার মুখে এ কি স্বপ্নময় হাসি। কি চাই ? কি চাই ? হৃদয় তার কি চায় ? এই পূর্ণ সৌন্দর্য্যে অপূর্ণতা কোথায় ? কিন্তু কিশোর বুকে এ কিসের অভাব। আকাশ জুড়িয়া কাহার কালো চোখের বিস্মৃতপ্রায় অস্পষ্ট ছবি তাহার বুকের মধ্যে জাগিতেছিল। বুঝি ওই দূরের গ্রামগুলির মতই সেই ছবি অস্পষ্ট, স্বপ্নময়।---আনওয়ার হোসেন কিন্তু বিবাহিত।

কিন্তু লতিফ সাহেব কন্যার বিবাহ ঠিক করিলেন এক বয়াটে, অর্দ্ধ পাগল উচ্ছৃঙ্খল জমিদার পুত্রের সঙ্গে। এই বিবাহে কেহই সম্মত হইল না---বি-এ, ক্লাসের ছাত্র নূরুল আলম বড় ভগ্নী আমেনাকে

লিখিল,---''বাবা আশুকে বিয়ে না বলিদান দিতে চান, কিন্তু দোহাই তোমাদের, তোমরা ওকে জ্যান্ত আগুনে ফেলতে দিও না ...যদি একান্তই না পারো বাবাকে নিরস্ত করতে, অকম্পিত হাতে আশার খাদ্যে বিষ মিশিয়ে দিও।''---ভগ্নীর প্রতি অপরিসীম স্নেহশীল ভাব-প্রবণ তরুণ যুবকের মুখে এ কথা অশোভন নয়। এদিকে কিশোরী আয়শা প্রথম প্রেমের উন্মেষে ভাব-বিহ্বলা, সে কোরান মাথায় নিয়া প্রতিজ্ঞা করিল, সে আনওয়ার হোসেন ছাড়া কাহাকেও বিবাহ করিবে না। পিতার নিষ্ঠুর আচরণে তাহার হৃদয়ে বেদনার ফল্গু-ধারা বহিয়া চলিল; শুধু অশ্রু বিসর্জ্জন ছাড়া এ-বেদনাকে চাপা দিবার হতভাগিনী বালিকার অন্য কোন উপায় নাই। তাহার অশ্রুজল এবং সকলের নিষেধও এ বিবাহ ঠেকাইয়া রাখিতে পারিল না---শেষে বালিকা সঙ্কল্প করিল, সে 'কবুল' জবাব দিবে না। সাবালিকা মুসলমান মেয়ের বিবাহ মেয়ের সম্মতি ছাড়া না-জায়েজ। শিক্ষিত লতিফ সাহেবও এত বড় বিষয়টীকে উপেক্ষা করিয়া গেলেন। আমেনা যখন বলিল, বাবা, আশা ত কেঁদেই খুন হচ্ছে! তখন প্রবীন সমাজের প্রতিনিধি বলিলেন—বিয়ের আগে সকল মেয়েই অমন কাঁদে, মা! ঢাক-ঢোল-সানাই-এর উচচ শব্দে বালিকার ক্ষীণ আর্ত্তনাদ ডুবিয়া গেল, আয়শার অসম্মতিতেও বিবাহ হইয়া গেল।—ইস্‌লাম নারীকে যথেষ্ট অধিকার দিয়াছে এই লইয়া আমরা গর্ব্ব করি, কিন্তু দিন দিন অত্যাচারী পুরুষ সেই অধিকার কেমন করিয়া ছিনাইয়া লইতেছে এইটী তাহার একটী জ্বলন্ত নিদর্শন। মুসলমান সমাজে অসংখ্য মেয়ের বিবাহ আজ তাহাদের অসম্মতিতে হইতেছে---অসংখ্য নারীর জীবন আজ এমনি করিয়া পুরুষের হাতে লাঞ্ছিত হইতেছে। লেখিকা তাঁহার বেদনার্ত-তুলিকায় এই ছবি বড় মর্ম্মন্তুদ করিয়া আঁকিয়াছেন, তাই অসংখ্য মূক-নারীর বেদনা তাঁহার হাতে জীবন্ত হইয়া ফুটিয়াছে। অশ্রুমতী আয়শাকে বাসরে দেওয়া হইল—তাহার অশ্রু দেখিয়া অর্দ্ধ উম্মাদ স্বামী তাহাকে পদাঘাতে পালঙ্ক হইতে ফেলিয়া দিল। বিমাতা মেয়ের বাবাকে বলিলেন,---'মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, তার স্বামী মারুক কাটুক, যা ইচ্ছে তাই করুক। আপনার তাতে কথা বল্‌বার কি অধিকার? যুগ-যুগান্তের বন্ধন ও

অত্যাচারে নারী আজ এমনি অমানুষ হইয়া গিয়াছে! স্বামীকে ছাড়িয়া স্বামীত্বের পূজায় মুসলমান নারী আজ তার নারীত্বকে তার মনুষ্যত্বকে কেমন করিয়া লাঞ্ছিত ও অবমানিত করিতেছে এইগুলি তাহার নিদর্শন। বিদায়কালে স্নেহশীল নুরুল আলম বলিল,—"তোর মুখ যেন আর না দেখি আয়শা!" কত বড় বেদনা ও স্নেহের এ অভিব্যক্তি!

আয়শার অন্তরের বেদনা তাহার শ্বশুর-বাড়ীতে আর একটী বিধবার বুকে বড় বাজিল, তিনি জমিদার-ভগ্নী করিমা বিবি, তাঁহার "চোখের সম্মুখে এক মাতৃহারা অসহায়া বালিকার ছবি ভাসিতেছে। কোন্ অভাগীর আজ সকল সুখের সমাধি? মূর্খ মাতাল স্বামী। আর এই রাক্ষসী-রূপিনী শাশুড়ী।" ঘোমটা খুলিতেই তিনি দেখিলেন, "সারা বিশ্বের বেদনা বধূর দুই চক্ষে জমা হইয়াছে।" তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহারই শিক্ষিত পুত্র আবদুল কাদের বধূর বেদনাময় মূর্ত্তির পানে নিমেষ-হারা হইয়া চাহিয়া রহিল। বধূর বেদনা তাহার চোখের ভিতর দিয়া যেন মরমে পেঁৗছিল। আবদুল কাদের আয়শাকে ভালবাসিল। সেই ভালবাসা নিষ্কাম, মহান। প্রকৃত ভালবাসা অন্ধ, লাভের তোয়াক্কা রাখে না, সুবিধা খোঁজে না। তাই আনোয়ার হোসেনকে বিবাহিত জানিয়াও আয়শা তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল, আবার আয়শাকে বিবাহিতা জানিয়াও আবদুল কাদের তাহাকে ভালবাসিল।

আবদুল কাদেরের ভালবাসার তুলনা নাই। সে এই ভালবাসার গৌরবে চিরদিন অবিবাহিত কাটাইয়াছে। আয়শাকে সে ভালবাসিয়াছে কোন দিন কামনা করে নাই। আয়শা প্রথমে তাহার ভালবাসার কথা জানিত না কিন্তু সে যে কাহাকেও ভালবাসে এ-কথা যখন জানিতে পারিল, তখন সে আবদুল কাদেরকে জিজ্ঞাসা করিল, 'সে অসামান্যা রূপসী কে?"---সেই প্রশ্নের উত্তরে আবদুল কাদের বলিল: 'কিন্তু আয়শা অসামান্য রূপসী হলেও জগন্মাতা। মায়ের রূপের আলোচনা সন্তানের মুখে শোভা পায় না! (বলা বাহুল্য হজরত মোহাম্মদের এক স্ত্রীর নাম আয়শা, হজরত মোহাম্মদের সহ-ধর্ম্মিণীরা মুসলমানদের মায়ের মত।) অপূর্ব্ব, অতুলনীয় এ ভালবাসা। আয়শার জীবন অপূর্ব্ব সংযমশীল—সে অকথ্য গালাগালি শুনিয়া সমস্ত গৃহ-কার্য নীরবে সমাধা করিত;

মদ্যপায়ী স্বামীর দুর্ব্যবহারে তার অন্তর জ্বলিয়া পুরিয়া খাক হইত বটে কিন্তু দেহ মনে সে পাষাণ হইয়া যাইত। জীবনে নৈরাশ্য ও লাঞ্ছনার সে মধ্যে মধ্যে কৈশোর-জীবনের অনুরাগের স্মৃতি টানিয়া আনিয় Pessimist-এর মত বলিত---"মায়া? মায়া! সবই মায়া রে!' মধ্যে মধ্যে অদৃষ্টবাদীর মত তার অভিমান পড়িত খোদার উপর---'ে তাহার এ দশা করিল! কেইবা তাহার বুকে বসিয়া সে-স্বপ্নের ছ আঁকিয়াছিল; কেইবা সে-ছবি ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিল! আজীব যাহাকে জাহান্নামে বাস করিতে হইবে, তাহার সম্মুখে বেহেস্তের দ্বা খুলিয়া তাহার যাবতীয় সৌন্দর্য্য মূর্ত্তিমান করিয়া কে ধরিয়াছিল আকাশ-কুসুমের মালা মর্ত্ত্য মানবীর হাতে দিতে গিয়া কে আবার তা টানিয়া ছিঁড়িল! এ-নির্ম্মম খেলা কে খেলিল! শয়তান? শয়তানের স্রষ্টি-কর্ত্তা?"

আবার মনকে অন্যদিকে ফিরাইয়া লইতেই মনে হইত---"খোদ দানে সুখী হইনি! প্রাণপণ চেষ্টাতেও স্বামীর পায়ে নিজেকে বিলি করতে পারিনি! সর্ব্বোপরি কোর-আন শরীফ নিয়ে পাগলের খে খেলেছি। অদৃষ্টের সঙ্গে লড়াই করতে চেয়েছি। ন্যায় বিচার খোদাকে অবিচারী হৃদয়হীন বলেছি।" তাই বুঝি তার জীবনে দুঃসহ বিড়ম্বনা!

আনওয়ার হোসেন, আয়শা, আবদুল কাদের---তারা একে অন্য ভালবাসে। কিন্তু তিন জনেরই জীবন অপূর্ব্ব সংযম দৃঢ়। আনও তাহার ভালবাসা কোন দিন কথায় বা ব্যবহারে প্রকাশ করে না তাহার এই অপূর্ব্ব সংযম আয়শার জীবনের সংযমকে আরও দৃঢ় ও করিয়াছে। তাহার দিক হইতেও যদি অনুকূল হাওয়া বহিত ত হইলে তাহা হয়ত আয়শার মনকে আরও তোলপাড় ও বেদনা-দগ্ধ কা তুলিত। সারা গল্পের মধ্যে তাহাকে আমরা তিন চার বারের দেখি নাই---আয়শার সংসর্গকে সে সব সময় এড়াইয়া চলিয়াছে। শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের কথা মনে হয়---'বড় প্রেম অনেক সময় ক টানিবার চাইতে দূরে ঠেলিয়া দেয়।'

আবদুল কাদেরের প্রেম তাহার নিজের মুখেই প্রকাশ করি," .. ভালবাসা পাপ নহে, পুণ্য; প্রেম মানুষকে ব্যর্থ করে না—সার্থক করে। ...আমার দেবী আমার পূজ্যাকে (আয়শা তার ভাবী) আমি পূজা করব, তাহাকে পূজা করে আমি বিশ্বের নারী-জাতিকে পূজা করতে শিখব, সেই পূজায় আমি বিশ্বকে পূজা করব, বিশ্ব তার বাসস্থান! এবং সেই পূজায় আমি সৃষ্টি-কর্ত্তাকে পূজা করব—আমার প্রিয়তমার সৃষ্টি-কর্ত্তা। প্রেমের লক্ষ্য অনন্ত মিলন—অনন্ত স্বর্গ! রসাতল নয়।"

প্রেমের বিকাশ ও পরিণতির জন্য স্বাধীনতা অপরিহার্য্য। স্বাধীনতা প্রেমকে মহীয়ান করে, অধীনতা তাহাকে ছোট ও পঙ্গু করিয়া ছাড়ে। জীবন দিয়া আয়শা এ সত্যকে উপলব্ধি করিয়াছে; তাই আবদুল কাদেরকে সে বলিল---"যে-প্রেমে স্বাধীন পুরুষকে উচে তোলে, সেই প্রেমই পরাধীনা নারীর ইহ-পরকাল অতলে ডুবায়। মনে করুন, সুফিয়া (যার সঙ্গে আবদুল কাদেরের বিবাহের কথা ছিল) যদি আপনাকে ভালবেসে থাকে, তবে সে কি আপনার মত জীবন যাপন করতে পারবে? পিতামাতা তাকে বলপূর্ব্বক বিয়ে দেবেন; আর দুর্ভাগিনী চির জীবন বুকের ভিতর গরল রেখে মুখে ছলনার হাসি হেসে কাটাবে।" অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে নিনাদিত এই কথা কি অবিশ্বাস করিবার জো আছে? দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান সময় যাহারা সন্তানের অভিভাবক তাঁহারা এ-সত্যটি ভুলিয়া যান; ততোধিক দুঃখের বিষয়, তাঁহারা বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের কৈশোর ও যৌবনের স্মৃতিকে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হন।

অবিবাহিতা কিশোরী আয়শা হয়ত আনওয়ারকে পাইবার আকাঙ্খা করিয়াছিল কিন্তু তার বিবাহিত জীবন সম্পূর্ণ সংযম ও ত্যাগের জীবন। পাগল স্বামীর অত্যাচার সে বুক পাতিয়া সহ্য করিয়াছে---অকরুণ শাশুড়ীর সব লাঞ্ছনা সে মাথা পাতিয়া লইয়া তাহাদের সেবা করিয়াছে, কোনদিন টু শব্দ করে নাই। তারপর যখন সে মা হইল তখন তাহার জীবন এক অপূর্ব্ব গৌরবের জীবন; "মেয়েটী বুকে পাইয়া আয়শা ধন্য হইল---এইত স্বর্গ! জগতের চরম সুখ! আর কি চাই? কিছুই

না! আমি ধন্য আমি তৃপ্ত! আর কিছু চাইনা খোদা! আর কিছু
চাই না!" এই অপূর্ব্ব মাতৃমূর্ত্তি শ্রদ্ধার জিনিস।

স্বামীকে সে কখনো প্রাণ দিয়া সেবা করিতে পারে নাই, কিন্
সন্তানের পিতাকে সে দেহমনে প্রণিপাত করিল। স্বামীর সব দো
সব ঘৃণা, সব অত্যাচার শিশুর মধুর হাসির স্বর্গালোকে মধুময় হই
গেল। যে-স্বামীকে সে অত্যাচারী মদ্যপ, বেশ্যাদাস বলিয়া ঘৃণা করি
সেই স্বামীই সন্তানের পিতারূপে তাহার চোখে দেবতা হইল---স্বামী
সে দেবতা ভাবিয়া কৃতার্থ হইল।"

এই হইতে আয়শার জীবন মায়ের জীবন।

একদিন স্বামী তাহাকে মারিয়া বেহুঁশ করিয়া ফেলিল। তাহ
আত্মীয়া ও সখি মরিয়ম আসিয়া সেবা যত্নের পর একটু হুঁস হইতে
আয়শা প্রথম প্রশ্ন করিল---"আমার আলমগীর (তাহার কনিষ্ঠ পুত্র)

: "দোলায় ঘুমুচ্ছে।"

: "সই, রুহুর বাবা (স্বামী) খেয়েছেন?"

আয়শার এ-মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া আবদুল কাদেরের বন্ধু হায়
তাহার অবিবাহিত জীবনের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিল---'ও
লক্ষীছাড়া! চেয়ে দেখ্—পৃথিবীর কি অপূর্ব্ব সম্পদে বঞ্চিত তু
দুর্ভাগা!'

আয়শার স্বামী অসুস্থ, সে নিজে অসুস্থ, সন্তানেরা মহাকষ্টে, ত
মাতৃহৃদয়ের সেই কি নিদারুণ কান্না---"আয়শা ভাবিত সে চির-দুঃখি
জন্মঅভিশপ্তা,---বুঝি জগতের ধূমকেতু মূর্ত্তিমতী অমঙ্গল সে!
হয়ত রাহু, রাক্ষসী-রূপে সন্তানদের সৌভাগ্য-সূর্য্যকে ঢাকিয়া রাখিয়া
নইলে এই সব নিষ্পাপ শিশু মাসুম ফেরেস্তা, নির্ম্মল বেহেশ্‌তের
ইহারা কষ্ট পায় কাহার পাপে? মায়েরই পাপ। কিন্তু ও
চিরঅদৃশ্য দেবতা! একটি বার দেখা দাও; একটী কথা আমার
যাও! একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাও আমায়! এই সব অ
শিশু আমার জঠরে আসিল কোন পাপে? আর আমি! হা আ

আলেমুল গায়েব! সর্ব্বন্তর্যামিন! কোন্ মহাপাপে আমার এ দশা! সেই যে সেই মুহূর্ত্তের তরে সৃষ্টির পূর্ণ সৌন্দর্য্যের পানে একটীবার মাত্র সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়েছিলাম! বিশ্ব-বাগানের সৌন্দর্য্য-সুভাস পূর্ণ গোলাবটী তুলিবার দুরাশা হৃদয়ে ধরেছিলাম! সেই কি আমার মহাপাপ! বলে দাও---ওগো বলে দাও। হে চন্দ্র সূর্য্যের স্রষ্টিকর্ত্তা! জগন্মোহন! অসীম সুন্দর! সেই পাপেই কি আমার এ শাস্তি! আয়শা মৃত্যুর প্রতীক্ষায় রহিল---"।

কিন্তু হঠাৎ তাহার কন্যা কঠিন রোগাক্রান্ত হইল। স্বামী ওমর আলী মদ্যপায়ী অত্যাচারী---কিন্তু পিতার মূর্ত্তিতে তাহার কি ঘোরতর পরিবর্ত্তন, পিতৃ-মূর্ত্তিতে সেও মহান। মানুষ সাময়িকভাবে পশু হইতে পারে, কিন্তু তাহার আত্মা মরে না। কোন্ সময় কোন্ সোনার কাঠির স্পর্শে তাহা জাগিয়া ওঠে কে জানে। অর্দ্ধপাগল, মদ্যপ, বেশ্যাসক্ত ওমর আলী কন্যার রোগ সংবাদে অধীর আকুল হইয়া বলিতেছে---"দাও খোদা! আমার সর্ব্বস্বধন ফিরিয়ে দাও। আমার ইহ-পরকালের বিনিময়ে রুহুকে (কন্যার নাম) বাঁচাও! আমার আয়ু নিয়ে রুহুর জীবন ভিক্ষা দাও! আমি অন্তিম-শয্যায় শুয়ে দেখি বাচচা দুইটি হেসে খেলে বেড়াচ্ছে। আমায় এ শেষ ভিক্ষা খোদা!"

হতভাগিনী আয়শা, তার কিছুতেই শান্তি নাই, স্বামীকে দেখিয়া তাহার আবার মনে হইল প্রথম হইতে স্বামীকে প্রাণ ঢালিয়া ভাল না বাসার তাহার প্রতি খোদার এ দণ্ড! স্বামীর পায়ে পড়িয়া বলিল---"ওগো! তুমি আমায় ক্ষমা কর।"

বিধির বিধান,---সব ব্যর্থ হইল। মেয়ে মারা গেল।

তাহার মনে হইল---"কেবল অটল আসনে বসিয়া অটল হৃদয়ে অটল বিচারক পাপিষ্ঠা আয়শার মহাপাপের মহাদণ্ড অটল চোখেই চাহিয়া দেখিল। জীবনে সে একদিন পবিত্র কোর-আন লইয়া ছেলে খেলা করিয়াছিল, তাই আজ তাহার কোর-আন পাঠও ব্যর্থ হইল।"

লক্ষ্য করিবার বিষয়, প্রথম ক্ষুদ্র বাক্যটীতে চারিবার 'অটল' শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। খোদার প্রতি আয়শার বিক্ষুব্ধ অন্তরের যে

অভিমান ইহা তাহারই অভিব্যক্তি। এই নিরপরাধ বালিকার বুকফাটা ক্রন্দন এমন করিয়াই কি ব্যর্থ করিতে হয়!

এই আঘাতে আয়শা অসুস্থ হইয়া পড়িল। ডাক্তার স্থান পরিবর্ত্তনের কথা বলিল। এলাহাবাদের পথে সে বাপের বাড়ী আসিল। এখানে মুহূর্ত্তের জন্য আনওয়ার হোসেনের সঙ্গে দেখা হইল—"বুকের ঝটিকা নিবারণ করিতে সে আলমগীরদের খুঁজিল।" তাহার মনে হইল সে রহিমাদের মা! কই মনে ত তার কোন পাপ-কামনা নেই, জীবন তার রহিমাময়, রহিমাদের পিতাই তার সব। হোকনা সে অত্যাচারী, হোকনা সে রুগ্ন, সে যে রহিমার জনক; আনওয়ারের সঙ্গে আবার যদি দেখা হয় সে বেশ বোনের মত ব্যবহার করবে।"

আনওয়ারের সঙ্গে আবার দেখা হইল—তাহার দিকে চাহিয়া এবার আয়শার মরিতে ইচ্ছা হইল—"মরণ! এস! এস! আজ এই পরিপূর্ণ সার্থকতার মধ্যে এস বন্ধু! আজই আমি যেতে চাই।" এই নিষ্কাম প্রেমই তাহাকে সর্ব্বজয়ী করিয়াছে—এই প্রেম না থাকিলে সারা জীবনের দুঃখ লাঞ্ছনার কাছে সে নিজেকে অম্লান বদনে ত্যাগ ও নিবেদন করিতে পারিত কিনা সন্দেহ।

আবার স্বামী তাহাকে অকারণে পদাঘাত করিল, "মুহূর্ত্তের তরে আয়শার সমস্ত মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল কিন্তু সে মুহূর্ত্তমাত্র! পরক্ষণেই রহিমার মুমূর্ষু ছবি তাহার বুকে জাগিয়া উঠিল, এ যে রহিমার জনক, আলমগীর ও সেলিম যে এখনো তার বুকে! তারাও ইহারই দান। আয়শা ত্বরিতে উঠিয়া আলমগীরকে বক্ষে তুলিয়া লইল এবং স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল..."আমায় মাপ কর।"

একদিন সে মরিতে চাহিয়াছিল; মৃত্যু তখন আসে নাই। কিন্তু মৃত্যুর হাতছানি যেন সে দেখিতে পাইল, মৃত্যুর জন্য সে বাপের বাড়ী হইতে বিদায় লইল। সে যে মা—তার হারা সন্তান যে এখানে নাই। সন্তানের পার্শ্বে ছাড়া তার আত্মা যে তৃপ্ত হইবে না। হায় রে হতভাগিনী নারী, চিরন্তন সন্তান-ক্ষুধা তোমাকে পাগল করিয়া ছাড়িল! জীবনের সহস্র বিড়ম্বনায়ও এ ক্ষুধার নিবৃত্তি হইল না?

জন্মভূমি হইতে বিদায়-বর্ণনা অপূর্ব্ব মর্ম্মন্তুদ, হৃদয়-বিদারক। জন্মভূমির সামান্য বাতাস নদী প্রান্তর চন্দ্র সূর্য্য তরুলতা পশু-পক্ষী সকলের ঋণ স্বীকার করিয়া বুক ফাটা কান্নার সঙ্গে বিদায় লওয়া। শেষে "আয় মা গর্ভধারিণী জননী!—আয়শার বক্ষ, চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল। —কত চেষ্টা কর্‌লাম একটীবার তোমার গোর দেখতে পারলাম না মা! পরাধীনা অভাগিনী বঙ্গনারী আমি। উদ্দেশ্যে সালাম লও মা!"

লেখাটী গল্প নয়, অন্ততঃ পড়িয়া মনে হয় না—আগা গোড়া একটী বেদনাময় জীবনের ইতিহাস। বড় করুণ বড় মর্ম্মন্তুদভাবে বর্ণিত।

লেখিকা আজ পরলোকে, সাহিত্যের এক ক্ষুদ্র পাঠক এ আলোচনায় আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁহাকে স্মরণ করিল।

চৈত্র, ১৩৩৫

উর্দ্দু কবি হা

কবিতার সংজ্ঞা নানা জনে নানা রকম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কি
যেই সংজ্ঞাই সত্য হউক না কেন, উর্দ্দু কবিতায় দেখা যায় বহু দি
পর্য্যন্ত উর্দ্দু কবিগণ 'জীবনের সমালোচনাকে'ই অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ অ
মানিয়া লইয়া যথেষ্ট কাব্য চর্চা করিয়াছেন। বেচারী Mathe
Arnold স্বপ্নেও হয়ত ভাবিতে পারেন নাই, তাঁহার নির্দ্দেশিত সংজ্ঞ
এমন দুর্ব্যবহার হইবে।

প্রেমিক প্রেমিকার মিলন-বিরহ গোলাপের প্রতি বুল-বুলের প্রে
নিবেদন আর সাকী ও শরাব এই ছিল তৎকালীন উর্দ্দু কবিদের কবি
লিখিবার বিষয়---পারশ্যের অমর কবি-প্রতিভা হাফেজ, রুমী, জা
প্রভৃতিকে অনুকরণ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা। উর্দ্দু কবিতা পারশ্য সাহিত্যে
কোলেই লালিত পালিত---কিন্তু শক্তিহীন অনুকরণকারীগণ শি
পারশ্য সাহিত্যের রূপ রসের সন্ধান করিয়া উঠিতে পারেন নাই, তাঁহা
শুধু তাহার দোষের ভাগই অনুকরণ করিয়াছেন। তাই তৎকালীন উ
কবিতা প্রাণহীন নিস্তেজঘ্যানঘ্যানিতে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। ইতিহাসে
দিক হইতে ইহার একটু কারণও হয়ত আছে---মোগল সাম্রাজ্যে
পতনের সময় উর্দ্দু কাব্য সাহিত্যের জন্ম। সেই সময়কার মানুষে
ভোগ ও বিলাসিতাই ছিল জীবনের চরম আদর্শ, উচচাঙ্গের শিল্প
সাহিত্য রস উপভোগের মত মনের অবস্থা তখন তাহাদের ছিল না
কোন দেশের জাতীয় জীবনের অন্তর-সাধনাই সেই দেশের সাহিত্য
জাতীয় মনের অধঃপতনের দিনে জন্ম গ্রহণ করা কবি ও শিল্পীর পক্ষে
দুর্ভাগ্যের বিষয়। সবল বীর্য্যবান প্রতিভা পাঠকের নিকৃষ্ট রুচি
কাছে হয়ত আত্মসমর্পণ করে না, কিন্তু যশপ্রার্থী কবি বা লেখক স
স্রোতে গা ভাসাইয়া দেন, সস্তা নাম ও যশের আকাঙ্খায়। উর্দ্দু কবিত
পক্ষে সত্য সত্যই এই দুর্ভাগ্য হইয়াছিল---। উর্দ্দু কবিগণ স্বার্থ

নামের খাতিরে নিজেদের সুর-বাণীকে বড় লোকের স্তব গানে এবং নিকৃষ্ট রুচির খোরাক যোগাইতে নিয়োজিত করিয়াছিলেন---দিল্লী, লক্ষৌর আমীর ও নবাবদের বিলাস কক্ষে কক্ষে এই সব কবিদের সুরাসন ছিল।

এই রুচিহীন অস্বাস্থ্যকর পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে পড়িয়া গালিবের ন্যায় কবি-প্রতিভাকেও সময়-স্রোতে গা ভাসাইতে হইয়াছিল। শুধু এই কথা বলিয়া গালিবকে ছাড়িয়া দিলে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইবে। তিনি উর্দ্দু কবিতার ভাষা ও আঙ্গিকে সম্যক উন্নতি সাধন করিয়াছেন--উন্নত রুচি ও বিষয় নির্ব্বাচনে রস-জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। প্রাচীন যুগসঞ্চিত সংস্কার ও আচারের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহের বাণী শুনান--উর্দ্দু কাব্য সাহিত্যে নতুন যুগের প্রবর্ত্তন করেন। উর্দ্দু সাহিত্যে তিনি ইংরেজী সাহিত্যের Goldsmith, Collins ও Thompsonএর কাজ করিয়াছেন। প্রচলিত প্রেম সঙ্গীতকে তিনি আর্ট ও উন্নত রুচির উপর প্রতিষ্ঠা করেন।

উর্দ্দু কাব্য সাহিত্যে নতুন যুগের সূচনা হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ মোসলেম শক্তির অবশিষ্টাংশকে ধ্বংস করিয়াছিল সত্য---কিন্তু পরোক্ষে তাহা এদেশবাসীর মনোবিকাশের ধারার পরিববর্ত্তনেও যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। বিদ্রোহের ঝড় ঝঞ্ঝা থামিয়া যাইবার পর, ব্রিটিশ শক্তির পূর্ণ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে একটী নতুন শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে আসিবার ফলে মানুষের মন উদার ও প্রত্যেক বিষয়ে পরিবর্ত্তনের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। মোল্লাদের 'ফৎওয়া'-অস্ত্রের বাধা নতুন যাত্রী ও পরিবর্ত্তনশীলদের আরও অদম্য ও উৎসাহী করিয়া তুলিয়াছিল।

এই সময় ভারতীয় মুস্‌লিমের নব জন্মের অগ্রদূত মহাত্মা স্যার সৈয়দ আহমদ তাঁহার জ্ঞান-কর্ম্মী সহকারীদের লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হন। তাঁহার সহকারীদের মধ্যে উর্দ্দু সাহিত্যের অমর কবি আলতাপ হোসেইন হালী অন্যতম। সৈয়দ আহমদ মোল্লাশক্তির গোঁড়ামীকে দমন করিয়া মুসলমান সমাজকে সত্য ও মঙ্গলযাত্রার পথে তুলিয়া দেন ---হালী উর্দ্দু কাব্য সাহিত্য হইতে অস্বাভাবিক মিথ্যা বাগাড়ম্বরকে

ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া তাহাকে অনাবিল সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিয়া সাহিত্যের কনকাসনে প্রতিষ্ঠা করেন। প্রচলিত মামুলী পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া নিজে অর্ন্তনিহিত সাধনা ও প্রতিভাবলে নতুন পথ কাটিয়া লন। মানুষের চিন্তা ও অনুভূতির প্রতি যদি কবিতার আবেদন না পেঁৗছে সেই কবিতা আর্টের দিক হইতে একেবারে অকিঞ্চিৎকর। হালী তৎকালীন মানুষের লজ্জাজনক শোচনীয় জীবনকে তাঁহার কবিতার মধ্যস্থতায় লোকচক্ষুর সম্মুখে খুলিয়া ধরেন--দর্পনে প্রতিবিম্বিত চেহারা দেখিয়া যেমন মানুষ নিজের চেহারাটীকে নির্ম্মল ও সুন্দর করিতে চেষ্টা করে, বড় বড় সাহিত্যিকদের মত তাঁহারও বিশ্বাস ছিল তাঁহার স্বসমাজের লোকেরা নিজেদের হীন জীবনের পরিচয় পাইয়া নিজেদের জীবনকে সুন্দর করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিবে। তাঁহার কাব্য সাধনার মূলমন্ত্র ছিল গৌরবময় অতীতের প্রতি আস্থা এবং বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থায় দুঃখ ও বেদনা। তাঁহার 'সেকোয়া-এ-হিন্দে' একদিকে যেমন তিনি মুসলমানের ভারত প্রবেশের বীর্য্যশ্রীমণ্ডিত কাহিনী—মুসলেম রাজত্বের যুগের গৌরবময় ইতিহাস অকুণ্ঠ কণ্ঠে প্রকাশ করিয়াছেন---তেমনি বর্ত্তমান মুসলমানের শোচনীয় দুর্দ্দশায় কবির সত্যকার দরদী চিত্ত লইয়াই কাঁদিয়াছেন। তাঁহার অন্তরের এই বেদনাময় প্রকাশ, প্রত্যেক পাঠকের মনে আবেদন জানায়। তাঁহার 'কাসিদাতুল গিয়াসিয়া'য় তিনি মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদের প্রতি যে ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন তাহা প্রত্যেক মুসলিমের চিত্তকে অপূর্ব্ব ভক্তিরসে আপ্লুত করে।—ভক্ত মুসলিমের চোখে আঁশু বহিয়া আনে। কিন্তু তাঁহার অমর সৃষ্টি 'মোসদ্দস্'---কবি প্রতিভার চরম বিকাশ, এই 'মোসাদ্দস্' তাঁহাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদের আসনে তুলিয়া দিয়াছে।---'মোসদ্দসে' বর্ণনার ঘটা, অত্যধিক উত্তেজনা এবং বাগাড়ম্বর কোথায় ও নাই---এই গুলি পর্ব্বতের গুহা নিঃসৃত ঝরনার মত, সহজ সরল গতিতে আপন মনেই বহিয়া চলিয়াছে। এইটাই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম সহজ ও সরল কাব্যে মুসলমানের উত্থান পতনের সম্পূর্ণ ইতিহাস। তিনি 'মোসদ্দসে' বলিয়াছেন--- বর্ত্তমান মুসলমান বিশাল সমুদ্রে বিপুল ঝড় ঝঞ্চার মধ্যে নিক্ষিপ্ত দিশাহারা নাবিকের মত কিন্ত যুগ সঞ্চিত অবসাদে তাহারা এখনো

ঘুমঘোরে অচেতন। প্রাগ-ঐসলামিক যুগের আরবের অবস্থা বর্ণনার পর তিনি তাঁহার স্বভাব সুন্দর ভাষা ও ছন্দের মাধ্যমে হজরত মোহাম্মদের আবির্ভাব তাঁহার নব ধর্ম্ম প্রচার এবং তাহার ফলে বেদুইন আরবে নব সভ্যতার জন্ম ও পরিণতির ইতিহাস অতি সুন্দর রূপে ধরিয়া দিয়াছেন। তারপর বিজয়ী ইসলাম দিকে দিকে নিজের শিক্ষা, সভ্যতা ও বিজয় পতাকা বহিয়া চলিয়াছে---'পূর্ব্বে সিন্ধু হিন্দু দেশ---পশ্চিমে হিস্পানী শেষ' তাঁহাদের পদানত; কিন্তু নিয়তির খেলা, আবার কালচক্র ঘুরিয়া গেল---দেখিতে দেখিতে এই বিরাট জাতির শিরায় শিরায় অধঃপতনের ঘুন ধরিল। অন্ধ কুসংস্কার ও গোঁড়ামী আসিয়া উদার ইসলামকে ছাইয়া ফেলিল—অজ্ঞতা ভ্রাতৃ-বিরোধ, বিলাসিতা ইত্যাদি এই মহিমান্বিত জাতিকে অধঃপতনের নিম্নস্তরে টানিয়া আনিল। এই সবই মোসদ্দসে বর্ণিত হইয়াছে---হালী নিজেই বলিয়াছেন তাঁহার মোসদ্দস ইসলামের অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থার দর্পণ।

ইংরাজ কবি Gray, Elegy লিখিয়া যেমন মুহূর্ত্তের মধ্যে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন---হালিও 'মোসদ্দস' লিখিয়া অল্পকালের মধ্যে যশস্বী হইয়া উঠেন। তাঁহার মোসদ্দসের অনেক লাইন সেইকালে লোকের মুখে মুখে ঘুরিয়া ফিরিত।

তাঁহার 'হোব্বে ওথন' পড়িলে বুঝা যায় তিনি কতখানি স্বদেশ প্রেমিক ছিলেন—এই কবিতা পড়িয়া অনেকেই তাঁহাকে স্বদেশ প্রেমিক কবি Scott ও Burns-এর সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন।

তাঁহার সমস্ত কবিতার পরিচয় দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। কিন্তু এই কথা নিঃসন্দেহরূপে সত্য যে তিনি নূতন বিষয় বর্ণনা ও নব পদ্ধতির প্রচলন করিয়া উর্দ্দু সাহিত্যকে সম্পদশালী করিয়াছেন। উর্দ্দু ভাষাভাষী ও উর্দ্দু সাহিত্য রসিক হালির কাছে নব কাব্য সাহিত্য পত্তনের জন্য চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিবে। উর্দ্দু সাহিত্যে স্বদেশ প্রেম ও প্রকৃতি বর্ণনার কবিতা তিনিই সর্ব্বপ্রথম প্রচলন করেন। হালির জন্ম না হইলে উর্দ্দু সাহিত্য প্রেম ও শরাবের হাত হইতে মুক্তি পাইত কিনা কে জানে।

হালি ভারতের সর্ব্বপ্রথম জাতীয় কবি, উর্দ্দু সাহিত্যে Romantic কবিতার জন্মদাতা এবং বর্ত্তমান উর্দ্দু সাহিত্যের মধ্যাহ্ন-রবি ইকবালের অগ্রদূত।

১৩৩৪

নারী-জাগরণ

গত বৎসরের পৌষ-অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'জাগরণে' (ঢাকা) কুমারী নূরজাহান মহোদয়ার 'বঙ্গ-মুসলিম নারী-জাগরণ' শীর্ষক এক নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, প্রবন্ধটী ক্ষুদ্র হইলেও সুচিন্তিত।

অবরোধ-প্রথা সম্পর্কে তিনি তাঁহার প্রবন্ধে দুইটী প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছেন। একটী--মুসলমান মেয়েরা কি জন্য বাহির হইবেন? —দ্বিতীয়টি তাঁহারা কি ভাবে বাহির হইবেন? প্রশ্ন দুইটী স্বাভাবিক এবং ততোধিক সুখের বিষয়, প্রশ্ন দুইটী নারীদের পক্ষ হইতে উঠিয়াছে। আমার বিশ্বাস, এর সমাধানও নারীদের উপর নির্ভর করে। আমাদের পক্ষে—বিশেষতঃ আমার পক্ষে এর সঠিক সমাধান সম্ভব নয়; কারণ নারী জীবন সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা, তাঁহাদের আশা-আকাঙ্খা ও aspiration-সম্বন্ধে আমার পরিচয় নেহাৎ কম। কাজেই আধুনিক আলোক-প্রাপ্তা মুসলিম রমনী তাঁহাদের গৌরবময় অতীতের উপর দাঁড়াইয়া কোন্ ভবিষ্যতের কল্পনা করেন, তাহা আমার অজ্ঞাত।

বৎসর খানেক পূর্ব্বে সাহিত্যের দীন-ভক্ত হিসাবে অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে একবার অনুযোগ করিয়াছিলাম এবং সে দিনের অনুযোগ ছিল ---নিছক সাহিত্যের পক্ষ হইতে। সেদিন বলিয়াছিলাম, আমাদের সাহিত্যিকেরা আমাদের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ— নিজের এবং দুই-চারিটী আত্মীয়-পরিবারের মধ্যেই তাঁহাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ, কাজেই মুসলমান রমণীর সুখ-দুঃখের কথা, তাঁহাদের হাসিঅশ্রুর ইতিহাস, তাঁহাদের আশা-আকাঙ্খা আমাদের সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিতেছে না।

আজ কুমারী নূরজাহানের প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার কারণ, তাঁহার উত্থাপিত প্রশ্নদ্বয়ের যৌক্তিকতা আমি স্বীকার করি—

এবং এই প্রশ্ন দুইটীর দিকে আমাদের মহিলা-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করা কর্ত্তব্য মনে করিতেছি। অবরোধ প্রথা সম্বন্ধে আজকাল অনেকে অনেক কথা বলিতেছেন। কেহ বলিতেছেন, অবরোধ একেবারে উঠাইয়া দিতে হইবে, আবার কেহ বলিতেছেন, এটাই আমাদের মেয়েদের গৌরব।

মানুষের সাধারণ ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠি লইয়া বিচার করিয়া দেখিলে মনে হয়, মানুষ মানুষকে আলো-বাতাস হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহার জীবনের অবাধগতি রুদ্ধ করিয়া দিবে, ইহার চাইতে বর্ব্বরতা আর কী হইতে পারে! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও ভুলিলে চলিবে না যে, মানুষ সামাজিক জীব;—কাজেই সমাজের কল্যাণ-অকল্যাণের দিকে চাহিয়া তাহাকে জীবনের অনেক কিছু নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়—অনেক জায়গায় বাঁধন আঁটিয়া দিতে হয়, আবার অনেক জায়গায় বাঁধন শিথিল করিতে হয়। মানুষের জীবনে যৌন ব্যাপারই বোধ হয় সৃষ্টির রহস্যতম কাণ্ড এবং এইটাই বোধ হয় মানুষের দুর্ব্বলতম বন্ধন। কাজেই সমাজে নর-নারীর সম্বন্ধকে এমনিভাবে নিয়মাবদ্ধ করিতে হয়, যাহাতে মানুষের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া না হয়।

বহু যুগ হইতে নারী অবরুদ্ধ জীবন যাপন করিয়া আসিতেছে। কাজেই বর্ত্তমানে তাঁহাদের দেহ-মন নিতান্ত পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে, এই কথা বলাই বাহুল্য। অনেককেই জানি, যাঁহারা নিজেরা তাঁহাদের পরিবারের মেয়েদের বাহিরে আনিবার চেষ্টা করিয়াও মেয়েদের রাজী করাইতে পারেন নাই—মেয়েরা নিজেরা বাহিরে আসিতে অনিচ্ছুক। এই যে ভীত ও দুর্ব্বল মন, এইগুলিকে আগে স্বাধীনতার উপযুক্ত না করিয়া হঠাৎ বাহিরে আসিতে বাধ্য করিলে, তাঁহাদের প্রতি অবিচারই করা হইবে। স্বাধীনতা পাইতে যেমন বহু সাধনার দরকার, তেমনি তাহাকে ভোগ করিবার জন্য নিজেকে উপযুক্ত করিয়া লইতেও বহু সাধনার আবশ্যক—আর না হয়, জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতা অনিবার্য্য!

মোটামোটী মানুষের জীবনের দুইটী দিক—দৈহিক ও মানসিক এই উভয় দিকের পরিপুষ্টির উপরই জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্য নির্ভর

করে। আধ্যাত্মিক দেশের লোক আমরা দেহটাকে নশ্বর ভাবিয়া সহজেই তাহার মঙ্গলামঙ্গল অস্বীকার করিয়া বসি—অথচ ইহাই পরম সত্য যে, আমাদের সব কিছু ঐ দেহটার উপরই নির্ভর করে। জাতির স্বাস্থ্য বার আনা নির্ভর করে মেয়েদের উপর। দেশের মৃত্যু-তালিকায় দেখা যায়, মুসলমান প্রসূতি ও শিশুদের মৃত্যুর হার অনেক বেশী, এর জন্য দারিদ্র ও অজ্ঞানতার সঙ্গে সঙ্গে অবরোধও যে অনেকখানি দায়ী এই কথা অস্বীকার করিবার যো নাই।

সব মুসলমান পরিবারে অবরোধ মেয়েদের স্বাস্থ্যের প্রতিকূল তাহা আমি বলিতেছি না; কিন্তু তথাপি আমি মেয়েদের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষপাতী। কারণ স্বাধীনতা এমনি সম্পদ—যাহা মানুষকে ছোট হইতে বড় করে। তবে আধুনিক মুসলমান মেয়েদের স্বাধীনতার ব্যাপারে ক্রমশঃ-নীতি অবলম্বন করিতে বলার একমাত্র কারণ এই যে, মুসলমান মেয়ের অধীনতা তাহার এক জীবনের অধীনতা নহে; বংশ পরম্পরায় বহু-জীবনের অধীনতার চাপ তাহার ভিতর জমাট বাঁধিয়া তাহাকে এমনি পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছে যে, সে আজ হঠাৎ রাস্তায় হাটিতে গেলে পড়িয়া যাইবার ভয় আছে—রাস্তায় দাঁড়াইয়া সে আজ অন্যের চোখের দিকে তাকাইয়া কথা বলিতে পারিবে না। এত দিনের অধীনতার যাঁতা-কলে পড়িয়া স্বাধীনতা যে কি, তাহাতে যে তাহারও অধিকার আছে, তাহার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য তাহারও যে স্বাধীনতার দরকার —এ কথা নারী আজ সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়াছে। কাজেই ধীরে ধীরে তাহার মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা জাগাইয়া তুলিতে হইবে এবং সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগকে তৈয়ারী করিয়া লইতে হইবে।

এদেশের মুসলমান মেয়েরা স্বাধীনতা চায় কি চায় না, এখনো সে বিষয় তাঁহাদের সঠিক মতামত জানা যায় নাই। অবরোধ দূরীকরণ সম্বন্ধে বাঙ্গালী মুসলমান মেয়েদের মধ্যে কোন বিশেষ রকম আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। অথচ আমার মনে হয়, মেয়েদের মুক্তির জন্য পুরুষদের আন্দোলন অনেকটা ব্যর্থতারই প্রকাশ। পুরুষদের অবরোধ দূরীকরণ সমিতি আমার কাছে হিন্দুদের গো-রক্ষা সমিতিরই অনুরূপ মনে হয়। ইহা নারীর ব্যক্তিত্বের

প্রতি চরম অপমান। অবরোধ দূরীকরণের জন্য যদি কোন আন্দোলনের দরকার থাকে, তবে সে আন্দোলন নারীদের পক্ষ হইতে আসা উচিত। পরের অনুগ্রহ গ্রহণের মধ্যে যে দীনতা আছে, সে দীনতার লজ্জা হইতে বাঙলার মুসলমান মেয়ে যেন রক্ষা পায়! তারপর, এই অবরোধ দূরীকরণে যদি নারীর সম্পূর্ণ সম্মতি না থাকে, তবে ইহা যে অধীনতারই নামান্তর হইয়া দাঁড়াইবে!

পুরুষ ও নারী এই দুইটী অংশ মিলিয়াই একটা জাতি। শুধু নারী যেমন একটা জাতি হইতে পারে না, শুধু পুরুষও একটা জাতি গঠন করিতে পারে না। কিন্তু এ দেশের একটা দুর্ভাগ্য অনেক দিন হইতে এদেশবাসী জাতি অর্থে শুধু দেশের পুরুষ গুলিকে ধরিয়া লইয়াছে। তাই জাতির উন্নতি শুধু পুরুষের উন্নতি সাব্যস্ত করিয়া এ দেশের পিতা শুধু পুত্র-সন্তানকে শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। তাহার কন্যাও যে জাতির একজন, জাতির ভবিষ্যৎ জননী এই কল্পনা তাহার মনে কোন দিন আসে নাই। কন্যারও শিক্ষা-দীক্ষার দরকার আছে, এ কথা এদেশবাসী অনেক দিন হইতে ভুলিয়া আছে। অন্ধকারে পিঞ্জরাবদ্ধ রাখিয়া যেন-তেন প্রকারে নয়-দশ বৎসর পর্য্যন্ত ভাত কাপড় দিয়া পাত্রস্থ করিতে পারিলেই এদেশের পিতা তাঁর পিতৃত্বের দায়িত্ব শেষ করিয়া তৃপ্তি লাভ করেন। নারীর গৌরব বর্ণনা অনেক হইয়াছে এবং প্রত্যেক নর-নারী এই সম্বন্ধে ওয়াকেফ্-হালও আছেন। কারণ প্রত্যেকেই নারীর সন্তান। কাজেই নারী-জননীর দেহমনের প্রভাব তাঁর উপর কতখানি, এই কথা প্রত্যেক লোক বুঝেন এবং তিনি যাঁহাকে জননীর গৌরব দান করিবেন, তাঁহার দেহ মন কি রকম উন্নত হওয়া উচিত, এই কথাও হয়ত তিনি বুঝেন। প্রশ্ন হইতে পারে, তথাপি এত যুগ পর্য্যন্ত পুরুষদের পক্ষ হইতেও নারীর মুক্তির কোন আন্দোলন উঠে নাই কেন; বরং দেখা গিয়াছে স্থান-বিশেষে পুরুষ অবরোধকে কঠোর হইতে কঠোরতর করিবার চেষ্টা করিয়াছে। আমার মনে হয়, তাহার কারণ—কোন এক অধঃপতনের দিনে পুরুষ নারীকে স্রেফ ভোগের মূর্ত্তিতে দেখিয়াছিল। সেই অধঃপতনের যুগ আমাদের জীবনে এখনো অবসান হয় নাই; তাই সেই হইতে নারী আজিও

ভোগের সামগ্রীরূপে পরিণত! মানুষের স্বভাব সে তার ভোগ ও লোভের জিনিষকে অন্য চক্ষুর অন্তরালে রাখিবার চেষ্টা করে। পুরুষের এই ভোগ-লালসাই নারীর অবরোধের মূল কারণ। এতদিন আমাদের সমাজের নারীদের পক্ষ হইতেও এই ধারণা ভাঙ্গাইবার কোন চেষ্টা হয় নাই। তাঁহাদের মধ্যেও যে ভোগাতীত শক্তি আছে, সুযোগ ও সুবিধা পাইলে তাহা জীবনের সবদিকে বিকশিত হইয়া উঠিতে পারে, এই কথা নারী জানিত কিনা জানি না, কিন্তু পুরুষদের এই যুগ-যুগের ধারণার বিরুদ্ধে তাঁহারা কোন প্রতিবাদ তোলেন নাই; তাই নারী আজিও ভোগের বস্তু হইয়াই আছে।

আজ নারীর মর্য্যাদার দিকে মানুষের চেতনা ফিরিয়া আসিতেছে—তথাপি এতদিনের সংস্কার নর-নারী কেহই সাহস করিয়া ভাঙ্গিতে পারিতেছে না। যেদিন আমাদের দেশের লোক এ সংস্কার মুক্ত হইতে পারিবে, সেদিন অবরোধের অবসান অনিবার্য্য। তবে এই কথা সত্য যে, নারীর লম্বা লম্বা গুণ কীর্ত্তন করিয়া এই সংস্কারের উচ্ছেদ হইবে না। আজ প্রত্যেক শিক্ষিত নর-নারীকে নিজের জীবনে এই সংস্কারকে ডিঙাইয়া যাইতে হইবে। শিক্ষিতা নারী আজ জীবনের সব প্রয়োজনে বাহিরে আসিয়া দাঁড়ান, শিক্ষিত পুরুষও এই বিষয়ে তাঁহাদিগকে সাহায্য করুক এবং নিজের জীবনে নারীর মর্য্যাদা-জ্ঞানকে ফুটাইয়া তুলুক!

একটা কথা না বলিয়া পারিতেছি না। বাঙলাদেশে মুসলমান শিক্ষিতা মেয়ের সংখ্যা দিন-দিন বাড়িতেছে। ইতিমধ্যে কয়েকজন গ্রাজুয়েট হইয়াছেন, কয়েকজন কলেজে পড়িতেছেন। এ ছাড়া দেশের বিভিন্ন পরিবারে শিক্ষিতা মেয়ের অভাব নাই। তথাপি এদেশে নারী-কল্যাণ উদ্দেশ্যে মুসলমান মেয়েদের মধ্যে কোন আন্দোলন সৃষ্টি হইতেছে না, কোন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না কেন? সমাজ হিতৈষিনী কর্ম্মিষ্ঠা কয়েকজন প্রবীণা নারী কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে স্কুল পরিচালনা করিয়া সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতেছেন, তাঁহাদের কথা আমার স্মরণ আছে—মুসলমান সমাজ তাঁহাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। আমার অনুযোগ হইতেছে, আধুনিক আলোকপ্রাপ্তা নবীনা সমাজের প্রতি। দেশের কোটী কোটী অশিক্ষিতা নারীর বেদনা কী ইহাদের

বুকে একটুও করুণার উদ্রেক করে না? এই সম্বন্ধে ইঁহাদের মনে কী একটুও ভাবনা আসে না?

কেহ কেহ মাসিকের পৃষ্ঠায় অবরোধের বিরুদ্ধে খুব করিয়া লিখিয়া থাকেন, কিন্তু ইঁহাদের দৌড় ঐ লেখা পর্য্যন্তই, ব্যক্তিগত জীবনে ইঁহারা নিজেরাও কঠোর অবরোধ পালন করিয়া থাকেন। পর্দ্দার বাহিরে আসা দূরে থাকুক, ইঁহারা ভিতরে থাকিয়া দুরাগত বন্ধু-বান্ধবের কুশল জিজ্ঞাসা করার সাধারণ ভদ্রতাটুকুও পালন করেন না। সংবাদ পত্রিকায় পর্দ্দার বিরুদ্ধে লিখিয়া পরে কঠোর পর্দ্দা পালন করাতে হয়ত 'পুণ্য' আছে, কিন্তু এতে নিজের অন্তরের সঙ্গে মিথ্যাচারের যে দীনতা---তাহার জ্বালা ইঁহারা কেমন করিয়া সহ্য করেন।

শ্রদ্ধেয়া মিসেস আর. এস্. হোসেন সেকালের মেয়ে। তথাপি তাঁহাকে দেখিয়াছি, তিনি পর্দ্দার অন্তরালে থাকিয়া ও সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়া থাকেন; তারপর সেবার নিখিল-ভারত মুসলমান শিক্ষা-সমিতির আলীগড় অধিবেশনে তিনি যে সাহস ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছেন, তাহা স্মরণে চিরদিন নারী-সমাজের মুখ গৌরবোজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। এই সেকেলে মেয়েটীর সঙ্গে একালের কলেজে-পড়া মেয়েদের তুলনা করিলে আমাদের আলোক-প্রাপ্তা তরুণী ভগ্নিদের জন্য করুণা হয়। ইচ্ছা থাকিলে যে অনেক কাজ করা যায়, তার বড় দৃষ্টান্ত মিসেস্ আর. এস্. হোসেনের জীবন। বাঙলার বাহিরেও মুসলমান মেয়েরা পর্দ্দার ভিতর থাকিয়া অনেক কাজ করিতেছেন, কিন্তু বাঙলার মুসলমান মেয়েরা একেবারে নীরব কেন?

কুমারী নূরজাহানের প্রশ্ন—মুসলমান মেয়েরা কেমন করিয়া বাহিরে আসিবেন? তাহার উত্তরে তিনি নিজেও দুইটী পথের নির্দ্দেশ করিয়াছেন---এক শিক্ষয়িত্রী, দ্বিতীয় চিকিৎসা ব্যবসায়ী হিসাবে। আমার কথা, উপযুক্ত হইয়া মুসলমান মেয়েরা জীবনের সব প্রয়োজনের তাগিদে সাড়া দিবেন।

শিক্ষা ও চিকিৎসা এই দুইটী প্রধান বৃত্তি মেয়েরা গ্রহণ না করিলে ত উপায়ই নাই। মেয়েদের চিকিৎসা মেয়ে ডাক্তার দ্বারা হওয়া বাঞ্ছনীয়, এই কথা প্রত্যেক মেয়েই বোধ হয় স্বীকার করিবেন। এত

কোটী কোটী মুসলমান মেয়ের চিকিৎসার জন্য কত মেয়ে ডাক্তার দরকার, আর এই জন্য মেয়েদের অবরোধের বাহিরে আসার প্রয়োজনীয়তা, আর বক্তৃতা দিয়া বুঝাইবার সময় নাই। মেয়ে-ডাক্তারের জন্য চিরদিন অন্য সমাজের প্রতি হাত পাতিতে মুসলমান মেয়েদের লজ্জা হয় না, এ কথা আমরা ভাবিতে পারি না! আর মেয়েদের শিক্ষার ভারও মেয়েদের নিজেদের হাতে রাখাই বিধেয়। এখন মেয়েরা বোধ হয় নিজেরা বুঝিতেছেন—স্বামীর কাছে পত্র লেখা এবং বাজার-হিসাবের বিদ্যায় আর চলিবে না। পৃথিবী দিনে দিনে উন্নত হইতেছে। এখন উচচ-শিক্ষা ছাড়া মুসলমান-মেয়েরা—তথা মুসলমান সমাজ জীবনের প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে তিষ্ঠিতে পারিবে না। এখন দেশের সাহিত্য, রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা সব বিষয়ে মুসলমান মেয়েদের পরিচিত হইতে হইবে— এক কথায় উচচ-শিক্ষা পাইতে হইবে। এই উচচ-শিক্ষা গ্রহণ ও দিবার জন্য মুসলমান মেয়েদের অবরোধের বাহিরে না আসিয়া ত উপায় নাই।

আর একটী কথা; দেশে রাষ্ট্রনৈতিক মুক্তি আন্দোলন চলিতেছে। মুসলমানদের এই আন্দোলন হইতে দূরে থাকার অর্থ—নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করা। ভারতবর্ষ একদিন বৈদেশিক নাগ-পাশ ছিন্ন করিয়া মুক্ত হইবেই। আজ মুসলমান এই আন্দোলনে যোগ না দিলে, সেই দিন সেই আন্দোলনে মুসলমান ছেলে-মেয়েরা কি অন্যের অর্জ্জিত মুক্তি হাত পাতিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে? সেই দীনতা কী তাহাদের রক্তে আছে? তারপর ভারতবর্ষের অন্যান্য সম্প্রদায় যদি স্বাধীনতার আন্দোলন না-ও করে তথাপি মুসলমানকে করিতে হইবে। কারণ অন্যের পক্ষে স্বাধীনতার আন্দোলন অনেকটা সখও হইতে পারে, কিন্তু মুসলমানের এটা ধর্ম্ম। অধীনতা তাহার পক্ষে পাপ। অধীনতা তাহার ইতিহাস, তাহার সভ্যতা, তাহার Culture এর বিরুদ্ধ জিনিষ। কাজেই এই স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলমান মেয়েদেরও পরিপূর্ণ সাহায্য দরকার। এই জন্যও মুসলমান মেয়েদের অবরোধ ছাড়িয়া বাহিরে আসিতে হইবে। মোট কথা আমার বক্তব্য, মানুষের মঙ্গলামঙ্গলকে আদর্শ করিয়া জীবনের প্রত্যেক প্রয়োজনে মুসলমান মেয়েরা অবরোধের বাহিরে আসিবেন!

পৌষ, ১৩৩৬

বিদায় ভাষণ
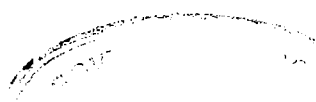
শিক্ষক ও ছাত্রের যে মধুর সম্পর্ক, তার চেয়ে মধুরতর কোন সম্পর্ক আমার জানা নেই। মানব জীবনের অন্যান্য সম্পর্ক যতই অচ্ছেদ্য হউক তার মধ্যে কিছুমাত্র অসাধারণত্ব নেই এবং সেই সব সম্পর্ক সৃষ্টির জন্যে কোন পক্ষকেই বিশেষ কোন সাধনা করতে হয় না। তা প্রাকৃতিক ও জৈবিক নিয়মানুসারেই প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু শিক্ষক ও ছাত্রের যে সম্পর্ক তা সাধনার সম্পর্ক, তা তপস্যার সম্পর্ক। শিক্ষকেরা আজীবন কঠোর সাধনা করে, মানব জীবনের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ যে জ্ঞান আহরণ করেছেন, তাই তাঁরা ছাত্রদের তিলে তিলে দান করেন। সেই দান অন্যান্য দানের মত বিনা আয়াসে মুষ্টি ভিক্ষার মত হাতে তুলে দেওয়া যায় না,—শিক্ষককে প্রতিদিন কত পরিশ্রম, কত যত্ন ও কত আয়াস স্বীকার করে তা দান করতে হয়। এই দান গ্রহণ করতেও সাধনার দরকার, ভিক্ষুকের মত হাত পেতে এই দান গ্রহণ করা যায় না,—এই দান গ্রহণ করতে ছাত্রদের সমগ্র শক্তি নিয়োগ করতে হয়, কত বিনিদ্র রজনীর তপস্যা দিয়ে কত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের দ্বারা এই দান গ্রহণ করতে হয়, নিজেকে এই দান গ্রহণের যোগ্য করে তুল্‌তে হয়, তোমরা ছাত্র, তা তোমাদের বেশ ভাল করেই জানা আছে। কোন পিতা পিতৃত্ব অর্জ্জনের জন্য, কোন ভ্রাতা ভ্রাতৃত্ব অর্জ্জনের জন্য এই রকম কঠোর সাধনা কোনদিন করেননি, যে সাধনা শিক্ষককে যোগ্য শিক্ষক হওয়ার জন্য করতে হয় এবং কোন পুত্র ও পুত্রত্ব অর্জ্জনের জন্যে এ তপস্যা করেননি, যে তপস্যা ছাত্রকে যোগ্য ছাত্র হওয়ার জন্য করতে হয়। তাই বল্‌ছিলাম, শিক্ষক ছাত্রের যে সম্পর্ক তা তপস্যার সম্পর্ক তা সাধনার সম্পর্ক— এবং মানবেতিহাসে এর চেয়ে মধুরতর ও এর চেয়ে পবিত্র কোন সম্পর্ক কল্পনা করা যায় না। **আমার দৃঢ় বিশ্বাস পৃথিবীতে যতদিন শিক্ষার**

মর্য্যাদা থাক্‌বে যতদিন জ্ঞান মানব সভ্যতার কেন্দ্রস্থল থাকবে এবং যতদিন লেখাপড়াকে মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন বলে মনে করা হবে অর্থাৎ যতদিন সমস্ত মানুষ দেবতা হয়ে উঠবে না অথবা পশুত্বে নেমে যাবে না, ততদিন শিক্ষক ছাত্রের এই মধুর ও পবিত্র সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ থাক্‌বে। তাই সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, সর্ব্বধর্ম্মে ও সমাজে এই সম্পর্কের পবিত্রতাকে স্বীকার করা হয়েছে। তোমাদের সঙ্গে আমার এই মধুর ও পবিত্র সম্পর্ক ছিল! আজ এই বিদায় বেলার অন্তহীন দুঃখের মাঝেও এই ভেবে আমার সান্ত্বনা যে আমাদের এই সম্পর্কের মাধুর্য্য একদিনের তরেও ক্ষুণ্ণ হয়নি। অপ্রীতি ও অশ্রদ্ধা আমাদের মাঝখানে কখনো মাথা তুলতে পারেনি।

কালও বলেছি---আমি চিরদিন মানব চরিত্রের মানবীয়দিগকেই ভালবাসি---তোমাদের মধ্যেও আমি এই মানবীয়দিগকেই বেশী করে খুঁজেছি। তাই মানব শিশু-সুলভ তোমাদের দৈহিক চল-চাঞ্চল্য ও অনাবিল হাস্য-কৌতুক আমি সব সময় মুগ্ধ নেত্রে উপভোগ করেছি---অনেক সময় ধমক দিতে গিয়ে নিজের মনের কাছ থেকেই বাধা পেয়েছি। মানব শিশুর ক্রমবর্দ্ধমান দেহ ও ক্রমবিকাশমান মনের চেয়ে কোন সুন্দর দৃশ্য আমার কল্পনায় আসে না। পৃথিবীর একাধিক সাহিত্যে, একাধিক কবি শিশুকে স্বর্গীয় প্রাণী বলে অভিহিত করেছেন। স্বর্গের কোন বস্তুর অভিজ্ঞতা আমাদের নেই কিন্তু আশৈশব স্বর্গের একটা কাল্পনিক ধারণা আমাদের আছে—স্বর্গ বল্‌তে আমরা বুঝি---পবিত্রতা, সৌন্দর্য্য ও অনাবিলতা; মানব-শিশুর জীবন এই পবিত্রতা, সৌন্দর্য্য ও অনাবিলতার আধার। সংসারের কল-কোলাহলে তোমাদের হৃদয় এখনো কলুষিত হয়নি, স্বার্থের দ্বন্দ্ব তোমাদের এখনো স্পর্শ করেনি---উদ্যানের স্ফুটনোন্মুখ পুষ্প কলিকার সঙ্গে তোমাদের জীবনের তুলনা হ'তে পারে। শতদলের বৃন্তে কাঁটা থাকা অসম্ভব নয়, অস্বাভাবিকও নয়—কিন্তু তার কাঁটার চেয়ে তার বিকশমান সৌন্দর্য্য ও সৌরভের মূল্য কি অনেক বেশী নয়? মানব-পরিবারের পুষ্প-কলিকা তোমরা---এই স্কুল-রূপ উদ্যানে সমবেত হয়েছ। পুষ্প বৃন্তের কণ্টকের মত তোমাদের স্বভাবে ও জীবনে দোষ ত্রুটী থাকা অস্বাভাবিক নয়---কিন্তু

সে দোষ ত্রুটী আমার চক্ষে বড় হয়ে দেখা দেয়নি কোনদিন! তোমাদের জীবনের নিষ্কলুষ স্বর্গীয় পবিত্রতাই আমায় আকৃষ্ট করেছে সবচেয়ে বেশী। তাই তোমাদের কথা, তোমাদের হাসি তোমাদের বুদ্ধি ও ক্রীড়া-কৌতুক আমায় অপরিসীম আনন্দ দিত।

তোমাদের সঙ্গে আমি একটা হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছিলাম---তোমাদের আশা আকাঙ্খার সঙ্গে আমি নিজেকে মিশাতে চেয়েছি। তাই কঠোর শিক্ষকের কঠোরতা দিয়ে আমি কখনো তোমাদের দূরে সরিয়ে রাখতে চাইনি। তোমাদের অনেকেই জান, পেশা হিসেবে আমি শিক্ষক হলেও, স্বভাবত আমি জন্ম-ছাত্র। বই এখনো আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় সামগ্রী। লেখা-পড়া এখনো আমার অবসর বিনোদনের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। এখনো আমার টেবিলের উপর, আমার শয্যাপার্শ্বে বই না হলে আমি অস্বস্তি অনুভব করি। কাজেই ছাত্র জীবনের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত জীবন যাত্রার একটা গভীর সাদৃশ্য আছে---মনে হয় এইটি অন্যতম কারণ, যার ফলে ছাত্রদের সঙ্গে একটা মানসিক ঐক্য খুঁজে পেতে, তাদের হৃদয়ের সঙ্গে যোগ স্থাপন করতে আমাকে কখনো বেগ পেতে হয়নি। ক্লাসের পড়াশোনা সম্বন্ধে আমার একটী আদর্শ ছিল---সেইটি এই; আমি কখনো পাঠ্য বইর বেড়া দিয়ে তোমাদের বিকশমান মনকে ঘিরে রাখতে চাইনি---যখনি সুযোগ পেয়েছি বাইরের বই, প্রবন্ধ ও কবিতা ইত্যাদি তোমাদের আমি পড়িয়ে শুনিয়েছি। উদ্দেশ্য পাঠ্য বইর গোস্পদ থেকে তোমাদের মনকে জ্ঞানের অসীম সমুদ্রের দিকে আকৃষ্ট করা। মনে রাখবে, পাঠ্য বই হচ্ছে, পথের আলোকস্তম্ভ, তার আলোকের সাহায্যে পথ চল্‌তে হয়,---কিন্তু কেউ যদি আলোকস্তম্ভকে নিজের বাড়ী বা গন্তব্য স্থান মনে করে, সে যেমন ভুল করে সে রকম যে ছাত্র পাঠ্য বইকেই জ্ঞানভাণ্ডার মনে করে বসে সেও সে রকম ভুল করে। স্কুলের নিয়ম ভঙ্গ করেও তোমাদের এই ভুল ভাঙ্গার চেষ্টা আমি মাঝে মাঝে করেছি।

শৈশব, বাল্য ও কৈশোরের মধ্যে তোমাদের জীবন এখনো সীমাবদ্ধ। তোমাদের দৈহিক ও মানসিক শক্তি, তোমাদের স্বভাব ও চরিত্র এখনো অসম্পূর্ণ এখনো অর্দ্ধ বিকশিত---তবুও তোমাদের অনেকের

মধ্যে এমন শক্তির আভাস আছে, যা'তে সহজেই মনে করা যায় তোমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ও গৌরবমণ্ডিত হবে।

আমাদের অর্থাৎ শিক্ষকদের জীবনের সার্থকতা, তোমাদের অর্থাৎ ছাত্রদের জীবনের সফলতার মধ্যে। তোমরা যদি বড় হও, তোমাদের জীবন যদি মহৎ ও উদার হয়—তোমরা যদি কীর্ত্তিমান ও যশস্বী হও, —আমরা যেখানেই থাকিনা কেন, তোমাদের সংবাদ আমাদের হৃদয়কে অনাবিল আনন্দরসে সিক্ত করবে। মনে রেখো,—ছাত্রদের কীর্ত্তির চেয়ে শিক্ষকের জন্যে আর কোন বড় সুসংবাদ নেই।

পুষ্প-কলিকা যেমন দিন দিন প্রস্ফুটিত হয়, তার সৌরভ সুষমায় দিগদিগন্ত আমোদিত করে তোলে—তোমরাও মানব বংশের পুষ্পকলিকা, আমি প্রার্থনা করি, তোমাদের জীবনও যেন পুষ্পের মত সৌন্দর্য্য মণ্ডিত হয়ে গড়ে উঠুক—তোমাদের সদ্‌গুণরাজির সৌরভে তোমাদের চতুর্দ্দিক যেন আমোদিত হয়ে ওঠে। যে পরিবারে তোমরা জন্মগ্রহণ করেছ, যে সমাজে ও যে দেশে তোমরা প্রতিপালিত ও বর্দ্ধিত হচ্ছ সেই পরিবারের, সেই সমাজের ও সেই দেশের দুঃখ যেন তোমরা দূর করতে পার;—পরের দুঃখ লাঘব করতে পার বা না পার অন্তত পরের দুঃখ বৃদ্ধি তোমরা করবে না, এই পণ তোমাদের জীবনে সত্য হউক।*

---

* খুলনা জেলা স্কুল থেকে বিদায়ের দিনে প্রদত্ত বক্তৃতার অংশ বিশেষ। ১৯৩৭

শরৎ-সাহিত্যের ভিত্তিভূমি অপরূপ চরিত্র চিত্রন। তাঁর সৃষ্টচরিত্রগুলি কায়া-হীন ছায়া নয়, তারা সবাই রক্ত মাংসের মানুষ। মনে হয় শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তার মূলেও তার এই নৈপুন্যই বিরাজ করছে। শুধু কথার তুবড়ি বাজিতে মানুষকে বেশীক্ষণ ভুলিয়ে রাখা যায় না; তাই আমাদের আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকে অধিকতর বিদ্যাবুদ্ধি ও মনীষা নিয়েও, শুধু বাকসর্ব্বস্ব বলে, আজ পর্য্যন্ত সাহিত্যে কোন স্থায়ী রেখা পাত করতে সক্ষম হলেন না। শরৎচন্দ্রের minor চরিত্রগুলিও অপরূপ—তারা সবাই মেরুদণ্ডসম্পন্ন মানুষ; রামের সুমতির মত ক্ষুদ্র লেখার ক্ষুদ্রতর চরিত্র নীলমনি কবিরাজ ও নেত্য ঝিকেও কি আমরা ভুলতে পারি? নিছক গল্প দিয়ে শরৎচন্দ্র তার পাঠকদের ভোলাতে চেষ্টা করেন নি;- দৃঢ় ও সুস্পষ্ট চরিত্রসম্পন্ন সত্যিকার মানুষ সৃষ্টি করেই তিনি আমাদের মুগ্ধ করেছেন। তাঁর যে কোন বইর কথা স্মরণ করতে গেলেই, সেই বইর পাত্র পাত্রীদের কথাই সর্ব্বাগ্রে আমাদের মনে পড়ে, আর বইতে তাদের অস্তিত্ব শুধু নাম-মাত্র নয়, তারা মানুষরূপেই তাদের সুখ দুঃখ, পুলক ব্যথা ও হাসি অশ্রু নিয়েই আমাদের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ভেসে ওঠে; গল্পাংশ কোথায় তলিয়ে যায়। তাই শরৎচন্দ্রের লেখায় কেউ গল্প খুঁজতে যায় না, গল্প পেলনা বলে দুঃখও কেউ করে না। তাঁর পাত্র পাত্রীগুলি কে কি রকম মানুষ হয়ে উঠেছে তা দেখেই পাঠক মুগ্ধ। নব নব চিন্তা ও ভাবের অপূর্ব্বতায়, বুদ্ধি ও উপমার বিদ্যুৎ দীপ্তিতে রবীন্দ্রনাথ অতুলনীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু চরিত্র চিত্রনে মনে হয় বঙ্গ-সাহিত্যে শরৎচন্দ্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

শুনতে পাওয়া যায়, "শেষ প্রশ্ন" একটু তর্কবহুল বলে কোন কোন বিজ্ঞ সমালোচক, গ্রন্থকারের প্রতি কটাক্ষপাত করতে কসুর করেন নি। তাঁদের ধারনা "শেষ প্রশ্নে" শরৎচন্দ্রের ঔপন্যাসিক প্রতিভা

ম্লান হয়েছে! এঁরা ভুলে যান যে "শেষ প্রশ্ন" প্রেমের গল্প নয়, যদিও প্রেমের অভাব তাতে নেই; শেষ প্রশ্নে শরৎচন্দ্র এমন সব প্রশ্নের অবতারণা করেছেন, যার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বহু তর্ক ও বাদানুবাদ করা যায়। কাজেই শেষ প্রশ্ন তর্কবহুল না হয়েই পারে না। তবে দেখ্‌তে হবে এই তর্ক ও বাদানুবাদ উপন্যাসের স্বাভাবিক গতিকে ব্যাহত করে কোথাও তার রস ক্ষুণ্ণ করেছে কিনা। শুধু তর্ক ও সমস্যাবহুল বলে "গোরা" বা "ঘরে বাইরে" ত আমাদের অপ্রিয় নয়। শেষ প্রশ্ন যাঁরা মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন তাঁরা স্বীকার করবেন যে শিল্পী শরৎচন্দ্রের হাতে শেষ প্রশ্নের ঔপন্যাসিক অনিবার্য্যতা ও শিল্প-রস কোথাও ক্ষুন্ন হয়নি। এই বইর মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ত চরিত্র চিত্রন ছিলনা, তবুও শিল্পী শরৎচন্দ্রের হাতে পড়ে এই বাদানুবাদ ও বিচিত্র তর্ক বিতর্কের ভিতর দিয়েও প্রত্যেকটি চরিত্র স্বকীয় বৈশিষ্টতায় অপরূপ হয়েই ফুটে উঠেছে। আশু বাবুর সহিত অবিনাশের, অক্ষয়ের সহিত হরেন্দ্রের; অজিতের সহিত শিবনাথের বা কমলের সহিত নীলিমার ও নীলিমার সহিত মনোরমার কোন সাদৃশ্যই নেই। এরা প্রত্যেকেই পৃথক ও বিশিষ্ট। শরৎচন্দ্র তার পুর্ব্ব রচনায় বহু অপরূপ নারী চরিত্র এঁকেছেন, যাঁরা বঙ্গীয় পাঠক সমাজের হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত আসন পেয়েছে। কিন্তু শেষ প্রশ্নের কমলের তুলনা শরৎ-সাহিত্যে কেন সারা বঙ্গসাহিত্যেও আর একটী নেই। কমল তীক্ষ্ণ-ধী শরৎচন্দ্রের বুদ্ধি ও মনীষার সর্ব্বসংস্কার মুক্ত আধুনিকতম প্রতীক। কোন রকম সংস্কারের মোহ কমলের নেই। হিন্দু সমাজের বহু যত্নে লালিত ও পরম প্রিয় বহু যুগ যুগান্তরের সংস্কারকে সে নির্ম্মমভাবে আঘাত করেছে ও অবলীলাক্রমে উপেক্ষা করে গেছে, অথচ তার প্রত্যেক আচরণ ও কথা অতি সহজ, অসঙ্কোচ ও অকুণ্ঠ। বইর প্রত্যেক পাত্র পাত্রীর সঙ্গেই, তার আচরণ ও মতামতের জন্য তাকে জবাবদিহি হতে হয়েছে;—প্রত্যেকের সঙ্গে সে একা সপ্তরথী বেষ্টিত অভিমন্যুর মত তর্ক করেছে, বাদানুবাদ করেছে, অথচ কোন দিন সে অবনমিত হয়নি, আত্মলব্ধ সত্যের শানিত ছুরিকা দিয়ে সে প্রতিপক্ষের উচ্ছ্বাস ও বাক্য জালকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে—কিন্তু তার কথায় ও

ব্যবহারে কোন রকম রূঢ়তা ও শ্রীহীন আত্মম্ভরিতা কোন দিন প্রকাশ পায় নাই। জয়ের দিনে যেমন সে আনন্দোৎফুল্ল হয়নি, পরাজয়ের দিনেও তার মুখের হাসি মিলিয়ে যায়নি। অযাচিত আদর পেয়েও সে নিজেকে আপ্যায়িত মনে করেনি—অপমানিত হয়েও সে ব্যথিত হয়নি। জীবনের সুখ ও দুঃখকে সে এক নির্বিকার সহজ অন্তঃকরণ দিয়ে গ্রহণ করতে পেরেছে। এদিক দিয়ে তার আত্মশক্তি ও সংযমের কোন তুলনা হয় না। হয়ত খুব কম পাঠকই তাকে শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখ্‌বে, তবুও উপেক্ষা তাকে কেউ করতে পারবে না। এমন অপরূপ তুলিতে শরৎচন্দ্র তাকে এঁকেছেন যে, তার মতামত ও আচরনে সায় দিন বা না দিন, তাকে স্বীকার করতেই হবে, মনোযোগ তার দিকে আকৃষ্ট না হয়েই পারবে না। এই অপরূপ ব্যক্তিত্ব সৃষ্টিতেই শরৎচন্দ্রের শিল্প প্রতিভার অপূর্ব্ব সাফল্য। কমলের মতামত ও যুক্তিতে কতখানি সত্য আছে, তার বিচারের ভার কালের হাতে কিন্তু যে গভীর আন্তরিকতা ও বিশ্বাসের সঙ্গে সে তার মতামত ব্যক্ত করেছে তা বইর ভিতরের ও বাহিরের বহু লোকের আজন্ম বিশ্বাসকেও টলটলায়মান করে তুলেছে ও তুল্‌বে তাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। এই দিক দিয়ে এই বই শরৎ-সাহিত্যের land mark। কমল বিবাহিত দম্পতির সন্তান নয়, তবুও তার জীবনের নির্ম্মল সৌন্দর্য্য, অবিমিশ্র সহানুভূতি ও অকুণ্ঠ সত্যাগ্রহ দেখে রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, তাকে সম্বোধন করে বলতে ইচ্ছা হয়—

"......অব্রাহ্মণ নহ তুমি......
তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুল জাত"।

রবীন্দ্র পরবর্ত্তী যুগে বাংলার নতুন কাব্য সাহিত্যের নতুন ধারার প্রতি যে কয়জন তরুণ কবি ইঙ্গিং তুলিয়াছেন অর্থাৎ যাঁহারা পূর্ব্বতন কবিদের প্রতিধ্বনি করেন নাই, নিজেরা নিজেদের সুর ও স্বর-বৈচিত্রের সন্ধান করিয়াছেন তন্মধ্যে কবি জসীমউদ্দিন একজন। তাঁহার প্রথম কবিতা 'কবর' হইতে আজিকার 'নক্সী কাঁথার মাঠ, (নক্সী কাঁথার মাঠ খণ্ড কবিতা নয়, গাঁথা idyll) পর্য্যন্ত তাঁহার বৈশিষ্ট এবং পার্থক্য এত distinctive যে তাঁহার লেখার সঙ্গে আধুনিক কবিদের কাহারও লেখার তুলনা চলে না। তাঁহার লেখার জুড়ী তালাস করিতে হইলে পল্লী কবিদের খোঁজ করিতে হয়, পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা ও মৈমনসিংহ গীতিকার পাতা উল্টাইতে হয়।

কাব্যে বাংলার পল্লী কখনো উপেক্ষিতা নয়---জসীমউদ্দীনের আগে এবং পরে পল্লী সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কবিতা লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের লেখার সঙ্গে জসীমউদ্দীনের লেখার পার্থক্য আছে, তাঁহাদের লেখা পড়িলেই মনে হয়, পল্লীর জন্য তাঁহাদের বুকে যতই দরদ ও সহানুভূতি থাকুক না কেন, তাঁহাদের চোখে শহরের চশমা রয়েছে, সেই চশমার ভিতর দিয়াই তাঁহারা পল্লীকে দেখিয়াছেন----তাই তাঁহাদের হাতে পল্লী সমাজ তাহার সহজ অনাবিল নির্ম্মল্য ও Freshness লইয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই, পল্লী-সৌন্দর্য্যের কবি জসীমউদ্দীনের চোখে কোন চশমা নাই, তিনি খোলা চোখেই পল্লীকে দেখিয়াছেন, পল্লীর শত আবর্জ্জনা, ম্যালেরিয়া, ভাঙ্গা রাস্তা, কচুরী পানার মধ্যেও সৌন্দর্য্য দেখিয়াছেন--সেই আবর্জ্জনার বিষ মন্থন করিয়া তিনি যে সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাইয়াছেন তাহাই তাঁহার লেখনী মুখে অমৃত হইয়া

* নক্সী কাঁথার মাঠ---জসীমউদ্দীন।

ঝরিয়া পড়িয়াছে। পল্লীর পুরাণ পুকুর, বটের ছায়া, কচুরী পানা, হয়ত সুন্দর নয়; কিন্তু কলের ধোঁয়া, মোটরের ধূলা, বৈদ্যুতিক আলো তাহাকে মলিন করে নাই, এই কথাও সত্য। তাহার মধ্যে যে সবুজ freshness আছে তাহাই কবি জসীমউদ্দীনের কবিতার প্রাণ। এই freshness-টুকু আধুনিক কাব্য-পাঠকের প্রাণে খুবই আরাম দেয়, শিল্পী-পাঠকের অন্তরের রস-বোধকে তৃপ্তিদান করে। এতদিন খণ্ডাকারে যে রসসৃষ্টি হইতেছিল তাহাই এই সুন্দর গ্রাম্য গাঁথাখানিতে রূপে রসে জমাট বাঁধিয়া অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। দেখিয়া তৃপ্ত হইলাম---তিনি এখানে কোথাও সংযম হারান নাই, এই লেখাটিকে অনেকখানি compact করিয়া তুলিয়াছেন, ইহার রসের বাঁধন কোথাও শিথিল নয়।

দুইটী দরিদ্র হৃদয়ের অনাবিল প্রেমের এই উপাখ্যানখানি ক্ষুদ্র হইলেও ইহার ভিতর দিয়া কবি যে অপূর্ব্ব রসের উদ্বোধন করিয়াছেন তাহার তুলনা আধুনিক বাংলা সাহিত্যে নাই। এই বইয়ের ভাব, ভাষা, ছন্দ, পারিপার্শ্বিকতা, এমন কি নায়ক নারিকার রূপ বর্ণনার উপমায়ও কবি কোথাও গ্রামের সীমা ছাড়াইয়া যান নাই। কলেজে-পড়া কবির পক্ষে এইটী কম কৃতিত্বের কথা নয়। বইটী এই রকম ভাবে আরম্ভ হইয়াছে---

এই এক গাঁও, ওই এক গাঁও, মধ্যে শূন্যে মাঠ---
খানিকটা তার ধানে ভরা, খানিকটা ভরা পাট।

পাঠকের চোখের সামনে গ্রাম সজীব হইয়া ফুটিয়া উঠে, শহুরে পাঠক পাঠিকার মনও উধাও হইয়া যায় ধান-পাট-ঘেরা বাংলার শ্যামল পল্লী-প্রান্তরে—

মাঠের মাঝে জলীর বিলের জোলো রঙ্গের টীপ—
জ্বল্‌ছে যেন এ-গাঁর ও-গাঁর বিরহেরি দীপ!

এই বিরহের দীপ প্রেমের ফুল ফুটালো এ-গাঁর কৃষান যুবক "রূপাইর" এবং ওগাঁর চাষার মেয়ে "সাজুর" অন্তরে।

রূপাইর রূপ---

কাঁচা ধানের পাতার মত কচি-মুখের মায়া,
তা'র সাথে কে মাখিয়ে গেছে নবীন তৃণের ছায়া।

আর নায়িকা সাজুর রূপ—

পড়্‌শীরা কয়—মেয়ে ত নয়, হল্‌দে-পাখীর ছা',
ডানা হইলেই উড়ে যেত ছেড়ে তা'দের গাঁ।
লাল মোরগের পাখার মত ওড়ে তাহার শাড়ী,

... ...

'হল্‌দে পাখীর ছা'—এই একটী কথাতেই এই মেয়েটীর রূপ বর্ণনা যেন সার্থকতা লাভ করিয়াছে—তাহার রূপ সম্বন্ধে কাহারও মনে আর কোন প্রশ্ন জাগে না। লাল শাড়ী খানির উপমা আরও চমৎকার। সে-বার চৈত্র বৈশাখ ধরিয়া বৃষ্টি হইল না, দরগায় মসজিদে কত সিন্নী পড়িল, তবুও বৃষ্টির দেবতার মন ভিজিল না। তারপর এ-গাঁর পাঁচটী মেয়ে বদনা বিয়ের গান করিতে করিতে ভিকমাগিতে ওই গাঁয়ে গেল —গান করিয়া করিয়া তাহারা মেঘের কাছে জল মাগিতেছিল, ভিক্ষার চাল দিয়া বৃষ্টির দেবতার উদ্দেশ্যে তাহারা সিন্নী করিবে। কবি একটী লাইনেই পাঁচটি মেয়ের রূপ বর্ণনা শেষ করিয়াছেন।

আগে পিছে পাঁচটী মেয়ে—পাঁচটী রঙ্গের ফুল,

তারপর—

পাঁচটী মেয়ের মাঝের মেয়ে লাজে যে যায় মরি'
বদনা হ'তে ছলাৎ ছলাৎ জল যেতে চায় পড়ি!

এই মাঝের মেয়েটীই গ্রন্থের নায়িকা। রূপাইর তাহাকে দেখিয়াই মনে হইল—

পাঁচটী মেয়ের রূপ বুঝি ওই একটী মেয়ের গায়!

... ...

পাঁচটী মেয়ের রূপ হ'য়েছে ও'রির রূপে আলো।

রূপাইর মা মেয়েদিগকে 'সেরেক খানেক ধান' আনিয়া দিল। রূপাই বলিল—

"এই দিলে মা থাকবে না আর মান।"
ঘর হ'তে সে এনে দিল সেরেক পাঁচেক চাল,
সেরেক খানেক দিল মেপে সোনামুগের ডা'ল।

আশ্বিন মাসে রূপাই ঐ গ্রামে বাঁশ কাটিতে গেল, সেখানে আবার সাজুর সঙ্গে তার চোখাচোখি হইল। তারপর এবার সাজুর মা'র সঙ্গে আলাপ হইল; তিনি একেবারে বলিয়া ফেলিলেন—আমি যে তোর খালা (মাসী)। এই করিয়া তাহাদের সঙ্গে রূপাইর ঘনিষ্ঠতা হইয়া উঠিল, এই হইতে নানা ছল করিয়া সে তাহাদের বাড়ী যাওয়া আসা করিতে লাগিল। রূপাইর মা সব শুনিল। তিনি সাজুর মা'র কাছে ঘটক পাঠাইলেন। সাজুর মা রাজী হইল। শুভদিনে এই প্রেমিক প্রেমিকার বিবাহ হইয়া গল। ঘটকের বর্ণনা, বিবাহ মজ্‌লিসে সারা রাত্র জাগিয়া পুঁথি পড়া, বিবাহ মজলিসে সামান্য ব্যাপার লইয়া ঝগড়া-ঝাঁটি বড় চমৎকাররূপে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রাম্য সমাজের কুসংস্কার ও আচার পদ্ধতির প্রতিও কবি যে দরদ ও সহৃদয়তা দেখাইয়াছেন তাহা আরও আশ্চর্য্য। ঈর্ষা বা বিদ্বেষে সৌন্দর্য্য-দ্রষ্টা কবির চোখ কোথাও অন্ধ হয় নাই, তাহার লেখায় দরদ আছে, কোথাও শ্লেষ বা বিদ্রূপ নাই।

তারপর নবদম্পতির আনন্দের নতুন জীবন আরম্ভ হইল। কিন্তু সেই সুখ বেশীদিন ভোগ করা হইল না, একদিন সংবাদ আসিল—

বন-গেঁয়োরা ধান কেটে নেয় গাজনা-চরের খামার ভুঁয়ে।'

তারপর—

আলী—আলী হাঁকল রূপাই, হুঙ্কারে তার গগন ফাটে,
হুঙ্কারে তার গর্জ্জে 'বছির', আগুন যেন ধরল কাটে।—
'আলী-আলী-আলী-আলী' রূপার যেন কণ্ঠ ফাটি
ইস্রাফিলের শিঙা বাজে, কাঁপছে আকাশ, কাঁপছে মাটি।
তারি সুরে সব লাঠেলে লাঠির পরে হানল লাঠি,
'আলী-আলী' শব্দে তাদের আকাশ যেন ভাঙ্গবে ফাটি।
আগে আগে ছুটল—রূপা—বোঁ। বোঁ। বোঁ। সড়কি ঘোরে;
কাল সাপের ফনার মত বাবরী মাথার চুল যে ওড়ে।

এই দাঙ্গার বর্ণনায় কবির ভাষা এবং ছন্দ একেবারে নৃত্যোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। অনেক খুন জখম করিয়া যখন রাত্রে রূপাই বাড়ী ফিরিল তখন প্রিয়ার বিচ্ছেদ-আশঙ্কা তাহার রক্তে রক্তে কাঁদন তুলিয়াছে—

লোহু লয়ে আজ সিনান করেছি, রক্তে ভেসেছে নদী,—
বুকের মালা যে ভেসে যাবে তাতো-আগে জানিতাম যদি!

পুলিশের ভয়ে সে-রাত্রেই তাহাকে পলাইতে হইল, যাইবার সময় সাজুকে বলিয়া গেল—

সখি, দীন দুঃখীর যারে ছাড়া কেহ নাই,
সেই আল্লার হাতে আজি আমি তোমারে সঁপিয়া যাই;

অতঃপর বৎসর কাটিয়া গেল, কিন্তু রূপাই ফিরিল না; বিরহিনী সাজুর আশা নৈরাশ্যে পরিণত হইল। কত লোককে সে বলিল, কিন্তু কেহই রূপার কোন সংবাদ দিতে পারিল না। এই বিরহিনী কন্যার কাছে তাহার স্নেহার্ত্ত মায়ের চিত্রটী ও চমৎকারভাবে ফুটিয়াছে। ফুলের পাপড়ি ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া ফুলের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য দেখাইবার দুরাশা করিব না— সাহিত্য-রসিক মাত্রই বইখানি পড়িয়া দেখিবেন, ভরসা আছে।

এই নৈরাশ্যের হাহাকারের মধ্যেও বিরহিনী সাজু—

নক্সী-কাঁথাটী বিছাইয়া সাজু সারারাত আঁকে ছবি,
ও যেন তাহার গোপন ব্যথার বিরহিয়া এক কবি!
অনেক সুখের দুঃখের স্মৃতি ওরি বুকে আছে লেখা,
তার জীবনের ইতিহাস খানি জাগিছে রেখায় রেখা।
স্বামী বসে তার বাঁশী বাজিয়েছে, সিলাই করেছে সে যে,
গুন্ গুন্ করে গান কভু রাঙা ঠোঁটেতে উঠেছে বেজে।
সেই কাঁথা আজও মেলিয়াছে সাজু যদিও সেদিন নাই,
সোনার স্বপন আজিকে তাহার পুড়িয়া হয়েছে ছাই
খুব ধরে ধরে আঁখিল যে সাজু রূপার বিদায়-ছবি,
খানিক যাইয়া ফিরে ফিরে আসা, আঁকিল সে তার ছবি।
আঁকিল কাঁথায়—আলু থালু বেশে কৃষাণ-নারী

দেখিছে—তাহার স্বামী তারে যায় জনমের মত ছাড়ি।
'এমন করিয়া বহুদিন যায়'—

তারপর শেষে এমনি হইল, বেদনার ঘায়ে ঘায়ে
এমন সোনার তনুখানি তার ভাঙ্গিল পড়িয়া বায়ে।
কি যেন দারুণ রোগেতে ধরিল উঠিতে পারেনা আর,
শিয়রে বসিয়া দুখিনী জননী মুছিল নয়ন-ধার।

সেই সময়ও সাজু তার মাকে বলিতেছে—

ঘরের মেঝেয় মেলে ধর দেখি আমার নকসী-কাঁথা;
একটু আমারে ধর দেখি সুঁচ সূতা দাও হাতে,
শেষ ছবিখানা এঁকে দেখি যদি কোন সুখ হয় তা'তে,

তারপর বেদনার অশ্রু দিয়া ছবিখানি আঁকিল—

কাঁথার উপরে আঁকিল সাজু তাহার কবরখানি
তারি কাছে এক গেঁয়ো রাখালের ছবিখানি দিল টানি—
রাত আন্ধার, কবরের পাশে বসি' বিরহীর বেশে
আহা রে বাজায় বাঁশের বাঁশীটি, বুক যায় জলে ভেসে—

এই ছবি আঁকিয়াই সাজু তার জীবনের অন্তিম বাসনা মাকে বলিয়া গেল—

এই কাঁথাখানি বিছাইয়া দিও আমার কবর 'পরে,
ভোরের শিশির কাঁদিয়া কাঁদিয়া এরি বুকে যা'বে ঝ'রে;
সে যদিগো আর ফিরে আসে কভু, তার নয়নের জল
জানি জানি মোর কবরের মাটী ভিজাইবে অবিরল!
হয়ত আমার কবরের ঘুম ভেঙে যাবে মাগো তা'তে;
হয়ত তাহারে কাঁদাইতে আমি জাগিব অনেক রাতে।
এ ব্যথা সে মাগো কেমনে সহিবে, ব'ল তারে ভাল করে,
তার আঁখি জল ফেলে যেন এই নকসী-কাঁথার পরে।

মোর যত ব্যথা, মোর যত কাঁদা এরি বুকে লিখে যাই,
আমি গেলে মোর কবরের গায় এরে মেলে দিও তাই।
মোর ব্যথা-সাথে তার ব্যথাখানি দেখে যেন মিল ক'রে,
জনমের মত সব কাঁদা আমি লিখে গেনু কাঁথা ভ'রে।

এমনি করিয়া এই গেঁয়ো মেয়ের দুঃখের জীবন শেষ হইল। তারপর—

বহুদিন পরে গাঁয়ের লোকেতে গভীর রাতের কালে
শুনিল কে যেন বাজাইছে বাঁশী বেদনার তালে তালে।
প্রভাতে সকলে দেখিল আসিয়া সেই কবরের গায়
রোগ-পাণ্ডুর একটি বিদেশী মরিয়া রয়েছে, হায়!
শিয়রের কাছে পড়ে আছে তা'র ক'খানা রঙ্গীন শাড়ী,—
রাঙ্গা মেঘ বেয়ে দিবসের রবি যেন চলে গেছে বাড়ী!
সারা গায় তা'র জড়ায়ে র'য়েছে সেই যে নক্সী-কাঁথা,—

এখানেই সেই রস-মধুর করুণ গাঁথাখানি শেষ হইয়াছে।

জসীমউদ্দীন বাংলার সাহিত্যিক সমাজে সুপরিচিত। তাঁহার লেখা সম্বন্ধে এখন বেশী বলা নিস্প্রয়োজন। প্রাচীন পালাগানের পরে এই রকম idyll বাংলা সাহিত্যে আর রচিত হয় নাই। এই খণ্ড কবিতার প্লাবনের যুগে জসীমউদ্দীনের এই অভিনব পথে সৌন্দর্য্য ও রস পরিবেশনের চেষ্টা সত্যই প্রশংসনীয়। এই ক্ষুদ্র idyll খানির মধ্য দিয়া যে Sincere mind ও পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা ইদানিং খুব কম কবিতায় দেখা যায়। এক কথায়, এই অপূর্ব্ব প্রেমের idyll খানিকে কেন্দ্র করিয়া সৌন্দর্য্য ও রস সৃষ্টিতে কবির লেখনী সার্থক হইয়াছে।

কার্ত্তিক, ১৩৩৬

প্রাচীন আরব সমাজে কবির জন্মকে খুব শুভ ও গৌরবের মনে কয়া হত।—অনন্ত সম্ভাবনাময় মানব জীবন, অসীম রহস্যময় মানুষের চিত্তলোকগ—। ক্ষণে ক্ষণে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মানুষের জীবনাকাশে কত বিচিত্র নক্ষত্রোদয়ের বিস্ময়, কত নির্ব্বাপিত গ্রহের হাহাকার;—মানব চিত্তের অতল সরোবরে কত পুষ্পোৎগম, কত পুষ্পকলিকার অকাল মৃত্যু! মানব মনের অদৃশ্য লোকে এই যে নিত্য হাসি অশ্রুর ফল্গুপ্রবাহ বয়ে চলেছে, তারি প্রতিবিম্ব যার চিত্তলোকে প্রতিফলিত হয়ে মুখর হয়ে ওঠে, তিনিই ত কবি; সৌন্দর্য্যাভিসারী মানুষের অন্তর লোককে যিনি সুন্দরতম ভাষায় ছন্দোবদ্ধোময় রূপ দিয়ে প্রকাশ করতে পারেন, মানুষের মাঝে তিনিইত শিল্পী। অন্তহীন সময়-স্রোতে কত দেশের কত যুগের, কত মানুষের ভাব-প্রবাহ, কত সাধনা, কত তপস্যা ভেসে চলেছে, উত্তরাধিকার-সূত্রে-প্রাপ্ত সেই প্রবাহ মানুষের বুকে বুকে জাগিয়ে তুলেছে কত বিচিত্র স্রোত—। উর্দ্ধলোকের অন্তহীন আকাশ মানুষের বুকে বুকে জাগিয়ে তুলেছে আশা, গগনবিহারী গ্রহমণ্ডলী দিয়েছে তার বুকে সঙ্কল্প, সবুজের শাখায় শাখায় বিচিত্র সুন্দর পুষ্পের হাসি তার চোখে দিয়েছে সৌন্দর্য্যের অঞ্জন, কল-কল নাদিনী কল-স্রোতা নদনদী তার কণ্ঠে দিয়েছে সঙ্গীতের সঙ্গত। মানুষের এই আশা, আশঙ্কা, সঙ্কল্প ও সৌন্দর্য্যকে যিনি রূপ দেবার প্রয়াস পান তিনি সর্ব্বকালের সর্ব্বদেশের এবং সর্ব্বমানুষের কবি। মানুষের মাঝে যিনি এই দুর্লভ কবি-প্রতিভার অধিকারী, তাঁর জন্মদিন সত্যই ত মানুষের জন্য গৌরবের, আনন্দের ও উৎসবের।

এ-কালের মানুষ—বিশেষ ক'রে এ-কালের মুসলমান আমরা এক অভিনব যুগসন্ধিক্ষণে বাস করছি। অতীতের আশা ও হতাশা বর্ত্তমানের জয়-পরাজয়ের সংগ্রাম, ভবিষ্যতের সুন্দরতর ও নবীনতর

জীবনের কল্পনা, আমাদের মনে মনে আজ এক বিচিত্র দ্বন্দ্ব ও দৃঢ়তর সঙ্কল্পকে জাগিয়ে তুলেছে।—আমাদের মাঝে যিনি-ই বাঁচা-মরার আদিম সমস্যাকে ছেড়ে একটুখানি চিন্তা-ভাবনার খবরদারী করতে পেরেছেন, দৈনন্দিন প্রয়োজনকে ডিঙিয়ে যিনি উদার আকাশের দিকে তাকিয়ে দুই ফুস্ ফুস্ ভরে নিশ্বাস নিতে চেয়েছেন, নীল নভোমণ্ডলের দিকে চোখ তুলে যিনি চাঁদের হাসি দুই চোখ ভরে পান করেছেন—বিচিত্র সুন্দর ফুলের হাসি দেখে মুগ্ধ হবার সুযোগ গ্রহণ করেছেন যিনি, জীবনে ও প্রকৃতিতে যে অন্তহীন উৎসব, যে অন্তহীন ব্যথার সমারোহ চলেছে যার মনে তার কিছুমাত্র প্রতিবিম্ব পড়েছে তিনি-ই আজ এই দ্বন্দ্বের সম্মুখীন, প্রয়াস-সাফল্যের জয়-পরাজয়ে ক্ষতবিক্ষত, জীবনে ও ধ্যানে আজ নবীন মানুষ এই সংগ্রামে বিপর্যস্ত;—জীবনের এই দুর্যোগ-দিনে, এই সংগ্রাম-মুহূর্তে যে-কবি অকুণ্ঠ কণ্ঠে এক আত্ম-প্রত্যয়ের বাণী ও দৃঢ়সঙ্কল্পকে বহন করে এনেছেন সে কবিকে আমাদের স্বাগতম।—

এ মত্ত যৌবন মোর মৃত্যুদ্বার করি' উত্তরণ
বিচিত্র বিশ্বেরে আসি' বার বার দিবে আলিঙ্গন
বন্ধহারা দুরন্ত উল্লাসে।
(দিলরুবা—পৃঃ ৩)

অজস্র মৃত্যুরে লঙ্ঘি' হে নবীন, চলো অনায়াসে
মৃত্যুজয়ী জীবন-উল্লাসে।
আসুক বেদনা ভীতি, আসুক ব্যর্থতা পরাজয়—
সর্ব্ব-বন্ধ বিস্মরিয়া ধ্বনি তোলো অসীমের জয়!
কণ্ঠে ধরি' বিধাতার জ্বালা-মাখা রক্ত মালা গাছি,
বলোঃ "মাভৈঃ, আমি আসিয়াছি।"

মহাপুরুষ মোহাম্মদকে সম্বোধন ক'রে এই শক্তিমান কবি, জোরালো ভাষায়, যে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্কল্পকে, সংগ্রাম সঙ্কল্পী উদারমুখীন তরুণ মুসলমানের সামনে যে-আশা ও যে-প্রতিজ্ঞাকে প্রকাশ করেছেন, তার চেয়ে মহাপুরুষের প্রতি শ্রেষ্ঠ ভক্তি নিবেদন আধুনিক কাব্যে দেখেছি মনে পড়ে না।

সাম্য ও মৈত্রীর তব বীর্য্যবন্ত সাধনার বলে
সর্ব্ব মানবের দ্বারে পৌঁছি দেবো সেবা কৌতুহলে।
—অখণ্ড বিশ্বের তীরে দাঁড়াইবে তব শিষ্য সব
অখণ্ড মানব॥
(দিল্‌রুবা—পৃঃ ২৫)

সর্ব্ব-সংস্কার-মুক্ত চিত্তে অখণ্ড মানুষের জন্য এই যে উদাত্ত-কণ্ঠে মঙ্গল-প্রার্থনা এই ত সত্যকার ইস্‌লাম। ইস্‌লামের এক বীর্য্যময় রূপ, অপূর্ব্ব শক্তিমান ভাষা ও ছন্দে বিদ্যুৎশিখার মত আমাদের সাম্‌নে ভেসে উঠে না কি?—

বর্শাফলকে সে নহে, কৃপাণের নহে সে-কাহিনী,
—শ্রেয়ঃমুখী সে-শক্তি দায়িনী।
অম্লান সত্যের পথে করিয়াছ রক্তাক্ত সংগ্রাম,
বজ্ররোধী তব ইস্‌লাম॥
(দিল্‌রুবা—পৃঃ ১৪)

আত্মলব্ধ সত্যের অগ্নিশিখার মত, তরুণ মুস্‌লিমের জন্য এক সুবিপুল আশ্বাস, আত্মপ্রত্যেয়ের কুণ্ঠাহীন কণ্ঠে কবি গেয়েছেনঃ—

.....দুর্দ্দম চঞ্চল।
যুগ যুগ পড়ি' র'বে আঁকড়িয়া সুপ্তির অঞ্চল
পশ্চাতের মোহে?
—নহে, কভু নহে।
বিশ্বের মুক্তির লাগি' জাগে ওই তাহাদের
মহা-অভিযান।
তুর্য্যকণ্ঠে বাজে যাত্রা-গানঃ
জয় নব নবীন উত্থান।
(দিল্‌রুবা—পৃঃ ৩৫)

আনন্দের বিষয় আমাদের কবি গেয়েছেন 'বিশ্বের মুক্তির লাগি' আমরা যেন 'অখণ্ড মানব'রূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে পারি।

আত্মপ্রতিষ্ঠার বীর্য্যশ্রীমণ্ডিত এই বীর-বাণী প্রত্যেক তরুণ মুস্‌লিমের বুকে আশা ও সাহসের সঞ্চার করবে। ধর্ম্ম ও দেশের সীমা-রেখা ডিঙিয়ে সমস্ত মানুষের জন্য কবির এই যে শুভ কামনা, মঙ্গল-আশা তরুণ মুস্‌লিমের নিঃসাম্প্রদায়িক উদার ভাব-সাধনার-ই প্রকাশ। নিজের চারদিকে সীমা-রেখা টেনে, অপরের সংস্পর্শ হতে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে, অন্যের শুভ ও অশুভের সঙ্গে নিজেকে যোগ না করে থাক্‌তে পারার দিন গত হয়েছে।—আজ মানুষের সমস্ত সাধনার মালিক আমি, আমার সমস্ত সাধনার দাবীদার সমস্ত মানুষ—প্রকৃতির সমস্ত রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধ, আকাশের বিচিত্র স্বপ্ন-স্বর্গ সবই মানুষের জন্য ঃ

এ-ধরার তৃণ-শষ্প পত্র-পুষ্পে যে আনন্দ গান
উচ্ছ্বসিয়া কাঁপিতেছে নিশিদিন ধরি'—
যে-ক্ষেত্রে যে-আনন্দের আছে লেশ, তারি পূর্ণ দান
নির্ম্মুক্ত পরাণে, নেবো, আপনার করি'।
অতৃপ্ত পিয়াসী আমি, নিঙাড়িয়া বসুধার সুধা
লক্ষ মুখে মিটাইব, অন্তরের অন্তহীন ক্ষুধা।

(দিল্‌রুবা পৃঃ ৩৭)

ভাবের অপরিচ্ছন্নতা, বাক্যের কুয়াসা এই কাব্যকে কোথাও ম্লান করে নি। অপূর্ব্ব সাবলীল ভাষায়,—ভাবের যে তেজোময় প্রকাশ এই কাব্যে দেখেছি, আমার বিশ্বাস তা পাঠককে মুগ্ধ করবে ঃ

যুগে যুগান্তরে বসি' যে যেখানে করেছে সাধনা,
যে কেহ জীবন দিল মানুষের লাগি'—
জীবনে করিব মূর্ত্ত তাহাদের সত্য-আরাধনা,
যত সব তপস্যার আমি হব ভাগী।
মানব-জন্মের আমি পেয়েছি সহজ অধিকার---
দিকে দিকে বিকশিয়া সার্থবিধ সে-জন্ম আমার।..
যেখানে যে-মিথ্যা আসি' দর্পভরে রুধিয়াছে পথ
আমি তা'রে হাসি দিয়া করিব নির্ম্মূল।
অস্থি-অস্ত্রে পথ কাটি' আনিব ন্যায়ের ভবিষ্যত,---

নবযুগ সৃষ্টি-গানে হবে সমাকুল।
পৃথিবী উঠিবে জাগি, স্বপ্ন ত্যজি' সৃজন-উৎসাহে,
পুরাতন প্রাণ পাবে মোর রাঙা জীবন-প্রবাহে!

(দিল্‌রুবা—পৃঃ ৩৮)

নিষ্কোষিত অসির মত সত্যের কী শক্তিময় প্রকাশ, ভাষা ও ছন্দের কী লীলাময় নৃত্য, সত্যাশ্রয়ী মানবাত্মা ন্যায় ও সত্যান্বেষণে ফরিয়াদ করে ফির্‌ছেঃ জীবন থেকে মহাজীবনে, ক্ষুদ্রতা থেকে বিরাটে, বিপুল থেকে বিপুলতর জীবনের আস্বাদের জন্য মানব মনের অন্তহীন ফরিয়াদঃ

মহা-জীবনের আস্বাদ লাগি' আত্মায় একি উন্মাদনা।
মরণের ভালে জীবনের ব্যথা এঁকে' দিক্ নব-আলিম্পনা।

(দিলরুবা—পৃঃ ২৯)

চমৎকার ভাবকে চমৎকাররূপে রূপ দেওয়া হয়েছে। ধারণা যেখানে সুস্পষ্ট, প্রকাশ সেখানে স্পষ্ট হবেইঃ—এই কাব্যব্যাপী ভাষার যে ঘনঘটা, ছন্দ ও ভাবের যে-লীলাময় নৃত্য উচ্ছ্বসিত হয়ে বয়ে চলেছে, তাতে কবির ভাব কোথাও কুয়াসাচ্ছন্ন হয়নি, পাঠকের পক্ষে এটা সান্ত্বনার কথা। কবিতার অর্থ হয় না যাঁরা বিশ্বাস করেন এই লেখক তাঁদের একজন নয়; এবং আজ পর্য্যন্ত কোন ভাল কবির ভাল কবিতাকে অর্থহীন আমি পাই নি। কাজেই ভাবের এই স্বচ্ছন্দ গতি ও সুস্পষ্ট প্রকাশ আমাকে আনন্দ দিয়েছে। এই যুগের বাংলা সাহিত্যের কাব্যাংশকে কিছুতেই দীন বলা যায় না; এই সমৃদ্ধিশীল কাব্য জগতে এই নবীন কবির প্রথম কাব্যখানি কতটুকু আদর পাবে বলা শক্ত। তবুও মনে হয় এর ছত্রে ছত্রে যে কাব্য-রস ও সৌন্দর্য্য, সত্য ও ন্যায়ের যে জ্যোতির্ম্ময় শিখা, কল্যাণ-জিজ্ঞাসার যে বীর্য্যময় রূপ, আত্মপ্রত্যয় ও আত্মপ্রতিষ্ঠার যে অগ্নিবাণী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, মনে হয় তা কাব্যরসিক পাঠককে তৃপ্তি দেবে।

কাব্য-বিচারের কোন সরকারী মাপকাঠি আছে কিনা জানিনা—তবে মনে হয় সব মাপকাঠির সেরা মাপকাঠি পাঠকের মনলোক।

কবি আবদুল কাদিরের নব প্রকাশিত 'দিল্‌রুবা' কাব্যখানি আমার ভাল লেগেছে বলেই এই প্রসঙ্গে এত কথা বল্‌তে হল। কোটেশনের অপরিসর ভিক্ষাপাত্রে কুড়ানো ছত্র কয়েকের মধ্যে কাব্যের সমস্ত রূপকে ফুটিয়ে তোলা বা উপলব্ধি করান কিছুতেই সম্ভব নয়। কাজেই সেই অসম্ভবকে সম্ভব করার দুরাশায় এই কাব্যালোচনা নয়—এই কাব্য পড়ে আমি যে আনন্দ পেয়েছি তারি কিঞ্চিৎ এই আলোচনা মারফৎ প্রকাশ করা গেল মাত্র।

শ্রাবণ, ১৩৪২

‘সাঁজের মায়া’

প্রতিভাময়ী মহিলা কবি সুফিয়া এন্ হোসেনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ “সাঁজের মায়া” আমাদের পড়বার সৌভাগ্য হয়েছে। বাংলা কাব্য সাহিত্যের পরিধি ব্যাপক ও সুবিস্তৃত,—শক্তিমান ও বিশিষ্ট কাব্য ভঙ্গিমার সাধকের অভাব আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যে নেই। তাই উচচ-শিক্ষায়বঞ্চিতা চির-অন্তঃপুরবাসিনী এক বিধবা মুস্‌লিম মহিলার এই কাব্য সাধনা হয়ত অনেকের কাছে একটা অমার্জ্জনীয় দুঃসাহসিক দুরাশা বলেই মনে হ’বে। কিন্তু মনে হয় ‘সাঁজের মায়া’র পাঠক এই শক্তিময়ী মহিলা কবির কাব্যপ্রতিভা দেখে সত্যি বিস্মিত হবেন। এই কাব্য গ্রন্থখানির প্রতি ছত্রে একটি বিরহবিধুরা নিষ্কলুষ অথচ সক্রিয় নারী-চিত্তের সাক্ষাৎ মেলে—যে নারী-চিত্ত প্রতি প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিরহ—মিলনের অনির্ব্বচনীয় পুলকব্যথায় সাড়া দিয়ে উঠেছে। প্রাকৃতিক আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দেওয়া হয়ত প্রত্যেক সক্রিয় মনেরই স্ব-ধর্ম্ম—, কিন্তু তাকে ছন্দের বন্ধনে কাব্যময় রূপ দেওয়া, ভাষাতীতকে ভাষা দেওয়া যে এক দুর্লভ শক্তির কাজ, যে দুর্লভ শক্তির নাম দেওয়া যায়—কবি-প্রতিভা, সেই কবি-প্রতিভা যে সুফিয়া এন্ হোসেনের আছে, তা ‘সাঁজের মায়া’র প্রতিটি কবিতাই তার প্রমাণ। সৌন্দর্য্যাভিসারী কবি সুফিয়া, তাঁর জীবনের সুন্দর ভাব-মুহূর্ত্তকে সুন্দরতর ছন্দ ও ভাষায় প্রকাশ করেছেন। উদ্ধৃতির সম্বন্ধ-বিহীন ছত্র কয়েকের মধ্যে কোন কাব্যেরই সৌন্দর্য্য ধরে দেখানো সম্ভব নয়। তবুও কয়েকটি ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত হল।

মুক্তি লভে বন্দী আত্মা—সুন্দরের স্বপ্নে, আয়োজনে,
নিঃশ্বাস নিঃশেষ হোক পুষ্প বিকাশের প্রয়োজনে।

(সাঁজের মায়া)

কবির পক্ষে এর চেয়ে সুন্দরতর জীবনাদর্শ আর কি হতে পারে?

"পরিতৃপ্ত চকোরের রুদ্ধ কণ্ঠ। আঁখি পাত্র ভরি
লভিছে অমৃত স্বাদ, চন্দ্রের অমিয় পান করি।
শ্যাম-তৃণাঞ্চলখানি এলাইয়া প্রান্তরের বুকে
বসুধা জাগিছে রাত্রি, সীমাহীন সৌভাগ্যের সুখে।
চৈত্র পূর্ণিমার রাত্রি। দূরে সপুষ্পিতা নিম্বশাখা,
নীল নভে বিচ্ছুরিছে মধু হাসি পূর্ণচন্দ্র বাঁকা,
আরক্ত কিংশুক কাঁপে, মালতীর বক্ষ উঠে ভরি,
চন্দ্রের অমৃত স্পর্শে---উঠিতেছে শিহরি শিহরি।
(চৈত্র পূর্ণিমার রাত্রি)

পুরোনো দিনের স্মৃতি নামক কবিতায় বাল্য ও কৈশোরের মধুময় জীবনের আভাস অপূর্ব্ব সুন্দর ভাষায় রূপ পেয়েছে। বাল্য জীবনের একটি চিত্র :--

বহুদিন পরে মনে পড়ে আজি পল্লী মায়ের কোল,
যথা ঝাউ-শাখে বনলতা বাঁধি হরষে খেয়েছি দোল!
কুলের কাঁটার আঘাত সহিয়া কাঁচা পাকা কুল খেয়ে
অমৃতের স্বাদ লভিয়াছি যেন গাঁয়ের দুলালী মেয়ে।
পৌষ পার্ব্বনে পিঠা খেতে বসে, খুশীতে বিষম খেয়ে,
আরো উল্লাস বাড়িয়াছে যেন মায়ের বকুনি পেয়ে
মাঘের শীতেও নিশাচরী সম খেজুর রসের আশে
বুড়া শেয়ালীর সন্তোষ লাগি ফিরিয়াছি পাশে পাশে।
চৈত্র নিশির চাঁদিমায় বসি শুনিয়াছি রূপ কথা,
স্বপনে হেরেছি সুয়ো দুয়ো রাণী দুঃখিনী মায়ের ব্যথা।
তবু বলিয়াছি মার গলা ধরেঃ মাগো সেই কথা বল,
রাজার দুলালে পাষান করিতে ডাইনী করে কি ছল।
সাতশ' সাপের পাহারা কাটায়ে---পাতালবাসিনী মেয়ে,
রাজার ছেলেরে বাঁচায়ে—কি করে পৌঁছিল দেশে যেয়ে!

কৈশোরের একটি চিত্র :

শৈশব খেলা সাঙ্গ হয়েছে এসেছে কিশোর বেলা,
আমাদের খেলা ঘুচায়ে খেলেছে মায়েরা নতুন খেলা।
নদীর কিনারে বিছানা বিছায়ে---সফেদ বালুর চর,
কিশোর কিশোরী সেইখানে মোরা প্রথম বাঁধিনু ঘর।
বৈচি ফলের মেখলা কটিতে, বন ফুলে চূড়া বাঁধা!
বেসুরো বাঁশের বাঁশরী বাজায়ে কৃষ্ণ সে, আমি রাধা!
শিঁরির ব্যথায় কাঁদে ফরহাদ পাষাণ---পাহাড় কাটি,
আমি লুকায়েছি প্রাচীর আড়ালে---সে কত কেটেছে মাটি।
মজনুর মতো নিরালা বসিয়া করিয়াছে মোর ধ্যান,
সহসা হাসিতে ফাটিয়া পড়েছে উল্লাসে সারা প্রাণ।

ইকবাল

ইকবাল একাধারে কবি, দার্শনিক ও স্বদেশ প্রেমিক ছিলেন। প্রকৃত কবি শক্তির সঙ্গে সুগভীর পাণ্ডিত্যের যোগ সংঘটিত হ'লে তা যে কি রকম অনুপম সাহিত্য স্থষ্টির সহায়ক হয় তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ইকবাল। গোলাপ, বুলবুল ও সিরাজী সর্ব্বস্ব উর্দ্দু সাহিত্যে কিছুটা নূতনত্ব আনবার প্রয়াস পেয়েছিলেন গালেব ও হালী। কিন্তু তাকে অভিনব ও বিচিত্র করে তুলেছেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যজ্ঞানসাগরে আকণ্ঠস্নাত ইকবাল। তাঁর বহু বিশিষ্ট কবিতা পার্শী ভাষায় রচিত বটে, তবুও তাঁর জন্মভূমি পাঞ্জাবের বাহিরে উর্দ্দু সাহিত্যের প্রতিনিধি হিসাবেই তাঁর বড় পরিচয়। 'আস্‌রারে খুদি' বা Secrets of the self তাঁর একটী সুপরিচিত বই, এইটিতে অনুপম কাব্যশক্তির সঙ্গে সুগভীর দার্শনিকতার অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটেছে। বলা হয়ে থাকে, জার্ম্মাণ দার্শনিক নিট্‌সের প্রভাব ইকবালের উপর পড়েছে—। তবে এই কথা সত্য যে নিট্‌সের মত ইকবালও শক্তিবাদী ছিলেন। দুর্ব্বলতা যে শুধু অকর্ম্মণ্যতার সহায়ক তা নয়, তা অপূর্ণতাও বটে। তিনি Secrets of the selfএ লিখেছেন :---

In solidity consists the glory of life.

Weakness is worthlessness and immaturity.

ইস্‌লামের অতীত গৌরবের তিনি ভক্ত ছিলেন---তার সৌন্দর্য্য বেশী করে তার শক্তি, তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। অতীতে যে সব মুসলমান ইস্‌লামের গৌরব ও ঐশ্বর্য্যের বাহন ছিলেন তাঁরা কেউ দুর্ব্বল ছিলেন না। ইকবালের শক্তিবাদের মূলে হয়ত ইস্‌লামের গৌরবময় অতীত সক্রিয় ছিল। আধুনিক মুসলমানের সর্ব্বাঙ্গীন পতন ও শ্রীহীন জীবন তাঁকে করেছিল ব্যথিত---এই ব্যথার চিত্র এঁকেছেন তিনি "শেকোয়া"ও "জওয়াবে শেকোয়ায়"। ইকবালের শেষ বই সম্ভবতঃ Six lectures on the

Reconstruction of religious thought in Islam এটি তাঁর পরিণত বয়সের সুচিন্তিত রচনা--এ'তে জ্ঞান ও বুদ্ধির চোখে তিনি ইস্‌লামের আধুনিক রূপ-পরিবর্ত্তন নিরীক্ষণ করেছেন। এই রচনাটির প্রতি শিক্ষিত ও চিন্তাশীল মুসলমানদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিৎ। মনে হয় স্বদেশ-প্রেমিক ও অক্লান্ত কর্ম্মী মৌলানা মোহাম্মদ আলীর মত ইকবালেরও জীবনে স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম একটা যেন দ্বন্দ্ব ও সংশয়ের সৃষ্টি করেছিল। এঁরা দু'জনেই ইস্‌লামের অতীত আদর্শ ও গৌরবের ভক্ত ছিলেন—অথচ স্বদেশপ্রীতি এঁদের কারো চেয়ে কম ছিল না। এই দ্বন্দ্বের সম্মুখে উভয়েই কতকটা দিশেহারা হয়েছিলেন---তাই তাঁরা কেউই জাতিকে সুনির্দ্দিষ্ট পথ নির্দ্দেশ করতে পারেন্ নি। কিন্তু ইকবালের সাধনার সার্থকতা রাজনীতিতে খুঁজলে তাঁর প্রতি অন্যায় করা হবে--কারণ মুখ্যতঃ তিনি ছিলেন কবি ও রূপস্রষ্টা। পতিত ইসলাম ও পতিত ভারতের দুঃখ তাঁকে বার বার রাজনীতির পিচ্ছিল পথে টেনে নিয়ে গেছে বটে কিন্তু আসলে তাঁর সত্যিকার পরিচয়--তিনি কবি, যে কবি চিন্তায়, কাব্যে দর্শনে একটা অভিনব ভাবকে রূপদান করেছেন--। তাঁর "শক্তিবাদ" তাঁর স্বধর্ম্মী ও স্বদেশবাসীকে শক্তিমান হ'তে উদ্বুদ্ধ করবে—তাঁর স্বদেশ সঙ্গীত স্বদেশের প্রতি তাঁর স্বদেশবাসীর মমত্ববোধ বৃদ্ধি করবে। তাঁর ইস্‌লাম-প্রীতি সত্যিকার ইস্‌লামের প্রতি সত্যান্বেষীদের সশ্রদ্ধ করে তুলবে। তাই মনে হয় তাঁর তিরোধানে তাঁর স্বদেশ শুধু দরিদ্রতর হ'লনা ইস্‌লাম জগৎও তার এক শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিকে হারাল।

বাংলার দরদী সাহিত্যিক, শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র, দুশ্চিচিৎস্য কেন্সার রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। শরৎচন্দ্র ছিলেন হৃদয়ধর্ম্মী সাহিত্যিক তাঁর সাহিত্যে তিনি যে সব নর-নারীর পারিবারিক ও সামাজিক জীবন সমস্যার অবতারণা করেছেন, একটা অদম্য হৃদয়ানুভূতি ও সুবিপুল উদারতার সাহায্যেই তিনি তাদের চরিত্র ও ছবি এঁকেছেন। মস্তিষ্কের আবেদন সীমাবদ্ধ, বুদ্ধির বিদ্যুতালোক মানুষকে ক্ষণিকের জন্যে চমৎকৃত করে মাত্র। যেমন আধুনিক সাহিত্যের Intelle-ctualism আমাদের কর্‌ছে, কিন্তু অকৃত্রিম প্রবল হৃদয়ানুভূতির আকর্ষণ সার্ব্বজনীন—শরৎচন্দ্রের হৃদয়ানুভূতিমূলক সাহিত্যের সার্ব্বজননীনতাই ছিল তাঁর অবিসম্বাদিত জনপ্রিয়তার মূলে। শরৎচন্দ্র নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান —যে নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবার হচ্ছে আধুনিক শিক্ষিত নব্য বঙ্গ সমাজের বুনিয়াদ। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ ও সমসাময়িক বঙ্গ-সাহিত্যের অন্যান্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর দৃষ্টি ছিল উর্দ্ধমুখী—রাজা বাদশাহ জমিদার ও অভিজাত সম্প্রদায়ের কৃত্রিম জীবন যাত্রার মধ্যেই ঐ সাহিত্য সীমাবদ্ধ ছিল। ফলে ঐ সাহিত্যে বৃহত্তর বঙ্গের কোন স্থান ছিল না। শরৎচন্দ্রের বিচিত্র জীবন, নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানসিকতা সাধারণ বাঙ্গালী সমাজের সঙ্গে তাঁর পরিচয়কে ঘনিষ্ঠ করে তুলেছিল, ফলে ঐ সমাজের সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ্য, সৌন্দর্য্য ও কদর্য্যতার সঙ্গে পরিচিত হবার বিশেষ সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। এই পরিচয় ও অকৃত্রিম দরদী চিত্ত তাঁকে করেছিল, সেই উপেক্ষিত ও তথাকথিত অনভিজাত সমাজ-জীবনের উদগাতা, তাদের সুখ-দুঃখময় জীবনের সার্থক শিল্পী। ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সঙ্গে অকৃত্রিম দরদের সংমিশ্রণে যে ছবি আঁকা হয় তাহা জীবন্ত ও প্রাণবান না হয়ে পারে না—তাই শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে যে সব নর-নারীর ছবি এঁকেছেন

তারা সবাই রক্ত মাংসের মানুষ হয়ে উঠেছে---। তাদের জীবনের ক্ষুদ্রতা ও দুর্ব্বলতা আমাদের মনে অনুকম্পা ও সহানুভূতির সঞ্চার করে ---তাদের জীবনের সৌন্দর্য্য, সত্যানুরাগ ও অকৃত্রিমতা আমাদিগকে শ্রদ্ধান্বিত করে তোলে। এই অকৃত্রিম দরদ ও প্রবল মনুষ্যত্ববোধ শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-স্মৃষ্টিকে সার্থক করেছে। এই সার্থক সাহিত্য-স্রষ্টা ও অকৃত্রিম মানব-প্রেমিকের তিরোধানে ---সমগ্র বাঙালী জাতির সঙ্গে, আমরাও দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হয়েছি।

সম্প্রতি বাংলায় ও বাংলার বাহিরে কোন কোন জায়গায় বঙ্কিম শত-বার্ষিকী উৎসব সমারোহের সঙ্গেই উদ্‌যাপিত হয়েছে। কিন্তু দেশের পক্ষে বেদনার কারণ—এই সব উৎসবে দেশের এক বৃহৎ সম্প্রদায় মনপ্রাণে যোগ দিতে পারেনি, এখানে ওখানে নানা অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত সেই সম্প্রদায়ের দু'এক জন প্রতিনিধি যে যোগ দেয়নি তা নয়। কিন্তু বৃহত্তর মুসলমান সমাজ এইসব অনুষ্ঠান থেকে দূরে সরে রয়েছে, তারা শ্রদ্ধা ও প্রসন্ন দৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তাকাতে পারছেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট একাধিক মুসলমান চরিত্র ও মুসলমান সম্বন্ধে তাঁর কোন কোন মন্তব্য এই সমাজের পক্ষে পীড়াদায়ক ও আপত্তিকর। চিন্তাশীল সাহিত্যিক কাজী আবদুল ওদুদ 'বাংলা সাহিত্যে জাতীয়তার আদর্শ' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন, "সঙ্কীর্ণ ও উগ্রজাতীয়ত্বই বঙ্কিমচন্দ্রের মন্ত্র। সে মন্ত্রের মোহ কাটিয়ে উঠ্‌বার মতো মানসিকতা আজো দেশের কোনো সম্প্রদায়েরই হয় নাই", দেশের বৃহত্তর মঙ্গলের খাতিরে এই মোহ কাটিয়ে উঠবার সাধনা দেশকে করতেই হবে।

বঙ্কিমচন্দ্র অনুপম সাহিত্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, তাঁর 'সঙ্কীর্ণ ও উগ্রজাতীয়ত্বকে' উপেক্ষা করে, শিক্ষিত মুসলমানদের, আজ তাঁর এই সাহিত্য প্রতিভার দিকে ফিরে তাকানো উচিৎ। আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যে নবজাগরণ যাঁরা এনেছেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের শীর্ষ স্থানীয়— এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমাদের কথা-সাহিত্যের ধারা তিনি আমূল পরিবর্ত্তন করে দিয়েছেন—ভাষার রূপ ও রীতি বদলে দিয়েছেন। সাহিত্য-মাসিকী পরিচালনের আদর্শ দেখিয়েছেন, সাহিত্যে অপূর্ব্ব হাস্যরসের অবতারণা করেছেন —দেশের নানা সমস্যা সম্বন্ধে উদার ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। আলালের ঘরের দুলাল ও

হুতুম প্যাঁচার নক্সার পর বিষবৃক্ষ, কপালকুণ্ডলা, কৃষ্ণকান্তের উইল, কমলাকান্তের দপ্তর—রামমোহন ও বিদ্যাসাগরী ভাষার পর 'বঙ্গদর্শনের' ভাষা এক বিস্ময়ের বিষয় নয় কি? বঙ্গ সাহিত্যে এই যুগান্তর আনয়নের সমস্ত গৌরবের অধিকারী বঙ্কিমচন্দ্র একা। স্বদেশের সাহিত্য-ক্ষেত্রে নির্ভিক, জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান বঙ্কিমচন্দ্রের বিচিত্র দান ও তাঁর বহুমুখী প্রতিভার মূল্য ও মর্য্যাদা শিক্ষিত মুসলমানদের মনে স্বীকৃতি পাওয়া উচিৎ। তা'হলে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তাঁদের যে অশ্রদ্ধা ও অপ্রসন্নতা তা অনেকখানি কমে আসবে বলেই আমাদের ভরসা। কাজী আবদুল ওদুদ অন্যত্র বলেছেন—"ভারতের হিন্দু মুসলমানের কয়েক শতাব্দীব্যাপী রেষারেষী দ্বেষাদ্বেষী ও কালে হয়ত অর্থশূন্য কিন্তু অদ্ভুত ঘটনা বলে মানুষের মনে হবে। তখন জ্ঞানী ও শক্তিমান বঙ্কিমচন্দ্রকে মানুষ ভালবাসতে পারবে সন্দেহ নাই কিন্তু তাঁর অসহিষ্ণুতা হবে তাদের জন্য পরম কৌতুকাবহ।"

মরহুম আবুল হুসেন স্মরণে

অধ্যাপক, এট্‌ভোকেট্ ও সাহিত্যিক আবুল হুসেন এম. এ. এম. এল. সাহেব মাত্র বিয়াল্লিশ বছর বয়সে দুরারোগ্য কেন্সার রোগে পরলোকগত হয়েছেন। আবুল হুসেন হয়ত অলৌকিক ও অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না। কিন্তু নবীন বাঙ্গালী মুসলমান সমাজে, যে সমাজ এখনো গড়ে ওঠেনি, গড়ে উঠবার একটা ক্ষীণ আকুলি বিকুলি ও প্রয়াস লক্ষিত হচ্ছে মাত্র, সেই সমাজে তিনি যে অনন্যসাধারণ ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষিত মুসলমান যুবকের জীবন একটা গতানুগতিক গড্ডলিকা প্রবাহ ছাড়া আর কি। জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের, দেশ ও সমাজকে কেন্দ্র করে বৃহত্তর জীবনের সাধ-স্বপ্ন ও সাধনা মুসলমানের জীবনে এখনো শিকড় গাড়েনি। যুবক আবুল হুসেনের জীবন ছিল এই গড্ডলিকা প্রবাহে একটি বিশিষ্ট ব্যতিক্রম,—একটা সুনিয়ন্ত্রিত বৃহত্তর জীবনের সাধ-স্বপ্ন কি করে যেন তিনি তাঁর জীবনের গোড়াতেই পেয়েছিলেন। তাই তিনি তাঁর জীবনের একটা আদর্শ ও উদ্দেশ্য গড়ে তুল্‌তে চেয়েছিলেন এবং সেই আদর্শ উদ্দেশ্যে পৌঁছাবার জন্যে নিজের দৈনন্দিন জীবনকেও একটা কঠোর সাধনায় পরিণত করেছিলেন। আদর্শ ও কর্ম্মের পথে তাঁর যে রকম অনম্য দৃঢ়তা ও সাধনার পথে যে রকম অকৃত্রিম একনিষ্ঠতা ছিল, মনে হয় বেঁচে থাকলে স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার সিদ্ধি তাঁর জীবনে অবশ্যম্ভাবী ছিল। জীবনে তিনি হ'তে চেয়েছিলেন অনেক, করতে চেয়েছিলেন বহু,—সাহিত্য করবার ও সাহিত্য গড়ে তুলবার সাধ করেছিলেন, 'তরুণ পত্র', 'ঢাকা মুস্‌লিম সাহিত্য সমাজ', 'শিখা', 'মুস্‌লিম কালসার' 'বাংলার বল্‌শী' ও অসংখ্য প্রবন্ধাদি তার নিদর্শন। পাঠ্য বইর সংস্কার করতে চেয়েছিলেন, সেই উদ্দেশ্যে বহু পাঠ্য বই লিখেছেনও, আইনে কৃতিত্ব অর্জ্জনের ইচ্ছায় আরাম ও মোটা মাইনের চাক্‌রী ছেড়ে

একটা সুবৃহ পরিবারের বোঝা মাথায় নিয়ে ব্যবহারজীবীর বন্ধুর পথে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা করেননি। কয়েকবার অকৃতকার্য্য হয়েও, শেষ পর্য্যন্ত এম. এল. পরীক্ষা পাশ করে তবে ছেড়েছিলেন, ঠাকুর ল' লেক্চরার ও ডি, এল'-এর থিসিস তৈয়েরী করেছিলেন। দেশের বিভিন্ন আইন কানুন সম্বন্ধে গবেষণা করেছেন, প্রচলিত আইনের সংস্কারের জন্য কোন কোন জন-হিতকর নতুন আইনের খসড়া তৈয়েরী করেছেন, তন্মধ্যে সর্ব্বজন-বিদিত ওয়াক্ফ আইন অন্যতম। পুরোনো ও অবৈজ্ঞানিক সেকেলে আইনগুলির সংস্কার করে ভারতবর্ষীয় আইন শাস্ত্রকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক রূপ দেবেন এই তাঁর একটি বড় স্বপ্ন ছিল। আইন ছাড়া অর্থনীতির তিনি ছাত্র ছিলেন, অধ্যাপক ছিলেন, তাঁর অর্থনৈতিক গবেষণাও হয়ত অর্থনীতিবিদ্‌দের কাছে সুপরিচিত। আজ দেশে গণ-আন্দোলন ও প্রজাহিতৈষণার কথা সর্ব্বত্র শ্রুতিগোচর হয়---আবুল হুসেন সাহেব পনর বছর পূর্ব্বে তাঁর 'বাংলার বল্‌শী' গ্রন্থে এই বিষয়ে ইঙ্গিত করেছিলেন। বাংলা নদীমাতৃক দেশ, বাংলার ধন ঐশ্বর্য্য ও উর্ব্বরা শক্তি তথা কৃষি সম্পদ নদীর উপরই নির্ভর করে,—আজ ডাক্তার রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, মেঘনাদ সাহা প্রভৃতিও এই নদীর দিকেই দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। আবুল হুসেন বহু পূর্ব্বেই নদী সম্বন্ধে বই লিখে এই বিষয়ে দেশবাসীর চৈতান্যাদয়ের চেষ্টা করেছিলেন। এই যে সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি ও সাধনার পরিধি, এর জন্যে যে শক্তি ও আত্মবিশ্বাসের প্রয়োজন তা আবুল হুসেন সাহেবের ছিল। এই শক্তি ও আত্মবিশ্বাস প্রণোদিত সাধনার কঠোরতাই সম্ভবতঃ শেষ পর্য্যন্ত ভঙ্গুর মানবদেহ সহ্য করতে পারলো না। এই-ই বোধ হয় এই জীবন-সাধক বীর-আত্মার অকাল প্রয়াণের কারণ।

মুসলমানের দৃষ্টি ভঙ্গি বদলে দেবেন, তাদের শ্রীহীন জীবনে সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে তুলবেন, দীনতার মাঝে ঐশ্বর্য্যকে ফিরিয়ে আনবেন, জ্ঞান ও সাধনার পথে সমাজকে এগিয়ে দেবেন---এই সব সাধ স্বপ্নও তাঁর ছিল। এই সাধ স্বপ্নের অনুকূল করেই নিজেকে ও নিজের জীবন ও পারিপার্শ্বকে তিনি তৈরী করছিলেন। এই সাধ স্বপ্নপূর্ণ, সাধনা ও তপস্যার জীবন অপূর্ব আশা ও পূর্ণশক্তি নিয়েই অকালে বিদায়

নিল। এই দুঃখ তাঁর সহকর্ম্মীদের জীবনে মর্ম্মন্তুদ হয়েই বিরাজ করবে।

মুসলমান যুবকের আত্মশক্তির উপর তাঁর একটা অগাধ বিশ্বাস ছিল তাই মুসলমানের জন্য কোন প্রকার 'রক্ষা কবচকে'ই তিনি ঘৃণা করতেন। রক্ষা কবচ মানুষকে পরমুখাপেক্ষী ও সংগ্রামবিমুখ করে, আত্মবিশ্বাসী চির-সংগ্রামশীল আবুল হুসেন একথা বিশ্বাস ও প্রচার করতেন। শাস্ত্রের ব্যবহারিক কোন কোন বিধি নিষেধের দেশকাল পাত্রানুযায়ী সংস্কারে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর এই সব আদর্শ ও মতামতের জন্য অদূরদর্শীদের লাঞ্ছনা গঞ্জনার হাত থেকেও তিনি রেহাই পাননি। কিন্তু দুর্জ্জয় ইচ্ছা-শক্তির অধিকারী আবুল হুসেন অবনমিত হননি। অন্য অনেকের মত তিনিও জান্‌তেন আমাদের সমাজের তথাকথিত পৃষ্টপোষকদের মতামতের ও প্রসন্নতা ও অপ্রসন্নতার পেণ্ডুলাম আর্থিক ও রাষ্ট্রিক পদমর্য্যাদার সঙ্গে সঙ্গেই দোল খায়, কিন্তু অন্যের সঙ্গে তাঁর তফাৎ ছিল;---অন্যেরা অন্যায় বিরুদ্ধতায়ও কিঞ্চিৎ হা হুতাশ করে চুপ করে সয়ে গিয়ে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন, কিন্তু এসব ক্ষেত্রে আবুল হুসেন পরাজয় স্বীকার করে চুপ করে থাকার পাত্র ছিলেন না। তিনি আবার নূতন করে সাধনা শুরু করেছিলেন,---জ্ঞানে, কর্ম্মে সাধনায় ও সর্ব্বাঙ্গীন যোগ্যতায় তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করবেন এই ছিল তাঁর সঙ্কল্প। এই সঙ্কল্প সিদ্ধি তাঁর করতলগত হওয়ার পূর্ব্বেই এই জীবন-সৈনিক তাঁর সমস্ত অপূর্ণকর্ম্ম ও সাধনার মাঝখানেই নশ্বরদেহ রক্ষা করেছেন। জীবনের কোন সাধনা-ই নিষ্ফল নয়---তাই মনে হয় জীবন-যুদ্ধে অকুতোভয় ও একাগ্র সাধক আবুল হুসেনের জীবন আর সাধনাও যুবক মুসলমানের সাম্‌নে বহুদিন একটা সক্রিয় প্রেরণা হয়েই বিরাজ করবে।

অতি শৈশবে যখন সংবাদ পত্রিকার সঙ্গে মাত্র পরিচয় ঘটিয়াছে, তখন হইতে শ্রদ্ধেয়া মিসেস্ আর. এস্. হোসেন সাহেবার নাম শুনিয়া আসিতেছি। তাঁহার অপূর্ব্ব সাধনা, অপরিসীম কার্য্যকুশলতা, সাহিত্য-প্রচেষ্টা, সর্ব্বোপরি তাঁহার স্বর্গগত স্বামীর স্মৃতিকে কেন্দ্র করিয়া প্রেমের অভিনব তাজমহল---সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস্ স্কুল প্রতিষ্ঠা, শত বাধা বিপত্তির মধ্যে সেটাকে ধীরে ধীরে গড়িয়া তোলা, এ-সব একটার পর একটা যখন শুনিতাম তখন বিস্ময়ে অবাক হইয়া যাইতাম। যে সমাজে পুরুষদের মধ্যে একটা বিশেষ সাধনা নাই, কোন একটা বিশেষ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানকে গড়িয়া তুলিবার জন্য মরিয়া হইয়া লাগিয়া থাকা, বাধা বিপত্তি ও উন্নতি অবনতিকে তুচ্ছ করিয়া নিজের অন্তরনিহিত সাধনালব্ধ সত্যকে আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকা অভ্যাস নাই—সে সমাজে, বাংলার শ্যামলবক্ষে কেমন করিয়া এমন ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের প্রতিমূর্ত্তি, একনিষ্ঠ সাধনার প্রতীক এই অসাধারণ মেয়েটীর জন্ম সম্ভব হইল! সন্তানহীনা বিধবা---উচচ শিক্ষা, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রী বা অতুল সম্পত্তি তাঁহার সহায় ছিল না। তথাপি আজ বহু বৎসর হইতে এই মহিমময়ী নারী কী নির্ভীক অনম্য হস্তে নারী শিক্ষা ও স্বাধীনতার পতাকা বহিয়া চলিয়াছেন---আজিও সে চলা বন্ধ হয় নাই। নিজের জীবন দিয়া যে সত্যটিকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন---অন্তরের অন্তস্থলে বুঝিয়াছিলেন, সেটিকে আজিও শত উত্থান পতনের মধ্যেও আঁকড়িয়া ধরিয়া আছেন—নিজের জীবনের সুখ, বিলাস ও অবসরকে বিসর্জ্জন দিয়া। তিনি এখন জীবনের শেষ প্রান্তে, এখন তাঁহার অবসর ভোগ করিবার সময়—কিন্তু সমাজ ও মানবকল্যাণকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার প্রেমের এ-মহান স্তব তাঁহাকে আজিও অবসর দিতেছে না। আমাদের সম্রাট-কবির অপূর্ব্ব প্রেমের পাষাণস্তম্ভ সুদূর যমুনাতীরে দাঁড়াইয়া আছে

সৌন্দর্য্যের প্রতীক হইয়া। সেটি প্রেমিক সম্রাটের ঐশ্বর্য্য ও প্রেমের সম্মিলিত প্রকাশ---আর বাংলার এ-কল্যাণী নারী তিলে তিলে নিজের দেহ ও প্রাণ দিয়া জ্বালাইয়াছেন প্রেমের এ-মহান্ দীপশিখা—ধ্যানের এ রং-মশাল। কোন্‌টি বড়, ভাবিয়া হঠাৎ উত্তর আসে না।

আগেই বলিয়াছি, কিছু একটা ধরিয়া থাকা---কোন একটা principle মানিয়া চলা আমাদের ধাতে নাই। আজ যিনি স্বরাজী, কাল তিনি হয়তো মডারেট; আজ যিনি সাইমন কমিশন বর্জ্জনের জন্য আন্দোলন করিতেছেন, কাল তিনি হয়তো সাইমন সহযোগিতা কমিটীর সভ্য; আজ যিনি ডায়ার্কী চাইনা বলিয়া মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ভোট দিতেছেন, কাল তিনি স্বয়ং মন্ত্রীপদপ্রার্থী। এই যখন আমাদের স্বভাব, তখন এর ভিতর দাঁড়াইয়া, প্রাচীরের অন্ধকার হইতে আদর্শ, একনিষ্ঠ সাধনা ও অধ্যবসায়ের আলোকশিখা লইয়া একটী নারী নির্ভীকভাবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইলেন—সে আলোকশিখা দেখিয়া আমাদের চোখ খোলা উচিত ছিল কিন্তু খোলে নাই। দলে দলে মুসলিম নারী সে আলোকশিখার তলে দাঁড়াইয়া জগতকে দেখিবার সুযোগ করিয়া লইবে আশা করা গিয়াছিল, কিন্তু কাহারও মনে যেন সাড়া জাগিল না। তথাপি সে অনির্ব্বাণ দীপ-শিখা জ্বলিতে লাগিল। তাহার পশ্চাতে যে আগুন কাজ করিতেছিল, তাহা তো তাহার শেষ তৈলবিন্দু নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত নিভিবার নহে,—এমনি তাহা উজ্জ্বল, জীবন্ত, বীর্য্যবান।

মিসেস্ হোসেন সাহেবার জীবন কথা আমরা জানি না---তথাপি তাঁহার সম্বন্ধে লিখিতে গেলে অনেক কথা মনে আসিয়া পড়ে। সে-বৎসর আলীগড় শিক্ষা কন্‌ফারেন্সে মেয়েদের প্রতি অন্যায় অবিচারের জন্য বোম্বের আতিয়া বেগমের নেতৃত্বে মেয়েরা যে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়াছিলেন, সেদিনও বাংলার মুখ রক্ষা করিয়াছিলেন এ অপূর্ব্ব মেয়েটী পুরুষ নেতা ও অসংখ্য জনতার মধ্যে, নির্ভীক পদবিক্ষেপে প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া পুরুষের পক্ষপাত ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ উত্তোলন, পরিশেষে নিজেদের অধিকার ও হক্ আদায় করিয়া লওয়া কম পৌরুষের কথা নয়।

এই বিদ্রোহের ধ্বনি সর্ব্বপ্রথম তাঁহার সাহিত্য প্রচেষ্টার ভিতর দিয়া ধ্বনিত হইয়া ওঠে। সর্ব্বসমেত তাঁহার চারিখানি বই প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া তাঁহার অসংখ্য প্রবন্ধ বাংলা সংবাদ পত্রিকার পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়া আছে। তাঁহার লেখা হয়তো সাহিত্যে খুব বড় স্থান পাইবার যোগ্য নয়, কিন্তু মুসলিম নারী-লেখিকাদের অগ্রদূতীরূপে সেগুলি চিরদিন সাহিত্যিকদের মনে স্থান পাইবে। তাঁর আগে অন্য কোন মুসলিম লেখিকা লেখেন নাই, তেমন কথা বলিতেছি না; কিন্তু তাঁহার সমস্ত লেখার ভিতর দিয়া আধুনিক বা ভবিষ্যত নারীজাগরণের একটা আভাস আমাদের মনে আসিয়া পড়ে।

বন্ধনক্লিষ্ট বাংলার নারী-আত্মা তাঁহার লেখনীমুখে ফরিয়াদ করিয়া উঠিয়াছে। বহুদিনের অন্ধকারাচ্ছন্ন পাতালপুরী হইতে সে যেন পাখা মেলিয়া উড়িতে চায়। এ মুক্তির বাণীর জন্য ভবিষ্যৎ বাংলার নারীজাগরণের ইতিহাস লেখক তাঁহাকে বা তাঁহার সাহিত্যকে ভুলিতে পারিবে না। যশের কাঙ্গাল বাঙ্গলা! যে দেশে নিজের কাগজে নিজেকে বঙ্গ-গৌরব, হজরত মৌলানা অমুক তনুক ইত্যাদি লেখা হয়, সে দেশে একটী মেয়ের যশ, সুখ্যাতি ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও দুই হাতে যশ ও সম্মানকে উপেক্ষা করিয়া শুধু নিজের সাধনাকে জয়-যুক্ত করিবার চেষ্টায় নিজেকে দিনে দিনে ক্ষয় করিয়া দিতেছেন, ইহা কি বিস্ময়ের বিষয় নয়? তিনি বয়োবৃদ্ধা পর্দ্দার বাহিরে আসা, বিশেষত এ বয়সে হয়তো তাঁহার সংস্কারে বাধে না, কিন্তু এ ধূয়া ধরিয়া পাছে কেহ তাঁহার সাধনাকে ব্যর্থ করিয়া দিবার চেষ্টা করে---যে সাধনার ভিতর দিয়া শত শত নারী জ্ঞান ও আলোকের পথে চলিয়াছে---এই আশঙ্কায় তিনি তাঁহার নিজের জীবনের আশা-আকাঙ্খাকেও বিসর্জ্জন দিয়াছেন। কত সভা-সমিতিতে তাঁহাকে বক্তৃতা ও নেতৃত্ব করিবার জন্য আহ্বান করা হয়, কিন্তু তাঁহার স্কুল ও সমাজের সংস্কারের দিকে চাহিয়া তাঁহাকে এ সব সম্মান প্রত্যাখ্যান করিতে হয়। অথচ এ দেশে সভাপতি হইতে এবং নিজের নাম জাহির করিতে কত হীন চেষ্টাই না চলে!

শুনিলাম অর্থাভাবে তাঁহার এই অভিনব সাধনার ধন স্কুলটী আশানুরূপ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে পারিতেছে না---আমাদের সমাজের লোক

দান করে না বা আমাদের সমাজে ধনী নাই তেমন কথা ত বিশ্বাস হয় না। খেলাফৎ, জমিয়তে ওলামা, আঞ্জুমানে ওলামা ইয়া উহা আর কত কি মাথামুণ্ডে সমাজ তো হাজার হাজার টাকা দিয়াছে—Election-কে কেন্দ্র করিয়া আমাদের সমাজের প্রার্থীরা আট দশ হাজার হইতে বিশ পঁচিশ হাজার পর্য্যন্ত খরচ করিতে কাহারও বাধে না। অথচ তাহার বিনিময়ে তাঁহারা দেশের বা সমাজের কতটুকু কল্যাণই বা করিতে পারেন? আবার এই পরিমাণ টাকা খরচ করিয়াও সব প্রার্থী যে নির্ব্বাচিত হয় তাহাও তো নহে---অথচ এ টাকার কিয়দংশ সাহায্য পাইলেও এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটী সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারিত। এই যে কল্যাণী নারী সমাজ ও মানবকল্যাণকে কেন্দ্র করিয়া নিজকে তিলে তিলে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন; ইহাতে কি কাহারও মনে স্পন্দন জাগে না? এত বড় একটী প্রেম ও কল্যাণের উৎসর্গ বাংলার নর-নারীর বুকে কোন অনুভূতি, কোন প্রেরণা সৃষ্টি করে না এ-কী কম দুর্ভাগ্যের কথা?

বাংলার রাজধানীর বুকে, সার্কুলার রোডের পার্শ্বে দাম্পত্য প্রেমের এ অভিনব তাজমহল---মুসলিম নারী শিক্ষার সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান, একটী মহিমময়ী কল্যাণীয়া নারীর আজীবনের সাধনা, নারীকল্যাণে নিজকে তিলে তিলে নিবেদন ও অপূর্ব্ব আত্মোৎসর্গের কুতুবমিনার বাংলার নর-নারীর তীর্থস্থানে পরিণত হউক---এ আমরা সর্ব্বান্তকরণে কামনা করি।

আশ্বিন, ১৩৩৫

---

* মিসেস্ আর. এস্. হোসেনের জীবিতকালে লিখিত ও প্রকাশিত।

অন্ধকারে ঢাকা অন্ধের দেশ---

চোখ আছে, তা বন্ধ। জিভ আছে কথা সরে না, অস্ফুটে মনের ব্যথাকে কথার আকার দেবার চেষ্টা করে, কথা ত নয়, সে যেন ইশারা! কান আছে, শোনে না---ছিদ্রের পর ছিদ্র করে ধাতব দ্রব্যের চক্রের পর চক্র লাগিয়ে তাকে ক'রে তোলা হয়েছে কালা। বাঁশীর মতো সুন্দর নাসিকা, সোণার ফাঁস লাগিয়ে তাকেও করা হয়েছে বিকৃত—ফুলের সুবাস, নির্ম্মল বাতাস ফুসফুসে পৌঁছার পথ খুঁজে পায় না। গলায়, হাতে ও পায়ে বেড়ীর পর বেড়ী লাগিয়ে তারা হয়ে পড়েছে বন্দী, জড়, নিশ্চল।

শুভ্র জ্যোৎস্নার মত, গন্ধে ভরা ফুলকলির মত একটী মেয়ে অন্ধের দেশের অন্ধকারে চঞ্চল হয়ে ওঠে,—পাখীর বিচিত্র কলরব, নদীর কলকলধ্বনি, ফুলের সুবাস অন্ধকার ভেদ করেও যেন তার কাণে কাণে নব জীবনের ক্ষীণ আভাস জানায়---নিশ্বাসের ক্ষীণপথ বেয়ে দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অজ্ঞাত জীবনের, অদৃশ্য জগতের বাণী যেন বীণা হয়ে বেজে ওঠে।

অন্তরের অন্তরতলে প্রশ্নের পর প্রশ্ন পাখা মেল্‌তে চায়—কি? ---কোথায়?---কেমন?

ফিস্ ফিস্ করে সে শুধায়---চোখ মেলি?
সহস্রকণ্ঠে শব্দ হয়---না! না! না! খবরদার, খবরদার!
পা, পা যে অবশ হয়ে গেল, একটু হাঁটি?
বিস্মিত কণ্ঠে ধ্বনি ওঠে—না, না, না, গোনাহ্! গোনাহ্!
পাখীর কূজন, নদীর কলকলধ্বনি, ফুলের সুবাস।
সে শুধায়---ও কিসের শব্দ?---ও কিসের গন্ধ?
সহস্রকণ্ঠে ধ্বনি ওঠে—কে জানে?---জানার দরকারটা কি?

মাথার উপরে আকাশ, চারদিকের পৃথিবী কেমন?---কিছুই যে দেখি না, নিশ্বাস যে নিতে পারি না! আলো দাও, বাতাস দাও!

অগণিত কণ্ঠে শব্দ হয়---চুপ্, চুপ্!

কুণ্ঠাহীন কণ্ঠের আলাপে সারা পথ মুখর হয়ে উঠেছে।

সে শুধায়---ঐ কারা যেন পথ চলে?

লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনি ওঠে---শয়তান! শয়তান! গোনাহ্গার!

সবাই মিলে তার পায়ে, হাতে, গলায় লাগায় বেড়ীর পর বেড়ী ---তার মিনতি ও কান্নাকে উপেক্ষা করে ফুঁড়ে দেয় তার নাক, কান। ---আকাশের বিদ্যুৎকে ধরে যেন পরিয়ে দেওয়া হয় বোরকা।

রাগে, গোশ্বায় তার ধৈর্য্যের বাঁধ যায় টুটে---গোনাহ্ হয় হোক, চোখ আমি খুলব---নিষেধ আমি শুনব না, পথ আমি চলব---পাপ হয় হউক, কথা আমি বলব।

---কোটি কণ্ঠে ধ্বনি ওঠে---গোনাহ্গার! গোনাহ্গার!

চোখ সে মেল্লই---মেলেই সে ত মুগ্ধ, বিস্মিত!---পৃথিবী এত সুন্দর! স্বর্গ থাক্---এই দুনিয়ার চাঁদ-সূর্য্যকে না দেখ্‌লে ত জীবন ব্যর্থ হত। এই প্রবহমান নদী, সবুজ মাঠ, পাখীর কূজন---এই ত স্বর্গ।

এই স্বর্গ কৃপণের মত একা ভোগ করব? না, না,---অন্ধকে দৃষ্টি দেব, কালাকে শ্রবণ, খোঁড়াকে পা, বোবাকে রসনা দেবার সাধনা হবে আমার জীবন।

নিজের দিকে চেয়ে সে লজ্জায় অধোবদন হ'ল---এই সুন্দর পৃথিবীতে সে নিজকে করে আছে এত কুৎসিৎ। একে একে ভাঙ্গল সে তার হাতের পায়ের বেড়ী, খুল্লে গলার শিকল, নামালে নাক আর কানের বোঝা।

তারপর শুরু হল তার যাত্রা।---অন্ধের হাত ধরে সে বল্লে---চোখ খোল; বোবাকে বল্লে---মুখ খোল; কালাকে বল্লে---শোন; খোঁড়াকে বল্লে---চল,---চেয়ে দেখ সুন্দর আকাশ, সবুজ পৃথিবী, খুলে ফেল হাত পায়ের বেড়ী।

বহুকণ্ঠে অগণিত ধ্বনি উঠ্‌ল—গোনাহ্‌! গোনাহ্‌!

সে বলে উঠল—গোনাহ্‌ নয়, কখনই গোনাহ্‌ নয়,—খোদা চোখ দিয়েছেন দেখার জন্য, কান দিয়েছেন শোনার জন্য, মুখ দিয়েছেন প্রকাশের জন্য।

অনেকে চেঁচিয়ে উঠল—গোনাহগার! গোনাহগার!

কেউ কেউ ভাব্‌লে, একবার চোখ খুলেই দেখি না।

তারা চোখ মেলে মুগ্ধ বিস্ময়ে বলে উঠ্‌ল—সুন্দর! সুন্দর!

অন্ধ আরও জোরে চোখ বন্ধ করে শুধায়—গোনাহ্‌র পথে নিয়ে যায়, এ কে?

চোখ-খোলা আলোপথচারিণীরা হাস্‌তে হাস্‌তে কলকণ্ঠে উত্তর দেয়—খোদার দরবারে নারীর জন্য মুক্তি-কামিনী এ—নাম এর রোকেয়া!!*

---

* মিসেস্‌ আর. এস্‌. হোসেনের মৃত্যুর পর প্রকাশিত।

আজিমুন্নেসা সাহেবা

বৃদ্ধা আজিমুন্নেসা সাহেবা তা'হলে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। তাঁর সুবৃহৎ নির্ম্মল চক্ষু তারকা দু'টী এখনো আমার চোখের সাম্‌নে ভাস্‌ছে---আমার সব সময় মনে হ'ত, সেই চক্ষু তারকা দু'টী তাঁর নির্ম্মল হৃদয় ও নির্ম্মল জীবনেরই প্রতিচ্ছবি।

জীবনে বহু উচচ শিক্ষিতা ও মহীয়সী মহিলার পরিচয় ও সংস্পর্শে আসার সুযোগ সুবিধা আমার ভাগ্যে ঘটেছে। কিন্তু নারীর কল্যাণী মূর্ত্তির যে অপূর্ব্ব বিকাশ তাঁর জীবনে দেখেছি, তা অন্য কারো জীবনে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। যে বৃহৎ 'বৃত্তটি' তাঁকে কেন্দ্র করে ঘুর্‌ছিল---সে বৃত্তটিতে কোন্ সুদূর অতীতে দিদারুলের ক্ষুদ্র সহপাঠি হিসাবে আমার সর্ব্বপ্রথম প্রবেশ তা আজ আমার মনেও নেই,---কিন্তু সে দিনের সেই সসঙ্কোচ পদক্ষেপই আমার জন্যে সেই 'বৃত্তে' একটি স্নেহময় ও স্থায়ী আসন হয়ে উঠেছিল;---পশ্চাদ্ দৃষ্টিপাত করে দেখ্‌লে বুঝতে বেগ পেতে হয় না, এই কল্যাণীর মাতৃহৃদয় আমার সেই আসনটিকে দিনে দিনে মধুর থেকে মধুরতর ও দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করে গড়ে তুলেছিল। এবং দিদারুলের তিরোধানের পরও আমার আসন সেই বৃত্তটিতে যে কিছুমাত্র শিথিল হলনা বরং কায়েমী হয়েই গেল---মনে হয়, তাও বেশীর ভাগ তাঁরই শুভ-ইচ্ছা ও হৃদয় মাহাত্ম্যের গুণেই। এই বৃত্তের ছোট বড় সকলের স্নেহ ভালবাসা শ্রদ্ধা আমি পেয়েছি, ---বোধ হয় একই নির্ঝরের বিভিন্ন স্রোতধারার মত, এসবেরও মূল উৎস ছিলেন তিনি। সন তারিখের দিক থেকে তিনি ছিলেন অতীতের--- আমরা যারা তাঁকে কেন্দ্র করে ঘুরছিলাম সবাই ছিলাম আধুনিক, চিন্তায় ভাবে চলাফেরায় সব দিকেই। অথচ তাঁর সঙ্গে কোন ব্যাপারে কোন-দিন আমাদের মতবিরোধ হয়নি। তিনি আমাদের সমস্ত আধুনিকতাই স্নেহের সঙ্গে মেনে নিতেন---জায়-নমাজে বসেই আমাদের নমাজ না

পড়া তিনি সহ্য কর্‌তেন। এসবই তাঁর উদার চরিত্র-শক্তি, মানসিক স্বাস্থ্য ও সবল কাণ্ডজ্ঞানের পরিচায়ক। মনে হয়, বিরোধ তাঁর চিত্তধর্ম্মের বিরোধী ছিল। স্নেহ, উদারতা ও কল্যাণবুদ্ধি দিয়ে তিনি বিরোধের মাঝেও মিল খুঁজে পেতেন।

আপনাদের সাংসারিক পরিধি ক্ষুদ্র নয়—খরচের স্রোত বহু, আয়ের পথ সঙ্কীর্ণ,—এ সবই ক্ষুদ্রতা-বৃদ্ধির অনুকূলে, তবুও পারিবারিক ব্যাপারে কোনদিন কোন সঙ্কীর্ণতা ও ক্ষুদ্রতা দেখা যায়নি;—মনে হয় এটিও তাঁর উদার চরিত্রের প্রভাব; তাঁর মনের কল্যাণ-বুদ্ধিতে কোন রকম ক্ষুদ্রতার স্থান ছিলনা। তিনি পরিবারের সক্রিয় কেন্দ্র ছিলেন—তাঁর নির্ম্মল চরিত্র ও কল্যাণ-বুদ্ধির স্পর্শ পরিবারের ছোট বড় প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে প্রভাবিত না করে ছাড়ত না। কাজেই সুযোগ ও অনুকূল আবহাওয়া থাকা সত্ত্বেও, পরিবারের আনাচে কানাচেও ক্ষুদ্রতা মাথা তুল্‌তে পারেনি।

জীবনে দুঃখ তিনি কম পাননি—একমাত্র স্নেহের দুলালী কন্যাকে তিনি অকালে হারিয়েছেন, স্বামীর অপঘাত মৃত্যু তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন, প্রতিভাবান কৃতী পুত্রের অকাল তিরোধান তাঁর চোখের সামনে ঘটেছে—বড় ছেলের দীর্ঘ দিন বিদেশে অবস্থান, সন্তান সন্ততি রেখে মেজ বৌ-এর অকাল মৃত্যু—এর যে কোনটি যে কোন সাধারণ নারীকে শোকাকুল করে তুল্‌তে পারত। তিনিও যে শোকাকুল হন্‌নি তা নয়, কিন্তু শোক ও দুঃখকে জয় করবার এক অপূর্ব্ব সাবলীল শক্তি যেন তাঁর করায়ত্ত ছিল। যে শোক অন্য যে কোন নারীকে জীবনে ভগ্নোৎসাহ ও নিরাশ করে ছাড়ত, সেই শোক, জরাজীর্ণ বৃদ্ধ বয়সেও তাঁকে করে তুলেছিল অধিকতর কর্ম্মিষ্ঠা। কি প্রবল আগ্রহেই না তিনি তাঁর মাতৃহারা ও পিতার স্নেহ থেকে দূরে অবস্থিত পৌত্র পৌত্রীদের লালন পালন ও সেবা যত্নের ভার গ্রহণ করেছিলেন। এ সবই তাঁর সবল চরিত্র ও দুঃখজয়ী মানসিকতার সাক্ষী। আমাদের পরিধিতে তাঁর স্থান পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা দেখিনা।—কিন্তু তাঁর তিরোধানের ক্ষতি যে এত নানা দিক থেকেই হবে তা পূর্ব্বে ভাবিনি;—তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চোখের সাম্‌নে থেকে একটি

নির্ম্মল জীবনও শুভবুদ্ধির আলোকবর্ত্তিকা চিরতরে নিবে গেল, গৃহিনীরা কাণ্ডারীহীন নৌকার আরোহীর মত দিশেহারা হবে বৈকি, উমুরা নীড়হারা না হউক একটি সুদৃঢ় ও নির্ভরশীল স্নেহ-বন্ধন থেকে চ্যুত হল, সামসুল আলম সাহেব ও পরিবারের মাঝখানে যে ফাঁকটা ছিল তিনি তা এতদিন পূর্ণ করে রেখেছিলেন, সেই ফাঁকটাও একটু বিস্তৃত হবে বৈ কি। আমরা যারা বাইর থেকে এসে কায়েমী আসন গেড়ে বসেছিলাম তাদের আসনও একটু টলটলায়মান না হয়ে পারেনা। ছন্নছাড়া সালাম হারাল তার সর্ব্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য আশ্রয়। গৃহের মার্জ্জার-পত্নিকেও এবার বড় মানুষী রুচি বদলাতে হ'বে, হয়ত আভিজাত্য ত্যাগ করে পরের হেঁসেলে গিয়েই ক্ষুন্নিবৃত্তির উপায় খুঁজ্‌তে হবে; হতভাগ্য মুরগী শাবকগুলি মাতৃহারা না হউক, অন্ততঃ মুরুব্বীহারা হ'ল বলতে হবে—এবং নিশ্চয় অন্নপূর্ণার বিদায়ের পর এবার থেকে তাদের অন্নে অনিয়ম দেখা দেবে। তাঁর কথা মনে হ'লে আমার শকুন্তলা কাব্যের কন্বমুণির আশ্রমের চিত্র মনে পড়ে---যেখানে পশু-পক্ষী ও গাছপালাসহ সমগ্র প্রকৃতির সঙ্গে মানব হৃদয়ের এক নিবিড় আত্মীয়তার ছবি কবি এঁকেছেন।---তাঁর জীবনে এই কাল্পনিক চিত্রের বাস্তব আভাস আমি দেখতাম। অতীতকালের মাহাত্ম্য ও শুভবুদ্ধির সঙ্গে আধুনিক কালের পরিচ্ছন্ন জীবন যাত্রার এক অপূর্ব্ব সমণ্বয় তাঁর জীবনে ঘটেছিল। বিদেশ থেকে দেশে ফির্‌বার কালে সব সময় আমি এই অপূর্ব্ব জীবনের সুমধুর সহচর্য্যের আকর্ষণ অনুভব কর্‌তাম—দেশ থেকে বিদেশে ফিরবার সময় তাঁর স্নেহাশীষকে পাথেয় ও রক্ষাকবচ বলে মনে হ'ত। আজ থেকে সেই আকর্ষণ, পাথেয় ও রক্ষাকবচ সব নিঃশেষে শেষ হয়ে গেল।

---

* মাহ্‌বুব-উল-আলম সাহেবকে লিখিত পত্রাংশ। মরহুমা ছিলেন এঁদের মা।

শশাঙ্ক মোহনের নামের পূর্ব্বে কবি-ভাস্কর উপাধি লেখা হ'তে দেখেছি,—এই উপাধি কে বা কাহারা দিয়েছিলেন আমার জানা নেই। তবে শশাঙ্ক মোহনের সাহিত্য সাধনা সম্বন্ধে যখনি ভেবেছি, তখনি মনে হয়েছে, ভাস্করের থেকে সার্থক-নামা উপাধি তাঁর আর হতে পারত কিনা সন্দেহ। বলা বাহুল্য সূর্য্য অর্থে ভাস্কর আমি মনে কর্‌ছি না এবং আমি মনে করি এটাও বলা বাহুল্য, কবিদের সূর্য্য বা কবিগণের মধ্যে সূর্য্য-সম এই উপাধি শশাঙ্ক মোহন সম্বন্ধে হাস্যাস্পদ ও অ-সার্থক। কারণ বাঙালা সাহিত্যের বা বাঙালী জীবনের ইতিহাসে শশাঙ্ক মোহনের বড় পরিচয়---কবি হিসেবে কখনও ছিল না, এবং সম্ভবতঃ কখনও হবেও না। তিনি ইংরেজীতে যাকে বলে আমাদের সাহিত্যের Minor Poet। মাইকেল মধুসূদনের সময় 'গৌর' কবিগণের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন ছিলেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তারপর আমাদের কাব্য-সাহিত্যে যে-যুগ চল্‌ছে, নিঃসন্দেহে তা রবীন্দ্র-যুগ,—এই সৌর-জগতে শশাঙ্ক মোহনও অন্যান্য কবিগ্রহদের অন্যতম মাত্র এর বেশী দাবী জানাতে গেলে স্বদেশ-হিতৈষণা প্রকাশ পাবে সত্য কিন্তু কাব্য বিচারের নিরপেক্ষতা রক্ষা করা হবেনা। আমার মনে হয় শশাঙ্ক মোহনের বড় ও সত্যিকার পরিচয় তিনি আমাদের সাহিত্যের একজন বড় সমালোচক---আমাদের সমালোচনা সাহিত্য তাঁর হাতে অনেকটা পরিণতি ও পূর্ণতা পেয়েছে। যে-অখণ্ড, নিরপেক্ষ ও নির্ভীক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি আমাদের সাহিত্যের ক্রম বিকাশের ধারা পর্য্যালোচনা করেছেন, তার থেকে পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপক আলোচনা আজ পর্য্যন্ত হয়নি। আমাদের সমালোচনা-সাহিত্যে শশাঙ্ক মোহন এখনো অনন্য সাধারণ ও অনতিক্রম্য। প্রস্তর মূর্ত্তি নির্ম্মাতা ভাস্কর যেমন একাগ্র সাধনা ও অচঞ্চল অধ্যবসায় দিয়ে তাঁর মানসী প্রতিমার একটির পর একটি রেখা খোদাই করেন,

শশাঙ্ক মোহনও তেমনি একাগ্র সাধনা ও কঠোর অধ্যবসায় দিয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের জ্ঞান-ভাণ্ডার মন্থন করে, 'বঙ্গবাণী' 'বাণী মন্দির' ও 'মধুসূদনের অর্ন্তজীবন ও প্রতিভা' নামক সুধাভাণ্ড বঙ্গ সাহিত্যকে উপহার দিয়েছেন, এই তিনটী গ্রন্থে ভাস্করের নৈপুণ্য, দক্ষতা ও নির্লিপ্ত একাগ্রতা লক্ষ্য করেছি। তাই বল্‌ছিলাম আমাদের আধুনিক সাহিত্যের দীর্ঘ-ইতিহাসে যে স্বল্প-সংখ্যক ভাস্কর-ধর্ম্মী সাহিত্যিক জন্মেছেন, নিঃসন্দেহে শশাঙ্ক মোহন তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

শশাঙ্ক মোহনের কবি-কীর্ত্তির সঙ্গে আমার পরিচয় ব্যাপক ও গভীর নয়। তবে যে সামান্য পরিচয়টুকু তাঁর কাব্যের সঙ্গে আমার ঘটেছে তাতেও আমি লক্ষ্য করেছি ভাস্কর্য্যের নৈপুণ্য, শব্দ-চয়ন ও শব্দ-প্রয়োগের অসাধারণ দক্ষতা। ভাবের বিদ্যুৎ-ঝলক, অর্থহীনশব্দের ঘনঘটা, অনৌপলব্ধ কল্পনা বিলাস শশাঙ্ক্‌ মোহনের কাব্যে নেই। তাঁর 'বিমানিকা' নামক কাব্য গ্রন্থের প্রথম কবিতার আরম্ভ:

কবিতা আমার মেঘের মতন হোক।
---আগুনে বারিতে ধ্বনিতে পূরিত হোক।

কবি ভাস্করের ইহার চেয়ে যোগ্য কাব্যাদর্শ কল্পনা করা যায় না।

মনে হয় শশাঙ্ক মোহনের দৃষ্টি কখনও জনতার হাততালির দিকে আকৃষ্ট হয় নি, সস্তা ভাব বিলাসিতা নিয়ে চটকদার কবিতা লিখে তিনি জন-চিত্ত জয় করার চেষ্টা পান্‌নি। তিনি নিজে বিদগ্ধ-চিত্ত সুপণ্ডিত লোক ছিলেন---তাঁর গদ্য ও পদ্য রচনায় এই পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধের ছাপ লক্ষ্য-যোগ্য। অর্দ্ধ শিক্ষিত বা নামে-মাত্র শিক্ষিত পাঠকের কাছে শশাঙ্ক মোহনের সাহিত্যিক মূল্য-নির্দ্ধারণ আশা করা যায় না---তাই শশাঙ্ক মোহনকে এখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে এক রকম উপেক্ষিত বল্লেও বলা যায়। এমন কি শশাঙ্ক মোহন আমাদের দেশের সাহিত্যিকদের হাতেও যে উপেক্ষা ও অবিচার পেয়েছেন তা অন্য কোন দেশের সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল বল্লেও হয়। বাঙলা সাহিত্যে ভাল কাব্যচয়ন নেই---তবুও যে দু'চারখানা অপূর্ণাঙ্গ কাব্য-চয়ন বেরিয়েছে তার মধ্যে বহু কবি-খদ্যোতের স্থান আছে, কিন্তু শশাঙ্ক মোহনের স্থান হয়নি।

আমাদের সাহিত্য-বিচার-বুদ্ধি যে কত অপরিণত, আমাদের সাহিত্যিক মাপকাঠি যে কত একদেশদর্শী ও অপূর্ণাঙ্গ এ তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

অন্যান্য শিল্পের মত সাহিত্যও একটা শিল্প। যে কোন শিল্পে কৃতিত্ব অর্জ্জন যেমন কঠোর অধ্যবসায় ও পরিশ্রম সাপেক্ষ, তেম্নি যে কোন উচচ শিল্পকে বুঝ্তে হলে, তার রসোদ্ধার করতে হলে পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। অথচ আমাদের জাতীয় চরিত্রের এমনি বৈশিষ্ট, সাহিত্য ও শিল্পের মর্ম্ম ও রসোদ্ধারে যে পরিশ্রম ও সাধনা প্রয়োজন একথা আমরা স্বীকারই করতে চাই না। ফলে আজ পর্য্যন্ত সাহিত্যের যে সব শাখায় মননশক্তি ও বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন সে সব শাখা এখনো বাঙলা দেশে স্বল্প সখ্যক পাঠকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের লেখা দুর্ব্বোধ্য এমন লজ্জা-হীন মন্তব্যও মাঝে মাঝে শুন্তে পাওয়া যায়। ভারতীয় চিত্র-শিল্পের সমজদারিতে এই নির্ব্বুদ্ধিতা আরও বেশী প্রকট। ভারতীয় চিত্র-কলার যে টেক্নিক তা আয়ত্ত করতে আমরা চেষ্টা করব না। তার রস ও মর্ম্মোদ্বারের জন্য যে সময় ও পরিশ্রম দেওয়া দরকার তা আমরা দেব না, অথচ Indian Art বলে অবজ্ঞা প্রকাশ করতে আমাদের আত্মসম্মানে বাধে না। শিল্প সাধকের যেমন শিক্ষা নবিশীর প্রয়োজন আছে, শিল্প বোদ্ধারও সে রকম শিক্ষা-নবিশীর দরকার রয়েছে। সুপ্রসিদ্ধ কবি-সাহিত্যিক মোহিতলাল মজুমদার লিখেছেন---"ভাষার পাণ্ডিত্য-সুলভ শ্রী ও সৌষ্ঠব, সংযম-জনিত-নৈপুন্য ও মিতাক্ষর গাঢ়তা উপভোগ করিতে হইলে পাঠকের পক্ষেও অনেকখানি তৈয়ারী থাকা চাই। সব কথা, চিন্তার সকল সূত্র ধরাইয়া দিতে হইবে, পাঠক হাতটি ধরিয়া ধীরে ধীরে চলিবেন, এমন প্রথা উৎকৃষ্ট আর্টের প্রথা নয়।"* শশাঙ্ক মোহন তাঁর গদ্য ও পদ্য রচনায় এই উৎকৃষ্ট আর্টের প্রথাই অনুসরণ করেছেন, কাজেই তাঁকে বুঝ্তে হলে পাঠককেও বিদগ্ধ-চিত্ত সুপণ্ডিত লোক হতে হবে।—ইউরোপীয় সাহিত্যে অধিকার ও স্বদেশের সাহিত্য ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সুপরিচয় ছাড়া কোন পাঠকই শশাঙ্ক মোহনের যথাযথ মূল্য-নির্দ্ধারণ করতে সক্ষম হবে না।

* সাহিত্যকথা—মোহিতলাল মজুমদার।

শামসুল আলম স্মরণে

"পূরবীতে" প্রকাশিত তীর্থ-রহস্য নামক উপন্যাসের লেখক—সু-সাহিত্যিক মাহবুব-উল-আলম, ওহীদুল আলম ও মরহুম কবি দিদারুল আলমের জ্যেষ্ঠাগ্রজ শামসুল আলম বর্ম্মার সাম্প্রদায়িক আততায়ীদের হাতে নিহত হয়েছেন। তাঁর এই অকাল-মৃত্যু নানা কারণে অত্যন্ত শোকাবহ। শামসুল আলম দীর্ঘ দিন ধরে বার্ম্মা প্রবাসী—বার্ম্মার সৌন্দর্য্য, বার্ম্মার ইতিহাস, সংস্কৃতি ও তার জাতীয় সম্পদের প্রতি তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদের তিনি ভালবাসতেন। বার্ম্মার পুরাবৃত্ত তিনি পরিশ্রম ও শ্রদ্ধাসহকারে অধ্যয়ন করেছেন এবং বার্ম্মার একটি প্রমাণ্য ইতিহাস লেখার মালমসলা সংগ্রহেও তিনি ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি তাঁর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গল্প উপন্যাসে অকৃত্রিম দরদও শ্রদ্ধাসহকারে বার্ম্মা-জীবনের সারল্য ও সৌন্দর্য্যকে আঁকবার চেষ্টা করেছেন। বার্ম্মায় উচ্চ শিক্ষিত বাঙ্গালীর সংখ্যা খুব বেশী নয়—সেই স্বল্পসংখ্যকদের মধ্যেও শামসুল আলমের মত এতখানি নিষ্ঠা, দরদ ও প্রীতি নিয়ে বার্ম্মার হৃদয়-সম্পদ আবিষ্কারের চেষ্টা আর কেউ করেছেন কিনা জানি না। অথচ, অদৃষ্টের কি নির্ম্মম পরিহাস ধর্ম্মান্ধ বার্ম্মাবাসীদের হাতেই তাঁকে শেষ পর্য্যন্ত প্রাণ দিতে হল।

অসাধারণ মেধা, তীক্ষ্ণ মননশক্তি ও হৃদয় ঔদার্য্যের জন্য শামসুল আলম আবাল্য খ্যাত ছিলেন। তাঁহার স্বভাবে ও চরিত্রে একটা অসাধারণ স্বকীয়তা ছিল—এই স্বকীয়ত্বের প্রভাব তাঁর সাহিত্য-প্রচেষ্টার মধ্যেও পরিস্ফুট হয়েছে। তাঁর লেখা ঠিক গতানুগতিক ও মামুলী ছিল না—ভাষায়, ভাবে ও পট-ভূমিকায় তিনি অনেকটা অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন। অনিসন্ধিৎসু, উদারমনা ও সর্ব্বসংস্কার-মুক্ত শামসুল আলমের দান ও জীবনের সার্থকতা নির্ণয় করা কঠিন। কারণ ভাটখারায় ওজন করার মত বেশী কীর্তি তিনি রেখে যেতে পারেন নি—

কিন্তু তাঁর অনুসন্ধিৎসা, মুক্তবুদ্ধি ও উদারতার প্রেরণা ও প্রভাব ফল্গুধারার মত একটি পরিবার ও পরিচিত মণ্ডলকে কি পরিমাণে প্রভাবান্বিত করেছে, তার ইতিহাস যদি কেউ কোন দিন দিতে পারেন তা হ'লে হয়ত তাঁর প্রতিভার যথাযোগ্য মূল্য নির্দ্ধারণ তখন সম্ভব হবে। এই শোক-প্রসঙ্গের লেখক ন'বছর পূর্ব্বে দিদারুল আলম সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে এই বাক্যটি লিখেছেন "সে (দিদারুল) প্রায়ই বলিত তাহার মধ্যে যেটুকু ভাল তার জন্য সে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শামসুল আলম সাহেবের কাছেই ঋণী এবং তাঁহাকে দিদারুল আলম পিতৃতুল্য ভক্তি করিত।" সম্প্রতি মাহ্‌বুব-উল-আলম সাহেব এক পত্রখণ্ডে লিখেছেন—"বড়-দা শুধু আমাদের বড় ভাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন আমাদের গুরুও।" যাঁরা এই পরিবারটিকে জানেন তাঁরা বিশ্বাস করবেন, এই সব উক্তির মধ্যে কিছুমাত্র অতিরঞ্জন নেই। পঁচিশ ত্রিশ বছর আগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি মুসলমানদের যে মনোভাব ছিল তাকে কিছুমাত্র প্রীতির বা শ্রদ্ধার বলা যায় না—, সেদিন মুসলমান সাহিত্য-সেবকের সংখ্যা ছিল যেমন নগণ্য, তাঁদের সেবাও ছিল তেমনি অকিঞ্চিৎকর। সেদিন স্বদেশ ও স্বদেশের সাহিত্যের প্রতি সাধারণ মুসলমানদের দৃষ্টি ভঙ্গিমায় যেমন ছিল না প্রসন্নতা, তেমনি ছিল না অসন্দিগ্ধ উদারতা, ফলে স্বদেশের নাড়ীর সঙ্গে, ভাবসূত্রের সঙ্গে তাঁদের কিছুমাত্র যোগ ছিল না। সেই আবহাওয়ার মধ্যে শামসুল আলমের ছাত্র জীবনের আরম্ভ—বাড়ীতে আরবী ফার্সী শিক্ষিত মৌলবী-পিতা—মা মৌলবী-কন্যা ও মৌলবী গিন্নী—বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি কারও কোন যোগ ছিল না, হয়ত খবরা-খবরও কেউ রাখতেন না;—ভ্রাতাদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, এমতাবস্থায় পরিবার ও পরিবেষ্টনের কাছ থেকে কোন প্রেরণা, বা আলোর ইঙ্গিত পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, তবুও এমন একটা স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ গ্রহণ শক্তি ও স্বকীয় বুদ্ধির সহজ প্রবণতা শামসুল আলমের মধ্যে ছিল, যার ফলে সেই শৈশবকালেই তিনি সমস্ত পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলে বৃদ্ধ বয়সে তাঁর পিতামাতার মুখে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও নজরুল ইসলামের নাম প্রীতির সঙ্গে উচ্চারিত হতে শোনা গেছে। ভ্রাতাদের বাংলা

সাহিত্য-প্রীতি ও সাহিত্যিক প্রবণতার মূলে শামস্থল আলমের স্বাদেশিক ও উদার দৃষ্টিভঙ্গিমা সক্রিয় ছিল বল্লে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হবে না।

বাংলা ছাড়া শামস্থল আলম ইংরেজী সাহিত্যেরও বিশেষ ভক্ত ছিলেন। ছাত্র জীবনেও তাঁর বিশুদ্ধ ইংরেজী জ্ঞানের খ্যাতি ছিল। সুগঠিত হস্তাক্ষরে অনর্গল বিশুদ্ধ ইংরেজী তিনি লিখ্‌তে পারতেন। জ্ঞান আহরণের প্রতি তাঁর এরকম স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল যে অধ্যয়নের জন্যে বই তিনি buy ও borrow ত করতেনই শোনা যায় ছাত্র জীবনে মাঝে মাঝে steal-নীতি অবলম্বন করতেও বিরত হতেন না।

চট্টগ্রাম হ'তে পরিচালিত আধুনা লুপ্ত ত্রৈমাসিক 'যুগের আলো' বার্ম্মা থেকে পরিচালিত মাসিক 'যুগের আলো', 'সাপ্তাহিক সম্মিলনী' ও এই 'পূরবী' আলম পরিবারের স্বদেশ ও বাংলা সাহিত্যপ্রীতির নিদর্শণ। 'সম্মিলনী' ও মাসিক 'যুগের আলো', শামস্থল আলমের আত্মিক ও আর্থিক প্রেরণায় পরিচালিত হ'ত। বাংলাদেশের অন্যান্য পত্রিকা থেকে এই পত্রিকাগুলির বৈশিষ্ট অনুসন্ধিৎসু মাত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মুসলমান পরিচালিত পত্রিকাগুলির একটা মস্তবড় গলদ এই যে তাদের সুরে কথাবার্ত্তায় একটা diffidence ও seclusion ভাব সব সময় ফুটে ওঠে—তাঁরা সমগ্র দেশের হয়ে কথা বলেন না, হয়ত তাঁরা সমগ্র দেশের হয়ে ভাবতেও চান্ না। ফলে যেখানে মুসলমানরা সংখ্যায় শত করা আশি নব্বই জন ও শিক্ষা দীক্ষায় অগ্রসর সেখানেও যে কোন ব্যাপারে তাঁরা এই diffidence ও seclusion মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়ে নিজেদের খর্ব্ব ও সমগ্র দেশকে দুর্ব্বল করছেন। শুধু রাজনৈতিক অনুষ্ঠান নয়; মুসলমানদের অন্য সব আয়োজন অনুষ্ঠানও এইভাবে খণ্ডিত ও সমগ্র দেশের যোগসূত্র থেকে বিচ্ছিন্ন। এটা আত্মদৌর্ব্বল্য ও আত্ম-বিশ্বাস-হীনতার পরিচায়ক বলেই মনে হয়। বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও মুসলমানরা এই সঙ্কীর্ণ ও বিচ্ছিন্ন মনোবৃত্তির পরিচয় কেন দিচ্ছেন, খুঁজলে হয়ত কারণের অভাব হবে না,—কিন্তু সেই সব কারণ দূর করার উপায় হচ্ছে দেশের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে সমগ্র দেশ সম্বন্ধে ভাবা ও সমগ্র দেশের হয়ে কথা বলা। 'সম্মিলনী' 'যুগের আলো' ও 'পূরবীর' এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই জন্ম—এবং এই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই এইগুলি

পরিচালিত হয়েছে ও হচ্ছে। এই উদার ও সার্ব্বজনীন দৃষ্টি ভঙ্গির মূল-উৎস ছিলেন শামসুল আলম—কনিষ্ঠেরা এই বিদগ্ধ মানস-পরিমণ্ডলের যোগ্য উত্তরাধিকারী।

চিন্তা ভাবনার রাজ্যে শামসুল আলম গতানুগতিক ও ধরা-বাঁধা পথের পথিক ছিলেন না। সামাজিক ও ধর্ম্মীয় বহু অযৌক্তিক অনুষ্ঠানের তিনি কঠোর সমালোচক ছিলেন। ব্যবহারিক জীবনে কিন্তু তিনি খুব খেয়ালী ও অনেকখানি কল্পনা-বিলাসী ছিলেন। বিদেশ থেকে যারা বার্ম্মায় যান, তাদের মুখ্য কাম্য হয় বার্ম্মার ধনসম্পদ--ভাগ্যান্বেষণে বার্ম্মায় গিয়ে শামসুল আলম মুখ্য কাম্য করেছিলেন বার্ম্মার হৃদয়-সম্পদ—অন্ন চিন্তা ছেড়ে করেছিলেন তিনি অন্য চিন্তা। তাই মাতৃভূমির জন্যে বার্ম্মার অর্থ-সম্পদ তিনি ভাণ্ডার পূর্ণ করে আনতে পারেন নি বটে, কিন্তু মাতৃভাষার অক্ষয় ভাণ্ডারে বার্ম্মার হৃদয়-সম্পদকে, বার্ম্মার প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যকে ধরে রাখার কিছু সফল চেষ্টা তিনি করেছেন। ধর্ম্মান্ধদের অন্ধ ছুরিকা এই নিরীহ সাহিত্য-সেবীর উপর উদ্যত না হ'লে বাংলা সাহিত্য অনেক অভিনব ঘটনা, অভিনব ছবি ও অভিনব চরিত্রের দ্বারা সমৃদ্ধতর হ'তে পারত। মনে হয় সুধী, উদার মনা ও বিদগ্ধ-চিত্ত শামসুল আলম সাহেবের মৃত্যুতে বাংলাদেশ বার্ম্মায় তার একজন যোগ্য প্রতিনিধিকে হারালো; আর বার্ম্মা হারালো তার এক সমজদার হৃদয়বান দরদী বন্ধুকে, তার জীবন সৌন্দর্য্যের চিত্রকর ও অতীত ঐশ্বর্য্যের এক নিষ্ঠাবান উদ্‌গাতাকে।

যে নিয়মটা চলিয়া আসিয়াছে অথবা চলিতেছে তাহাই প্রথা। সাধারণ মানুষের জীবন এ প্রথার চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ; তাহাকে ডিঙ্গাইয়া চলা তাহার পক্ষে সাধ্যাতীত। কিন্তু প্রতিভাবান মানুষ বীর্য্যবানচিত্ত, কখনও প্রথার দাসত্ব স্বীকার করেনা---সে নিজের জ্ঞানবুদ্ধির আলোকে নিজের পথ নিজে তৈয়ার করিয়া লয়, তাহার নব নব সৃষ্টির আলোকে অতীতের অকেজো প্রথা যাহা শুধু কালের দীর্ঘতার ধ্বজা ধরিয়া মানুষের মনের উপর মুরুব্বিয়ানা করিতেছে, নিস্প্রভ হইয়া যায়। সাধারণ মানুষ অনুকরণ করে, বিচার করিবার শক্তি তাহার নাই; তাই যখন কোন নূতন সমস্যা উদয় হয় তখন সে প্রথা, tradition নিয়ম ইত্যাদির দোহাই পারে, কিন্তু সবল-চিত্ত মানুষ প্রথার মোহ এড়াইয়া চলে, তার জ্ঞানের কষ্টিপাথরে সে দোষ গুণ যাচাই করিয়া লয়, তার সৃজনী শক্তি জীবনের বিচিত্র ভঙ্গিমায় সময়োপযোগী পথ কাটিয়া লয়। প্রথার উর্ণনাভের মধ্যে যাহারা জড়াইয়া আছে তাহাদের পক্ষে যেখানে দাঁড়াইয়া আছে সেখান হইতে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া বা নূতন কিছু সৃষ্টি করা একেবারে অসম্ভব। যুগে যুগে দেখা গিয়াছে পৃথিবীতে যে সমস্ত মহাপুরুষ, মনীষী, প্রতিভাবান, নূতন সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাদিগকে দেশকাল পাত্রের প্রথা কোন দিন বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই---সমস্ত বাধা বিপত্তির মধ্যেও তাঁহারা সব কিছুকে উপেক্ষা করিয়া নব নব প্রথার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। সাধারণ মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞান এবং কল্পনা কোন দিন এ সমস্ত বড় প্রতিভাকে বুঝিবার অনুকূল নয়—তাই লাঞ্ছনার জয়তিলক তাঁহাদের সবাইর জীবনকে মহিমান্বিত করিয়াছে। ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টাইয়া নজীর দিবার দরকার নাই। তবে যাঁহাদের চোখ আছে তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন —এ বিংশ শতাব্দীতেও মুসলমান সমাজে যাঁহারা এ প্রথার মোহ

এড়াইয়া একটু অগ্রসর হইতে চাহিতেছেন, তাঁহাদিগকে ভ্রষ্ট, কুপথগামী, নাস্তিক ধর্ম্মবিরোধী, উচ্ছৃঙ্খল ইত্যাদি হরেক রকমের উপাধি দিয়া তাঁহাদের গতিপথ রুদ্ধ করিবার অহেতুক চেষ্টা চলিতেছে। তবে এ কথা সত্য যে যাঁহারা আছাড় খাইবার ভয়ে একেবারে লেপমুড়ি দিয়া শুইয়া থাকিতে পছন্দ করেন অথবা জলে ডুবিবার ভয়ে জলের দিকে পিছ্‌ ফিরিয়া থাকিতে চান তাঁহাদের পক্ষে যেমন হাঁটা বা সন্তরন শিক্ষা অসম্ভব আমাদের সমাজেও যাহারা প্রথার চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া সমাজকে উন্নত করিবেন মনে করেন তাহাদের আশাও ঐ পর্য্যন্তই ফলবতী হইবে। চতুর্দ্দিক পাড় দিয়া পুকুর তৈয়ার করা যায়---নদী নয়। চতুর্দ্দিকের পাড় পুকুরের জলকে নিয়ন্ত্রণ করে কিন্তু তাহা নদীর জলকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না বরং নদীর গতি প্রবাহ নিত্য নূতন তীরের স্বষ্টি করিয়া বিচিত্র ভঙ্গিমায় ছুটিয়া চলে। আমাদের আশা নবীন মুসলমানের জীবন যেন প্রথার বেষ্টনে পুকুরের জলের মত গতিহীন হইয়া না পড়ে, এবং তার জীবন প্রবাহ যেন নিত্য, নূতন প্রথা স্বষ্টি করিয়া নূতন গতি প্রবাহে জীবনের বহু ভঙ্গিম চলচঞ্চল গতিতে ছুটিয়া চলে।

সীমাহীন সূচীভেদ্য অন্ধকার--হিম-শীতল তার পরশ।--সমস্ত আঁধার জমে বরফ হয়ে ধুক্ ধুক্ করে কাঁপছে--তারি বুকের পাঁজরা ভেদ করে আর্ত্তনাদ জাগে, ফরিয়াদ গুমরে ওঠে---আলো, আলো--

বিশ্বকর্ম্মা বলে উঠেন---আলো হউক।

আলো হয়--।

অন্ধকার হেসে ওঠে—সব যেন যৌবন ফিরে পায়।

বিশ্বকর্ম্মার কর্ম্মশালা গড়ে উঠে--সুদূর দিগন্ত রেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত অনন্ত নীলিমা---ধ্যানী শিল্পীর সৌন্দর্য্য রচনার কল্পলোক, স্বপ্নের পটভূমি।

তবুও তাঁর তৃপ্তি নেই---এই সৃষ্টিতে তাঁর সৃষ্টি ক্ষুধা যেন মেটে না। আলোকাধার বিরাটকায় সূর্য্যকে তাতে ছেড়ে দেন---তাকে ঘিরে কত বিচিত্র গ্রহ-উপগ্রহ চোখ মেলে পথ চলা আরম্ভ করে। দিনে সূর্য্যের আলো জ্বলে, রাত্রে চাঁদের হাসি ফোটে! অবাক-বিস্ময়ে স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মাও বুঝি কিছুক্ষণ চেয়ে থাকেন।

তবুও তাঁর বুকে নৈরাশ্যের হাহাকার, অতৃপ্তির ক্ষুধা।

তারপর সীমাহীন অথই জলরাশি থৈ থৈ করে নেচে ওঠে---ফেনিলোচ্ছ্বসিত উর্ম্মিপ্রহত অনন্ত বারিধির ঢেউএ ঢেউএ নৃত্য---সে এক দেখবার ব্যাপার--দেখে বিধাতার চোখও উজ্জ্বল হয় ওঠে। কিন্তু পরক্ষণে তাঁর চোখের বাতি নিবে যায়---নৈরাশ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে আসে তাঁর সর্ব অবয়বে। ধ্যানী পুরুষ আবার ধ্যানে বসেন।--

ধীরে ধীরে তরঙ্গায়িত সমুদ্রের বুকে দানা বাঁধে--মাটি মার সাদা মুখ ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে। জল-রেখাকে ছাড়িয়ে মাটি মাথা

উচু করে ওঠে---কিন্তু তার শুক রুক্ষ্ম মুখ দেখে বিশ্বকর্ম্মার তৃপ্তি হয় না।

বিশ্বকর্ম্মা আবার তাঁর স্বষ্টি-ধ্যানে চক্ষু নিমিলীত করেন।

পাহাড়-মাটি সব দেখ্‌তে দেখ্‌তে সবুজ হয়ে ওঠে—চারদিকে বিচিত্র সুন্দর ফুল হেসে ওঠে--জীবনের রস বর্ণ-গন্ধে ফল ভরে ওঠে। ফুল-ফলের সৌন্দর্য-সৌরভে বিশ্বকর্ম্মার ঠোঁটে হাসি ফোটে।

কিন্তু সে হাসি বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। এরা যে নিজের ইচ্ছায় কিছু করতে পারে না। নিজের স্বষ্টির অক্ষমতায় নিজেই তিনি অধোবদন হন।

আবার তাঁর স্বষ্টি তপস্যা শুরু হয়।

এবার পাখীর বিচিত্র গানে সমস্ত প্রকৃতি মুখরিত হয়ে ওঠে-- জলে স্থলে কত রং বেরঙ্গের জানোয়ার স্বষ্টি হয়। অদ্ভুত সব তাদের কণ্ঠস্বর, বিচিত্র তাদের গঠন--অপূর্ব তাদের চলন। সত্যি এবার বিশ্বকর্ম্মার মুখে হাসি আর ধরে যা। হয়ত সত্যিই এবার তাঁর অবসর মিলল।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে তাঁর সে হাসিও মিলিয়ে গেল,—এরা যে কিছু নতুন স্বষ্টি করতে পারে না--তিদি যা দিয়েছেন, তার বেশী এরা এক পাও এগোতে পারে না। নিজের স্বষ্টির অক্ষমতায় নিজের স্বষ্টি ক্ষমতার উপরই যেন তাঁর সন্দেহ হয়।

তিনি আবার ধ্যানস্থ হন।

মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেটে যায়--এবার সত্যিই তাঁর চোখে মুখে জ্যোৎস্না ফুটে ওঠে। নিজের এতদিনের কার্পণ্য ও অনুদারতার জন্য লজ্জায় তাঁর মুখ লাল হয়ে ওঠে—নিজের স্বষ্টিকে স্বষ্টি ক্ষমতা না দিলে তারা যে চিরদিন অসহায় হয়েই থাকবে।

তাই এবার স্বষ্টি হল মানুষ--বিধাতার প্রতিনিধি।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে বিধাতার পৃথিবী নতুন সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হয়ে উঠল। জলে-স্থলে, আকাশে বাতাসে চলল মানুষের স্বষ্টির অভিযান--- ঘরে ঘরে জ্বলে উঠল ক্ষুদে সূর্য ও চাঁদ।

এবার কণ্ঠস্বর হল ভাষা, ভাষা হল সঙ্গীত! বাঁশ হল বাঁশী--মাটি হল 'মেডোনা'--পাথর হল তাজমহল!—আরও কত কী! এতদিনে বিশ্বকর্ম্মার মিলল অবসর--তাঁর চোখে মুখে ফুটে উঠল পরিপূর্ণ আনন্দ ও তৃপ্তির হাসি!!

১৯৩১

ধর্ম্ম

উৎসর্গ

আমার পিতা

মরহুম মওলানা ফজলর রহমান সাহেবের পবিত্র স্মরণে

যাঁর জীবনে

কোরাণের বাণী পেয়েছিল রূপ

কৈফিয়ৎ

একদা কোরাণের সমাসমুদ্রে ডুব দেওয়ার দুঃসাহস আমি করেছিলাম। দুঃসাহস এই কারণে যে, এই কাজের যোগ্যতা ও জ্ঞান দুই-ই আমার অত্যন্ত পরিমিত ও সঙ্কীর্ণ। ফলে রত্ন যা আহরণ করতে পেরেছি তার চেয়েও বেশী হয়ত রয়ে গেছে সেই রত্না-করের গর্ভে। তবুও এই সংগৃহীত রত্ন-কণাগুলি পাঠক দরবারে এই আশা নিয়েই পেশ করা গেল যে তাঁরা নিজেরা হয়ত জ্ঞানের এই মহাসমুদ্রে ডুব দেওয়ার তাগিদ্ এই রচনাগুলিতেই পাবেন। জিজ্ঞাসু-চিত্তে যদি কেউ জ্ঞানের এই মহাসমুদ্র মন্থনের তক্‌লিফ্ স্বীকার করেন, জোর করে বলা যায়, তাঁর পরিশ্রম ব্যর্থ হবে না। তবে নিজের বুদ্ধিকে মুক্ত ও মনকে খোলা রাখ্‌তে হবে। বলা বাহুল্য, যে কোন জ্ঞান-সাধকের পক্ষে এ'দুটি প্রথম ও শেষ সর্ত্ত।

ইসলাম স্বাভাবিক, বাস্তব ও ব্যবহারিক জীবনেরই ধর্ম্ম। কাজেই ব্যবহারিক জীবনের কথা ও নির্দ্দেশই কোরাণে স্থান পেয়েছে সব চেয়ে বেশী। উচচতর ও গভীরতর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ব্যক্তিগত সাধনা ও ধ্যান-ধারণাতেই সীমাবদ্ধ। সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সেই সাধনা ও তার উপলব্ধি দুই-ই নানা কারণে অসম্ভব। বলা নিষ্প্রয়োজন ব্যতিক্রম কখনো সাধারণ নিয়মের মর্য্যাদা পেতে পারে না।

সর্ব্বসাধারণ মুসলমানের জীবনে কোরাণের রয়েছে এক মহৎ ও বিশিষ্ট স্থান। তবুও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আজ কোরাণের শিক্ষা পৃথিবীব্যাপী মুসলমানের জীবনে বড় শোচনীয়রূপেই ব্যর্থ। কেন এমন হল? কেন এমন হচ্ছে? এই কেন'র কিছুটা উত্তর আমার অনুবাদগুলিতে ও স্থানে স্থানে আমি যে সব সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করেছি, অনুসন্ধিৎসু পাঠক হয়ত তাতেই খুঁজে পাবেন।

আমাদের জীবনে, খুব সাধারণ একটি বড় ত্রুটি এই লক্ষ্য করা যায় যে আমরা কোরাণের আক্ষরিক পরিচয়, পাঠ ও আবৃত্তির উপর, তার ভাষা ও শব্দের উপর যত জোর দিয়ে থাকি তার অর্থ, মর্ম্মগ্রহণ ও উপলব্ধির উপর শতাংশের একাংশও জোর দিইনা। ফলে এলেম্ কিছুটা আমাদের হাসিল হলেও আমল কিছুই হয়না। অথচ জীবনের বিকাশ ও সৌন্দর্য্য নির্ভর করে আমলের উপর।

অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থের মত কোরাণেও স্থান লাভ করেছে বহু রূপক ও প্রতীকের প্রয়োগ, শুধু শব্দগত অর্থ করলে রূপক ও প্রতীকের মর্ম্মগ্রহণ কিছুতেই সম্ভব নয়। আরব জাতি ও আরবী ভাষার একটি বিশেষ লক্ষণ অলঙ্কারের বহুল প্রয়োগ---কোরাণেও ঘটেছে আলঙ্কারিক ভাষার ব্যাপক ব্যবহার। ভাষার অলঙ্কারকে ডিঙিয়ে পাঠককে পৌঁছতে হবে অর্থের মর্ম্ম-লোকে এবং উপলব্ধি করে তা জীবনে করতে হবে প্রয়োগ ও দিতে হবে রূপ। এই না হলে যে-কোন ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও তার শিক্ষা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

জীবনকে বাদ দিয়ে নিছক আধ্যাত্মিকতার স্থান ইসলামে বিশেষ আমল পায়নি। মানব-জীবনের মূল্যবোধ কোরাণে বার বারই স্বীকৃত হয়েছে। মানুষকে বলা হয়েছে, 'আশরাফুল মখ্‌লুকাৎ'---স্বষ্টির শ্রেষ্ঠতম এবং দেওয়া হয়েছে তাকে পূর্ণ স্বাধীনতা। "আল্লাহ্‌ মানুষের কোন ক্ষতি করেন না, মানুষ নিজেই নিজের ক্ষতি সাধন করে।" কোরাণের এই মন্তব্যও বিশেষ অর্থপূর্ণ। জীবনের যত ব্যাপক ক্ষেত্রে কোরাণের নির্দ্দেশ মিল্‌বে অন্য কোন ধর্ম্মগ্রন্থে জীবনের অর্থাৎ দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের অত ব্যাপক ও সুনির্দ্দিষ্ট নির্দ্দেশ মিল্‌বে কিনা সন্দেহ। গভীরতর আধ্যাত্মিক তত্ত্বে কোন কোন ধর্ম্মগ্রন্থ অধিকতর সমৃদ্ধ হতে পারে কিন্তু বাস্তব জীবন-জিজ্ঞাসা কোরাণের মত অত ব্যাপকভাবে আর কোথাও স্থান পায়নি। সাধারণতঃ নব ধর্ম্ম অনুদার ও সঙ্কীর্ণ হয়ে থাকে, কিন্তু কোরাণের দৃষ্টিভঙ্গি বিস্ময়করত্নপে উদার। পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক ও ধর্ম্মগ্রন্থকে মেনে নেওয়ার স্পর্শ নির্দ্দেশ দিয়ে কোরাণ উদারতা ও জ্ঞানের পথকে করেছে সুগম। কোরাণের একটি সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ ঃ "আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আমরা বিশ্বাস করি এবং তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল তাতেও আমরা বিশ্বাস পোষণ করি।" এইভাবে কোরাণ সব সত্য, সব শিক্ষা ও সব জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার নির্দ্দেশ দিচ্ছে এবং যেখানে যা কিছু ভাল, যা কিছু মহৎ ও যা কিছু গ্রহণীয় ও শিক্ষণীয়, তা গ্রহণের জন্যে দিচ্ছে সুস্পষ্ট তাগিদ্‌। অন্ধ প্রতিযোগিতার পরিবর্ত্তে কোরাণ সহযোগিতারই প্রচারক, শুধু সৎকার্য্যের বেলায় প্রতিযোগিতা পেয়েছে কোরাণের অনুমোদন।

কোরাণের পাঠককে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে হবেঃ কোরাণে উপাসনা ও বিশ্বাসের কথা যখনি বলা হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে সৎকর্ম্মেরও নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঐসলামিক জীবন-ধারণায় সৎকর্ম্ম থেকে বিচ্ছিন্ন বিশ্বাস বা উপাসনা মূল্যহীন। বিশ্বাস ও উপাসনা যে-কোন মানুষের মনকে করে তোলে শ্রদ্ধাশীল ও বাড়ায় মনের

গ্রহণ শক্তি বা Receptive Power। বিশ্বাস ও উপাসনার এইটিই সব চেয়ে বড় ও সাক্ষাত ফল।

বলেছি ইসলাম সামাজিক মানুষের ধর্ম্ম। তাই কোরাণে সৎকর্ম্ম অর্থে সামাজিক কর্ত্তব্য পালনের উপরই দেওয়া হয়েছে জোর। কোরাণ বর্ণিত সৎকর্ম্মগুলির সেরা সৎকর্ম্ম হচ্ছে দান-খয়রাৎ অর্থাৎ মানুষের দুঃখের অংশ গ্রহণ। সমাজ-বিচ্ছিন্ন আত্ম-কেন্দ্রিক সন্ন্যাসের স্থান ইসলামে নেই। "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়" ইহা ইসলামের অন্যতম মর্ম্ম কথা।

কোরাণের আর একটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও লক্ষণীয় তাগিদ্ হচ্ছে—জ্ঞানের প্রতি। শুধু কেতাবী জ্ঞান নয়, বিশ্বজ্ঞান তথা প্রকৃতি-বিজ্ঞানের প্রতি কোরাণ বার বারই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে মানুষের। বলা হয়েছে—'যারা জ্ঞানী ও যাদের আছে বোধশক্তি তারাই বুঝতে পারবে কোরাণের অর্থ ও তার ইঙ্গিত।' অথচ কোরাণ ও হাদিসের সুস্পষ্ট আদেশ, নির্দ্দেশ ও ইঙ্গিত সত্ত্বেও আজ মুস্‌লিম জগত জ্ঞানের প্রতি বিমুখ। ফলে পৃথিবীব্যাপী তারা আজ যাপন করছে এক শোচনীয় অধঃপতিতের জীবন। এই অধঃপতন থেকে উদ্ধারের একমাত্র উপায়---জ্ঞান, জ্ঞানের সাধনা, মনে প্রাণে সব রকম প্রাচীন ও আধুনিক জ্ঞানকে গ্রহণ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস কোরাণের ছাত্র ও পাঠককেও আধুনিক জ্ঞানে জ্ঞানী হতে হবে। কোরাণ হাদিসের আলোর সঙ্গে যদি আধুনিক জ্ঞানের আলোক সমন্বয় ঘটে তা হলেই কোরাণ শিক্ষার্থীরাও জাতীয় জীবনে এক সার্থক ভূমিকা পালন করতে পারবে। অন্ধের কাছে সহস্র বৈদ্যুতিক আলোক-রশ্মিও ব্যর্থ, কিন্তু যার আছে দৃষ্টিশক্তি একমাত্র সে-ই বুঝতে পারে আলো-অন্ধকারের পার্থক্য, সে-ই গ্রহণ ও কাজে লাগাতে পারে যে-কোন আলোক-রশ্মি। তাই আমি মনে করি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো নিয়ে যে কোরাণ অধ্যয়ন করবে কোরাণের যথার্থ মর্ম্ম সে-ই ভাল ভাবে গ্রহণ ও উপলব্ধি করতে পারবে। আজকের দিনে মুসলমানের সাম্‌নে এই একটি মাত্র পথ ও এই একটি মাত্র আদর্শই বিরাজ করছেঃ আধুনিক জ্ঞানকে গ্রহণ করা এবং সেই জ্ঞানের আলোক বর্ত্তিকা হাতে নিয়ে কোরাণ, হাদিস ও ইতিহাস সব কিছুকে অধ্যয়ন, যাচাই ও উপলব্ধি করা, এক কথায় বিচার করে গ্রহণ করা। গ্রহণ ছাড়া বিচারের যেমন কোন মূল্য নেই, তেমনি বিচার ছাড়া গ্রহণও যে শুধু মূল্যহীন তা নয় বরং স্থান কাল ও পাত্র বিশেষে তা হয়ে পড়ে মারাত্মক। আর এও মনে রাখা দরকার, জ্ঞান ও অন্ধ-বিশ্বাস হচ্ছে পরস্পরের জানী দুশ্‌মন্, একের সঙ্গে অপরের আপোষ বা

সমঝোতা কখনো সম্ভব নয়। তাই সর্ব্বাগ্রে হতে হয় মুক্ত-বুদ্ধি। তা হলেই কোরাণ বর্ণিত বিশ্বমানব ধর্ম্মের সঙ্গে আধুনিক বিশ্বজ্ঞানের হতে পারবে সার্থক পরিণয়। এই পরিণয়ের ফলে মুসলমান সমাজেও জন্মলাভ করবে আদর্শ মানুষ—ইন্‌সানে কামেল। যে-মানুষ শুধু বিশ্বাসী বা উপাসক নন্, একাধারে জ্ঞানী, কর্ম্মী, বিবেচক, সুবিচারক, সংযতেন্দ্রিয় এবং শান্তির রক্ষক ও বাহক। 'ইসলাম শব্দের অর্থ শান্তি, বলাই বাহুল্য ইসলামের অনুবর্তীদেরও হতে হয় শান্তিকামী ও শান্তিবাদী। আল্লার যে সব নামের উল্লেখ করা হয়, তারও অর্থের প্রতি তাকালে দেখা যাবে প্রত্যেকটি নামই গুণবাচক ও কোন না কোন সি'ফত বা গুণের দ্যোতক। ভক্তের পক্ষে সেই নাম জিকির বা জপের কোন সার্থকতাই নেই, যদি না তিনি সেই নামের অন্তর্নিহিত গুণকে আয়ত্ত করার চেষ্টা করেন। আল্লার যে-সব গুণের কথা বলা হয়েছে, সেই সব গুণে গুণী অর্থাৎ আল্লার গুণে গুণান্বিত হওয়ারই নাম ইসলাম, অন্য কথায় ইন্‌সানিয়েত বা মনুষ্যত্ব। মানুষের জন্যে ইহাই শ্রেষ্ঠতম সাধনা, এই সাধনার সাধক বলেই মানুষ আশরাফুল-মখ্-লুকাৎ—সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম। 'কোরাণের বাণী' এই সাধনারই ইঙ্গিত বহন করে এবং ইহাই ঐসলামিক জীবন-বাদ বা জীবন-দর্শন।

*　　　　*　　　　*

ক্ষুদ্র বৃহৎ ১১৪টি সুরা বা খণ্ডে কোরাণ বিভক্ত এবং প্রত্যেক সুরায় আছে অনেকগুলি আয়াৎ বা শ্লোক। এই গ্রন্থে অর্থ ও ভাবার্থকে কিছুমাত্র বিকৃত না করে, যথা সম্ভব মুক্তভাবে, প্রত্যেক সুরা থেকে নির্বাচিত আয়াতের তরজমা ও সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন আয়াতের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাও দেওয়া গেল। বলা বাহুল্য এই সব অনুবাদ বা ভাষ্য কোন বিশেষজ্ঞের নয়, সাধারণ একজন পাঠক নিজের বুদ্ধি ও হৃদয় দিয়ে যতটুক গ্রহণ করতে পেরেছে, এ-গ্রন্থ বহন করছে তার-ই মাত্র যত কিঞ্চিৎ পরিচয়। যে-কোন ধর্ম্মগ্রন্থ তার মূল ভাষায় সীমাবদ্ধ হয়ে থাক্‌লে তা কখনো জনগণের সামগ্রী হতে পারে না। যতদিন বাইবেল হিব্রু ভাষার নিগড়ে আবদ্ধ ছিল ততদিন তা শুধু পাদ্রীদেরই একচেটিয়া সম্পত্তি ছিল। কিন্তু হিব্রুর নিগড় মুক্ত হয়ে ইংরেজী ভাষার বাহনে বাইবেল আজ প্রচার লাভ করেছে পৃথিবীর সর্বত্র এবং ইংরেজী শিক্ষিত মহলে লাভ করেছে একাধারে ধর্ম্মগ্রন্থ ও সাহিত্যের মর্য্যাদা।

কোরাণের বাণী সুকঠিন আরবী ভাষায় বন্দী হয়েই রয়েছে। আরব দেশের বাইরে অধিকাংশ লোকের পক্ষে সেই ভাষা বুঝবার মত করে আয়ত্ত করা কখনো সম্ভব

নয়। ফলে অধিকাংশ মুসলমানও কোরাণের বাণী ও শিক্ষা থেকে চির মাহ্‌রূম্‌ থাকে। কোরাণের বাণী জনগণের মাঝে প্রচার করতে হলে তাকেও বিদেশী ভাষার অবগুণ্ঠন ত্যাগ করে গ্রহণ করতে হবে লৌকিক বা দেশের সাধারণ মানুষের মাতৃ-ভাষার বাহন। শুধু মুষ্টিমেয় আরবী-জানা লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বাংলা ভাষাবাহী হয়েই কোরাণের বাণী বাংলাদেশের ঘরে ঘরে প্রচার লাভ করুক, দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ুক কোরাণের শিক্ষা ও মর্ম্মবাণী ঃ এই উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থের অবতারণা। তাই মূল আরবী এই গ্রন্থে দেওয়া হয়নি। আরবী আয়াত বে-অজু অবস্থায় পড়া নিষেধ। অমুসলমানদের মধ্যে কোরাণের ব্যাপক প্রচারের ইহাও একটি বড় অন্তরায়। এই গ্রন্থ অনায়াসে অমুসলমান পাঠকেরাও ব্যবহার করতে পারবেন; অধ্যয়ন করতে পারবেন; এবং অমুসলমান শিক্ষকেরাও অসঙ্কোচে পড়তে ও পড়াতে পারবেন এ বই। আজ মানুষের জীবনের গতি গেছে বেড়ে, জটিলতর হয়েছে জীবন সংগ্রাম—খুব কম লোকের ভাগ্যেই জোটে গৃহের শান্তিময় নির্ঝঞ্ঝাট অবসর অধিকাংশ মানুষকে আজ জীবিকার ধান্ধায় ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে এখানে ওখানে রেলে ষ্টিমারে বিমানে মোটরে ট্রামে-ট্রাকে, সব সময় অজু করা বা রক্ষার সুযোগ সুবিধা অনেকের এক রকম নেই বল্লেই চলে। মূল আরবী না থাকাতে সেই রকম অবস্থায়-ও এই বই যে-কোন অনুরাগী পাঠকের সঙ্গী হতে পারে।

যদি কেউ মূলের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চান তাঁদের সুবিধার জন্যে শিরোনামায় সুরার ক্রমিক নম্বরসহ নাম ও পার্শ্বে আয়াতের সংখ্যা দেওয়া হল। উদ্ধৃতি বোধক দুই কমার মাঝখানে যা লেখা হয়েছে তাই আয়াতের অনুবাদ বা মর্ম্মানুবাদ। তার বাইরের রচনা অনুবাদকের মন্তব্য। বলা বাহুল্য, মুদ্রাকর প্রমাদে কোথাও কোথাও উদ্ধৃতি বোধক কমা চিহ্ন পেয়েছে লোপ। আরবী বাক্যবিন্যাস ও রচনা ভঙ্গি বাংলা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। হুবহু আরবী রচনা ও বচন ভঙ্গি অনুসরণ করতে গেলে তা যেমন হবে না বাংলা, তেমনি তার মর্ম্মোদ্ধারও হবে দুরূহ। বলা বাহুল্য এই তরজমা করা হয়েছে বাংলায়, তা করতে গিয়ে বাংলা ভাষার স্বভাবকে লঙ্ঘন করার অপচেষ্টা কোথাও করা হয়নি, তা করা হলে তা না হত আরবী, না হত বাংলা, সেই বিড়ম্বিত ভূমিকা যে-কোন রচনার জন্যই অবাঞ্ছিত।

কোরাণ যাঁরা নিয়মিত তেলাওয়াৎ করেন তাঁদের সুবিধার জন্য তাঁরা দিনে নির্দ্দিষ্ট অংশ পাঠ করে মাসে অর্থাৎ ত্রিশ দিনে যাতে কোরাণ একবার খতম করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে কোরাণকে সমান ত্রিশ খণ্ডেও ভাগ করা হয়েছে এবং এ রকম এক একটি ভাগকে সিপা'রা বা শুধু পা'রা বলা হয়। বলা বাহুল্য, এই বিভাগ অনেকটা কৃত্রিম,

কারণ অনেক ক্ষেত্রে সুরার মাঝখানেই পা'রা-র সীমারেখা টানতে হয়েছে। যেমন প্রথম পা'রা শেষ হয়েছে দ্বিতীয় সুরার ১৪১ আয়াতে এসে। এই একই উদ্দেশ্যে 'রুকু' হিসাবেও কোরাণের সুরাগুলি বিভাগ করা হয়। কয়েকটি আয়াৎ মিলে এক একটি 'রুকু' গঠিত। এই গ্রন্থে নিষ্প্রয়োজন বলে পা'রা বা 'রুকু' বিভাগ নির্দেশ করা হয়নি, কারণ এই বই তেলাওয়াতের উদ্দেশ্যে রচিত নয়।

আজ চতুর্দ্দিকে ইসলামী শিক্ষা ও মুসলিম রাষ্ট্রের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। মুসলিম জীবন ও ইসলামী রাষ্ট্রাদর্শের মূল বুনিয়াদ হচ্ছে কোরাণ। কাজেই কোরাণেই পাওয়া যাবে তার প্রকৃত স্বরূপ। এই দিক থেকেও কোরাণের পরিচয় গ্রহণ বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষেই আজ অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। এই গ্রন্থ সেই উদ্দেশ্য সাধনেও কিঞ্চিৎ সহায়তা করবে।

কোরাণের ইসলাম, যে-ইসলামকে হজরত মোহাম্মদ নিজের জীবনে রূপ দিয়েছেন ও করেছেন প্রচার, তাতে আল্লার আসন সর্ব্বোচ্চে---সেই আল্লাহ দ্বিতীয়-বিহীন একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, তিনি কারো থেকে জন্ম নেন্‌নি, তাঁর থেকেও কেউ জন্ম নেয়নি, তিনি সর্ব্বগুণের আধার অথচ তিনি নিরাকার, তাঁর কোন আকার কল্পনা করা, তাঁর গুণের প্রতীক বা প্রতিমা নির্ম্মাণ ইসলামে নিষেধ, কঠোরভাবেই নিষেধ। এই বিষয়ে ইসলাম একেবারে আপোষহীন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত মুসলমানের জীবনে এই আল্লাহ্‌-কে মান্‌তে হয়, স্বীকার করতে হয়, তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেই জীবন যাপন করতে হয়। মুস্‌লিম-শিশুর জন্ম মুহূর্ত্তে তার কানের কাছে আল্লারই জয়ধ্বনি দিতে হয়, মুমূর্ষু মুসলমানকে আল্লার নাম নিয়েই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করতে হয় ও শোনাতে হয় তাকে আল্লার নাম। আল্লার নাম নিয়েই তাকে সমাধিস্থ করতে হয়। মুসলমানকে যে কোন কিছু আরম্ভ করতে হয় আল্লার নাম নিয়ে, সুখ ও গৌরবের দিনে জয়ধ্বনি দিতে হয় আল্লার, বিস্ময় প্রকাশ করতে হয় আল্লার পবিত্রতা ঘোষণা করে। আনন্দ প্রকাশ কর্‌তে হয় আল্লার প্রশংসা করে। মানুষকে উপাসনায় ডাকে সে আল্লার নামে, কারো মৃত্যু সংবাদ শুনে সে বলে উঠে---আমরাও আল্লার জন্য, আল্লার দিকেই আমরা ফিরে যাবো। আল্লার নামে জবেহ্‌ না হলে কোন পশু-পাখীর মাংস মুসলমানের জন্য হালাল হয় না, ভবিষ্যতের যে কোন অঙ্গীকার তাকে আল্লার নাম নিয়েই করতে হয়---ইন্‌শাল্লাহ্‌ যদি আল্লার অভিপ্রেত হয়, এই বলে। মোট কথা আল্লায় আত্ম-নিবেদনই ইসলাম ও মুসলিম-জীবন।

ইসলাম সামাজিক মানুষের ধর্ম্ম, সমাজ ত্যাগের কোন পরামর্শ ইসলাম মানুষকে দেয়নি, সমাজত্যাগী মানুষের প্রতি ইসলাম কখনো প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাকায়নি। ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকদের মধ্যে একমাত্র হজরত মোহাম্মদই পূর্ণ সামাজিক জীবন যাপন করেছেন। সামাজিক জীবনের ভিত্তি হল নিজের সঙ্গে পরের সম্বন্ধ নির্ণয়---এই সম্বন্ধ নির্ণয়ে ভুল হলে, ধৈর্য্যহীনতা ও অসামঞ্জস্য ঘটলে বিপদ অনিবার্য্য। পৃথিবীর বড় বড় মহাযুদ্ধ থেকে ঘরোয়া দাম্পাত্য কলহ পর্য্যন্ত সব বিপর্য্যয়ের মূলেই রয়েছে এই সম্বন্ধ নির্ণয়ের

গোলমাল। হজরত মোহাম্মদ নিজেকে বলেছেন, আল্লার বাণী-বাহক। এই বাণীর মারফৎ মানুষকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক সম্বন্ধ নির্ণয়ের অর্থাৎ জীবনযাত্রার আদর্শ নির্দ্দেশ করা হয়েছে এবং এই বাণীর ভিতর দিয়ে রূপ লাভ করেছে বাণীদাতার পরিচয় অর্থাৎ তাঁর আদেশ-উপদেশ, পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদির পরিচয়। মানুষের প্রতি আল্লার গুণে গুণান্বিত হওয়ার আদেশ কোরাণে ও হাদিসে বহুবার বহু জায়গায় করা হয়েছে। আল্লার কি সব গুণ এবং মানুষের জন্য কি সব জীবন-বাণী কোরাণে ধ্বনিত হয়েছে তার পরিচয় হয়ত আজকের পরস্পরবিরোধী জীবন-দর্শনের সংঘাতে জর্জ্জরিত বিব্রত ও বিক্ষুব্ধ মানুষের সামনে একটি সুষ্ঠু ও সুস্থ পথের ইঙ্গিত দিতে পারবে। যে-আল্লায় বিশ্বাস ছাড়া এবং যে-আল্লার নির্দ্দেশিত পথের অনুসরণ ছাড়া মোমেন হওয়াই যায় না, মুসলিমের জীবন কেন্দ্র সেই আল্লার ও তাঁর নির্দ্দেশ-পথের ধারণা কিভাবে মুসলমানের ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণে রূপ লাভ করেছে, অনুসন্ধিৎসু মাত্রেরই এই বিষয়ে কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক। ধর্ম্মের কোন ভৌগোলিক সীমা থাক্‌তে পারে না, ইসলামেরও নেই, পৃথিবীর এমন কোন দেশ, এমন কোন জাতি নেই যেখানে বা যাদের দ্বারা ইসলাম গৃহীত হয়নি, তাই ইসলামকে বলা হয় বিশ্ব-ধর্ম্ম। বিশ্বমানবতার উপরই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, বিশ্বমানবতাবর্জ্জিত ধর্ম্ম কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। ইসলামে বিশ্বমানবতা অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকারের সঙ্কীর্ণতা বর্জ্জিত মানব-ধর্ম্ম কতখানি স্থান লাভ করেছে তারও পরিচয় পাওয়া যাবে কোরাণে। কাজেই কোরাণেই পাওয়া যাবে, ইসলাম মানুষের জন্য যে-জীবন কাম্য মনে করে ও যে-জীবনের আদর্শ মানুষের সাম্‌নে ইসলাম স্থান করতে চায় তার পরিচয় ও নির্দ্দেশ। পরবর্ত্তী পৃষ্ঠাগুলিতে মানব জীবনের আদর্শ নির্দ্দেশক কিছু কিছু আয়াতের পরিচয় ও ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

১ : সুরা ফাতেহা

কোরাণে যে-আল্লার কথা বলা হয়েছে তিনি শক্তিমান ও পাপের দণ্ডদাতা নিশ্চয়ই, কিন্তু তিনি একাধারে দয়ালু ও দয়াময়---রহিম ও রহমান। কোরাণের প্রত্যেক সুরার আরম্ভে, মুসলমানদের প্রত্যেক উপাসনার গোড়ায়, এমন কি প্রত্যেক কর্ম্মের শুরুতে যে-আল্লার নাম নেওয়ার নির্দ্দেশ আছে, সেই আল্লার অন্য গুণের পরিবর্ত্তে তিনি যে দয়ালু ও দয়াময় এই কথাই বার বার করে বলা হয়েছে। বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহিম—আমি সেই আল্লার নামে আরম্ভ কর্‌ছি যিনি দয়ালু ও দয়াময়—মুসলমানকে এই বলে সব কাজ আরম্ভ করতে হয়।

কোরাণের মুখবন্ধ যে-সুরা ফাতেহায় করা হয়েছে এবং যে-সুরা প্রতি নামাজের প্রতি রাকাতে পড়া আবশ্যিক, অবশ্য পঠনীয়, না পড়লে নামাজই হবে না এবং যাকে কোরাণের সারমর্ম্ম বলেও অভিহিত করা হয়, সেই সুরাতেও সর্ব্বপ্রথম প্রশংসা করা হয়েছে বিশ্ববিধাতার, যে-বিশ্ববিধাতা দয়ালু ও দয়াময় এবং উপাসক ঐ আল্লারই উপাসনা করছেন, তাঁর কাছেই প্রার্থনা জানাচ্ছেন সোজা ও সরল পথ প্রদর্শনের জন্যে, অর্থাৎ যে-পথ অভ্রান্ত, যে-পথে কল্যাণ ও মঙ্গল রয়েছে সেই পথে উপাসককে পরিচালিত করার জন্যে। এই সুরা পাঠ করার পর প্রতিবারই বল্‌তে হয়--আমীন,—আমার এই প্রার্থনা কবুল হউক!

যত রকমের নামাজ আছে প্রতি নামাজের প্রতি রাকাতে উপাসককে এই সুরা আবৃত্তি করতে হয়,—এই প্রার্থনা তার উপাস্যের কাছে জানাতে হয়। উপাস্য যেখানে দয়ালু ও দয়াময়, সেখানে উপাসকের সাধনা তার বিপরীত হতে পারে না, যেখানে প্রার্থনা জানানো হচ্ছে সত্য ও কল্যাণের, সেখানে বিপরীত সাধনা আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া আর কি! আত্মবঞ্চনা কখনো মানুষকে দিতে পারে না বিশ্বাসের শক্তি, আত্মপ্রবঞ্চক

কখনো হয় না সত্যের সেবক ও সাধক বা কল্যাণের বাহক। উপাসনা তার জীবনে একটি মৌখিক বুলি ছাড়া আর কিছুই নয়।

উপাসনার উদ্দেশ্য যদি উপাস্যের গুণে নিজেকে গুণান্বিত করে তোলাই হয়, তা হ'লে প্রত্যেক মোমেন মুসলমানকে দয়াগুণ আয়ত্ত করতে হবে অর্থাৎ দয়ালু হতে হবে, সরল ও সত্য পথের যাত্রী হতে হবে। আল্লার যে-গুণের কথা শুধু উপাসনার সময় নয়, শুধু কোরাণ বা ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠের সময় নয়, প্রতি কর্ম্মের গোড়ায় স্মরণ করতে হয় অর্থাৎ সংসারী মানুষের যা প্রতিনিয়ত স্মরণীয়, সে-গুণ উপাসক নিজের জীবনে যদি গ্রহণ না করে, অন্তত তা করবার যথাসাধ্য চেষ্টা না করে তা হ'লে তার উপাসনা কি করে ফল-প্রসূ হতে পারে? আল্লাহ্ যে-দয়ার কথা বলেছেন অর্থাৎ যে-দয়াগুণে তিনি দয়ালু, সেই দয়ায় কোন সঙ্কীর্ণতা নেই, সেই দয়া সর্ব্ব-মানবের প্রতি, সমস্ত সৃষ্টির প্রতি। এই উদার সার্ব্বজনীন বিশ্বব্যাপী দয়াই ইসলামের আদর্শ ও কোরাণের বাণী। যে কোন সঙ্কীর্ণতার মধ্যে দয়া শ্রী-ভ্রষ্ট, গৌরবহীন ও ঐশীগুণ–বিবর্জ্জিত, সুতরাং অশ্রদ্ধেয়।

দয়া, সত্য ও কল্যাণ---এই যদি মানুষের আদর্শ হয়, সমাজের প্রতি-মানুষ যদি এই সাধনাকে গ্রহণ করে, তা হ'লে মানুষের জীবনে এমন কোন সমস্যার কল্পনা করা যায় না, যা আপোষে, শান্তিতে মীমাংসা হতে পারে না। কোরাণ গোড়াতেই যে জীবন-দর্শন ও আদর্শ মানুষের সাম্নে স্থাপন করেছে তার ভিত্তি মহৎ-মনুষ্যত্ব সাধনার উপরই প্রতিষ্ঠিত এবং নিঃসন্দেহে তা শান্তি ও কল্যাণবাহী।

আয়াৎ ২ : ৩ : বলা হয়েছে---'যাঁরা ধার্ম্মিক, যাঁরা সংযমী, যাঁরা আল্লাকে অর্থাৎ পাপের দণ্ডদাতা আল্লাকে ভয় করে পাপ থেকে বিরত থাকেন, কোরাণ তাঁদের পথপ্রদর্শক। তাঁদের পরিচালক।'

কাজেই প্রকৃত ধার্ম্মিক হতে হলে, সংযমী হতে হবে, পাপের পথ থেকে দূরে সরে থাক্‌তে হবে। উপাসনা ইসলামের একটি প্রধান নির্দ্দেশ, এই নির্দ্দেশ কোরাণে বার বার দেওয়া হয়েছে, এই সূরার গোড়াতেও সর্ব্বপ্রথম এই নির্দ্দেশ দেওয়া হচ্ছে---'যারা উপাসনা করে, যারা আল্লার দান থেকে খরচ করে তাদের জন্য কোরাণ পথ-প্রদর্শক।' ইসলামের আল্লাহ্ দয়াময়, দয়ার সঙ্গে কৃপণতা বা স্বার্থপরতার সম্পর্ক থাক্‌তে পারে না, তাই এই খরচ শুধু ব্যক্তিগত সুখ ও আরাম-আয়াসে সীমাবদ্ধ থাক্‌লে চলবে না। আল্লার দান মানব-জীবনে অত্যন্ত ব্যাপক ও অসীম, পার্থিব অর্থসম্পদ, দৈহিক ও মানসিক শক্তি, প্রভাব ও ক্ষমতা সবই আল্লার দান, এই সব কিছু নিজের ও পরের মঙ্গলার্থে ব্যয় ও প্রয়োগ করতে হবে।

আয়াৎ ৯ : ১০ : মুখে এক মনে আর, এই আত্মপ্রবঞ্চনাকে নিন্দা করা হয়েছে। 'যারা এইভাবে নিজের মনকে ফাঁকি দিয়ে আল্লাকে প্রতারণা করতে চায়, তারা আত্মপ্রতারণা করছে মাত্র। এই আত্মপ্রতারণা-রূপ হৃদয়-রোগের শাস্তি থেকে রেহাই নেই।'

আয়াৎ ১১ : ১২ : এই আত্মপ্রবঞ্চকদের যখন বলা হয়---'পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করো না---তখন তারা বলে, আমরা ত শান্তি প্রতিষ্ঠা করতেই চাই। আসলে তারাই অশান্তির মূল।' আত্মপ্রবঞ্চক ব্যক্তি, সম্রাট, নেতা, রাজ্য-পরিচালক সবাই শান্তির দোহাই দিয়ে অশান্তির সৃষ্টি করে। এই অন্ধ আত্মপ্রবঞ্চকদের ছলনা অন্তর্যামী আল্লার অবিদিত নয়। এই আত্মপ্রবঞ্চনাকারীরা নিজেরাই প্রবঞ্চিত হবে।

এরাই সত্য পথের বিনিময়ে ভ্রান্তি ক্রয় করে এবং পরিণামে তারাই হয় ক্ষতিগ্রস্ত।

আয়াৎ ২৪ : ২৫ : প্রথম আয়াতে আল্লার প্রতি অবিশ্বাসীদের শাস্তির কথা বলা হয়েছে কিন্তু দ্বিতীয় আয়াতে যাঁরা বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মশীল তাঁদেরে অভিনন্দিত করা হয়েছে, পরকালে তাঁদের জন্য পরম আনন্দময় জীবনের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

লক্ষ্য করার বিষয়, বিশ্বাসের সঙ্গে সৎকর্মের উল্লেখ করা হয়েছে একই সঙ্গে অর্থাৎ সৎকর্মের সংযোগ ছাড়া শুধু বিশ্বাসের জোরে পূর্ণ ধার্ম্মিক হওয়ার সম্ভাবনা নেই—সৎকর্ম্ম-বিবর্জ্জিত ধর্ম্মবিশ্বাস ফলপুষ্পহীন বৃক্ষের ন্যায়।

আয়াৎ ২৭ : 'আল্লার আদেশ অমান্যকারীদের মত পৃথিবীতে যারা অশান্তি সৃষ্টি করে তারাও নিন্দনীয়, পরিণামে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।'

আয়াৎ ৩০-৩৩ আল্লার প্রতিনিধি করেই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে, ফেরেস্তার চেয়েও মানুষের আসন উচ্চে, মানুষকে বস্তু ও প্রকৃতির জ্ঞান বা জ্ঞান আয়ত্তের শক্তি দেওয়া হয়েছে। কোরাণের মতে মানুষের আদি পিতা হচ্ছে আদম, এই আদমের সঙ্গে জ্ঞানের প্রতিযোগিতায় ফেরেস্তারা হেরে গেছেন। আদি পিতার এই আদর্শই মানুষের আদর্শ, এই বিশ্বপ্রকৃতির যাবতীয় তথ্য ও তত্ত্ব আহরণের সাধনা ও জ্ঞানের রাজ্যে অপরাজেয় শক্তি অর্জ্জনের তপস্যাই মানুষের জন্য কাম্য। তাই কোরাণের যাঁরা ভক্ত সেই মুসলমানেরও আদর্শ হওয়া উচিত জ্ঞানের রাজ্যে নিত্য নূতন দিগ্বিজয়ের।

আয়াৎ ৩৫ : ৩৬ : আদম ও হাওয়ার নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের পর স্বর্গ হ'তে বিতাড়িত হওয়ার কাহিনী থেকে মর্ত্ত্যের মানুষ কি এক মহৎ আদর্শ ও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না ?—সংসারেও প্রতি পদে, প্রতি স্তরে, প্রতি ক্ষেত্রে একটা সীমা মেনে চল্‌তে হয়, পরিচালক ও নেতার আদেশ ও হুকুম মেনে চল্‌তে হয়। অধিকার এবং স্বাধীনতারও একটা সীমা আছে, সেই সীমা না মানলে, যেখানে যতটুকু সংযমী হওয়া প্রয়োজন তা না হলে, নিয়ম ও শৃঙ্খলাকে লঙ্ঘন করলে, জীবনে ব্যর্থতা ও

দুঃখ আসতে বাধ্য। জীবনের প্রতিপদেই প্রলোভন আছে। মানুষের মনোভূমিতেও রয়েছে লোভের বীজ, আবার বাইরে থেকেও আস্‌তে পারে দুর্দ্দমনীয় প্রলোভন, কিন্তু সব সময় সংযত হয়ে সেই প্রলোভনকে জয় করতে হবে। না হয় পরিণামে, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু অনিবার্য্য। লোভ ও লোভের শাস্তি নর-নারীকে সমানভাবেই ভোগ করতে হ'বে---এই বিষয়ে নর-নারীতে কোন ভেদাভেদ করা হয়নি। তাই আদম ও হাওয়া ভোগ করেছেন একই শাস্তি।

আয়াৎ ৪২ : 'সত্যকে মিথ্যা দিয়ে ঢেকো না। যদি জানো সত্যকে গোপন করো না।'

আয়াৎ ৪৩ : উপাসনা করবে এবং নিয়মিত দান করবে।' মনের একাগ্রতা ও চিত্তের নির্ম্মলতার জন্যে যেমন উপাসনার প্রয়োজন, তেমনি হৃদয়-ঔদার্য্য বৃদ্ধির জন্য দানেরও আবশ্যক। কোরাণে এই দু'টি সৎ কর্ম্মের কথা প্রায় একই সময় বহুবার বলা হয়েছে। দানহীন উপাসনা ও উপাসনাহীন দান ঐসলামিক জীবন-ধারণার বিপরীত। ঈদের জমা'তে শরীক হওয়ার পূর্ব্বেই বাধ্যতামূলক দান খয়রাৎ সেরে ফেলতে হয়---জমা'তের পরেও স্বেচ্ছাকৃত দানে অভাবগ্রস্থের অভাব দূর করতে হয়। মসজিদ ও ঈদ্‌গায়ের চতুর্দ্দিকে ভিক্ষুকের ভীড় দৃষ্টি কটু হতে পারে কিন্তু ঐসলামিক জীবন-ধারণার দিক থেকে ঐ দৃশ্য অর্থহীন নয়। উপাসনা ও দানের তাগিদ কোরাণে পাশাপাশিই দেওয়া হয়েছে—জীবনেও তার অভিব্যক্তি পাশাপাশিই হবে এই ত স্বাভাবিক।

আয়াৎ ৪৪ : নিজে সৎ না হয়ে অপরকে সৎ হতে উপদেশ দেওয়া অর্থহীন। যে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করে অর্থাৎ যে ধার্ম্মিক সে কখনো এমন আত্মপ্রবঞ্চনার আশ্রয় গ্রহণ করবে না। আত্মপ্রবঞ্চনা কারো পক্ষে সুফল-প্রসূ নয় এই কথা প্রত্যেকের হৃদয়ঙ্গম করা উচিত।

আয়াৎ ৪৫ : 'ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও উপাসনার সঙ্গে আল্লার সাহায্য প্রার্থনা কর। বিনয়ী ছাড়া অন্যের পক্ষে সত্যই এই এক কঠিন সাধনা।'

আয়াৎ ৫৪-৫৯ : বনি ইসরাইলরা আল্লার হুকুমের বিরোধীতা করেছিল, তবুও তারা আল্লার করুণা থেকে বঞ্চিত হয় নি। অনুতপ্ত হৃদয়ের তৌবা আল্লাহ্ সব সময় কবুল করে থাকেন। কাজেই ক্ষমাহীন নির্ম্মমতা আল্লার কখনো প্রিয় হতে পারে না। যারা আল্লার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তারা কারো ক্ষতি করে না, ক্ষতি করে নিজেদের আত্মার। যারা সীমা লংঘনকারী তারা শাস্তির হাত থেকে রেহাই পায় না।

আল্লার যে-সব গুণের কথা বলা হয়েছে, সেই সব গুণ যারা চর্চ্চা করে না, আয়ত্ত করে না, এবং তাঁর হুকুম অমান্য করে, তারাই ত আল্লার বিদ্রোহী—না হয় আল্লার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কোন অর্থই করা যায় না।

আয়াৎ ৬০ : বনি ইসরাইলদের প্রতি এখানে যে-ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করা হয়েছে তা' সর্ব্বকালের সর্ব্ব মানুষের প্রতিই প্রযোজ্য: 'নিজের অধিকারের মধ্যে থেকে অর্থাৎ কোন রকমের অনধিকার চর্চ্চা না করে, খাও, পিয়ো, পৃথিবীর বুকে কোন অশান্তি সৃষ্টি করো না।' ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে এই আদর্শই মানুষের জীবনে চরম কল্যাণ বহন করে নিয়ে আসতে পারে। এই আদর্শ অনুসরণ করলে পৃথিবীতে এত মারা-মারি, খুন-জখম ও বিশ্ব সমরের ভয়াবহ অভিনয় কিছুতেই হত না। পৃথিবীতে যত New orderই আসুক না কেন, ক্ষুধায় অন্ন, তৃষ্ণায় জল, পরনে বস্ত্র প্রতি মানুষকেই দিতে হবে। একের অধিকার অন্যকে মেনে চল্‌তেই হবে। নিজে পৃথিবীর বুকে কোন অশান্তি সৃষ্টির কারণ হব না, এর চেয়ে বড় আদর্শ আর কী হতে পারে?

আয়াৎ ৬২ : এখানেও বিশ্বাসের কথা, ধর্ম্মগ্রন্থ অনুসরণের কথা বলা হয়েছে—সঙ্গে সঙ্গে সৎকর্ম্ম করার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশ্বাস ও ধর্ম্ম পালনকে কোরাণ সৎ কর্ম্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে নি, মানব জীবনেও এই দু'টির সমন্বয় কোরাণের ইঙ্গিত।

আয়াৎ ৭১ : এই আয়াতের মর্ম্ম—নিষ্ঠা ও সদিচ্ছা ছাড়া কোন উৎসর্গই (কোরবাণী) প্রকৃত উৎসর্গ নয়।

আয়াৎ ৭২ : পাপ করে গোপন রাখা যায় না, পাপী গোপন করলেও আল্লাহ্ তাকে দিবালোকে নিয়ে আসেন। পাপের শাস্তি থেকে রেহাই নেই।

আয়াৎ ৭৯-৮২ : যারা নিজের হাতে বই লিখে তাকে আল্লার বাণী বলে প্রচার করে তারা অভিশপ্ত। যারা পাপের দ্বারা লাভবান হতে চায়, তারা অগ্নির সাথী, অগ্নিতেই তারা চিরকাল বাস করবে অর্থাৎ অনন্ত দুঃখই তাদের বরাদ্দ। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মশীলকে অনন্ত আনন্দলোকের সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছে। পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার ঐসলামিক জীবন-ধারণার একটি সর্ব্বজনবিদিত ও প্রাথমিক নীতি।

আয়াৎ ৮৩ : 'আল্লাকে ছাড়া কাকেও উপাসনা করবে না। পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম ও অভাবগ্রস্থের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে এবং লোকের প্রতি ন্যায় ও ভাল কথা বল্‌বে। নামাজ পড়বে ও নিয়মিত জাকাৎ (দান) দেবে।'

আয়াৎ ৮৪ : পরস্পর রক্তপাত করবে না। কোন স্বজনকে গৃহ থেকে বিতাড়িত করবে না—এ সব আদেশ যারা অমান্য করেছে বা করবে তাদের জন্য অনন্ত শাস্তি।

আয়াৎ ৯৫ : ***অত্যাচারী ও অন্যায়কারীকে আল্লাহ্ ভাল করেই জানেন অর্থাৎ শাস্তির হাত থেকে জালেমের রেহাই নেই, জুলুমের জবাবদিহি তাকে করতেই হবে।

আয়াৎ ১০২ : ১০৩ ***যাদু বিদ্যায় বিশ্বাসীরা কখনও সুখী হতে পারে না। আল্লায় বিশ্বাস কর ও পাপ থেকে বিরত থাক, তা হ'লে আল্লাহ্ উত্তমরূপে পুরস্কৃত করবেন।

আয়াৎ ১০৭ : ***আল্লাহ্ ছাড়া মানুষের অন্য কোন পৃষ্ঠপোষক ও সহায়তাকারী নেই।' আল্লায় আত্মনিবেদন ইসলামের প্রধান নীতি—এই ছাড়া প্রকৃত মুসলিম জীবন কল্পনা করা যায় না।

আয়াৎ ১১০ : 'নিয়মিত উপাসনা ও দান কর। মৃত্যুর পূর্ব্বে যা কিছু প্রেরিত হবে, সবই আল্লার কাছে ফিরে পাবে।'

আয়াৎ ১১২ : 'আল্লার দিকে যিনি ফিরেছেন অর্থাৎ আল্লায় যিনি আত্মনিবেদন করেছেন ও যিনি সৎকর্ম্মশীল,—তিনি আল্লার কাছে পুরস্কার পাবেন। এমন লোকের জীবন ভয়-দুঃখের অতীত।'

আয়াৎ ১১৪ : 'যে আল্লার ঘরে (মসজিদে) আল্লার নাম নিতে নিষেধ করে, তার চেয়ে বড় অত্যাচারী আর কে? এমন লোকের সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য। ইহলোকে বেইজ্জতি, পরলোকে অপরিসীম দুঃখ এর জন্য অপেক্ষা করছে।

আয়াৎ ১১৫ : 'পূর্ব্ব-পশ্চিম অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই আল্লার। যেদিকেই ফের, সেখানেই আল্লাকে উপস্থিত পাবে। আল্লাহ্ সর্ব্বব্যাপ্ত ও সর্ব্বজ্ঞ।'

আয়াৎ ১১৯ : 'রছুল বা প্রেরিত পুরুষকে সত্যিকার সুসংবাদ ও সতর্কবাণীর বাহক করেই পাঠানো হয়েছে। সংকর্ম্মশীলের প্রতি সুসংবাদ ও পাপীর প্রতি সাবধানবাণী তিনি শোনাবেন।'***

আয়াৎ ১২৮ : ***'আল্লাহ্ পাপীকে ও চিরতরে ত্যাগ করেন না---সকলের কাছে—পাপীর কাছেও তিনি বার বার ফিরে আসেন। তিনি দয়ালু ও দয়াময়।'

আয়াৎ ১৪১ : 'যারা অতীত হয়ে গেছে তারা যে রকম কাজ করেছে সে রকম ফল ভোগ করবে। তোমরাও ফল পাবে তোমাদের কর্ম্মানুযায়ী। অপরের ভাল মন্দের জন্য কাকেও জবাবদিহি করা হবে না।'

আয়াৎ ১৫৩ : 'ধৈর্য্য ও উপাসনার সঙ্গে আল্লার সাহায্য প্রার্থনা কর। আল্লাহ্ ধৈর্য্যশীলদের সঙ্গী।'

আয়াৎ ১৫৫ : ১৫৬ : 'ভয় ও ক্ষুধায় মানুষের পরীক্ষা হয়। যখন হারায় মাল অথ। প্রাণ অথবা কঠোর পরিশ্রমের পরও যদি ক্ষতি হয়, তখনো যারা ধৈর্য্য হারায় না; বিপদ যখন ঘিরে নেয় তখনো যারা বলে---'আমরা আল্লার, তাঁর প্রতিই আমাদের প্রত্যাবর্ত্তন,---তাদের প্রতি সুসংবাদ।'

আয়াৎ ১৬৪ : 'আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি, দিন রাত্রির বৈপরীত্য, মানুষের উপকারার্থে সাগরে জাহাজের চলাচল, বৃষ্টিপাত—যে-বৃষ্টিপাতে মৃত ধরণী সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়ানো পশু, বায়ুর পরিবর্ত্তন এবং আকাশ ও মর্ত্ত্যভূমির মাঝখানে বায়ু-তাড়িত মেঘরাশি—জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানের জন্য এ-সবই সুস্পষ্ট নিদর্শন।' অর্থাৎ বিশ্ব-প্রকৃতিকে, প্রকৃতির যাবতীয় বস্তুকে জান্‌তে হবে, বুঝতে হবে, জেনে বুঝে ব্যবহারে লাগাতে হবে। প্রকৃতিবিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে জ্ঞান সম্পূর্ণ হতে পারে না। ইসলাম শুধু ধর্ম্ম শিক্ষার উপর জোর দেয়নি---বিজ্ঞান শিক্ষার সুস্পষ্ট নির্দ্দেশও কোরাণে এইভাবে দেওয়া হয়েছে।

আয়াৎ ১৬৮ : 'মৃত্তিকার (পৃথিবী) উপর যা পবিত্র ও হালাল তাই খাবে। তোমার চির-শত্রু শয়তানের পদক্ষেপ অনুসরণ করো না।'

ভাল, পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যপ্রদ যা তাই গ্রহণ করতে হবে, খাদ্যের সঙ্গে মানুষের দেহ মনের নিবিড় যোগ রয়েছে, তাই প্রতি ধর্ম্ম শাস্ত্রেই খাদ্য নিয়ন্ত্রণ লক্ষিত হয়। পাপীকে শত্রু দুশ্‌মন বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং পাপীর অনুসরণ না করার জন্য এখানেও আবার সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে।

আয়াৎ ১৭০ : মানুষের গতানুগতিকতা প্রবৃত্তি সম্বন্ধে এখানে ইঙ্গিত করা হচ্ছে: বহু লোক আছে যারা শুধু পূর্ব্বপুরুষের পদানুসরণ করেই সন্তুষ্ট, যদিও সেইসব পূর্ব্বপুরুষ ছিল, জ্ঞানবুদ্ধি বিবর্জ্জিত। এখনো পৃথিবীতে বহু লোক ও বহু জাতি আছে যাদের রীতিনীতি আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মাচরণ পূর্ব্ব পুরুষের ধারাবাহিক অনুকৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়, সেই সব আচার ও ধর্ম্মানুষ্ঠান যতই কাণ্ডজ্ঞান-বিবর্জ্জিত হউক না কেন। অনুকৃতি ও অনুসরণ বাদ দিয়ে স্বাধীন বিচার বুদ্ধিই মানুষের আশ্রয় হওয়া উচিত।

আয়াৎ ১৭২ : 'বিশ্বাসীগণ পবিত্র জিনিস ভক্ষণ করবে।'***

আয়াৎ ১৭৩ : 'মৃতের মাংস, রক্ত, শূকরের গোশ্‌ত এবং আল্লার নাম ছাড়া অন্য উপাস্যের নামে যা হত্যা করা হয়েছে তা তোমরা খাবে

না। কিন্তু বাধ্য হয়ে, সঙ্কটকালে নিষিদ্ধ খাদ্যও গ্রহণ করা যেতে পারে;---আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।'

আয়াৎ ১৭৭ : 'পূর্ব্বদিকে কি পশ্চিমদিকে মুখ ফেরানোই সাধুতা বা সৎকর্ম্ম নয়। কিন্তু সৎকর্ম্ম হচ্ছে, আল্লায়, শেষ দিনে, ফেরেস্তা, আল্লার কেতাব ও নবীগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন এবং আল্লার প্রেমে নিজের সম্পদ দান করায়; আত্মীয় প্রতিবেশীকে, এতিম ও অভাব-গ্রস্থকে, পথিক ও ভিক্ষুককে, আর ক্রীতদাসের মুক্তি-মূল্য দানে; উপাসনায়, নিয়মিতদানে, অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি পালনে;---দুঃখকষ্ট ও সঙ্কট মুহূর্ত্তে সর্ব্বাঙ্গীণ আতঙ্কের সময় দৃঢ় ও ধৈর্য্যশীল হওয়ায়। এই সব লোকই আল্লাহ্-ভীরু ও সত্যশীল।'

আয়াৎ ১৭৮ : ১৭৯ 'হত্যার প্রতিশোধের নিয়মঃ (ভুলে ও আকস্মিক হত্যায় এই নিয়ম খাট্‌বে না—ঐ রকম হত্যায় মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা নিষেধ) মুক্ত মানুষের পরিবর্ত্তে মুক্ত মানুষ, ক্রীতদাসের পরিবর্ত্তে ক্রীত-দাস, নারীর পরিবর্ত্তে নারী; কিন্তু নিহতের ভ্রাতা (ওয়ারিস) যদি যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ নিয়ে ক্ষমা করেন তবে কৃতজ্ঞচিত্তে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেবে,---ইহা আল্লার অনুগ্রহ ও দয়া বলেই গ্রহণ করবে। সীমা লংঘন করলে কঠোর শাস্তি। ক্ষতিপূরণের এই নিয়ম (সমানে সমান) যারা বিবেচক, তাদের প্রাণ রক্ষার কারণ হবে, তারা সংযত হতে পারবে।' প্রাচীন আরব সমাজে একটি হত্যা বংশানুক্রমিক দীর্ঘ যুদ্ধের কারণ হত, ফলে শত শত লোক নিহত ও আহত হত, দীর্ঘ দিন দেশে শান্তি থাকত না। এই আইন ব্যাপক হত্যা নিবারণের উপায় স্বরূপ ও ন্যায়ের পদ প্রদর্শক।

আয়াৎ ১৮০ : 'যাদের মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হয়েছে তারা নিজেদের সম্পত্তির অংশ যুক্তিসঙ্গত প্রথায় পিতা-মাতা, ও নিকট আত্মীয়কে দিতে পারে। আল্লাকে যারা ভয় করে এটা করা তাদের কর্ত্তব্য।' পিতা-মাতা, প্রতিবেশী ও নিকট-আত্মীয়দের প্রতি কর্ত্তব্য ও প্রীতির কথা কোরাণে বহু স্থানে বলা হয়েছে।

আয়াৎ ১৮১ : ১৮২ : মৃতের কাছ থেকে শোনার পর কেউ যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক মৃতের অছিয়তকে কোন রকম রদবদল করে, তার

শাস্তি তাকে ভোগ করতেই হবে। কিন্তু যদি মৃতের অছিয়তে কোথাও পক্ষপাতিত্ব বা ভুল করা হয়েছে বলে সন্দেহ হয় এবং কেউ যদি বিবদমান পক্ষের মাঝখানে আপোষ রফা করে দেন, তাতে কোন দোষ নেই। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।'

আত্মস্বার্থ সাধনের জন্য মৃতের অছিয়তকে পরিবর্ত্তিত করার ফলে নানা মামলা মোকর্দ্দমা প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়, কোরাণ এ রকম শঠতার কঠোর নিন্দা করেছে।

আয়াৎ ১৮৩ : ১৮৪ : বিশ্বাসীদের রোজা বা উপবাস পালন করতে হবে—তা হলে আত্মসংযমী হতে পারবে। রমজান মাসে রোজা রাখবে কিন্তু যদি কেউ পীড়িত হয় বা বিদেশে ভ্রমণে থাকে, তা হলে পরে তাদের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক (রোজা) পূর্ণ করে দিতে হবে; যাদের রোজা রাখায় খুব কষ্ট হয় (অতি বৃদ্ধ, মা'জুর, যারা আরোগ্যের পথে ও অন্তঃসত্বাদের পূর্ণকালে), তারা প্রতি রোজার পরিবর্তে একজন ভিক্ষুককে খাওয়াবে কিন্তু যারা স্বেচ্ছায় আরো বেশী দেয় (খাদ্য বা তার মূল্য) বা বেশী ভিক্ষুককে খাওয়ায়, তাদের হবে অধিকতর মঙ্গল।'

আল্লাহ্ মানুষকে সব রকম সুবিধা দানের পক্ষপাতী, মানুষ অসুবিধায় পড়ুক, এ আল্লার অভিপ্রেত নয় এবং কোন রকম অসম্ভব দাবী আল্লাহ্ মানুষের উপর করেন না।

আয়াৎ ১৮৬ : 'আল্লাহ্ ভক্ত ও সেবকদের অতি নিকটেই বিরাজ করেন, যারা আল্লাকে ডাকেন তাদের প্রত্যেকের প্রার্থনা তিনি শোনেন। ভক্তেরও উচিত আল্লার আহ্বান মনোযোগ দিয়ে শোনা ও বিশ্বাস করা, তা হ'লেই তারা সত্য পথের পথিক হতে পারবে।'

আয়াৎ ১৮৭ : 'রোজার রাত্রে স্ত্রীর নিকটবর্ত্তী হওয়া নিষেধ নয়। স্বামী স্ত্রী পরস্পরের পোষাকের মত।'***

পোষাক যেমন মানুষকে লজ্জা ও শীতাতপ থেকে বাঁচায়, স্বামী-স্ত্রীও পরস্পরকে লজ্জা ও পাপ থেকে রক্ষা করে। যৌন প্রবৃত্তি মানুষের জীবনে দুর্দ্দমনীয়, দীর্ঘ এক মাস সহবাস নিষিদ্ধ হ'লে হয়ত

গোপন পাপেরই প্রশ্রয় দেওয়া হত, সেই রকম অস্বাভাবিক কঠোরতা কোরাণ সমর্থন করেনি।

'ঊষার শ্বেত রেখা দেখা যাওয়া পর্য্যন্ত খানা-পিনা অবাধে চল্‌তে পারবে কিন্তু (পরবর্তী) রাত্রির আবির্ভাব পর্য্যন্ত রোজা বা উপবাস পালন করতে হ'বে। উপাসনায় প্রবৃত্ত হওয়ার সময় সহবাস নিষিদ্ধ অর্থাৎ উপাসনায় রত হওয়ার পূর্ব্বে সম্পূর্ণভাবে পবিত্র হয়েই অগ্রসর হ'তে হবে।'

আত্মসংযম শিক্ষার জন্যই এ সব বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোরাণে উপবাস, দান ও সৎকার্য্যের কথা যেমন বার বার বলা হয়েছে, সে রকম আত্মসংযমের কথাও বহুবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

আয়াৎ ১৮৮ : 'নিষ্ফল আত্মম্ভরিতায় নিজেদের সর্ব্বস্ব উজাড় করে দিয়ো না, জেনে শুনে অন্যায়ভাবে অপরের সম্পত্তির ক্ষুদ্রতম অংশও আত্মসাতের অভিপ্রায়ে কখনো বিচারককে অর্থাৎ ক্ষমতাশালীকে ঘুষ দিয়ো না।'

বিলাসিতা ও অতিরিক্ত খরচ করাকে কোরাণ অন্যত্রও নিন্দা করেছে—ঘুষকে ত নিন্দা করা হয়েছে কঠোরতম ভাষায়।

আয়াৎ ১৮৯ : ১৯৫***পশ্চাদ্‌দিক দিয়ে কারো গৃহে প্রবেশ করা ভাল নয়। আল্লাকে ভয় করবে, (সদর) দরজা দিয়ে গৃহে প্রবেশ করবে। যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, আল্লার পথে থেকে তোমরা তাদের সঙ্গে শুধু যুদ্ধ করবে। কিন্তু সীমা লংঘন করবে না। সীমা লংঘনকারীকে আল্লাহ্‌ ভালবাসেন না। আক্রান্ত হ'লে আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করবে। বিদ্রোহ, অশান্তি ও অত্যাচার, হত্যা থেকেও নিকৃষ্ট। আক্রান্ত না হলে পবিত্র কাবায় কখনো যুদ্ধ করবে না। বিদ্রোহ অত্যাচার দমিত হয়ে দীন্‌ বা ন্যায়-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত যুদ্ধ করবে। কিন্তু তারা (শত্রু) নিরস্ত হলে একমাত্র অত্যাচারীর বিরুদ্ধে ছাড়া অন্য কারো প্রতি শত্রুতা রাখ্‌বে না।'

আরবী ভাষায় দীন্‌ বা ধর্ম্ম শব্দ খুব ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হয়, ----স্বাধীনতা, ন্যায়, কর্ত্তব্য, বিচার, বিশ্বাস, আচার-ব্যবহার এই সবই

দীন্ শব্দের দ্বারা বুঝায়। এই দীনে এলাহি প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করা সঙ্গত, শত্রু যদি যুদ্ধ থামায়, যারা অত্যাচার করে তাদের সঙ্গে ছাড়া, অন্যের সঙ্গে বিরোধ করবে না। 'যারা সীমা লংঘন করবে, তাদের সঙ্গেই মাত্র তুমিও সীমা লংঘন করবে, কিন্তু মনে রেখো, যারা সংযত ও ধৈর্য্যশীল আল্লাহ্ তাদের সঙ্গেই থাকেন। আল্লার পথে অর্থাৎ সৎপথে খরচ কর। তোমার নিজের হাত যেন তোমার ধ্বংসের কারণ না হয়। সৎকর্ম্ম কর, আল্লাহ্ সৎকর্ম্মশীলকে ভালবাসেন।'

আয়াৎ ১৯৬ : 'হজক্রিয়া' সম্পূর্ণ কর।'***

বিশ্বব্যাপী একই ধর্ম্মবিশ্বাসী মানুষের বাৎসরিক সম্মেলনের এত বড় আয়োজন অন্য কোন ধর্ম্মে ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা সন্দেহ। পুণ্যও ধর্ম্মের কথা বাদ দিলেও এটা সর্ব্বজনস্বীকৃত সত্য যে দেশবিদেশ ভ্রমণে, নানা জাতীয় লোকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও মেলা-মেশায় মানুষের জ্ঞান, ভূয়োদর্শন ও অভিজ্ঞতা বাড়ে, মনের অনুদারতা, সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামী তিরোহিত হয়, হৃদয়ে সহানুভূতি ও আত্মত্যাগের ভাব জাগ্রত হয়। এই জন্যে প্রকৃত মুসলমানের পক্ষে কূপমণ্ডূকের জীবন কিছুতেই সম্ভব নয়। হজের এই সার্ব্বজনীন দিকটা উপেক্ষণীয় নয়।

আয়াৎ ১৯৭ : 'হজব্রত যদি কেউ গ্রহণ করে, সে যেন অশ্লীলতা, দুষ্টামি ও বিবাদ থেকে দূরে থাকে। ভ্রমণের পাথেয় সঙ্গে নেবে কিন্তু (জেনে রেখো) সংস্বভাব হচ্ছে সব চেয়ে উৎকৃষ্ট পাথেয়।'

আয়াৎ ২০৪ : ২০৫ : 'এক প্রকার লোক আছে যারা বৈষয়িক আলাপে মানুষকে তাজ্জব বানিয়ে দেয়, আর আল্লাকে সাক্ষী মানে তাদের কথার, অথচ এ সব লোকই সর্ব্বত্র ছড়ায় ক্ষতি ও অনিষ্ট, যার ফলে শস্য ও পণ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আল্লাহ্ অনিষ্ট ভালবাসেন না।' শয়তানী, বিবাদবিসম্বাদ, ক্ষতি ও অনিষ্ট করার বিরুদ্ধে কোরাণ পদে পদেই সতর্কবাণী উচচারণ করেছে।

আয়াৎ ২০৮ : 'যারা বিশ্বাসী তারা সরল অন্তকরণে ইসলামে প্রবেশ কর; শয়তান বা পাপের পদানুসরণ করো না, কারণ পাপ বা শয়তান হচ্ছে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।'

আয়াৎ ২১২ : ***'কেয়ামত বা প্রলয়ের দিন সৎকর্ম্মশীলদের আসন হবে অবিশ্বাসীদের উপরে।'***

আয়াৎ ২১৫ : আবার দানের কথা বলা হচ্ছে: 'যা ভাল তাই দান করবে।' কাজেই কোন বস্তুবিশেষের উপর জোর দেওয়া হয় নি,—অর্থ, প্রয়োজনীয় বস্তু, অন্যভাবে সহায়তা, অন্ধকে পথ দেখিয়ে দেওয়া, অক্ষমকে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দেওয়া, সৎ উপদেশ, সান্ত্বনাবাক্য সবই ব্যাপক অর্থে এ দানের অন্তর্গত।

'পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্ত ও পথিক, এদের দাবী সর্ব্বাগ্রে, তোমার প্রতি সৎকর্ম্ম আল্লার গোচরীভূত।' কাজেই বাহবা লাভের জন্য, নাম জাহির করার জন্য বা অহঙ্কার প্রকাশের জন্য দান করা উচিত নয়। 'ডান হাতে দান করবে ত বাঁ হাত জানতে পারবে না।' দান সম্বন্ধে ইহাই ইসলামের নবীর নির্দ্দেশ।

আয়াৎ ২১৬ : 'সত্যের জন্য ন্যায় যুদ্ধের বিধান দেওয়া হয়েছে কিন্তু অবুঝ ও অন্ধ মানুষ তা বুঝতে পারে না, তার জন্য যেটা ভাল সেটা সে পছন্দ করে না, যা মন্দ তাই সে পছন্দ করে বসে। কিন্তু আল্লাহ্ জানেন মানুষের জন্য কী ভাল আর কী মন্দ।'

আয়াৎ ২১৯ : 'মদ ও জুয়া—মহাপাপ।' ***মদ ও জুয়া ব্যক্তিগত ও সামাজিক ক্ষতির কারণ এবং বহু প্রকার পাপের উৎস স্বরূপ। কোন সভ্য মানুষ বা সভ্য দেশ এইগুলিকে সমর্থন করে না। মদ ও জুয়া সম্বন্ধে ইসলামের বিধিনিষেধ অত্যন্ত কঠোর।

'যা তোমার প্রয়োজনের বেশী তাই খরচ করবে—সৎকাজে ও দানে।' কোরাণ কৃপণ ও মোনাফাখোরকে কোথাও সমর্থন করেনি অথচ ব্যক্তিগত প্রয়োজনের চাহিদাকেও করেনি অস্বীকার।

আয়াৎ ২২০ : 'এতিমের কল্যাণ করাই এতিমদের প্রতি উৎকৃষ্ট ব্যবহার। তারা তোমার ভাই, তাদের বিষয় যদি তোমার বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত কর, কে তা সৎ উদ্দেশ্যে, আর কে তা মন্দ উদ্দেশ্যে কর্‌ছে আল্লাহ্ তা জানেন।' এতিমের সম্পত্তি অভিভাবকের সম্পত্তি থেকে পৃথক রাখাই বিধি, মায় হিসাবপত্র

শুদ্ধ। যত গোপনেই এতিমের বিষয় আত্মসাৎ করা হউক না কেন, আল্লাকে ফাঁকি দেওয়া যাবে না, তিনি সর্ব্বজ্ঞ।

আয়াৎ ২২১ : 'অবিশ্বাসী অর্থাৎ পৌত্তলিক নারীকে বিয়ে করো না, যদিও সে তোমাকে প্রলুব্ধ করে। বিশ্বাসী ক্রীতদাসীও অবিশ্বাসী নারী থেকে উত্তম। তোমাদের মেয়েদেরও অবিশ্বাসী বা পৌত্তলিকদের সঙ্গে বিয়ে দিয়ো না। বিশ্বাসী ক্রীতদাসও অবিশ্বাসীর চেয়ে উত্তম।'

আয়াৎ ২২৩ : 'তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যভূমির মত, ইচ্ছামত তাদের সমীপবর্ত্তী হবে।' এই বাস্তব উপমার দ্বারা কৃষকের সঙ্গে তার শস্যভূমির যেমন জীবন-মরণ সম্পর্ক, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কও যে সে রকম আজীবন স্থায়ী তাই ইঙ্গিৎ করা হচ্ছে। শস্যক্ষেত্রের যথা-যোগ্য যত্ন ও সেবা করলেই শস্যক্ষেত্র কৃষককে তার জীবিকা দান করে থাকে, অবহেলা ও অযত্নে ভূমি থেকে ভাল ফসল কিছুতেই আশা করা যেতে পারে না, স্ত্রীরও সেরকম যত্ন করতে হয়, তার সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করতে হয়, তা হলেই প্রতিদানে সেই স্ত্রীর কাছ থেকে স্বামী পেতে পারে সেবা, যত্ন, শ্রদ্ধা ও প্রেম; তখনি স্ত্রী হ'তে পারে স্বামীর জীবনের সর্ব্বপ্রকার সুখের উৎস। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক শুধু দৈহিক নয়, আত্মিকও, তাই পরমুহূর্ত্তেই কোরাণ বলছে 'তৎপূর্ব্বে অর্থাৎ স্ত্রীর নিকটবর্ত্তী হওয়ার পূর্ব্বে এমন কাজ করবে যাতে আত্মার কল্যাণ হয়—'অর্থাৎ রাগ, বিতৃষ্ণা ও ক্রোধের পরিবর্ত্তে প্রেম প্রীতির সঙ্গে হাসি মুখে প্রফুল্ল হৃদয়ে স্ত্রীর নিকটবর্ত্তী হবে। এ-রকম মিলনেই নিবিড় আনন্দ ও সুসন্তান লাভ ঘটে। আধুনিক যৌন-বিজ্ঞানও এই সত্যের সমর্থন করে।

আয়াৎ ২২৪ : 'ভাল কি মন্দ কাজে অথবা আপোষ মীমাংসার সময় আল্লার নামকে তোমাদের শপথের অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করো না।'

আয়াৎ ২২৬--২২৮ : 'যদি কেহ স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক না রাখার শপথ গ্রহণ করে থাকে, তবে চার মাস অপেক্ষা করা উচিত। এই সময়ের মধ্যে তাদের পুনর্মিলন হলে ভাল—আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

কিন্তু তারা যদি তালাক বা সম্পর্কচ্ছেদের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প করে—সম্পর্কচ্ছেদ করতে পারে; আল্লাহ্ সবই শোনেন, সবই জানেন। তালাক দেওয়া স্ত্রীলোকদের তিন মাসিক-ঋতুকাল অপেক্ষা করা উচিত, তাদের গর্ভে আল্লাহ্ যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা উচিত নয়, অর্থাৎ এই সব স্ত্রীলোক যদি অন্তসত্ত্বা থাকে তা প্রকাশ করা উচিত।'***

আয়াৎ ২২৯ : 'দুই তালাক পর্য্যন্ত দেওয়া যেতে পারে, তার পর দুই পক্ষ হয় ন্যায়সঙ্গত ভাবে সম্মিলিত থাকবে অথবা তিন তালাক দিয়ে সহৃদয়তার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। একে অপরকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা না করে, কোন রকম নিন্দা কুৎসার আশ্রয় না নিয়ে, সহজ ভদ্রভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়াই ভাল।

'স্বামী যা কিছু স্ত্রীকে উপহার দিয়েছে তা ফিরিয়ে নেওয়া উচিত নয়, অবশ্য যদি দুই পক্ষের মনে আশঙ্কা থাকে যে তারা সীমা মেনে চল্‌তে পারবে না, (স্বামীর এমন কোন পাওনা বা দাবী যদি থাকে যার ফলে স্ত্রীর স্বাধীনতা বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে) তবে বিচারকের বিবেচনা মত স্ত্রী যদি স্বামীকে কিছু ফিরিয়ে দেয় তাতে দোষ নেই। সীমা লংঘন করবে না, সীমা লংঘনকারী নিজের ও অপরের ক্ষতিসাধন করে।'

আয়াৎ ২৩০ : 'পূর্ণ তালাক বা বিচ্ছেদের পর স্বামী সেই স্ত্রীকে পুনরায় বিয়ে করতে পারে না, কিন্তু সেই স্ত্রীর যদি অন্যত্র বিয়ে হয় এবং দ্বিতীয় স্বামীও তাকে তালাক দেয় তখন মাত্র বিয়ে হতে পারে। এই রকম পুনর্ব্বিবাহে কোন পক্ষেরই দোষ হয় না অবশ্য তারা যদি আল্লার নির্দ্দেশিত সীমারেখা মেনে চল্‌তে পারবে বলে বিশ্বাস করে।'

তালাক যাতে সহজে ঘটতে না পারে তার জন্যই এই কঠোর ব্যবস্থা, কিন্তু যেখানে স্বামী-স্ত্রীর জীবন দুর্ব্বিসহ হয়ে পড়েছে, সেখানে সম্পর্কচ্ছেদের ব্যবস্থা না থাকলে তা হ'ত অস্বাভাবিক ও অন্যায়। আবার তালাক ফিরিয়ে নেওয়ার সহজ ব্যবস্থা থাকলে, সামান্য ছুতানাতা বা মনোমালিন্যেও তালাক হয়ে পড়ত দৈনন্দিন ব্যাপার। যে-সব

ধর্মে তালাকের ব্যবস্থা নেই সেখানে স্বামী বা স্ত্রীকে বিচ্ছেদের জন্য নানান অসাধু উপায়ের আশ্রয় নিতে দেখা যায়, এমন কি শুধু দাম্পত্য বিচ্ছেদের জন্য ধর্মান্তরও ঐ সব সমাজে বিরল ঘটনা নয়। ইসলাম মানব স্বভাবকে কোথাও লংঘন করেনি, বরং মানব স্বভাবকে সামাজিক পথে সুনিয়ন্ত্রিত করার শিক্ষাই ইসলামের অর্থাৎ কোরাণের শিক্ষা।

আয়াৎ ২৩১ : 'হয় সুবিবেচনার সঙ্গে (দুই তালাকের পর) স্ত্রীকে গ্রহণ করো, না হয় সুবিবেচনার সহিত (তিন তালাক দিয়ে) তাকে মুক্তি দাও (বিবাহবন্ধন থেকে); কিন্তু ক্ষতি সাধনের বা অন্যায় সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে তাকে ফিরিয়ে নিয়ো না, কেউ যদি সে-রকম করে সে নিজের আত্মার ক্ষতি সাধন করে। আল্লার নির্দ্দেশকে পরিহাস রূপে গ্রহণ করো না।'

আয়াৎ ২৩২ : 'ইদ্দৎ কাল অতিবাহিত হওয়ার পর যদি উভয় পক্ষ সুবিবেচনার সঙ্গে সম্মিলিত হ'তে সম্মত হয় তবে তাদের পুনর্ব্বিবাহে বাধা দিয়ো না। ইহাই পুণ্য ও পবিত্রতার পথ।'

পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে দাম্পত্য সম্পর্কই সব চেয়ে বড় ও মহৎ সম্পর্ক। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সুখ ও শান্তি এই সম্পর্কের উপর ষোল আনাই নির্ভর করে। তাই এই সম্পর্ককে সুস্থ ও যুক্তি-সঙ্গত করার উদ্দেশ্যে মানব প্রকৃতির অনুকূল করেই কোরাণে ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে। তালাকের ব্যাপারে সব সময় যুক্তি, সুবিবেচনা ও সহৃদয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

আয়াৎ ২৩৩ : 'দুগ্ধপোষ্য শিশুর পিতা-মাতার মধ্যে যদি তালাক হয়, মা পূর্ণ দুই বছর শিশুকে স্তন্য দেবেন, অবশ্য পিতা যদি কাল পূর্ণ করতে চান। কিন্তু পিতা যুক্তি-সঙ্গত ভাবে মা ও শিশুর ভরণ-পোষণের ভার গ্রহণ করবেন। কোন প্রাণীর উপর সে যা বহন করতে পারবে তার বেশী বোঝা চাপানো উচিত নয়। শিশুর জন্য তার পিতা মাতার প্রতি অন্যায় ব্যবহারও উচিত বা সঙ্গত নয়।'

আয়াৎ ২৩৪ : 'স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবাদের চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করা উচিত। তারপর তারা যদি ন্যায়সঙ্গতভাবে নিজের

ব্যবস্থা করে অর্থাৎ পুনরায় বিবাহাবদ্ধ হয়, তা হলে তাতে দোষ নেই।'

আয়াৎ : ২৩৫ : '(বিধবার সঙ্গে) বিবাহ-প্রস্তাবে বা মনে বিয়ের বাসনা পোষণে দোষ নেই, কিন্তু একমাত্র সম্মানজনকভাবে ছাড়া তাদের সঙ্গে কোন গোপন চুক্তি করো না। ইদ্দৎ পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে বিবাহাবদ্ধের সঙ্কল্পও অনুচিত। আল্লাহ্ সর্ব্বজ্ঞ—তিনি তোমার মনের খবর রাখেন।'***

আয়াৎ ২৩৭ : ***'পরস্পরের মধ্যে (ব্যবহারে) বদান্যতাকে ভুলো না।'***

ধর্ম্মীয় বিশ্বাসের বেলায় ইসলাম অত্যন্ত কঠোর কিন্তু মানবীয় ব্যবহারের বেলায় ইসলাম যুক্তি, সুবিবেচনা, ঔদার্য্য ও বদান্যতারই প্রচারক ও নির্দ্দেশক।

আয়াৎ ২৩৮ : 'নিয়মিত উপাসনা করবে। আল্লার সামনে মনোযোগ ও ভক্তি নিয়ে দাঁড়াবে।'

আয়াৎ ২৩৯ : 'শত্রুর ভয় থাকলে, দাঁড়িয়ে বা অশ্বপৃষ্ঠে যেমন তোমার সুবিধা, উপাসনা করবে।'***

আয়াৎ ২৪০ : 'যারা মৃত্যুর সময় বিধবা রেখে যায়, তারা বিধবার জন্য বাসস্থান ও অন্তত এক বছরের খোরাকীর ব্যবস্থা যেন রাখে।'***

আয়াৎ ২৪১ 'তালাক দেওয়া স্ত্রীর জীবিকার যুক্তি-সঙ্গত ব্যবস্থা করা উচিত---ইহা সৎ ও ধার্ম্মিকের লক্ষণ।'

আয়াৎ ২৪৪ : 'আল্লার পথে যুদ্ধ করবে' অর্থাৎ সত্য, ন্যায় ও ধর্ম্মের জন্যই সংগ্রাম,—মিথ্যা, অন্যায় ও আত্মস্বার্থ সাধনের জন্য যুদ্ধ অনুচিত।

আয়াৎ ২৪৯ : এই আয়াতের উপসংহার করা হয়েছে এই বলে —'আল্লাহ্ ধৈর্য্যশীলদের সঙ্গেই থাকেন।'

আয়াৎ ২৫৬ : 'ধর্ম্মে কোন জোর জবরদস্তি নেই : সত্য মিথ্যা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও পৃথক, যিনি পাপ পরিহার করে আল্লায়

বিশ্বাস স্থাপন করেছেন, তিনি সবচেয়ে বিশ্বস্ত হস্তই ধারণ করেছেন, যা কখনও ভাঙ্গবে না বা শিথিল হবেনা।'

আয়াৎ ২৬১ 'যারা আল্লার পথে খরচ করে, নিজের অর্থ সৎকাজে ব্যয় করে, তাদের দান শস্যকণার মত, যে শস্যকণা থেকে সাতটি শীষ বের হয়, প্রতি শীষে জন্মে শত শস্য।' ***অর্থাৎ যা দান করা হয় দাতা লাভ করেন তার বহু গুণ—আনন্দ, আত্মপ্রসাদ, তৃপ্তি পুণ্য ও পবিত্রতায় এবং সে-লাভ আরো বহু রকমে।

আয়াৎ ২৬৩ : 'দান করে দান গ্রহীতার ক্ষতি করার চেয়ে, দু'টো মিষ্টি কথা বা সদয় আলাপ ও অপরের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা অনেক ভাল।'

আয়াৎ ২৬৪ : 'লোক দেখানো দানের মত, হে মোমিন, দান স্মরণ করে বা গ্রহীতার ক্ষতি সাধন করে তোমার দানকে ব্যর্থ করে দিয়ো না।'***

এই সব দাতার উপমা দেওয়া হয়েছে কঠিন অনুর্ব্বর প্রস্তর খণ্ডের সঙ্গে, যে-প্রস্তর খণ্ডের উপর সামান্য মৃত্তিকা রয়েছে, যখন তার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত হয়, মৃত্তিকা ধুয়ে গিয়ে শূন্য প্রস্তর খণ্ডই শুধু পড়ে থাকে। কিছুই তাতে জন্মোনা ও কিছুই হয় না উৎপন্ন। যে-দান লোক দেখানোর জন্য, বাহবা পাওয়ার জন্য বা প্রতিদান পাওয়ার উদ্দেশ্যে করা হয় তাও এমনি ব্যর্থ, নিষ্ফল ও বন্ধ্যা।

আয়াৎ ২৬৫ 'যাঁরা আল্লার প্রীতির জন্যে ও নিজেদের আত্মাকে বলীয়ান করার জন্যে দান করেন তাঁদের উপমা দেওয়া হয়েছে উচ্চ ও উর্ব্বর উদ্যানের সঙ্গে; প্রবল বৃষ্টিপাতে যা দেয় দ্বিগুণিত শস্য, প্রচুর বৃষ্টি না হলেও হাল্কা আর্দ্রতা বা হিমকণাও যার পক্ষে যথেষ্ট।'

নিঃস্বার্থ দান মানুষের জীবনকে সজীব, সফল ও সার্থক করে তোলে,—অনির্ব্বচনীয় আত্মপ্রসাদ ও তৃপ্তিতে মন যায় ভরে।

আয়াৎ ২৬৭ : 'যা ভাল, যা সসম্মানে উপার্জ্জন করেছ ও ভূমিজাত ফলমূল যা আল্লাহ্ তোমার জন্যে উৎপন্ন করেছেন, তা-ই দেবে অর্থাৎ দান করবে। যা তুমি নিজে অনিচ্ছা বা বিরক্তির সঙ্গে ছাড়া

গ্রহণ করবে না, তেমন খারাপ জিনিস দান করার উদ্দেশ্যে পেতে চেয়ো না।'

মোটকথা দানের বস্তু ভাল হওয়া চাই। অকেজো ও খারাপ জিনিস দান করা উচিত নয়।

'আল্লাহ্ সমস্ত অভাবের উর্দ্ধে,—দানে আল্লাহ্ উপকৃত হন না, দাতা নিজেই হ'য়ে থাকে উপকৃত।'

আয়াৎ ২৬৮ : 'শয়তান অর্থাৎ কুপ্রবৃত্তি মানুষের জন্যে নিয়ে আসে দারিদ্র্য ও অভাবের আতঙ্ক এবং প্ররোচিত করে কুকাজে; আর মানুষের জন্য আল্লার অঙ্গীকার নিয়ে আসে ক্ষমা ও প্রাচুর্য্য।' অর্থৎ শয়তান দুঃখ-দারিদ্র্য, অভাব ও সমস্ত পাপেরই প্রতীক—আর আল্লাহ্ হচ্ছেন ক্ষমা, প্রাচুর্য্য, রহমৎ ও নেয়ামতের প্রতীক।

বুদ্ধিমান ও বিবেচক মানুষের সাম্নে এই দুই পথই রয়েছে উন্মুক্ত। কোরাণ কঠোরতম ভাষায় শয়তানের পথকে করেছে নিন্দা আর বার বার নির্দ্দেশ দিয়েছে আল্লার পথের। বুদ্ধিমান অর্থাৎ মুসলমানের জন্য আল্লার পথ ছাড়া দ্বিতীয় পন্থা নেই।

আয়াৎ ২৬৯ : 'আল্লাহ্ যাকে খুশী জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেচনা দিয়ে থাকেন।' ***জ্ঞান হচ্ছে আল্লার অপরিসীম দান, অসীম মঙ্গলের আকর। জ্ঞানী ছাড়া আল্লার বাণী কে ধারণা করতে পারে, কে বুঝতে পারে? অথচ এই সর্ব্বকল্যাণবাহী জ্ঞানের প্রতি মুসলমান সমাজ আজ বিমুখ। এ কারণেই কোরাণের শিক্ষা আজ তার জীবনে পদে পদেই হচ্ছে ব্যর্থ।

আয়াৎ ২৭১ : 'যদি তোমার দানের কথা প্রকাশ কর তা-ও ভাল, কিন্তু যদি তুমি তা গোপন কর, আর তোমার দান যদি প্রকৃত অভাবগ্রস্তের দ্বারে গিয়ে পৌঁছে তা সব চেয়ে উত্তম। তাতে তোমার চিত্ত বিশুদ্ধ ও কলুষ বিদূরিত হবে।'

কাজেই বাহবা পাওয়ার জন্যে বা আত্মম্ভরিতা প্রকাশের জন্যে দান করা উচিত নয়। দান করবে গোপনে, অভাবগ্রস্তের অভাব

মোচনের জন্যে। এ-রকম দানে দাতার মনের কালিমা দূর হয় আর পাওয়া যায় অনির্ব্বচনীয় আত্মপ্রসাদ।

আয়াৎ ২৭২ ঃ ***'যা কিছু ভাল তাই দান করলে আত্মার কল্যাণ হয়। যা দান করবে তা আবার ফিরিয়ে পাবে, তোমার প্রতি অবিচার করা হবে না।' অর্থাৎ তোমার দান বিনা প্রতিদানে যাবে না—দুই জাঁহানেই তুমি আল্লার দ্বারা হবে পুরস্কৃত।

আয়াৎ ২৭৩ ঃ 'যাঁরা আল্লার পথের পথিক অর্থাৎ কোন মহৎ ও সৎকার্য্যে রত বলে অন্য কোন পেশা অবলম্বন করেন না, জীবিকান্বেষণের জন্য যেখানে সেখানে ঘুরতে অক্ষম, সেই সব অভাবগ্রস্তকেও দান করবে। তাঁরা দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে বেড়ান না, তাঁরা সঙ্কোচ করেন বলে অজ্ঞ লোকেরা মনে করে এঁদের কোন অভাব নেই। এঁদের দেখলেই চেনা যায়, এঁরা সাধারণ পেশাদার ভিক্ষুক নন্।'*** বহু আলেম ফাজেল, সাধক দরবেশ ও নানা মহৎ কাজে- রত ব্যক্তি আছেন যাঁরা নিজেদের সাধনায় এমনিভাবে ডুবে রয়েছেন যে, তাঁদের পক্ষে জীবিকার্জ্জনের ফুরসৎই নেই, এ সব দুঃখব্রতী সাধকদের দান করা উচিত। এঁরা শত অভাবেও সঙ্কোচ ত্যাগ করে কারো সাম্নে কখনো হাত পাতেন না, না চাইলেই এঁদেরে দান করা উচিত।

আয়াৎ ২৭৪ ঃ 'যাঁরা দিনে রাতে গোপনে ও প্রকাশ্যে দান করেন, তাঁরা তাঁদের প্রভু অর্থাৎ আল্লার দ্বারা পুরস্কৃত হবেন। তাঁদের ভয় নেই, তাঁদের দুঃখ পেতে হবে না।' উপরে অন্য এক আয়াতেও বলা হয়েছে দানে দাতার আত্মা বলীয়ান হয়, আত্ম-বলে যিনি বলী, তিনি অনায়াসে শোক, দুঃখ ও ভয়কে জয় করতে পারেন।

আয়াৎ ২৭৫ ঃ 'যারা সুদ খায়, তারা শয়তানের স্পর্শে উন্মাদগ্রস্থ লোকের সমতুল্য' অর্থাৎ যারা কুকাজ ও পাপ করতে করতে উন্মাদ হয়ে গেছে তাদের সঙ্গে তুলনা দেওয়া হয়েছে সুদখোরের। লোভী সুদখোর কাণ্ডজ্ঞান বিবর্জ্জিত অর্থ-পাগল ছাড়া আর কি?

'আল্লার নিষেধ শুনে যারা সুদ খাওয়া থেকে বিরত থাকে, তারা তাদের অতীত পাপের জন্য ক্ষমা পাবে, আল্লাহ্ তাদের বিষয় বিবেচনা করবেন, কিন্তু যারা পুনর্ব্বার সুদ খাবে তারা হবে অগ্নির সাথী অর্থাৎ তাদের জন্য আছে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা।'

আয়াৎ ২৭৬ : 'সুদ যে-কোন রকমের করুণা বা আশীর্ব্বাদ থেকে বঞ্চিত কিন্তু দানে রয়েছে করুণা ও আশীর্ব্বাদের প্রাচুর্য্য। যারা অকৃতজ্ঞ ও দুষ্ট প্রকৃতির লোক তারাই আল্লার ভালবাসা থেকে হয় বঞ্চিত।'

আয়াৎ ২৭৭ : 'যাঁরা বিশ্বাস করেন, সৎকাজ করেন, নিয়মিত এবাদৎ ও দান করেন, আল্লার কাছে তাঁরা পুরস্কৃত হবেন। তাঁদের জীবন ভয় ও শোকের অতীত।'

আয়াৎ ২৭৮ : 'সুদের দাবী যেটুকু বাকী আছে, হে বিশ্বাসিগণ তা প্রত্যাহার কর। অর্থাৎ এই নিষেধ বাণী জ্ঞাত হওয়ার পর অনাদায়ী সুদও আর আদায় করো না।'

আয়াৎ ২৭৯ : 'সুদের দাবী প্রত্যাহার না করা আল্লাহ্ ও রছুলের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণার সমতুল্য। সুদের দাবী প্রত্যাহার করলে, তোমার আসল তুমি পাবে। অন্যায় করো না, তোমার প্রতিও অন্যায় করা হবে না।' অর্থাৎ তুমি তোমার আসল বা পুঁজি থেকেও বঞ্চিত হও, ইহা ইসলামের ব্যবস্থা নয়।

আয়াৎ ২৮০ : 'ঋণী বা খাতক যদি বিপদে থাকে, সে যাতে স্বচ্ছন্দে পরিশোধ করতে পারে সেই সময় তাকে দাও। কিন্তু তুমি যদি বদান্যতার বশবর্ত্তী হ'য়ে মাপ করে দাও তা তোমার পক্ষে সব চেয়ে উত্তম।'

আয়াৎ ২৮১ : 'সে-দিনকে ভয় কর যে-দিন তোমাকে আল্লার সামনে ফিরিয়ে আনা হবে, সে-দিন প্রতি আত্মা যা উপার্জ্জন করেছে তাকে তাই দেওয়া হবে, কারো প্রতি অবিচার করা হবে না।'

কোরাণে বিচার-দিনের কথাও বার বার বলা হয়েছে, ঐ দিনে বিশ্বাস করা ঈমানের অন্যতম শর্ত্ত। যে যা করবে সে সেই অনুসারেই সে-দিন প্রতিফল পাবে, সৎ কাজের পুরস্কার ও পাপের শাস্তি থেকে

কেউই বঞ্চিত হবে না। এবং সেই দিন কারো প্রতি কোন অন্যায় বা অবিচার করা হবে না অর্থাৎ সৎ কাজ করে শাস্তি ও পাপ করে মুক্তি, উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে, এ কখনো হবে না।

আয়াৎ ২৮২ : 'ভবিষ্যতে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আদান প্রদানের চুক্তি লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত। লেখক যেন উভয়পক্ষের শর্ত বিশ্বস্তভাবে লেখেন—তিনি যেন লিখ্তে অস্বীকার না করেন। আল্লার ভয় হৃদয়ে পোষণ করে ঋণী ব্যক্তি তাঁর কাছে যা পাওনা অর্থাৎ তাঁর ঋণ কিছুমাত্র না কমিয়ে বলে যাবেন। ঋণী ব্যক্তি যদি নির্ব্বোধ, দুর্ব্বল ও অক্ষম হন অর্থাৎ সঠিকভাবে বলার বা চুক্তি করার সামর্থ্য ও যোগ্যতা যদি না থাকে, তবে তার অভিভাবক তার পক্ষ থেকে সঠিকভাবে বলে যাবেন। নিজেদের মধ্য থেকে দু'জন পুরুষকে সাক্ষী করবে, দু'জন পুরুষ না পাওয়া না গেলে, একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রী-লোককে সাক্ষী করবে, ভুলে গেলে আর একজন যেন স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। সাক্ষ্য দেওয়ার প্রয়োজন হলে সাক্ষীরা যেন অস্বীকার না করে। ছোট হউক বড় হউক (দাবীর সংখ্যা) ভবিষ্যতের দায়িত্ব-মূলক চুক্তি লিখ্তে অবহেলা করোনা। আল্লার চোখে ইহাই অধিকতর ন্যায়। প্রমাণ হিসেবেও অধিকতর সঙ্গত ও সুবিধাজনক এবং তাতে পরস্পরের মধ্যে কোন রকমের সন্দেহ উদ্রেকেরও সুযোগ থাকে না। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে যদি কোন চুক্তির নগদ আদান প্রদান হয়ে যায়, তা'হলে আর লিখবার দরকার নেই। ব্যবসায়মূলক কোন চুক্তি করলেই তার সাক্ষী করবে। লেখক বা সাক্ষীর যেন কোন ক্ষতি করা না হয় অর্থাৎ দলিল লিখেছেন বা সাক্ষী হয়েছেন বলে তাঁদের প্রতি যেন কোন উৎপীড়ন করা না হয়; করা হলে তা হবে তোমাদের শয়তানী। আল্লাকে ভয় কর।'

আয়াৎ ২৮৩ : 'যদি প্রবাসে ভ্রমণকালে লেখক পাওয়া না যায় তবে অঙ্গীকারের সঙ্গে কিছু বন্ধক রাখলেই চল্‌বে। যদি কেউ কিছু জমা বা আমানত রাখে আমানতদার যেন বিশ্বস্ততার সঙ্গে সেই আমানত রক্ষা করেন এবং যেন পোষণ করেন হৃদয়ে আল্লার ভয়। প্রমাণ

গোপন করবে না, যে তা করে তার অন্তর পাপে কলুষিত; তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা সবই জানেন।'

আয়াৎ ২৮৬ : 'কোন আত্মাকেই সে যা বহন করতে পারবে তার অধিক বোঝা দেওয়া হয়নি।' অর্থাৎ মানুষের শক্তি ও সামর্থ্যানুযায়ীই তাকে কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কোন রকম অসম্ভব দাবী মানুষের উপর করা হয়নি।

'মানুষ যে-টুকু কল্যাণ বা পুণ্য অর্জ্জন করবে তাই সে পাবে এবং যে-টুকু পাপ অর্জ্জন করবে তাই সে ভোগ করবে।'

৩ঃ সূরা আল্ইম্রান্

আয়াৎ ৭ ঃ এই আয়াতের উপসংহারে আবার বলা হয়েছে 'জ্ঞানী ও বিবেচক ছাড়া আল্লার বাণীর মর্ম্ম গ্রহণ কেউ করতে পারে না।' যারা অজ্ঞ মূর্খ ও কাণ্ডজ্ঞান বিবর্জ্জিত তারা শুধু ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের খোলসটাই দেখে সেটাই বুঝতে পারে তার অন্তরে প্রবেশ করতে পারে না। শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত মর্ম্ম উদ্ধারের তারা অক্ষম। তাই কোরাণের বাণী-বাহক হজরত মোহাম্মদ বলেছেন 'জ্ঞান অর্জ্জন প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্যই ফরজ বা অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য।' আল্লার বাণীর অক্ষরকে ডিঙিয়ে তার মর্ম্মদেশে পৌঁছুতে হলে চাই জ্ঞান ও বিবেচনা শক্তি। বিদ্যা হচ্ছে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান ও বিবেচনা শক্তির উৎস স্বরূপ।

আয়াৎ ১৪ঃ 'নারী ও সন্তান সন্ততি সঞ্চিত স্বর্ণ রৌপ্য বনিয়াদী অশ্ব গৃহপালিত নানা রকমের পশু উর্ব্বর ভূসম্পদ এই সবই মানুষের চোখে লোভনীয় এবং মনোরম আকর্ষণ। এ সব এই পার্থিব জীবনেরই সম্পদ। কিন্তু সর্ব্বোত্তম লক্ষ্য ও আদর্শ হচ্ছে আল্লার নৈকট্য।'

আয়াৎ ১৭ ঃ যারা ধৈর্য্যশীল একনিষ্ঠ ও আত্মসংযমী যারা মনে ও মুখে কথায় ও কাজে সত্যব্রতী, যারা ভক্তির সঙ্গে উপাসনা করে, যারা আল্লার পথে খরচ করে অর্থাৎ দান করে, যারা প্রত্যুষে উঠে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাদের জন্য অভিনন্দন, তাদের জন্য স্বর্গের সুসংবাদ।'

আয়াৎ ১৯ ঃ 'আল্লার নিকট ইসলামই ধর্ম্ম।' ইসলাম অর্থ শান্তি ও আল্লায় আত্মসমর্পণ।'

আয়াৎ ২১ ঃ 'যাঁরা আল্লার নিদর্শনকে অস্বীকার করে, ন্যায়-ধর্ম্মকে উপেক্ষা করে নবীদের হত্যা করে, আর যে সব জ্ঞানী মানব সমাজে ন্যায় ও যথাযোগ্য ব্যবহার শিক্ষা দেন তাঁদেরে যারা হত্যা করে তাদের জন্য কঠোর শাস্তি ঘোষণা করা হচ্ছে।'

আয়াৎ ৫৭ : 'যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তারা আল্লার কাছ্ থেকে তার সম্পূর্ণ দাম বা পুরস্কার পাবে, কিন্তু যারা জুলুম বা অত্যাচার করে আল্লাহ্ তাদেরে ভালবাসেন না।'

আয়াৎ ৬৪ : 'বলো---আমরা আল্লার ছাড়া কারো উপাসনা করি না, আল্লার সঙ্গে কোন শরীক বা অংশীদার মিশাই না বা মানি না এবং আল্লাকে ছাড়া আমাদের মধ্য থেকে কাকেও প্রভু বা পৃষ্ঠপোষক (যথা, পোপ, পীর, পুরোহিত ইত্যাদি) দাঁড় করাই না' (অর্থাৎ আল্লার ছাড়া কারো আনুগত্য আমরা স্বীকার করি না।' আল্লার একত্ব সম্বন্ধে ইসলাম অনমনীয় ও আপোষহীন।

আয়াৎ ৭৬ : 'যারা অঙ্গীকার ও বিশ্বাস রক্ষা করে এবং সৎকাজ করে, আল্লাহ্ তাদেরে ভালবাসেন।'

আয়াৎ ৭৭ : 'তুচ্ছ মূল্যের বিনিময়ে যারা বিশ্বাস ও অঙ্গীকার বিক্রয় করে, তারা আল্লার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত---তা'দের জন্য বরাদ্দ কঠোর শাস্তি।'

আয়াৎ ৮৯ : 'যাঁরা তৌবা করেন ও নিজেদের সংশোধন করেন আল্লাহ্ তাঁদেরে ক্ষমা করেন, আল্লাহ্ অত্যন্ত করুণাময়।' সত্যিকার ও আন্তরিক অনুতপ্ত লোকের জন্য তৌবার ব্যবস্থা না থাক্‌লে তা-ও হ'ত অস্বাভাবিক কঠোরতা। মানুষ মাত্রেই ভুল করে থাকে কিন্তু মনে যখন পাপের জন্য বেদনাবোধ জাগে, অনুতাপ আসে এবং ভবিষ্যতে পাপ থেকে দূরে থাকার জন্য সে যখন সঙ্কল্প করে, তখন তার পূর্ব্ব কৃতকর্ম্মের জন্য তার ক্ষমা পাওয়া উচিত। মানব স্বভাবের দুর্ব্বলতার উপর ক্ষমাহীন কঠোরতা ইসলামের বিধান নয়। মানব স্বভাবকে ও তার দুর্ব্বলতাকে ইসলাম পদে পদেই স্বীকার করে---এই অর্থেই ইসলাম মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

আয়াৎ ৯২ : 'তোমার যা প্রিয় তা যতক্ষণ তুমি অনায়াসে দান করতে না পার বা দান না কর, ততক্ষণ তুমি সাধুতা অর্জ্জন করতে পারবে না।' যা মূল্যবান ও প্রিয় তা'ই দান করতে হয়। যা কোন

কাজে আসবে না, যার কোন মূল্য নেই, যা তুমি কোন প্রকারে বিলিয়ে দিতে পারলেই রেহাই পাও তা দান করা অকিঞ্চিৎকর।

আয়াৎ ১০৩ : 'আল্লার রজ্জুকে (বা ধর্ম্মকে) সকলে মিলে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।'

পরস্পরের ঐক্যবন্ধন পারিবারিক ও সামাজিক উন্নতির প্রথম ভিত্তি এবং দেশ ও জাতির সমৃদ্ধির উপায়, অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা পতন অশান্তি ও ধ্বংসের হেতু। ধর্ম্মই মানুষকে দিতে পারে প্রকৃত মিলনের সূত্র, রাষ্ট্রচেতনার উপর যে ঐক্য তার ভিত্তি বালির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তা' নিয়ে আসে মানুষের জন্য অবর্ণনীয় দুঃখ ও বিরোধ। ইউরোপের ইতিহাস ও বিশ্বব্যাপী দুই মহাসমর মানুষের সামনে তার দুই অবিস্মরণীয় সাক্ষী।

আয়াৎ ১০৪ : 'তোমাদের মধ্য থেকে এমন একদলের সৃষ্টি হউক যারা মানুষকে সর্ব্বপ্রকার সৎ ও মঙ্গলের দিকে আহ্বান করবে; তারা কী সত্য আর কী ন্যায় তা প্রচার করবে এবং বিরত করবে মানুষকে ভুল ও পাপ থেকে। এই সব লোকের প্রতি অভিনন্দন, এঁদের মনোবাসনা পূর্ণ হবে।'

আয়াৎ ১০৫ : 'যারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন, স্পষ্ট নিদর্শনের পরও যারা তর্ক ও ঝগড়ায় লিপ্ত, তাদের মত হয়োনা, তাদের অনুসরণ করো না---তাদের জন্য ভয়াবহ শাস্তি।'

আয়াৎ ১১৭ : 'যারা অবিশ্বাসী ও পাপী তারা এ-জীবনে যা-কিছু খরচ করে (কু-উদ্দেশ্য) তাকে তুলনা দেওয়া হয়েছে ঝড়ের সঙ্গে, যে-ঝড় নিয়ে আসে সর্ব্বনাশী তুষার। কু-পথে ব্যয় আত্ম-নিপীড়নকারীর জীবন-কালকে নষ্ট ও বিনাশ করে দেয়। আল্লাহ্ তাদের কোন ক্ষতি করেননি, তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে।'

আয়াৎ ১৩০ : সুদের কথা আবার বলা হচ্ছে: 'যারা বিশ্বাস কর, (অর্থাৎ যারা মুমেন) তারা সুদ খেয়ো না: দ্বিগুণ বা বহুগুণ। আল্লাকে ভয় কর।' অর্থাৎ আল্লার নিষিদ্ধ পাপ থেকে বিরত থাক এবং তা হলেই তোমার ভাগ্যে প্রকৃত সমৃদ্ধি লাভ ঘটবে।

লোভ ও স্বার্থপরতায়, উৎপীড়ন ও নিপীড়নে সমৃদ্ধি নেই, সমৃদ্ধির পথ হচ্ছে দান, করুণা, ত্যাগ ও সেবা।

আয়াৎ : ১৩৩ 'আল্লার ক্ষমা এবং সৎ ও সাধু ব্যক্তির জন্য যে-উদ্যান রচিত হয়েছে, যার বিস্তৃতি সমগ্র আকাশ ও ভূমণ্ডলব্যাপী তাকে পাওয়ার জন্য ক্ষীপ্র গতিতে ছুট।'

এই আয়াতে স্বর্গ সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত করা হয়েছে তা অত্যন্ত অর্থপূর্ণ। স্বর্গ সম্বন্ধে সাধারণের ধারণার সঙ্গে এই ইঙ্গিতের মিল নেই। পুণ্য কাজের যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ, তৃপ্তি ও আত্মপ্রসাদ, তাই ভূমানন্দ, তা সীমাবদ্ধ নয়, গণ্ডীবদ্ধ নয়, তা প্রাচীরঘেরা উদ্যান নয়। উদ্যানের সঙ্গে তুলনা দিয়ে তাই বলা হচ্ছে সেই উদ্যান সর্ব্ব-ব্যাপ্ত।

আয়াৎ ১৩৪ : 'যারা সম্পদে ও আপদে অকাতরে দান করে, যারা ক্রোধ দমন করে এবং সকল মানুষকে (অর্থাৎ মানুষের অপরাধকে) ক্ষমা করে, তাদের জন্যই স্বর্গ। কারণ, যারা সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদেরে ভালবাসেন।'

আয়াৎ ১৩৫ : 'যারা লজ্জিত হওয়ার মত কাজ করেছে অথবা নিজের আত্মার উপর জুলুম করেছে, তারা যদি সরল মনে ও সর্ব্বান্তঃকরণে আল্লাকে স্মরণ করে এবং নিজেদের কৃত পাপের জন্য আল্লার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, নিজের ভুল বুঝতে পেরে আর কখনো জেদ করে না, আল্লাহ তাদেরে ক্ষমা করেন। আল্লাহ্ ছাড়া কে পাপ ক্ষমা করতে পারে ?'

আয়াৎ ১৩৭ : 'তোমার আগে বিশ্বে কত রকমের জীবন-রীতিই না অতিবাহিত হয়েছে। যারা সত্যকে অস্বীকার করেছে, বিশ্ব-পর্য্যটন করে তাদের পরিণাম একবার স্বচক্ষে দেখে এস।'

আয়াৎ ১৩৯ : 'ভগ্নমনোরথ হয়ো না, নিরাশ হয়ো না, যদি তুমি মুমেন হও, বিশ্বাসী হও, জয়ী তুমি হবেই।'

আয়াৎ ১৪০ : 'যদি তুমি কোন আঘাত পেয়ে থাক, নিশ্চয়ই জেনে রাখো ঐ রকম আঘাত অন্যেরাও পেয়েছে। কারা প্রকৃত বিশ্বাসী ও

সত্যের শহীদ তা জানার জন্যে আল্লাহ্ মানুষের জীবনে ভাগ্যের বিপর্য ঘটিয়ে থাকেন। আল্লাহ্ অত্যাচারীকে ভালবাসেন না।'

আয়াৎ ১৫০ : 'হ্যাঁ, আল্লাই তোমার রক্ষক এবং তিনিই উ সহায়।'

আয়াৎ ১৫৭ : 'আল্লার পথে অর্থাৎ ধর্ম্ম ও সৎকাজ কর গিয়ে অথবা ধর্ম্ম ও সত্যের জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে তুমি যদি নি হও বা মৃত্যু বরণ কর, তোমার জন্য জমা থাক্‌বে আল্লার ক্ষমা করুণা : যে ক্ষমা ও করুণা শত্রুপক্ষের সমস্ত মৌজুদের চেয়ে উত্তম

আয়াৎ ১৬০ : 'যদি আল্লাহ্ তোমাকে সাহায্য করেন, কো তোমায় পরাস্ত করতে পারবে না। আল্লাহ্ যদি তোমায় ত্যাগ করে এরপর কে আর তোমায় সাহায্য করতে পারবে? মুমিনদের উ আল্লায় বিশ্বাস স্থাপন করা।'

আয়াৎ ১৬৯ : 'যাঁরা আল্লার রাস্তায় মৃত্যু বরণ করেছেন তাঁে মৃত মনে করো না। আল্লার সমীপে তাঁরা জীবিত।' শহীদী ত অমর—মুসলিমের কাছে শহীদের আসন অত্যন্ত উচ্চে।

আয়াৎ ১৭২ : আহত হওয়ার পরেও যাঁরা আল্লাহ্ ও রছু আহ্বানে সাড়া দেন, যাঁরা সৎকাজ করেন, মন্দ কাজ থেকে থা বিরত, তাঁদের জন্য মহৎ পুরস্কার।'

আয়াৎ ১৮০ : 'আল্লাহ্ অনুগ্রহ করে তাঁর প্রাচুর্য্য যা দিয়েছেন তারা যেন প্রলোভনের বশে নিজেরা সব দখল ও মৌজুদ না রাখে। এই কি তাদের জন্য ভাল মনে কর? কখনো না, তাদের জন্য অত্যন্ত নিকৃষ্ট পথ। অনতিবিলম্বে শেষ বিচারের যে সব বস্তু লোভের বশে তারা মৌজুদ করে রেখেছে, তা পেঁচ গলাবন্ধের মত তাদের গলায় বেঁধে দেওয়া হবে। আকাশ ও মর্ত্যভ যাবতীয় মিরাছ বা সম্পদ আল্লারই।' ঐসলামিক ধনবণ্টন অনুসরণ করলে পৃথিবীতে ধনতন্ত্র ও পুঁজিবাদের জন্ম হ'ত না। ধ ও পুঁজিবাদের ভয়াবহ নিষ্ঠুরতা ও পরিণতি আজ আমরা আম চোখের সামনেই অহরহ দেখতে পাচ্ছি।

আয়াৎ ১৮৫ : 'প্রত্যেক আত্মাকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।'

আয়াৎ ১৮৮ : 'যারা নিজেদের কৃতকর্ম্মের ফলের জন্য অহঙ্কৃত হয় এবং তারা যা করেনি তার জন্যও যারা প্রশংসা-পিয়াসী, তারা শাস্তির হাত থেকে রেহাই পাবে এই কথা মনে করো না। তাদের জন্য প্রতীক্ষা করছে কঠোর বেদনাদায়ক শাস্তি।'

আয়াৎ ১৯০ : 'আকাশ ও পৃথিবী-সৃষ্টিতে, দিন রাত্রির বৈপরীত্যে, সমজদার বা জ্ঞানী লোকের জন্য সুনিশ্চিত নিদর্শন রয়েছে।' কল্পনাতীত বিপুল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের দিকে তাকালে আল্লার মহিমা ও ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে সহজেই ধারণা করা যায়। যারা জ্ঞানী ও চিন্তাশীল কোরাণে বার বার তাদের দৃষ্টি প্রকৃতির দিকে আকর্ষণ করা হয়েছে এবং এই সব আয়াতে রয়েছে প্রকৃতিকে জানবার ও তাকে আয়ত্ত করবার ইঙ্গিত। প্রকৃতি-বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে কোন রকমের উন্নতিই সম্ভব নয়। তাই প্রকৃতির গূঢ় রহস্য আবিষ্কারের সাধনাই আজ মানুষের শ্রেষ্ঠ সাধনায় পরিণত হয়েছে।

আয়াৎ ১৯১ : 'যে সব লোক দাঁড়িয়ে, বসে বা শুয়ে অর্থাৎ সর্ব্ব অবস্থায় আকাশও ভূমণ্ডলের বিস্ময়কর সৃষ্টি রহস্য ধ্যান করে এবং ভাবে---'প্রভু তুমি এইসব বৃথা সৃষ্টি কর নাই', তারাই পুরস্কৃত হবে।'

আয়াৎ ১৯৫ : 'নর-নারী নির্ব্বিশেষে তোমাদের কারও কোন কর্ম্ম নষ্ট হবে না, তোমরা একে অপরের অংশ এবং পরস্পর পরস্পরের জন্য। যারা আল্লার কারণে গৃহত্যাগ করেছে অথবা গৃহ থেকে বিতাড়িত হয়েছে অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যুদ্ধ করেছে অথবা নিহত হয়েছে, আল্লাহ্ তাদের সমস্ত অপরাধ মার্জনা করবেন এবং তাদের জন্য স্বর্গ অবধারিত।'

আয়াৎ ২০০ : 'হে বিশ্বাসিগণ, অধ্যবসায় সহকারে ধৈর্য্য ধারণ কর, ধৈর্য্য রক্ষায় প্রতিযোগিতা কর, (প্রতিযোগিতার দ্বারা) পরস্পরকে শক্তিমান কর, আল্লাকে ভয় কর, যেন তুমি সমৃদ্ধ হতে পার।'

ইসলাম সৎকাজে প্রতিযোগিতা সমর্থন করে, এই রকম প্রতিযোগিতায় হিংসা, বিদ্বেষ ও স্বার্থপরতার স্থান নেই। তাই বলা হয়েছে প্রতিযোগিতার ফলে তোমরা উভয়ে যেন শক্তিমান হও, একজনকে খাটো করে আর একজন বড় হওয়া ইসলামের আদর্শ নয়। পাছে কোন পক্ষ অন্যায় করে বসে এইজন্য বলা হয়েছে, আল্লাকে ভয় কর। আল্লাকে যে আন্তরিক ভাবে ভয় করে তার দ্বারা কখনো অন্যায় বা পাপ হতে পারে না এবং তাই সুস্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ দেওয়া হচ্ছে, এই পথেই আছে মানুষের জন্য অসীম সমৃদ্ধি।

৪ : সুরা নেছা

আয়াৎ ১ : এই আয়াতে আবার তাগিদ দেওয়া হচ্ছে---'যে গর্ভ তোমাকে ধারণ করেছে, সে-গর্ভ অর্থাৎ গর্ভধারিণী জননীর প্রতি কর্ত্তব্য কর ও শ্রদ্ধা নিবেদন কর।' ইসলামের রছুলও বলেছেন ---মায়ের পদতলেই সন্তানের বেহেস্ত!

আয়াৎ ২ : 'এতিম যখন সাবালেগ হয়, তার সম্পত্তি তাকে ফিরিয়ে দাও। তোমার নিকৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে তার উৎকৃষ্ট বস্তুর বদল করোনা। তোমার নিজের বিষয়-সম্পত্তির সঙ্গে এতিমের বিষয়-সম্পত্তি মিশিয়ে তার অংশ আত্মসাৎ করোনা। কারণ ইহা নিশ্চয়ই ভয়ানক পাপ।'

আয়াৎ ৩ : 'ন্যায় ও সমব্যবহার করতে না পারার আশঙ্কা থাকলে একটি মাত্র বিয়ে করবে। অন্যায় ও অবিচার থেকে তোমাকে রক্ষা করার ইহাই উৎকৃষ্ট উপায়।'

আয়াৎ ৪ : 'যেসব মেয়েদের বিয়ে করবে তাদেরে স্বেচ্ছায় যৌতুক উপঢৌকন দেবে; কিন্তু তারা যদি স্বেচ্ছায় তার কিয়দংশ মাফ করে দেয়, তা তুমি স্বচ্ছন্দে ভোগ করতে পার।'

আয়াৎ ৫ : (এতিম সম্বন্ধে বলা হচ্ছে) 'যাদের বুঝবার শক্তি নেই, যারা নির্ব্বোধ ও বোকা তাদের উপর সম্পত্তির ভার দিয়ো না; কিন্তু তাদের ভরণপোষণ করবে, তাদের সঙ্গে ন্যায় ও সদয় কথা বল্‌বে।'

আয়াৎ ৬ : 'বিবাহ-বয়স পর্য্যন্ত পৌঁছার পূর্ব্বেতক্ এতিমদের পরীক্ষা করে দেখ্‌বে। যদি বুদ্ধি বা বিবেকের পূর্ণতা লক্ষ্য কর, তাদের সম্পত্তি তাদেরে ফিরিয়ে দাও। অপব্যয়ের দ্বারা অথবা পাছে তারা বড় হয়ে ওঠে, সেই জন্য তাড়াতাড়ি (তাদের সম্পত্তি) আত্মসাৎ করো না। যদি অভিভাবক সম্পন্ন হন, তিনি যেন কোন পারিশ্রমিক না নেন,

যদি দরিদ্র হন তবে ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত পারিশ্রমিক নিতে পারেন। এতিমের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়ার সময় তাদের সাক্ষাতেই সাক্ষী রাখবে। কিন্তু হিসাব গ্রহণে আল্লাহ্ সর্ব্বতোভাবে সমর্থ।' অর্থাৎ মানব সাক্ষীকে ফাঁকি দিতে পারলেও আল্লাকে ফাঁকি দিতে পারবে না।

আয়াৎ ৭ : 'পিতা-মাতা বা নিকট আত্মীয়, মৃত্যুর সময় যে সম্পত্তি রেখে যান, তা অল্প হউক বা বেশী হউক---তাতে নর ও নারীর অংশ আছে---বিধিবদ্ধ অংশ।'

আয়াৎ ৮ : 'যদি বণ্টনের সময় অন্য আত্মীয়-স্বজন, এতিম বা দরিদ্র লোক উপস্থিত থাকে, মৃতের সম্পত্তি থেকে তাদেরে খাওয়াবে এবং তাদের সঙ্গে ন্যায় ও সদয় কথা বলবে।'

আয়াৎ ৯ : 'যারা সম্পত্তি বণ্টন করবে তারা যেন নিজেরা অসহায় পরিবার ফেলে গেলে নিজেদের সম্পত্তি সম্বন্ধে যে রকম ভয় করবে, অপরের সম্পত্তি বণ্টনের সময়ও যেন অনুরূপ ভয় মনে পোষণ করে। তারা যেন আল্লাকে ভয় করে ও যথাযোগ্য সান্ত্বনা বাক্য বলে।'

আয়াৎ ১০ : 'যারা অন্যায়ভাবে এতিমের সম্পত্তি ভক্ষণ করে, তারা উদরে অগ্নি গ্রহণ করে। শীঘ্রই জ্বলন্ত অগ্নিদাহের জ্বালা তাদের ভোগ করতে হবে।'

আয়াৎ ১১ : উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আল্লার নির্দ্দেশ: 'পুরুষ-সন্তান দুই মেয়ে সন্তানের সমান পাবে। যদি দুই বা ততোধিক মেয়ে সন্তান থাকে, তারা দুই-তৃতীয়াংশ পাবে, যদি একটি মেয়ে থাকে তার অংশ হবে অর্দ্ধেক। মৃতের সন্তান-সন্ততি থাকলে মা বাবা প্রত্যেকে এক ষষ্ঠাংশ পাবে, যদি সন্তান-সন্ততি না থাকে মা বাবাই যদি একমাত্র উত্তরাধিকারী হয়, তা হলে মা এক তৃতীয়াংশ পাবে। যদি মৃতের ভাই ভগ্নি থাকে, তবে মা এক-ষষ্ঠাংশ পাবে। সব সময় মৃতের নির্দ্দেশ (অছিয়ৎ) ও কর্জ্জ পরিশোধের পর বণ্টন করতে হবে।'

আয়াৎ ১২ : 'স্ত্রী যদি নিঃসন্তান মারা যায়, স্বামী স্ত্রীর সম্পত্তির অর্দ্ধেক পাবে, সন্তান থাক্‌লে স্বামী এক-চতুর্থাংশ---অছিয়ৎ পালনও কর্জ্জ পরিশোধের পর যা থাকবে তাই বণ্টন হবে।

স্বামীর যদি কোন সন্তান না থাকে স্ত্রী এক-চতুর্থাংশ পাবে, সন্তান থাকলে স্ত্রী এক-অষ্টমাংশ পাবে, অছিয়ৎ পালন ও কর্জ্জ পরিশোধের পর।

যদি নর বা নারীর, যার উত্তরাধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠেছে, কোন উর্দ্ধতন বা অধস্তন উত্তরাধিকারী না থাকে, কিন্তু যদি একটি ভাই বা একটি ভগ্নি (শুধু মায়ের পক্ষ থেকে) থাকে তবে প্রত্যেকে এক-ষষ্ঠাংশ পাবে। যদি ভাই ভগ্নি দুইয়ের বেশী থাকে তারা এক-তৃতীয়াংশের ভাগ পাবে—মৃতের অছিয়ৎ পালন ও কর্জ্জ পরিশোধের পর। কারো ক্ষতি সাধন যেন না হয়। কর্জ্জের মধ্যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার খরচও সামিল।'

আয়াৎ ১৫ : 'যদি কোন মেয়ে ব্যভিচার করে, চারজন বিশ্বস্ত সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করবে।' সাধারণতঃ দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্যে যে কোন অপরাধ প্রমাণিত করার নিয়ম; কিন্তু সহজে সামান্য কারণে লোকে মেয়েদের চরিত্রের উপর দোষারোপ করে থাকে বলেই তাদের চরিত্র সম্বন্ধে কোন অভিযোগের প্রমাণ চারজন বিশ্বস্থ সাক্ষীর উপর বরাত দেওয়া হয়েছে।

আয়াৎ ১৭ : 'যদি অজ্ঞতার বশবর্ত্তী হ'য়ে কেউ কোন পাপ করে; কিন্তু অবিলম্বে তার জন্য অনুতপ্ত হয়, অর্থাৎ তৌবা করে, আল্লাহ তাদের ক্ষমা করেন।'

আয়াৎ ১৯ : 'নিষ্ফল দম্ভের বশবর্ত্তী হয়ে নিজেদের সম্পত্তি উদরসাৎ করো না; কিন্তু সদিচ্ছার সহিত আপোষে পরস্পর ব্যবসা-বাণিজ্য করবে, নিজেকে ধ্বংস করো না।'

আয়াৎ ৩৫ : 'স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যদি বিরোধের আশঙ্কা থাকে, তবে দু'জন সালিশকার নিযুক্ত কর---একজন স্বামীর আর একজন স্ত্রীর পক্ষ থেকে। তাঁরা যদি শান্তি কামনা করেন আল্লাহ্ আপোষের কারণ হবেন।'

আয়াৎ ৩৬ : ৩৭ : 'আল্লার সেবা কর, তাঁর কোন অংশীদার স্বীকার করো না, ভাল কর -পিতা-মাতার, আত্মীয়-স্বজনের, এতিমের,

অভাব-গ্রস্তের নিকট-প্রতিবেশীর, দূর-অপরিচিত প্রতিবেশীর, পার্শ্ববর্ত্তী সহচরের, পথিকের আর তোমার দক্ষিণ হস্ত যাঁদের উপর প্রভুত্ব করছে (চাকর, দাস, দাসী) তাদের প্রতি। আল্লাহ্ একগুঁয়ে ও দাম্ভিককে ভালবাসেন না এবং আর ভালবাসেন না কৃপণ ও যারা অন্যের উপর কৃপণতার নির্দ্দেশ চালায় তাদেরকে। আল্লাহ্ যে প্রাচুর্য্য তাদের দিয়েছেন, তা যারা গোপন করে তারাও আল্লার ভালবাসা থেকে বঞ্চিত।'

আয়াৎ ৩৮ : 'যারা পাপ বা শয়তানকে করেছে অন্তরঙ্গ, নিজেদের জন্য কি ভয়াবহ সুহৃদই না তারা গ্রহণ করেছে।'

আয়াৎ ৪০ : 'আল্লাহ্ তিলমাত্রও অন্যায় করেন না। যদি কিছু সৎকর্ম্ম করা হয় আল্লাহ্ তাকে দ্বিগুণিত করেন ও মহত্তর পুরস্কারে করেন পুরস্কৃত।'

আয়াৎ ৪৩ : 'নেশার অবস্থায়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তুমি যা বল তা বুঝ্‌তে পার, ততক্ষণ উপাসনার নিকটবর্ত্তী হয়ো না অর্থাৎ নামাজ পড়ো না,—অপবিত্র অবস্থায়ও না।'

মাতাল ও নাপাক অবস্থায় নমাজ পড়া নিষেধ।

আয়াৎ ৫১ : 'যাদুবিদ্যা ও পাপে যারা বিশ্বাস করে তারা অভিশপ্ত।'

আয়াৎ ৫৮ : আল্লার আদেশ: 'যদি আমানত রেখে থাক, যার প্রাপ্য তাকে তা ফেরৎ দাও। যখন তুমি দু'জনের মাঝে বিচার করতে বস, তখন ন্যায় বিচার করো।'

আয়াৎ ৫৯ : আল্লাকে মান, রছুলকে মান, আর যারা তোমাদের মধ্যে নেতা বা পরিচালকের আসনে অধিষ্ঠিত, তাঁদেরে মেনে চলো।

তোমাদের মধ্যে যদি কোন মত-বিরোধ উপস্থিত হয়, তবে আল্লাহ্ ও রছুলের নির্দ্দেশ গ্রহণ করবে অর্থাৎ কোরাণ ও হাদিসের নির্দ্দেশমত চল্‌বে।'

আয়াৎ ৭৪ : 'আল্লার জন্য অর্থাৎ ধর্ম্ম, সত্য ও ন্যায়ের জন্য যারা যুদ্ধ করে, তারা নিহত হউক বা জয়ী হউক, তাদের জন্য মহৎ পুরস্কার রয়েছে।'

আয়াৎ ৭৫ : ন্যায় ও সত্যের জন্য, নর-নারী ও শিশুকে অত্যাচার থেকে বাঁচাবার জন্য যুদ্ধ করার তাগিদ ইসলামে বার বারই দেওয়া হয়েছে। এই আয়াতেও সেই তাগিদই আবার দেওয়া হচ্ছে।

আয়াৎ ৭৮ : 'যেখানেই থাক মৃত্যু তোমাকে খুঁজে নেবে, এমন কি সুউচ্চ দৃঢ়দুর্গে থাক্‌লেও।'

আয়াৎ ৭৯ : 'হে মানব, তোমার জীবনে যা কিছু উৎকৃষ্ট তা আসে আল্লার কাছ থেকে, আর যা-কিছু মন্দ ঘটে তার মূল তোমার মনে। অর্থাৎ মন্দ বাসনার ফলেই মানুষ হয় মন্দ ও পেয়ে থাকে মন্দ ফল।'

আয়াৎ ৮৫ : 'যে সৎকর্ম্মের পরামর্শ দেয় এবং তাতে করে সহায়তা সে তার পুণ্যের অংশভাগী হয়; যে কু-কর্ম্মের পরামর্শ দেয় ও তাতে করে সহায়তা সে তার বোঝার (পাপের) অংশ ভাগী হয়।'

আয়াৎ ৮৬ : 'যখন তোমাকে শিষ্ট সম্ভাষণ করা হয়, অধিকতর শিষ্টতার সঙ্গে প্রতিসম্ভাষণ করবে। অন্ততঃ সম-প্রতিসম্ভাষণ জানাবে। আল্লাহ্ সব বিষয়ের নিখুঁত হিসেব নিয়ে থাকেন।'

আয়াৎ ৯৫ : 'যে-সব বিশ্বাসী নিশ্চেষ্ট হয়ে গৃহকোণে বসে থাকে, তাদের চেয়ে যে সব বিশ্বাসী আল্লার পথে নিজের জান ও মাল দিয়ে সংগ্রাম করে তাদের আসন অনেক উচ্চে—তাদের জন্য বিশেষ পুরস্কার।

আয়াৎ ১০০ : 'যে আল্লার জন্য গৃহত্যাগ করে, পৃথিবীতে সে পায় বহু আশ্রয়, যা যুগপৎ ব্যাপক ও প্রশস্ত। আল্লাহ্ ও রছুলের জন্য যদি তার গৃহহারা অবস্থায় মৃত্যুও হয়, সে হয়ে পড়ে আল্লার কাছে সুনিশ্চিত দাবীদার।'

আয়াৎ ১০৭ : 'আত্মপ্রবঞ্চকের পক্ষ সমর্থন করো না; আল্লাহ্ প্রবঞ্চক ও পাপীকে ভালবাসেন না।'

আয়াৎ ১১০ : 'যদি কেহ পাপ করে অথবা নিজের আত্মার উপর করে জুলুম এবং পরে যদি আল্লার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে পাবে আল্লাকে ক্ষমাশীল ও দয়ালু।'

আয়াৎ ১১১ : 'যদি কেউ পাপ অর্জ্জন করে, সে তা তার আত্মার জন্যই করে থাকে, অর্থাৎ তার পাপের ভাগী অন্য কেউই হবে না।'

আয়াৎ ১১২ : 'যদি কেউ নিজে পাপ বা দোষ করে অন্য নির্দ্দোষী ব্যক্তির উপর আরোপ করে, তা হ'লে সে মিথ্যা ও ঘোরতর পাপ দুই-ই করে, অর্থাৎ দুয়েরই শাস্তি সে বহন করবে।'

আয়াৎ ১১৪ : 'গুপ্ত কথায় কোন কল্যাণ নেই; কিন্তু যদি দানের জন্য বা সুবিচারের জন্য বা পরস্পরের মধ্যে আপোষ-রফার জন্য (গোপন আলোচনা) করা হয় তাতে দোষ নেই।'

আয়াৎ ১২২ : 'যারা বিশ্বাস করে এবং সৎ কাজ করে তারা স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করবে, যে উদ্যানে প্রবাহিত হয়ে চলেছে নদী, তারা চিরকাল সেখানেই বাস করবে। আল্লার প্রতিশ্রুতিই সত্য, আল্লার কথা থেকে আর কার কথা অধিকতর সত্য হতে পারে?'

আয়াৎ ১২৪ : 'নর বা নারী যে কেউ যদি সৎ কাজ করে, যদি বিশ্বাসী হয় সে স্বর্গে প্রবেশ করবে তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার করা হবে না।'

আয়াৎ ১২৯ : (যদি একাধিক বিয়ে করা হয়) সকলের প্রতি সম ও ন্যায় বিচার, প্রবল ইচ্ছা থাকলেও সব সময় করা যায় না। কিন্তু কারো প্রতি সম্পূর্ণভাবে বিমুখ হয়ে তাকে ঝুলিয়ে রেখো না। যদি সৌহার্দ্দের সঙ্গে আপোষ কর ও আত্মদমন কর, তবে আল্লাকে পাবে চির-ক্ষমাশীল, তিনি অত্যন্ত সদয়।'

আয়াৎ ১৩৫ : 'নিজের, তোমার পিতামাতার, আত্মীয়-স্বজনের অথবা ধনী বা গরীবের বিরুদ্ধে হলেও, হে বিশ্বাসীগণ, ন্যায়ের প্রতিভূ আল্লার সাক্ষীস্বরূপ, দৃঢ়ভাবে সুবিচারের পক্ষ সমর্থন করো। আল্লাহ্ দুই পক্ষকেই সুচারুরূপে রক্ষা করতে পারেন। তোমার মনের লালসা-

বৃত্তির অনুসরণ করো না, পাছে তুমি ন্যায় বিচারের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়। যদি তুমি বিচারকে কলুষিত কর বা বিচার কর্‌তে অস্বীকার কর, তাও আল্লার অজ্ঞাত থাকবেনা।'

আয়াৎ ১৫০ : ১৫১ : 'যারা আল্লাহ ও রছুলগণকে অস্বীকার করে ও যারা আল্লাহ্ ও রছুলগণের মধ্যে নিয়ে আসে পার্থক্য, বলে আমরা কতক গুলি রছুলকে বিশ্বাস করি ও কতকগুলিকে করি অস্বীকার এবং যারা গ্রহণ করে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্য পথ, তারা নিঃসন্দেহে অবিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীদের জন্যে আমরা অত্যন্ত অপমানকর শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছি।' এই ভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছে বিশ্বমানবধর্ম্মের ভূমিকা, সব দেশের, সব জাতের, সব মহাপুরুষকেই স্বীকার করতে হবে, গ্রহণ করতে হবে তাদের বাণী ও শিক্ষার মর্ম্ম। কাকেও ঘৃণা করা বা বাদ দেওয়া চল্‌বে না। সত্যের কোন জাত নেই, বর্ণ নেই, ভৌগোলিক সীমা নেই—রছুলেরা হচ্ছেন সত্যের বাহক ও সাধক। সত্যকে জান্‌তে হলে সব দেশের, সব জাতের, সব যুগের রছুলকেই মান্‌তে হবে। এই ভাবে হজরত মোহাম্মদ জ্ঞানের চরম কথা---বিশ্বমানবের ভ্রাতৃত্ব ও সাম্য প্রচার করেছেন এবং এই অর্থেই তিনি শেষ নবী। কোরাণ অন্যত্রও ঘোষণা করেছে 'পৃথিবীতে এমন কোন জাত নেই যাদের কাছে নিজেদের মধ্য থেকে রছুল প্রেরিত হয়নি।'

আয়াৎ ১৭১ 'ধর্ম্মে অতিরঞ্জন বা বাড়াবাড়ি করোনা। আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ছাড়া মিথ্যা বলো না।' ধর্ম্মে অতি রঞ্জন বা ধার্ম্মিকতা বহু ধর্ম্মকে বিকৃতির পথে নিয়ে গেছে। খ্রীষ্টানেরা অতিরঞ্জনের ফলে যিশুকে বানিয়েছে আল্লার সন্তান, কোন কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায় মানুষকে করেছে অবতার ও দেবতায় পরিণত। এই অতিরঞ্জন বা সীমালংঘনের বিরুদ্ধে কোরাণে সাবধানবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে বারে বারে।

৫ : সূরা মায়েদা

আয়াৎ ১ : 'হে বিশ্বাসিগণ, সমস্ত দায়িত্ব পালন কর'। দায়িত্ব শব্দ এখানে খুব ব্যাপক অর্থে-ই ব্যবহৃত হয়েছে,---আধ্যাত্মিক, দৈহিক, মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার মানবীয় কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব অর্থে-ই এই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। Escapism বা পলাতক মনোবৃত্তির স্থান ইসলামে নেই। দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যকে এড়িয়ে, জীবনকে ফাঁকি দিয়ে যে-সন্ন্যাস ইসলাম তাকে কোন দিন সুচক্ষে দেখেনি।

আয়াৎ ৩ : 'সৎ ও পুণ্য কার্য্যে পরস্পর সহায়তা করবে, কিন্তু পাপ ও শত্রুতা সাধনে একে অপরের সাহায্য করো না।'

আয়াৎ ৫ : 'যা ভাল ও পবিত্র তা খাওয়াই বিধিসঙ্গত'।***

আয়াৎ ৬ : 'গ্রন্থ-প্রাপ্ত জাতির খাদ্য তুমি খেতে পার, তোমার খাদ্য তারা খেতে পারে। বিশ্বাসী সতী নারীকে যে তুমি শুধু বিয়ে করতে পার তা নয়, গ্রন্থ-প্রাপ্ত জাতির সতী নারীকেও বিয়ে করা বিধিসঙ্গত।' অন্যান্য সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধবিহীন বিচ্ছিন্ন সামাজিক ব্যবস্থা ইসলামের আদর্শ নয়। সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ জীবন, অন্য সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ, আত্মীয়তা ও ভাবের আদান প্রদানের পথ যেখানে রুদ্ধ তেমন বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডিত জীবন কখনো মানুষের জন্য কাম্য হতে পারে না। ইসলাম তেমন জীবন সমর্থন করেনি। এইভাবে ইসলাম এক মানব-জাতিত্ব গঠনের পথ সুগম করে দিয়েছে। পৌত্তলিক জাতির সঙ্গে মুসলমান ধর্ম্মনীতির মৌলিক ও আচার ব্যবহারের এত বিরাট ব্যবধান রয়েছে যে, তাতে পরস্পরের ধর্ম্ম বজায় রেখে শান্তিতে পারিবারিক দাম্পত্য জীবনযাপন সম্ভব নয়। তাই পৌত্তলিকের সঙ্গে বিবাহ-সম্বন্ধ ইসলাম অনুমোদন করেনি।

আয়াৎ ৯ : 'আল্লার ওয়াস্তে, ন্যায়ের সাক্ষ্য হিসেবে দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হও। অপরের প্রতি ঘৃণা যেন তোমাকে অন্যায়ের দিকে

অথবা সুবিচারের পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে না যায়। ন্যায়বান হও, ন্যায় পুণ্যের নিকটতম প্রতিবেশী।'

আয়াৎ ৩৫ : 'খুনী বা যে-লোক দেশে অশান্তি বিস্তার করছে তাকে ছাড়া যে-কোন একজন (নিরপরাধ) লোককে হত্যা করা একটা সমগ্র জাতিকে হত্যা করার সমতুল্য এবং যে-কেউ একজন লোকের জীবন রক্ষা করে সে যেন একটা জাতির জীবন রক্ষা করল।'

আয়াৎ ৩৬ : এই আয়াতে দেশে অশান্তি সৃষ্টি করাকে আল্লাহ্ ও রছুলের বিরুদ্ধাচরণের সমতুল্য বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং তার জন্য একই রকম শাস্তির বিধান দেওয়া হয়েছে।

আয়াৎ ৪৫ : 'ধর্ম্মাদেশ লংঘনকারীরাও যদি তোমার কাছে বিচারের জন্য আসে, ন্যায়ভাবে বিচার করবে। আল্লাহ ন্যায়-বিচার ভালবাসেন।'

আয়াৎ ৪৮ : সমান প্রতিশোধ গ্রহণের বিধান দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ প্রাণের জন্য প্রাণ, চক্ষুর জন্য চক্ষু, নাকের জন্য নাক, কানের জন্য কান, দাঁতের জন্য দাঁত, আঘাতের পরিবর্ত্তে আঘাত। কিন্তু যদি কেউ বদান্যতার বশবর্ত্তী হয়ে প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষমা করে দেয়, ইহা তার পক্ষে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ।

আয়া ৮০ : 'হে গ্রন্থ-প্রাপ্ত জাতি! ধর্ম্ম ব্যাপারে যা ন্যায় সঙ্গত তার সীমা লংঘন করো না, সত্যকে অতিক্রম করো না। অতীতে যে সমস্ত লোক বিপথগামী হয়েছে তাদের নিষ্ফল কামনার অনুসরণ করো না, যারা বহু লোককে বিপথগামী করেছে এবং নিজেরা সোজা পথ ছেড়ে চলে গেছে বিপথে তাদের পথও গ্রহণ করো না।'

আয়াৎ ৯০ : 'হে বিশ্বাসিগণ, যে-সব উৎকৃষ্ট বস্তু তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে, তাকে হারাম মনে করো না। কখনো সীমা লংঘন করো না। আল্লাহ্ সীমা লংঘনকারীকে ভালবাসেন না।' বৈরাগ্য ও অতিরিক্ত কৃচ্ছ্র সাধনা, আত্মনিপীড়নেরই সামিল; সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও উৎকৃষ্ট বস্তুর স্বাদ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা ইসলাম পছন্দ করে না।

আয়াৎ ৯১ : 'আল্লাহ্ যে-সব হালাল ও উৎকৃষ্ট বস্তু দিয়েছেন তা ভক্ষণ করো, কিন্তু যে-আল্লাকে তুমি বিশ্বাস কর, পোষণ কর মনে তাঁর ভয়।'

আয়াৎ ৯৩ : নেশা ও বাজিখেলাকে এই আয়াতে শয়তানের কাজ বলেই অভিহিত করা হয়েছে।

আয়াৎ ৯৬ : 'যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকাজ করে তারা অতীতে (ইসলাম প্রচার বা গ্রহণ করবার পূর্ব্বে) যা খেয়েছে তার জন্যে তাদের দোষারোপ করা হবে না---যদি তারা পাপ থেকে আত্ম-রক্ষা করে, বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে।' পাপ থেকে আত্মরক্ষা ও সৎ কাজ করার তাগিদ এই আয়াতে তিন তিন বার একই সঙ্গে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

আয়াৎ ১০৩ : 'নিকৃষ্ট বস্তু উৎকৃষ্ট বস্তুর সমান হতে পারে না---যদিও নিকৃষ্টের প্রাচুর্য্য তোমাদের চক্ষুতে লাগায় তাক্। শুধু সংখ্যা বা পরিমাণ গুণের সমান হতে পারে না।'

আয়াৎ ১০৪ : 'যে সব গুপ্ত বিষয় প্রকাশ করা হলে তোমরা বিপদে পড়বে তা জানতে চেয়ো না।' ভবিষ্যৎ বা অপরের মনের খবর জানবার কৌতূহল দমন করা উচিত—ঐ-সব জ্ঞান অনেক সময় মানুষকে নিয়ে যায় অশান্তির মধ্যে।

আয়াৎ ১০৮ : 'হে বিশ্বাসিগণ, নিজের আত্মাকে পাহারা দাও। যদি তুমি ন্যায়ের অনুসরণ কর, বিপথগামীরা তোমার কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। তোমাদের সকলের লক্ষ্য আল্লাহ্—তোমরা যাই কর তার সত্যস্বরূপ তিনি তোমাদের দেখাবেন।'

৬ সুরা আনাম্

আয়াৎ ১ : 'যিনি আসমান জমিন, আলো ও অন্ধকার সৃষ্টি করেছেন সব প্রশংসা সেই আল্লারই। তবুও যারা ধর্ম্মকে মানে না, তারা তাদের প্রতিপালক-প্রভুর সমকক্ষ অংশীদার স্বীকার করে বসে!'

আয়াৎ ২ : 'তিনিই তোমাকে কাদা-মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং তারপর নির্দ্ধারিত কাল (আয়ু) দিয়েছেন। তাঁর নিকটেও আর একটা নির্দ্ধারিত কাল আছে (পরলোক)। তবুও মনে তুমি সন্দেহ পোষণ কর।'

আয়াৎ ৩ : 'আসমান জমিনের তিনিই প্রভু, তিনিই আল্লাহ্, তুমি যা-কিছু গোপন কর বা যা-কিছু প্রকাশ কর সবই তিনি জানেন, আর জানেন তোমার কর্ম্মফল যা তুমি অর্জ্জন করেছ।'

আয়াৎ ১১ : 'পৃথিবী পরিভ্রমণ কর এবং যারা সত্যকে অস্বীকার করেছে, তাদের শেষ পরিণতি কি হয়েছে তা দেখে এসো।

আয়াৎ ৫৪ : ***'যদি কেহ অজ্ঞতাবশতঃ পাপ করে, কিন্তু পরে অনুতপ্ত হয় ও নিজেকে সংশোধন করে, আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করেন।'

আয়াৎ ৭০ : 'যারা নিজের ধর্ম্মকে শুধু আমোদ প্রমোদ বলেই মনে করে এবং এই পার্থিব জীবনদ্বারা যারা প্রতারিত হয়েছে, তাদেরে বল এবং তাদের কাছে এই সত্য বিঘোষিত কর: 'প্রত্যেক আত্মা নিজের কার্য্য কলাপের দ্বারাই নিজের ধ্বংস আনয়ন করে।'***

আয়াৎ ১২০ : গোপন এবং প্রকাশ্য সব রকম পাপ নিঙ্ড়িয়ে নির্ম্মুল করে ফেল। যারা পাপ উপার্জ্জন করবে তারা তাদের উপার্জ্জনের পূর্ণ প্রতিদান পাবে।'

আয়াৎ ১৪১ : 'নানা রকমের ফল তার মৌসুমের সময় ভক্ষণ করবে কিন্তু তার যথাযোগ্য মূল্য শস্য বা ফল সংগ্রহের দিন আদায়

করবে। অতি ব্যয়ের দ্বারা অপচয় করো না। অপব্যয়কারীকে আল্লাহ্ ভালবাসেন না।'

আয়াৎ ১৫১ : 'আল্লার অংশীদার করবে না, পিতা-মাতার প্রতি সদয় ব্যবহার করবে, অভাবের অজুহাতে নিজের সন্তান হত্যা করবে না, আমরাই তোমাদের ও তাদের আহার্য্যের ব্যবস্থা করে থাকি। গোপনে বা প্রকাশ্যে লজ্জাজনক কার্য্যের নিকটবর্ত্তী হয়ো না। ন্যায় ও সত্যের জন্য ছাড়া আল্লার সৃষ্ট পবিত্র প্রাণ নিয়ো না অর্থাৎ হত্যা করো না।'

আয়াৎ ১৫২ : 'এতিম পূর্ণ শক্তিমান হওয়ার পূর্ব্বে, উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে ছাড়া এতিমের সম্পত্তির নিকটবর্ত্তী হয়ো না। ওজন ও মাপ পূর্ণ ন্যায়ের সঙ্গেই করবে। বহন করতে পারার অতিরিক্ত বোঝা কোন আত্মাকেই দেওয়া হয়নি। যখনি কোন কথা বল্‌বে ন্যায়ের সঙ্গেই বল্‌বে, এমন কি তোমার নিকটতম আত্মীয়ও যদি জড়িত থাকে।'

আয়াৎ ১৫৩ : 'এইটিই আল্লার পথ, সোজা পথ—এইটিই অনুসরণ কর। অন্য পথে যেয়ো না, সেই সব পথ তোমাকে বিপথগামী করবে।'

আয়াৎ ১৫৯ : 'যারা নিজেদের ধর্ম্মকে বিভক্ত করে এবং নিজেরা হয় বিভিন্ন দলে খণ্ডিত, তাদের সঙ্গে তুমি কিছুমাত্র সম্পর্ক রেখো না।'

আয়াৎ ১৬০ : 'যে সৎ কাজ করে সে তার কার্য্যের দশ গুণ প্রতিফল পাবে, যে পাপ করে সেও তার কার্য্যানুসারেই প্রতিফল পাবে কারো প্রতি অবিচার করা হবে না।'

আয়াৎ ১৬৪ : 'যার-যার কাজের জন্য সে-সেই দায়ী হবে, প্রত্যেক আত্মা নিজ কাজের প্রতিফল পাবে। নিজের বোঝা ছাড়া কেউই অন্যের বোঝা বহন করতে পারে না।'

৭ : সুরা আরাফ্

আয়াৎ ২৬ : 'হে আদমের সন্তানগণ, লজ্জা নিবারণ ও নিজেদের সজ্জিত করার জন্য আমি তোমাদের পোষাক দিয়েছি কিন্তু সৎ কর্ম্মরূপ পোষাক হচ্ছে সব চেয়ে উৎকৃষ্ট।'

আয়াৎ ২৮ : *'যা অশ্লীল ও লজ্জাকর তা করতে আল্লাহ্ কখনো আদেশ করেন না।'

আয়াৎ ২৯ : 'যা ন্যায় তা করতেই আমাদের প্রভু অর্থাৎ আল্লাহ্ আদেশ করেছেন।'

আয়াৎ ৩১ : 'প্রতি উপাসনার সময় ও মসজিদে তোমার যা সুন্দর পোষাক আছে তাই পরবে; খাও, পিয়ো, কিন্তু বাড়াবাড়ি করে অপব্যয় করো না,---আল্লাহ্ অপব্যয়কারীকে ভালবাসেন না।'

আয়াৎ ৩২ : আল্লাহ্ তাঁর মনোরম দান, জীবিকার জন্য যে-সব পাক-পবিত্র বস্তু সৃষ্টি করেছেন তা ভোগ করতে নিষেধ করেন নি : সেই সব এই পার্থিব জীবনেরই সামগ্রী।'

আয়াৎ ৩৩ : 'আল্লাহ্ নিষেধ করেছেন---লজ্জাজনক কাজ, গোপনে বা প্রকাশ্যে এবং পাপ, আর নিষেধ করেছেন সত্য ও যুক্তিকে লংঘন করা, আল্লার অংশীদার করা এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে যা জান না তা বলা।'

আয়াৎ ৮৫ : 'ঠিকভাবে ওজন ও মাপ দেবে, যার যা প্রাপ্য তার থেকে তাকে বঞ্চিত করবে না এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পৃথিবীতে আর অশান্তি সৃষ্টি করবে না।'

আয়াৎ ১৪২ : 'ন্যায় করবে, অন্যায়কারীদের পথ অনুসরণ করবে না।'

আয়াৎ ১৫৬ : 'আল্লাহ্ বলছেন—'যারা ন্যায় করে, যারা নিয়মিত দান করে, যারা আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে, তাদের প্রতি আমার রহমৎ বর্ষিত হবে।'

আয়াৎ ১৯৪ : 'আল্লাকে ছাড়া অন্য যাদেরই তোমরা উপাসনা কর, তারাও আল্লারই সেবক অর্থাৎ আল্লারই সৃষ্ট। যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাদের ডাক, তোমাদের প্রার্থনা শুন্‌তে বল।'

আয়াৎ ১৯৫ : 'তাদের কি হাঁটবার পা আছে? ধরবার হাত আছে? দেখবার চোখ আছে? শুনবার কান আছে? তোমাদের দেবতা-অংশীদারদের একত্র কর, আমার বিরুদ্ধে কু-মৎলব আঁট (যদি ক্ষমতা থাকে) আমাকে শান্তি থেকে বঞ্চিত কর।'

আয়াৎ ১৯৭ : 'আল্লাকে ছাড়া যাকেই তোমরা ডাক, সে কিছুতেই পারবে না তোমাদের সাহায্য করতে, সত্যই সে পারে না নিজেকেও সাহায্য করতে।'

আয়াৎ ১৯৮ : 'তোমাকে পথ দেখাবার জন্যে যদি তুমি তাদের ডাক, পাবে না কোন সাড়া, কারণ তারা শুনতে পায় না। তুমি দেখবে তারা যেন তোমার দিকে চেয়ে আছে, আসলে তারা কিছুই দেখতে পায় না।'

আয়াৎ ১৯৯ : 'ক্ষমাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর। যা ন্যায় তার হুকুম কর। কিন্তু অজ্ঞ লোকদের থেকে ফিরে চলো।'

আয়াৎ ২০৪ : 'যখন কোরাণ পাঠ করা হয়, মনোযোগ দিয়ে শোন, এবং শান্তি রক্ষা কর, তা হ'লে, শান্তি বা করুণা তুমিও লাভ করবে।'

৮ : সূরা আনফাল্

আয়াৎ ৬৯ : 'হালাল ও উৎকৃষ্ট যুদ্ধ-মাল তুমি ভোগ কর। কিন্তু আল্লাকে ভয় করবে। আল্লাহ্ চিরক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু।'

আয়াৎ ৭০ : 'হে নবী, যারা তোমার হাতে যুদ্ধবন্দী হয়েছে তাদেরে বল, যদি আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে কিছুমাত্র ভাল গুণ দেখতে পান তা হ'লে তোমাদের থেকে যা নেওয়া হয়েছে তার থেকে উৎকৃষ্টতর বস্তু তোমাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং তিনি তোমাদের করবেন ক্ষমা। কারণ আল্লাহ চিরক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু।'

আয়াৎ ৭২ : 'যাঁরা ঈমান এনেছেন ও হিজরত করেছেন, এবং আল্লার পথে ধর্ম্মের জন্য নিজেদের জান-মাল দিয়ে সংগ্রাম করেছেন আর যাঁরা এইসব মুহাজেরিনদের দিয়েছেন আশ্রয় ও করেছেন সাহায্য, তাঁরা সবাই পরস্পর বন্ধু ও রক্ষাকারী। যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করেনি তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব তোমাদের নয়। কিন্তু ধর্ম্ম ব্যাপারে তারা যদি তোমাদের সাহায্য কামনা করে, তাদেরে সাহায্য করবে। কিন্তু যে-জাতি বা রাষ্ট্রের সঙ্গে তোমাদের পরস্পরের সহায়তার ভিত্তিতে সন্ধি রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করবে না।'

৯ : স্থরা তৌবা

আয়াৎ ১ : 'যে-সব কাফেরদের সঙ্গে তুমি মিত্রতা-মূলক সন্ধি করেছ, তাদের প্রতি আল্লাহ্ ও রছুলের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা ঘোষণা করা হচ্ছে।'

আয়াৎ ৪ : 'যে-সব কাফেরদের সঙ্গে তুমি মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হয়েছ তারা যদি পরে অঙ্গীকার ভঙ্গ না করে এবং তোমার বিপক্ষে কাকেও যদি সাহায্য না করে, তাদের সঙ্গে সন্ধি ভঙ্গ করা উচিত নয়। নির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত তাদের সঙ্গে সন্ধির শর্ত্তাবলী পালন কর। আল্লাহ্ সৎ-লোককে ভালবাসেন।'

আয়াৎ ৬ : 'যদি কোন কাফেরও তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করে, তা মঞ্জুর কর;—তা হলে সে আল্লার বাণী শুনতে পাবে। পরে তাকে সঙ্গে করে নিরাপদ স্থানে পেঁাছে দিয়ো।'

আয়াৎ ১৩ : 'যারা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছে, রছুলকে বিতাড়িত করতে ষড়যন্ত্র করেছে এবং সর্ব্বাগ্রে তোমাকে আক্রমণ করেছে, সেই সব লোকের সঙ্গে কি তুমি যুদ্ধ করবে না ? সেই সব লোককে কি তুমি ভয় কর ? না, যদি বিশ্বাসী হও একমাত্র আল্লাকেই তুমি ভয় করবে।'

আয়াৎ ৬৭ : 'কপট নর ও নারীর পারস্পরিক বোঝাপড়া আছে, তারা কুকাজের নির্দ্দেশ দেয়, ন্যায় করতে নিষেধ করে, তাদের হাত মুষ্টিবদ্ধ অর্থাৎ তারা কৃপণের হদ্দ। তারা আল্লাকে ভুলে গেছে, তাই আল্লাহ্‌ও তাদেরে ভুলে আছেন। কপটরা ঈশ্বর-দ্রোহী ও বিপথগামী।'

আয়াৎ ৭১ : 'বিশ্বাসী নর ও নারী পরস্পরকে রক্ষা করে, তারা যা ন্যায় তার নির্দ্দেশ দেয়, যা পাপ তা নিষেধ করে, তারা

নিয়মিত উপাসনা করে। নিয়মিত দান করে, আল্লাহ্ ও রছুলকে মানে। এই সব লোকের উপর আল্লাহ্ করুণা বর্ষণ করেন। কারণ আল্লাহ্ সর্ব্বশক্তিমান ও জ্ঞানী।'

আয়াৎ ৭২ : এই আয়াতে চির আনন্দধাম স্বর্গ থেকেও আল্লার সন্তুষ্টিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ ও মহত্তম তৃপ্তি বলে অভিহিত করা হয়েছে।

আয়াৎ ১১৯ : 'বিশ্বাসীগণ, যারা কাজে ও কথায় সত্যাশ্রয়ী তাদের সঙ্গী হও।'

১০ ঃ সূরা য়ূনুস্

আয়াৎ ৬ ঃ 'দিন-রাত্রির পরিবর্ত্তনে এবং আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহ্ যা-কিছু সৃষ্টি করেছেন সেই সবে, যারা আল্লাকে ভয় করে, তাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।'

আয়াৎ ৯ ঃ 'যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকাজ করে, তাদের প্রভু তাদেরে ঈমানের সাথে পথ প্রদর্শন করবেন ও করবেন পরিচালিত।'

আয়াৎ ১৭ ঃ 'আল্লার বিরুদ্ধে যে মিথ্যার জালিয়াতী করে বলে আল্লার নিদর্শনকে করে অস্বীকার, তার চেয়ে বেশী অন্যায় কে করে? পাপীর কোন সমৃদ্ধি নেই।

আয়াৎ ১৯ ঃ 'মানব' প্রথমে এক জাতি ছিল, পরে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে পরিণত হয়েছে।'

আয়াৎ ২৪ ঃ 'আমরা আকাশ থেকে যে-বৃষ্টিধারা প্রেরণ করি তার সঙ্গে এই (পার্থিব) জীবনের তুলনা চলে; বৃষ্টির জল মিশ্রণের ফলে ভূমি থেকে মানুষ ও পশুর খাদ্য উৎপন্ন হয়, যা বর্দ্ধিত হয় সোনালী রঙ ও সৌন্দর্য্যে সজ্জিত হওয়া পর্য্যন্ত। যে-সব লোক এ-সবের মালিক তারা মনে করে এ-সবের উপর তাদের পূর্ণ কর্তৃত্ব রয়েছে। আমাদের নির্দ্দেশ দিনে অথবা রাত্রে গিয়ে পৌঁছে অর্থাৎ যে-কোন সময় আমরা সে-স্থান সম্পূর্ণ শস্য-কাটা ভূমির মত করে দিই, মনে হয় গতকালও এখানে কিছুই জন্মেনি। এই ভাবে আমরা, যারা চিন্তাশীল তাদেরে আমাদের নিদর্শন ব্যাপকভাবে বুঝিয়ে দিই।'

আয়াৎ ২৬ ঃ 'যারা সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে অপরিমিত উৎকৃষ্ট পারিতোষিক। তাদের মুখ কখনো ঢাক্‌বে না অন্ধকারে বা লজ্জায়। তারাই চিরস্বর্গবাসী।'

আয়াৎ ২৭ : 'যারা পাপ উপার্জ্জন করবে তারা সেই অনুপাতে পাপের ফলও পাবে। বেইজ্জতিতে তাদের মুখমণ্ডল ঢেকে থাকবে। কেউই তাদের রক্ষা করতে পারবে না।'

আয়াৎ ৩১ : (হে রছুল, অবিশ্বাসীদের) জিজ্ঞাসা করো, "আকাশ ও ভূমি থেকে কে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা করে থাকেন অথবা শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির উপর কার রয়েছে ক্ষমতা? এবং তিনি কে, যিনি মৃতের মধ্যে নিয়ে আসেন জীবন, আর জীবনে নিয়ে আসেন মৃত্যু? তিনি কে যিনি সব বিষয় নিয়ন্ত্রণ ও শাসন করেন?" তারা ত্বরিত উত্তর দেবে---"আল্লাহ্।" জিজ্ঞাসা করো, "তা হ'লে তোমরা কি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবনত হবে না?"

আয়াৎ ৩২ : 'এই তো আল্লাহ্ যিনি তোমাদের সত্যিকার প্রভু ও রক্ষক। সত্যকে বাদ দিলে মিথ্যা আর ভ্রান্তি ছাড়া আর কী বা থাকে? তা হ'লে কি করে তোমরা সত্য থেকে বিমুখ হও?"

আয়াৎ ৩৪ : বলো, "তোমাদের অংশীদারেরা, অর্থাৎ যাদেরে তোমরা আল্লার অংশীদার কল্পনা করে পূজা করে থাক তারা কি সৃষ্টি করতে পারে, না সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি করতে পারে?" বলো, "আল্লাহ্ সৃষ্টির সূচনা করে থাকেন এবং তার পুনরাবৃত্তিও করেন: তা হ'লে কী করে তোমরা সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হও?"

আয়াৎ ৩৫ : বলো, "তোমাদের অংশীদারদের মধ্যে কেউ কি সত্য পথের নির্দ্দেশ দিতে পারে?" বলো, "আল্লাই সত্যের নির্দ্দেশ দিয়ে থাকেন। তা হ'লে, যিনি সত্যের পথ প্রদর্শক তিনিই অনুসরণের অধিকতর যোগ্য, না যে কেউ না চালালে চলতে পারে না সে-ই? তোমাদের কাণ্ডকারখানা কী রকম, কী ভাবে তোমরা বিচার করো।"

আয়াৎ ৩৬ : 'কিন্তু তাদের অধিকাংশই কিছুই অনুসরণ করে না একমাত্র তাদের অনুমান ছাড়া। সত্যই অনুমান বা কল্পনা সত্যের বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্রও কার্য্যকরী হতে পারে না। বস্তুতঃ তারা যা করে আল্লাহ্ সবই জানেন।'

আয়াৎ ৪৪ : 'আল্লাহ্ মানুষের প্রতি কিছু মাত্র অন্যায় করেন না, মানুষ নিজেই নিজের আত্মার প্রতি অবিচার করে থাকে।'

আয়াৎ ৬২ : 'বস্তুতঃ যাঁরা আল্লার বন্ধু তাঁদের কোন ভয় নেই, তাঁদের পেতে হবে না কোন শোক।'

আয়াৎ ৬৩ : ৬৪ : 'যাঁরা বিশ্বাস করেন এবং অনবরত পাপ থেকে আত্মরক্ষা করেন, তাঁদের জন্য সুখবর—বর্ত্তমান জীবনে এবং ভবিষ্যৎ জীবনেও আল্লার কথার কোন রদ্‌বদল হয় না। ইহা সত্যই চরম খোশখবর।'

১১ : সুরা হুদ

আয়াৎ ১১ : 'যারা ধৈর্য্য ধারণ করে এবং একনিষ্ঠ ও সৎ-কর্ম্মশীল, তারা কখনো অহঙ্কার প্রকাশ করে না, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহৎ পুরস্কার।'

আয়াৎ ২৪ : 'এই দুই শ্রেণীর লোককে (বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের) তুলনা করা যায় অন্ধ-বধির ও চক্ষুষ্মান-শ্রবন-শক্তি বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে। অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা অন্ধ-বধিরের সমতুল্য আর বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলরা চক্ষুষ্মান ও শ্রবন-শক্তি সম্পন্ন লোকের সমান। তুলনায় এই দুই শ্রেণীর লোক কি কখনো সমান হতে পারে? তা'হলে তোমরা কি সতর্ক হবে না?'

আয়াৎ ১০৭ : 'কোন জাতিকেই আল্লাহ্ একটি মাত্র ভুলের জন্য ধ্বংস করেন না, যদি সেই জাতির সংশোধনের সম্ভাবনা থাকে।'

আয়াৎ ১১৮ : 'আল্লাহ ইচ্ছা করলেই সব মানুষকে এক জাতিতে পরিণত করতে পারতেন; কিন্তু মানুষ তো ঝগড়া থেকে বিরত থাক্‌বে না।'

১২ : সূরা য়ূসুফ্

আয়াৎ ২ : 'তোমরা যাতে বুঝতে পারো ও জ্ঞান আহরণ করতে পারো সেই উদ্দেশ্যেই কোরাণ আরবী ভাষায় পাঠানো হয়েছে।' মাতৃভাষাই যে লোক শিক্ষার শ্রেষ্ঠতম বাহন কোরাণের এই আয়াৎ অত্যন্ত অসন্দিগ্ধ ভাষায় বহন কর্‌ছে তারই এক সুস্পষ্ট প্রমাণ।

১৩ ঃ সূরা রা'দ্

আয়াৎ ১১ ঃ 'বস্তুতঃ আল্লাহ্ কোন জাতির অবস্থার পরিবর্ত্তন করেন না, যতক্ষণ না সেই জাতি নিজের অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করে।'

আয়াৎ ১৭ ঃ 'আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, যার যে রকম আয়তন সে অনুসারে নদ-নদীতে জলস্রোত প্রবাহিত হয়; স্রোতের উপরিভাগে যে ফেনা উত্থিত হয় জলস্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এমন কি যে ধাতুকে অলঙ্কার বা আসবাব তৈরীর জন্য আগুনে দগ্ধ করা হয় তাতেও থাকে গাদ। এইভাবে আল্লাহ্ দৃষ্টান্তের দ্বারা সত্য ও মিথ্যার তুলনা করেছেন, ফেনার মত গাদও দূরীভূত হয়। উপরন্তু যা মানব জাতির কল্যাণকর তা-ই পৃথিবীতে অবিনশ্বর হয়ে বিরাজ করে।' মিথ্যা হচ্ছে ফেনা বা গাদের মত ক্ষণস্থায়ী।

আয়াৎ ২২ ঃ 'আল্লাকে পাওয়ার জন্য যারা ধৈর্য্য সহকারে অধ্যবসায়ে রত থাকে, নিয়মিত উপাসনা করে, তাদের জীবিকার জন্য আমরা যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে বা প্রকাশ্যে যারা দান করে, এবং পাপকে পুণ্যের দ্বারা যারা প্রতিরোধ করে, তারাই পাবে চরম ও শ্বাশ্বত গৃহ'।

১৪ : সুরা ইব্রাহিম

আয়াৎ ১ : 'মানব জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোকে পথ দেখাবার জন্যেই তোমার প্রতি আমরা একটি গ্রন্থ (কোরাণ) অবতীর্ণ করেছি।'

আয়াৎ ৪ : 'কোন জাতির কাছে আমরা তার নিজস্ব ভাষায় ছাড়া কোন রছুল পাঠাইনি।' উদ্দেশ্য—রছুল যেন জনগণের ভাষায় আল্লার বাণী পরিষ্কারভাবে সকলকে বুঝিয়ে দিতে পারেন।

আয়া ২৪ : ২৫ : 'সু-কথাকে আল্লাহ্ তুলনা করেছেন সু-বৃক্ষের সঙ্গেঃ যা দৃঢ়-মূল ও যার শাখা-প্রশাখা আকাশ-ব্যাপী বিস্তৃত এবং যা চির-ফলপ্রসূ।'

আয়াৎ ২৬ : 'এবং কু-কথাকে তুলনা দেওয়া হয়েছে কু-বৃক্ষের সঙ্গে, যার মূল মাটি থেকে উৎপাটিত এবং যার কোন স্থায়ীত্বই নেই।'

১৫ : সূরা হিজ্‌র্

আয়াৎ ৮৮ : ‘আমরা অন্য জাতিকে যা দিয়েছি তার জন্য তোমার চক্ষুকে পীড়া দিয়ো না। অথবা তার জন্য মনোকষ্ট পেয়ো না। অর্থাৎ অপর জাতির শোভা-সম্পদ দেখে তুমি ঈর্ষান্বিত হয়ো না। বিশ্বাসীদের প্রতি তোমার মাথা অবনত কর অর্থাৎ মু'মেনদের প্রতি হও শ্রদ্ধাশীল।”

আয়াৎ ১২ : 'আল্লাহ্ দিন রাত্রি ও চন্দ্র সূর্য্যকে তোমার অধীন করে দিয়েছেন, তাঁর আদেশে নক্ষত্রসমূহকে তোমার অধীন করা হয়েছে, সত্যই বিজ্ঞ ব্যক্তির জন্য এসবে-ই রয়েছে ইঙ্গিত,।'

আয়াৎ ১৪ : 'আল্লাহ্ সাগরের উপর তোমাদের কর্ত্তৃত্ব ও অধিকার দিয়েছেন, যাতে তোমরা তার তাজা ও কোমল মৎস্য আহার্য্যরূপে খেতে পাও, আর তা থেকে যাতে আহরণ করতে পার নানা রকমের আভরণ (সাগর-তলের মক্তা চিরদিনই মানুষের রূপ-সজ্জার অঙ্গ)। তোমরা দেখ্তে পাও সাগর-তরঙ্গ ভেদ করে জাহাজ চলাচল করে। এই সব দেখে আল্লার প্রাচুর্যই যেন হয় তোমার কাম্য, আর তুমি যেন হও আল্লার প্রতি কৃতজ্ঞ।'

আয়াৎ ২২ : 'তোমার আল্লাহ্ এক। যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের দিল্ জ্ঞানের প্রতি বিমুখ---তারাই হচ্ছে একগুঁয়ে ও গোঁয়ার।'

আয়াৎ ২৩ : 'তারা (একগুঁয়ে অবিশ্বাসীরা) যা গোপন করে আর যা প্রকাশ করে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সবই জানেন: 'সত্যই আল্লাহ্ একগুঁয়ে গোঁয়ার লোককে ভালবাসেন না।'

আয়াৎ ৩৬ : 'প্রত্যেক জাতির প্রতিই আমরা এক একজন রছুল পাঠিয়েছি, প্রতি রছুলের প্রতিই ছিল আমাদের এই আদেশ: "আল্লার সেবা কর আর পাপকে নির্মূল কর।" আল্লাহ্ কোন কোন লোককে সত্যের পথে পরিচালিত করেছেন, আবার কেউ কেউ ডুবে গেছে ভুল ও অজ্ঞতায়। পৃথিবী পর্য্যটন করে দেখ, যারা সত্যকে অস্বীকার করেছে তাদের কী পরিণাম হয়েছে।"

আয়াৎ ৬১ : "যদি আল্লাহ্ প্রতি কু-কাজের জন্যই মানুষকে শাস্তি দিতেন, তা হ'লে পৃথিবীতে একটি প্রাণীও অবশিষ্ট থাকত না;

কিন্তু তিনি তাদের নির্দ্দিষ্ট সময় (অনুতাপ ও তৌবার জন্য) দিয়ে থাকেন, নির্দ্দিষ্ট সময় পার হলে এক ঘণ্টার জন্যও শাস্তি এড়ানো যাবে না ; যেমন এক ঘণ্টা আগেও শাস্তি প্রত্যাশা করা যায় না।' অর্থাৎ আল্লাহ্ কাকেও নির্দ্দিষ্ট সময়ের আগে বা পরে শাস্তি দেন না। যার যা কর্ম্মফল যথাসময়েই তাকে তা ভোগ করতে হবে।

আয়াৎ ৬৪ : 'আমরা এই পুস্তক অর্থাৎ কোরাণ অবতীর্ণ করেছি মানুষের যে-সব বিষয়ে মতভেদ রয়েছে তাকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। যারা বিশ্বাস করে, কোরাণ তাদের জন্য একাধারে পথ-নির্দ্দেশক ও করুণা।'

আয়াৎ ৬৫ : ৬৯ : কোরাণে বিভিন্ন আয়াতে প্রকৃতির দিকে বার বার মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এখানেও আবার বৃষ্টিধারার দিকে, পশুপক্ষীর দিকে, গৃহপালিত পশুর দুগ্ধের প্রতি, খেজুরফল, আঙ্গুর, মৌমাছির মৌচাক ও মধুর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছে—এই সবে রয়েছে চিন্তাশীল ও জ্ঞানীর প্রতি ইঙ্গিত। বস্তুতঃ প্রকৃতির যাবতীয় বিষয়, আকাশের গ্রহমণ্ডল থেকে ধরণীর ধূলিকণা পর্য্যন্ত আজ মানুষের গবেষণা ও শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্গত। প্রকৃতি-বিজ্ঞান, শরীর-তত্ত্ব, উদ্ভিদ বিদ্যা, পদার্থ-বিদ্যা, জ্যোতিষ, ভূতত্ত্ব, জীববিদ্যা এমন কি মৌমাছি-তত্ত্বও আজকের একটি আলোচ্য বিষয়। কোরাণে জ্ঞানের সর্ব্বদিকেই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, কোন কিছুকেই কোরাণ জ্ঞানের বহির্ভূত বলে নির্দ্দেশ করে নি। সত্যই, জ্ঞানই মানুষের অমেয় ও অজেয় শক্তির মূল।

আয়াৎ ৯০ : 'আল্লাহ্ ন্যায় বিচার, সৎকাজ ও স্বজনবর্গের প্রতি উদারতার আদেশ করেন, তিনি নিষেধ করেন—লজ্জাজনক কাজ অবিচার ও বিদ্রোহ ; তিনি শিক্ষা দিচ্ছেন যাতে তোমরা উপদেশ পাও।'

আয়াৎ ৯১ : 'আল্লার সঙ্গে অঙ্গীকার করার পর সেই অঙ্গীকার পূর্ণ কর। শপথ গ্রহণ করার পর সেই শপথ ভঙ্গ করো না। বাস্তবিক আল্লাকেই তুমি তোমার জামিন করেছ। তুমি যা কিছু কর আল্লাহ্ সবই জানেন।'

আয়াৎ ৯২ : 'এক দল আর এক দলের উপর সংখ্যাধিক্য অৰ্জ্জনের অভিপ্রায়ে ছলনা করার জন্য শপথ গ্রহণ করো না।'

আয়াৎ ৯৩ : 'যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন তা'হলে তিনি সব মানুষকেই এক সম্প্রদায়ভুক্ত করতেন; কিন্তু তিনি যাকে খুশী বিপথে চলার সুযোগ দেন, যাকে খুশী সত্য পথে পরিচালিত করেন। কিন্তু তোমার প্রত্যেক কাজের জন্যই তোমাকে নিশ্চয়ই জবাবদিহি হতে হবে।'

আয়াৎ ৯৭ : 'নর অথবা নারী যেই সৎকাজ করে এবং যার বিশ্বাস আছে, তাকেই আমরা এক নবজীবন দেব, যে-জীবন ভাল ও পবিত্র। তাদের কর্ম্মের শ্রেষ্ঠতানুযায়ী তাদেরে আমরা পুরস্কৃত করব।'

আয়াৎ ৯৯ : 'যারা বিশ্বাসী এবং আল্লায় নির্ভরশীল, তাদের উপর শয়তানের কোন কর্ত্তৃত্ব চলে না।'

আয়াৎ ১০০ : 'শয়তানকে যারা নিজেদের পৃষ্ঠ-পোষক করেছে এবং যারা যুক্ত করে আল্লার সঙ্গে অংশীদার, শয়তানের কর্ত্তৃত্ব চলে শুধু তাদের উপর।'

আয়াৎ ১১৪ : আল্লাহ তোমাকে যে জীবিকা দিয়েছেন,---হালাল এবং পবিত্র, তা ভক্ষণ কর। যদি তুমি আল্লার সেবক হও, তাঁর অনুগ্রহের জন্য তাঁর প্রতি হও কৃতজ্ঞ।'

আয়াৎ ১১৫ : 'তিনি অর্থাৎ আল্লাহ্ শুধু তোমাদের জন্য হারাম করেছেন মৃত-মাংস, রক্ত, শূকর-মাংস এবং যে সব খাদ্যের উপর আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নাম উচচারিত হয়েছে সেই সব খাদ্য। ইচ্ছাকৃত অবাধ্যতা না হ'লে বা সীমা লংঘন না করলে, যদি অবস্থায় পড়ে বাধ্য হয়, তা'হলে নিষিদ্ধ খাদ্যও গ্রহণ করা চলে; সেই রকম অবস্থায় আল্লাহ্ চির-ক্ষমাশীল ও দয়ালু।'

আয়াৎ ১২৫ : 'সকলকে জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা এবং মনোরম ব্যাখ্যা দিয়ে আল্লার পথে আহ্বান কর। যা উদার ও উত্তম তা দিয়ে তাদের সঙ্গে (বিপক্ষের সঙ্গে, যারা এখনো আল্লার পথে আসেনি তাদের সঙ্গে) আলোচনায় প্রবৃত্ত হও। আল্লাহ্ ভালভাবেই জানেন, কে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে আর কে সত্য পথের নির্দ্দেশ গ্রহণ করেছে।"

আয়াৎ ১২৮ : 'যাঁরা সংযমী এবং যাঁরা সৎকর্মশীল আল্লাহ্ তাঁদেরই সঙ্গী।

১৭ : সুরা বনি ইসরাইল

আয়াৎ ৭ : 'যদি ভাল করে থাক, তবে তুমি নিজের ভালই করেছ, আর যদি তুমি মন্দ করে থাক, তবে নিজের মন্দই ডেকে এনেছ।'

অর্থাৎ সু-কাজ করলে মানুষ তার সুফল পাবেই, আর মন্দ কাজ করলে তার মন্দের ভাগীও তাকে নিশ্চয়ই হতে হবে। নিজের কৃতকর্ম্মের পরিণাম ফল থেকে কারো অব্যাহতি নেই।

আয়াৎ ৯ : 'নিশ্চয়ই কোরাণ সত্যে স্থির-প্রতিজ্ঞদের পথ-প্রদর্শক এবং সৎকর্ম্মশীল বিশ্বাসীদের প্রতি কোরাণ দিচ্ছে মহৎ পুরস্কারের সু-সংবাদ।'

আয়াৎ ১৫ : 'যে উপদেশ গ্রহণ করে সে তা গ্রহণ করে, নিজের উপকারের জন্যই অর্থাৎ তাতে সে-ই হয় উপকৃত; আর যে বিপথে যায়, বিপথে গিয়ে সে ক্ষতি করে নিজেরই। এক জনের বোঝা অন্য জন বহন করতে পারে না অর্থাৎ একজনের কৃতকর্ম্মের ফল অন্যের ঘাড়ে চাপানো হবে না এবং অন্যে সেই ভার গ্রহণ করতে পারবেও না। বস্তুতঃ রছুল পাঠিয়ে সতর্ক করার পুর্ব্বে তোমাদের উপর শাস্তি বর্ষিত হবে না।'

আয়াৎ ২৩ : 'তোমার প্রভু নির্দ্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া আর কারো উপাসনা করবে না এবং তুমি তোমার পিতা-মাতার প্রতি সদয় হবে। তোমার জীবদ্দশায় তাঁরা উভয়ে অথবা তাঁদের একজনও যদি বার্দ্ধক্যে পৌঁছেন, তাঁদের প্রতি একটিও তুচ্ছ কথা বল্‌বে না, তাড়িয়ে দেবে না বরং সম্মানের সঙ্গে সম্বোধন করবে।'

আয়াৎ ২৪ : 'এবং সদয় চিত্তে বিনয় ও নম্রভাবে তাঁদের কাছে মাথা অবনত করবে এবং বল্‌বে (আল্লাকে) "প্রভু, তাঁরা শৈশবে আমাকে যেমন পালন করেছেন, সে রকম তাঁদের প্রতি তুমি করুণা বর্ষণ কর।'

আয়াৎ ২৬ : ‘আত্মীয়স্বজনের হক্ আদায় করবে। যারা অভাবগ্রস্ত এবং যারা পথিক তাদের দান করবে। কিন্তু অমিতব্যয়ীর মত অপব্যয় করবে না।’

আয়াৎ ২৭ : ‘অমিতব্যয়ীরা শয়তানের ভাই এবং শয়তান নিজেই নিজের প্রভুর প্রতি অকৃতজ্ঞ।’

আয়াৎ ২৮ : ‘আল্লার প্রদর্শিত রহমতের পথ অনুসরণ করতে গিয়ে যদি তাদের (পিতামাতা ও যাদের সঙ্গে তোমার মতবিরোধ হয়েছে) ত্যাগ কর, অর্থাৎ ত্যাগ করতে বাধ্য হও, তবুও তাদের প্রতি বিনম্র সদয় কথা বলবে।’

আয়াৎ ২৯ : ‘কৃপণের মত গলকরলগ্ন হয়েও থাকবে না, অথবা শেষ সীমা পর্য্যন্ত নিজের হাতকে প্রসারিত করেও দেবে না,— যা করলে তুমি হয়ে পড়বে নিন্দিত ও অভাবগ্রস্ত।’

আয়াৎ ৩১ : ‘অভাবের ভয়ে তোমার সন্তানদের হত্যা করো না; তাদের এবং তোমাদের আহার আমরাই দেব। তাদের হত্যা করা মহাপাপ।’

আয়াৎ ৩২ : ‘ব্যভিচারের সন্নিকট হয়ো না: কারণ ইহা লজ্জাকর ও পাপকর্ম্ম এবং আরো বহুতর পাপের প্রবেশপথ।’

আয়াৎ ৩৩ : ‘সত্য ও ন্যায়ের জন্য ছাড়া প্রাণ নেবে না, যে প্রাণকে আল্লাহ্ করেছেন মহান ও পবিত্র। অন্যায়ভাবে যদি কাকেও হত্যা করা হয় তার উত্তরাধিকারীকে (কেসাস্—ক্ষতিপূরণ লওয়ার বা ক্ষমা করে দেওয়ার) অধিকার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রাণ গ্রহণ করার সময় সে যেন সীমা অতিক্রম না করে; কারণ আইনের সহায়তা তার পক্ষে।’

আয়াৎ ৩৪ : ‘বাড়াবার মৎলব ছাড়া এতিমের সম্পত্তির নিকটবর্ত্তী হয়ো না যতদিন না সে পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ও বয়স্ক হয়; প্রত্যেক প্রতিশ্রুতি পালন করবে, প্রতি প্রতিশ্রুতির সম্বন্ধেই সন্ধান নেওয়া হবে।’

আয়াৎ ৩৫ : 'যখন তুমি ওজন কর, পুরা ওজনই দেবে এবং মাপবে সোজা মাপকাঠি দিয়েই : ইহাই সব চেয়ে উচিত এবং ইহাই সব চেয়ে সুবিধা বা লাভ দেবে শেষ মীমাংসার সময়।'

আয়াৎ ৩৬ : 'যার কোন জ্ঞান তোমার নেই তা অনুসরণ করো না।'

আয়াৎ ৩৭ : 'খুব দম্ভপুর্ণভাবে পৃথিবীতে বিচরণ করো না।'

আয়াৎ ৩৮ : 'এই সবের মধ্যে পাপ হচ্ছে আল্লার কাছে সব চেয়ে ঘৃণ্য।'

আয়াৎ ৫৩ : 'আমার সেবকদের বল তারা যেন যা উত্তম তাই বলে। শয়তান মানুষের মধ্যে বিরোধ বপন করবেই, কারণ শয়তান হচ্ছে মানুষের বিঘোষিত শত্রু।'

আয়াৎ ৭২ : 'যারা এই পৃথিবীতে অন্ধ অর্থাৎ যারা সত্যমিথ্যা, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, পাপ পুণ্য, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি বিচার করতে পারে না বা করে না, তারা পরকালেও অন্ধ থাক্‌বে এবং তারাই হচ্ছে সবচেয়ে বিপথগামী।'

আয়াৎ ৮০ : 'বল "হে আমার প্রভু আমার প্রবেশ ও নির্গমন যেন সত্য ও সম্মানের ফটক দিয়েই হয় : তোমার সহায়তার অধিকার যেন আমার প্রতি মঞ্জুর করা হয়।'

আয়াৎ ৮১ : 'এবং বল, "সত্যের আবির্ভাব ঘটেছে, মিথ্যার বিনাশ হয়েছে; কারণ মিথ্যার ধ্বংস অনিবার্য্য।"

১৮ : সুরা কাহফ্

আয়াৎ ২৩ ও ২৪ : "আল্লার যদি অভিপ্রেত হয়" এই কথা যোগ না করে "আমি কাল ইহা নিশ্চয়ই করতে পারব" এমন কথা বলবে না। যখন তুমি ভুলে যাও, আল্লাকে স্মরণ কর এবং বল "আমি আশা করি আমার প্রভু এর চেয়েও নিকটতরভাবে আমাকে সত্যপথে পরিচালিত করবেন।"

আয়াৎ ৩০ : 'বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মশীলদের একটি সৎকর্ম্মের পুরস্কারও বিনষ্ট হবে না।'

আয়াৎ ৪৬ : 'ঐশ্বর্য্য ও সন্তান-সন্ততি এই পার্থিব জীবনেরই সৌন্দর্য্য—প্রলোভন। সৎকাজ হচ্ছে চিরস্থায়ী সম্পদ--আল্লার কাছে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। পুরস্কার এবং আশার উৎস হিসেবেও উত্তম।'

আয়াৎ ১১০ : 'বল "আমি তোমাদের মত একজন মানুষ মাত্র। আমার কাছে অহি এসেছে, যে, তোমাদের আল্লাহ্ এক। যে তার প্রভুর সঙ্গে মিলিত হতে চায় সে যেন সৎকাজ করে এবং তার প্রভুর উপাসনায় অন্যকে যেন অংশীদার না করে।"

১৯ : সূরা মরিয়ম্

আয়াৎ ৩০ : 'ঈসা বা যিশু বলছেন---"সত্যই আমি আল্লার সেবক। তিনি আমাকে কেতাবের অধিকারী ও নবী করেছেন';

আয়াৎ ৩১ : 'আমি যেখানেই থাকি তিনিই (আল্লাহ্) আমাকে অনুগৃহীত করেন এবং আজীবন উপাসনা ও দান করার আদেশ দিয়েছেন।

আয়াৎ ৬৬ : 'মানুষ বলে থাকে: "কি! মৃত্যুর পর আমাকে আবার পুনর্জ্জীবিত করা হবে!"

আয়াৎ ৬৭ : 'কিন্তু মানুষ কি এই কথা স্মরণ করে না, এর পূর্ব্বে একেবারে কিছু-না-থেকে যে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে?

আয়াৎ ৭৬ : 'যারা সৎপথের নির্দ্দেশ চায় আল্লাহ্ তাদের প্রতি নির্দ্দেশ পাঠিয়ে থাকেন। সৎকর্ম্মই হচ্ছে আল্লার কাছে অবিনশ্বর এবং পুরস্কার ও প্রতিদান হিসেবেও তা সব চেয়ে উত্তম।'

আয়াৎ ৯৬ : 'যারা বিশ্বাস করে এবং যারা সৎকর্ম্ম করে তাদের উপর বর্ষিত হয় আল্লার প্রেম ও করুণা।'

আয়াৎ ৯৭ : 'সৎকর্ম্মশীলকে যাতে তুমি সুসংবাদ ও যারা বিরোধে লিপ্ত তাদেরে যাতে সতর্ক করে দিতে পার, সেই জন্যেই আমরা কোরাণ সরল ও সহজ ভাষায় তোমার নিজের জবানে পাঠিয়েছি।'

২০ : সূরা তা'হা

আয়াৎ ৬৯ : 'যাদুকর যেখানেই যাক্ না কেন তার কখনো সমৃদ্ধি নেই। অর্থাৎ মিথ্যা ও ছলনার জয় কখনো সম্ভব নয়।'

আয়াৎ ৭৫ : 'যে সব মু'মিন ও সৎকর্ম্মশীল আল্লার নিকটবর্ত্তী হয় তাদের স্থান অত্যন্ত উচচ স্তরে';

আয়াৎ ৭৬ : 'নদী-প্রবাহিত অবিনশ্বর উদ্যানেই তারা চির-কাল বাস করবে, যারা পাপ থেকে নিজেদের নির্ম্মল রাখে, এই তাদের পুরস্কার'।

আয়াৎ ৮২ : 'আল্লাহ্ নিঃসন্দেহে যারা অনুতপ্ত হয়, বিশ্বাস করে, সৎকর্ম্ম ও ন্যায় করে এবং সত্যপথের নির্দ্দেশ গ্রহণে সদা প্রবৃত্ত, তাদেরে বার বার ক্ষমা করে থাকেন।'

আয়াৎ ১১২ : 'যারা সৎকর্ম্ম করে এবং যাদের বিশ্বাস বা ঈমান আছে তাদের কোন প্রকার নির্য্যাতন বা ক্ষতির ভয় নেই।'

আয়াৎ ১১৪ : 'সবার উপরে আল্লাহ্, সত্যের রাজাধিরাজ তিনি। সম্পূর্ণ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে কোরাণ সম্বন্ধে তাড়াতাড়ি (মন্তব্য) করো না। কিন্তু প্রার্থনা কর, "হে প্রভু, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর।" অর্থাৎ কোন বিষয় সম্পূর্ণরূপে না জেনে শুনে, আংশিক জ্ঞান নিয়ে কোন বিষয়েই আলোচনা করা, তার উপর মন্তব্য করা উচিত নয়। 'অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী'—ইহা অভিজ্ঞতারই বাণী।

আয়াৎ ১৩১ : এই পার্থিব জীবনে যে সব ঐশ্বর্য্য আমরা অন্যদের দিয়েছি তার দিকে লুব্ধচিত্তে তাকিয়ে নিজের চোখকে পীড়িত করো না, ঐ সব দিয়ে আমরা ওদের পরীক্ষা করি। কিন্তু আল্লার কাছ থেকে যে-জীবিকা, তা হচ্ছে সব চেয়ে উত্তম ও অবিনশ্বর।'

২১ : সূরা আম্বিয়া

আয়াৎ ৩৫ : 'প্রত্যেক আত্মাকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবেঃ আমরা ভাল ও মন্দের সাহায্যে তোমাদের পরীক্ষা করে থাকি। আমাদের কাছে তোমাদের ফিরে আসতেই হবে।'

আয়াৎ ৯৪ : 'যে-কেউ যে-কোন সৎকর্ম্ম করে এবং যার ঈমান আছে তার চেষ্টা কখনো ব্যর্থ হবে না। তার স্বপক্ষে তার কৃত সৎকর্ম্ম লিপিবদ্ধ করে রাখা হবে।'

আয়াৎ ১০৫ : 'আমার সৎকর্ম্মশীল সেবকগণই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে।'

আয়াৎ ১০৬ : 'সত্যই কোরাণ আল্লার সত্যিকার উপাসকমণ্ডলীর প্রতি এক মহৎ বাণী।'

আয়াৎ ১০৭ : 'রছুলকে বলা হচ্ছে--"তোমাকে আমরা সমগ্র বিশ্ববাসীর প্রতি রহমৎ বা করুণারূপেই পাঠিয়েছি।"

২২ : সুরা হজ্জ

আয়াৎ ১১ : 'মানুষের মধ্যে আল্লার এমন উপাসকও আছে, যারা দাঁড়িয়ে থাকে ধারে প্রান্তে, সুবিধা যদি আসে এতেই ওরা খুশী থাকে; কিন্তু বিপদ ও পরীক্ষা যখন আসে তখন তারা পৃষ্ঠ-ভঙ্গ দেয়,— এরা ইহকাল পরকাল দুই-ই হারায়। প্রকাশ্যে এই ক্ষতি সকলের দৃষ্টিগোচর হয়।'

আয়াৎ ১২ : 'আল্লাকে বাদ দিয়ে তারা এমন সব দেবতাদের স্মরণ লয়, যাদের ভাল-মন্দের কোন ক্ষমতাই নেই। সত্যই ইহা চরম বিপথগামিতা।'

আয়াৎ ২৮ : 'কোরবাণীর গোশত সম্বন্ধে বলা হচ্ছে..."তা থেকে তুমিও খাবে, অভাবগ্রস্থকেও খাওয়াবে।"

আয়াৎ ৩৭ : ('উৎসর্গিত বা কোরবাণীপ্রদত্ত পশুর) মাংস অথবা রক্ত আল্লার কাছে পৌঁছে না, কিন্তু তোমার সাধুতা ও পুণ্যই তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছে।'

আয়াৎ ৩৮ : 'সত্যই যারা বিশ্বাসী আল্লাহ্ তাদেরে রক্ষা করেন; অকৃতজ্ঞ ও বিশ্বাসঘাতককে আল্লাহ্ ভালবাসেন না।'

আয়াৎ ৪১ : 'যারা নিয়মিত উপাসনা ও দান করে, সুকাজের নির্দ্দেশ দেয় ও কুকাজ থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করে, আল্লাহ্ সেই সব লোককেই সাহায্য করেন।'

আয়াৎ ৪৫ : 'অত্যাচার ও কুকাজে লিপ্ত কত জাতিকেই না আমরা ধ্বংস করেছি। তারা ছাদের নীচে হুমড়ী খেয়ে পড়েছে। কত কূয়া অকেজো, কত সুনির্ম্মিত ও উচচ প্রাসাদাবলী হয়েছে পরিত্যক্ত।'

আয়াৎ ৪৬ : 'তারা কি দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করে না? তা হলে তাদের মন জ্ঞান আয়ত্ত করতে পারত এবং তাদের কর্ণরন্ধ্রও শ্রুতি-

শক্তি আয়ত্ত করতে সক্ষম হত। বাস্তবিক তাদের চোখ অন্ধ নয়, অন্ধ হচ্ছে তাদের বুকের অভ্যন্তরে ন্যস্ত দিল।'

আয়াৎ ৪৯ : বল, '"হে মানবমণ্ডলি! সুস্পষ্ট সতর্কবাণী শোনাবার জন্যই আমি তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি।" .

আয়াৎ ৫০ : 'যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম্ম করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও জীবিকার উদার ব্যবস্থা।'

আয়াৎ ৫১ : 'কিন্তু যারা আমাদের নিদর্শনকে ব্যর্থ করে দেওয়ার চেষ্টা করে তারা হচ্ছে অগ্নির সাথী।'

আয়াৎ ৫৮ : 'যারা আল্লার কারণে গৃহত্যাগ করে এবং পরে মৃত্যুমুখে পতিত অথবা নিহত হয়, তাদের উপর আল্লাহ্ উত্তম জীবিকা বর্ষণ করেন। বাস্তবিক তিনিই আল্লাহ্ যিনি উত্তম জীবিকাদাতা।'

আয়াৎ ৬০ : 'তার যা ক্ষতি করা হয়েছে তার অতিরিক্ত যদি সে প্রতিশোধ গ্রহণ না করে এবং তার উপর যদি আবারও জবরদস্তি করা হয়—আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করেন। কারণ তিনিই হচ্ছেন আল্লাহ্ যিনি পাপ বিদূরিত করেন ও বার বার ক্ষমা করেন।'

আয়াৎ ৬৩ : 'তুমি কি দেখ না আল্লাহ্ আকাশ থেকে বৃষ্টি-ধারা প্রেরণ করেন আর মুহূর্ত্তে ধরণী সবুজ বসনে হয় আচ্ছাদিত? তিনিই আল্লাহ্ যিনি সূক্ষ্মতম রহস্যকেও বুঝেন এবং তার সঙ্গে যিনি সুপরিচিত।'

আয়াৎ ৭৩ : 'হে মানবমণ্ডলি! এখানে একটি উপমা দেওয়া হল: শোন আল্লাকে ছাড়া যাদের তোমরা ডাক অর্থাৎ উপাসনা কর তারা সবাই সম্মিলিত হলেও একটি মক্ষিকাও সৃষ্টি করতে পারবে না, তাদের কাছ থেকে যদি মাছি কিছু ছিনিয়েও নেয় তা কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতাও তাদের নেই। যারা প্রার্থনা করে (এ সব পুতুলের কাছে) ও যাদের প্রতি প্রার্থনা করা হয় তারা উভয়েই দুর্ব্বল।'

আয়াৎ ৭৪ : 'আল্লাহ্ সম্বন্ধে তাদের (পুতুল পূজারীদের) কিছুমাত্র সত্যোপলব্ধি হয়নি: তিনিই আল্লাহ্ যিনি শক্তিমান ও নিজের ইচ্ছা পালনে যিনি সক্ষম।'

আয়াৎ ৭৭ : 'হে বিশ্বাসিগণ। ভক্তিতে মস্তক অবনত কর, ভূমিতে প্রণত হও আরাধনা কর তোমার প্রভুর এবং সৎকাজ কর: তা হলেই হবে তোমার সমৃদ্ধি।'

২৩ : সূরা মুমেনুন্

আয়াৎ ১–৫ : 'বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা উপাসনায় বিনয়াবনত যারা পরিহার করে শূন্যগর্ভ বাজে কথা যারা দানে উদ্যোগী ও সক্রিয় আর যৌন ব্যাপারে যারা সংযতেন্দ্রিয় নিশ্চয়ই তাদের জয় হবে।'

আয়াৎ ৮–১১ : 'যারা বিশ্বস্ততার সঙ্গে আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে আর উপাসনার বেলায় যারা দৃঢ় ও একনিষ্ঠ তারাই হবে উত্তরাধিকারী—তারাই পাবে স্বর্গের মিরাছ্ এবং তারাই সেখানে বসবাস করবে চিরকাল।'

আয়াৎ ৬২ : 'বহন করতে পারার অতিরিক্ত বোঝা আমরা কারো উপর চাপাইনি। আমাদের সামনে যে বিবরণ রয়েছে, তা সত্যের নিঃসন্দেহ প্রকাশ। কারো উপর অন্যায় করা হবে না।'

আয়াৎ ৯৬ : 'যা মন্দ তাকে বাধা দাও, যা সব চেয়ে উত্তম তাই দিয়ে ..।'

২৪ : সুরা নূর

আয়াৎ ২ : 'ব্যভিচার দোষে দোষী নর ও নারী প্রত্যেককে এক শ' করে চাবুক লাগাবে, তোমরা যদি আল্লাহ্ ও শেষ দিনে বিশ্বাস পোষণ করে থাক আল্লার নির্দ্দেশিত ও নির্দ্ধারিত বিষয়ে যেন করুণায় তোমাদের হৃদয় বিগলিত না হয়। এবং বিশ্বাসীদের মধ্যে একদল যেন এই রকম শাস্তির সময় সাক্ষীস্বরূপ উপস্থিত থাকে।'

আয়াৎ ৩ : 'ব্যভিচার দোষে দোষী কোন পুরুষ যেন ঐ রকম অপরাধে অপরাধিনী বা অবিশ্বাসিনী ছাড়া অন্য কাকেও বিয়ে না করে, ঐ রকম (ব্যভিচারী) পুরুষ বা অবিশ্বাসী ছাড়া অন্য কোন লোক যেন ঐ রকম (ব্যভিচারিণী) মেয়েকেও বিয়ে না করে; বিশ্বাসীদের জন্য এ রকম কাজ নিষেধ।'

আয়াৎ ৪ : 'সতী নারীর বিরুদ্ধে এ রকম (ব্যভিচারের) অপবাদ যারা দেয় এবং তাদের অভিযোগের সমর্থনে যদি তারা চার জন সাক্ষী পেশ করতে না পারে, তাদের উপর লাগাবে আশীটি চাবুক এবং এর পর অগ্রাহ্য করবে এদের সাক্ষ্য, কারণ এ সব লোক হচ্ছে অত্যন্ত বদ্ ও সীমালংঘনকারী।'

আয়াৎ ৫ : 'যতদিন না তারা অনুতপ্ত হয় ও নিজেদের সংশোধন করে (ততদিন তাদের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করবে); কারণ আল্লাহ্ চিরক্ষমাশীল ও দয়ালু।'

আয়াৎ ২৩ : 'অসতর্ক অথচ বিশ্বাসী এমন সতী নারীকে যারা অপবাদ দেয়, তাদের এই জীবন ও পরবর্ত্তী জীবন অভিশপ্ত, তাদের জন্য কঠোর শাস্তি।'

আয়াৎ ২৬ : 'পবিত্র নারী অপবিত্র পুরুষের জন্য, অপবিত্র পুরুষ অপবিত্র নারীর জন্য, পবিত্র নারী পবিত্র পুরুষের জন্য, পবিত্র

পুরুষ পবিত্র নারীর জন্য; লোকের কথায় (অপবাদে) এদের কিছু এসে যায় না, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক ব্যবস্থা।'

আয়াৎ ২৭ : 'হে বিশ্বাসী। তোমার নিজের ঘর ছাড়া অন্যের ঘরে অনুমতি না নিয়ে বা যারা ভিতরে আছে তাদের সালাম না জানিয়ে প্রবেশ করো না, ইহাই তোমার পক্ষে উত্তম।'

আয়াৎ ২৮ : 'ঘরে যদি কেউ না থাকে, তবুও অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করো না, যদি তোমাকে ফিরে যেতে বলা হয় ফিরে যেয়ো, তোমার নিজের জন্য ইহাতেই রয়েছে অধিকতর পবিত্রতা; তুমি যাই কর আল্লাহ্ সবই জানেন।'

আয়াৎ ২৯ : 'যে ঘর লোকের বাসস্থান হিসেবে ব্যবহার করা হয় না যাতে অন্য উদ্দেশ্য সাধিত হয়, তাতে প্রবেশ করলে কোন দোষ হয় না; তুমি যা প্রকাশ কর আর যা গোপন কর সবই আল্লাহ্ জানেন।'

আয়াৎ ৩০ : 'বিশ্বাসী লোকগণকে বল তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত করে ও নিজেদের শ্লীলতা রক্ষা করে, ইহাতেই রয়েছে তাদের জন্য অধিকতর পবিত্রতা।'

আয়াৎ ৩১ : 'বিশ্বাসী নারীগণকে বল তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত করে ও নিজেদের শ্লীলতা রক্ষা করে; যা স্বভাবতই উন্মুক্ত তা ছাড়া তারা যেন নিজেদের সৌন্দর্য্য ও অলঙ্কার জাহির না করে এবং নিজেদের বক্ষ-দেশের পর যেন আবরণ টেনে দেয়।'**

আয়াৎ ৩৩ : 'যাদের বিয়ে করার সম্বল নেই, আল্লাহ্ তাদেরে তৌফিক্ দেওয়া পর্য্যন্ত তারা যেন পবিত্রভাবে জীবন যাপন করে, তোমার কোন ক্রীতদাসীকে বেশ্যাবৃত্তিতে বাধ্য করোনা।'

আয়াৎ ৪৩ : ৪৪ : 'মেঘ, বৃষ্টি, শিলা, বিদ্যুৎ ও পর্য্যায়ক্রমে যে দিন-রাত হয় তাতে চক্ষুষ্মান মানুষের জন্য রয়েছে শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত।'

আয়াৎ ৫১ : 'বিচারের জন্য যখন বিশ্বাসিগণ আল্লাহ্ ও রছুলের সাম্‌নে নীত হবেন, তখন তাদের মুখে এই ছাড়া অন্য উত্তর থাকবে না—'আমরা শুনি এবং মেনে নিই'—ইহাতেই লাভ হবে আনন্দ।'

আয়াৎ ৫২ : 'এই রকমভাবে যারা আল্লাহ্ ও রছুলকে মানে, আল্লাকে করে ভয় ও পালন করে ন্যায়, পরিণামে তারাই হয় জয়ী।'

আয়াৎ ৫৮ ঃ 'রাত্রে শেষ উপাসনার পর থেকে উষাকালীন উপাসনার আগ্ পর্য্যন্ত, আর দুপুরবেলা, যখন তোমরা কাপড়-চোপড় ছেড়ে অসতর্কভাবে বিশ্রাম করো, তখন দাস-দাসী, চাকর-বাকর, এমন কি অল্প বয়স্ক শিশুরাও যেন বিনানুমতিতে তোমাদের কাছে না আসে; অন্য সময় পরস্পর দেখাশোনা বা মেলামেশায় আপত্তি নেই;—আল্লাহ্ এইভাবে দিয়েছেন পরিষ্কার নির্দশন, কারণ আল্লাহ্ জ্ঞান ও বিজ্ঞতায় পূর্ণ।'

আয়া ৫৯ ঃ 'শিশুরা যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয় তারাও যেন বড়দের মত অনুমতি প্রার্থনা করে'

আয়াৎ ৬০ ঃ 'বৃদ্ধারা, যাদের বিয়ের বয়স পেরিয়ে গেছে, তারা যদি বহিরাবরণ খুলে রাখে তাতে দোষ নেই, যদি না তারা অনাবশ্যক নিজেদের সৌন্দর্য্য জাহির করার চেষ্টা করে। কিন্তু লজ্জাশীলা হওয়া তাদের পক্ষেও উত্তমঃ আল্লাহ্ সব দেখেন, সব জানেন।'

আয়া ৬১ ঃ 'তোমরা যখন কোন বাড়ীতে প্রবেশ কর, পরস্পর সালাম করবে,—সালাম আল্লার কাছ্ থেকে বহন করে নিয়ে আসে পবিত্রতা ও আশীর্বাদ।'

২৫ঃ সুরা ফোরকান্

আয়াৎ ৬৩ : 'মহান ও দয়ালু আল্লার তারাই সেবক যারা বিনয়ের সঙ্গে পৃথিবীতে বিচরণ করে, যখন অজ্ঞলোকেও তাদেরে সম্বোধন করে, তারা বলে—'সালাম'—শান্তি।'

আয়াৎ ৬৭ : 'যারা খরচের বেলায় অমিতব্যয়ীও নয় আবার মুষ্টিবদ্ধ কৃপণও নয়, বরং এই দুই প্রান্তের মাঝখানে সমতা রক্ষা করে, তারাই উত্তম।'

আয়াৎ ৭০ : 'যারা অনুতপ্ত হয়, বিশ্বাস করে ও সুকাজ করে, আল্লাহ্ তাদের মন্দকেও ভালয় পরিণত করেন, আল্লাহ্ সতত ক্ষমাশীল ও অত্যন্ত দয়ালু।'

আয়াৎ ৭১ : 'যে কেউ অনুতপ্ত হয় ও সৎকর্ম্ম করে, বুঝতে হবে সত্য সত্যই সে আল্লার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করেছে।'

আয়াৎ ৭২ : 'যারা কোন মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং যখন বেহুদা ও বাজে কিছুর সামনে গিয়ে পড়ে, তখন তাকে সসম্মানে পরিহার করে চলে (তাদের জন্যে রয়েছে পুরস্কার)।'

২৬: সুরা শোয়া'রা

আয়াৎ ৮৩ : (হজরত ইব্রাহিম আল্লার কাছে প্রার্থনা করছেন) 'হে আল্লাহ, আমাকে জ্ঞান দান কর এবং সৎকর্ম্মশীলদের সঙ্গী কর।'

আয়াৎ ৮৪ : 'পরবর্ত্তীকালে সত্যের রসনায় যেন আমি উল্লিখিত হই—।'

আয়াৎ ৮৫ : 'আমাকে আনন্দ-উদ্যানের অন্যতম উত্তরাধিকারীকর'—

আয়াৎ ৮৬ : 'আমার পিতাকে ক্ষমা কর, কারণ তিনিও পথভ্রষ্টদের অন্যতম'।—

আয়াৎ ৮৮ : 'বিচারের দিন সম্পদ বা পুত্র কিছুই কাজে আসবে না।'

আয়াৎ ৮৯ : 'কিন্তু যিনি নিয়ে আসবেন সুস্থ অন্তঃকরণ একমাত্র তাঁরই হবে সমৃদ্ধি।'—

আয়াৎ ৯০ : 'সৎকর্ম্মশীলের জন্য স্বর্গোদ্যান নিকটবর্ত্তী হবে।'

আয়াৎ ৯১ : 'যারা মন্দের দিকে বিপথগামী তাদের দৃষ্টি জুড়ে রাখা হবে অগ্নি।'—

আয়াৎ ১৫১ : ১৫২ : 'যারা অমিতব্যয়ী তাদের হুকুম মেনো না আর মেনো না যারা করে দেশে অশান্তির স্বষ্টি এবং করে না নিজেদের সংশোধন, তাদেরে।'

আয়াৎ ১৮১ : 'যথাযথ ওজন দেবে এবং (শঠতার দ্বারা) কারো ক্ষতির কারণ হবে না।'

আয়াৎ ১৮২: 'খাঁটি ও ঠিক মাপযন্ত্র দ্বারা ওজন করবে ও মাপবে।'

আয়াৎ ১৮৩ : 'মানুষকে তার প্রকৃত প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করো না আর কুকাজ করে দেশে কোন রকম অশান্তি স্বষ্টি করবে না।'

২৭ঃ সুরা নমল্

আয়াৎ ৩ ঃ 'যারা নিয়মিত উপাসনা করে আর নিয়মিত দান করে, পরলোকে তাদের জন্য রয়েছে পূর্ণ অঙ্গীকার।'

আয়াৎ ১১ ঃ 'যদি কেহ অন্যায় করে এবং পরে মন্দের পরি-বর্ত্তে যদি করে ভাল (সে পাবে ক্ষমা), সত্যই আমি চির-ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু।'

আয়াৎ ৪৮ ঃ 'তারা (অবিশ্বাসীরা) কি দেখতে পায় না আমরা তাদের বিশ্রামের জন্য রাত ও আলোর জন্য করেছি দিন? যে কোন জাতি যারা বিশ্বাস করে এই সবে রয়েছে তাদের জন্য নিদর্শন।'

আয়াৎ ৮৯ ঃ 'যদি কেউ ভাল কাজ করে, তা হলে তার জন্য জমা হবে ভাল,—বিচারের দিন সে পাবে অভয়।'

আয়াৎ ৯২ ঃ 'কোরাণ পাঠ করে যদি কেউ উপদেশ গ্রহণ করে, সে তা করে নিজের আত্মার মঙ্গলের জন্যই; এবং যদি কেউ বিপথগামী হয় তাকে বল (হে রছুল) "আমি শুধু একজন সতর্ককারী।"

আয়াৎ ৩৭ : 'অত্যাচারীদের সমৃদ্ধি নেই।'

আয়াৎ ৫০ : 'আল্লার নির্দ্দেশ ভুলে যারা নিজেদের ইন্দ্রিয়ের অনুসরণ করে তাদের চেয়ে ভ্রান্ত আর কে?'

আয়াৎ ৫৫ : '(বিশ্বাসীগণ) যখন বাজে গল্প-গুজব শোনে, তখন তারা সেখান থেকে সরে পড়ে এবং বলে "আমাদের কর্ম্মফল আমাদের কাছে, তোমাদের কর্ম্মফল তোমাদের কাছে, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক, আমরা মূর্খের সঙ্গ কামনা করি না।'

আয়াৎ ৭৬ : 'উল্লসিত হয়ো না, ধন নিয়ে উল্লাস আল্লাহ্ পছন্দ করেন না।'

আয়াৎ ৭৭ : 'কিন্তু আল্লাহ্ প্রদত্ত ধন দিয়ে সন্ধান কর পরকালের বাসগৃহ অর্থাৎ দান কর এবং ধন সৎকর্ম্মেই ব্যয় কর। দুনিয়ায় নিজের অংশ ভুলে যেয়ো না অর্থাৎ নিজের ন্যায্য ও প্রয়োজনীয় যা খরচ তা করবে, প্রয়োজনের বেলায় কৃপণতা করবে না। আল্লাহ্ যেমন তোমার ভাল করেছেন তুমিও অপরের ভাল কর। সংসারে বিবাদ বাধাবার সুযোগ সন্ধান করো না, কারণ যারা বিবাদ করে আল্লাহ্ তাদেরে পছন্দ করেন না।'

আয়াৎ ৭৮ : 'দুষ্টকে তার পাপের জবাবদিহির জন্য সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য তলব দেওয়া হয় না।'

অর্থাৎ সময় মতই পাপের দণ্ড দেওয়া হয়, মানুষের ইচ্ছামত যখন তখন পাপের দণ্ড বা পুণ্যের পুরস্কার বর্ষিত হয় না। অনেক সময় পাপের শাস্তি সঙ্গে সঙ্গে দেখতে না পেয়ে অধৈর্য্য মানুষ বিরক্ত ও নিরাশ হয়ে পড়ে, কিন্তু আল্লাহ্ পরম ধৈর্য্যশীল, তিনি মানুষকে

সংশোধনের সুযোগ দিয়ে থাকেন। সময় উপস্থিত হলেই তিনি শাস্তি বা পুরস্কার বর্ষণ করেন।'

আয়াৎ ৮০ : 'বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মশীলদের জন্য পরলোকে রয়েছে উত্তম পুরস্কার। কিন্তু সৎকর্ম্মে ধৈর্য্যশীল ছাড়া অন্য কেউই তা অর্জ্জন করতে পারবে না।'

আয়াৎ ৮৩ : 'যারা দুনিয়ায় বিবাদ করে না ও যারা অবাধ্য নয়, পরলোকে তারা পাবে আবাসস্থল। সৎকর্ম্মশীলের অন্তিম অতি উত্তম।'

আয়াৎ ৮৪ : 'যদি কেউ সৎকর্ম্ম করে, সে পায় তার কর্ম্মের চেয়েও উত্তম পুরস্কার, কিন্তু যদি কেউ কু-কর্ম্ম করে, তাকে দেওয়া হয় তার কু-কাজের সমপরিমাণ শাস্তি।'

আয়াৎ ৮৮ : 'আল্লাহ্ ছাড়া অন্য দেব-দেবীকে ডেকো না। তিনি ছাড়া অন্য কোন প্রভু নেই। আল্লাহ্ ছাড়া সবই বিনষ্ট হবে। তিনিই হুকুমের মালিক, তাঁর কাছেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে।'

২৯ : সূরা আন্‌কবুত

আয়াৎ ২ : 'লোকে কি মনে করে "আমরা বিশ্বাস করি" এই কথা বল্লেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে, কোন পরীক্ষাই করা হবে না ?'

আয়াৎ ৩ : 'তাদের পূর্ববর্ত্তীদের পরীক্ষা করা হয়েছে এবং কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী আল্লাহ্ তা নিশ্চয়ই জানেন।'

আয়াৎ ৪ : 'যারা কুকাজে রত তারা কি মনে করে তারা আমাদের (আল্লার) উপর জয়ী হবে? ইহাকেই বলে ভ্রান্ত বিচার।'

আয়াৎ ৬ : 'যদি কেউ চেষ্টা করে (জেহাদ বা সংগ্রাম করে) অবশ্য সৎকর্ম্মে, তারা তা নিজেদের আত্মার জন্যই করে, কারণ আল্লাহ্ সমস্ত অভাব থেকেই মুক্ত, তাঁর সৃষ্ট-জগতের মুখাপেক্ষী তিনি নন্।'

আয়াৎ ৭ : 'যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম্ম করে, আমরা তাদের সমস্ত পাপ নিশ্চিহ্ন করে মুছে দেব, তাদের সর্বোত্তম কর্ম্মানুসারেই আমরা তাদেরে করব পুরস্কৃত।'

আয়াৎ ৮ : 'মাতাপিতার প্রতি সদয় ব্যবহার আমরা নির্দ্দেশ করেছি, কিন্তু যদি তারা বা তাদের একজন, যার সম্বন্ধে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাকে আমার সঙ্গে যুক্ত করার জন্যে নির্দ্দেশ দেয়, সেই নির্দ্দেশ তুমি অমান্য করো। তোমাদের সকলকেই আমার কাছে ফিরে আস্‌তে হবে, এবং তোমাদের সমস্ত কৃতকর্ম্ম তোমাদের জানানো হবে।'

আয়াৎ ৯ : 'যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম্ম করে, তারা সৎকর্ম্মশীলের সঙ্গ লাভ করবে।'

আয়াৎ ১১ : 'আল্লাহ্ নিশ্চয়ই জানেন কে বিশ্বাসী এবং আর কে কপট।'

আয়াৎ ২০ : 'বল: "বিশ্ব পর্য্যটন করে দেখ আল্লাহ্ কী করে সৃষ্টির সূচনা করেছেন, পরেও আল্লাহ্ এইভাবেই সৃষ্টি করবেন। কারণ তাঁর ক্ষমতা রয়েছে সব কিছুর উপর।'

আয়াৎ ২১ : 'যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দিচ্ছেন, যাকে ইচ্ছা করুণা করছেন এবং তাঁর প্রতিই আমাদের প্রত্যাবর্ত্তন।'

আয়াৎ ২২ : 'স্বর্গে বা মর্ত্ত্যে কোথাও তুমি তাঁর উদ্দেশ্য বা পরিকল্পনা ব্যর্থ করতে পারবে না এবং আল্লাহ্ ছাড়া তোমার কোন রক্ষাকর্ত্তা বা সাহায্যকারীই নেই।'

আয়াৎ ৪১ : 'যারা আল্লাকে ছাড়া অন্যদের করে নিজের রক্ষাকর্ত্তা তাদের উপমা হচ্ছে মাকড়শা, যে মাকড়শা নিজের জন্য ঘর তৈরী করে বটে, কিন্তু মাকড়শার ঘর হচ্ছে সবচেয়ে ভঙ্গুর। যদি তারা তা জান্‌ত।' অর্থাৎ যারা আল্লাকে ছেড়ে অন্য দেব-দেবীকে করে নিজের উপাস্য, যদি তারা এই সত্য বুঝ্‌তে পারত, তাহ'লে ক্ষণ-স্থায়ী ও ভঙ্গুর দেব-দেবীতে তারা কখনো বিশ্বাস ন্যস্ত করতো না।

আয়াৎ ৪৪ : 'আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবীকে সমভাবেই সৃষ্টি করেছেন: বস্তুতঃ তাতেই রয়েছে বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন।'

আয়াৎ ৪৫ : 'ওহিরূপে যে কেতাব (অর্থাৎ কোরাণ) প্রেরিত হয়েছে তা আবৃত্তি কর, নিয়মিত উপাসনা কর, কারণ উপাসনা মানুষকে রক্ষা করে অন্যায় ও লজ্জাজনক কাজ থেকে এবং নিঃসন্দেহে আল্লাকে স্মরণ করা এক মহত্তম কাজ। এবং তুমি যা কর আল্লাহ্ তা সবই জানেন।'

আয়াৎ ৪৬ : 'যারা তোমাদের প্রতি অন্যায় বা আঘাত করে তাদের সঙ্গে ছাড়া, গ্রন্থপ্রাপ্ত জাতিদের সঙ্গে মহত্তর উপায়ে ভিন্ন বিবাদ করো না। বরং বল—"আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আমরা বিশ্বাস করি এবং তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল তাতেও আমরা বিশ্বাস পোষণ করি; আমাদের এবং তোমাদের আল্লাহ্ এক এবং তাঁর প্রতিই আমরা নতি স্বীকার করে থাকি।"

আয়াৎ ৫৭ : 'প্রত্যেক আত্মাকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে; অন্তিমে আমাদের কাছে (অর্থাৎ আল্লার কাছে) তোমাদের নিয়ে আসা হবে।'

আয়াৎ ৬১ : 'যদি সত্যই তুমি জিজ্ঞাসা কর, আকাশ ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? চন্দ্র-সূর্য্যকে কে নিয়মাধীন করেছেন? তারা নিশ্চয়ই উত্তর দেবে, "আল্লাহ্।" তার পরেও তারা কি করে বিভ্রান্ত হয় ও বিপথে যায়?'

সংসারে এমন লোকের অভাব নেই যারা একেশ্বরবাদী, ঈশ্বরের ক্ষমতা ও অস্তিত্বে যারা বিশ্বাস-পরায়ণ,---কিন্তু আল্লার বিধি-নিষেধ তারা মেনে চলে না, আল্লার নির্দ্দেশিত পথেরও তারা করে না অনুসরণ। সত্যই এইসব লোকের আচরণ অত্যন্ত বিস্ময়কর।

আয়াৎ ৬৫ : 'যখন তারা নৌকারোহণ করে তখন একান্ত ভক্তির সঙ্গেই তারা আল্লাকে ডাকে, যখন আল্লাহ্ তাদেরে নিরাপদে ডাঙ্গায় পৌঁছে দেন, তখন তারা অন্যকে দেয় অংশ (তাদের উপাসনার); অর্থাৎ তখন তারা আল্লাকে ছেড়ে গ্রহণ করে অন্য উপাস্য।'

আয়াৎ ৬৮ : 'সত্যের বাণী তার কাছে পৌঁছার পর যে সত্যকে অস্বীকার করে অথবা তারপরেও আল্লার বিরুদ্ধে যে মিথ্যার বেসাতি করে, তার চেয়ে কে বেশী নিজের ক্ষতি সাধন করে? যারা বিশ্বাস বা ধর্ম্মকে অস্বীকার করে তাদের জন্য কি নরকে বাসস্থান নেই?"

আয়াৎ ৬৯ : 'যারা আমাদের (আল্লার) জন্য চেষ্টা করে, সংগ্রাম করে, নিশ্চয়ই তারা আমাদের অর্থাৎ সত্যের পথে পরিচালিত হবে। কারণ সত্যই আল্লাহ্ সৎকর্ম্মশীলদের সঙ্গেই বিরাজ করেন।'

আয়াৎ ৯ : 'তারা কি পৃথিবী ঘুরে তাদের পূর্ববর্ত্তীদের কি পরিণাম হয়েছে তা দেখে না? তারা শক্তিতে ছিল উচ্চতর, ভূমি কর্ষণ করে করেছিল চাষ, ওদের জন-সংখ্যাও ছিল অনেক বেশী, তাদের কাছে পরিষ্কার নিদর্শন নিয়ে তাদের পয়গম্বর এসেছিলেন, তারা কিন্তু তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। আল্লাহ্ তাদের ক্ষতি করেননি, তারাই নিজেদের আত্মার ক্ষতি সাধন করেছে।'

আয়াৎ ১০ : 'যারা মন্দ কাজ করে শেষ-মেষ তাদের পরিণামও হয় চরম মন্দে।' ***

আয়াৎ ১৫ : 'যারা বিশ্বাস করেছে এবং সৎকাজ করেছে সেইদিন (বিচারের দিন) আনন্দের মধু-উৎসবে তাদের করা হবে সুখী।'

আয়াৎ ১৬ : 'আর যারা হয়েছে অবিশ্বাসী এবং অন্যায়ভাবে আল্লার নিদর্শনে ও পরে তাঁর সঙ্গে মিলনকে করেছে অস্বীকার তাদের উপর বর্ষিত হবে দণ্ড।'

আয়াৎ ১৯ : 'তিনি (আল্লাহ্) মৃতকে জীবিত ও জীবিতকে মৃতে পরিণত করেন। মৃত ধরণীকে যিনি করেন জীবন দান; মৃত্যুর পর তোমাকেও তিনিই করবেন পুনর্জীবিত।'

আয়াৎ ২০ : 'তাঁর (আল্লার) নিদর্শন বাণীর ইহাও একটি : তিনি তোমাকে ধূলি-কণা থেকেই সৃষ্টি করেছেন। তারপর মানুষ তোমরা পৃথিবীর সর্বত্র পড়েছ ছড়িয়ে।'

আয়াৎ ২১ : 'ইহাও তাঁর একটি নিদর্শনঃ তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের সাথী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের নিয়ে শান্তিতে বসবাস করতে পার। এবং তোমাদের অন্তরে তিনি দিয়েছেন

দয়া ও ভালবাসা। সত্যই যারা চিন্তা করে তাদের জন্য এই সবে রয়েছে নিদর্শন।'

আয়াৎ ২২ : 'তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে আকাশ ও পৃথিবী-সৃষ্টি, তোমাদের ভাষা ও বর্ণ বৈচিত্র্যও অন্যতম। সত্যই যারা জানে তাদের জন্যে ঐসবে রয়েছে ইঙ্গিত।'

আয়াৎ ২৩ : 'তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রাত্রে ও দিনে তোমরা যে নিদ্রা যাও এবং তাঁর প্রাচুর্য্য থেকে তোমরা যে-জীবিকা সন্ধান কর তা-ও, --সত্যই যারা শোনে, তাদের জন্য এই সবই ইসারা।'

আয়াৎ ২৪ : 'তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যেঃ একাধারে ভয় ও আশার সঙ্কেতরূপে তিনি প্রদর্শন করেন বিদ্যুৎ ও প্রেরণ করেন বৃষ্টি-ধারা, যার ফলে মৃত ধরণী হয়ে ওঠে সজীব। সত্যই যারা পাপী তাদের জন্য এই সবই নিদর্শন।'

আয়াৎ ৩১ : 'অনুতপ্ত চিত্তে আল্লার দিকে ফের এবং তাঁকেই কর ভয়ঃ নিয়মিত উপাসনা কর এবং যারা আল্লার সঙ্গে অংশীদার যুক্ত করে,---তাদের দলভুক্ত হয়ো না।'---

আয়াৎ ৩২ : (দলভুক্ত হয়ো না ঐসব লোকের) যারা নিজেদের ধর্ম্মকে বিভক্ত করে ও দলাদলি করে এবং নিজ নিজ দলের যা, শুধু তা নিয়েই যারা গর্ব করে।'

আয়াৎ ৩৮ : 'যা আত্মীয়দের প্রাপ্য তা দিয়ে দাও, আর দান কর অভাবগ্রস্ত ও ভ্রমণশীল পথিককে। যারা আল্লাকে চায় তাদের জন্য ইহাই উত্তম এবং এই সব লোকই হন সমৃদ্ধিশালী।'

আয়াৎ ৩৯ : 'অন্যের সম্পদ নিয়ে যারা নিজের উন্নতি চায়, আল্লার নিকট তাদের কোন সমৃদ্ধি নেই। কিন্তু আল্লাকে কামনা করে তোমরা যা দানে লাগাও, তাতেই হয় উন্নতিঃ এই সব লোক প্রতিদানে পায় বহুগুণ।'

আয়াৎ ৪০ : 'আল্লা-ই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তদুপরি তিনিই তোমার জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন, তারপর তিনিই তোমার মৃত্যুর কারণ হবেন এবং তিনিই তোমাকে দান করবেন নব-জীবন। তোমাদের

কপট "অংশীদার" অর্থাৎ মিথ্যা দেবতাদের কেউ কি এই সবের একটিও করতে সক্ষম? সমস্ত গৌরব আল্লারই, তাঁর আসন তাদের কল্পিত "অংশীদার"দের অনেক উপরে।'

আয়াৎ ৪২ : 'পৃথিবীব্যাপী ভ্রমণ করে তোমার পূর্ববর্ত্তীদের পরিণাম কি হয়েছে দেখ। তাদের অধিকাংশই আল্লাকে বাদ দিয়ে অন্যের পূজা করেছিল।'

আয়াৎ ৪৩ : 'যে দিনকে কিছুতেই পরিহার করা যাবে না সেই দিন এসে পড়ার আগেই তুমি সত্য ধর্ম্মের প্রতি তোমার মুখ ফেরাও। সেই দিন (অর্থাৎ কেয়ামতের দিন) মানব জাতি (বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী) এই দুইভাগে বিভক্ত হবে।'

আয়াৎ ৪৪ : 'যারা ধর্ম্মকে অস্বীকার করে তারা এই অস্বীকৃতির পরিণাম ভোগ করবেই, যারা সৎ কাজ করে তারা নিজেদের আরাম শয্যাকে করে বিস্তৃত অর্থাৎ তারাই হবে অপরিমিত সুখী।'

আয়াৎ ৪৫ : 'আল্লাহ্ তাঁর প্রাচুর্যের ভাণ্ডার থেকে পুরস্কৃত করবেন, যাঁরা বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মশীল তাঁদেরে; অবিশ্বাসীকে তিনি ভালবাসেন না।'

আয়াৎ ৪৬ : 'তাঁর (আল্লার) নিদর্শনাবলীর মধ্যে ইহাও: বাতাসকে পাঠান তিনি সুসংবাদের দূতরূপে, যা দিয়ে থাকে তোমাকে তাঁর রহস্য ও দয়ার স্বাদ---তাঁর আদেশে যেন চল্‌তে পারে জাহাজ এবং তাঁর প্রাচুর্য্য থেকে তোমরা যেন চাইতে পার ও হতে পার কৃতজ্ঞ।'

আয়াৎ ৪৮ : 'আল্লা-ই পাঠিয়েছেন বায়ু, যে-বায়ু সৃষ্টি করে মেঘ। (বলা বাহুল্য বায়ুর সাহায্যেই বাষ্প নীত হয় আকাশে) ইচ্ছা মত আল্লাহ্ এই মেঘ-রাশিকে ছড়িয়ে দেন আকাশে ও ভেঙ্গে চূর্ণিত করেন যতক্ষণ না তোমরা দেখতে পাও তার থেকে নেমে পড়ছে বৃষ্টিফোঁটা, যখন এই বৃষ্টি-ধারা তাঁর বান্দার দ্বারে গিয়ে পৌঁছে তখন তারা হয় উল্লসিত।'

আয়াৎ ৪৯ : 'যদিও বৃষ্টিধারা পৌঁছার পূর্বে তারা ছিল নৈরাশ্যে মূক।'

আয়াৎ ৫০ : 'তাই হে মানুষ, ভাব আর স্মরণ কর আল্লার রহমতের কথা ; কীভাবে তিনি মৃত ধরণীকে দিয়ে থাকেন জীবন, ঠিক সেই ভাবেই মৃত মানুষকে তিনি দেবেন প্রাণ। কারণ তাঁর রয়েছে সব কিছুর উপর অধিকার।'

আয়াৎ ৫৭ : 'শেষ বিচারের দিন সীমালঙঘনকারীদের কোন অজুহাতই কাজে আস্‌বে না, তখন (তৌবা করে) রহমত ভিক্ষার জন্যে তাদেরে আর ডাকা হবে না।'

আয়াৎ ৬০ : 'সুতরাং ধৈর্য্যধারণ কর, আল্লার প্রতিশ্রুতি পরম সত্য। যাদের নিজেদের বিশ্বাসের স্থিরতা নেই, তারা যেন তোমার বিশ্বাসকে বিচলিত না করে।'

৩১ঃ সূরা লোকমান

আয়াৎ ৩ ঃ '(কোরাণের এই সমস্ত আয়াৎ) সৎকর্ম্মশীলের জন্যে একাধারে রহমত ও পথপ্রদর্শক।'

আয়াৎ ৪ঃ 'যাঁরা নিয়মিত নমাজ পড়েন ও নিয়মিত জকাত দেন এবং অন্তরে পোষণ করেন পরলোকের আশ্বাসঃ'

আয়াৎ ৫ ঃ 'তাঁদের জন্য এই সব (অর্থাৎ আয়াৎ সমূহ) তাঁদের প্রভুর কাছ্ থেকে সত্যকার পথ-নির্দ্দেশ এবং তারাই অর্জ্জন করবে সফলতা ও সমৃদ্ধি।'

আয়াৎ ৬ ঃ 'কিন্তু এমন মানুষও আছে যারা ক্রয় করে মিথ্যা ও অর্থহীন কল্প-কাহিনী, মানুষকে এরা আল্লার পথ থেকে করে বিপথগামী ও সত্য পথকে করে উপহাস। এই সব লোকের ভাগ্যে জুটবে অবমাননাকর শাস্তি।'

আয়াৎ ৭ ঃ 'এই রকম লোকের কাছে যখন আমাদের নিদর্শন পুনরুল্লিখিত হয়, তখন সে দম্ভের সঙ্গে ঘাড় বাঁকায়, এবং এমন ভান করে যেন শুনতে পায়নি, যেন তার দু'কানই কালা। এমন লোকের প্রতি ঘোষণা কর কঠোর শাস্তি।' অর্থাৎ জ্ঞানের কথার প্রতি যে করে পৃষ্ঠ প্রদর্শন, তার কখনো হতে পারে না শুভ।

আয়াৎ ৮ ঃ ৯ ঃ 'যারা বিশ্বাস ও সৎকর্ম্ম করেন, তাঁরা বাস করার জন্য পাবেন রম্য উদ্যান, আল্লার প্রতিশ্রুতি সত্য, তিনি সর্বোচচ ক্ষমতার অধিকারী ও জ্ঞানী।'

আয়াৎ ১২ ঃ 'আল্লার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, যে তাই হয় সে নিজের আত্মারই কল্যাণ সাধন করে, কিন্তু যে অকৃতজ্ঞ (সে করে নিজেরই অকল্যাণ); আল্লাহ্ সমস্ত অভাবের উর্দ্ধে ও সমস্ত প্রশংসারই যোগ্য।'

আয়াৎ ১৩ : 'জ্ঞানী-শ্রেষ্ঠ লোকমান, নিজের পুত্রকে উদ্দেশ করে বলেছেন, "হে পুত্র, অন্যকে আল্লার সঙ্গে উপাসনার অংশীদার করো না, কারণ মিথ্যা উপাসনা হচ্ছে সব চেয়ে নিকৃষ্ট কাজ।"

আয়াৎ ১৪ : 'আল্লাহ্ মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দ্দেশ দিয়েছেন:—বেদনার পর বেদনা যাকে সহ্য করতে হয় আর পান করাতে হয় (সন্তানকে) দু'বৎসর ধরে স্তন্য। আল্লার আদেশ হচ্ছে—"আমার প্রতি ও তোমাদের পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। আমি-ই হচ্ছি তোমার শেষ গন্তব্যস্থল।'

আয়াৎ ১৫ : 'কিন্তু তাঁরা (অর্থাৎ পিতা-মাতা) যদি তোমার অজ্ঞাত কোন কিছুকে আমার সঙ্গে উপাসনার অংশীদার করতে হুকুম করে, সেই হুকুম অমান্য করবে। কিন্তু তবুও জীবনে তাঁদের সঙ্গে ন্যায় ও সুবিবেচনার সঙ্গে ব্যবহার করবে এবং যাঁরা আমাকে ভালবাসেন তাঁদের পথই তুমি করবে অনুসরণ। শেষকালে তোমাদের সকলেরই প্রত্যাবর্ত্তন হবে আমার কাছে এবং তোমরা যা কিছুই কর তার সত্যার্থ আমি সেদিন তোমাদের কাছে করব উদঘাটন।'

আয়াৎ ১৭ : 'লোকমান পুত্রকে আদেশ করেছেন: "নিয়মিত উপাসনা করবে, যা ন্যায় তারই হুকুম করবে যা অন্যায় তা করবে নিষেধ এবং সব কিছুকে বহন করবে অবিরাম ধৈর্য্যের সঙ্গে। কারণ কাজ করতে গেলেই প্রয়োজন সুকঠিন দৃঢ়তার।'

আয়াৎ ১৮ : 'অহঙ্কারে ফেঁপে মানুষের প্রতি স্ফীত-গণ্ড হয়ো না, আর দম্ভের সঙ্গে হেঁটো না দুনিয়ার বুকে। কারণ একগুঁয়ে ও দাম্ভিককে আল্লাহ্ ভালবাসেন না।'—

আয়াৎ ১৯ : 'সাধারণভাবে পা ফেলবে, অনতি উচ্চ স্বরে কথা বল্‌বে: কারণ গাধার চীৎকারই হচ্ছে সব চেয়ে কর্কশ আওয়াজ।'

ইসলাম সব ব্যাপারে বিশেষ করে দৈনন্দিন আচরণে মধ্য-পন্থারই সমর্থক, সব কিছুরই চরম বা Extreme কে করা হয়েছে নিষেধ। তাই সদম্ভ পদক্ষেপ ও অনাবশ্যক চীৎকারধ্বনি ইসলামে পায়নি সমর্থন। দম্ভ, অহঙ্কার ইত্যাদি আত্ম-বিনাশকর প্রবৃত্তির প্রতি নিষেধাজ্ঞা জানানো

হয়েছে কোরাণের আরো বহু জায়গায়। ইসলাম সহজ মানুষের সুশৃঙ্খল শান্ত জীবনেরই সমর্থক।

আয়াৎ ২১ : 'আল্লার অবতীর্ণ বাণী অনুসরণ করার জন্য যখন অবিশ্বাসীদের বলা হয়, তারা উত্তর করে—"না, আমরা আমাদের পিতা-পিতামহদের যে-পথ অনুসরণ করতে দেখেছি, আমরাও সেই পথই অনুসরণ করব।" কী! যদি শয়তানই তাদের অগ্নিকুণ্ডের দিকে চালিত করে তবুও?' অর্থাৎ পূর্ব পুরুষের পথ যদি ভ্রান্ত পথও হয় এবং তা যদি ধ্বংসের দিকেও নিয়ে যায় তাও কি অনুসরণ করতে হবে? কিন্তু সংসারে এমন আহাম্মকের সংখ্যা কম নয়, যারা তা-ই করে থাকে। এই আহাম্মকদের নির্বুদ্ধিতার প্রতি কোরাণে এইভাবে প্রকাশ করা হয়েছে অপরিমিত বিস্ময়।

আয়াৎ ২২ : 'যিনিই সর্বান্তঃকরণে আল্লায় আত্মসমর্পণ করেছেন এবং তিনি যদি হন সৎকর্ম্মশীল, নিশ্চয়ই তিনি ধারণ করেছেন সবচেয়ে বিশ্বস্ত হাত। সব ব্যাপারের সিদ্ধান্ত আল্লার উপরই নির্ভরশীল।'

আয়াৎ ২৬ : 'স্বর্গ মর্ত্যের সব কিছুরই মালিক আল্লাহ্ঃ বস্তুতঃ তিনিই আল্লাহ্ যিনি সমস্ত অভাবের উর্দ্ধে এবং যিনি সমস্ত প্রশংসার যোগ্য।'

আয়াৎ ২৭ : 'পৃথিবীর যাবতীয় বৃক্ষরাজি যদি হয় কলম এবং সমুদ্র যদি হয় কালি এবং আরও সপ্ত সমুদ্র যদি মৌজুদও রাখা হয়, তবুও আল্লার কথা অর্থাৎ মহিমাকীর্ত্তন শেষ হবে না। কারণ আল্লাহ্ সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী এবং তিনিই জ্ঞানের আকর।'

আয়াৎ ৩০ : 'আল্লা-ই একমাত্র সত্য, হক্, তাঁকে ছাড়া অন্য যা কিছুর উপাসনা করা হয় তা হচ্ছে মিথ্যা। আল্লাহ্ সর্বোচ্চ ও সব চেয়ে মহান।'

আয়াৎ ৩৩ : 'হে মানব জাতি! তোমার প্রভুর প্রতি তোমার কর্ত্তব্য পালন কর এবং ঐ দিনকে ভয় কর যেদিন পিতা পুত্রের ও পুত্র পিতার কিছুমাত্র উপকারে আস্‌বে না। আল্লার প্রতিশ্রুতিই

সত্য। বর্ত্তমান জীবন যেন তোমাকে প্রতারিত না করে এবং সব চেয়ে বড় প্রতারকও যেন আল্লার সম্বন্ধে তোমাকে প্রতারিত করতে না পারে।'

আয়াৎ ৩৪ : 'সময়ের জ্ঞান একমাত্র আল্লারই জানা অর্থাৎ কোন সময়ে কি ঘট্‌বে-না-ঘট্‌বে তা একমাত্র আল্লারই মালুম। তিনিই বর্ষণ করেন বৃষ্টিধারা, গর্ভে কি আছে অর্থাৎ ছেলে কি মেয়ে তা একমাত্র তাঁরই জ্ঞাত। কেউ-ই জানে না কাল প্রাতঃকালে সে কী উপার্জন করবে এবং কেউ-ই জানে না কোন্ দেশে ঘট্‌বে তার মৃত্যু। সত্যই, একমাত্র আল্লা-ই সব কিছুর পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী।'

৩২ঃ সুরা সজ্‌দা

আয়াৎ ৭ ঃ 'আল্লাহ্ সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর সৃষ্টি মাত্রই উত্তম। তিনি মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন কাদামাটি দিয়ে।'

কোরাণের এই মন্তব্যও অর্থপূর্ণ। মানব শরীরের মৌল-উপাদান সব সংগৃহীত হয় ভূমিজাত দ্রব্য থেকে—মানবদেহের যাবতীয় শক্তি-কণা ও কোষের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি যার উপর নির্ভরশীল। সব প্রাণেরই মূল মাটি। জীব-তত্ত্বের এই একটি সর্বজনস্বীকৃত বৈজ্ঞানিক সত্য, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পরীক্ষার বহু পূর্বেই কোরাণে পেয়েছে স্বীকৃতি।

আয়াৎ ৮ ঃ 'এবং তার অর্থাৎ মানুষের সন্তান-সন্ততিকে তৈরী করা হয়েছে না-পাক তরল পদার্থের সারাংশ থেকে।'

আয়াৎ ৯ ঃ 'কিন্তু তিনি অর্থাৎ আল্লাহ্ তাকে (ভ্রূণকে) দিয়েছেন সুসামঞ্জস্যময় অবয়ব। তারপর নিজের শক্তির (রূহ্) কিছুটা সঞ্চারিত করে দিয়েছেন তার মধ্যে।' এতক্ষণ যে ভ্রূণ ছিল শুধুমাত্র জৈব, এইবার তা পেল ঐশ্বরিক শক্তির বা রূহে এলাহির স্পর্শ। তাই মানুষ আশ্‌রাফুল মখ্‌লুকাৎ—সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম।

'এবং আল্লাহ্ তোমাকে দিয়েছেন শোন্‌বার শক্তি, দেখ্‌বার শক্তি এবং অনুভব করবার বোধশক্তি। তবুও আল্লার প্রতি তোমাদের কৃতজ্ঞতা নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর।'

আয়াৎ ১০ ঃ 'তারা অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা বলে—'কী! যখন আমরা মাটির নীচে থাক্‌ব গুপ্ত ও হয়ে যাবো লুপ্ত, তখন কি সত্যিই আমরা নীত বা পুনর্জীবিত হব নতুন সৃষ্টিতে! এমন কি তারা তাদের প্রভুর সঙ্গে পুনর্মিলনও অস্বীকার করে!'

আয়াৎ ১১ ঃ 'বল—"তোমার ভারপ্রাপ্ত মৃত্যু-দূত তোমার আত্মা বা রূহ্ নিয়ে যাবে। তারপর তোমাকে ফিরিয়ে আনা হবে তোমার

প্রভুর কাছে।” ইসলামের ইহাও একটি মূল বিশ্বাস, —প্রত্যেককে ফিরে যেতে হবে তার স্রষ্টার কাছে। এই বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত রয়েছে পাপপুণ্যের বিচার, শাস্তি ও পুরস্কারে বিশ্বাস। ইসলামের মতে পার্থিব আয়ু-সীমাতেই মানবজীবনের শেষ নয়—এই জীবন দীর্ঘতর পরলোক-জীবনেরই প্রস্তুতি-ক্ষেত্র মাত্র। নদী যেমন সাগরে মিলিত হয়েই পায় বিরাম ও পূর্ণতা, মানবাত্মাও সেই রকম সংসার যাত্রা শেষে সেই মহান আত্মা রুহুলকুদ্দুসের সঙ্গে মিলিত হয়েই লাভ করে একাধারে বিরাম ও সম্পূর্ণতা।

আয়াৎ ১৫ : 'যারা আমাদের নিদর্শনে (আয়াতে) বিশ্বাস করে এবং যারা ঐ সব আয়াতের আবৃত্তি শুনে ভূমিতে হয় প্রণত অর্থাৎ সেজ্‌দা করে বা নমাজ পড়ে এবং তাদের প্রভুর প্রশংসা কীর্ত্তন করে, আর অহঙ্কারে হয় না স্ফীত'—

আয়াৎ ১৬ : 'যখন তারা তাদের প্রভুকে আশা ও আকাঙ্খা-পূর্ণচিত্তে ডাকে, তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অর্থাৎ তারা নিজেরা ত্যাগ করে (উপাসনার জন্যে, আরামের) শয়ন শয্যা, আর তাদেরে যে জীবিকা আমরা দিয়েছি তার থেকে করে দান'—

আয়াৎ ১৭ : 'তাদের সৎকর্ম্মের পুরস্কার স্বরূপ কী তৃপ্তিকর দৃশ্যই না তাদের জন্যে মৌজুদ রাখা হয়েছে, তা কেউ-ই জানে না'—

আয়াৎ ১৮ : 'তা হলে যে বিশ্বাস করে, সে কি যে অবাধ্য ও অসৎ তার থেকে ভাল নয়? এই দুই জন কখনো সমান নয়।'

আয়াৎ ১৯ : 'যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম্ম করে, কর্ম্মফল স্বরূপ তারা পাবে অতিথিপরায়ণ আশ্রয়ের মতো উদ্যান।'

আয়াৎ ২০ : 'এবং যারা অবাধ্য ও অসৎ, অগ্নি হবে তাদের বাসস্থান।'***

আয়াৎ ২৬ : 'তাদের পূর্বে কত জাতিকেই আমরা করেছি ধ্বংস, যাদের বাসস্থানে তারা এখন করে যাতায়াত;—ইহা কি তাদের কোন পাঠই শিক্ষা দেয় না? বস্তুতঃ তাতেই রয়েছে নিদর্শন—তারা কি কর্ণপাত করবে না?'

যদিও এই আয়াতের লক্ষ্য এস্‌রাইল বংশ, কিন্তু এর অন্তর্নিহিত সত্য, সর্ব যুগের সব জাতির উপরই প্রয়োজ্য। পৃথিবীর কত প্রাচীন জাতিই ত ধ্বংস হয়েছে, তাদের রাজ্য ও সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ পৃথিবীর নানা জায়গায় রয়েছে ছড়িয়ে। যে-সব জাতি পাপ ও অধর্ম্মের পথে বাড়িয়েছে পা, তাদের ভাগ্যে ঘটেছে দ্রুত বিনাশ। এই সব দেখে প্রত্যেক জাতিরই সতর্ক হওয়া উচিত। কোরাণে, অন্যত্রও উল্লিখিত হয়েছে---"আল্লাহ্ কোন জাতির অবস্থার পরিবর্ত্তন করেন না, যতক্ষণ না সেই জাতি নিজের অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করে।" এই বাণীর দ্বারা নিষ্ক্রিয় নির্ভরতার মূলে করা হয়েছে কুঠারাঘাত। আর এর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত—অবস্থা মন্দের দিকে পরিবর্ত্তন করলে পরিণাম হবে মন্দ, আস্‌বে বিনাশ, ভালর দিকে পরিবর্ত্তন করলে পরিণামে পাওয়া যাবে সুফল ও সমৃদ্ধি।

আয়াৎ ২৭ : 'তারা (অবিশ্বাসীরা) কি দেখে না, আমরা ঊষর শুষ্কভূমিতে পাঠাই বৃষ্টিধারা, তার থেকে উৎপন্ন করি শস্য, যা থেকে পায় তারা ও তাদের পশুরা খাদ্য? তাদের কি দৃষ্টিশক্তি নেই?' অর্থাৎ যারা বিশ্ব প্রকৃতির রহস্য দেখে ও বোঝে, তারা আল্লাকে বিশ্বাস না করে কী করে থাক্‌তে পারে? এই জন্যে কোরাণে বারবারই বিশ্বপ্রকৃতির রহস্যের দিকে মানুষের দৃষ্টি করা হয়েছে আকর্ষণ।

৩৩ : সূরা আহ্‌যাব

আয়াৎ ১ : 'হে নবী। আল্লাকে ভয় কর, খল ও অবিশ্বাসীদের কথায় কর্ণপাত করো না। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ সমস্ত জ্ঞান ও বিবেচনা শক্তির অধিকারী।'

আয়াৎ ২ : 'তোমার প্রভুর কাছ থেকে অহি হিসাবে যা আসে তারই অনুসরণ কর: কারণ তুমি যা সব কর, আল্লার তা ভাল করেই জানা।'

আয়াৎ ৩ : 'আল্লার উপর বিশ্বাস ন্যস্ত কর। সব ব্যাপারের ব্যবস্থাপক হিসেবে আল্লা-ই যথেষ্ট।'

এই সব আয়াতের দ্বারা ইহাই প্রমাণ হচ্ছে যে, নবীগণও সর্বতোভাবে মানুষ ছিলেন, কোন রকম ঐশ্বরিক গুণসম্পন্ন তাঁরা নন্। এবং সাধারণ মানুষের দুর্বলতার শিকার তাঁরাও হতে পারেন। এই জন্যে তাঁদেরও সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে—অবিশ্বাসী ও খল ব্যক্তিদের সম্বন্ধে ও নির্দ্দেশ দেওয়া হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে আল্লার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর্‌তে।

আয়াৎ ৪ : 'আল্লাহ্‌ কোন মানুষেরই এক দেহে দুই মন দেননি।' অর্থাৎ কোন মানুষকেই মনে একই সঙ্গে বিশ্বাস ও অবিশ্বাস, সত্য ও মিথ্যা, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, ন্যায় ও অন্যায় পোষণ করার অধিকার দেওয়া হয়নি। এক মুনাফেক ছাড়া এমন পরস্পর বিরোধী মত পোষণ বা কাজ, কারো দ্বারাই সম্ভব নয়। কোরাণে মুনাফেককে করা হ'য়েছে কঠোরতম নিন্দা। এই আয়াতে আরো বলা হচ্ছে—'মৌখিক-সম্বন্ধ কখনো পেতে পারে না রক্ত সম্পর্কের মর্য্যাদা। দাম্পত্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার দুরভিসন্ধি নিয়ে যদি কেউ স্ত্রীকে সম্বোধন করে মা, সে কখনো মা হবে না, পোষ্যপুত্রও হবে না পুত্র। এই সব

শুধু তোমাদের মৌখিক জবান। কিন্তু আল্লা-ই তোমার কাছে প্রকাশ করেন সত্য এবং তোমাকে নির্দ্দেশ করেন সত্যপথ।'

ভাবালুতা ও খেয়ালিপনাকে ইসলাম কখনো আমল দেয়নি। মুহূর্ত্তের ভাবাবেগে অথবা কু-মতলবে যে-সব মৌখিক সম্বন্ধ পাতানো হয়, তা যদি পায় রক্ত সম্পর্কের বা আইনের মর্য্যাদা তা হ'লে ঘরে ঘরে কত অনর্থ-ই না ঘটত। ইসলাম বাস্তব মানুষের ধর্ম্ম, তাই অস্বাভাবিক ভাবালুতা ইসলামে পায়নি কোন রকম প্রশ্রয়। ইসলামের এক বড় লক্ষ্য সুষ্ঠু সামাজিক জীবন, সেই সামাজিক জীবন যাতে সুস্থ স্বাভাবিক ও সুশৃঙ্খল হয়, ইসলামের সব ব্যবস্থা ও বিধি-নিষেধের মূলে তাই জুগিয়েছে প্রেরণা।

আয়াৎ ১৬ : '(যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যারা পলায়ন করতে চায় তাদেরে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে) বল, "যদি মৃত্যু বা হত্যার হাত থেকে পলায়ন করতে চাও, পলায়নে কিছুমাত্র উপকার হবে না; পলায়ন যদি তুমি করও, বিশ্রাম করতে পারবে অতি স্বল্প-কাল।" কারণ মৃত্যুর হাত থেকে কেউ-ই পাবে না রেহাই, গৃহের নিরাপদ ও নিভৃত স্থানেও মৃত্যু দেবে হানা।

আয়াৎ ১৭ : 'বল: "আলাহ্ যদি তোমাকে শাস্তি দিতে বা রহমত করতে ইচ্ছা করেন কেউ-ই কি তোমাকে আড়াল করে রাখতে পারবে? তারা (যারা আড়াল করে রাখতে চায়) নিজের জন্যও পাবে না আল্লাকে ছাড়া কোন রক্ষাকর্তা বা সাহায্যকারী।"

আয়াৎ ২৮ : 'হে নবী, তোমার স্ত্রীগণকে বল—"যদি তুমি এই পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্য চাও, এসো, তোমার সুখ ভোগের প্রচুর ব্যবস্থা আমি করব এবং অতি শোভন ভাবেই আমি তোমাকে দেব মুক্তি—!'

আয়াৎ ২৯ : কিন্তু তুমি যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রছুল ও পরলোকের বাসস্থান চাও: সত্যই তোমাদের মধ্যে যে সৎকর্ম্মশীলা তাঁর জন্যে আল্লাহ্ মহৎ পুরস্কারের ব্যবস্থা রেখেছেন।'

মানুষে মানুষে এই কঠোর নিরপেক্ষতা ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট। বিচারের বেলায় পদ, গুণ, ধন ও সামাজিক মর্য্যাদাকে ইসলামে কোন খাতির করা হয় না। বরং যাঁরা দায়িত্ব ও মর্য্যাদাজনক পদে অধিষ্ঠিত তাদের সামান্য ভুলেও ক্ষতি হতে পারে ব্যাপক, তাই তাদের বেলায় অধিকতর সতর্কতার প্রয়োজন। তারা অপরাধ করলে শাস্তির ব্যবস্থাও হওয়া উচিত কঠোরতর।

আয়াৎ ৩১ : 'কিন্তু তোমাদের মধ্যে যদি কেউ আল্লাহ্ ও রছুলের সেবায় হও ব্রতী ও কর সৎকর্ম্ম, তাকে আমরা দেব দ্বিগুণ পুরস্কার এবং তার জন্যে আমরা ব্যবস্থা করেছি প্রচুর জীবিকার।'

উচচ-পদ-মর্য্যাদায় যারা অধিষ্ঠিত বিপথগামী হওয়ার প্রলোভনও তাদের বেশী, সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া তাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত কঠিন। এই কঠিনের সাধনায় যারা ব্রতী হবে তাদের পুরস্কারও যথেষ্ট হওয়া বিধেয়।

আয়াৎ ৩৫ : 'মুসলিম নর-নারীর জন্য, বিশ্বাসী নর-নারীর জন্য, সত্যশীল নর-নারীর জন্য, অধ্যবসায়ী ও ধৈর্য্যশীল নর-নারীর জন্য, বিনয়ী নর-নারীর জন্য, দানশীল নর-নারীর জন্য, যে-সব নরনারী রোজা রাখে (অর্থাৎ সংযত জীবন যাপন করে) তাদের জন্য যে সব নর-নারী নিজেদের চরিত্র ও সতীত্ব রক্ষা করে তাদের জন্য, যে-সব নর-নারী আল্লার প্রশংসা কীর্ত্তন করে বেশী তাদের জন্য, আল্লাহ্ ব্যবস্থা করেছেন ক্ষমা ও মহৎ পুরস্কারের।'

আয়াৎ ৪০ : 'এই আয়াতে হজরত মোহাম্মদ যে তাঁর উম্মৎগণের কারো পিতা নহেন তা জানানো হয়েছে, আর বলা হয়েছে তিনি আল্লার রছুল এবং রছুলদের মধ্যে তিনিই শেষ রছুল।' কোন কোন দেশে দেখা যায়, ভাবাবেগের বশবর্ত্তী হ'য়ে কোন কোন রাষ্ট্রনায়ক বা নেতাকে হয়ত অভিহিত করা হয় জাতির পিতা বা Father of the nation বলে। ইস্‌লামে এই নীতি সমর্থিত হয়নি। পিতামাতার

সঙ্গে সন্তানের সম্বন্ধ একাধারে অতি পবিত্র ও দায়িত্বপূর্ণ, অন্যের সঙ্গে সেই সম্বন্ধের আরোপ করা হলে, তাকে করা হয় লঘু ও সম্বন্ধের হয় অপব্যবহার।

আয়াৎ ৪১ : 'হে বিশ্বাসীগণ। আল্লার প্রশংসা কীর্ত্তন কর এবং তা কর সব সময়। অর্থাৎ আল্লার গুণ-কীর্ত্তনের দ্বারা নিজে আল্লার গুণে গুণান্বিত হওয়ার চেষ্টা করো অবিরাম।' তোতাপাখী-জাতীয় নাম কীর্ত্তন যে কতখানি পণ্ডশ্রম তা ত সহজেই অনুমেয়।

আয়াৎ ৪২ : 'এবং আল্লার গৌরব কীর্ত্তন কর সকালে ও সন্ধ্যায়।' ঐ দুই সময় যে উপাসনার পক্ষে সব চেয়ে উপযুক্ত সময় তাও সর্ব্বজন-স্বীকৃত।

আয়াৎ ৪৫ : 'হে নবী! সত্যই আমরা তোমাকে একজন সাক্ষী, সুসংবাদের বাহক ও সতর্ককারী হিসেবেই পাঠিয়েছি;—

আয়াৎ ৪৬ : 'তুমি লোককে আমন্ত্রণ জানাবে আল্লার দিকে—আল্লার অনুমতি নিয়েঃ (তুমি) যেন একটি প্রদীপ, যার থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে আলো।'

আয়াৎ ৪৭ : 'বিশ্বাসীগণকে এই সুসংবাদ দাও যে তারা আল্লার কাছ থেকে পাবে মহৎ প্রাচুর্য্য।'

রছুল সম্বন্ধে ও রছুলের ভূমিকা সম্বন্ধে এই তিন আয়াতে যা বলা হয়েছে, তাই রছুলের সত্যিকার পরিচয়। ইসলামের রছুল অতিমানব নন, অলৌকিকতার ছায়া তাঁর জীবন ও বাণীকে কোথাও করে তোলেনি রহস্যাবৃত ও মায়াময়। তিনি আলোকস্তম্ভ—যে আলোকস্তম্ভ দেখে পথিক গন্তব্য পথে অগ্রসর হয়, দিশেহারা নাবিক খুঁজে পায় পথ।

আয়াৎ ৫৮ : 'যারা বিশ্বাসী নর-নারীকে অন্যায়ভাবে বিরক্ত অর্থাৎ মিথ্যা অপবাদ দেয়, তারা নিজেরা বহন করবে এক সঙ্গে পাপ ও অভিশাপ দুই-ই।'

আয়াৎ ৫৯ : 'হে নবী! তোমার স্ত্রী কন্যা ও বিশ্বাসী নারীগণকে বল, তারা যখন ঘরের বাইর হয়, তাদের অঙ্গ যেন বহির্ব্বাসে

থাকে ঢাকা: ইহা একাধারে সুবিধাজনক ও বে-ইজ্জতি নিবারক। আল্লাহ্ চির-ক্ষমাশীল ও দয়ালু।'

ইসলাম প্রয়োজনীয় অঙ্গাবরণের নির্দ্দেশ দিয়েছে, কিন্তু অবরোধের সমর্থন করে নি, বহির্জ্জগতের কর্ম্মজীবন মেয়েদের জন্য ইসলাম নিষেধ করেনি, তবে নারীদেহের আব্রু রক্ষার নির্দ্দেশ দিয়েছে অসন্দিগ্ধ ভাষায়।

আয়াৎ ৭০ : 'হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাকে ভয় কর এবং এমন কথা বল যা সত্য,—যার নির্দ্দেশ সত্যাভিমুখী।'

আয়াৎ ৭১ : 'যেন আল্লাহ্ তোমার স্বভাবকে করতে পারেন পূর্ণ ও খাঁটি এবং ক্ষমা করতে পারেন তোমার পাপ। যিনি আল্লাহ্ ও তাঁর রছুলের প্রতি অনুগত তিনি আয়ত্ত করেছেন উচ্চতম সফলতা।'

আয়াৎ ৭২ : ৭৩ : 'আমরা স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পর্ব্বতরাজিকে বিশ্বাস ও দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আহ্বান করেছিলাম, কিন্তু তারা ভয়ে সেই দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হয় নি। কিন্তু মানুষ গ্রহণ করেছে সেই দায়িত্ব; কিন্তু নিশ্চয়ই মানুষ (ঐ বিশ্বাস ও দায়িত্ব পালনে) পরিচয় দিয়েছে অন্যায় ও নির্ব্বুদ্ধিতার। ফলে আল্লাকে দিতে হয়েছে শাস্তি খল নর-নারীকে, অবিশ্বাসী নর-নারীকে; কিন্তু আল্লাহ্ করুণার হস্ত প্রসারিত করেছেন বিশ্বাসী অর্থাৎ মু'মেন নর-নারীর দিকে, কারণ আল্লাহ্ চির-ক্ষমাশীল ও অত্যন্ত দয়ালু।'

এই দুটি আয়াৎ অত্যন্ত চমৎকার ও গুরুত্বপূর্ণ। স্বল্পকথায় এ'তে মানুষের এক পূর্ণ-পরিচয় ফুটে উঠেছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অন্য কোন জীব যে দায়িত্ব ও বিশ্বাস গ্রহণ করতে রাজি হয়নি, তা গ্রহণ করেছে দুঃসাহসী মানুষ। তাই ফেরেস্তারাও একদিন হয়েছিল মানুষের প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত। এই বিশ্বাস ও দায়িত্ব কি? আল্লার গুণে গুণান্বিত হওয়া। তাই তার অন্তরে ফুঁকে দেওয়া হয়েছে ঐশ্বরিক শক্তির কণা বা রূহ্। তাই সে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম। তাকে দেওয়া হয়েছে বুদ্ধি, বিবেচনাশক্তি, ভালমন্দ বিচারের ক্ষমতা। তবুও মানুষ করে ভুল, হয় নির্ব্বুদ্ধিতার শিকার। ভুল করবার অধিকার না থাকলে সে হ'ত

ফেরেস্তা, হ'ত না ফেরেস্তার চেয়ে মহত্তর, তার সেজ্‌দার অর্থাৎ ভক্তির অধিকারী। মানুষকে দেওয়া হয়েছে ইচ্ছাশক্তি, এই ইচ্ছাশক্তি ও নির্ব্বাচনের অধিকার তাকে করে তুলেছে সৃষ্টির সেরা। তাই শাস্তি ও পুরস্কার উভয়েরই মালিক বা অধিকারী হয়েছে মানুষ। ইহাতেই মানুষের গৌরব, এবং আল্লার গুণে গুণাণ্বিত অবস্থারই নাম মনুষ্যত্ব। মানুষের আদর্শ এলাহিয়েৎ নয়, মানুষের আদর্শ হচ্ছে ইনসানিয়েৎ—যে ইন্‌সানিয়েৎ সুখে দুঃখে পাপে পুণ্যে সফলতা নিষ্ফলতায়, শাস্তি ও পুরস্কারে, হাসি ও অশ্রুতে পায় পূর্ণতা। এইভাবে দুঃখের অগ্নিদহনে মানব জীবন হয়ে ওঠে খাঁটি সোনা।

৩৪ঃ সূরা স'বা

আয়াৎ ঃ 'ভূমিতে যা কিছু প্রবেশ করে ও ভূমি থেকে যা কিছু নির্গত হয়, আকাশ থেকে যা কিছু নেমে আসে ও যা কিছু আকাশের দিকে হয় উত্থিত, সবই আল্লার জানা আছে। তিনি পরম দয়ালু ও চিরক্ষমাশীল।'

আয়াৎ ৬ ঃ 'তোমার প্রভুর কাছ থেকে তোমার (নবীর) প্রতি যে অহি অবতীর্ণ হয়েছে, যারা জ্ঞানী, তারা দেখে উহাই সত্য, এবং উহাই নির্দ্দেশ দিয়ে থাকে যিনি গৌরবময় ও যিনি সব প্রশংসার যোগ্য তাঁর পথের।'

আয়াৎ ২২ ঃ 'আল্লাকে ছাড়া তোমাদের (অবিশ্বাসীদের) খেয়াল খুশী মতো যে-কোন দেব দেবীকে তোমরা আহ্বাণ করতে পারো ঃ আকাশমণ্ডল ও মর্ত্ত্যভূমিতে তাদের কিছুমাত্র শক্তি নেই, এমন কি অণুর শক্তি থেকেও তারা বঞ্চিত এবং তাতে অর্থাৎ আকাশ ও ধরণীতে তাদের কোন অংশ নেই, তাদের মধ্যে কেউ-ই আল্লার সাহায্যকারীও নয়।'

আয়াৎ ২৮ ঃ 'আমরা তোমাকে (নবীকে) বিশ্বমানবের কাছে আমাদের দূত বা বার্ত্তাবাহক হিসেবেই পাঠিয়েছিঃ মানব জাতিকে সুসংবাদ দাও ও পাপের বিরুদ্ধে কর সতর্ক। অধিকাংশ মানুষ বুঝতে পারে না।'

ইসলামের নবী কোন গোষ্ঠী বা দেশের প্রতি প্রেরিত হননি, তিনি প্রেরিত হয়েছেন সমগ্র মানব-জাতির প্রতি, তাই তিনি বিশ্বনবী ও তাঁর প্রচারিত ধর্ম্ম বিশ্ব-ধর্ম্ম।

আয়াৎ ২৯ ঃ 'অবিশ্বাসীরা নবীকে জিজ্ঞাসা করে ঃ "তোমার কথা যদি সত্য হয়, তবে এইসব প্রতিশ্রুতি কবে কার্য্যে পরিণত হবে?"

আয়াৎ ৩৩ : 'বলঃ "তোমাদের জন্য দিন নির্দ্দিষ্ট করা আছে, যা তোমরা এক ঘণ্টা পিছিয়ে নিতেও পারবে না ও পারবে না এক ঘণ্টা এগিয়ে নিয়ে আস্‌তেও।"

আয়াৎ ৩৪ : 'যখনি আমরা কোন জাতির প্রতি আমাদের রছুল পাঠিয়েছি, সেই জাতির ধনীরা বলেছেঃ "যে বার্ত্তা দিয়ে তোমাকে পাঠানো হয়েছে তাতে আমরা বিশ্বাস করি না।"

আয়াৎ ৩৫ : 'তারা আরো বলেঃ "আমাদের বহু ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততি আছে। এবং আমাদের কোন রকম শাস্তি দেওয়াই সম্ভব হবে না।"

আয়াৎ ৩৬ : 'বল "সত্যই আমার প্রভু ইচ্ছা মতো কারো প্রতি করেন জীবিকা বৰ্দ্ধিত আবার কারো প্রতি করেন সঙ্কোচিত। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা বোঝে না।"

মানব প্রকৃতির সাধারণ প্রবণতার প্রতি-ই উপরের কয়েকটি আয়াতে করা হয়েছে ইঙ্গিত। সাধারণত দেখা যায় ধনী লোকেরাই বেশী মাত্রায় হয়ে থাকে একগুঁয়ে ও অহঙ্কারী, নিজেদের ধন জনের উপর তারাই নির্ভর করে সবচেয়ে বেশী, কোন রকম পরিবর্ত্তনের তারা বিরোধী এবং পাপের পথে তাদের গতি হয় সহজ। ইসলাম জগতের সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে নিয়ে এসেছে এক বিরাট ওলট-পালট, পুঁজিবাদীদের একাধিপত্য ইসলামে পায়নি কোন আমল। কাজেই সূচনায় ধনীরা যদি ইসলামকে করতে চায় অস্বীকার, সেটাও খুব অপ্রত্যাশিত নয়। ডুবন্ত লোক যেমন তৃণখণ্ডকে ধারণ করেও বাঁচতে চায় এরাও তেম্‌নি ইসলামের বিরাট শক্তি প্রবাহকে রোধ করতে চায় নিজেদের ধন-জন দিয়ে। কিন্তু এই সব নির্ব্বোধ ধনীরা বুঝতে পারে না যে, আল্লাহ্ যেমন প্রচুর দিতে পারেন আবার নিয়েও নিতে পারেন মুহূর্ত্তে। সমস্ত শক্তি ও ধন-ঐশ্বর্য্যের মালিক ত আল্লাহ্। কিন্তু অধিকাংশ লোক এই অমোঘ সত্য বুঝেও বুঝতে চায় না।

আয়াৎ ৩৭ : 'তোমাদের ধন-সম্পদ বা সন্তান সন্ততি পরিণামে তোমাদিগকে আমাদের অধিকতর সান্নিধ্যে নিয়ে আস্‌বে না; কিন্তু

যারা বিশ্বাস করে ও সৎকার্য্য করে, তাদের কার্য্যের জন্য তাদের প্রতি বহুগুণিত করা হবে পুরস্কার এবং তারা বাস করবে সুনিশ্চিতভাবে নিরাপদ আবাস গৃহে।'

আয়াৎ ৩৯ : 'বল হে নবী, "সত্যই আমার প্রভু তাঁর বান্দাদের যার ইচ্ছা জীবিকা বৃদ্ধি করেন, যার ইচ্ছা সঙ্কোচ করেন। এবং তোমরা যা কিছু তাঁর জন্য খরচ কর আল্লাহ্ তা পূরণ করে দেন। কারণ তিনি হচ্ছেন জীবিকা-দাতাদের মধ্যে সর্ব্বোত্তম।'

আয়াৎ ৪৯ : 'বল হে নবী, "সত্যের আবির্ভাব হয়েছে,---মিথ্যা পারে না নতুন কিছু সৃষ্টি করতে, পারে না কিছু পুনরুদ্ধার করতেও।'

সত্য ও মিথ্যার যে তারতম্য তারও এক চমৎকার ইঙ্গিত এখানে করা হয়েছে। সব রকম সৃষ্টির মূলেই রয়েছে সত্যের প্রেরণা ও তাগিদ। মিথ্যা ত আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র; আত্মপ্রবঞ্চনা কখনো হতে পারে না নব সৃষ্টির কারণ। তাই সত্য মানুষের জীবনে নিয়ে আসে সাফল্য ও মিথ্যা নিয়ে আসে ব্যর্থতা। সত্যাশ্রয় ছাড়া কোন সার্থক সৃষ্টিই সম্ভব নয়।

আয়াৎ ৫০ : 'বল, "যদি আমি (নবী) বিপথগামী হই, তা হ'লে আমি বিচরণ করি নিজের আত্মারই ক্ষতির পথে, কিন্তু আমি যদি সত্য পথের নির্দ্দেশ পেয়ে থাকি তা আমি পেয়েছি আল্লার প্রেরণা বা অহি থেকেই; তিনি সব কিছু শোনেন এবং তিনি আমাদের চির নিকটবর্ত্তী।'

৩৫ : সূরা ফাতির্

আয়াৎ ২ : 'আল্লাহ্ নিজ রহমত থেকে যা কিছুই মানব জাতিকে করেন প্রদান, এমন কেউ নেই যে, তা রুখতে পারে অর্থাৎ তার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করতে পারে; কিন্তু তিনি নিজে যা করেন প্রতিরোধ অর্থাৎ যা থেকে মানুষকে করেন বঞ্চিত তা কেউ-ই দিতে সক্ষম নয়। তিনি ক্ষমতার মহিমায় অধিষ্ঠিত এবং তিনিই পূর্ণ জ্ঞানী।'

আয়াৎ ৩ : 'হে মানব! আল্লার নেয়ামত স্মরণ কর। আল্লাহ্ ছাড়া এমন স্রষ্টা কি আর কেউ আছে যে, আকাশ ও মাটি থেকে তোমাকে দেবে জীবিকা? আল্লাহ্ ছাড়া কোন দেবতা নেই, তবুও তুমি কি করে সত্য থেকে হও প্রতারিত ও বিপথে হও পরিচালিত?"

আয়াৎ ৫ : 'হে মানব! নিশ্চয়ই আল্লার প্রতিশ্রুতি সত্য। বর্ত্তমান জীবন তোমাকে যেন প্রতারিত না করে এবং প্রধানতম প্রতারকও যেন আল্লার সম্বন্ধে তোমাকে করতে না পারে প্রবঞ্চিত।'

আয়াৎ ৬ : 'সত্যই শয়তান তোমার শত্রু, কাজেই তার সঙ্গে শত্রু হিসেবেই কর ব্যবহার। সে তার অনুগতদের জ্বলন্ত অগ্নির সাথী হওয়ার জন্যেই করে আহ্বান।'

আয়াৎ ৭ : 'যারা আল্লাকে অস্বীকার করে, তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি। কিন্তু যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম্ম করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহৎ পুরস্কার।'

আয়াৎ ৮ : 'যে-লোক নিজ বদ্-স্বভাবের প্রলোভনে পড়ে মন্দকেও মনে করে ভাল, সে কি যে সত্য পথে হয়েছে পরিচালিত, তার সমকক্ষ? আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বিপথে যেতে দেন এবং যাকে ইচ্ছা সত্য পথে করেন পরিচালিত। সুতরাং তোমার আত্মা যেন

তাদের (অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের) পশ্চাদ্‌গামী হওয়ার জন্যে দীর্ঘশ্বাস না ছাড়ে। কারণ তাদের কার্য্যকলাপ আল্লার ভাল করেই জানা আছে।'

মন্দকে মন্দ জেনে করা আর মন্দকে ভাল জেনে করার রয়েছে যথেষ্ট তফাৎ। মন্দকে মন্দ বলে জান্‌লে মন্দ থেকে উদ্ধারের বা সংশোধনের সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু মন্দকে যে ভাল বলে গ্রহণ করে তার আর সংশোধনের উপায়ই থাকে না।

আয়াৎ ৯ঃ 'আল্লা-ই প্রেরণ করেন বায়ু, যাতে তারা তুলে নিয়ে যেতে পারে মেঘ এবং সেই সব মেঘগুলিকে আমরা পরিচালিত করি মৃত-ভূমির দিকে, তার দ্বারা মৃত-ভূমিকে করি পুনর্জীবিতঃ এই ভাবেই হবে পুনর্জীবন বা পুনরুত্থান।'

বায়ু তাড়িত হয়েই মেঘ সকল চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং মেঘ থেকে যে বর্ষাধারা নেমে আসে তার ফলে শুষ্ক ও মৃত-ধরণী হয়ে উঠে সজীব। এমনিভাবে সত্য ও ধর্ম্মের স্পর্শে মৃত-জাতি লাভ করে নব জীবন। ইতিহাসে আরব জাতি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মৃত-ধরণীকে আল্লাহ্ যে ভাবে করেন সজীব, মৃত মানুষকেও শেষ বিচারের দিন সেই ভাবেই করবেন সজীব ও দেবেন পুনর্জীবন।

আয়াৎ ১০ঃ 'যদি কেউ ইজ্জত পেতে চায়ঃ সমস্ত ইজ্জতের মালিক কিন্তু আল্লাহ্। সমস্ত পাক কালাম তাঁরই দিকে হয় উত্থিত। তিনি সমস্ত সৎ-কার্য্যকে দেন মাহাত্ম্য! কুকার্য্যের ষড়যন্ত্র যারা করে, তাদের জন্য বরাদ্দ কঠোর শাস্তি। এই রকম ষড়যন্ত্র সবই ব্যর্থ হবে।'

অর্থাৎ যে ইজ্জত পেতে চায় তাকে স্মরণ নিতে হবে আল্লার। একমাত্র আল্লা-ই মানুষকে দিতে পারেন ইজ্জত বা করতে পারেন বেইজ্জত।

আয়াৎ ১১ঃ 'আল্লাহ্ মাটি দিয়েই তোমাকে করেছেন সৃষ্টি; তারপর এক ফোঁটা শুক্র থেকেই দিয়েছেন অবয়ব। তারপর তোমাদের করেছেন দম্পতি-যুগল। আল্লার অজ্ঞাতে কোন নারী সন্তান ধারণ বা প্রসব করে না। আল্লার নির্দ্দেশ ছাড়া কোন মানুষের আয়ুর দীর্ঘতা হ্রস্বতা সাধিত হয় না। এই সমস্তই আল্লার পক্ষে সহজ।'

আয়াৎ ১৩ : 'তিনি রাত্রিকে দিনের মধ্যে ও দিনকে রাত্রির মধ্যে করেন বিলীন এবং চন্দ্র সূর্য্যকে করেছেন তাঁর নিয়মাধীন;— প্রত্যেকে নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট পথে করে আবর্ত্তন। এই রকমই আল্লাহ্, তোমার প্রভু, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের তিনিই মালিক। আল্লাকে ছাড়া যাকেই (অর্থাৎ যে কোন দেব দেবীকে) তোমরা ডাক না কেন তার কিছু মাত্র শক্তি নেই।'

আয়াৎ ১৪ : 'যদিও তোমরা তাদের ডাক, তারা কিন্তু শোনে না, শুন্‌লে তারা দিতে পারে না জবাব। শেষ বিচারের দিন তারা করবে তোমাদের "অংশীদারিত্ব" অস্বীকার। যিনি সর্ব্বজ্ঞ তিনি ছাড়া হে মানব, কে তোমাকে সত্যের খবর দিতে পারে?'

আয়াৎ ১৫ : 'হে মানব! তোমারই প্রয়োজন আল্লার, কিন্তু আল্লাহ্ সমস্ত অভাব থেকেই মুক্ত। তিনি সমস্ত প্রশংসার যোগ্য।'

আয়াৎ ১৮ : 'একজন আর একজনের বোঝা বহন করতে পারে না। যার বোঝা খুব ভারী সে অন্যকে তার বোঝা বহনের জন্য ডাকতে পারে। কিন্তু তার ক্ষুদ্রতম অংশও অন্যে বহন করতে পারে না, এমন কি নিকটতম আত্মীয় হলেও পারবে না। তাদের অদৃশ্য প্রভুকে ভয় করার ও নিয়মিত উপাসনার সুপরামর্শ তুমি দিতে পার, আর কিছুই করতে পার না। যদি কেউ নিজেকে পাক ও নির্ম্মল করে, সে তা করে নিজের আত্মার উপকারের জন্যই। সকলের গন্তব্যস্থল কিন্তু আল্লা-ই।'

কারো পাপের বোঝা বা আধ্যাত্মিক দায়িত্ব অন্যে গ্রহণ করতে পারে না। সাংসারিক দায়িত্বে বাঁটোয়ারা বা পারস্পরিক সাহায্য চল্‌তে পারে। কিন্তু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে পিতার দায়িত্ব পিতার, সন্তানের দায়িত্ব সন্তানের। শুধু সুপরামর্শ একে অপরকে দিতে পারে।

আয়াৎ ১৯ : 'যে অন্ধ আর যে দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন, তারা কখনো এক নয়।'

আয়াৎ ২০ : 'আর এক নয় গভীর অন্ধকার ও আলো।'

আয়াৎ ২১ : 'এবং সুশীতল ছায়া ও মনোরম সূর্য্যোত্তাপও এক নয়।'

আয়াৎ ২২ : 'যারা জীবিত ও যারা মৃত তারাও এক নয়। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা শোনাতে পারেন; কিন্তু যারা কবরে শায়িত তাদেরে তুমি (নবীকে বলা হচ্ছে) কিছুই শোনাতে পার না।'

আয়াৎ ২৩ : 'তুমি (হে নবী)! সতর্ককারী ছাড়া আর কিছু নও।'

আয়াৎ ২৪ : 'বস্তুতঃ তোমাকে আমরা পাঠিয়েছি সত্যের সঙ্গে অর্থাৎ সত্যবাণীর প্রচারক করেঃ সুসংবাদ-বাহক ও সতর্ককারী হিসেবেঃ এমন কোন জাতি নেই যাদের কাছে পাঠানো হয়নি তাদের নিজেদের থেকে কোন সতর্ককারী।'

এই আয়াৎ থেকে এই কথাও প্রমাণ হচ্ছে যে প্রত্যেক জাতির কাছেই পাঠান হয়েছে নবী, যারা জাতিকে দেবে সত্যের নির্দ্দেশ ও দেখাবে ধর্ম্মের পথ। নবী স্বজাতির ভিতর থেকে না হলে, ভাষার ব্যবধান, আচার ব্যবহার ও প্রচলিত সংস্কার ও কুসংস্কারের সঙ্গে অপরিচয়, সত্য প্রচারের পথে হয়ে দাঁড়াত বিঘ্ন ও প্রবল অন্তরায়।

আয়াৎ ২৯ : 'আল্লার গ্রন্থ যাঁরা অধ্যয়ন করেন ও নিয়মিত উপাসনা করেন এবং আমরা যা দিয়েছি তার থেকে গোপনে বা প্রকাশ্যে করেন দান, তাঁরা এমন ব্যবসার আশা করতে পারেন যে ব্যবসার কখনো হবে না পতন।'

আয়াৎ ৩০ : 'কারণ তিনি অর্থাৎ আল্লাহ্ দেবেন তার প্রতিদান বরং তাঁর প্রাচুর্য্যের ভাণ্ডার থেকে আরো বেশী তিনি দেবেন, কারণ তিনি চিরক্ষমাশীল ও গুণ-গ্রহণে বা সৎকার্য্যের মর্য্যাদা দানে চিরতৎপর।'

আয়াৎ ৪৫ : 'মানুষকে তার প্রাপ্য হিসেবে যদি আল্লাহ্ শাস্তি দিতেন তাহলে ভূ-পৃষ্ঠে একটি প্রাণীও অবশিষ্ট থাকত না। কিন্তু নির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত আল্লাহ্ তাদেরে দিয়ে থাকেন অবকাশঃ যখন

তাদের নির্দ্দিষ্টকাল হয় গত (তখন তাদের দেওয়া হয় বরাদ্দ শাস্তি বা ক্ষমা)। বস্তুতঃ আল্লার সব বান্দাই তাঁর দৃষ্টিগোচর।'

জীবনে মানুষ কত পাপই ত করে থাকে, পদে পদে ঘটে তার ত্রুটি-বিচ্যুতি। মুনিরও হয় মতিভ্রম, সাধুরও হয় পদস্খলন। কিন্তু আল্লাহ্ যতখানি দণ্ডদাতা তার বেশী তিনি ক্ষমাশীল, দয়া ও করুণার আধার। তাই মানুষের প্রতি তাঁর ক্ষমা ও করুণা হয় অজস্রধারে বর্ষিত এবং দণ্ডদাতা আল্লার চেয়ে মানুষের জীবনে ক্ষমা ও দয়ার অবতার আল্লার-ই আবির্ভাব ঘটে বেশী ও বারে বারে।

৩৬ : সুরা এয়াছিন্

আয়াৎ ২ : 'কোরাণ জ্ঞানে পরিপূর্ণ।'—

আয়াৎ ৩ : 'তুমি (হজরত মোহাম্মদ) সত্যই একজন নবী'।

আয়াৎ ৫ : 'ইহা (অর্থাৎ কোরাণ) মহা দয়ালু ও মহা-শক্তি-ধর আল্লার কাছ্ থেকেই অবতীর্ণ।'

আয়াৎ ৩৩ : 'মৃত ধরণী তাদের (অবিশ্বাসীদের) জন্য একটি নিদর্শনঃ আমরা তাতে দিই প্রাণ ও তার থেকে উৎপন্ন করি শস্য, যা তোমরা খেয়ে থাক।'

আয়াৎ ৩৪ : 'এবং তাতে আমরা খেজুর ও আঙ্গুর লতার ফলোদ্যান উৎপন্ন করি এবং সেখান থেকে প্রবাহিত করি ঝর্ণাধারা।'

আয়াৎ ৩৫ : 'তারা যেন এখান থেকে করতে পারে ফলভোগঃ এই সব তাদের স্বহস্ত নির্ম্মিত্ নয়ঃ তবুও তারা কি ধন্যবাদ দেবে না ?'

সত্যই সব ব্যাপারেই রয়েছে আল্লার অদৃশ্য শক্তির সহায়তা। অনুকূল অবস্থা সত্ত্বেও অনেক সময় শস্য হয় না, অতি-বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টিতে হয় ধ্বংস, এই কে না-দেখেছে ? চেষ্টা মানুষ নিশ্চয়ই করবে, কিন্তু সেই চেষ্টার সাফল্যের জন্যে প্রয়োজন আল্লার রহমত ও সাহায্য। বিস্ময়ের বিষয় তবুও মানুষ থেকে যায় অবিশ্বাসী ও অকৃতজ্ঞ।

আয়াৎ ৫১ : '(শেষ বিচারের দিন) শিঙ্গা বাজানো হবে, তখন দেখ্‌বে, সমাধি থেকে উঠে সব মানুষ ছুটে যাবে তাদের প্রভুর দিকে!'

আয়াৎ ৫২ : 'তারা বল্‌বে "সর্ব্বনাশ, আমাদের বিশ্রাম-শয়ন থেকে কে আমাদের জাগালো ?" দৈববাণী বল্‌বে—"মহাদয়ালু আল্লাহ্ যা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ইহা তা-ই এবং নবীগণের কথা সত্য।"

আয়াৎ ৫৩ : 'এক দমকা হাওয়ার বেশী নয়, দেখ্‌বে, তারা সবাই আমাদের সাম্‌নে আনীত হয়েছে।'

আয়াৎ ৫৪ : 'সেদিন কারো প্রতি এতটুকু অবিচার করা হবে না, শুধু দেওয়া হবে তোমাদের অতীত কাজের প্রতিদান।'

আয়াৎ ৫৮ : '(শেষ বিচারের দিন) পরম দয়ালু আল্লার কাছ থেকে বিশ্বাসীদের প্রতি উচচারিত হবে এই একটি মাত্র শব্দ—"সালাম---শান্তি।"

ভক্ত-জীবনের ইহাই ত চরম কাম্য, সেই কামনা সেইদিন হবে পূর্ণ। নমাজ, রোজা, জপতপ, উপাসনা, এবাদত সবের লক্ষ্য ত জীবন শেষে শান্তিময় বিরাম। তাই শান্তিবাণী দিয়েই স্বয়ং আল্লাহ্‌ বিশ্বাসী বান্দাকে জানাচ্ছেন অভ্যর্থনা। ভক্তের এর বড় আর কি কাম্য থাক্‌তে পারে?

আয়াৎ ৬০ : 'পাপীদের সম্বোধন করে বলা হচ্ছে "হে আদম সন্তানগণ, শয়তানের পূজা করো না। এই হুকুম কি তোমাদের আমি দিইনি? কারণ, শয়তান তোমাদের একজন শক্ত দুশ্‌মন।'

আয়াৎ ৬১ : 'কিন্তু শয়তান তোমাদের বহু সংখ্যককে করেছে বিপথগামী। তোমরা কি তখন বুঝতে পারনি?'

মানুষকে দেওয়া হয়েছে বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি। সেজন্যেই জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে এই প্রশ্ন। মানুষ এই বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তির অধিকারী বলেই যে-কোন অপরাধ বা পাপের শাস্তি হয় তার প্রাপ্য।

আয়াৎ ৬৫ : 'সেদিন (কেয়ামতের দিন) আমরা তাদের (অবিশ্বাসীদের) মুখে দিয়ে দেব শীলমোহর অর্থাৎ সেদিন পাপীরা হবে ভয়ে হতবাক্‌। কিন্তু তারা যা করেছে তার সাক্ষ্য দেবে তাদের পা, জানাবে তাদের হাত। অত্যন্ত আপন আত্মীয় স্বজনও সেদিন করবে না পাপীর সমর্থন।'

আয়াৎ ৭১ : 'তারা কি দেখ্‌তে পায় না তাদের জন্যই আমরা সৃষ্টি করেছি,---যে-সবকে আমাদের হাত দিয়েছে অবয়ব,—গৃহপালিত পশু, যার উপর তারা করছে প্রভুত্ব?'—

আয়াৎ ৭২ : 'এবং সেই সবকে করেছি তাদের ব্যবহারের আয়ত্তে (তা কি তারা দেখ্‌তে পায় না?), সেই সবের কোন কোনটা তাদের করে বহন এবং কোন কোনটাকে তারা করে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার।'

আয়াৎ ৭৩ : 'এই ছাড়া অন্য উপকারও তারা সেই সব থেকে পায়, যেমন পান করার দুগ্ধ। তাতেও কি তারা কৃতজ্ঞ হবে না?'

আয়াৎ ৭৪ : 'তবুও তারা আল্লাকে ছেড়ে অন্য উপাস্য গ্রহণ করে, সাহায্য পাওয়ার আশায়।'

আয়াৎ ৭৫ : 'সাহায্য করার তাদের কোনরকম ক্ষমতাই নেই। কিন্তু দণ্ড দেওয়ার জন্য দলে দলে তাদের নিয়ে আসা হবে আমাদের বিচারাসনের সাম্‌নে।'

আয়াৎ ৭৮ : 'সে (অবিশ্বাসী) আমাদের সঙ্গে দেয় উপমা এবং ভুলে যায় নিজের গোড়া বা সৃষ্টির কথা। সে বলে "শুষ্ক হাড়ে ও গলিত শবে কে দিতে পারে প্রাণ?"

আয়াৎ ৭৯ : 'বল, "যিনি তাদেরে প্রথম সৃষ্টি করেছেন তিনিই দেবেন প্রাণ। কারণ, সব রকম সৃষ্টি কার্য্যে তিনি হচ্ছেন পারদর্শী।"

আয়াৎ ৮০ : 'সেই তিনি একা, যিনি সবুজ বৃক্ষ থেকে তোমার জন্য সৃষ্টি করেছেন অগ্নি, তার পর দেখ, তার থেকে তুমি নিজেই প্রজ্জ্বলিত করো আলো।'

আয়াৎ ৮১ : 'যিনি আকাশ ও ধরণী সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি আবার ঐ রকম সৃষ্টি করতে পারেন না? নিশ্চয়ই পারেন। কারণ তিনি মহাস্রষ্টা, দক্ষতা ও জ্ঞান তাঁর অসীম।'

আয়াৎ ৮২ : 'বস্তুতঃ তিনি যখন কিছু সৃষ্টি করতে চান তখন তাঁর আদেশ হচ্ছে "হও" এবং মুহূর্ত্তে তা হয়ে যায়।'

আয়াৎ ৮৩ : 'সুতরাং সমস্ত গৌরব তাঁর, যাঁর প্রভুত্ব সব কিছুর উপর এবং তাঁর প্রতি আমাদের সকলেরই হবে প্রত্যাবর্ত্তন।'

৩৭ : সূরা সাফ্ফাৎ

আয়াৎ ৪ : 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, তোমার আল্লাহ্ এক।'

আয়াৎ ১০৯ : 'ইব্রাহিমের উপর সালাম বা শান্তি।'

আয়াৎ ১১০ : 'এইভাবে আমরা, যারা সু-কাজ করে তাদেরে করি পুরস্কৃত।'

এই সূরায় অন্যান্য নবীগণের উপরও বর্ষণ করা হয়েছে সালাম। এইভাবে কোরাণের অনুবর্ত্তীদের দেওয়া হচ্ছে সব নবী ও মহাপুরুষদের শ্রদ্ধা করবার নির্দ্দেশ।

আয়াৎ ১৮০ : 'সব গৌরব আল্লার, যিনি সব রকম ইজ্জৎ ও ক্ষমতার মালিক। (অবিশ্বাসীরা যা কিছু তাঁর প্রতি আরোপ করে তার থেকে তিনি মুক্ত।'

আয়াৎ ১৮১ : 'নবীগণের প্রতি সালাম।'

আয়াৎ ১৮২ : 'আল্লার প্রশংসা, যে-আল্লাহ্ সমগ্র জগতের মালিক ও রক্ষা কর্ত্তা।'

৩৮ : সুরা সোয়াদ্

আয়াৎ ২৬ : 'হজরত দাউদকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে– "হে দাউদ! আমরা তোমাকে পৃথিবীতে আমাদের একজন প্রতিনিধি করেই পাঠিয়েছি। সুতরাং মানুষের সঙ্গে মানুষের বিচারে সত্য ও ন্যায় পালন করবে। তোমার হৃদয়ের লালসা বৃত্তির অনুসরণ করো না, কারণ তারা তোমাকে আল্লার পথ থেকে নিয়ে যাবে বিপথে।— যারা আল্লার পথ ছেড়ে বিপথে করে বিচরণ, তাদের জন্যে রয়েছে পীড়াদায়ক শাস্তি। কারণ তারা ভুলে যায় হিসাব নিকাশের দিন।'

আয়াৎ ২৮ : 'যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম্ম করে তাদেরে কি আমরা যারা দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি করে তাদের সমান ব্যবহার করব? যারা পাপ থেকে আত্মরক্ষা করে তাদেরে কি আমরা যারা সত্য থেকে বিমুখ তাদের মত ব্যবহার করব?'

অর্থাৎ তেমন অসম্ভব কখনো সম্ভব হতে পারে না। বিশ্বাসী, সৎকর্ম্মশীল ও পাপ থেকে আত্মরক্ষাকারী পাবে পুরস্কার ও তার বিপরীতগামীরা পাবে শাস্তি।

আয়াৎ ২৯ : 'এই যে গ্রন্থ (কোরাণ) তোমার প্রতি আমরা অবতীর্ণ করেছি, ইহা আশীর্ব্বাদে পূর্ণ, যেন তারা (লোকেরা) ইহার আয়াৎ সম্বন্ধে চিন্তা করতে পারে এবং জ্ঞানী ও বিবেচক লোকেরা যেন ইহা থেকে গ্রহণ করতে পারে উপদেশ।'

আয়াৎ ৪৯ : 'ইহা একটি বাণী: সত্যই যারা সৎ তাদের শেষ প্রত্যাবর্ত্তন হবে মনোরম স্থানে।'

আয়াৎ ৫৫ : 'কিন্তু যারা অসৎ তাদের শেষ প্রত্যাবর্ত্তন হবে জঘন্য জায়গায়।'

আয়াৎ ৮৬ : 'বল (হে নবী,) "এই জন্যে আমি তোমাদের কাছ্ থেকে কোন পুরস্কার চাই না এবং আমি প্রতারক নই। কোরাণের বাণী হচ্ছে সত্যের নির্দ্দেশ দানের জন্য। নবীরা চান না কোন প্রতি-দান।'

আয়াৎ ৮৭ : 'এই বাণী (কোরাণের বাণী, নবীদের নির্দ্দেশ) সমস্ত বিশ্বের প্রতি।'

আয়াৎ ৮৮ : 'অল্পকালের মধ্যে তোমরা নিশ্চয়ই এর সত্য উপলব্ধি করতে পারবে।'

৩৯ : সূরা জুম'র্

আয়াৎ ২ : 'বস্তুতঃ, সত্যের সঙ্গেই এই গ্রন্থ তোমাদের প্রতি আমরা অবতীর্ণ করেছি: সুতরাং আন্তরিক ভক্তির সঙ্গে আল্লার উপাসনা কর।'

আয়াৎ ৪ : 'আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন তাঁর সৃষ্টি থেকে যাকে খুশী তিনি পুত্র হিসাবে নির্ব্বাচন করতে পারতেন। কিন্তু সব গৌরব আল্লার (এই সবের তিনি উর্দ্ধে); তিনি আল্লাহ্, তিনি এক, তিনি অপ্রতিরোধ্য।'

আয়াৎ ৮ : 'কোন বিপদ যখন মানুষকে আক্রমণ করে, তখন সে হয় আল্লার কাছে অনুতপ্ত ও করে কাতর প্রার্থনা, কিন্তু আল্লাহ্ যখন নিজের কাছ্ থেকে বর্ষণ করেন অনুগ্রহ তখন মানুষ ভুলে যায় এর পূর্ব্বে সে কিসের জন্য করেছিল কান্নাকাটি ও প্রার্থনা এবং দাঁড় করায় আল্লার প্রতিদ্বন্দ্বী ও এইভাবে অন্যকেও করে আল্লারপথ থেকে বিপথ-গামী। বল—"তোমার অধর্ম্মাচরণের ভোগ হবে স্বল্পকালস্থায়ী, সত্যই তুমিও হবে অগ্নির সাথীদের একজন।'

আয়াৎ ১০ : 'বল—'হে আমার বিশ্বাসী বান্দাগণ, তোমাদের প্রভুকে ভয় কর, এই জগতে যারা সু-কাজ করে তাদের জন্য সু-পুরস্কার। আল্লার দুনিয়া বেশ প্রশস্ত। যারা ধৈর্য্যের সঙ্গে অধ্যবসায়ে রত, তারা পাবে অপরিমিত পুরস্কার।'

আয়াৎ ১৮ : 'যারা আল্লার বাণী শোনে এবং তার সর্ব্বোত্তম ব্যাখ্যা অনুসরণ করে তারা হচ্ছে যারা পেয়েছে আল্লার কাছ্ থেকে সত্য পথের নির্দ্দেশ এবং তারাই বোধশক্তিসম্পন্ন।'

আয়াৎ ২০ : 'যারা নিজের প্রভুকে ভয় করে তাদের জন্য সু-উচচ অট্টালিকা সব একটির পর একটি নির্ম্মিত হয়ে আছে, যার

নীচে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে আনন্দের নদী-প্রবাহ: এই রকমই আল্লার প্রতিশ্রুতি, বস্তুত: আল্লাহ কখনো প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন না।'

আয়াৎ ২১ : 'তুমি কি দেখ না আল্লাহ্ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং ঝর্ণাধারার ভিতর দিয়ে তাকে সঞ্চারিত করে দেন মৃত্তিকায়? তারপর তার থেকে তিনি উৎপাদন করেন নানা বর্ণের উৎপন্ন। তারপর, তা যায় শুকিয়ে; তুমি দেখবে সেই সবকে হতে হলুদে, তারপর তিনি তাকে করেন শুষ্ক এবং তা পড়ে যায় টুকরো টুকরো হয়ে ঝরে। সত্যই বোধশক্তিসম্পন্ন লোকের জন্যে এই সবে রয়েছে স্মরণীয় বাণী।'

অর্থাৎ প্রকৃতিই হচ্ছে মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা-নিকেতন। চিন্তাশীল ও বোধশক্তিসম্পন্নরা প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ও তার উৎপাদন প্রণালী থেকেই নিতে পারে পাঠ এবং এইভাবে আয়ত্ত করতে পারে প্রকৃতি-বিজ্ঞানকে।

আয়াৎ ২২ : 'যাঁর অন্তঃকরণকে আল্লাহ্ ইসলামের প্রতি করেছেন উন্মুক্ত, যার ফলে তিনি আল্লার কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন আলো বা নূর, তিনি কি পাষাণ-হৃদয় লোক থেকে ভাল নয়? যে সব পাষাণ-হৃদয় আল্লার গুণ-কীর্ত্তনে বিমুখ তাদের প্রতি ধিক্কার। খোলাখোলি ভাবেই তারা বিচরণ করছে ভুল পথে।'

আয়াৎ ২৮ : 'কোরাণ অবতীর্ণ করা হয়েছে আরবীতে অর্থাৎ আরবদের মাতৃভাষায়, তাতে নেই কোন রকম বক্রতা,—যাতে তারা হতে পারে পাপ থেকে সতর্ক।' অর্থাৎ কোরাণের ভাবে ভাষায় কোথাও বক্রোক্তির দ্বারা বক্তব্য বিষয়কে জটিল করে তোলা হয়নি। সত্যের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে সুস্পষ্ট বাক্যে যাতে লোকে বুঝতে পারে কোন্‌টা ভাল আর কোন্‌টা মন্দ, আল্লার কী আদেশ আর কী নিষেধ এবং পাপ থেকে থাকতে পারে বিরত।

আয়াৎ ২৯ : 'আল্লাহ্ একটি উপমার অবতারণা করেছেন—

যে লোক বহু অংশীদারদের অধীন—যে অংশীদারদের পরস্পর নেই মিল, আর যে মানুষ সম্পূর্ণরূপে একটি মাত্র প্রভুর অধীন: তুলনায়

এই দুই ব্যক্তি কি সমান? সব রকম প্রশংসা আল্লার! কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জ্ঞানহীন।'

অর্থাৎ বহু দেব-দেবীর পূজক কি কখনো একেশ্বরবাদীর সমকক্ষ হতে পারে?

আয়াৎ ৩০: 'সত্যই তুমি (হে নবী) একদিন মৃত্যুমুখে পতিত হবে এবং সত্যই তারাও একদিন মৃত্যুমুখে পতিত হবে।'

নবীরাও যে মানুষ, কোন রকম অতি মানুষ নন্ ও সাধারণ মানুষেরই মতো তাঁরাও যে মরণশীল সেই কথা এখানে আবার স্পষ্ট করে বলা হ'ল।

আয়াৎ ৩৩: 'যিনি সত্য আনয়ন করেন আর যিনি সত্যে করেন বিশ্বাস,—তাঁরাই পালন করেন ন্যায়।'

আয়াৎ ৩৪: 'তাঁদের প্রভুর সামনে তাঁরা যা চাইবেন তাই পাবেন: যাঁরা সুকাজ করেন এই রকমই তাঁদের পুরস্কার।'

আয়াৎ ৪১: 'বাস্তবিক তোমার প্রতি এই গ্রন্থ (কোরাণ) সত্যের সঙ্গে মানব জাতিকে সদুপদেশ দেওয়ার উদ্দেশ্যেই অবতীর্ণ করা হয়েছে। যিনি সত্য পথের নির্দ্দেশ গ্রহণ করেন, তিনি তাঁর আত্মারই উপকার সাধন করেন, যে বিপথগামী হয়, সে নিজের আত্মারই ক্ষতি সাধন করে। তোমাকে (হে নবী) তাদের কার্য্যনির্ব্বাহক করা হয়নি। অর্থাৎ মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে কিছু করার অধিকার নবীদেরও দেওয়া হয়নি। মানুষ স্বেচ্ছায় যে যা নির্ব্বাচন করবে, তার পরিণাম ফলও সেই অনুসারেই সে পাবে। চিন্তা ও কর্ম্মের স্বাধীনতা না থাক্‌লে পাপ-পুণ্যের বিচার ও দণ্ড-পুরস্কারের কোন অর্থই থাকে না। তাই মানুষকে দেওয়া হয়েছে স্বাধীন ইচ্ছা-শক্তি।

আয়াৎ ৪৭: 'অন্যায়কারীরা অর্থাৎ পাপীরা যদি পৃথিবীর সর্ব্বস্বেরও মালিক হয় এবং তদ্ অতিরিক্তও যদি তারা শেষ দিনের শাস্তির বিনিময়ে দিতে চায়, তাও হবে ব্যর্থ। আল্লার কাছ থেকে এমন কিছু এসে তাদের আঘাত করবে যা তারা কখনো ধারণাও করতে পারেনি।'

অর্থাৎ সৎকর্ম্মশীলের জন্যে যেমন ধারণাতীত পুরস্কার ও আনন্দ অপেক্ষা করছে, পাপীদের জন্যেও তেমনি অপেক্ষা করছে ধারণাতীত শাস্তি।

আয়াৎ ৪৯ : 'যখন বিপদ এসে মানুষকে স্পর্শ করে তখন সে আমাদের কাছে করে প্রার্থনা: কিন্তু যখন আমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তার প্রতি করি করুণা বর্ষণ, তখন সে বলে, "এই সব আমার বিশেষ জ্ঞান বা যোগ্যতার জন্যেই আমাকে দেওয়া হয়েছে"; না, ইহা পরীক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়, কিন্তু অধিকাংশই বুঝতে পারে না।'

আয়াৎ ৫০ : 'তাদের পূর্ব্ববর্ত্তীরাও এরকম বলত। কিন্তু তারা যা করেছে তা তাদের কোন উপকারেই আসেনি।'

আয়াৎ ৫১ : 'বরং তাদের কর্ম্মের কুফলই তাদেরে করেছে গ্রাস; এই (কালের) অন্যায়কারী ও পাপীদেরও শীঘ্রই গ্রাস করবে তাদের কর্ম্মের কুফল। তারা কখনো ব্যর্থ করতে পারবে না আমাদের পরিকল্পনা।'

আয়াৎ ৫২ : 'তারা কি জানে না আল্লাহ্ যার উপর ইচ্ছা জীবিকাকে করেন প্রশস্ত, যার উপর ইচ্ছা করেন সঙ্কোচিত? সত্যই যারা বিশ্বাস করে তাদের জন্যে এই সবে রয়েছে নিদর্শন।'

আয়াৎ ৫৩ : 'বল, "হে আমার যে সব বান্দা নিজের আত্মার বিরুদ্ধে করেছ সীমালঙঘন, আল্লার করুণা থেকে নিরাশ হয়ো না: কারণ আল্লাহ্ সব পাপ ক্ষমা করেন। তিনি চিরক্ষমাশীল ও দয়ালু।'

আয়াৎ ৫৪ : 'তোমার কাছে শাস্তি নেমে আসার পূর্ব্বেই অনুতপ্তচিত্তে আল্লার দিকে ফের, তাঁর প্রতি হও ভক্তিতে নত। তারপর তুমি কোন সহায়তা পাবে না।'

আয়াৎ ৫৫ : 'তোমার প্রভু তোমার প্রতি যে সব পথের নির্দ্দেশ অবতীর্ণ করেছেন, তার সর্ব্বোত্তমটি অনুসরণ কর, এবং তা কর তোমার কাছে শাস্তি এসে পৌঁছার আগে, অকস্মাৎ, তোমার উপলব্ধিরও আগে হয়ত এসে পড়তে পারে শাস্তি।'

আয়াৎ ৫৬ : 'পাছে তোমার আত্মা না বলে "আহ্, আমাকে ধিক্কার, আমি আল্লার প্রতি কর্ত্তব্যে করেছি অবহেলা এবং আল্লাকে যারা করেছে বিদ্রূপ আমি হয়েছি তাদের দলভুক্ত;

আয়াৎ ৫৭ : 'অথবা তোমার আত্মা না বলে, "যদি শুধু আল্লাহ্ আমাকে সত্যপথে পরিচালিত করতেন, নিশ্চয়ই আমি সৎকর্ম্মশীলদের দলভুক্ত হতাম।'

আয়াৎ ৫৮ : 'অথবা যখন শাস্তির সম্মুখীন হয়, আত্মা না বলে বসে, 'যদি আমি আর একটিবার সুযোগ পেতাম তাহ'লে নিশ্চয়ই আমি সৎকর্ম্মশীলদের একজন হতাম।'

আয়াৎ ৫৯ : 'উত্তর হবে (আল্লার কাছ থেকে): 'না, তোমার প্রতি আমার নিদর্শন এসেছিল এবং তুমি তা করেছ অস্বীকার: তুমি ছিলে দাম্ভিক এবং যারা বিশ্বাসকে (ঈমানকে) করেছে অস্বীকার, তুমিও হয়ে পড়েছিলে তাদের একজন।'

আয়াৎ ৬০ : 'যারা আল্লার বিরুদ্ধে মিথ্যা বলেছিল শেষ বিচারের দিন তাদেরে তুমি দেখতে পাবে; তাদের মুখমণ্ডল হবে কৃষ্ণবর্ণ; দাম্ভিকের জন্যে কি নরকে জায়গা হবে না? অর্থাৎ দাম্ভিকের ও স্থান হবে নরকে।'

আয়াৎ ৬১ : 'কিন্তু আল্লাহ্ সৎকর্ম্মশীলদের স্থাপন করবেন তাদের মুক্তি নিবাসে,—কোন রকম মন্দ তাদের স্পর্শ করবে না, তাদের করতে হবে না কোন শোক।'

আয়াৎ ৬২ : 'আল্লা-ই সব কিছুর স্রষ্টা, অভিভাবক ও সব ব্যাপারের ব্যবস্থাপক।'

আয়াৎ ৬৩ : 'আকাশ ও ধরণীর কুঞ্জিকা রয়েছে আল্লার কাছে: যারা আল্লার নিদর্শন অস্বীকার করে তারাই হয় ক্ষতিগ্রস্ত।'

আয়াৎ ৬৫ : 'তোমার পূর্ব্ববর্তীদের মত তোমার কাছেও নাজেল করা হয়েছে এই বাণী—"যদি তুমি আল্লার সঙ্গে যোগ কর অন্য অংশীদার, সত্যই তোমার সব কর্ম্ম হবে পণ্ড এবং সুনিশ্চিতভাবে তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত, হবে আধ্যাত্মিক সম্পদ থেকে বঞ্চিতের দলে।'

আয়াৎ ৬৬ : 'বরং আল্লারই উপাসনা কর এবং হও যারা কৃতজ্ঞ তাদের একজন।'

আয়াৎ ৭০ : '(শেষ বিচারের দিন) প্রত্যেক আত্মাকে তার কর্ম্মের পূর্ণ প্রাপ্য ফল দেওয়া হবে, তারা যা কিছু করে সবই আল্লাহ্ উত্তমরূপেই জানেন।'

আয়াৎ ৭১ : '(শেষ বিচারের দিন) অবিশ্বাসীদের দলে দলে পরিচালিত করা হবে নরকের দিকে, যখন তারা সেখানে পৌঁছবে নরকের সব দরজা যাবে খুলে এবং রক্ষকরা জিজ্ঞাসা করবে, "'তোমার প্রভুর নিদর্শন স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যে এবং এই দিনের বিষয় সতর্ক করে দেওয়ার জন্যে, তোমাদের মধ্য থেকে কি তোমাদের প্রতি কোন নবী আসেনি ? উত্তর হবে—"সত্য: (অর্থাৎ এসেছিল) কিন্তু অবিশ্বাসীদের প্রতি শাস্তির নির্দ্দেশও সত্য প্রমাণিত হল!"

আয়াৎ ৭২ : 'তাদের বলা হবে: "বসবাস করার জন্যে নরকের ফটকে প্রবেশ কর: এই জঘন্য স্থানই দাম্ভিকদের যোগ্য বাসস্থান।"

আয়াৎ ৭৩ : 'যারা তাদের প্রভুকে করেছে ভয়, তাদেরে দলে দলে পরিচালিত করা হবে স্বর্গের দিকে, তারা যখন সেখানে পৌঁছবে, দেখতে পাবে—স্বর্গের সব দরজা গেছে খুলে এবং তার রক্ষকরা বল্‌বে—"সালাম, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক, তোমরা বেশ উত্তম কাজ করেছ, তোমরা বাস করার জন্য এখানে প্রবেশ কর।'

আয়াৎ ৭৪ : 'তারা বল্‌বে—"সব প্রশংসা আল্লার, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি করেছেন পূর্ণ এবং আমাদের দিয়েছেন এই স্থানের অধিকার (বা মিরাছ); আমরা ইচ্ছামতো এই স্বর্গোদ্যানে বাস করতে পারব: যারা সৎকর্ম্ম করে তাদের জন্যে কি চমৎকার পুরস্কার!'

৪০ : সূরা মু'মিন্

আয়াৎ ২ : 'এই গ্রন্থ আল্লার কাছ্ থেকেই অবতীর্ণ, যে আল্লাহ্ সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা ও পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী।'

আয়াৎ ৩ : 'যিনি ক্ষমা করেন পাপ, গ্রহণ করেন অনুতাপ; যিনি দণ্ডবিধানে কঠোর এবং যাঁর নাগাল দীর্ঘ অর্থাৎ নিকট বা দূরের সবই যাঁর নাগালের মধ্যে। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন ঈশ্বর নেই, তিনিই শেষ গন্তব্যস্থল।'

আয়াৎ ৫৪ : 'আল্লার প্রেরিত পুস্তক বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য একাধারে পথনির্দ্দেশক ও বাণী।'

আয়াৎ ৫৫ : 'ধৈর্য্যের সঙ্গে পরিশ্রম কর, কারণ আল্লার প্রতিশ্রুতি সত্য, তোমার দোষত্রুটির জন্যে আল্লার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং সকাল-সন্ধ্যা গুণ কীর্ত্তন কর তোমার প্রভুর।'

আয়াৎ ৫৮ : 'অন্ধ এবং চক্ষুষ্মান কখনো সমান নয়। অবিশ্বাসী ও দুষ্কৃতিশীলও কখনো বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মশীলের সমকক্ষ নয়। সতর্কবাণী থেকে অতি সামান্য শিক্ষাই তোমরা গ্রহণ করে থাক। অবিশ্বাসী লোক অন্ধের সমতুল্য—চর্তুদিকে নানা নিদর্শন দেখেও যে গ্রহণ করে না কোন শিক্ষা।'

পক্ষান্তরে যিনি বিশ্বাসী যাঁর জীবনে বিশ্বাসের সঙ্গে ঘটেছে সৎকার্য্যের সমন্বয়, তিনি চক্ষুষ্মানের মত দেখ্তে পান সব কিছু, দেখে তিনি হন সাবধান ও গ্রহণ করেন প্রয়োজনীয় শিক্ষা।

আয়াৎ ৬৪ : 'তোমার বিশ্রাম-ক্ষেত্র এই পৃথিবী আল্লা-ই সৃষ্টি করেছেন আর সৃষ্টি করেছেন উপরে চাঁদোয়ার মত আকাশকে এবং তোমাকে দিয়েছেন অবয়ব, অত্যন্ত মনোরম অবয়ব এবং তোমার

জীবিকার জন্যে ব্যবস্থা করেছেন অত্যন্ত ভাল ও খাটি জিনিস। এই রকমই তোমার প্রভু—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রভু আল্লারই সমস্ত গৌরব।'

আয়াৎ ৬৫ : 'তিনি জীবন্ত, তিনি ছাড়া অন্য উপাস্য নেই। অকপট ভক্তির সঙ্গে তাঁকে ডাকো। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রভু আল্লারই সমস্ত প্রশংসা।'

আয়াৎ ৬৭ : 'তিনি তোমাকে ধূলি থেকেই তৈরী করেছেন। তারপর এক ফোঁটা শুক্র থেকে—তারপর কীটাকৃতি ঘনীভূত বস্তু থেকে, তারপর তিনি-ই ঘটান শিশুরূপে তোমার আবির্ভাব। তারপর বর্দ্ধিত করেন পূর্ণশক্তির বয়সে অর্থাৎ যৌবনে পৌঁছান, তারপর পৌঁছান বার্দ্ধক্যে যদিও তোমাদের কেউ কেউ তার আগেই পতিত হয় মৃত্যুমুখে।—এবং তোমাকে পৌঁছান নির্দ্দিষ্টকালে অর্থাৎ মৃত্যুকালে। যেন তুমি জ্ঞান আহরণ করতে পার।'

জন্ম থেকে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত মানুষের যে শুধু আয়ু বাড়ে তা নয়, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শনও বর্দ্ধিত হয়।

৪১ : সূরা হা'মিম্

আয়াৎ ৬ : 'নবীকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে—'তুমি বল, "আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ, অহি দ্বারা আমাকে জানানো হয়েছে যে, তোমার আল্লাহ্ এক, সুতরাং তাঁর প্রতি সুদৃঢ়ভাবে আস্থাশীল থাকো এবং তাঁর কাছে করো ক্ষমা প্রার্থনা। যারা আল্লার সঙ্গে অন্য দেব-দেবীকে যুক্ত করে তাদের প্রতি অভিশাপ।'

আয়াৎ ৭ : 'আর যারা নিয়মিত দান করে না এবং যারা পরকালকেও করে অস্বীকার (তাদের প্রতিও অভিশাপ)।'

আয়াৎ ৮ : 'যারা বিশ্বাসী ও করে সৎকর্ম্ম, তাদের প্রতি সু-নিশ্চিত পুরস্কার।'

আয়াৎ ৩৩ : 'যে আল্লার দিকে মানুষকে আহ্বান করে ও করে সৎকর্ম্ম এবং বলে, "আমি তাঁদেরই একজন যারা ইসলামে করে আত্মসমর্পণ" তার চেয়ে উত্তম কথা আর কে বলে?'

আয়াৎ ৩৪ : 'কু এবং সু কখনো সমান হতে পারে না। সু দিয়ে কু'কে দাও বাধা। তাহ'লে তোমার ও যাদের মাঝে রয়েছে শত্রুতা, তা পরিণত হবে বন্ধুত্ব ও অন্তরঙ্গতায়।'

আয়াৎ ৩৬ : 'শয়তান যদি কোন সময় তোমাকে অশান্তির উত্তেজনা দেয়, আল্লার আশ্রয় ভিক্ষা কর। এক মাত্র তিনিই সব শোনেন ও সব জানেন।'

আয়াৎ ৩৭ : 'দিন রাত্রি ও চন্দ্র সূর্য্য আল্লার নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত। চন্দ্র বা সূর্য্যকে পুজা করো না, যে আল্লাহ্ চন্দ্র সূর্য্যকে সৃষ্টি করেছেন সেই আল্লারই কর পুজা, যদি তোমার ইচ্ছা হয় তাঁরই কর উপাসনা।'

আয়াৎ ৩৯ : 'তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে ইহাও: তুমি দেখ ঊষর পতিত ভূমি, কিন্তু আমরা যখন সেখানে পাঠাই বৃষ্টি ধারা, উহা সজীব হয়ে ওঠে ও দেয় প্রচুর (শস্য), সত্যই যিনি মৃত ভূমিকে দেন জীবন, নিশ্চয়ই মৃত মানুষকেও তিনি দিতে পারেন প্রাণ। কারণ সব কিছুরই উপর তাঁর রয়েছে ক্ষমতা।'

আয়াৎ ৪০ : 'যারা আমাদের আয়াতের সত্যকে করে বিকৃত তারা আমাদের দৃষ্টি থেকে লুক্কায়িত নয়। কে শ্রেষ্ঠতর? যে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হবে, না যে বিচারের দিন নিরাপদে পরীক্ষায় হবে উত্তীর্ণ, সে? যা ইচ্ছা তুমি কর, তবে তুমি যা কিছুই কর, সবই দেখ্‌তে পান আল্লাহ্‌।'

আয়াৎ ৪৩ : '(হে নবী) তোমাকে এমন কিছু বলা হয়নি যা তোমার পূর্ব্ববর্তী নবীদেরও হয়নি বলা, একাধারে পরিপূর্ণ ক্ষমা ও কঠোরতম শাস্তি তোমার প্রভুর করায়ত্ত।'

আয়াৎ ৪৪ : 'আমরা যদি এই কোরাণ আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় অবতীর্ণ করতাম তারা অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা বলত: "এর আয়াৎ-গুলির কেন ব্যাখ্যা করা হয়নি? কী। রছুল একজন আরব, অথচ কোরাণের ভাষা নয় আরবী?" বল, "যারা বিশ্বাসী তাদের জন্যে কোরাণ একাধারে উপদেশ ও আরোগ্য, আর যারা অবিশ্বাসী তাদের কানে বধিরতা ও চোখে রয়েছে অন্ধতা। বহুদূর থেকেই যেন তাদের কাছে এসেছে আহ্বান।"

আয়াৎ ৪৬ : 'যিনি সৎকর্ম্ম করেন তিনি নিজের আত্মারই মঙ্গল সাধন করেন, যিনি কু-কাজ করেন তিনি করেন নিজের আত্মারই প্রতিকূলতা।—তোমাদের প্রভু তাঁর বান্দার প্রতি কখনও এতটুকু অবিচার করেন না।'

আয়াৎ ৪৭ : 'বিচারকাল একমাত্র আল্লারই জানা। আল্লার অজ্ঞাতে খেজুর খোসা ছেড়ে নির্গত হয় না, নারী করে না সন্তান ধারণ ও করে না প্রসব। আল্লাহ্‌ বিচারের দিন অবিশ্বাসীদের প্রশ্ন করবেন— "আমার সঙ্গে তোমরা যে সব অংশীদার আরোপ করেছিলে তারা এখন

কোথায়।" তারা বল্‌বে, "আমরা নিশ্চয় করে বল্‌ছি, আমরা একজনও তার সাক্ষ্য দিতে পারব না।"

আয়াৎ ৪৯ : 'শুভ-কামনায় মানুষ কখনও ক্লান্তি বোধ করে না। কিন্তু অশুভ অর্থাৎ কু যখন মানুষকে স্পর্শ করে তখন আশা তাকে ত্যাগ করে এবং নিজেকে হারিয়ে ফেলে সে নৈরাশ্যে।'

আয়াৎ ৫১ : 'আমরা যখন মানুষের উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করি তখন সে আমাদের থেকে ফিরে নিজের দিকে দূরে সরে যায়। কিন্তু যখন দুঃখ বা বিপদ এসে করে আক্রমণ তখন সে প্রবৃত্ত হয় দীর্ঘ প্রার্থনায়।'

এ কে না-দেখেছে সুখের দিনে মানুষ আল্লাকে যায় ভুলে কিন্তু দুঃখের দিনে তার নমাজ-রোজার বহর যায় বেড়ে ও প্রার্থনা হয় দীর্ঘতর।

৪২ : সূরা শূ'রা

আয়াৎ ১০ : 'তিনি অর্থাৎ আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা : তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের জোড়া স্থষ্টি করেছেন : জীব জন্তরও স্থষ্টি করেছেন জোড়া। এইভাবে তিনি তোমাদের সংখ্যা করেন বৃদ্ধি : আল্লার সমকক্ষ কিছুই নেই, তিনি সব কিছু শুন্‌তে পান ও পান সব কিছু দেখতে।'

আয়াৎ ১২ : 'ধরিত্রী ও আকাশ-মণ্ডলের চাবি-কাঠি তাঁরই অধিকারে : তিনি ইচ্ছামতো কারো প্রতি বাড়ান জীবিকা ও কারো প্রতি কমান। কারণ সব কিছুর পূর্ণজ্ঞান রয়েছে তাঁরই।'

আয়াৎ ২০ : 'যে পরকালের চাষ কামনা করে, তার চাষ আমরা করি বৃদ্ধি, আর যে করে এই পৃথিবীর চাষ তাকে দিই সেইভাবে, ---কিন্তু তার ভাগ্যে কিছুই জুট্‌বে না পরকালে।'

আয়াৎ ২২ : 'তুমি দেখ্‌বে, কু-কর্ম্মকারীরা যা উপার্জ্জন করেছে তার ভয়েই তারা ভীত এবং তার বোঝা এসে তাদের উপর চাপবেই। কিন্তু যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম্ম করে তারা স্থান পাবে স্বর্গের প্রস্ফুটিত উদ্যানে। তারা যা চায় আল্লার কাছে সবই পাবে এবং তা হবে সবচেয়ে মহৎ প্রাচুর্য্য।'

আয়াৎ ২৫ : 'তিনি অর্থাৎ আল্লাহ্ বান্দার তৌবা বা অনুতাপ মঞ্জুর করেন এবং ক্ষমা করেন পাপ। তুমি যা কর তিনি সবই জানেন।'

আয়াৎ ২৬ : 'যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম্ম করে, আল্লাহ্ শ্রবণ করেন তাদের প্রার্থনা এবং বর্দ্ধিত করেন তাদের প্রতি তাঁর দান। কিন্তু অবিশ্বাসীদের জন্যে ব্যবস্থা রয়েছে কঠোর শাস্তির।'

আয়াৎ ২৭ : 'যদি আল্লাহ্ তাঁর বান্দার জীবিকা করতেন বঞ্চিত, তা হ'লে নিশ্চয়ই তারা পৃথিবীতে সব রকম সীমা করতো লংঘন, কিন্তু তাঁর ইচ্ছামতো তিনি পাঠিয়ে থাকেন (জীবিকা) নির্দ্দিষ্ট মাত্রায়। কারণ তিনি তাঁর বান্দাদের উত্তমরূপেই জানেন ও তাদের উপর রাখেন সতর্ক দৃষ্টি।'

আয়াৎ ২৮ : 'মানুষ সমস্ত আশা ত্যাগ করার পর একমাত্র আল্লাহ্-ই পাঠান বৃষ্টিধারা এবং সর্ব্বত্র ছড়িয়ে দেন তাঁর করুণা। তিনি রক্ষা কর্ত্তা, তিনিই সমস্ত প্রশংসার যোগ্য।'

আয়াৎ ২৯ : 'আল্লার নিদর্শনাবলীর মধ্যে আকাশ মণ্ডল, পৃথিবী ও সর্ব্বত্র বিক্ষিপ্ত জীব জন্তুর সৃষ্টিও এবং যখনি ইচ্ছা করেন সকলকে একত্রিত করার ক্ষমতাও তিনি রাখেন।'

আয়াৎ ৩০ : 'যে বিপদই তোমার আসুক না কেন, তা তোমার নিজের হাতেরই সৃষ্টিঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আল্লাহ্ করেন ক্ষমা।'

বিচার করে দেখ্‌লে দেখা যাবে মানুষের দুঃখ-কষ্ট ও বিপদের মূল মানুষের নিজেরই কর্ম্মফল। মানুষ নিজের বিপদ নিজেই ডেকে নিয়ে আসে। চিরক্ষমাশীল আল্লাহ্ অনেক ক্ষেত্রেই মানুষকে করেন ক্ষমা, বিপদ-আপদ থেকে করেন রক্ষা।'

আয়াৎ ৩৬ : 'তোমাকে যা কিছুই এখানে দেওয়া হয়েছে তা এই পার্থিব জীবনের সুখ-সুবিধার জন্যই। কিন্তু আল্লার কাছে যা আছে বা যা পাবে তা আরো উত্তম ও আরো দীর্ঘস্থায়ী এবং তা হচ্ছে বিশ্বাসীদের জন্য—যারা আল্লার উপর করেছে নির্ভর।'

আয়াৎ ৩৭ : 'যারা পরিহার করে মহাপাপ ও লজ্জাকর কাজ এবং রাগের সময়ও করে ক্ষমা ;—

আয়াৎ ৩৮ : 'যারা আল্লার বাণী শোনে, ও নিয়মিত উপাসনা করে, যারা পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার দ্বারা নিজেদের কার্য্য নির্ব্বাহ করে এবং আমরা যা জীবিকার জন্যে দিয়েছি তার থেকে যারা খরচ করে অর্থাৎ দান করে';—

আয়াৎ ৩৯ : 'এবং যাদের উপর করা হয় অন্যায় নির্য্যাতন (তারা যদি দমে না গিয়ে) পারস্পরিক সাহায্যে আত্মরক্ষা করে।'—

অর্থাৎ এই সব লোকই আল্লার প্রিয় এবং পরলোকে এঁরাই হবেন পুরস্কৃত।

আয়াৎ ৪০ : 'ক্ষতির বদ্‌লা সম-পরিমাণ ক্ষতিঃ কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি ক্ষমা করে ও আপোষ করে, আল্লার কাছে পুরস্কার হয় তার প্রাপ্যঃ কারণ আল্লাহ্‌ অন্যায়কারীকে ভালবাসেন না।'

আয়াৎ ৪২ : 'অপরাধী হচ্ছে ঐ সব লোক যারা মানুষকে অন্যায়ভাবে নির্য্যাতন করে ও যারা ন্যায় ও সত্যকে করে অস্বীকার এবং অত্যন্ত গর্ব্বিতভাবে পৃথিবীতে করে সব রকম সীমা-লংঘন। এই সব লোকের জন্যে অপেক্ষা করছে কঠোর শাস্তি।'

আয়াৎ ৪৩ : 'বস্তুতঃ যদি কেউ ধৈর্য্য ও ক্ষমা প্রদর্শন করে, বাস্তব কার্য্যক্ষেত্রে তাকে তাই-ই জুগিয়ে থাকে সক্রিয় হিম্মত্‌।'

আয়াৎ ৪৯ : 'আকাশ ও মর্ত্ত্যভূমির সাম্রাজ্য আল্লারইঃ তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, তাঁর ইচ্ছামতোই তিনি দিয়ে থাকেন ছেলে বা মেয়ে।'

আয়াৎ ৫০ : 'অথবা দিয়ে থাকেন উভয়-ই পুরুষ অথবা মেয়ে, (অর্থাৎ) একই লিঙ্গের যমজ ছেলে-মেয়েও হয়ে থাকে): আবার যাকে ইচ্ছা তিনি রেখে দেন বন্ধ্যা। কারণ তিনিই সমস্ত জ্ঞান ও ক্ষমতার অধিকারী।'

৪৩ : সূরা জুখ্‌রুফ্‌

আয়াৎ ৫৬ : 'ফেরাউন ও তার জাতির ঔদ্ধত্যের কাহিনী বর্ণনার পর এই আয়াতে বলা হচ্ছে—তাদেরে আমরা পরিণত করেছি অতীত জাতিতে ও ভবিষ্যৎ যুগের জন্য করেছি দৃষ্টান্তস্থল।'

ফেরাউন ও তার স্বজাতি আজ ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন, তাদের ইতিহাস আজ অতীত কাহিনীতেই পর্য্যবসিত। ফেরাউন ও তার স্বজাতির ইতিহাস থেকে ঈশ্বরদ্রোহিতার যে কী ভয়াবহ পরিণাম তা অন্যান্য জাতিরা জানতে পারবে, নিতে পারবে শিক্ষা, হতে পারবে সাবধান। ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে এইভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যাওয়া সত্যই যে কোন জাতির জন্য অত্যন্ত করুণ ও অগৌরবের ভূমিকা।

আয়াৎ ৭৬ : 'আমরা তাদের প্রতি কোন অন্যায় করব না : কিন্তু তারা নিজেরাই নিজের প্রতি করে অন্যায়।'

অর্থাৎ মানুষ নিজেই নিজের প্রতি করে অন্যায়—নিজের বিবেককে নিজেই করে লংঘন এবং সত্য ও ন্যায়ের করে অমর্য্যাদা---মিথ্যা ও অন্যায়ের পথে বাড়ায় পা। এই ভাবে মানুষ নিজের প্রতি নিজে করে অবিচার। অথচ নিজের কৃতকর্ম্মকে অনায়াসে আরোপ করে বসে আল্লার উপর।

আয়াৎ ৮১ : খ্রীষ্টানরা যিশুকে আল্লার সন্তান বলে থাকেন, সেই প্রসঙ্গে এখানে বলা হচ্ছে---"বল, হে নবী, যদি মহাদয়ালু আল্লার একটি পুত্র থাকত, তাহলে আমিই সর্ব্বাগ্রে তাঁর পূজা করতাম।"

আয়াৎ ৮২ : 'আরশের অধিপতি, আকাশমণ্ডল ও জগতের প্রভুর-ই সব গৌরব। তারা অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা যা আরোপ করে আল্লাহ্‌ তার থেকে মুক্ত।'

আয়াৎ ৮৭ : ‘যদি অবিশ্বাসীদের তুমি জিজ্ঞাসা কর, কে তাদের সৃষ্টি করেছে?—তারা নিশ্চয়ই বলবে—আল্লাহ্, তবুও তারা সত্যপথ থেকে কী করে বিপথগামী হয়—?’

অর্থাৎ স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করেও অনেকেই তাঁর নাফরমানী বা বিরুদ্ধাচরণ করতে ইতস্ততঃ করে না।

৪৪ : সূরা দু'খান্

আয়াৎ ৩৮ : 'আকাশমণ্ডল, পৃথিবী ও তার মধ্যবর্ত্তী সব কিছুকে আমরা নিছক খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করি নি';

আয়াৎ ৩৯ : 'সত্য ও ন্যায়সঙ্গত পরিণতি ছাড়া অন্য কিছুর জন্যই এই সবকে সৃষ্টি করা হয়নি। কিন্ত তাদের অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের অধিকাংশই তা বুঝতে পারে না।'

৪৫ : সুরা জাছিয়া

আয়াৎ ৩ : 'বস্তুতঃ যারা বিশ্বাস করে তাদের জন্য পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলে রয়েছে প্রভূত নিদর্শন।'

আয়াৎ ৫ : 'দিনরাত্রির বৈপরিত্যে ও আল্লাহ্ আকাশ থেকে পাঠিয়ে থাকেন যে-জীবিকা (অর্থাৎ বারিধারা, যার কারণে জমিতে জন্মে নানা ফসল) ও যার ফলে মৃত ধরণী হয় সজীব, এবং বায়ুতে ঘটে যে-পরিবর্ত্তন, এই সবে জ্ঞানীদের জন্যে রয়েছে নিদর্শন।'

আয়াৎ ৭ : 'মিথ্যা নিয়ে যে বণিক-বৃত্তি করে এমন প্রত্যেক পাপ-ব্যবসায়ীর প্রতিই অভিশাপ।'

আয়াৎ ৮ : 'তাকে যখন আমাদের আয়াৎ শোনানো হয়, সে শোনে; কিন্তু সে এমন দাম্ভিক ও একগুঁয়ে যে (ভান করে) যেন শোনেনিঃ ঘোষণা করো, এমন লোকের হবে নির্ম্মম শাস্তি।'

আয়াৎ ৯ : 'আমাদের আয়াৎ থেকে সে যখন কিছু শেখে, তাও সে গ্রহণ করে অত্যন্ত উপহাসের সঙ্গেঃ এরকম লোকের ভাগ্যেও জুট্‌বে অপমানকর শাস্তি।'

আয়াৎ ১২ : 'আল্লা-ই সমুদ্রকে করেছেন তোমাদের অধীন, তাঁর হুকুমে জাহাজ যেন করতে পারে সমুদ্র-পথে চলাচল, তোমরা যেন করতে পার তাঁর প্রাচুর্য্যের অন্বেষণ এবং যেন হও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ।'

আয়াৎ ১৩ : 'পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলে যা কিছু সবই তিনি তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন; তাকিয়ে দেখো, যারা চিন্তাশীল তাদের জন্যে ঐ সবে রয়েছে নিদর্শন।'

আয়াৎ ১৪ : 'যারা বিশ্বাসী তাঁদেরে বল, যারা আল্লার দিন সমূহের প্রতি বিমুখ তাদেরে যেন ক্ষমা করেনঃ যে মানব জাতি যেমন

রোজগার করেছে (পাপ বা পুণ্য) তাদের তিনি সেই রকমই প্রতিফল দেবেন।'

যে কোন কারণে এমন কি ন্যায় ও সত্যের জন্যে হলেও ব্যক্তি-গত বা দলগতভাবে প্রতিশোধ বা নিজের হাতে আইন গ্রহণ এখানে নিষেধ করা হচ্ছে। সাধারণতঃ এইরকম ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ঈর্ষা ও বিদ্বেষই পেয়ে বসে প্রাধাণ্য। ফলে বিচারের নামে ঘটে অবিচার। আল্লাই পাপ পুণ্যের বিচারের একমাত্র মালিক, কারণ তিনিই পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। মানুষের জ্ঞান ও ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ব্যক্তিগত রুচি ও প্রবৃত্তির শৃঙ্খল মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা অর্জ্জন মানুষের পক্ষে একরকম অসম্ভব বল্লেই হয়। কাজেই পাপ পুণ্যের মত ব্যাপকতর ও গভীরতর বিষয়ের বিচারের ভার যিনি সর্ব্বজ্ঞ তাঁর হাতে থাকাই উচিত।

আয়াৎ ১৫ : 'যদি কেউ কোন সৎকাজ করে, সে তা করে নিজের আত্মার জন্যই; যদি কেউ করে কু-কাজ, তা করে সে তার আত্মার বিরুদ্ধে। পরিশেষে তোমাদের সবাইকে ফিরিয়ে আনা হবে তোমাদের প্রভুর কাছে।'

আয়াৎ ১৮ : 'আমরা তোমাদেরে ধর্ম্মের পথে স্থাপন করেছি-- সেই পথ অনুসরণ করো, যারা অজ্ঞ তাদের বাসনার অনুবর্ত্তী হয়ো না।'

আয়াৎ ১৯ : 'তারা (অজ্ঞলোকেরা) আল্লার সাম্‌নে তোমাদের কোন উপকারেই আস্‌বে না; পাপীরা শুধু পরস্পরের রক্ষক বা প্রভুই সাজে, কিন্তু সৎকর্ম্মশীলের রক্ষক হচ্ছেন আল্লাহ্‌।'

আয়াৎ ২০ : 'এই সব-ই মানুষের জন্যে পরিষ্কার নিদর্শন এবং দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্যে একাধারে পথ-প্রদর্শক ও রহমত।'

আয়াৎ ২১ : 'কি! যারা কু-মতলবী তারা কি মনে করে তাদেরে আমরা যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মশীল তাদের সমান করব---? তাদের জন্ম ও মৃত্যু কি সমান হবে? তারা যা করে তা অত্যন্ত ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত।'

আয়াৎ ২২ঃ 'আল্লাহ্ পৃথিবী ও সৌরমণ্ডলকে ন্যায় উদ্দেশ্যেই করেছেন সৃষ্টি,—প্রত্যেকে যে যেমন রোজগার করে, সে যেন সে রকম প্রতিদানই পায় এবং কারো প্রতি যেন করা না হয় কোন অন্যায়।'

আয়াৎ ৩০ ঃ 'যারা বিশ্বাস করেছে ও করেছে সৎকর্ম্ম, তাদের প্রবেশ ঘটবে আল্লার রহমতে। সকলের পক্ষে সেই সাফল্য সত্যই দেখবার মত।' অর্থাৎ মানুষের চরম ও পরম কাম্য হচ্ছে আল্লার রহমত।

৪৬ : সুরা আহ্‌কাফ্‌

আয়াৎ ১৩ : 'সত্যই যারা বলে "আল্লাই আমাদের প্রভু", এবং ঐ পথে থাকে স্থির ও দৃঢ়,---তাদের কোন ভয় নেই এবং তাদের করতে হবে না কোন শোক।'

আয়াৎ ১৫ : 'আমরা মানুষের প্রতি নির্দ্দেশ দিয়েছি,--মাতা-পিতার প্রতি সদয় হতে, মা পরম বেদনার সঙ্গে তাকে ধারণ করেছেন গর্ভে, প্রসব করেছেন বেদনার সঙ্গে। দুধ ছাড়াবার কাল পর্য্যন্ত ত্রিশ মাস ধরে পান করাতে হয় স্তন্য। অবশেষে যখন সে পূর্ণশক্তির বয়সে পোঁছে এবং চল্লিশ বৎসরে করে পদার্পণ তখন সে বলে "হে আমার প্রভু, আমি যেন তুমি আমাকে এবং আমার মাতা-পিতা উভয়কে যা দিয়েছ তার জন্যে কৃতজ্ঞ হতে পারি এবং যেন করতে পারি তোমার অনুমোদিত সৎকর্ম্ম। এবং সন্তান সন্ততির ব্যাপারে আমার প্রতি হও সদয়। সত্যই আমি তোমার দিকে হই রুজু ও সত্যই আমি ইসলামে (শান্তির প্রতি) ঝুকাই মাথা।"

আয়াৎ ১৯ : 'কৃতকর্ম্মানুসারেই সব মানুষের মান বা শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট করা আছে: যেন আল্লাহ্‌ দিতে পারেন তাদের কর্ম্মের যথাযোগ্য প্রতিফল এবং কারো প্রতি যেন না ঘটে কোন অবিচার।'

আয়াৎ ২৭ : 'অতীতে তোমাদের চতুষ্পার্শ্বের বহু বসতিই আমরা ধ্বংস করেছি এবং আমরা দেখিয়েছি নানাভাবে নিদর্শন: যেন তারা ফিরতে পারে আমাদের দিকে অর্থাৎ মানুষ যেন হতে পারে আল্লা-মুখীন।'

আয়াৎ ৩২ : 'যিনি আল্লার পথে আহ্বান করেন তাঁর কথায় যে কান দেয় না, সে কখনো দুনিয়ায় আল্লার পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করতে পারবে না। এবং সে পেতে পারে না আল্লাকে ছাড়া কোন রক্ষাকর্ত্তা: সুস্পষ্ট ভুল পথেই হচ্ছে এই সব লোকের বিচরণ।'

৪৭ : সূরা মুহাম্মদ

আয়াৎ ১ : 'যারা আল্লাকে অস্বীকার করে এবং মানুষকে আল্লার পথ থেকে করে বিচ্যুৎ,—আল্লাহ্ তাদের কাজকে করবেন লক্ষ্যচ্যুত অর্থাৎ ব্যর্থ।'

আয়াৎ ২ : 'কিন্তু যারা বিশ্বাস ও সৎকর্ম্ম করে এবং মুহাম্মদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে করে বিশ্বাস—কারণ তা হচ্ছে তাঁর প্রভুর সত্যবাণী, আল্লাহ্ দূর করবেন তাদের সব দুঃখ ও তাদের অবস্থার করবেন উন্নতি।'

আয়াৎ ৩ : 'কারণ, যারা আল্লাকে অস্বীকার করে তারা মিথ্যার করে অনুসরণ, আর যারা বিশ্বাস করে তারা অনুসরণ করে আল্লার প্রেরিত সত্যের। এইভাবে আল্লাহ্ দৃষ্টান্তের সাহায্যে মানুষের সামনে ধরেন শিক্ষণীয় পাঠ।'

আয়াৎ ৭ : 'হে বিশ্বাসী, যদি তুমি আল্লার পথে কর সাহায্য, তিনিও তোমাদের সাহায্য করবেন এবং প্রতিষ্ঠিত করবেন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর।'

আয়াৎ ১২ : 'সত্যই যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মশীল আল্লাহ্ তাদেরে এমন এক উদ্যানে প্রবেশ করাবেন, যে-উদ্যানে প্রবাহিত হচ্ছে নদী এবং যারা অস্বীকার করে আল্লাকে, তারা এই পৃথিবীকে ভোগ করবে, খাবে পশুরা যেমন খায় কিন্তু অগ্নি হবে তাদের বাসস্থান।'

আয়াৎ ১৯ : 'জেনে রাখো, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই এবং নিজের অপরাধের জন্যে ও বিশ্বাসী নর-নারীর জন্যে আল্লার কাছে প্রার্থনা করো ক্ষমা। কারণ আল্লাহ্ জানেন তুমি কি ভাবে কর বাইরে বিচরণ ও কিভাবে কর ঘরে জীবন যাপন।'

আয়াৎ ২১ : 'আনুগত্য স্বীকার করো ও যা ন্যায় তা বলাই উচিত এবং যদি কোন বিষয়ে গ্রহণ করা হয় সঙ্কল্প, তখন আল্লার প্রতি সত্যনিষ্ঠ থাকাই উত্তম।'

অর্থাৎ ধর্ম্মকে লংঘন করে কোন সঙ্কল্পই গ্রহণ করা উচিত নয়। দেশের বা জাতির স্বার্থের খাতিরেও বৃহত্তর ন্যায় ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দেওয়া ইসলাম সমর্থন করে না। ধর্ম্মকে লংঘন না করেই করবে সব আদর্শ বা সঙ্কল্পের আনুগত্য এবং ন্যায় কথা বলতে কখনো হবে না বিরত। ইহাই ইসলামের নির্দ্দেশ।

আয়াৎ ২২ : 'তাহ'লে এ কী কখনো আশা করা যেতে পারে কর্ত্তৃত্বের আসনে তোমাকে বসালে তুমি দেশে বাধাবে গোলমাল ও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে ঘটাবে বিচ্ছেদ?'

অর্থাৎ যদি মানুষ ন্যায় ও সত্যের প্রতি থাকে অনুগত এবং কোন বিষয়েই আল্লাকে না করে লংঘন, তা হ'লে যত বড় ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্বের অধিকারীই হউক না কেন, ঐ মানুষ কখনো করতে পারে না অশান্তি, গৃহ বিবাদ ও ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদের সৃষ্টি।

আয়াৎ ৩৬ : 'এই জাগতিক জীবন ক্রীড়া ও আনন্দ ছাড়া আর কিছুই নয়ঃ যদি বিশ্বাস কর এবং পাপের বিরুদ্ধে থাক সতর্ক, আল্লাহ্ তোমাকে দেবেন প্রতিফল এবং বলবেন না তোমার ধনসম্পদ ত্যাগ করতে।'

আয়াৎ ৩৮ : 'দেখ, তোমরা ঐ লোক, যাদেরে আহ্বান করা হয়েছে আল্লার পথে খরচ করার জন্যে কিন্তু তোমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা কৃপণ। কিন্তু যারা কার্পণ্য করে, তারা ক্ষতি করে নিজেদেরই আত্মার। আল্লাহ্ সব অভাব থেকেই মুক্ত কিন্তু তোমরা নিজেরাই হচ্ছ অভাবগ্রস্ত। যদি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর, আল্লাহ্ অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন---যারা তোমাদের মত হবে না।'

অর্থাৎ তারা হবে তোমাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট। তারা আল্লার উদ্দেশ্য সাধনে নিজেদের যথাসর্ব্বস্ব দানেও কুণ্ঠিত হবেনা, কোন জাতি বিশেষ অকৃতকার্য্য হতে পারে কিন্তু আল্লার উদ্দেশ্য কখনো ব্যর্থ হবে না। তোমার নিজের অক্ষমতা ও ক্ষুদ্রতা, আল্লার পরিকল্পনাকে কখনো ব্যর্থ করতে পারবে না। উৎকৃষ্ট লোকেরা তাকে সফল করে তুলবেই।

৪৮ : সূরা ফৎহে

আয়াৎ ১৪ : 'আল্লাহ্ সৌর-জগত ও বিশ্ব-রাজ্যের মালিক: যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন ও যাকে ইচ্ছা দেন শাস্তি। কিন্তু আল্লাহ্ হচ্ছেন সর্ব্বদা ক্ষমাশীল ও অত্যন্ত দয়ালু।'

আয়াৎ ১৭ : '(জেহাদে যোগ না দিলে) অন্ধের কোন অপরাধ হয় না, আর অপরাধ হয় না খোঁড়ার, আর যে অসুস্থ তারও, কোন অপরাধ নেই: কিন্তু যাঁরা আল্লা ও রছুলের করেন আনুগত্য, আল্লাহ্ তাঁদের ভর্ত্তি করবেন উদ্যানে, যে উদ্যানে প্রবাহিত হচ্ছে নদীসমূহ। আর যে (জেহাদ থেকে) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে আল্লাহ্ তাকে দেন মর্ম্মন্তদ শাস্তি।'

৪৯ : সূরা হুজুরাৎ

আয়াৎ ৬ : 'হে বিশ্বাসী, যদি কোন বদ্‌লোক তোমার কাছে আসে কোন খবর নিয়ে, তার সততা সম্বন্ধে হবে ওয়াকিবহাল, পাছে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তুমি লোকের প্রতি করে বস অবিচার ও পরে যার জন্যে তোমাকে হতে হবে অনুতপ্ত।'

অর্থাৎ সত্য মিথ্যা যাচাই না করে শুধু গুজবে বা বদ্‌লোকের কথায় বিশ্বাস করে কোন কাজ করা উচিত নয়। ঐরূপ করলে প্রায়ই করতে হয় অবিচার ও পরিণামে হতে হয় অনুতপ্ত।

আয়াৎ ৯ : 'দুই দল মুমেন বা বিশ্বাসী যদি লিপ্ত হয় কলহে, উভয় দলের মাঝে তুমি এনে দাও শান্তি, কিন্তু একদল যদি সীমা অতিক্রম করে বসে, তবে সে সীমা লংঘনকারীর বিরুদ্ধে তোমরা সবাই কর লড়াই, যতক্ষণ না সে পালন করে আল্লার হুকুম। যদি সে আল্লার হুকুম পালন করে তবে ন্যায়সঙ্গত ভাবে উভয়ের মাঝখানে প্রতিষ্ঠা করে দাও শান্তি, কারণ যারা ন্যায়বান আল্লাহ্ তাদেরেই ভালবাসেন।'

আয়াৎ ১০ : 'বিশ্বাসীরা একই ভ্রাতৃত্বের অন্তর্গত, কাজেই দুই বিবদমান ভাইয়ের মাঝখানে আপোষ ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করে দাও এবং আল্লাকে কর ভয়, যেন পেতে পার তুমি তাঁর করুণা।'

আয়াৎ ১১ : 'হে বিশ্ববাসীগণ, তোমাদের একদল যেন অন্যদলকে বিদ্রূপ না করে, হ'তে পারে বিদ্রূপকারী দল থেকে অন্যদল শ্রেষ্ঠতর: এক দল মেয়ে লোক যেন অন্যদলকে না করে বিদ্রূপ, হতে পারে যাদের করা হয়েছে বিদ্রূপ তারা বিদ্রূপকারিদের থেকে শ্রেষ্ঠতর। পরস্পর অপমান করোনা ও করোনা ব্যঙ্গ। আর একে অপরকে পীড়াদায়ক ডাক-নামে ডেকোনা,—বিশ্বাসীদের প্রতি কু-নামের আরোপ করা বদ্ স্বভাবেরই পরিচায়ক এবং যারা এই সব থেকে বিরত থাকে না, তারা করে অন্যায়।'

আয়াৎ ১২ : 'হে বিশ্বাসীগণ। যতদূর সম্ভব সন্দেহ করা থেকে বিরত থাক, কারণ কোন কোন ক্ষেত্রে সন্দেহ করাই পাপ। পরস্পরের প্রতি গোয়েন্দাগিরি করোনা, আর করোনা পরস্পরের পেছনে নিন্দা। তোমাদের মধ্যে কেউ কী মৃতভাইয়ের মাংস খেতে চাইবে? না, তোমরা তা করবে ঘৃণা। কিন্তু আল্লাকে কর ভয়, কারণ আল্লাহ্ চির ক্ষমাশীল ও অত্যন্ত দয়ালু।'

উপরের কয়েকটি আয়াতে লোক-ব্যবহারের যে উপদেশ ও নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে তা শুধু সঙ্গত ও শোভন নয়, তা চরিত্রের মাহাত্ম্য ও আত্মমর্য্যাদাজ্ঞাপকও। সু-সভ্য ও মর্য্যাদা সম্পন্ন লোকের যেভাবে আচরণ করা উচিত তারই পথ নির্দ্দেশ করা হয়েছে এই সব আয়াতে। পর নিন্দাকে কী কঠোরভাবেই না করা হয়েছে নিন্দা! পর নিন্দা মানুষের মনকে করে দুর্ব্বল ও কলুষিত ও তা ইন্ধন জোগায় মারাত্মক কলহ ও বিরোধের। তাই তাকে ভ্রাতৃ-মাংস ভক্ষণের মতো ঘৃণ্য বলে অভিহিত করা হয়েছে কোরাণে।

আয়াৎ ১৩ : 'হে মানবজাতি আমরা তোমাদেরে সৃষ্টি করেছি এক জোড়া নর ও নারী থেকেই, তারপর করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীতে পরিণত, যেন তোমরা হতে পার পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত। (অর্থাৎ পরস্পর ঘৃণা করার জন্যে তোমাদের সৃষ্টি করা হয়নি)। সত্যই তোমাদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে সৎকর্ম্মশীল, আল্লার দৃষ্টিতে তিনিই সব চেয়ে সম্মানিত। আল্লার রয়েছে পূর্ণজ্ঞান এবং সব কিছুর সঙ্গেই তিনি সুপরিচিত।'

আয়াৎ ১৫ : 'ঐ সব লোকই বিশ্বাসী যারা আল্লাহ্ ও রসুলে করে বিশ্বাস এবং তার পরে মনে পোষণ করেনি কোন সন্দেহ, বরং আল্লার পথে করেছে সংগ্রাম নিজেদের দেহ ও সর্ব্ব-সম্পদ দিয়ে, এরাই আন্তরিকভাবে সত্যশীল।'

আয়াৎ ১৭ : 'তারা (যারা ইস্লাম কবুল করেছে) তোমাকে (রছুলকে) এমন ভাব দেখায় যেন ইসলাম কবুল করে তারা তোমাকেই অনুগ্রহ করেছে। বল, "তোমাদের ইসলাম গ্রহণ মনে করোনা

আয়াৎ ১৮ : 'সত্যই আল্লাহ্ সৌরমণ্ডল ও বিশ্বজগতের সব গোপন তথ্যই জানেন: তোমরা যত কিছুই কর সবই আল্লার দৃষ্টিগোচর।'

৫০ : সূরা ক্বাফ্

আয়াৎ ৬ : '(অবিশ্বাসীরা) তাদের মাথার উপরকার আকাশের দিকে কি তাকিয়ে দেখে না?---কি ভাবে আমরা তা তৈরী করেছি ও নিখুঁতভাবে করেছি সজ্জিত?'

আয়াৎ ৭ : 'এবং পৃথিবী, যাকে আমরা করেছি বিস্তৃত ও স্থাপন করেছি যার উপর পর্ব্বত সমূহ, যা রয়েছে সুদৃঢ়ভাবে খাড়া এবং তাতে (পৃথিবীতে) করা হয়েছে জোড়ায় জোড়ায় সুন্দর বস্তুর উৎপত্তি;

আয়াৎ ৮ : 'যা (সৃষ্টি করা হয়েছে) তা প্রত্যেক আল্লা-মুখীন ভক্তেরই দর্শণীয় ও স্মরণীয়।'

প্রকৃত ভক্ত কখনো বিশ্ব প্রকৃতি থেকে দূরে, জগৎরহস্যের প্রতি উদাসীন থেকে, কূপমণ্ডুকের জীবন যাপন করতে পারে না। বিশ্ব-প্রকৃতির নানা দৃশ্য ও রহস্যই হয়ে থাকে তাঁর জ্ঞান ও ভক্তির প্রেরণা ও উৎস। জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কহীন ভক্তির গভীরতা ও মূল্যই বা কতটুকু? তাই ইসলাম বার বার জ্ঞানের প্রতি, মানুষের বোধশক্তির প্রতি করেছে আবেদন। জ্ঞান ও বুদ্ধি শক্তির এক বড় উৎস হচ্ছে বিশ্ব-প্রকৃতি, এই বিশ্বপ্রকৃতি থেকে শিক্ষা নিতে কোরাণ বার বারই আহ্বান জানিয়েছে মানুষকে।

আয়াৎ ১৬ : 'আমরাই সৃষ্টি করেছি মানুষকে, এবং তার মনে যেসব কু-মতলবের উদয় হয়, তা আমাদের অজানা নয়; কারণ আমরা রয়েছি তার গর্দ্দানের শিরা থেকেও নিকটে।'

আল্লার সম্বন্ধে এই উক্তিও অত্যন্ত তাৎপর্য্য পূর্ণ।

আয়াৎ ২৯ : 'আল্লাহ্ বলছেন---"আমার কাছে কোন কথার রদবদল নেই এবং আমি আমার বান্দাদের প্রতি ন্যূনতম অবিচারও করি না।"

ইসলামের আল্লাহ্ সুবিচারেরই প্রতীক, তাই ব্যবহারিক জীবনেও ইসলামের এক বড় আদর্শ ইন্সাফ বা ন্যায় বিচার।

আয়াৎ ৩১ : 'স্বর্গকে নিয়ে আসা হবে সৎ-কর্ম্মশীলের নিকটে,- তার কাছে তা থাক্‌বে না দুরের সামগ্রী হয়ে।'

পুণ্যবানকে ছুটতে হবে না স্বর্গে পৌঁছার জন্যে, বরং স্বর্গ-ই নেমে আসবে পুণ্যবানের কাছে। কোরাণের মতে পুণ্যবান অর্থে- সৎ-কর্ম্মশীল। কোরাণের এই উক্তিও, গভীর অর্থপূর্ণ। এই আয়াৎ স্বর্গ নরকের প্রচলিত ধারণাকেই দিচ্ছে বদ্‌লে। সত্যই স্বর্গ দূর আকাশের সপ্তর্ষিমণ্ডলে অবস্থিত এক স্থূল বস্তু বা সীমাবদ্ধ এক ভৌগোলিক অবস্থান, এই কল্পনা অত্যন্ত আদিম ও অবৈজ্ঞানিক।

৫১ : সূরা জারিয়াৎ

আয়াৎ ১৫ : 'সৎকর্ম্মশীলরা বাস করবেন উদ্যান ও ঝর্ণা ধারা পরিবেষ্টিত হয়ে।'

আয়াৎ ১৬ : 'তাঁদের প্রভু যা দিয়েছেন তাতেই পাবেন তাঁরা আনন্দ। কারণ, ইতিপূর্ব্বে তাঁরা যাপন করেছেন সৎ-জীবন।'

ইসলামের মতে সৎ-জীবনই বড় কথা—সজ্জন বা good man হওয়াই বড় আদর্শ। কোরাণ এই সৎ-জীবনের উপর জোর দিয়েছেন বারে বারে। উদ্যান ও ঝর্ণা কোরাণে বার বারই ব্যবহৃত হয়েছে প্রতীক হিসেবে—সুখ শান্তি ও সৌন্দর্য্যের প্রতীক হিসেবে এবং অগ্নি হচ্ছে শাস্তি ও দুঃখের প্রতীক। কোরাণে রূপক ও প্রতীকের ব্যবহার ঘটেছে অজস্রবার, সাধারণ ভাষ্যকার রূপক ও প্রতীককে রূপক ও প্রতীক হিসেবে না নিয়ে শব্দগত স্থূল অর্থে গ্রহণ করেই ভুল করে বসেন। মনে রাখতে হবে প্রায় ধর্ম্মগ্রন্থেই রূপক ও প্রতীকের ব্যবহার একটি সুপ্রচলিত রীতি।

আয়াৎ ১৯ : 'সৎকর্ম্মশীলরা নিজেদের ধনসম্পদের উপর অভাবগ্রস্তের দাবী স্মরণ ও স্বীকার করেন : যে অভাবগ্রস্ত সওয়াল করল আর যে অভাবগ্রস্ত কোন কারণ বশতঃ সওয়াল করা থেকে রইল বিরত, উভয়ের দাবীই সৎকর্ম্মশীলের কাছে পায় স্বীকৃতি।'

অর্থাৎ যে সব ভদ্র ও সম্মানিত লোক দৈব দুর্ব্বিপাকে সম্পদ হারা হয়ে পড়েন অথচ লজ্জা ও সংকোচে প্রকাশ্যে ভিক্ষা করতে পারেন না, সৎকর্ম্মশীল তাদের অভাব মোচনেও হন অগ্রসর।

আয়াৎ ২০ : 'যাদের ধর্ম্মবিশ্বাস সুদৃঢ় তাদের জন্য পৃথিবীতে রয়েছে বহু নিদর্শন।'

আয়াৎ ২১ : 'এবং তোমার নিজের মধ্যেও রয়েছে নিদর্শন: তবুও তুমি কি দৃষ্টিপাত করবে না?'

বিশ্ব প্রকৃতির মতো মানুষের দেহ মনেও রয়েছে কত কলা কৌশল, কত বিচিত্র রহস্য—যাতে তাত্ত্বিক ও জ্ঞানান্বেষীর জন্যে রয়েছে প্রচুর শিক্ষণীয় এবং ভাববার ও চিন্তার খোরাক।

৫২ : সুরা তুর্

আয়াৎ ৩৪ : ‘(যারা কোরাণকে অবিশ্বাস করে ও বলে তা রসুলেরই কল্পিত, তাদের সম্বন্ধে বলা হচ্ছে) যদি তারা সত্যবাদী হয় তাহলে তারা ঐ রকম (অর্থাৎ কোরাণের মত) একটি শ্লোক তৈরী করুক দেখি।’

বলা বাহুল্য, কোরাণের মত শ্লোক বা আয়াৎ কেউ একটিও রচনা করতে সক্ষম হয়নি। যারা প্রতিযোগিতা করেছিল তাদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ প্রয়াসে পরিণত হয়েছে।

আয়াৎ ৩৫ : ‘একেবারে নাস্তি থেকেই কী তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, না তারা নিজেরাই নিজেদের সৃষ্টিকর্তা?’

আয়াৎ ৩৬ : ‘না কি তারাই সৃষ্টি করেছে সৌরমণ্ডল ও পৃথিবী? না, এদের বিশ্বাস বিন্দুমাত্রও দৃঢ় নয়!’

আয়াৎ ২৩ : '(নানা দেব দেবী ও তাদের আরোপিত নাম সম্বন্ধে বলা হচ্ছে) ঐ সব তোমাদের পরিকল্পিত নাম ছাড়া কিছুই নয়, আল্লাহ্ তোমাকে যা করার কোন অধিকার দেননি, তোমরা ও তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা তাই করেছ। তারা নিজেদের অনুমান ও মনোবাসনা ছাড়া আর কিছুরই অনুসরণ করেনা, যদিও তাদের কাছে এসেছে সত্যপথের নির্দ্দেশ অর্থাৎ হেদায়েৎ।'

রসুল কর্ত্তৃক সত্যপথ নির্দ্দেশের পরও পৃথিবীতে এমন লোক বিরল নয় যারা এখনো পূজা করছে নানা পুতুল-প্রতিমার ও নানা দেব-দেবীর এবং সেই সবকে অভিহিত করছে স্বকপোলকল্পিত নানা নামে।

আয়াৎ ২৪ : 'না, মানুষের সব মনোবাসনা কি পূর্ণ হবে?'

অর্থাৎ তা কখনো পূর্ণ হবে না, বরং ভ্রান্ত ও যথেচ্ছ মনোবাসনা মানুষকে নিয়ে যায় ভ্রান্তি ও ধ্বংসের পথে।

আয়াৎ ২৫ : 'কিন্তু আল্লাই হচ্ছেন সব জিনিসের আদি ও অন্তের মালিক।'

আয়াৎ ২৯ : 'যারা আমাদের বাণী থেকে মুখ ফেরায় ও এই পার্থিব জীবন ছাড়া আর কিছুই কামনা করে না, তাদের থেকে দূরে থাক।'

আয়াৎ ৩১ : 'হাঁ, সৌরমণ্ডল ও পৃথিবীর সব কিছুরই মালিক একমাত্র আল্লাহ্, কাজেই যারা কু-কাজ করে তাদেরে তিনি প্রতিফল দেন তাদের কাজ অনুসারেই এবং যারা করে সৎকাজ তাদেরে দেন উত্তম প্রতিদান।'

আয়াৎ ৩২ : 'যারা মহাপাপ ও লজ্জাকর কাজ থেকে বিরত থাকে শুধু ছোট খাটো দোষ-ক্রটীই যাদের ঘটে, (আল্লাহ্ তাদেরে ক্ষমা করেন), সত্যই তোমার প্রভুর ক্ষমায় রয়েছে প্রাচুর্য্য। তিনি তোমাকে খুব উত্তমরূপেই জানেন, যখন তিনি তোমাকে নির্গত করেন ভূমি থেকে এবং যখন তুমি ছিলে মাতৃ-গর্ভে গোপন। (অর্থাৎ সৃষ্টির আদি থেকে, তোমার জন্ম থেকেই তিনি তোমার সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল)। অতএব নিজেকে সমর্থন করার চেষ্টা করো না: তিনি উত্তমরূপেই জানেন কে করে পাপ থেকে আত্মরক্ষা।'

আয়াৎ ৩৮ : 'কোন ভারবাহী-ই অন্যের ভার বহন করতে পারে না।'

অর্থাৎ নিজের পাপপুণ্যের বোঝা নিজেকেই করতে হবে বহন, নিজের কৃতকর্ম্মের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হ'বে একমাত্র নিজেরই কাঁধে। পুত্রকে করা হবেনা পিতার কৃতকর্ম্মের জন্য দায়ী এবং পিতাকেও করা হবে না পুত্রের জন্য দায়ী। স্বামীকে করা হবে না স্ত্রীর জন্য ও স্ত্রীকে করা হবে না স্বামীর জন্য দায়ী।

আয়াৎ ৩৯ : 'মানুষ যা চেষ্টা করে তার বাড়া কিছুই পায় না।'

তক্‌দিরে বিশ্বাস করে অকর্ম্মণ্য নিষ্ক্রিয় জীবন ইসলামে সমর্থন পায়নি। তদ্‌বির করতে হবে, চেষ্টা করতে হবে, জীবন-সংগ্রামে নিজের পরিপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে, তাহলেই আস্‌বে সাফল্য, যাবে পেঁাছানো লক্ষ্যে ও কর্ম্মে হবে সিদ্ধি। ইহাই ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ। ঐসলামিক জীবনবাদ ইহারই উপর প্রতিষ্ঠিত।

আয়াৎ ৪০ : 'চেষ্টার ফল অনতিবিলম্বেই যাবে দেখা;'

আয়াৎ ৪১ : 'তখনই তাকে পুরস্কৃত করা হবে পরিপূর্ণ পুরস্কার দিয়ে;'

আয়াৎ ৪২ : 'তোমার প্রভুই শেষ গন্তব্য স্থল;'

আয়াৎ ৪৩ : 'তিনিই দিয়ে থাকেন হাসি ও অশ্রু;'

আয়াৎ ৪৪ : 'তিনিই দিয়ে থাকেন জীবন ও মৃত্যু;'

আয়াৎ ৪৫ : 'তিনিই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন পুরুষ ও নারী।'

আয়াৎ ৪৮ : 'তিনিই দিয়ে থাকেন সম্পদ ও সন্তোষ।'

আয়াৎ ৬০ : 'তুমি কি শুধু হাস্‌বে, কাঁদবে না?'

আয়াৎ ৬১ : 'অসার কাজে অপব্যয় করবে তোমার সময়?'

আয়াৎ ৬২ : 'আল্লার প্রতি হও প্রণত ও করো তাঁরি উপাসনা।'

আয়াৎ ১৭ : ২২ : ৩২ : ৪০ : 'বুঝবার জন্যে ও স্মরণ রাখার জন্যে আমরা কোরাণকে করেছি সহজ; তাহলে এমন কে আছে যে গ্রহণ করবে না সতর্ক-উপদেশ?'

উপরোক্ত চার আয়াতে একই কথা একই ভাষায় পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। ধর্ম্মগ্রন্থকে পড়ে, বুঝে, মনে রেখে, অনুসরণ করার জন্যে এই যে তাগিদ তা বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য। ধর্ম্মগ্রন্থকে না বুঝে তোতাপাখী-জাতীয় অধ্যয়নের ফল যে নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর তা সহজেই অনুমেয়। না বুঝলে তা মনে রাখা যেমন দুরূহ, তার মর্ম্ম গ্রহণও হয় অসম্ভব, জীবনে পালন ও অনুসরণ ত দূরের কথা। কোরাণ অর্থে এখানে সব অবতীর্ণ ধর্ম্মগ্রন্থ-কেই লক্ষ্য করা হয়েছে এবং সেই প্রসঙ্গে বারবার একই উপদেশের পুনরাবৃত্তি সত্যই অর্থপূর্ণ।

আয়াৎ ৪৭ : 'বস্তুতঃ যারা পাপে লিপ্ত তাদের মন বিক্ষিপ্ত ও তারা উন্মাদ।'

যে কোন মনোবিজ্ঞানীই স্বীকার করবে সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষ, যারা বিবেকবান ও স্থির-বুদ্ধি, তারা সব সময় চলে সত্য ও ন্যায়ের পথে,---যে কোন পাপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তা কোন না কোন বিকৃত-বুদ্ধিরই ফল। আধুনিক Psycho-analysis বিদ্যাও একথা স্বীকার করে। যারা স্থির-চিত্তে ভালমন্দ বিচার করতে পারে না, তাদের ব্যবহারেই ঘটে নানা দোষ ত্রুটী, যার অপর নাম হচ্ছে পাপ।

আয়াৎ ৪৯ : 'সত্যই আমরা সব জিনিস সৃষ্টি করেছি সামঞ্জস্য ও পরিমিতির সঙ্গে।'

বিশ্বসৃষ্টি একটা বিশৃঙ্খল ব্যাপার নয় এবং তা খেয়ালীর খেয়ালীপনাও নয়। প্রত্যেক সৃষ্টির পেছনে রয়েছে নিয়ম, শৃঙ্খলা ও কার্য্য কারণের সম্বন্ধ, আর আছে মিল ও সঙ্গতি।

আয়াৎ ৫৪ : 'সৎকর্ম্মশীলরা বিরাজ করবেন উদ্যান ও নদী পরিবেষ্টিত হয়ে'--

আয়াৎ ৫৫ : 'মহাসত্যের সভায়, সার্ব্বভৌম সর্ব্বশক্তিমানের সামনে (হবে সৎকর্ম্মশীলের স্থান)।'

ইহাই ত ভক্তের চির-কাম্য, সৎকর্ম্মশীল ভক্ত পাবেন এই চিরকাম্যধাম।

৫৫ : সূরা রহমান

আয়াৎ ৯ : 'প্রতিষ্ঠা করো ন্যায় সঙ্গত ওজন ও নিক্তিতে যেন না পড়ে কম্‌তি।'

ওজন ও পরিমাণ সম্বন্ধে কোরাণে বার বারই দেওয়া হয়েছে তাগিদ। আদান-প্রদানের সময় খাঁটি ও ন্যায়সঙ্গত ওজন ও পরিমাপের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে অত্যন্ত কঠোর ভাষায়।

আয়াৎ ১৩ : পূর্ব্ববর্ত্তী আয়াৎগুলিতে পৃথিবীতে আল্লার বহুবিধ সৃষ্টির কথা বলে, এই আয়াতে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে—'তা'হলে আল্লার কোন্ অনুগ্রহ তুমি অস্বীকার করবে?'

এই সুরায় ৩১ বার এই প্রশ্নের করা হয়েছে পুনরাবৃত্তি। এই প্রশ্নের তাৎপর্য্য, আল্লার কোন অনুগ্রহই মানুষ অস্বীকার করতে পারে না। এই পৃথিবীতে আল্লাহ্ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সবেরই প্রয়োজন হয় মানুষের কোন না কোন কাজে। অর্থাৎ আল্লার কোন সৃষ্টিই ব্যর্থ বা অকারণ নয়।

আয়াৎ ৬০ : 'ভাল'র পুরস্কার ভাল ছাড়া আর কী হতে পারে?'

অর্থাৎ সব রকম সু-কাজের প্রতিফল হবে সু, সু'র পরিবর্ত্তে কখনো হবে না কু। এইভাবে কোরাণ বার বার নির্দ্দেশ দিচ্ছে সৎকর্ম্মের ও প্রেরণা দিচ্ছে সৎ-জীবনের।

আয়াৎ ৬০ : 'আমরা মৃত্যুকে তোমাদের সকলের সাধারণ নিয়তিরূপেই করেছি নির্দিষ্ট। আমাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করা যাবে না।'

আয়াৎ ৬১ : 'তোমাদের আকার হবে পরিবর্ত্তিত, তোমাদের অজ্ঞাত অবয়বেই তোমাদের করা হবে পুনঃসৃষ্টি।'

মৃত্যু সকলের পক্ষেই অনিবার্য্য। বড়-ছোট সাদা কালো কেউ-ই এড়াতে পারবে না মৃত্যুর হাত। মানুষের জাগতিক দেহ নশ্বর, পঞ্চভূতেরই তৈরী, মৃত্যুর পর তা পঞ্চভূতেই যাবে মিশে। কিন্তু মানুষের আত্মা অবিনশ্বর। জাগতিক দেহের পুনরুত্থান কোরাণের বক্তব্য নয়। বিদেহী মানবাত্মা জ্ঞানময় ও চিন্ময়—যা আধুনিক বিজ্ঞানও স্বীকার করে এবং আধুনিক বিজ্ঞান এও স্বীকার করে কোন কিছুই একেবারে সমূলে বিনাশ পায়না, সব জিনিসেরই শুধু ঘটে রূপান্তর। আধুনিক Spiritualism বা প্রেততত্ত্বও এই মতেরই করে সমর্থন। তাই আত্মার পুনরুত্থান কিছুমাত্র অবৈজ্ঞানিক বা অসম্ভব ব্যাপার নয়।

আয়াৎ ৬৩ : 'তুমি ভূমিতে যে বীজ বপন কর তা ত দেখ?'

আয়াৎ ৬৪ : 'তার অঙ্কুরিত হওয়ার কারণ কি তুমি, না আমরা?'

আয়াৎ ৬৮ : 'তুমি যে জল পান কর তার প্রতি কি তাকিয়ে দেখ?'

আয়াৎ ৬৯ : 'তা মেঘলোক থেকে কে বর্ষণ করে তুমি, না আমরা?'

আয়াৎ ৭০ : 'যদি আমাদের ইচ্ছা হ'ত তাহ'লে আমরা তা করতে পারতাম বিস্বাদ ও লবণাক্ত: তবুও তুমি কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করনা?'

আয়াৎ ৭১ : 'তোমরা যে আগুন জ্বাল তার প্রতি কি তাকিয়ে দেখ?'

আয়াৎ ৭২ : 'অগ্নিকে যে-বৃক্ষ যোগায় ইন্ধন, তা কে উৎপাদন করে? তোমরা, না আমরা?'

আয়াৎ ৮৮ : 'যদি তিনি (অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি) হন আল্লার নিকটতমদের একজন;'

আয়াৎ ৮৯ : 'তাঁর জন্যে সেখানে (অর্থাৎ পরলোকে) থাক্‌বে বিশ্রাম, সন্তোষ ও আনন্দ-বাগ।'

আয়াৎ ৯০ : 'এবং তিনি যদি হন ডানহাতের সঙ্গী অর্থাৎ সৎকর্ম্মশীলদের একজন;'

আয়াৎ ৯১ : 'তাঁর জন্যে ডান হাতের সঙ্গীদের অর্থাৎ সৎকর্ম্মশীলদের কাছ থেকে আসবে এই অভিবাদন---'তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।'

আয়াৎ ৯২ : 'কিন্তু সে যদি হয় ঐ সব লোকের একজন যারা সত্যকে ব্যবহার করে মিথ্যার মতো ও চলে ভ্রান্ত পথে;'---

আয়াৎ ৯৩ : 'তাকে পরিবেশন করা হবে উত্তপ্ত ও ফুটন্ত পানি;'

আয়াৎ ৯৪ : 'এবং সে জ্বলবে দোজখের আগুনে।'

আয়াৎ ৯৫ : 'কাজেই যিনি সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বাধিনায়ক তোমার সেই প্রভুর গুণকীর্ত্তন করো।'

৫৭ঃ সুরা হাদিদ্

আয়াৎ ৭ : 'আল্লাহ্ ও তাঁর রছুলে কর বিশ্বাস এবং আল্লাহ তোমাকে যে সম্পদের করেছেন উত্তরাধিকারী তার থেকে কর খরচ অর্থাৎ দান কর, কারণ তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস ও দান করে তাদের জন্য রয়েছে মহৎ পুরস্কার।'

আয়াৎ ৯ : 'একমাত্র তিনি অর্থাৎ আল্লা-ই পাঠিয়ে থাকেন তাঁর বান্দাদের কাছে পরিষ্কার নিদর্শন, এবং তিনিই গভীর অন্ধকার থেকে তোমাদের পরিচালিত করতে পারেন আলোর দিকে। সত্যই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ও করুণাময়।'

আয়াৎ ১০ : 'কী কারণ আছে যে তুমি আল্লার পথে খরচ করবে না? সৌরমণ্ডল ও বিশ্বজগতের সব সম্পদের-ই মালিক ত আল্লাহ্। তোমাদের মধ্যে যারা জয়লাভের পূর্ব্বে মুক্ত হস্তে খরচ করেছে ও করেছে লড়াই, তারা কখনো যারা ঐসব কাজ পরে করেছে তাদের সমান নয়। যারা জয়লাভের পরে করেছে মুক্ত হস্তে খরচ ও করেছে লড়াই তাদের থেকে পূর্ব্ববর্ত্তীরাই উচ্চ পদের অধিকারী। কিন্তু সকলকেই আল্লাহ্ উত্তম পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তোমরা যা কিছুই কর, আল্লাহ্ তার সম্বন্ধে উত্তমরূপেই ওয়াকিবহাল।'

জয় সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হয়ে কোন বিষয়ে ত্যাগ ও সংগ্রাম করা সহজ, সকলেই তার জন্যে হয় উৎসুক, কিন্তু অনিশ্চিত জয়ের জন্য, সফলতার কোন আভাসই দেখা যায়নি যেখানে এখনো, সেই রকম সময়, সংগ্রামের গোড়াতেই যারা জানমাল দিয়ে সংগ্রামে হয় লিপ্ত তাদের ত্যাগের মূল্য নিশ্চয়ই বেশী—তারা তুলনায় নিশ্চয়ই উচ্চতর পদের অধিকারী। নিজেদের মতামত ও আদর্শবাদের প্রতি তাদের যে নিষ্ঠা ও দৃঢ় অনুরাগ তা সন্দেহাতীত।

আয়াৎ ১১ : 'কে এমন আছে আল্লাকে দেবে এক মনোরম কর্জ্জ? কারণ, আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তির হিসাবে তা করবেন বহুগুণিত এবং এ ছাড়াও আল্লাহ্ তাকে দেবেন উদার পুরস্কার।'

আয়াৎ ১৩ : 'একদিন মুনাফেক্ (অর্থাৎ প্রবঞ্চক) নর-নারীরা বিশ্বাসীদের বল্‌বে—'আমাদের জন্যে অপেক্ষা কর, তোমাদের আলো থেকে আমাদের কিছু আলো দাও ধার।' তখন বলা হবে—"তোমাদের পেছনের দিকে ফের, তারপর কর আলোর সন্ধান।" তখন উভয়ের মাঝখানে স্থাপিত হবে এক প্রাচীর, যাতে থাক্‌বে এক দরজা, তার অভ্যন্তরে সর্ব্বত্র বিরাজ করবে রহমত বা করুণা এবং বাইরে থাক্‌বে আজাব বা শাস্তি।'

অর্থাৎ স্ব স্ব কৃতকর্ম্মই মানুষকে পাপী ও পুণ্যবান এই দুই ভাগে করবে বিভক্ত। উভয়ের মাঝখানে যোগসূত্রের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এই জন্যে যে পাপীরা যেন উপলব্ধি করতে পারে আল্লার রহমত ও করুণা তাদের নাগালের বাইরে নয় এবং তাদের বর্ত্তমান অবস্থা তাদের কু-কর্ম্মেরই পরিণাম।

আয়াৎ ১৮ : 'যে সব নর ও নারী দান করেন এবং এইভাবে আল্লাকে দেন মনোরম কর্জ্জ, অর্থাৎ কর্জ্জে-ই হাসানা—তাঁদের নামে তা হবে বহুগুণে বর্দ্ধিত, এ ছাড়াও তাঁরা পাবেন উদার পুরস্কার।'

আয়াৎ ২০ : 'তোমরা সকলেই জেনে রাখো—এই পৃথিবীর জীবন খেলাধূলা আমোদ-প্রমোদ ছাড়া কিছুই নয়; আড়ম্বর, পারস্পরিক দম্ভ, স্ফীতধন ও সন্তান-সন্ততি নিয়ে নিজেদের মধ্যে নিছক প্রতিযোগিতা—! এখানে দেওয়া হচ্ছে এক রূপক: কী ভাবে বৃষ্টির ফলে উৎপন্ন ফসলের দৃশ্য চাষীর মনে জাগায় আনন্দ, কিন্তু অনতিবিলম্বে তা যায় শুকিয়ে, তুমি দেখ্‌বে তা হল্‌দে হয়ে উঠেছে, তারপর শুকিয়ে ঝরে পড়ছে। অন্যায়কারীদের জন্যে পরলোকে রয়েছে কঠোর শাস্তি। এবং আল্লাহ্-ভক্তদের জন্য রয়েছে আল্লার ক্ষমা ও তাঁর শত সন্তুষ্টি। এই পৃথিবীর জীবন শুধু প্রতারণার মালমাত্তা আর সম্পত্তি ছাড়া আর কি?"

আয়াৎ ২১ : 'তোমার প্রভুর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতে তুমি হও সব চেয়ে অগ্রগামী, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলগণে করে বিশ্বাস তাদের জন্য রচিত হয়েছে এক আনন্দ-বাগ, যার বিস্তৃতি আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তারের সমতুল্য: ইহাই আল্লার দান, যাকে খুশী তাকে তিনি ইহা দিয়ে থাকেন এবং আল্লাহ্ হচ্ছেন অপরিসীম দানের মালিক।'

আয়তনিক ও সীমাবদ্ধ স্বর্গের ধারণা এই আয়াতেও অস্বীকার করা হচ্ছে। পূর্ণ আনন্দ ও তৃপ্তির কোন সীমা সরহদ্ নেই, তাকে কোন রকম সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতেই আবদ্ধ করা যায় না। তা একাধারে অসীম ও অনন্ত। পরিপূর্ণ আত্মতৃপ্তির অনির্ব্বচনীয় ভূমানন্দের কী কোন ভৌগোলিক অবস্থান হতে পারে? তাই সেই ভূমানন্দকে এখানে মানুষ সব চেয়ে যে বিরাট বস্তুর কল্পনা করতে পারে অর্থাৎ আকাশ ও বিশ্বজগৎ, একমাত্র তার সঙ্গেই করা হয়েছে তুলনা।'

আয়াৎ ২৯ : 'গ্রন্থ-প্রাপ্ত জাতি যেন জেনে রাখে আল্লার বদান্যতার উপর তাদের কোন রকম দাবী বা অধিকার নেই, তাঁর বদান্যতা সম্পূর্ণরূপে তাঁরই হাতে---যার উপর ইচ্ছা তিনি তা বর্ষণ করেন। আল্লাহ্ অপরিসীম বদান্যতার মালিক।'

শুধু গ্রন্থপ্রাপ্ত জাতি হলেই রেহাই নেই, ঈমানদার বা বিশ্বাসী হতে হবে আর করতে হবে আমল বা সৎকর্ম্ম। তখন-ই তার উপর বর্ষিত হবে আল্লার বদান্যতা বা করুণা।

৫৮ : সূরা মুজা' দলা

আয়াৎ ২ : 'তোমাদের মধ্যে কেউ যদি স্ত্রীকে মা ডেকে তালাক দেয় (অতি প্রাচীন ও পৌত্তলিক আরবদের একটি প্রথা) তারা কখনো তাদের মা হবে না। যারা তাদেরে প্রসব করেছে তারা ছাড়া কেউ-ই মা হতে পারে না। বাস্তবিক তারা ব্যবহার করে এমন সব কথা যা একাধারে মিথ্যা ও অন্যায়। বস্তুত: একমাত্র আল্লা-ই উৎপাটিত করেন পাপ এবং ক্ষমা করেন বার বার।'

আয়াৎ ৭ : 'তুমি কি দেখনা, আল্লাহ সৌরমণ্ডলে ও বিশ্বজগতে যা কিছু আছে সবই জানেন? তিনজনে মিলে কোন গোপন পরামর্শ চল্‌তে পারে না, তার মাঝখানে তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ) হন চতুর্থ; পাঁচজনের মধ্যেও চলে না, তিনি হন ষষ্ঠ,—যেখানেই হউক, এর থেকে কম বা বেশীর মধ্যে হলেও তিনি থাকেন তাদের মাঝখানে। বিচারের দিন, শেষকালে—তিনি তাদের দেখেন, তারা যা করেছে তার সত্য বর্ণনা। কারণ একমাত্র আল্লারই রয়েছে সব কিছুর পুর্ণ জ্ঞান।'

আয়াৎ ৯ : 'হে বিশ্বাসীগণ, যখন কোন গোপন পরামর্শ কর, তা করোনা কোন অন্যায় বা শত্রুতা সাধনের উদ্দেশ্যে বা রসুলের বিরোধিতা করার জন্য, কিন্তু তা কর সৎকর্ম্ম ও আত্মদমনের জন্যে। আল্লাকে কর ভয়—তার কাছে তোমাকে ফিরিয়ে আনা হবে।'

আয়াৎ ১০ : 'শয়তানই শুধু দিয়ে থাকে গোপন মন্ত্রণার প্রেরণা, যেন সে বিশ্বাসীদের দিতে পারে খুব দু:খ যন্ত্রণা; কিন্তু আল্লার যতটুকু হুকুম তার বেশী এতটুকু ক্ষতিও সে করতে পারে না;—বিশ্বাসীরা যেন আল্লার উপর ন্যস্ত করেন নিজেদের আশা ভরসা।'

আয়াৎ ১১ : 'হে বিশ্বাসীগণ, সভাসমিতিতে যখন তোমাদের বলা হয় আসন ছেড়ে দেওয়ার জন্য, তখন সরে পড়ে জায়গা করে

দাও, আল্লাহ তোমাদের জন্য যথেষ্ট জায়গার ব্যবস্থা করবেন। যখন তোমাদের বলা হয় উঠে দাঁড়াবার জন্য (কোন সম্মানিতের সম্মানার্থে), দাঁড়িয়ে পড়ঃ তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী ও যাদের দেওয়া হয়েছে জ্ঞান, আল্লাহ তাদের উন্নীত করবেন যথাযোগ্য পদে। তোমরা যা কিছু কর তা সবই আল্লার কাছে সুপরিচিত।'

সভা-সমিতিতে কী ভাবে ব্যবহার করতে হবে ও সম্মানিত ব্যক্তিদের কীভাবে দিতে হবে সম্মান তারই এক সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে এই আয়াতে।

আয়াৎ ২০ঃ 'যারা আল্লাহ ও তার রসুলের করে বিরোধিতা, তারা স্থান পাবে যারা সবচেয়ে অপমাণিত তাদের দলে।'

আয়াৎ ২২ ঃ 'তুমি দেখ্‌বেনা এমন কোন জাতিকে যারা আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাস করে অথচ ভালবাসে এমন লোককে যারা আল্লাহ ও রসুলের বিরোধী, যদিও সেই সব লোক হয় তাদের পিতা কি পুত্র অথবা ভাই কি আত্মীয়। এই ভাবে তিনি তাদের অন্তর-লোকে অঙ্কিত করে দিয়েছেন বিশ্বাস এবং নিজের রুহানী বা আত্মিক শক্তি দিয়ে তাদের মন করেছেন দৃঢ়। এবং চিরকাল ধরে বাস করবার জন্যে তিনি এদের প্রবেশ করাবেন এমন এক উদ্যানে যার নীচে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে বহু নদ-নদী। আল্লাহ্ তাদের উপর হবেন খুশী, তারাও হবে আল্লার উপর খুশী। তারাই আল্লার দলভুক্ত। সত্যই আল্লার দলই হাসিল করবে আনন্দ।'

৫৯ : সুরা হাশর

আয়াৎ ১৮ : 'হে বিশ্বাসীগণ, আল্লাকে ভয় কর এবং প্রতি আত্মা যেন কালকের জন্য কী আগাম পাঠিয়েছে তা পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে। আল্লাকে ভয় কর, কারণ তুমি যা কিছু কর সবই আল্লার জানা।'

ভয় ও ভালবাসার মাঝখানে যে ভেদ-রেখা তা অতি সূক্ষ্ম। যাকে আমরা সত্যিকারভাবে ভালবাসি তার অপ্রিয় কিছু করতে স্বতঃই আমরা বিরত হই। কিছুতেই তার মনোকষ্টের কারণ আমরা হতে চাই না। আল্লার যে ভয় তারও উৎসমূল গভীরতম ভালবাসা। আমাদের পরম প্রিয়জনের গুণরাজি আমরা আয়ত্ত করতে চাই, অনুকরণ ও অনুসরণ করতে চাই,---এই ভাবে তার প্রীতি ও ভালবাসার যোগ্য হওয়ার চেষ্টা আমরা করি। আল্লার গুণে গুণান্বিত হওয়া---যা ভক্তের এক পরম লক্ষ্য তাও আয়ত্ত হতে পারে এইভাবে। আল্লার অপ্রিয় হওয়ার বা অপ্রিয় কাজ করার ভয় যদি মনে পোষণ করা না হয়, তা হলে তাঁর প্রিয় কাজও সুষ্ঠুভাবে, নির্খুঁতভাবে করা হবে না। তাই ভক্তির পথে ভয়ের স্থান এক বিশেষ অর্থপূর্ণ।

আয়াৎ ১৯ : 'যারা আল্লাকে ভুলে গেছে তুমি তাদের মতো হয়ো না; তিনি অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদের এমন করেছেন যে তারা নিজের আত্মাকেই গেছে ভুলে। এরকম যারা, তারাই হচ্ছে অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী।'

আয়াৎ ২০ : 'অগ্নির সাথীরা আর উদ্যানের সাথীরা কখনো সমতুল্য নয়ঃ উদ্যানের বাসিন্দারাই হাসিল করবে আনন্দ।'

আয়াৎ ২২ : 'তিনিই আল্লাহ্, যিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই,---যিনি প্রকাশ্য ও গুপ্ত সব বস্তুর রাখেন জ্ঞান; তিনি সব চেয়ে বদান্য ও সব চেয়ে দয়ালু।'

আয়াৎ ২৩ : 'তিনিই আল্লাহ্ যিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, যিনি সর্ব্বপ্রধান ও পবিত্র, যিনি শান্তি ও পূর্ণতার মূল, ধর্ম্ম ও নিরাপত্তার রক্ষক, সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী, অপ্রতিহত ও সর্ব্বপ্রধান: আল্লারই মহিমা: অবিশ্বাসীরা তাঁর প্রতি যে সব অংশীদার যুক্ত করে তিনি সে সবের উর্দ্ধে।'

আয়াৎ ২৪ : 'তিনিই আল্লাহ্—স্রষ্টিকর্তা, প্রকাশক, আকার ও অবয়ব ছাড়া। সবচেয়ে মনোজ্ঞ নাম সমূহের তিনি মালিক: আকাশ-মণ্ডল ও বিশ্বজগতে যা কিছু আছে সবই তাঁর প্রশংসা ও গৌরবকীর্ত্তন করে: তিনি সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ও জ্ঞানময়।'

আয়াৎ ৩ : 'শেষ বিচারের দিন তোমার আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততি কোন উপকারেই আস্‌বে না: তিনি তোমাদের প্রত্যেকের বিচার করবেন: কারণ তোমরা যা কিছুই কর সবই আল্লাহ্‌ দেখ্‌তে পান।'

আয়াৎ ৮ : 'যারা তোমাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের জন্য তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে না বা গৃহ থেকে তোমাদের বিতাড়িত করে না তাদের সঙ্গে সদয় ও ন্যায় বিচার আল্লাহ্‌ নিষেধ করেন নি; কারণ যারা ন্যায়বান আল্লাহ্‌ তাদের ভালবাসেন।

আয়াৎ ৯ : 'আল্লাহ্‌ শুধু নিষেধ করেছেন নিরাপত্তা ও বন্ধুত্বের জন্য ঐ সব লোকের প্রতি হস্ত প্রসারিত করতে যারা তোমাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের জন্যে তোমাদের সঙ্গে করে যুদ্ধ, গৃহ থেকে তোমাদের করে বিতাড়িত ও অন্যকে সাহায্য করে তোমাদের বিতাড়িত করতে। এই করা মানে জালেমের দিকে ফেরা অর্থাৎ অত্যাচারী জালেমের সাহায্য প্রার্থনা করা।'

আয়াৎ ১০ : 'হে বিশ্বাসীগণ, যদি তোমাদের কাছে কোন বিশ্বাসী (মু'মেন) আশ্রয়-প্রার্থিনী আসে, তাদেরে পরীক্ষা করে দেখ: তাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাস একমাত্র আল্লারই উত্তমরূপে জানা আছে: যদি তারা বিশ্বাসী প্রমাণিত হয় তাদেরে আর অবিশ্বাসীদের কাছে ফেরত পাঠিও না। তারা অবিশ্বাসীদের ন্যায়সঙ্গত স্ত্রী নয়,—অবিশ্বাসীরাও তাদের ন্যায়সঙ্গত স্বামী নয়। কিন্তু অবিশ্বাসীরা ওদের জন্যে যা (যৌতুক বা অন্য কারণে) খরচ করেছে তা দিয়ে দাও। তাদের প্রাপ্য যৌতুক আদায় করার পর তাদেরে তোমরা বিয়ে করলে কোন অন্যায় করা হয় না। কিন্তু অবিশ্বাসী মেয়েদের অভিভাবকত্ব আক্‌ড়ে থেকো না, ওদের জন্যে তোমরা যা যৌতুক হিসাবে খরচ করেছ তাই শুধু দাবী করতে

পার এবং অবিশ্বাসীরাও যা কিছু খরচ করেছে (যে সব বিশ্বাসী মেয়ে তোমাদের কাছে চলে এসেছে তাদের জন্য) তা দাবী করতে পারে। ইহাই আল্লার হুকুম; তিনি ন্যায়পরতার সঙ্গেই তোমাদের পরস্পরের বিচার করে থাকেন। আল্লাহ্ পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী।

ইসলামের সূচনায় এরকম বহু ঘটনাই ঘটেছিল। মুসলমানের হয়ত ছিল কাফের স্ত্রী, আবার মুসলমান স্ত্রীর হয়ত ছিল কাফের স্বামী। তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয় বা সম্বন্ধচ্ছেদের নির্দ্দিষ্ট নির্দ্দেশ না দেওয়া হলে বহু লোকের পারিবারিক জীবনে সৃষ্টি হ'ত এক দুর্ব্বিসহ পরিস্থিতির। একটি নিরপেক্ষ ও ন্যায়সঙ্গত নীতির সাহায্যেই করা হয়েছে এই সমস্যার সমাধান।

আয়াৎ ১২ঃ 'হে নবী যখন বিশ্বাসী মেয়েরা তোমার কাছে তোমার প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতে আসে তখন তারা যেন এই শপথ গ্রহণ করে যে, তারা আল্লার সঙ্গে অন্য কিছুকেই শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তাদের পুত্রকন্যাকে হত্যা করবে না, নিন্দা করবে না, ইচ্ছা করে মিথ্যার আশ্রয় নেবে না এবং কোন রকম ন্যায় কাজে তোমার বিরুদ্ধতা করবে না;---তাহলেই তুমি তাদের বিশ্বস্ততার শপথ বা বায়েৎ কবুল করবে এবং আল্লার কাছে প্রার্থনা করবে তাদের পাপের মাফ-ইর জন্য, কারণ আল্লাহ্ চিরক্ষমাশীল ও অত্যন্ত দয়ালু।

প্রাচীন আরব সমাজে বহু ব্যাপক ও বহুল প্রচলিত কয়েকটি পাপের উল্লেখ এখানে করা হয়েছে এবং মুমেনদের প্রতি প্রাথমিক শর্ত্ত আরোপ করা হচ্ছে এই সব পাপ থেকে দূরে থাকার শপথ গ্রহণ। ইসলামের সামাজিক সংস্কারকের ভূমিকা ও তার সাফল্যের কথা সর্ব্বজনবিদিত। ইসলামের পয়গাম্বর কোনদিন পাপ ও কুসংস্কারের সঙ্গে আপোষ করেননি। পাপের সঙ্গে কোন রকম আপোষ করে বা অন্যায়ের এতটুকু প্রশ্রয় দিয়ে ইসলাম প্রচারিত হয়নি। এবং এটাও লক্ষ্যযোগ্য শর্ত্তাবলীর একটি হচ্ছে---'ন্যায় কাজে তোমার বিরুদ্ধতা করবে না।' ন্যায়-অন্যায় নির্ব্বিচারে অন্ধভক্তি বা আনুগত্যের প্রশ্রয়ও ইসলাম দেয়নি। ব্যক্তিত্ব ও মানবস্বভাবের মর্য্যাদা ইসলামে এইভাবে পদে পদে পেয়েছে স্বীকৃতি।

৬১ : সুরা সফ্ফে

আয়াৎ ২ : 'হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা যা কাজে পরিণত করবে না তা মুখে কেন বল?'

আয়াৎ ৩ : 'তোমরা যা পালন কর না, তা বলা আল্লার কাছে অত্যন্ত ঘৃণার্হ ও পীড়াদায়ক।'

আয়াৎ ৪ : 'সত্যই আল্লাহ্ ঐসব লোককে ভালবাসেন যারা আল্লার কারণে সুদৃঢ়ভাবে বুহ্য-বদ্ধ হয়ে লড়াই করে।'

আয়াৎ ৭ : 'আল্লার বিরুদ্ধে যে মিথ্যার অবতারণা করে, তার চেয়ে বড় অন্যায়কারী আর কে? যদিও সে আহুত হয়েছে ইসলামে। এবং যারা অন্যায় করে আল্লাহ্ তাদেরে পরিচালিত করেন না সত্য পথে।'

আয়াৎ ৮ : 'তাদের অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের ইচ্ছা তাদের মুখের ফুঁ দিয়েই তারা আল্লার নূরকে দেবে নিভিয়ে কিন্তু আল্লাহ্ তার নূরকে করবেন সম্পূর্ণ, এমন কি অবিশ্বাসীরা তা অপছন্দ করলেও।'

আয়াৎ ১১ : 'আল্লাহ্ ও তার রসুলে বিশ্বাস কর এবং তোমার জানমাল দিয়ে আল্লার রাস্তার কর জেহাদঃ ইহাই তোমার জন্যে সর্ব্বোত্তম, যদি তোমরা তা জানতে।'

৬২ : সুরা জুমুয়াহ্

আয়াৎ ৮ : 'বল, "যে মৃত্যু থেকে তোমরা পলায়ন কর, সেই মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই: তখন তোমরা প্রেরিত হবে যিনি গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু জানেন তাঁরই কাছে এবং তিনি তোমরা যা করেছ, তা তোমাদের কাছে করবেন বয়ান।"

আয়াৎ ৯ : 'হে বিশ্বাসীগণ, শুক্রবারে যখন নমাজের জন্যে আহ্বান জানানো হয় অর্থাৎ আজান দেওয়া হয়, তখন আল্লাকে স্মরণ করার জন্যে ক্ষিপ্র গতিতে ধাবিত হও এবং ত্যাগ কর সব রকম বৈষয়িক কাজ, ইহাই তোমার জন্য সর্ব্বোত্তম, যদি তোমরা তা জানতে।'

আয়াৎ ১০ : 'যখন নমাজ খতম হয় তখন তোমরা ছড়িয়ে পড়ো দেশের সর্ব্বত্র এবং আল্লার বদান্যতার করো অন্বেষণ: অনুক্ষণ আল্লার প্রশংসা কীর্ত্তন করো, যেন হয় তোমাদের সমৃদ্ধি।'

৬৩ : সুরা মুনাফেকুন

আয়াৎ ২ : 'মুনাফেকদের শপথ তাদের কু-কর্ম্মেরই আবরণ: এই ভাবে তারা মানুষকে আল্লার পথে দেয় বাধা : সত্যই তারা যা করে তা হচ্ছে কু-কাজ।'

আয়াৎ ৯ : '(হে বিশ্বাসীগণ) তোমার ধন দৌলত বা সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে আল্লার জিকির থেকে বিচ্যুত না করে। যদি কেউ এরকম করে অর্থাৎ আল্লার পথ থেকে যায় বিপথে, তবে সে ক্ষতি করে নিজেরই।'

৬৪ : সূরা তগাবুন

আয়াৎ ৫ : 'অতীতে যারা ধর্মকে অস্বীকার করেছে তাদের কাহিনী কি তোমার কাছে পৌঁছেনি? তারা আস্বাদ করেছে তাদের কাজেরই কুফল এবং তারা পেয়েছে কঠোরতম শাস্তি।'

আয়াৎ ৬ : 'তার কারণ, তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিলেন নবীগণ, কিন্তু তারা বলেছেঃ "মানুষ দেবে আমাদেরে নির্দেশ?" সুতরাং তারা আল্লার বাণীকে করেছে অস্বীকার ও আল্লার পথ থেকে গেছে ফিরে। কিন্তু তাদের বাদ দিয়েও আল্লার চলেঃ আল্লাহ্ সব অভাব থেকেই মুক্ত এবং সমস্ত প্রশংসারই যোগ্য।'

আয়াৎ ৮ : 'আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলে বিশ্বাস করো এবং বিশ্বাস করো যে নূর বা আলো আমরা অবতীর্ণ করেছি তাতে। তোমরা যাই করো সবের সঙ্গে আল্লাহ্ সুপরিচিত।'

নূর অর্থে আল্লার বাণী বা জ্ঞানের আলো, বিবেকবুদ্ধির আলো।

আয়াৎ ১১ : 'আল্লার হুকুম ছাড়া কোন বিপদই ঘট্‌তে পারে না এবং যদি কেউ আল্লায় বিশ্বাস ন্যস্ত করে, আল্লাহ্ তার অন্তরকে পরিচালিত করেন সত্যের পথেঃ কারণ আল্লাহ্ হচ্ছেন সর্ব্বজ্ঞ।'

আয়াৎ ১৫ : 'তোমার ধন দৌলত ও তোমার সন্তান-সন্ততি তোমার পরীক্ষার জন্যও হ'তে পারে। কিন্তু আল্লার সান্নিধ্যই সর্ব্বোত্তম পুরস্কার।'

আয়াৎ ১৬ : 'সুতরাং যতদূর সম্ভব আল্লাকে ভয় করো, (আল্লার আদেশ) শোনো ও পালন করো এবং নিজের আত্মার কল্যাণার্থে খরচ করো দাতব্য কাজে, মনের লোভ মোহ থেকে যারা আত্মরক্ষা করে তারাই অর্জ্জন করে সাফল্য ও সমৃদ্ধি।'

৬৫ : সূরা তালাক

আয়াত ৭ : 'সম্পদশালী লোকেরা যেন নিজের সম্পদের অনুরূপ খরচ করে এবং যার সামর্থ্য সীমাবদ্ধ সে যেন আল্লাহ তাকে যে রকম দিয়েছেন সেই অনুপাতেই করে খরচ। আল্লাহ্ নিজে যা দিয়েছেন তার অতিরিক্ত বোঝা কারো উপর তিনি চাপান না। বিপদের পর আল্লা-ই করবেন বিপদ-মুক্ত।'

৬৬ঃ সুরা তাহরিম্

আয়াৎ ৮ : 'হে বিশ্বাসীগণ! আন্তরিক অনুতাপের সঙ্গে আল্লার প্রতি মনোযোগী হওঃ এই আশায় যে, আল্লাহ তোমার পাপ বিদূরীত করবেন। তোমাকে প্রবেশ করাবেন উদ্যানে, যে-উদ্যানে প্রবাহিত হচ্ছে নদী-সমূহ।—কেয়ামতের দিন আল্লাহ নবী ও তাঁর সঙ্গে যাঁরা বিশ্বাস এনেছেন তাঁদেরে কখনো লাঞ্ছিত হতে দেবেন না। তাঁদের আলো তাঁদের সামনে ও ডানে ছুটে এগিয়ে যাবে এবং তাঁরা বলতে থাকবেন---'হে আমাদের প্রভু! আমাদের আলো আমাদের জন্য সম্পূর্ণ করো এবং আমাদের জন্য মঞ্জুর করো ক্ষমা। তোমার আছে সব কিছুর উপর ক্ষমতা।''

অর্থাৎ পুণ্যবানের কাছ থেকে বিদূরীত হবে পাপ ও অজ্ঞতার অন্ধকার এবং তাঁর চারদিকে ঝলসে উঠবে আল্লার নূর।

৬৭ঃ সূরা মুল্‌ক্‌

আয়াৎ ৩ : 'যে আল্লাহ্ একটির পর একটি সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করেছেন; সেই মহাদয়াবান আল্লার সৃষ্টিতে তুমি কোন অসামঞ্জস্যই দেখ্‌তে পাবেনা। পুনরায় দৃষ্টিক্ষেপ করো ঃ কোন খুঁৎ দেখ্‌তে পাও কি?'

আয়াৎ ৪ : 'দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত করো ঃ তোমার দৃষ্টি নিস্তেজ ও পরাস্ত হয়ে ক্লান্ত অবস্থায় তোমার কাছে ফিরে আস্‌বে।'

আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে আজ কারো জান্‌তে বাকি নেই যে, বিশ্বসৃষ্টি এত বিরাট ও এত ব্যাপক যে তার সম্বন্ধে কোন রকম ধারণা করাই এক রকম অসম্ভব। বাংলা ভাষায় রচিত রবীন্দ্র-নাথের 'বিশ্ব-পরিচয়' ও স্যার জর্জ্জ জিম্‌সের Mysterious Universe-এর অনুবাদ 'বিশ্বরহস্য' পাঠ করলেও এই কোরাণিক উক্তির সত্যতা কিছুটা অনুমান করা যাবে। দৃষ্টি দিয়ে মানুষ কতটুকুই বা এই বিরাট বিশ্বের দেখতে পায়? দূরবীক্ষণের সাহায্যেও যতটুকু দেখতে পাওয়া যায় তাও সৃষ্টির অতি নগণ্যতম অংশমাত্র।

আয়াৎ ১৯ : 'তারা (অবিশ্বাসীরা) কি লক্ষ্য করে না তাদের উর্দ্ধস্থিত পাখীগুলিকে?---পাখা বিস্তার করছে ও গুটোচ্ছে? মহাদয়াবান আল্লাহ্ ছাড়া কেউ-ই তাদের (শূন্যে) সুপ্রতিষ্ঠ রাখতে পারে না। সত্যই আল্লাহ্ সব কিছুর উপর রাখেন সতর্ক-দৃষ্টি।'

আয়াৎ ৩০ : 'বল,—"তুমি কি লক্ষ্য কর? যদি তোমার ঝর্ণাধারা কোন এক সকালে হারিয়ে যায় ভূগর্ভে, কে তোমাকে দিতে পারে স্বচ্ছ-প্রবাহিত পানীয় জল?"

এখানে মানুষের জীবন ধারণের একটি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দৃষ্টান্ত দিয়ে আল্লার মহিমা ও রহমত, আর তা মানব জীবনে যে কতখানি সঙ্কট-ত্রাণ তা অতি চমৎকার ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

৬৮ : সূরা কলম

আয়াৎ ৮ : 'যারা সত্যকে অস্বীকার করে তাদের কথায় কর্ণপাত করো না।'

আয়াৎ ১০--১৪ : 'ঘৃণ্য-প্রকৃতির লোকের কথায়ও কর্ণপাত করো না,—যে সব সময় শপথ করতেই প্রস্তুত, যে নিন্দা ও অপবাদ রটনা করে বেড়ায়, সৎকাজে বাধা দেওয়াই যার স্বভাব, যে করে সব রকমের সীমালংঘন ও ডুবে থাকে পাপে, সব কিছুর প্রতি যে নিষ্ঠুর ও নীচ-স্বভাব;---কারণ তার আছে সম্পদ ও সন্তান সন্ততি!'

ধন ও জনশক্তি অনেক সময় মানুষকে করে তোলে এমনি নানা বদ্‌স্বভাবের মালিক, কাজেই এই সব লোকের কথায় কর্ণপাত না করে এদের থেকে দূরে সরে থাকাই ভাল।

আয়াৎ ৩৪ : 'সত্যই আল্লার সামনে সৎকর্মশীল হবেন আনন্দ-বাগের অধিকারী।'

৬৯ : সুরা হাক্কা

আয়াৎ ৩৩ : 'নরকের শাস্তি প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে: "যে মহান আল্লায় বিশ্বাস করে না সে-ই এই শাস্তি ভোগ করবে।'

আয়াৎ ৩৪ : 'এবং (সেও ভোগ করবে) যে উৎসাহ দেয় না দুঃস্থ-দুর্গতকে সাহায্য দানে।'

আয়াৎ ৩৫ : 'কেয়ামতের দিন সে পাবে না কোন বন্ধু।'

আয়াৎ ৪৮ : 'সত্যই কোরাণ মুত্তাকি বা আল্লাহ্-ভীরুদের প্রতি এক শিক্ষাপ্রদ বাণী।'

৭০ : সূরা মা'আরেজ

আয়াৎ ১৭ ও ১৮ : 'নরকের শাস্তি প্রসঙ্গে এখানে আবারও বলা হচ্ছে,---নরকাগ্নি আহ্বান করবে ঐসব লোককে যারা সত্যের প্রতি বিমুখ ও শুধু জড়ো করে ধন-সম্পদ এবং তাও খরচ না করে রাখে লুকিয়ে মজুদ করে।'

আয়াৎ ১৯—২৮: 'সত্যিই মানুষকে বড় অস্থিরমতি করেই সৃষ্টি করা হয়েছে (কারণ মানুষকে দেওয়া হয়েছে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি); যখন বিপদ আসে তখন সে হয় ক্ষুব্ধ, যখন মঙ্গল এসে তাকে স্পর্শ করে, তখন সে হয় বদ্ধ-মুষ্টি;---কিন্তু যারা উপাসনায় অনুরক্ত, যারা নমাজে থাকে স্থিতিশীল এবং যাদের সম্পদের উপর অভাবগ্রস্ত ভিখারী ও (নানা কারণে) যারা ভিক্ষা করতে অক্ষম তাদের দাবী হয় স্বীকৃত, তারা কিন্তু ঐরকম নয় এবং যারা শেষ দিনের সত্যতায় বিশ্বাসী ও যারা তাদের প্রভুর বিরক্তিকে করে ভয় (তারাও ঐরকম নয়); কারণ আল্লার বিরক্তি হচ্ছে সব রকম সুখ-শান্তির অন্তরায়।'

৭১ : সূরা নূহ্

আয়াৎ ২৫ : 'নূহ্‌নবীর অবিশ্বাসী স্বজাতি সম্বন্ধে বলা হচ্ছে– "তাদের পাপের কারণেই তাদেরে নিমজ্জিত করা হয়েছে ও প্রবেশ করানো হয়েছে অগ্নিতে এবং আল্লার পরিবর্তে তারা কা'কেও পায়নি সাহায্যকারী।"

৭২ঃ সুরা জিন্

আয়াৎ ১১ ঃ 'জিনেরা বল্‌ছে—"আমাদের মধ্যে কেউ আছে সৎ এবং কেউ কেউ আছে তার বিপরীতঃ আমরা অনুসরণ করি বিভিন্ন পথ।'—

আয়াৎ ১২ ঃ 'কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি বিশ্বের কোথাও আমরা আল্লাকে ব্যর্থ করতে পারব না এবং পালিয়ে গিয়েও ব্যর্থ করতে পারব না তাঁর উদ্দেশ্য।'

আয়াৎ ২১ ঃ 'বল (হে নবী)—"তোমাদের ক্ষতি করা বা তোমাদেরে সত্যপথে পরিচালিত করা আমার ক্ষমতার আয়ত্তাতীত।'

অর্থাৎ শাস্তি ও হেদায়েতের মালিক আল্লাহ্। নবীদের দেওয়া হয়নি কাকেও শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা—তাঁরা শুধু সত্যের বাহক ও প্রচারক। বিশেষতঃ নবীরা হচ্ছেন মানুষ, তাঁরা প্রেরিত হয়েছেন মানুষের প্রতি। তাঁদের দায়িত্ব হচ্ছে মানুষকে হেদায়েত করা।

৭৩ : সুরা মুজাম্মেল

আয়াৎ ৬ : 'সত্যই রাত্রে (উপাসনার জন্যে) ওঠা আত্ম-নিয়ন্ত্রণের জন্যে অত্যন্ত ফলদায়ক। প্রার্থনার উপযোগী ভাষারও খুব উপযুক্ত সময় রাত্রিকাল।'

চিন্তা, ধ্যান ও হৃদয়ের গভীর অনুভূতি প্রকাশের এবং একাগ্র মনোযোগের প্রকৃষ্ট সময় ত রাত্রিবেলা। যখন দিনের কোলাহল, উদ্বেগ ও কর্ম্মব্যস্ততা যায় থেমে ও বিরাজ করে সর্ব্বত্র নীরবতা ও পরিপূর্ণ শান্তি।

আয়াৎ ৭ : 'সত্যই, দিনে সাধারণ কর্ত্তব্য কাজে তুমি দীর্ঘক্ষণ ধরে থাকো ব্যস্ত।'

আয়াৎ ৮ : 'কিন্তু তোমার প্রভুর নাম স্মরণ রেখো এবং তোমার নিজেকে একান্ত মনে তাঁর প্রতি করো নিয়োগ।'

আয়াৎ ৯ : 'তিনি পূর্ব্ব ও পশ্চিমের প্রভু, তিনি ছাড়া অন্য কোন দেবতা নেই, কাজেই তাঁকেই করো তোমার পরিচালক।'

৭৪ : সূরা মুদাছ্‌ছির

আয়াৎ ১১—১৬ : 'যাকে আমি নগ্ন ও একক সৃষ্টি করেছি তার ব্যবস্থা আমাকেই একা করতে দাও!—যাকে আমি দিয়েছি প্রচুর সম্পদ ও দিয়েছি পার্শ্বে পুত্রগণকে, যার জীবন করেছি আমি সহজ ও আরামদায়ক! তবুও সে লোভী—চায় যেন আমি তার আরও (ধনে-জনে) বাড়াই। না, তা আর কিছুতেই করা হবে না। কারণ আমাদের নিদর্শনের প্রতি সে হচ্ছে বিমুখ ও অ-বাধ্য।'

আয়াৎ ১৮ : 'প্রত্যেক আত্মা স্বকাজের জন্যই থাকবে বন্ধক।'

আয়াৎ ৪১ : ৪২ : 'স্বর্গবাসীরা পাপীদের জিজ্ঞাসা করবে—"কিসে তোমাদের নরকাগ্নিতে নিয়ে এল?"

আয়াৎ ৪৩ : ৪৭ : 'তারা বল্‌বে—"যারা উপাসনা করতো আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না, যারা দুঃস্থদের খাওয়াতো আমরা তাদের দলভুক্তও ছিলাম না; কিন্তু আমরা অসার গল্প গুজবকারিদের সঙ্গে দম্ভপূর্ণ আলাপ করতাম ও অস্বীকার করতাম শেষ বিচারের দিন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সেই সুনিশ্চিত দিন আমাদের সন্নিকট হয়েছে।"

৭৫ : সূরা কেয়ামত

আয়াৎ ২২ : ২৩ : 'সেইদিন (কেয়ামতের দিন) কোন কোন মখ তাদের প্রভুর দিকে তাকিয়ে সৌন্দর্য্যে করবে ঝলমল।'

আয়াৎ : 'এবং সেদিন কোন কোন মুখ হবে বিমর্ষ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন।

বলা বাহুল্য, প্রথমোক্ত চেহারা পুণ্যবানের ও শেষোক্ত চেহারা পাপীর।

৭৬ঃ সূরা দহর

আয়াৎ ৮ ঃ 'তারা অর্থাৎ (সৎকর্ম্মশীলেরা) দুঃস্থ, অনাথ ও বন্দীদের আহার্য্য দিয়ে থাকে স্রেফ্ আল্লার মহব্বতেই ;'—

আয়াৎ ৯ ঃ 'তারা বলে—"শুধু আল্লার ওয়াস্তেই আমরা তোমাদের আহার করাচ্ছি। আমরা তোমাদের কাছ থেকে কোন পুরস্কার বা ধন্যবাদ চাই না।"

৭৭ : সুরা মুরসলাত্

আয়াৎ ৪১ : 'ধার্ম্মিক বা সৎলোকেরা পাবেন ছায়াশীতল ও ঝর্ণাধারা প্রবাহিত স্থান।'

আয়াৎ ৪২ : 'এবং যত ইচ্ছা তারা পাবেন ফল।'

আয়াৎ ৪৩ : 'মনের খুশী মত খাও, পিয়ো,—কারণ তোমরা করেছ সৎকাজ।'

আয়াৎ ৪৪ : 'নিশ্চয়ই আমরা সৎকর্ম্মশীলকে এইভাবেই দিয়ে থাকি পুরস্কার।'

৭৮ : সুরা ন'বা

আয়াৎ ৮ : 'আমরা কি তোমাদেরে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করিনি ?'---

আয়াৎ ৯ : 'এবং করিনি তোমার নিদ্রাকে বিশ্রাম ?'---

আয়াৎ ১০ : 'এবং করিনি রাত্রিকে তোমার আবরণ ?'---

আয়াৎ ১১ : 'এবং দিনকে কি করিনি তোমার জীবিকার উপায় ?'

আয়াৎ ৩১ : 'সত্যই সৎকর্ম্মশীলের আত্মবাসনা বা ইচ্ছা হবে পূর্ণ।'

৭৯ : সুরা নাজেয়াৎ

আয়াৎ ২৭ : 'কি ! আকাশ না তোমাকে সৃষ্টি করা বেশী কঠিন ?---আল্লা-ই সৃষ্টি করেছেন আকাশ !'

আয়াৎ ২৮ : 'তার চাঁদোয়া করেছেন উঁচু এবং তিনি তাকে দিয়েছেন শৃঙ্খলা ও পূর্ণতা।'

আয়াৎ ৩৫ : 'শেষ বিচারের দিন মানুষ জীবনে যা কিছু করেছে সবই হবে স্মরণ।'

আয়াৎ ৩৬ : 'সকলের দৃষ্টির সামনেই উন্মুক্ত হবে আগুন।'

আয়াৎ ৩৭ : 'তারপর যারা করেছে সব সীমা লংঘন ;'—

আয়াৎ ৩৮ : 'এবং এই পার্থিব জীবনকেই করেছে অধিকতর পছন্দ ;'---

আয়াৎ ৩৯ : 'নরকাগ্নি হবে তাদের বাসস্থান।'

আয়াৎ ৪০ : ৪১ : 'এবং যারা একদিন আল্লার সামনে যে উপস্থিত হতে হবে এই ভয়কে মনে করেছে পোষণ ও নীচ প্রবৃত্তির হাত থেকে করেছে নিজের মনকে দমন, তাদের বাসস্থান হবে পুষ্পিত উদ্যান।'

৮০ : সুরা আবসা

আয়াৎ ২৪ : 'মানুষ যেন তার খাদ্যবস্তুর প্রতি তাকিয়ে দেখে' : অর্থাৎ কি করে তা উৎপন্ন হয় তা দেখে তার থেকে মানুষ যেন নেয় শিক্ষা—এই শিক্ষারই ফল আজকের কৃষি ও খাদ্য-বিজ্ঞান।

আয়াৎ ২৫ : 'সেই জন্যে আমরা প্রচুর জল বর্ষণ করি;'—

আয়াৎ ২৬ : 'এবং মাটিকে করি বিদীর্ণ ও খণ্ড খণ্ড;'—

আয়াৎ ২৭ : 'এবং তার থেকে উৎপন্ন করি শস্য;'—

আয়াৎ ২৮ : 'আঙ্গুর ও পুষ্টিকর গাছগাছড়া;'—

আয়াৎ ২৯ : 'জলপাই ও খেজুর;'—

আয়াৎ ৩০ : 'প্রাচীর বেষ্টিত, উচচ ও ঘন বৃক্ষশোভিত উদ্যান;'

আয়াৎ ৩১ : 'এবং ফলমূল ও ঘাস;'—

আয়াৎ ৩২ : (বর্ণিত সব কিছুই সৃষ্টি করা হয়েছে) তোমাদের ও তোমাদের পালিত পশুর খাদ্য ও সুবিধার জন্যে।'

৮১ : সুরা তক্বীর

আয়াৎ ১৪ : 'শেষ বিচারের দিন সব আত্মাই জানতে পারবে সে কি পাঠিয়েছে আগাম।'

অর্থাৎ সেদিন সবাই জানতে পারবে জীবনে কে কি সুকাজ করেছে।

আয়াৎ ২৭ : 'সত্যই কোরাণের বাণী সমস্ত বিশ্বজগতের প্রতি।'

আয়াৎ ২৮ : 'তোমাদের মধ্যে যে-ই সোজা ও সরল পথে চলতে চায় সে-ই পাবে (কোরাণ থেকে) উপকার।'

আয়াৎ ২৯ : কিন্তু বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু আল্লার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুমি কোন ইচ্ছা পোষণ করো না।'

৮২ঃ সূরা ইনফেতার

আয়াৎ ৬ ঃ 'হে মানব! কিসে তোমাকে তোমার মহা দয়ালু প্রভুর কাছ থেকে ভুলিয়ে রেখেছে?'

আয়াৎ ১৩ ঃ 'সৎকর্ম্মশীলরা থাকবেন খুশী ও তৃপ্তিতে;'—

আয়াৎ ১৪—১৬ঃ 'এবং বদমাইসরা স্থান পাবে অগ্নিতে। বিচারের পর তারা সেখানে প্রবেশ করবে এবং তারা কিছুতেই তার থেকে থাকতে পারবে না দূরে।'

৮৩ : সূরা তাৎফীফ

আয়াৎ ১ : 'যারা প্রতারণা করে তাদের প্রতি অভিশাপ ;'—

আয়াৎ ২ : 'যারা নিজেরা কোন জিনিস নেবার সময় পুরোপুরি ওজন করে নিয়ে থাকে ;'—

আয়াৎ ৩ : 'কিন্তু তারা নিজেরা যখন কোন জিনিস মেপে বা ওজন করে অপরকে দেয়, তখন দিয়ে থাকে কম।'

(এই সব প্রতারণাকারীদের প্রতি জানানো হচ্ছে অভিশাপ ও দেওয়া হচ্ছে ধিক্কার।)

আয়াৎ ৪ : 'তাদের যে জবাবদিহি হতে হবে তারা কি তা ভাবে না ?'

আয়াৎ ২২ : 'সত্যই সৎকর্মশীলরা থাকবেন আনন্দে।'

আয়াৎ ২৪ : 'তাদের চেহেরায় তুমি দেখতে পাবে আনন্দের বিকীর্ণ জ্যোতি।'

৮৪ : সূরা এন্‌শেকাক্

আয়াৎ ১৬—১৯ : 'আমি তোমাদের আহ্বান করছি; অস্তায়মান সূর্য্যের রক্তবর্ণের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌তে, আর দেখ্‌তে রাত্রি ও তার গৃহ প্রত্যাগমন এবং পূর্ণচন্দ্রের দিকে। নিশ্চয়ই তোমাকে স্তরের পর স্তর অতিক্রম করতে হবে।'

বিশ্বে ক্ষুদ্রবৃহৎ সব কিছুই পরিবর্ত্তনশীল। চন্দ্র সূর্য্য ও দিনরাত্রি তারও আছে পরিবর্ত্তন। অস্তায়মান সূর্য্যের সোনালী কিরণ বা পূর্ণচন্দ্রের ভুবনমোহন সৌন্দর্য্য দেখে আমরা মুগ্ধ হতে পারি কিন্তু তারও আয়ু স্বল্পকাল স্থায়ী। রাত্রির শান্তি ও গাম্ভীর্য্য, কর্ম্মকোলাহলহীন বিশ্রাম আমাদের কাম্য সন্দেহ নেই, কিন্তু দিনের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তারও ঘটে অবসান। একমাত্র আল্লা-ই হচ্ছেন অপরিবর্ত্তনীয় অজর অমর ও আদি অন্তহীন। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে যেমন মানুষকে অগ্রসর হতে হয় একটার পর একটা স্তর অতিক্রম করে, সেই রকম আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও আছে স্তরের পর স্তর। এক একটা স্তর অতিক্রম করেই তবে লাভ হয় আধ্যাত্মিক সিদ্ধি।

আয়াৎ ২৫ : 'যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম্ম করে তাদের জন্য আছে পুরস্কার, যা কখনো ব্যর্থ হবে না।'

অর্থাৎ সৎকর্ম্মশীল কখনো তার প্রাপ্য পুরস্কার থেকে হবেন না বঞ্চিত।

৮৫ : সূরা বুরুজ

আয়াৎ ৯ : 'আল্লা-ই আকাশমণ্ডল ও বিশ্বরাজ্যের মালিক এবং আল্লাহ্ রয়েছেন সব বস্তুর সাক্ষী।'

আয়াৎ ১১ : 'যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম্ম করে তারা ন্যস্ত হবে উদ্যানে---যে-উদ্যান তলে প্রবাহিত হচ্ছে নদী: ইহাই মহামুক্তি (এক কথায় সমস্ত বাসনা কামনার পূর্ণ পরিতৃপ্তি)।'

আয়াৎ ১২ : 'সত্যই তোমার প্রভুর যে-ধরা সে অত্যন্ত শক্ত।' অর্থাৎ আল্লার সঙ্গে বান্দার রয়েছে এক কঠিন সম্বন্ধ-বন্ধন। সন্তান যেমন মায়ের স্নেহবন্ধন সম্পূর্ণ ছিড়ে ফেলতে পারে না, তেমনি বান্দাও পারবে না তার সঙ্গে স্রষ্টার যে-যোগসূত্র তা ছেদন করতে। আর পাপ করে, অপরাধ করেও সে আল্লার হাত থেকে পাবেনা নিষ্কৃতি, পারবেনা কোথাও পালিয়ে বাঁচতে।

আয়াৎ ১৩ : 'আদি থেকে তিনিই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই দিতে পারেন পুনর্জীবন।'

আয়াৎ ১৪ : 'তিনি চিরক্ষমাশীল ও দয়ামায়ায় পূর্ণ।'

আয়াৎ ১৭ : ১৮ : 'ফেরাউন ও ছমুদ জাতির শক্তি-বাহিনীর কাহিনী কি তোমাদের কাছে পৌঁছেনি?' অর্থাৎ অতবড় শক্তির অধিকারী হয়েও ফেরাউন ও ছমুদ জাতির অস্তিত্ব ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে গেছে ও হয়ে গেছে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন। বিপুল সাম্রাজ্য ও অতুলনীয় পার্থিব সম্পদও তাদের রক্ষা করতে পারেনি।

আয়াৎ ১৯ : 'তবুও (অর্থাৎ ফেরাউন ও ছমুদ জাতির পরিণাম দেখেও) অবিশ্বাসীরা সত্যকে করে অস্বীকার!'

আয়াৎ ২০ : 'কিন্তু আল্লাহ্ তাদেরে পরিবেষ্টিত করবেন পশ্চাদ্দিক্ থেকে।'

অর্থাৎ অপ্রত্যাশিত ও অজ্ঞাত বিপদ এসে তাদেরে করবে গ্রাস এবং যাদেরে তারা মনে করেছিল তাদের পৃষ্ঠপোষক তারাও হয়ে দাঁড়াবে তাদের দুশ্‌মন। এইভাবে প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিত সব রকম বিপদ এসে তাদেরে ধরবে ঘিরে।

৮৬ : সূরা তারেক্

আয়াৎ ৪ : 'এমন কোন আত্মা নেই, যার উপর নেই কোন রক্ষা-কর্ত্তা।'

অর্থাৎ সব মানুষেরই রক্ষা কর্ত্তা হচ্ছেন আল্লাহ্। জীবনের বিপদ সঙ্কুল পথে কতভাবেই না মানুষ বিপদ-মুক্ত হচ্ছে, বুঝতে না পেরে সে বলে উঠে আকস্মিক বা Miraculous escape, আসলে এক অদৃশ্য ঐশী শক্তিই মানুষকে রক্ষা করছে পদে পদে।

আয়াৎ ৫ : 'মানুষ নিজে কিসের থেকে সৃষ্ট হয়েছে, তা যেন একবার সে ভেবে দেখে!'

আয়াৎ ৬ : 'সে সৃষ্ট হয়েছে নিঃসরিত একটি ফোঁটা থেকে;'–

আয়াৎ ৭ : 'মেরুদণ্ড ও পাঁজরার হাড়ের মাঝখান দিয়ে যা হয়েছে নির্গত।'

আয়াৎ ৮ : 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাকে পুনর্জীবন দিতেও সক্ষম।'

অর্থাৎ এরকম তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তু থেকে যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তিনি মৃত্যুর পরে পুনর্জীবন দিতেও সমর্থ।'

৮৭ঃ সূরা আ'লা

আয়াৎ ৮ ঃ 'আমরা তোমার পক্ষে সরল পথের অনুসরণ সহজসাধ্য করব।'

সরল পথ অর্থে এখানে ইসলামকেই নির্দ্দেশ করা হচ্ছে। বাস্তবিক ইসলামের পথ হচ্ছে সব চেয়ে সহজ ও সরল। ইসলাম ধর্ম্মের বিশ্বাস ও পালনীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে কোন রকমের বক্রতা বা জটিলতার স্থান নেই। কি বিশ্বাস করতে হবে আর কি পালন করতে হবে তা ইসলামে অত্যন্ত অসন্দিগ্ধ ভাষায় বলে দেওয়া হয়েছে এবং তা পালন করা কোন দেশে বা কোন ঋতুতেই শিক্ষিত অশিক্ষিত, নর-নারী কারো পক্ষে কিছুমাত্র কষ্টসাধ্য নয়। এই জন্যই ইসলামকে সহজ ও সরল পথ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

আয়াৎ ৯ ঃ 'অতএব সতর্ক কর, সতর্কবাণীর ফলে শ্রোতা উপকৃত হতে পারে।'

আয়াৎ ১০ ঃ 'যারা আল্লাকে ভয় করে তারা সতর্কবাণী গ্রহণ করবে;'

আয়াৎ ১১ ঃ 'কিন্তু নেহাৎ হতভাগ্যরাই তা করবে প্রত্যাখ্যান;'

আয়াৎ ১২ ঃ 'তারা প্রবেশ করবে মহা অগ্নিকুণ্ডে;''

আয়াৎ ১৩ ঃ 'তখন সেখানে তারা মরবেও না, বেঁচেও থাক্‌বে না।'

অর্থাৎ পাপীরা জীবনের আনন্দ ও মৃত্যুর শান্তি দুই থেকেই হবে বঞ্চিত। এবং তারা অহরহ দগ্ধ হতে থাক্‌বে পাপাগ্নিতে।

আয়াৎ ১৪ ঃ 'কিন্তু যারা নিজেদের করে নির্ম্মল (দেহে মনে স্বভাবে চরিত্রে, নীতি ও ব্যবহারে) তারা হবে সমৃদ্ধ;

আয়াৎ ১৫ : 'এবং তারা করে তাদের রক্ষাকর্তা প্রভুর গুণকীর্তন ও প্রার্থনার সাহায্যে নিজের আত্মার করে উন্নতি।'

আয়াৎ ১৬ : ১৭ : 'তুমি এই পার্থিব জীবনকেই বেশী পছন্দ কর কিন্তু পরলোকের জীবন আরও উত্তম এবং আরো চিরস্থায়ী।'

৮৮ : সূরা গাশিয়া

আয়াৎ ১৭ : 'তারা কি (অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা) উষ্ট্রের দিকে তাকিয়ে দেখে না, কি ভাবে ওদের সৃষ্টি করা হয়েছে?'

উষ্ট্র হচ্ছে মরুবাসী আরবদের পরম সম্পদ। তার দেহ-গঠন বিচিত্র ও অদ্ভুত, সে তার উদরে সঞ্চয় করে রাখতে পারে প্রচুর পানি, শুধু কাঁটা খেয়ে বাঁচতে পারে দীর্ঘ দিন, সে বহন করে মানুষ ও বোঝা। তার মাংস ব্যবহার হয় খাদ্য হিসেবে এবং তার লোম ব্যবহার হয় বয়নে। তবুও উষ্ট্র কত শান্ত। স্রষ্টার এই সৃষ্টি-কৌশল দেখে মানুষ কী করে আল্লায় বিশ্বাস না করে ও তাঁর প্রশংসা না করে থাকতে পারে?

আয়াৎ ১৮ : 'এবং তারা কি ফিরে তাকায় না আকাশের দিকে, কি ভাবে তা উত্থিত রয়েছে ঊর্দ্ধে?'

আয়াৎ ১৯ : 'এবং ফিরে তাকায় না পর্ব্বতরাজির দিকে, কিভাবে সেই সব রয়েছে সুদৃঢ়ভাবে খাড়া'?'

আয়াৎ ২০ : 'এবং ফিরে তাকায় না পৃথিবীর দিকে, কিভাবে তাকে করা হয়েছে প্রশস্ত?'

আয়াৎ ২১ : 'অতএব (হে নবী) তুমি মানুষকে সতর্ক কর, কারণ সতর্ক করাই তোমার কাজ।'

নবীদের সতর্কবাণী শুনে হয়ত মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির দিকে, আল্লার সৃষ্টপ্রাণী ও বস্তুর দিকে ফিরে তাকাবে। এইভাবে স্রষ্টাকে উপলব্ধি করা হয়তো তার পক্ষে হবে সহজ ও সম্ভব। অপরের সাহায্য ছাড়া, অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না জ্ঞানের দিকে, যোগ্যতর লোক বুঝিয়ে ও দেখিয়ে না দিলে সাধারণ মানুষ অনেক সময় দেখেও দেখে না, বুঝেও বুঝে না, তার জ্ঞান-চক্ষু হয় না সহজে উন্মীলিত। তাই প্রয়োজন হয় গুরু, ওস্তাদ ও পথ প্রদর্শকের। জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে নবীদেরও এই ভূমিকা।

আয়াৎ ১৪ : 'তোমার রক্ষাকর্ত্তা প্রভু আছেন সু-উচ্চ মিনারের উপর।' অর্থাৎ সু-উচচ মিনারের উপর থেকে যেমন চারদিকে সবকিছু দেখা যায়, আল্লাহ্-ও সে রকম সব কিছু দেখেন। দেখেন কে করছে ন্যায় আর কে করছে অন্যায়, কে বাড়াচ্ছে পা পাপের দিকে আর কে অগ্রসর হচ্ছে পুণ্যের পথে।

আয়াৎ ১৫ : 'মানুষকে যখন সম্মান ও পুরস্কার দিয়ে তার প্রভু করেন পরীক্ষা, তখন বেশ দম্ভ সহকারে মানুষ বলে—"আমার প্রভু আমাকে সম্মানিত করেছেন।"

আয়াৎ ১৬ : 'কিন্ত তিনি যখন তার জীবিকা সঙ্কুচিত করে তাকে পরীক্ষা করেন তখন হতাশভাবে সে বলে—"আমার প্রভু আমাকে নিগৃহীত করেছেন।"

আয়াৎ ১৭ : 'না, না, বরং তুমিই সম্মান কর না এতিমকে।'

আয়াৎ ১৮ : 'এবং দাও না দরিদ্রকে আহার্য্যদানে পরস্পরকে উৎসাহ।'

আয়াৎ ১৯ : 'সর্ব্বপ্রকার লোভের বশবর্ত্তী হয়েই তোমরা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি কর গ্রাস।'

লোভে পড়ে অনেকেই এতিম, অনাথ, বিধবা, দুর্ব্বল ও অসহায়দের সম্পত্তি আত্মসাৎ করে। আবার লোভে পড়ে অনেকেই উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির করে অপব্যবহার, পরিবারের অন্য দশজনকে বঞ্চিত করে নিজে ভোগ করে হয়ত সিংহের ভাগ। এমন দৃষ্টান্ত আমাদের পারিবারিক জীবনে কিছুমাত্র বিরল নয় যে, যেখানে পরিবারের কর্ত্তা নিজের খেয়াল খুশী মত, অত্যন্ত দায়িত্বহীনভাবে পৈত্রিক

সম্পত্তিকে উড়িয়ে দিচ্ছে নিজের বিলাস ব্যসনে ও পরিবারের অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ও কনিষ্ঠদের করছে তাদের ন্যায্য হক্ থেকে বঞ্চিত।

আয়াৎ ২০ : 'আর ধনসম্পত্তির প্রতি তোমার আকর্ষণ অপরিমিত।'

অপরিমিত ধনলিপ্সা বহু পাপের মূল, তাই তাকেও নিন্দা করা হয়েছে কোরাণে বারে বারে।

আয়াৎ ২৩ : 'সেদিন অর্থাৎ কেয়ামতের দিন নরক স্থাপিত হবে তোমার সামনাসামনি, সেদিন লোকে (ভয়ে) আল্লাকে স্মরণ করবে, কিন্তু সেই স্মরণ কি তার কোন উপকারে আসবে?'

আয়াৎ ২৪ : 'সে বল্‌বে—"হায়, আমার এই জীবনের জন্যে আমি যদি কিছু সৎকাজ আগাম পাঠাতাম!"

যা কিছু সৎকাজ তা জীবনে বেঁচে থাকতেই করতে হয়। মৃত্যুর পর করতে হবে জবাবদিহি, দিতে হবে হিসাব নিকাশ এবং তখন সব রকম অনুতাপ অনুশোচনা হবে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ।

৯০ : সূরা ব'লদ

আয়াৎ ৪ : 'সত্যই আমরা মানুষকে পরিশ্রম ও সংগ্রামের মাঝখানেই সৃষ্টি করেছি।'

মানুষের জন্যে এই আয়াতের ইঙ্গিতও বেশ অর্থপূর্ণ। যারা কোন পরিশ্রম করে না এবং দুঃখ কষ্টের হয়রানি সম্মুখীন, অনর্জিত পৈত্রিক সম্পত্তির উপর দেয় গড়াগড়ি, ঘুষ ও চুরির ধনে যারা করে পোদ্দারী এবং এইভাবে যারা পরিশ্রম ও সংগ্রামকে দিচ্ছে ফাঁকি, তারা মানব জীবনের উদ্দেশ্যকেই করছে ব্যর্থ ও আল্লার অভিপ্রায়কে করছে লঙ্ঘন। মানুষকে মানুষ হিসেবে জীবন যাপন করতে হলে নিজের হাত পা ও শক্তির যথাযথ ব্যবহার করতেই হবে।

আয়াৎ ৫ : 'মানুষ কি মনে করে তার উপর কারো কর্তৃত্ব নেই?'

আয়াৎ ৬ : 'দম্ভ করে সে বলতে পারেঃ "প্রচুর ধনসম্পদ আমি উড়িয়ে দিয়েছি!"

আয়াৎ ৭ : 'সে কি মনে করে কেউ তাকে দেখ্ছে না?' অর্থাৎ অন্য কেউ দেখুক বা না দেখুক আল্লাহ্ ত রয়েছেন তার সব রকম অপব্যয়ের সাক্ষী।

আয়াৎ ৮ : 'আমরা কি তাকে এক জোড়া চক্ষু দিইনি?'

আয়াৎ ৯ : 'এবং একটি জিহ্বা ও এক জোড়া ঠোঁট?'—

আয়াৎ ১০ : 'এবং তাকে দুটি পথই কি আমরা দেখাইনি?'

দুটি পথের একটি হচ্ছে পুণ্যের পথ যা কঠিন, আর একটি হচ্ছে পাপের পথ যা সহজ।

আয়াৎ ১১ : 'কিন্তু খাড়া ও কঠিন পথের দিকে সে ত দ্রুত ধাবিত হয়নি।'

আয়াৎ ১২ : 'কিসে তোমাকে বুঝিয়ে দেবে কঠিন বা খাড়া পথ কি?'—

আয়াৎ ১৩ : '(তা হচ্ছে) দাসকে মুক্তি দেওয়া;'

আয়াৎ ১৪ : 'অথবা অভাব ও দুর্ভিক্ষের দিনে লোককে আহার্য্য দেওয়া;

আয়াৎ ১৫ : 'যে-এতিমের আত্মীয়তার দাবী রয়েছে তাকে আহার্য্য দেওয়া ও সাহায্য করা।'

আয়াৎ ১৬ : 'অথবা রাস্তার দীন দুঃখীকে (আহার্য্যদান ও সাহায্য করা)।'

অর্থাৎ কঠিন পুণ্য পথের যে নির্দ্দেশ তা হচ্ছে সৎকর্ম্মে দান খয়রাতের, দীন দুঃখীর অভাব মোচনের।

আয়াৎ ১৭ : ('এই রকম সৎকর্ম্ম যে পালন করে) সে হতে পারবে বিশ্বাসীদের একজন, যারা হুকুম করে ধৈর্য্য ও সংযম আর হুকুম করে করুণা ও সদয়-কর্ম্ম।'

আয়াৎ ১৮ : 'এই রকম লোকেরাই হচ্ছে দক্ষিণ হস্তের সাথী অর্থাৎ বিশ্বাসী ও পুণ্যবান।'

সৎকর্ম্মহীন নিছক উপাসনাকে ইসলাম কোথাও প্রশ্রয় দেয়নি।

৯১ : সূরা শাম্‌স্‌

আয়াৎ ১--১০ : 'সূর্য্য এবং তার উজ্জ্বল রশ্মি, চন্দ্র যা সূর্য্যকে করে অনুসরণ, দিন যাতে সূর্য্যের আলো হয় প্রকটিত, রাত্রি যাতে সূর্য্যের আলো হয় গুপ্ত, আকাশ ও তার সুগঠন, পৃথিবী ও তার বিস্তার, সুগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত আত্মা---ভালমন্দ সম্বন্ধে যে আত্মার রয়েছে সুপরিচয়, এই সবের নাম নিয়ে বলা হচ্ছে,—সত্যই যে নিজের আত্মাকে নির্ম্মল ও পবিত্র রাখে তার লাভ হয় সাফল্য, আর যে করে আত্মাকে কলুষিত তার হয় পতন।'

৯২ : সূরা লায়ল্

আয়াৎ ১—৪ : 'রাত্রি যা আলোকে করে গোপন, স্ব-গৌরবে ভাস্কর দিন, নরনারী সৃষ্টির রহস্য, (এই সব যেমন সত্য) এও তেমনি সত্য যে মানুষের স্বভাবে রয়েছে বিভিন্নতা, তারা ধাবিত হয় বিভিন্ন দিকে (অর্থাৎ কেউ যায় ভালো'র দিকে আবার কেউ যায় মন্দের দিকে)।'

আয়াৎ ৫ : 'সুতরাং যে দান করে ও আল্লাকে করে ভয়;'

আয়াৎ ৬ : 'এবং যা উত্তম আন্তরিকভাবে তারই দেয় সাক্ষ্য',--

আয়াৎ ৭ : 'নিশ্চয়ই আনন্দের দিকে আমরা তার গতি করব সহজ ও নিরাপদ।'

আয়াৎ ৮--৯ : 'কিন্তু যে লোভী ও কৃপণ ও যে নিজেকে মনে করে অন্যনিরপেক্ষ বা সর্ব্ব সম্পদের মালিক এবং যা উত্তম তার প্রতি করে মিথ্যার আরোপ;'---

আয়াৎ ১০ : 'নিশ্চয়ই দুর্গতির দিকেই তার গতি করব আমরা সহজ ও অবাধ।'

আয়াৎ ১১ : 'সে যখন হুমড়ি খেয়ে পড়বে তখন তার ধনসম্পদ তার কোন উপকারেই আসবে না।'

আয়াৎ ১২ : 'সত্যই মানুষকে সত্যপথ নির্দ্দেশের দায়িত্ব আমাদের (অর্থাৎ আল্লার);

আয়াৎ ১৩ : 'সত্যই আমরাই আদি ও অন্তের মালিক।'

এখানে আদি ও অন্ত ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। ইহকাল পরকাল, সৃষ্টি ও প্রলয়, জন্ম ও মৃত্যু অর্থাৎ সৃষ্টির সূচনা থেকে তার শেষ পর্য্যন্ত সব কিছুরই মালিক আল্লাহ্।

আয়াৎ ১৭ : 'যারা আল্লার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত, (দোজখের) অগ্নি থেকে তাদের অপসারিত করা হবে দূরে;'—

আয়াৎ ১৮—২১ : 'যারা নিজেদের ধনসম্পদ চিত্ত-শুদ্ধির জন্যে ব্যয় করেন, মনে পোষণ করেন না কারো থেকে কোন অনুগ্রহ, চান না দানের প্রতিদান; শুধু হৃদয়ে পোষণ করেন মহান আল্লার করুণা; অচিরে তারা লাভ করবেন পূর্ণ পরিতৃপ্তি।'

নিজের স্বার্থ সাধনের জন্যে দান করা বা প্রতিদানের আশায় যে দান, তাতে দানের উদ্দেশ্য হয় ব্যর্থ। নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম দান শুধু যে দাতাকে অনাবিল আনন্দই দিয়ে থাকে তা নয় তার অন্তরকেও করে পূতসুন্দর।

৯৩ : সূরা দোহা

আয়াৎ ১—৪ : 'জ্যোতির্ম্ময় প্রভাত-রশ্মি ও শান্তশীতল রাত্রির নাম নিয়ে বল্‌ছি (হে নবী) তোমার প্রভু তোমাকে ত্যাগ করেননি ও হন্‌নি তোমার উপর অসন্তুষ্ট। সত্যই বর্ত্তমান থেকে তোমার ভবিষ্যৎ বা পরবর্ত্তী সময় হবে আরো উত্তম।'

আয়াৎ ৫ : 'শিগ্‌গীর তোমার প্রভু তোমাকে যা দেবেন তাতে তুমি হবে পরিতুষ্ট।'

আয়াৎ ৬ : 'তিনি কি তোমাকে পান্‌নি এতিম এবং দেন্‌নি আশ্রয় ?'

আয়াৎ ৮ : 'এবং তিনি তোমাকে পেয়েছিলেন দরিদ্র, করেছেন অভাবমুক্ত, স্বাধীন।'

আয়াৎ ৯ : 'কাজেই কখনো এতিমের প্রতি কঠোর ব্যবহার করো না।'

আয়াৎ ১০ : 'আর (কখনো) ফিরিয়ে দিয়োনা ভিখারীকে;'

আয়াৎ ১১ : 'বরং আল্লার প্রাচুর্য্য (অর্থাৎ তোমার প্রতি তার বদান্যতা) স্মরণ ও প্রচার কর।'

যদিও নবীকে উদ্দেশ করেই এ সব নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে, কোরাণের অন্য সব নির্দ্দেশের মত এই সব নির্দ্দেশও সার্ব্বজনীন—সকলের প্রতিই প্রয়োজ্য।

৯৪ : সুরা আলম্‌নশ্‌রাহ্‌

আয়াৎ ৫—৬ : 'বস্তুতঃ প্রত্যেক বিপদেরই আছে মুক্তি। বস্তুতঃ প্রত্যেক বিপদেরই আছে মুক্তি।'

উপরোক্ত দুই আয়াতেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। মনে হয় জোর দেওয়ার জন্যেই তা করা হয়েছে। যেমন প্রতি রোগের আছে ঔষধ, তেম্‌নি প্রতি বিপদ আপদ দুঃখ কষ্টেরও আছে মুক্তি। তাই বিপদে পড়লে ভয়ে দিশেহারা ও ভগ্নমনোরথ হওয়া উচিত নয়। মেঘের পর সূর্য্যোদয় যেমন অনিবার্য্য, পরিণামে বিপদও যে একদিন কেটে যাবে তাও তেম্‌নি অনিবার্য্য। সত্যই এই রকম সুদৃঢ় অভয়বাণী ও আশ্বাস বিপদগ্রস্ত মানুষকে দেবে এক মৃত্যুঞ্জয় প্রেরণা।

আয়াৎ ৭ : 'অতএব যদি তুমি মুক্ত হও (বিপদ থেকে), তবুও কঠিন পরিশ্রম কর।'

বিপদ মুক্তির পর অনেকেই হয়ে পড়ে অনুদ্যম আলস্যের শিকার—যার পরিণাম মারাত্মক ও শোচনীয়। তাই ফের সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে।—বিপদ্‌মুক্তির পরও গাফেলতী না করে করে যাবে নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

আয়াৎ ৮ : 'তোমার প্রভুর প্রতি একাগ্রচিত্তে হও মনোযোগী।'

যার চিত্ত আল্লামুখীন সে কখনো নিজেকে অলস বিলাস ব্যসনে নিযুক্ত রাখ্‌তে পারে না। সে কখনো মনে করতে পারে না অনর্জ্জিত বা বিনাশ্রমের অন্নের উপর তার আছে দাবী। কাজেই বিপদে আপদে যেমন সে পরিশ্রম করবে—আরাম ও সম্পদের সময়ও সে পরিশ্রম থেকে বিরত থাকবে না ও করবে একাগ্রচিত্তে আল্লাকে স্মরণ।

৯৫ : সূরা ত্বীন

আয়াৎ ৪ : 'সত্যই মানুষকে আমরা সৃষ্টি করেছি সুন্দরতম অবয়বে ;'—

আয়াৎ ৫ : ৬ : 'তারপর তাদের পতন হয় নীচ থেকেও নীচে, কিন্তু যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম্ম করে তারা পাবে সুনিশ্চিত পুরস্কার।'

যারা আল্লার আদেশ করে অমান্য, করে সত্য ও ন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, তাদেরই হয় অধঃপতন,—মনোরম অবয়ব ও সুশ্রী চেহারা সত্ত্বেও তারা শাস্তির হাত থেকে পাবেনা রেহাই। যারা নিজেদের জ্ঞান ও বিবেকের করে সদ্‌ব্যবহার, চলে সত্য ও ন্যায়ের পথে, তারাই পাবে পুরস্কার, যে পুরস্কার চিরস্থায়ী।

আয়াৎ ৮ : 'আল্লা-ই কি সব চেয়ে জ্ঞানী বিচারক নহেন?'

আল্লাহ্ সব চেয়ে জ্ঞানী ও সব চেয়ে সুবিচারক, তাঁর কাছে পুণ্যবানদের কোন ভয় নেই, ভয় একমাত্র পাপীদের। পাপপুণ্যের বিচারে আল্লাহ্ করেন না এতটুকু ইতস্ততঃ ও করেন না কিছুমাত্র পক্ষপাত। যার যা প্রাপ্য সেই অনুপাতেই সে পাবে শাস্তি ও পুরস্কার।

৯৬ : সূরা একরা

আয়াৎ ১ : 'তোমার স্রষ্টা প্রভুর নাম নিয়ে পড় বা প্রচার কর ;'—

আয়াৎ ২ : 'নিছক জমাট শোণিত কণা থেকেই তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ ;'—

আয়াৎ ৩ : 'প্রচার কর, তোমার প্রভু অত্যন্ত বদান্য ;'—

আয়াৎ ৪ : 'যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের ব্যবহার ;'--

আয়াৎ ৫ : '(যিনি) মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা মানুষের কাছে ছিল অজ্ঞাত।'

তুচ্ছ শোণিত কণা থেকেই মানুষের জন্ম। তবুও সেই মানুষকেই যেমন আল্লাহ্ দিয়েছেন সব চেয়ে মনোরম অবয়ব, তেমনি তাকেই তিনি দিয়েছেন নব নব জ্ঞান আহরণের শক্তি, শিখিয়েছেন কলমের ব্যবহার—যে-কলম হচ্ছে সব রকম জ্ঞানের প্রতীক। যে সব ব্যক্তি বা জাতি গ্রহণ করেছে কলমের তথা জ্ঞানের পথ, তারাই হতে পেরেছে উন্নতির নিত্য নূতন পথে অগ্রসর। যারা জ্ঞানের দিকে ফিরিয়েছে পিঠ তাদের অধঃপতন ঠেকাতে পারেনি কেউই। কোরাণের সুস্পষ্ট নির্দেশ সত্ত্বেও আজ মুসলমান জাতি জ্ঞানের পথকে মনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেনি, ফলে পৃথিবীব্যাপী তাদের অধঃপতন ও হতশ্রী জীবন আজ কার না লক্ষ্য-গোচর ?

৯৭ : সূরা কদর

আয়াৎ ৩ : ‘শবে কদরের রাত্রি হাজার মাসের থেকেও উত্তম।’

আয়াৎ ৫ : ‘শান্তি!.. ঐ রাত্রে ভোর পর্যন্ত বিরাজ করে শান্তি।’

৯৮ : সুরা বাইয়েনা

আয়াৎ ৫ : (গ্রন্থ-প্রাপ্ত জাতিকে) এর বেশী আদেশ করা হয়নি: (আদেশ করা হয়েছে) একনিষ্ঠ বিশ্বাস ও আন্তরিক ভক্তির সঙ্গে আল্লার বন্দনা করার, নিয়মিত উপাসনা করার ও নিয়মিত দান অব্যাহত রাখার,—ইহাই সত্য ও সোজা ধর্ম্ম।'

আগেই এক আয়াতে বলা হয়েছে, ইসলাম অত্যন্ত সহজ ও সরল ধর্ম্ম---তাতে কোন রকম দুরূহ কৃচ্ছ্রসাধনা বা জটিলতার স্থান নেই। এখানে যে তিনটি কর্ম্মকে ধর্ম্ম বলে অভিহিত করা হয়েছে তার প্রতি লক্ষ্য করলেও বুঝা যাবে ইসলামের নির্দ্দেশ কত সহজ ও সরল: আল্লার প্রতি আন্তরিক ভক্তি, উপাসনা ও দান---এই তিনটি যে পালন করে, সেই পালন করে ধর্ম্ম। এই তিনটি কর্ম্মই মানুষের মনের কলুষ দূর করে মানবাত্মাকে করে নির্ম্মল ও উন্নত। আন্তরিকতাহীন উপাসনার বিশেষ কোন মূল্য নেই। সত্যিকার আন্তরিক উপাসনা মানুষের মনকে দিয়ে থাকে পূতস্নিগ্ধ গভীরতা ও করে তোলে তাকে গ্রহণশীল, যা কিছু সু একমাত্র সেই মনই তা গ্রহণ করতে সক্ষম। উপাসনার ইহাও একটি সাক্ষাৎ ফল। ইসলামের আল্লাহ্ আত্মকেন্দ্রিক নন্, তাই আল্লাহ্-ভক্তও হতে পারেনা আত্মকেন্দ্রিক। তাই মানুষের কোন ভক্তি বা উপাসনাই সার্থক নয় যদি না তার সঙ্গে যুক্ত হয় দান। দানের সাহায্যেই মানুষ সহজে যুক্ত হতে পারে প্রতিবেশীর সুখ-দু:খের সঙ্গে। আল্লার বান্দাকে ভুলে আল্লার উপাসনা বা আল্লাকে স্মরণ, আল্লার অভিপ্রেত নয়, অনুমোদিত নয়, পছন্দও নয়। দান একটি সামাজিক কর্ত্তব্য। তাই দানের কথা কোরাণে এত বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ দান মানে মানুষের দু:খের অংশ গ্রহণ, তার ব্যথায় ব্যথী হওয়া। দানের উপর মানব মনের সুস্থ বিকাশ ও স্বাস্থ্য দুই-ই নির্ভর করে।

আয়াৎ ৭ : 'যাদের বিশ্বাস আছে অর্থাৎ যারা ঈমানদার ও সৎকর্ম্মশীল তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম।'

৯৯ঃ সূরা যিল্‌যাল্‌

আয়াৎ ৭ঃ 'যে অণু পরিমাণও সৎকাজ করেছে সেদিন (কেয়ামতের দিন) সে তা দেখতে পাবে।'

আয়াৎ ৮ঃ 'যে অণু পরিমাণও বদ্‌কাজ করেছে সেও তা সেদিন দেখতে পাবে।'

১০০ : সূরা আদিয়াৎ

আয়াৎ ৬ : 'সত্যই (অবিশ্বাসী) মানুষ তার প্রভুর প্রতি বড় অকৃতজ্ঞ;'

আয়াৎ ৭ : 'তার নিজের কৃতকর্মের দ্বারাই সে বহন করে তার (অকৃতজ্ঞতার) সাক্ষী।'

আয়াৎ ৮ : 'আর সে পোষণ করে ধন-দৌলতের প্রতি ভয়ঙ্কর লোভ।'

ধন সম্পদের প্রতি অপরিমিত লোভও অবিশ্বাসীরই লক্ষণ। আর এই লোভ মানুষকে নিয়ে যায় নিত্য নূতন পাপের পথে।

১০১ : সূরা আল্‌কারেয়া

আয়াৎ ৬ : ৭ : '(কেয়ামতের দিন) যার সৎকার্য্যের পাল্লা হবে ভারী, তিনি পাবেন সুখময় পরম তৃপ্তিপূর্ণ এক জীবন।'

আয়াৎ ৮ : ৯ : 'কিন্ত যার সৎকার্য্যের পাল্লা হবে হাল্কা (সেদিন) তার বাসস্থান হবে এক অতল গহ্বর।'

১০২ : সূরা তকাসুর

আয়াৎ ১ : 'পার্থিব সম্পদ সঞ্চয়ে তোমাদের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা আসল ও সত্য বস্তু থেকে তোমাদের মনকে করে বিক্ষিপ্ত।'

আয়াৎ ২ : 'যতক্ষণ না, তোমরা প্রবেশ কর কবরে।'

আয়াৎ ৩ : ৪ : 'না, শীঘ্রই তোমরা আসল ও সত্য বস্তু কি তা জানতে পারবে, শীঘ্রই তা তোমরা জানতে পারবে।'

জীবনে মানুষ পার্থিব ধন-সম্পদ, পদ মর্য্যাদা, প্রভাব প্রতিপত্তিকেই দিয়ে থাকে বড় আসন, কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাকে এ সবই যেতে হয় ছেড়ে। তখনই মাত্র সে বুঝতে পারে এই সবের ক্ষণিকতা ও ব্যর্থতা। আসল ও স্থায়ী সম্পদ হচ্ছে সৎকর্ম্ম, আর তা সঞ্চয় করতে হয় জীবনে, বেঁচে থাক্‌তেই। তাই তার প্রতি এখানে একই সঙ্গে দু'বার দেওয়া হচ্ছে তাগিদ্।

১০৩: সূরা আচর

আয়াৎ ১—৩ : 'মহাকাল সৃষ্টির এক চিরন্তন ও শাশ্বত সত্য, যা সৃষ্টির সূচনা থেকে যুগ যুগ ধরে আবহমান একই গতিতে হচ্ছে প্রবাহিত, সেই শাশ্বত মহাকালের নাম নিয়ে এখানে বলা হচ্ছে: সত্যই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কিন্তু যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মশীল এবং যারা সত্য ও ধৈর্য্যের পাঠ গ্রহণে হয় পরস্পর সম্মিলিত (তাদের কোন ক্ষতি হয় না)।'

সমাজ বিচ্ছিন্ন আত্মকেন্দ্রিক মানুষের সমর্থন নেই ইসলামে ব্যক্তির সব রকম শুভকর্ম্মের যোগ রয়েছে সমষ্টির শুভ কর্ম্মের সঙ্গে। ইসলামের ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানগুলিও তাই পালন করতে হয় যতদূর সম্ভব সম্মিলিতভাবে এবং তার উপর দেওয়া হয়েছে বিশেষ জোর। ইসলামের নির্দ্দেশিত সৎকর্ম্মের সেরা হচ্ছে—দান। বলা বাহুল্য দান একটি সামাজিক কর্ত্তব্য—দানের প্রধান উদ্দেশ্য সমাজের দুঃখ মোচন! সত্যের প্রতি অনুরাগ, ধৈর্য্য ও সহনশীলতা সমাজ-জীবনের গোড়া বললেই হয়। মনে বিশ্বাস না থাক্‌লে সত্য, তিতিক্ষা ও ধৈর্য্যের প্রেরণা ও শক্তি আসবে কোথা থেকে? সেই জন্যে কোরাণে বারে বারে বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে। বিশ্বাস হচ্ছে জীবনে সব রকম শুভ প্রেরণা ও শুভ উদ্যমের একাধারে উৎস ও ভিত্তি।

১০৪ঃ সূরা হুমাজা

আয়াৎ ১ঃ 'সব রকম নিন্দুক ও কুৎসা রটনাকারীর প্রতি ধিক্কার।'

আয়াৎ ২ঃ 'যে মৌজুদ করে রাখে ধন দৌলত (তার প্রতিও ধিক্কার);'—

আয়াৎ ৩ঃ '(সে) মনে করে তার ধন দৌলত তাকে করবে চিরজীবী!'

পরনিন্দা, অসাক্ষাতে কুৎসা ও কৃপণতা—এখানে এই তিনটিকেই পাপ বলে একই ভাষায় দেওয়া হচ্ছে ধিক্কার। বলা বাহুল্য তিনটি-ই সামাজিক অপরাধ। ইসলাম সামাজিক মানুষের ধর্ম্ম—'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়'—ইহা ইসলামেরই মর্ম্মকথা। তাই যে কোন সামাজিক অপরাধ ইসলামে বারে বারে হয়েছে নিন্দিত। অপরিমিত ধন-লিপ্সা নানা সামাজিক অপরাধের মূল। তাই কোরাণে বহু যায়গায় তাকেও করা হয়েছে নিন্দা। এখানে ফের্ বলা হচ্ছে ধনদৌলত কখনো মানুষকে করতে পারে না অমর।

আয়াৎ ৪ঃ 'কিছুতেই না (অর্থাৎ মৌজুদ ধনদৌলত মানুষকে কিছুতেই রক্ষা করতে পারবে না); নিশ্চয়ই তাকে নিক্ষেপ করা হবে, যাতে সে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে।'

আয়াৎ ৬ঃ '(যা তাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করবে) তা হচ্ছে আল্লার প্রজ্জ্বলিত রোষাগ্নি;'—

আয়াৎ ৭ঃ 'তা স্পর্শ করবে তার অন্তঃকরণ পর্য্যন্ত' অর্থাৎ আল্লার প্রজ্জ্বলিত রোষাগ্নি নিন্দুক, কুৎসা-রটনাকারী ও মৌজুদদারের হৃদয় পর্য্যন্ত করবে দগ্ধীভূত।

১০৫ : সূরা ফীল্

এই সুরায় আরবের একটি প্রাচীন কাহিনীর উল্লেখ করা হয়েছে। বিরাট হস্তি-বাহিনী নিয়ে খ্রীষ্টান রাজ আব্রাহা মক্কার কাবা-গৃহ আক্রমণ করেছিল। কিন্তু অপ্রত্যাশিত ও অতর্কিতভাবে কোথা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে আবাবিল পাখী এসে আব্রাহার সৈন্যবাহিনীর উপর ছুঁড়ে মারতে লাগল প্রস্তরখণ্ড। আব্রাহার সৈন্যবাহিনী হল পর্য্যুদস্ত—পরাজিত হয়ে আব্রাহা ফিরে গেল বাধ্য হয়ে। মানুষকে শিক্ষা ও সত্যপথ প্রদর্শনের জন্যে কোরাণে যেমন বহু প্রাচীন কাহিনীর উল্লেখ করা হয়েছে, তেমনি বহু রূপক, প্রতীক, দৃষ্টান্ত আর অলঙ্কারেরও করা হয়েছে উল্লেখ। ঐ সবের সাহায্যে মানুষকে দেওয়া হয়েছে নানা শিক্ষা ও সত্যের ইঙ্গিত। এই সুরার শিক্ষাও ব্যাপক ও সর্ব্বজনীন। আল্লার সাহায্য কখন কিভাবে কত অপ্রত্যাশিতভাবে আসে তা সাধারণ মানুষের ধারণার অতীত। শক্তি মদমত্ত মানুষের শক্তি ও সামরিক সমাবেশ যত ব্যাপক ও বিপুলই হউক না কেন, আল্লার শক্তির কাছে তা তুচ্ছাদপি তুচ্ছ। এবং সেই শক্তি কখন কিভাবে যে আসে তাও মানুষের পক্ষে অচিন্ত্যনীয়। তুচ্ছ বস্তু দিয়ে বিরাট শক্তিকে একমাত্র আল্লাই করতে পারেন ব্যর্থ। যাদের নির্ভর একমাত্র পশুশক্তির উপর তাদের পতন আব্রাহার পতনের মতই অনিবার্য্য।

১০৬ : সুরা কোরায়েশ

আয়াৎ ৩ : ৪ : ‘(কোরেশরা কা’বাগৃহের রক্ষক ও সেবক হিসেবে যে সম্মান ও মর্যাদা ভোগ করছে তার উল্লেখ করে বলা হচ্ছে)-- তারা যেন এই কা’বাগৃহের প্রভুর বন্দনা (এবাদৎ) করে, যিনি তাদেরে দিয়ে থাকেন ক্ষুধায় অন্ন ও বিপদে নিরাপত্তা।’

মানুষ যত সম্ভ্রান্ত ও কুলশীলের অধিকারীই হউক না কেন, যতই দায়িত্বপূর্ণ ও মর্য্যাদাবান কাজে নিযুক্ত থাকুক না কেন তাকেও করতে হবে আল্লার বন্দেগী।

১০৭ঃ সুরা মাউন

আয়াৎ ১ঃ 'এমন লোককে কি তুমি দেখনি যে ধর্ম্ম বা শেষ বিচারকে করে অস্বীকার?'

আয়াৎ ২ঃ 'এরকম লোকই নির্দ্দয়ভাবে এতিমকে করে বিতাড়িত।'

আয়াৎ ৩ঃ 'এবং দীনদরিদ্রকে আহার্য্য দানে দেয় না উৎসাহ।'

আয়াৎ ৪ঃ ৫ঃ 'উপাসনাকে যারা অবহেলা করে সেই সব উপাসকদের প্রতি অভিশাপ।'

এখানে আন্তরিকতাহীন উপাসনাকেই করা হচ্ছে নিন্দা। মনোযোগ ও একাগ্রতা ছাড়া যে-কোন উপাসনাই অর্থহীন ও ব্যর্থ। অবহেলার সঙ্গে যে-উপাসনা তাতে আন্তরিকতা থাকতেই পারে না।

আয়াৎ ৬ঃ 'এই সব লোক শুধু চায় লোকে দেখুক তাদের উপাসনা!'

এরকম উপাসনায় একাগ্রতা বা আন্তরিকতা কিছুতেই আশা করা যায় না। লোক দেখানোই এদের প্রধান উদ্দেশ্যঃ ফলে উপাসনার যা স্বাভাবিক পরিণতি সজ্জীবন, সৎকর্ম্ম ও পরোপকার, তা এদের দৈনন্দিন জীবনে, আচারে ব্যবহারে থাকে অনুপস্থিত।

আয়াৎ ৭ঃ '(তাই এইসব উপাসক) সাধারণ প্রতিবেশী-জনোচিত কর্ত্তব্য করতেও করে অস্বীকার।'

প্রতিবেশীর প্রতি সদয় ও সহানুভূতির সঙ্গে ব্যবহার করা ইহাও ইসলামের এক বিশেষ নির্দ্দেশ। প্রকৃত বিশ্বাসী ও ভক্ত দৈনিক অবশ্য-পালনীয় কর্ত্তব্যের মতোই প্রতিবেশীর প্রতি এই সব ছোটখাটো দায়িত্বও পালন করে থাকেন। প্রতিবেশীর বিপদে আপদে সহানুভূতি

দেখানো, যতটুকু সম্ভব সাহায্য করা, অভাবগ্রস্ত প্রতিবেশীর অভাব-মোচনে অগ্রসর হওয়া—সুবিচার ও ভদ্রতার সঙ্গে ব্যবহার করা এই সবই প্রতিবেশীপরায়ণতা এবং এই সবই ধার্ম্মিকের লক্ষণ! এবং এইসব কর্ত্তব্য পালন করতে হবে জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সব প্রতিবেশীর প্রতি।

১০৮ : সুরা কওসর

আয়াৎ ১ : ‘(হে নবী), তোমার প্রতি আমরা রহমতের স্বর্গীয় ঝর্ণাধারা মঞ্জুর করেছি।’

আয়াৎ ২ : ‘অতএব ত্যাগ ও উপাসনার সঙ্গে তোমার প্রভু অর্থাৎ আল্লাহ্-মুখীন্ হও।’

ত্যাগ ও উপাসনার হাত থেকে নবীদেরও নেই রেহাই। তাঁরাও যে অন্য মানুষের মতই মানুষ, কিছুমাত্র অতি-মানব নন্ এই সব নির্দ্দেশে তারও নিঃসন্দেহ প্রমাণ। ত্যাগ ও উপাসনা ছাড়া মানুষের জীবন হয়না মহৎ, পায়না গভীরতা, মনে আসে না আন্তরিকতা। তাই এইসব গুণ যাঁরা অগণিত মানুষকে করবেন হেদায়েৎ ও পরিচালিত তাঁদের অর্থাৎ নবীদের জীবনে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন! ত্যাগ ও উপাসনাই জীবনকে দিয়ে থাকে পূর্ণতা ও শোভনতা।

১০৯ : সূরা কাফেরূণ

আয়াৎ ১ : ২ : 'বল, (হে নবী): "হে অবিশ্বাসিগণ, তোমরা যার উপাসনা কর, আমি তাকে উপাসনা করি না;'

আয়াৎ ৩ : 'যাঁর উপাসনা আমি করি, তোমরাও তাঁকে উপাসনা করবে না।'

আয়াৎ ৪ : ৫ : 'তোমরা যার বন্দনা করতে অভ্যস্ত, আমি তার বন্দনা করতে রাজি নই; আমি যার বন্দনা করি, তুমিও তার বন্দনা করবে না।'

আয়াৎ ৬ : 'তোমার ধর্ম্ম তোমার—আমার ধর্ম্ম আমার।'

ধর্ম্ম-বিশ্বাস প্রত্যেকের ব্যক্তিগত,—নবী মানুষকে সত্যপথের নির্দ্দেশ দিয়ে তার কর্ত্তব্য তিনি পালন করেছেন। তার পরেও যারা মিথ্যাকে আঁকড়ে রয়েছে তার দায়িত্ব তাদের নিজেদেরই, তার জন্যে তারাই হবে জবাবদিহি। কোরাণে অন্যত্রও বেশ অকুণ্ঠ ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে—'ধর্ম্মে কোন জোর জবরদস্তি নেই।' এখানে স্পষ্টতর ভাষায় সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করা হ'ল। মানুষকে দেওয়া হয়েছে স্বাধীন ইচ্ছা-শক্তি—ইচ্ছাশক্তির সদ্ব্যবহার করে যে সত্যকে গ্রহণ করল তারই হল জয়, যে তা করল না তার হল হার। কতকগুলি লোক সত্যকে গ্রহণ করল না বলে সত্যের কখনো পরাজয় ঘটবে না। সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী।

১১০ : সূরা নছর

আয়াৎ ১ : ২ : 'যখন আল্লার সাহায্য ও জয় হবে সন্নিকট, তুমি দেখ্‌তে পাবে সব দলে দলে প্রবেশ করছে আল্লার ধর্ম্মে ;'—

আয়াৎ ৩ : '(তখন) আল্লার গুণকীর্ত্তন কর ও ক্ষমা প্রার্থনা কর তাঁর কাছেঃ তিনি চিরক্ষমাশীল, তিনি বার বার ক্ষমা করেন।'

বিজয়-গৌরবের দিনে সাধারণতঃ মানুষ আপন শক্তি মদগর্ব্বে গর্ব্বিত হয়ে ন্যায়ের সীমা করে লংঘন। তাই কোরাণ নির্দ্দেশ দিচ্ছে, ---বিজয়-গৌরবে অন্ধ না হয়ে আল্লাকে করো স্মরণ, তিনি যে তোমাকে বিজয়-গৌরবের অধিকারী করেছেন তার জন্যে তার প্রতি হও কৃতজ্ঞ। যার স্মরণে আল্লাহ্ থাক্‌বেন চির বিরাজমান সে কখনো সীমা লংঘন করতে পারে না, পারে না করতে কোন রকম অন্যায় ও অবিচার। তাই স্বদেশ বিতাড়িত নবী যখন বিজয়ী বেশে মক্কায় করেছেন প্রবেশ তখনও তিনি ছিলেন আল্লার প্রতি কৃতজ্ঞ-চিত্ত, কোন রকম প্রতিশোধের পরিবর্ত্তে সেদিন তিনি তার শত্রুদের প্রতিও প্রসারিত করে দিয়েছিলেন ক্ষমা, দয়া ও করুণার হস্ত।

১১১ : সূরা লহব

আমাদের নবীর আবুলহব নামে এক চাচা ছিল। তাঁর ও ইসলামের সে ছিল এক নির্মম শত্রু। আবুলহব ও তার স্ত্রী উভয়ে মিলে রসুলকে করেছিল নানাভাবে নির্যাতন। এখানে সেই আবুলহবের প্রসঙ্গেই বলা হচ্ছেঃ

আয়াৎ ২ : '(আবুলহবের) সমস্ত ধন সম্পদ ও সমস্ত উপার্জ্জন তার কোন উপকারেই আসবে না।'

সত্যই কোন উপকারেই আসেনি। নির্মম নিষ্ঠুরতার পরিণাম কখনো শুভ হয় না। আবুলহব ও আবুলহব-পত্নীর পরিণামও শুভ হয়নি। যারা সত্যের বিরোধিতা করে সত্য ও তাদের উপর নিয়ে থাকে কঠোর প্রতিশোধ। ইতিহাসে এই সত্যের পুনরাবৃত্তি বারে বারেই ঘটেছে। সত্যের এই কঠোর প্রতিশোধ আবুলহব ও আবুলহব-পত্নী এড়াতে পারেনি। কোন কালে কোন যুগেই তা কেউ-ই এড়াতে পারে না।

১১২ : সূরা এখলাস

আয়াৎ ১ : ‘বলঃ আল্লাহ্ এক; অদ্বিতীয় এক।’

আয়াৎ ২ : ‘আল্লাহ্ শাশ্বত ও অন্য-নিরপেক্ষ (অর্থাৎ সর্ব্ব-প্রকার অভাব-মুক্ত, কারো উপর নির্ভরশীল নন্ তিনি কোন ব্যাপারেই।)’

আয়াৎ ৩ : ‘তিনি জন্ম দেন্‌নি, তিনি নিজেও জাত নহেন;’

আয়াৎ ৪ : ‘তাঁর মত কেউ নেই---তিনি তুলনাবিহীন।’

দার্শনিকতা, হেঁয়ালী ও তথাকথিত মিষ্টিসিজম্ বা দুর্ব্বোধ্য ভাষার আশ্রয় না নিয়ে সহজ ও স্পষ্ট বোধগম্য ভাষায় আল্লার এক চমৎকার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এই সূরায়।

১১৩ : সূরা ফলক

আয়াৎ ১ : 'বল: আমি উষালোকের প্রভু আল্লার আশ্রয় ভিক্ষা করি ;'---

আয়াৎ ২---৫ : 'যাবতীয় সৃষ্ট-বস্তুর অপকার থেকে, বহুবিস্তৃত অন্ধকারের অপকার থেকে, গোপন যাদুবিদ্যার প্রয়োগ যারা করে তাদের অপকার থেকে, আর হিংসুকের হিংসার অপকার থেকে।'

উল্লিখিত সব কিছু থেকেই মানুষের জীবনে দুঃখ-কষ্ট, আপদ বিপদ আসতে পারে, সেই সব অজানা বিপদে মানুষের একমাত্র ত্রাণকর্তা হচ্ছেন আল্লাহ্, তাই সেই আল্লার কাছেই এখানে আশ্রয় ভিক্ষা করা হচ্ছে। লক্ষ্য করবার বিষয় সেই আল্লাকে এখানে বিশেষভাবে 'উষার প্রভু' বলেই অভিহিত করা হচ্ছে। উষার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী থেকে বিদূরীত হয় সব অন্ধকার। অন্ধকার হচ্ছে সব রকম অজ্ঞতা ও বিপদের প্রতীক। যেমন আলো হচ্ছে সব রকম জ্ঞান ও সুখ-শান্তির প্রতীক। তাই আল্লাহ্ সম্বন্ধে 'উষার প্রভু' এই প্রয়োগ বিশেষ অর্থপূর্ণ। যে আল্লাহ্ প্রতিদিন অন্ধকার দূর করে ফুটিয়ে তোলেন আলো, তিনিই বাঁচাতে পারেন মানুষকে সব রকম অজ্ঞতা ও সব রকম বিপদ আপদ থেকে ও নিয়ে যেতে পারেন সুখ-শান্তি ও জ্ঞানের জ্যোতির্ম্ময় রাজ্যে।

১১৪ঃ সূরা নাছ

আয়াৎ ১ ঃ 'আমি মানবজাতির প্রতিপালক আল্লার আশ্রয় ভিক্ষা করি;'

আয়াৎ ২ ঃ ৩ ঃ 'মানবজাতির যিনি মালিক ও প্রভু (তাঁরই আশ্রয় ভিক্ষা করি;)

আয়াৎ ৪ ঃ 'যে গোপনে কুমন্ত্রণা দিয়ে সরে পড়ে তার অপকার থেকে অর্থাৎ শয়তানের প্ররোচনা থেকে, মানুষরূপী শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে (আমি চাই আল্লার আশ্রয়);'

আয়াৎ ৫ ঃ 'মানুষের মনে মনে যে দিয়ে থাকে কুমন্ত্রণা তার হাত থেকেও; (মানুষের নিজের ভিতরেও রয়েছে বহু কুপ্রবৃত্তি, নিজের মনের কুপ্রবৃত্তি দমনেও আমি চাই আল্লার সাহায্য।)

আয়াৎ ৬ ঃ 'জীন্ এবং মানুষের মধ্যে (যারা ঐ রকম কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে ও মানুষকে নিয়ে যায় ভ্রান্ত পথে, তাদের হাত থেকেও আমি আল্লার আশ্রয় প্রার্থনা করি)।'

যে-ই দিক কুমন্ত্রণা তা গ্রহণ ও শ্রবণ দুই-ই অনুচিত, কারণ তা মানুষকে করে বিপদগ্রস্ত। সব রকম কুমন্ত্রণা ও কুপ্রবৃত্তির প্রভাব থেকে মানুষকে রক্ষা করতে ও বাঁচাতে পারেন একমাত্র আল্লাহ্—যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান। তাই তাঁরই আশ্রয় হচ্ছে মানুষের পক্ষে শ্রেষ্ঠতম আশ্রয়। সেই আশ্রয় ভিক্ষার তাগিদ কোরাণে দেওয়া হয়েছে বারংবার।

বিতর্কিকা

স্যার আবদুর রহিমের সম্প্রদায়

•

(কলকাতা থেকে প্রকাশিত সুবিখ্যাত মাসিক 'প্রবাসী'র ১৩৩২-এর আশ্বিন সংখ্যায় ''কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারী সাহায্যদান'' এ শিরোনামায় এক আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে উদ্‌ধৃত লেখাটি তারই জবাব। এটি ছাপা হয় ঐ বছরের মাঘ সংখ্যা প্রবাসীতে অর্থাৎ আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে। তখন আমি ছাত্র। আমার লেখার উত্তরে সম্পাদক যে মন্তব্য করেছেন তাও এখানে উদ্‌ধৃত হলো। বলা বাহুল্য তখন 'প্রবাসী'র সম্পাদক ছিলেন স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়—একজন নিষ্ঠাবান বহুজন শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্ম এবং সফল সম্পাদক। প্রবাসীর সাথে সাথে 'মডার্ণ রিভিয়ু' নামে একটি ইংরেজী মাসিকও তিনি সম্পাদনা করতেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এঁকে অশেষ শ্রদ্ধা করতেন। স্যার আবদুর রহিম ছিলেন সে যুগের এক বিখ্যাত মুসলিম জন নায়ক যখনকার কথা এখানে লেখা হয়েছে তখন তিনি ছিলেন অবিভক্ত বাংলাদেশের গভর্ণরের এক্সিকিউটিভ কৌন্সিলের সদস্য আর শিক্ষা বিভাগ ছিল তাঁর জিম্মায়।)

আশ্বিনের প্রবাসীর বিবিধ-প্রসঙ্গে 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারী সাহায্যদান' সম্বন্ধে আলোচনাকালে একস্থানে লেখা হইয়াছে "শুনিলাম স্যার আবদুর রহিম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অফিসে মধ্যে-মধ্যে চিঠি লিখিয়া এরূপ-সব তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন, যাহাতে কলিকাতাকে টাকা কম দিবার কারণ প্রদর্শন করা সহজ হইতে পারে, কিম্বা নিজের সম্প্রদায়ের লোকদিগকে টাকা পাওয়াইবার সুবিধা হইতে পারে।" আমরা এই কথা-কয়টির ঠিক অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি এই-রকম 'তথ্য' থাকে যাহা বাহির হইয়া পড়িলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে টাকা কম দিবার কারণ দর্শানো সহজ হইয়া পড়ে, শুধু কলিকাতা কেন যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি সেই-রকম অফিশিয়াল 'তথ্য' থাকে তাহা জানিয়া লওয়া এবং তাহার বিহিত ব্যবস্থা করাতে দোষ কি আছে আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।

স্যার আবদুর রহিম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আফিস হইতে যে 'তথ্য' সংগ্রহ করিবেন তাহা অন্ততঃপক্ষে মিথ্যা বা খেয়ালী হইবে না বলিয়াই আমাদের মনে হয়। আমাদের 'মনে হওয়াটা' যদি সত্য হয় তবে বুঝিতে হইবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বা যে-কোনো বিশ্ববিদ্যালয় আফিসে ঐ রকম 'তথ্য' পাওয়া যায়, সেখানে নিশ্চয়ই টাকার অপব্যবহার হয়। এই-রকম সত্য তথ্যের সাহায্যে যদি কলিকাতা বা যে-কোন বিশ্ববিদ্যালয়কে স্যার আবদুর রহিম বা তাঁহার স্থানের যে কেহ টাকা কম দিবার কারণ দর্শান, তাহা হইলে তাহা অন্যায় হইবে বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য প্রবাসী-সম্পাদক মহোদয়ও ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। শুধু কটাক্ষপাত করিয়াছেন মাত্র।

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক সাহেবের দ্বিতীয় কথা, "কিম্বা নিজের সম্প্রদায়ের লোকদিগকে টাকা পাওয়াইবার সুবিধা হইতে পারে।" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে টাকা কম দিলে বা একেবারেই না দিলে সেই টাকা কেমন করিয়া স্যার আবদুর রহিমের সম্প্রদায়ের পকেটে আনিয়া ফেলান হইবে তাহাও আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমরাও স্যার আবদুর রহিমের সম্প্রদায়ের লোক, কাজেই টাকা পাওয়ার নামে আমাদেরও লোভ হয় বই কি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে টাকা কম দিয়া বা একেবারেই না দিয়া সেই টাকা যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া হয় তাহাতেও প্রবাসী-সম্পাদক মহোদয়ের সম্প্রদায়ের যত লাভ স্যার আবদুর রহিমের সম্প্রদায়ের তত লাভ নাই।

কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যায়, শিক্ষক সংখ্যায় এবং কর্ম্মচারী সংখ্যায় স্যার আবদুর রহিমের সম্প্রদায়ের লোক এক তৃতীয়াংশেরও কম কাজেই শিক্ষা বিভাগের সমস্ত টাকাও যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পায়ে ঢালিয়া দেওয়া হয় তথাপি স্যার আবদুর রহিমের সম্প্রদায়ের চেয়ে প্রবাসী-সম্পাদকের সম্প্রদায়ের লাভ হয় তিনগুণেরও বেশী। সুতরাং স্যার আবদুর রহিম ঢাকা বা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে টাকা দেওয়ায় বা না দেওয়ায়, অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় তাঁহার স্বসম্প্রদায়ের কোন বিশেষ লাভ বা ক্ষতি নাই। অবশ্য স্যার আবদুর রহিম কি মতলবে ঐ সমস্ত 'তথ্য' সংগ্রহ করিতেছেন, তাহা আমরা

জানি না; কারণ স্যার আবদুর রহিমের মতন বড় চাকুরের সহিত আমাদের আলাপ থাকা দূরে থাক, আমরা আজ পর্য্যন্ত তাঁহার মুখচন্দ্রিমা দেখিবার সুযোগও পাই নাই। সুতরাং স্যার আবদুর রহিম কি-কি কারণ দর্শাইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে টাকা কম দিবেন এবং কোন্ কোন্ রাস্তা দিয়া কি-কি যানবাহনাদির মারফত সেই টাকাগুলি তাঁহার সম্প্রদায়ের জেবে আনিয়া ফেলিবেন তাহা প্রবাসী-সম্পাদক মহোদয় একটু খোলসা করিয়া বলিলে সুবিধা হয়। নবীন আমরা, দূরদর্শী প্রবীণের গভীর মতামত হয়ত এখন বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না, খুলিয়া বলিলে বুঝিতেও পারি।

এইখানে বলিয়া রাখা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্য না দেওয়ার পক্ষপাতী নহি। আমাদের অভিযোগ টাকার অযথা অপব্যবহার এবং সম্প্রদায়-বিশেষের একচেটিয়া প্রভুত্ব বা সম্প্রদায়-বিশেষের প্রতি পক্ষপাতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও যদি ঐরকম কুক্রিয়া হইয়া থাকে, আমরা তাহারও সমান জোরে প্রতিবাদ করিতেছি। অনেকেই মনে করেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমানদিগকে খুব বেশী-রকমের সুবিধা দেওয়া হইয়াছে এবং ইসলামী শিক্ষার একটা বিশেষ সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে; প্রবাসী-সম্পাদক সাহেবেরও এই মত। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অনেক অ-মুসলমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ব্যঙ্গ করিয়া 'মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়'ও বলিয়া থাকেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরের খবর জানা থাকিলে ইঁহারা এই ধারণা কখনও পোষণ করিতে পারিতেন না। দুঃখের বিষয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের সমালোচকেরা শুধু অতিরঞ্জিত অনুষ্ঠানলিপি (prospectus) পাঠ্যতালিকা (curriculum) এবং চেন্সেলার ও ভাইস্ চেন্সেলারদের শ্রুতিমধুর কন্‌ভোকেশন্ বক্তৃতা পড়িয়াই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়া বসেন। কিন্তু ইঁহারা তলাইয়া দেখেন না যে, এই সমস্ত হইতেছে 'বাহ্যিক' বিজ্ঞাপন মাত্র। হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড ও ৫০০্ টাকা পুরস্কারের নীচে ভোলানাথের জ্বরের যম, শিশি ।।০ আট আনা মাত্র। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী শিক্ষার একটি শাখা রাখা হইয়াছে বই কি, কিন্তু সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই

শাখাটি খুব বেশী উপেক্ষিত বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না। ঐ বিভাগে উপযুক্ত-সংখ্যক শিক্ষক নাই বলিলেও হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য শাখাকে যেমন ইংরেজী, ইতিহাস, অঙ্ক, ফিলজফি, সংস্কৃত প্রভৃতিকে যতটুকু সুযোগ সুবিধা দেওয়া হইয়াছে এই শাখাটিকেও অন্ততপক্ষে ততটুকু সুযোগ সুবিধা দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সেই সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় নাই। এই শাখার শিক্ষকের অভাবে নিয়মিত ক্লাশ হয় না, তাই নির্দ্দিষ্ট পঠিতব্য বিষয়ের এক-তৃতীয়াংশও বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত খতম্ করা যায় না। সময়-সময় দুই-তিনটি ক্লাশও সম্মিলিতভাবে করিতে হয়। এই বৎসর ইস্‌লামী শাখার প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক এবং আরবী অনার্সের দ্বিতীয় বার্ষিক আরবী সাহিত্য একসঙ্গে পড়ানো হইতেছে। দ্বিতীয় বার্ষিক ক্লাসদ্বয় প্রথম বার্ষিকের সময় শিক্ষকের অভাবে একদিনের জন্যও মিলিত হইবার সুযোগ পায় নাই। কাজেই এখন মুড়ি-মুড়কী এক সঙ্গে। ইহা অতিরঞ্জিত নহে, এই ত্রিবেণী-সঙ্গমে এই লেখকেরও যোগ দিবার সুযোগ হইয়াছে। যাঁহারা মনে করেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'উচচ আরবী শিক্ষার কেন্দ্র' হইয়া উঠিয়াছে তাঁহারা ভুল বুঝিয়াছেন। এখানে সংস্কৃত বা অন্যান্য বিষয় যে রকম সুচারুরূপে শিক্ষা দেওয়া হয়, ইসলামী শিক্ষা বা আরবী সেইরূপ হয় না। এই বৎসর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইসলামী শিক্ষার কয়েকজন এম-এ-পাশ করিয়া বাহির হইল। ইহারাই ইসলামী শিক্ষার সর্ব্বপ্রথম এম.এ। শুনিলাম অধিকাংশই নাকি ফাস্‌ট ক্লাস পাইয়াছেন। দেখা যাউক, ইঁহারা দেশের ও জাতির কতটুকু কি করেন। অনেকেই মনে করেন ইঁহারা চতুর্ভুজ হইয়াছেন---কারণ ইঁহারা আরবী, ইংরেজী, উর্দ্দু বাংলা এই চতুর্বিদ্যায় পারদর্শী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্রদিগকে যেমন ইস্‌লামী শিক্ষার বিশেষ সুবিধা করিয়া দেওয়া হয় নাই, অন্যান্যদিকেও তাহারা উপেক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি ছাত্রাবাসের মধ্যে দুইটি অ-মুসলমান কর্ত্তৃক অধিকৃত। একটি মাত্র মুসলমানদিগকে দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে মুসলমান ছাত্রদের সংস্থান হইতেছে না। ছাত্রেরা এখানে-ওখানে বাসা করিয়া নানা অসুবিধার মধ্যে দিন কাটাইতেছে। এই দিকে

বিশ্ববিদ্যালয়ের নজর নাই, অবশ্য নূতন ছাত্রাবাস নির্ম্মাণের প্রস্তাব পাস হইতে ত্রুটি হইতেছে না। অথচ ঢাক পিটাইয়া ঘোষণা করা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমানদিগকে 'হাতে সূর্য্য ভালে চাঁদ' দেওয়া হইয়াছে।

সম্পাদকের মন্তব্য

খবরের কাগজে এমন অনেক চেষ্টার কথা লিখিত হয়, যাহার সংবাদ প্রকাশিত হইয়া পড়ায় সে সব চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। সুতরাং পরে তাহার কোন সহজলভ্য প্রমাণ থাকে না, এবং সে বিষয়ে আলোচনা করিবারও আত্যন্তিক প্রয়োজন থাকে না। তবে ইহা ঠিক্, যে কোন সম্পাদক এরূপ চেষ্টার কল্পিত কথা প্রকাশিত করিলে সেরূপ কাজ নিন্দনীয়। আমাদের বিশ্বাস আমরা কল্পিত খবর প্রকাশ করি নাই; খবর পাইয়া লিখিয়াছিলাম। অবশ্য, আমাদের কথা মিথ্যা মনে করিবার অধিকার সকলেরই আছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে টাকার অপব্যবহার নিবারণের জন্য মডার্ণ রিভিউ ও প্রবাসীতে অন্য কোন কাগজ অপেক্ষা কম চেষ্টা হয় নাই। সুতরাং স্যার্ আবদুর রহিম সেরূপ কোন চেষ্টা করিয়া থাকিলে আমরা তাহার বিরোধিতা করি নাই, বুঝিতে হইবে।

তথ্যসংগ্রহে দোষ নাই। কিন্তু তথ্যের অপব্যবহার দ্বারা প্রতিষ্ঠান-বিশেষকে ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করা অসম্ভব নহে। আমরা জানি, এই প্রকারে একটি অতীব প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানকে বঞ্চিত করা হইয়াছে। কিন্তু সে-বিষয়ে সমুদয় খবর ছাপিবার অধিকার আমরা পাই নাই। এই অকীর্ত্তি রহিম-সাহেবের নহে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে টাকা একেবারেই না দিলে, তাহাতে ভাগ বসান সম্ভব নহে, ইহা আমরাও বুঝি। কিন্তু কাহাকেও টাকা কম দিলে, তাহার ভাগবখরা নিশ্চয়ই হইতে পারে।

আমরা পক্ষপাতশূন্য, কিম্বা কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বা সপক্ষে আমাদের কোন বদ্ধমূল ধারণা বা সংস্কার নাই, এরূপ উচ্চ দাবী আমরা

করিতে পারি না। কিন্তু ইহা বলিলে অহঙ্কার করা হইবে না, যে, আমরা নিরপেক্ষভাবে লিখিতে চেষ্টা করি। সুতরাং প্রবাসীর সম্পাদকের যদি কোন সম্প্রদায় থাকে, তাহা হইলেও আমরা সেই সম্প্রদায়ের লাভের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কিছু লিখি, ইহা সত্য বলিয়া মানিতে পারি না। মুসলমান সম্প্রদায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অন্য অনেক প্রতিষ্ঠানে যে যথাযোগ্য কাজ করিবার ও টাকা রোজগার করিবার সুযোগ পান না, তাহা সম্পূর্ণরূপে অমুসলমানদের দোষে ঘটে নাই। মুসলমান-দিগের পাশ্চাত্য জ্ঞানলাভ করিতে অবহেলা ও বিলম্ব করাও ইহার অন্যতম এবং প্রধান কারণ।

টাকার অপব্যবহারে এবং সম্প্রদায়বিশেষের একচেটিয়া প্রভুত্বে আমাদেরও আপত্তি আছে, এবং তাহা বহু বার প্রকাশ করিয়াছি।

লেখক বলেন, "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমানদিগকে খুব বেশী রকমের সুবিধা দেওয়া হইয়াছে এবং ইস্‌লামী শিক্ষার একটা বিশেষ সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে—প্রবাসী-সম্পাদক সাহেবেরও এই মত।" আমরা কোথাও কখনও ঠিক এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছি বলিয়া মনে পড়িতেছে না। তবে এরূপ ধারণা আমাদের ছিল বটে, যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ায় মুসলমানদিগের কিছু সুবিধা হইয়াছে এবং ইসলামী শিক্ষারও কিছু সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। কিন্তু লেখক মহাশয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে আমাদের ধারণা ভ্রান্ত মনে হইতেছে ইহা দুঃখের বিষয়।

ইসলামী শিক্ষা

[এটি ছাপা হয়েছিল 'সলীমুল্লা মুসলিম হল ম্যাগাজিনের' প্রথম সংখ্যায়। ঐ পত্রিকার যে কাটিংসটুকু আমার কাছে আছে তাতে বছরের উল্লেখ নেই। সম্ভবতঃ পত্রিকাটির গোড়ায় অর্থাৎ টাইটেলেই শুধু বছরের নাম ছাপা হয়েছিল। অনুমান পত্রিকাটি ১৯২৬ কি ২৭ শেই প্রকাশিত। তখন আমি উক্ত হলের আবাসিক ছাত্র। এটি কোন বিশেষ লেখার প্রতিবাদ নয়, তবে প্রতিবাদের স্বর এটিতেও অস্পষ্ট নয়। এর আগে যে লেখাটি ছাপা হয়েছে এবং তার উপর 'প্রবাসী'—সম্পাদক যে মন্তব্য করেছেন তার আলোয় পড়ে দেখলে এটিকেও নেহাৎ প্রক্ষিপ্ত মনে হবে না।]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইস্‌লামী শিক্ষার একটী শাখা রাখা হইয়াছে--এতে অনেক মুসলমান, আমরা নিজেরাও খুব আনন্দিত হইয়াছিলাম—হয়ত বাঙ্গালী মুসলমানের চিন্তা ধারায় এবার যুগান্তর আসিবে। সকলেই একটা বৃহত্তর ভবিষ্যতের অপেক্ষা করিতেছিল। অতীতের যুগসঞ্চিত অগাধ সম্পদ হইতে হয়ত জ্ঞানের নবীন পূজারীগণ নব যুগের উপযোগী নূতন তথ্যের সন্ধান দিয়া জরাগ্রস্ত বাঙ্গালী মুসলমানের মস্তিষ্কে নূতন ভাব-বিপ্লব স্বষ্টি করিবে। জ্ঞানের আলোকে জাতির চিন্তার দাসত্ব ঘুচিবে---নব নব চিন্তার নব নব উন্মেষে---প্রকৃতির বিচিত্র সুরে ও গানে বাঙ্গালী মুসলমানের আঙ্গিনা ভরিয়া উঠিবে। আরবের মরু প্রান্তরে ইসলাম যে অপূর্ব্ব শক্তি ও বিচিত্র সুরের সৃষ্টি করিয়াছিল---বাঙ্গালী মুসলমান, ভারতের মুসলমান, তার অন্তরের সেই শক্তির লীলা ও সুরের কলতান পায় নাই। সে শুধু ইসলামের বাহ্যিক খোলসটাই পাইয়াছিল। তাই ভারতে ইসলাম বাহিরে যতখানি বাড়িয়াছে অন্তরে, ভাবের রাজ্যে অর্থাৎ সোজা কথায় culture-এর দিক দিয়া তার সেই অনুপাতে উন্নতি হয় নাই। বহু শতাব্দী ধরিয়া আমরা ভারতে আছি, ভারতকে বাদ দিলে সেই সময়কার ইসলামের ইতিহাস বড়ই গৌরবের ইতিহাস, পারস্য,

বোগ্‌দাদ ও স্পেনে ইসলামের জ্ঞান সাধকগণ জ্ঞানের বিচিত্র-সাধনায়, সৃষ্টির নব নব রূপে ইসলামকে তথা বিশ্বকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিতে-ছিল---আর এই দিকে আমাদের হেরেমে বাঁদীর সংখ্যাই বৃদ্ধি পাইতে-ছিল! অনেকের কাছে পূর্ব্ব পুরুষের এই সব দুর্ব্বলতার কথা ভাল লাগিবে না জানি---কিন্তু এই সব নির্ম্মম সত্য খুলিয়া না ধরিলে আমাদের ভবিষ্যতের পথ ত নির্দ্দেশিত হইবে না। মানুষের ভুল ভ্রান্তি হয়—অতীতে আমাদের অসংখ্য গৌরবযোগ্য জিনিষের সঙ্গে সঙ্গে অনেক ভুল ভ্রান্তিও জড়িত হইয়া গিয়াছে---তাহাতে সাময়িকভাবে গর্ব্বান্ধ হইয়া ধামা চাপা দিলে আমাদের ভবিষ্যৎও সেই ভুলচুক হইতে মুক্তি পাইবে না। মুসলমান রাজত্বের সেই দীর্ঘ শতাব্দীর মধ্যে কিছু কবিতা, খান কয়েক ধর্ম্ম পুস্তক, আর কয়েকখানি ইতিহাস---এর বেশী আমাদের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি আর কি আছে? আরবের জ্ঞান-সাধনা ইউরোপে (Renaissance) নব জীবনের. সূত্রপাত করিয়াছিল কিন্তু ভারতীয় মুসলমান ভারতে ভাব-বিপ্লব সৃষ্টি করিতে পারে নাই। সত্য বটে মুসলমান আমলে নানক, কবীর প্রভৃতির ন্যায়, কয়েকজন ধর্ম্ম প্রচারকের আবির্ভাব হইয়াছিল কিন্তু তাহাও আরবের দান; ইসলামের মন্ত্র শক্তির সঙ্গে এদেশের মন্ত্র শক্তির সংঘর্ষেরই ফল; এ ভারতীয় মুসলমানের culture-এর সৃষ্টি নয়। তাই বলিতে ছিলাম একেবারে গোড়া থেকেই এদেশে আমরা ইসলামের শক্তির সন্ধান, তার বিরাট cultureএর সন্ধান পাই নাই। Education আর culture ঠিক এক জিনিষ নয়। আমরা ইসলামী Education পাইয়াছি এবং পাইতেছি—আমাদের মধ্যে মৌলবী, মৌলানা, হাফেজ ইত্যাদির অভাব নাই---কিন্তু আমরা ইসলামী culture পাই নাই। তাই এদেশে তেমন কোন বড় মুসলমান চিন্তাশীলের জন্ম হয় নাই। আবিসীনা, ইব্‌নে রোশ্‌দ্‌ বা ওমর খৈয়াম এদেশে জন্মে নাই, নূতন বিজ্ঞান বা জ্ঞানের নূতন শাখায় ভারতের মুসলমান কিছুই সৃষ্টি করে নাই। আমার মনে হয় এর মূলীভূত কারণ সংস্কার-বর্জ্জিত স্বাধীন চিত্ত লইয়া আমরা ইসলামের culture করি নাই। ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে Islamic studies বিভাগে মুসলমান ছাত্রেরা culture এর সন্ধান পাইবে বলিয়া আমরা আশা করিয়াছিলাম কিন্তু কয়েক বছরের ফল দেখিয়া আমাদের আশা পূর্ণ হইবে বলিয়া মনে

হইতেছে না---এখানেও সেই গতানুগতিক পন্থার ব্যতিক্রম নাই--পড়া হইতেছে ঢের, চিন্তার উৎকর্ষ হইতেছে না মোটেও---এ কথায় অতি রঞ্জন কিছুই নাই; আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি। এখানে হয়ত memorisation হইতেছে কিন্তু culture হইতেছে না। কোরাণ, হাদীস্, তফসীর ফেকা সবই পড়ান হইতেছে কিন্তু বর্ত্তমান কালোপযোগী জাতির ভবিষ্যৎ পথ নির্দ্দেশের নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে না---ছেলেরাও মনের ততখানি উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিতেছে না। প্রত্যেক ধর্ম্মের দুইটি রূপ আছে; বাহির ও ভিতর—ইসলামের যাহা ভিতরের রূপ যাহার উপর ইসলামের ভিত্তি, যেমন 'তৌহীদ,' হজরত মোহাম্মদ খোদার রছুল ইত্যাদি। এইগুলি শাশ্বত সনাতন। এইগুলি অপরিবর্ত্তনীয় কিন্তু যাহা বাহ্যিক—যুগের সঙ্গে সঙ্গে তার পরিবর্ত্তন না হইয়াই পারে না। তাহার প্রমাণ আমরা হজরত মোহাম্মদের জীবনকালেই পাই। কোরাণ ও হাদীসে এক সময় এক হুকুম জারি হইয়াছে কিন্তু কিছুদিন পরে হয়ত অন্য আয়াতে বা হাদীসে ঐ হুকুম 'রদ্' হইয়া গিয়াছে। ইহা থেকে কি আমরা এই শিক্ষা পাই না যে ইসলামের বাহ্যিকরূপকে যুগের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত করিলেও আসল ধর্ম্মের কোন অনিষ্ট হয় না। বরং তার দ্রুত উন্নতির জন্য এই পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। ১৪ শত বৎসর পূর্ব্বে আরবের তৎকালীন অবস্থায় যে সামাজিক ও রাজনৈতিক কায়দা কানুনের সৃষ্টি হইয়াছিল, আজ বিংশ শতাব্দীতে তাহা হয়ত চলিতেছেনা; এই জন্য সময়োপযোগী পরিবর্ত্তনে আসল ধর্ম্মের কোন অনিষ্ট হইতে পারে বলিয়া আমার মনে হয় না। পরিবর্ত্তন ছাড়া কোন জীবিত জিনিষই বাঁচিতে পারে না---জীবিত ধর্ম্মও পরিবর্ত্তনকে এড়াইয়া বাঁচিতে পারিবে না। ইসলামও যদি বাঁচিয়া থাকে তবে এই পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়াই বাঁচিয়া থাকিবে। কোরাণ হাদীস হইতে পরবর্ত্তী যুগে ইমামেরা কি কালোপযোগী কায়দা কানুনের সৃষ্টি করেন নাই? ঐ গুলিই ফেকা নামে অভিহিত হইয়াছে। এই যুগেও যদি ইসলামের বাহ্যিকরূপের পরিবর্তন কিছু দরকার হইয়া পড়ে তাহা করার ভার Islamic Studeis-এর ছাত্রেরা নিবে বলিয়া আশা করিয়া ছিলাম। ভারতের বাহিরে এই পরিবর্ত্তন শুরু হইয়াছে---একটা ক্ষুদ্র

উদাহরণ দিই চুরি করিলে এখন মুসলমান রাজ্যেও হাতকাটা হয় না। ভারতবর্ষেও কিছু কিছু পরিবর্ত্তনের দরকার হয় নাই এই কথা বলা যায় না! কিন্তু এই পরিবর্ত্তন করিতে হইলে অতীত ও বর্ত্তমানের যতখানি culture-এর দরকার তাহা কি Islamic Studies-এর ছাত্রেরা পাইতেছে?

অতি আধুনিক সাহিত্য ও শরৎচন্দ্র

[এটি মুদ্রিত হয়েছিল ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'মাসিক সঞ্চয়ের' ১৩৩৬ বাংলার পৌষ সংখ্যায়। লেখাটি শরৎচন্দ্রের অতি-আধুনিক সাহিত্য-বিরোধী একটি লেখার প্রতিবাদ। তখন কল্লোল-কালি কলমের যুগ আর আমরা তখন অতি-আধুনিক সাহিত্যের ভয়ংকর উৎসাহী পাঠক এবং ভক্তও। মাসিক সঞ্চয় সম্বন্ধে আমার 'রেখাচিত্রে' লেখা হয়েছে, "সুবিখ্যাত 'শূলসুধা' ঔষধের বিজ্ঞাপনী পত্রিকা ছিল 'মাসিক সঞ্চয়।' ওখানে ম্যানজার হিসেবে আমাদের এক বন্ধু কাজ করতেন। তাঁকে কি করে হাত করে আবদুল কাদির সেই বিজ্ঞাপনী পত্রিকাটিকেই রাতারাতি সাহিত্য পত্রিকায় করে ফেলেছিল রূপান্তরিত। প্রতি মাসে স্বনামে বেনামে ঐ পত্রিকায় আমাকেও অনেক লেখা লিখতে হয়েছে।" এ অনেক লেখার একটি হচ্ছে এটি। আবদুল কাদির মানে কবি আবদুল কাদির--'দিলরুবা' আর 'উত্তর বসন্ত' যাঁর কাব্য-গ্রন্থ এবং যিনি ছান্দসিক কবি নামে খ্যাত।]

বছর দুই তিন আগে কথা-শিল্পী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অতি-আধুনিক সাহিত্যের প্রশংসা করিয়াছিলেন—'শৈলজা প্রেমেন্দ্র-নজরুল-কল্লোল-কালিকলমের' প্রশংসা করিতে যাইয়া সেইদিন তিনি রবীন্দ্রনাথকে পর্য্যন্ত অসঙ্গত কড়া কথা শুনাইয়াছিলেন। আবার এই সেইদিন তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁহার পূর্ব্ব মতামতের জন্য তৌবা করিয়া তরুণ সাহিত্যকে গ্লানির বস্তু বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। থাক্ Change, change, constant change is life. এই নিয়া কোন কথা হইতেছেনা—কথা হইতেছে শরৎচন্দ্র আন্দাজী ঢিল ছুঁড়িলেন কেন? অথচ তিনি বলিতেছেন তিনি তরুণদের সব লেখাই পড়িয়াছেন---। কোন্ তরুণের, কোন্ রচনা বাংলা সাহিত্যের গ্লানির বস্তু হইয়া উঠিয়াছে এই কথা তিনি খুলিয়া বলিলে বাংলার পাঠক পাঠিকাদের উপকার হইত। আন্দাজী ঢিল ছোঁড়ায় একটী সুবিধা তাহা কাহারও গায়ে লাগেনা। কিন্তু সেইরকম আর একটি অসুবিধা এই যে তাহা

জুনিয়ার সাহিত্যিকদেরই বুঝায়। শৈলজা প্রেমেন্দ্র, নজরুলের লেখার প্রশংসা স্বয়ং শরৎচন্দ্রই ত করিয়াছিলেন। শৈলজা, অচিন্ত্য, জসীম, জগদীশ গুপ্তের লেখার প্রশংসা রবীন্দ্রনাথ করিয়াছেন। বাকী রহিলেন শিবরাম, জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব, প্রবোধ সান্যাল—এই দুই তিন বৎসরের মধ্যে ইহাঁদের এমন কি লেখা বাহির হইয়াছে যাহার জন্য বাংলা সাহিত্য আজ গ্লানির বস্তু হইয়া উঠিয়াছে? এই কয় বৎসরের মধ্যে তরুণ সাহিত্যিকদের বই ত এই কয়খানাই মাত্র—নজরুল ইসলামের গজল গান, আর খান দুই কবিতার বই, অচিন্ত্যসেনগুপ্তের 'বেদে' ও 'টুটা ফুটা', প্রেমেন্দ্রমিত্রের 'পঞ্চশর' শৈলজার 'বানভাসি,' 'বহুবচন,' 'মাটির রাজা,' জসীম উদ্দীনের 'রাখালী,' 'নক্সী কাঁথার মাঠ,' প্রবোধ সান্যালের 'যাযাবর,' জগদীশগুপ্তের 'বিনোদিনী,' 'অসাধু সিদ্ধার্থ,' 'রূপের বাহিরে;' জীবনানন্দ দাশের ঝরা-পালক, এই ত। ইহার মধ্যে কোন বইটি বাংলা সাহিত্যের গ্লানির বস্তু, আমরা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।

শরৎচন্দ্রের কথা—"তারা (অর্থাৎ তরুণেরা) বর্ত্তমানে যে সাহিত্য গড়ে তুল্‌ছে, তাতে রস থাকেনা, গ্লানি থাকে।"

নজরুল ইসলামের গজল গানগুলিতে রস নাই, শুধু গ্লানি! জসীমউদ্দিনের গাথাও কি গ্লানিকর?—শনিবারের চিঠিও প্রশংসা করিয়াছেন। না, জসীমউদ্দীন তরুণ নয়?—প্রেসিডেন্সি কলেজেই ত পড়ে বোধ হয়! এই যদি গ্লানির বস্তু হয় বাংলা সাহিত্য এই গ্লানিকে মাথায় নিয়া যে কোন সম্রাটের ঘোষণা বাণীকে উপেক্ষা করিয়া জয়যাত্রার পথে চলিবেই। সম্রাটের ঘোষণাবাণী রাজনীতিতে চলে। সাহিত্যে বিচারকের রায়েরই মূল্য বেশী। দুঃখের বিষয় শরৎচন্দ্র তরুণ সাহিত্যের বিচার করেন নাই, বিচারকের সহৃদয়তা নিয়া তিনি তরুণ সাহিত্য পড়েন নাই। না হয় তাঁহার মত দরদী সাহিত্যিক কেমন করিয়া এক কথায় সমগ্র তরুণ সাহিত্যকে গ্লানিকর বলিয়া ব্যাখ্যা দিলেন? কোন কোন তরুণের কোন কোন লেখায় গ্লানি

থাকিতে পারে কিন্তু সব তরুণ লেখকই গ্লানিকর সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছেন অথবা একই লেখকের সব লেখাই গ্লানিকর, ইহা সত্য নয়। পরের মুখে যাঁহারা ঝাল খায় এই তাঁহাদেরই কথা। আমাদের মনে হয় শরৎবাবু তরুণ সাহিত্য অর্থে শনিবারের চিঠি বা মহাকাল পর্য্যন্তই পড়িয়াছেন—না হয় তিনি তরুণ সাহিত্যের নিন্দা করিবার সময় কিছু না কিছু নজির দেখাইতে পারিতেন। কোন লেখকের কোন লেখা পড়িয়া তাঁহার মন এমনি তিক্ত হইয়া উঠিল এই কথাও ত তিনি বাংলার পাঠক সাধারণকে জানাইতে পারিতেন। অনেক পাঠক তিক্তরস আস্বাদন থেকে বাঁচিয়া যাইত। শনিবারের চিঠির উদ্ধৃত কয়েক লাইন পড়িয়া যদি কোন লেখকের বিচার করা হয় তবে তাঁর প্রতি অবিচার ছাড়া আর কি হইতে পারে?

ধরুন বুদ্ধদেব বসুর এই লাইন কয়টি

কাহারে করিব ধন্য মোরা—

প্রেম দিয়ে? নির্ব্বোধ নারীর পাল, স্থূল মাংস-স্তূপ,
শরীর সর্ব্বস্ব, মূঢ়! চর্ম্ম-সাথে চর্ম্মের ঘর্ষণ
একমাত্র সুখ যাহাদের, সন্তানেরে স্তন্য দান
উচ্চতম স্বর্গলাভ।—তাহারা কী বুঝিবে প্রেমের?

যাঁহারা শুদ্ধ এই কয়টি লাইন পড়িয়া কবির বিচারে বসিবেন তাঁহারা কবির প্রতি সশ্রম দণ্ডেরই ব্যবস্থা করিবেন জানি—কিন্তু সমগ্র কবিতাটি পড়িলে পাঠকের মনের অবস্থা অন্য রকম হইয়া যায়। এই সুদীর্ঘ সুন্দর কবিতাটি কবির স্বপ্নের ছায়া পথ রচনা—এর ছন্দের সাথে পাঠকও এমনি তন্ময় হইয়া যায় যে এই লাইন কয়টি যে কোথা দিয়া কখন চলিয়া যায় সে খবরও থাকে না।

শরৎবাবু বলিতেছেন—"আজ চোখ মেলে চাইলেই দেখা যায় মানুষের যত বৃত্তি আছে তার মাত্র একটিরই বার বার আবৃত্তি এরা করেছেন।" সেই সঙ্গে আবার তিনি তরুণদের জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—আমাদের পরাধীনতা, অজ্ঞতা বা দারিদ্র্যের বেদনা কি তোমাদের প্রাণে জাগে না? তার উত্তরে তরুণেরা নাকি বলিয়াছেন—ওসব দিক্ সাহিত্যের নয় তা ছাড়া আমরা ওসব পড়িনা।

এই সব কথা যেন গল্পের মত শুনায়।

আজ নজরুল ইসলামের তিনখানি বই বাজেয়াপ্ত কেন? (শরৎবাবুর মাত্র একখানি!) নজরুল ইসলাম এক বৎসর ধরিয়া ঘানি টানিয়া আসিলেন কেন? প্রবীণ ও তরুণ সাহিত্যিকদের মধ্যে এই লাঞ্ছনা ত আর কারও হয় নাই। ঐ কি একটি বৃত্তিরই বার বার আবৃত্তির ফল?

অচিন্ত্য সেনগুপ্তের "টুটা ফুটা" কী আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত সমাজের দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর ও উলংঘ প্রকাশ নয়?

শৈলজানন্দের লেখায় কি কয়লা কুটির কুলীদের দুঃখের কাহিনী ও সমাজের বহুবিধ গ্লানি প্রকাশ পায় নাই?

শরৎবাবু কি প্রেমেন্দ্র মিত্রের মিছিল পড়িয়াছেন? এখানে ও কি তিনি একই বৃত্তির পুনরাবৃত্তি দেখিয়াছেন?

নজরুল ইসলাম 'মাধবী প্রলাপ' যেমন লিখিয়াছেন সেই সঙ্গে 'কাণ্ডারী হুঁসিয়ার'ও লিখিয়াছেন—এই সেদিনও গজল গানের সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যার কবিতাও লিখিয়াছেন। অথচ শরৎবাবু বলিতেছেন, দেশের পরাধীনতা ইহাদের মনে কোন বেদনার উদ্রেক করে নাই। নজরুল ইসলাম যে আজ তাঁর বাঁশীকে বাঁশ করিয়া তুলিয়াছেন, সেকি দেশের পরাধীনতার দুঃখ বেদনায় নয়? 'সর্ব্বহারা' কি সেই বৃত্তিরই বার বার আবৃত্তি? 'পথের দাবী' শরৎবাবুর বুড়া বয়সের লেখা, তরুণ শরৎচন্দ্রের লেখা 'চরিত্রহীন', 'গৃহদাহ' ইত্যাদি।

আমরা জানি শরৎবাবু অতিশয় emotional তবে তিনি ভুলিয়া যান যে emotion গল্প উপন্যাস, কবিতায় অবাধে চলে কিন্তু বিচারের ক্ষেত্রে emotional হইতে গেলে আসামীদের প্রতি অবিচার করা হয়। আজ যাহাদিগকে জোর করিয়া টানিয়া আনিয়া বাংলা সাহিত্যের কাটগড়ায় দাঁড় করান হইয়াছে, অতি বিনীতভাবে বলিতে চাই আমাদের সাহিত্য সম্রাট তাঁহাদের প্রতি সুবিচার করেন নাই।

দিশেহারা তারুণ্য

(এটি ছাপা হয়েছিল 'সাপ্তাহিক সওগাতের' ১৩৩৬ বাংলার ২৯শে চৈত্রের সংখ্যায়। তরুণ প্রবীণের সমস্যা নিয়ে একবার এক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল ঐ পত্রিকা-পৃষ্ঠায়। সে বিতর্কের একদিকে ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ একা অন্যদিকে ছিলেন সে যুগের তিনজন খ্যাতনামা সাংবাদিক—জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন, জনাব মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী আর জনাব আবুল মনসুর। এঁরা তিনজন এ বিতর্কে অংশ নিয়েছিলেন নূরী, ফজলে আলী আর আজীজররহমান এ ছদ্ম নামে। আমি কাজী আবদুল ওদুদের অনুরাগী ও সমর্থক। আমার এ প্রতিবাদপত্রে সেটিই স্পষ্টভাবে ধ্বনিত হয়েছে। আসলে বিরোধটা ছিল, যা এ বিতর্কের মূলে—ঢাকা School of thought আর কলিকাতা School of thonght-এর পারস্পরিক মনোভাবের পার্থক্য। এঁদের মধ্যে আমি ছিলাম বয়োকনিষ্ঠ। ফলে আমার ভাষাটা হয়েছে অধিকতর কড়া। মরহুম মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী বহুকাল আগে পরলোকগত। সুখের বিষয় বাকি দু'জন শ্রদ্ধেয় বন্ধু আজো বেঁচে।)

জনাব সম্পাদক সাহেব,

তরুণ প্রবীণ সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া সাপ্তাহিক সওগাতে প্রকাশিত কাজী আবদুল ওদুদ, মিঃ ফজলে আলী ও মিঃ নূরীর পত্রগুলি প্রতি সপ্তাহে আগ্রহের সঙ্গে পড়িয়াছি। তাঁহাদের সঙ্গে আমার মতভেদ যথেষ্ট থাকা স্বাভাবিকও। মিঃ ফজলে আলী ও মিঃ নূরীর পত্রে অতিমাত্রায় উষ্ণতা ও ব্যক্তিগত ইঙ্গিতে অস্বস্তিও অনুভব করিয়াছি কম নয়। কিন্তু গত সপ্তাহে মিঃ (অথবা মৌলবী) আজীজর রহমান সাহেব যে "কয়েকটি কথা" লিখিয়াছেন, তাহাতে শিক্ষিত, ভদ্র ও মার্জিত রুচি পাঠকমাত্রেরই ব্যথিত হইবার কারণ ঘটিয়াছে। তাই সব চিঠিগুলি আজ আবার নূতন করিয়া পড়িয়া দেখিলাম। কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের পত্রগুলিতে এমন কিছুই খুঁজিয়া পাইলাম না যার জন্য মিঃ আজীজর রহমানের

এতখানি উদ্ধতা ও সাহিত্যিক রুচিহীনতার পরিচয় দিবার দরকার ছিল। তাঁহার পত্রের শেষাংশের বক্তব্য এতই অবান্তর ও ব্যক্তিগত দোষ-দুষ্ট যে সাহিত্যে তাহার স্থান হওয়া অবাঞ্ছনীয়। তাঁহার পত্রখানি পড়িয়া মনে হইল, "গুরু মহাশয়গিরি ক্লাশরুমের বাহিরে অচল" নয়—জ্ঞান, culture ও রুচির সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় অত্যন্ত কম পদে পদে তাঁহাদের জন্য গুরুমহাশয়ের দরকার। পিঞ্জরাবদ্ধ পশু গর্জন করে, বনের মুক্ত পশুর চাইতেও বেশী। যাহার সম্মুখে পথ আছে, সে চলে—যাহার সম্মুখে কোন পথের সন্ধান নাই, সে অন্ধ, সে শুধু আর্তনাদ করে—চেঁচায়। সবল খেলার সাথীর হাতে মার খাইয়া অসহায় দুর্বল বালক দাঁতমুখ খিঁচাইয়া শুধু গালিই পাড়ে।

কাজী আবদুল আবদুল ওদুদ বুদ্ধি, জ্ঞান ও মনীষা লইয়া যে কথাগুলি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার সম্মুখীন হইতে বুদ্ধি ও জ্ঞানের দরকার। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, মিঃ ফজলে আলী, মিঃ নূরী ও মিঃ আজীজর রহমান বুদ্ধি ও জ্ঞানকে অস্বীকার করিয়া অত্যন্ত হাল্কা ও দৈনিকের মামুলী কথাকে লইয়া হাঁকাহাঁকি করিতেছেন। তাই এই সুদীর্ঘ আলোচনায় অত্যন্ত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে দুই দিকের দুই রূপ—একপক্ষ সত্যিকার সাহিত্যিক, সম্বল জ্ঞান, অন্যপক্ষ সাংবাদিক, সম্বল মামুলী বুলি। তাই একপক্ষে ফুটিয়া উঠিয়াছে ব্যক্তিত্বৰৰ্জ্জিত সমাজকল্যাণের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত---অন্যপক্ষে ব্যক্তিত্বের প্রতি বারংবার ইসারা ও অজ্ঞতার আস্ফালন। পরান্নভোজী দরিদ্রের পক্ষে নিজের দারিদ্র্য লইয়া গৰ্ব্ব করা এবং ধনীর ঐশ্বৰ্য্যকে হিংসা করা হয়ত স্বাভাবিক কিন্তু অজ্ঞ মানুষ যখন নিজের অজ্ঞতার অহমিকায় জ্ঞানী মানুষের পাণ্ডিত্যকে "পণ্ডিতী" বলিয়া আস্ফালন করিতে চায় তখন তাহা অত্যন্ত বেমানান।

উভয়পক্ষের বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট—

একপক্ষ বলেন, বুদ্ধির মুক্তি ও জ্ঞানচর্চা--অন্য পক্ষ বলেন, 'বিপ্লব, একটা প্রবল রকমের ওলট পালট।'

ঢাকা 'সাহিত্য সমাজের' প্রতি যখন দৃষ্টিক্ষেপ করি, 'শিখা'র পাতা যখন উল্টাই অথবা 'নব পৰ্য্যায়ের' কথা যখন স্মরণ হয় তখন এক

পক্ষের কথা, কাজ ও কর্ম্মপ্রণালী সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। অন্যপক্ষে যখন তাকাই তখন দেখি তিনজন লোক বেশ দিব্যি আরামে লেপ মুড়ি দিয়া, মুখে পান গুঁজিয়া, হুঁকার মুখে কলিকায় টিকা জ্বালাইয়া অত্যন্ত নির্বিঘ্নে ভয়ানক 'বিপ্লব' 'দারুণ' ওলট-পালট করিতেছেন, তখন বিপ্লবের immediate কাজ তামাকের existing order-এর ধ্বংসসাধন অস্পষ্ট থাকে না।

কাজী আবদুল ওদুদ তরুণদের বিরুদ্ধে অনুযোগ করিয়াছেন,—"আমাদের কোন কোন তরুণ এ পর্য্যন্ত নিজেদের দাড়ী ধ্বংস করা ভিন্ন আর কিছুই করে উঠতে পারেন নাই কেন?" কথাটি নির্মম শুনাইলেও সত্য ছাড়া আর কি?—গত generation-এর তরুণদের সঙ্গে এই যুগের তরুণদের পার্থক্য, একমাত্র ঐ দাড়ী ধ্বংসের ব্যাপারে, নতুবা কর্ম্ম ও সাধনার ক্ষেত্রে আজিকার তরুণ-মুসলিম খুব বেশী অগ্রসর নয়।

চিঠিগুলি বারবার পড়িয়াও বুঝা গেল না আমাদের বিপ্লবী বন্ধুগণ বিপ্লব অর্থে কি বুঝেন, কার সঙ্গে বিপ্লব, কি বিষয়ে বিপ্লব—তাঁহাদের immediate কাজই বা কি, ভবিষ্যৎ 'প্রোগ্রামই' বা কি—কিছুরই ইঙ্গিত তাঁরা আমাদের সম্মুখে দিতে পারেন নাই—existing order এর ধ্বংস সাধন বলিলে কিছুই পরিষ্কার বোঝা যায় না, অত্যন্ত vague অস্পষ্ট কথায় নিজেকে ও মানুষকে ফাঁকি দিবার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয় মাত্র। কাজী আবদুল ওদুদ যে তিনটি প্রশ্ন করিয়াছেন তাহা অতি সুস্পষ্ট কিন্তু আমাদের বিপ্লবী বন্ধুগণ তাহা যে ভাবে পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন তাহাতে মনে হয় পৃথিবীর কোন দেশের কোন বিপ্লবের ইতিহাসের সঙ্গেই তাঁহারা পরিচিত নন। লেনিন, কার্লমার্ক্স, ফ্রান্স, রুশিয়া ও তুরস্কের নাম আওড়াইতে আজকাল বার বৎসরের বালকেও পারে। যদি ফরাসী বিপ্লব কি রাশিয়ান বিপ্লবের ইতিহাস-অন্ততঃ কার্লমার্ক্স ও রুশোর বইগুলি ইঁহারা পড়িয়া দেখিতেন তবে তাঁহাদের কল্পিত বিপ্লবের একটা সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে তাঁহারা সক্ষম হইতেন এবং একটা চলনসই প্রোগ্রামও হয়ত খাড়া করিতে পারিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই দিক দিয়া তাঁহারা নিজেদের চিন্তা ও জ্ঞানের শোচনীয় দৈন্য দেখাইয়াছেন।

মিঃ ফজলে আলী লিখিতেছেন, "আমার প্রোগ্রাম কি অধ্যাপক সাহেব জান্তে চেয়েছেন, আমি দিতেও পারি, কিন্তু ভাবনার কথা, তাঁকে আমার প্রোগ্রাম জানিয়ে যে লাভ তা কি লেনিনের প্রোগ্রাম বার্ণাড শ'-কে জানিয়ে যে লাভ হোতো তার চাইতে আলাদা কিছু হবে?" বার্ণাড শ' লেনিনের প্রোগ্রাম জানিতেন না এই কথা যাঁহারা শ'র বই স্পর্শ করেন নাই তাঁহারাই হয়ত বলিতে পারেন। তা যাহাই হউক মিঃ ফজলে আলী কি এই কথা জানেন না সংবাদ পত্রিকায় বাদ-প্রতিবাদের লক্ষ্য জনসাধারণ, বাদ প্রতিবাদকারী নয়—তাঁর প্রোগ্রাম জানিয়া কাজী আবদুল ওদুদের কোন লাভ না হইতে পারে কিন্তু দেশের একষ্টি মিষ্ট তরুণদের লাভ হইতে পারিত, এই তিনি কেন বিস্মৃত হইলেন। কাজী আবদুল ওদুদ যদি তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য হইয়া থাকেন তবে চিঠিখানি সওগাতে না ছাপাইয়া কাজী আবদুল ওদুদের বাসার ঠিকানায় পাঠাইয়া দেওয়াই হইত সব চাইতে বুদ্ধিমানের কাজ।

কাজী আবদুল ওদুদের প্রশ্ন তিনটির নীচে সওগাত সম্পাদক একটুখানি মাতব্বরী করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

"প্রথম যে দুইটি প্রশ্ন অধ্যাপক সাহেব করিয়াছেন তাহার উত্তর তিনি যেমন অন্যের নিকট দাবী করিতে পারেন, অন্যেও তেমনি তাঁহার নিকট আশা করিতে পারেন, কারণ তিনি প্রায় সবারই চক্ষে তরুণদের অন্যতম প্রধান অগ্রণী।" কথাগুলির মধ্যে কোন লজিক (মিঃ আজিজর রহমান দেখিতেছি লজিকের উপর ভয়ানক খাপ্পা—তবে তাঁহার স্মরণ রাখা ভাল আজিও সভ্য মানুষের তর্ক লজিককে স্বীকার করিয়াই), কোন যৌক্তিকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বিপ্লবের প্রতি কাজী আবদুল ওদুদের কোন শ্রদ্ধা নাই, যাঁরা বিপ্লবের পতাকাবাহী তাঁহাদের প্রতি বিপ্লব সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন—সওগাত সম্পাদক বলিতে চাহেন সেই প্রশ্নগুলির উত্তর প্রশ্নকারীরই দেওয়া উচিৎ! অপরাধ তিনি তরুণ। তাঁহার এই উল্টা প্রশ্ন দেখিয়া মনে হয় তিনি এবং তাঁহার বিপ্লবী বন্ধুগণ অত্যন্ত অসহায়।

কাজী আবদুল ওদুদ existing order-এর ধ্বংস সাধনের দুইটি পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমাদের বিপ্লবী বন্ধুগণ এই দুই পথের

কোন্ পথের পথিক তা তাঁহারা দেশকে ও সমাজকে জানান নাই (হয়ত দেশের অজ্ঞাতে তাঁহারা তিনজনে মিলিয়াই existing order-এর ধ্বংস সাধন করিয়া ফেলিবেন) অথচ এই ছাড়া অন্য কোন তৃতীয় পথের নির্দ্দেশও তাঁহারা দেন নাই (অবশ্য গুপ্ত বিপ্লব হইলে আমরা জানিতে চাহি না)। এই আলোচনায় যখনই কোন definite কাজের কথা উঠিয়াছে তখনই তাঁহারা নিরাপদে পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন। আর কাজী আবদুল ওদুদকে মডারেট তরুণ প্রমাণ করিবার জন্য খুব খানিকটা সময় ব্যয় করিয়াছেন। অথচ তাঁহারা এই কথাটুক লক্ষ্য করিতেছেন না, যে মানুষটি নিজের চিন্তা, সাধনা এবং কার্যে বারবার ইঙ্গিত করিতেছেন মানব কল্যাণের দিকে, সে মানুষটির মডারেট প্রমাণিত হইলেই বা কি, একষ্ট্রিমিষ্ট প্রমাণিত হইলেই বা কি আসিয়া যায়। তাঁহার লক্ষ্য ত একষ্ট্রিমিষ্ট হওয়া নয়, তাঁহার লক্ষ্য সমাজ কল্যাণ আর এও কি ঠিক নয়, জ্ঞান ও কর্ম্মবিমুখ বাক্‌সর্বস্ব একষ্ট্রিমিষ্ট তরুণের চাইতে জ্ঞান ও মনীষা সম্পন্ন কর্মসাধক মডারেট তরুণই শ্রেষ্ঠ, আজিকার সমাজ কল্যাণের জন্য বেশী প্রয়োজনীয়? মিঃ ফজলে আলী ও মিঃ নূরী বলিয়াছেন কোন ক্ষেত্রে তরুণ ও প্রবীণে মিলন সম্ভবপর নয়। মিঃ ফজলে আলী আরও বলেন সম্ভবপর নিয়মটি নাকি অত্যন্ত অপ্রমাণিত। রামকৃষ্ণ মিশন, বেঙ্গল কেমিকেল ওয়ার্কস, বিশ্বভারতী, বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী, সাহিত্য পরিষদ, Servants of India society, অভয় আশ্রম, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়, কংগ্রেস, রুশ ও ফরাসী বিপ্লব, আমেরিকা ও ইটালীর বিপ্লব সবই তরুণে-প্রবীণে সহযোগিতার ফল।

তরুণে প্রবীণে সহযোগিতার সব চাইতে বড় প্রমাণ, আমাদের পারিবারিক জীবন। জীবন নিয়ন্ত্রণে ও সমাজ কল্যাণের চিন্তায় আমাদের অভিভাবকদের সঙ্গে আমাদের মতভেদ যথেষ্ট, তথাপি পারিবারিক কল্যাণকে কেন্দ্র করিয়া আমরা স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করিতেছি। মানুষের স্বাভাবিক জন্মগত-ধর্ম্ম মিলন—সংঘর্ষ abnormal মনের সাময়িক রূপ। যেমন উত্তেজনা মানুষের মনের বিকার মাত্র, তার স্বাভাবিক অবস্থা নয়।

কাজী আবদুল ওদুদ সংঘর্ষ ও বিপ্লবকে ভূমিকম্প ও জলপ্লাবনের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। আমাদের বিপ্লবী বন্ধুগণ "উপদ্রব হইলেও এইসব হইয়া থাকে" বলিয়াই সন্তুষ্ট। কিন্তু সেই বাক্যটিতে কাজী আবদুল ওদুদের "আরাধনা" শব্দটির প্রতি তাঁহারা মোটেও নজর দেন নাই। হয়ত ব্যস্তবাগীশ সাংবাদিক ও উকিলের পক্ষে "আরাধনা", "তপস্যা" প্রভৃতি শব্দের অর্থ বুঝা কঠিন কিন্তু এই কথা জানিতেও কি আপত্তি আছে যে আজ দিকে দিকে জ্ঞান এবং বিজ্ঞানে মানুষের সাধনা চলিয়াছে ভূমিকম্প ও জলপ্লাবন প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপদ্রবকে রোধ করার দিকে, তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া ডাকিয়া আনার দিকে নয়। যখন কোন মানুষ বলে "আমার আদর্শ revolution আমার আদর্শ ভূমিকম্প ও জলপ্লাবন "তখন তাঁহার চিন্তা ও সাধনার প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা আসে না। Long live revolution সুস্থ মানুষের নয়, মাতলামীর জয়ধ্বনি।"

মিঃ নূরী তারুণ্যের এক অদ্ভুত সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন—'এ দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় যারা এই অসাধারণ সংস্কার-গতির আবশ্যকতা তীব্রভাবে অনুভব করেন, তাঁরাই হচ্ছেন আমার মতে তরুণ, আর বাদ বাকী সব প্রবীণ।' সারদা বিল (?)' avoid করিবার জন্য সেদিন যে মানুষটিকে মহাসমারোহে বরণ করিয়া আনিয়াছেন, তিনি তীব্রভাবে অনুভব করা দূরে থাকুক অত্যন্ত হাল্কাভাবেও এই অসাধারণ সংস্কার-গতির আবশ্যকতা অনুভব করেন না তথাপি তাঁকে প্রবীণা ভাবিতে মনে কষ্ট লাগে। এই দিক দিয়া মিঃ নূরীর অসাধারণ ক্ষমতা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে।

পুনশ্চ: —

১। মিঃ ফজলে আলী লিখিয়াছেন "অধ্যাপক আবদুল ওদুদ সাহেব যেন রাষ্ট্রনীতিকে বিষের মত এড়িয়ে চলতে চান।" কথাটা সত্য নয়---"মোসলেম ভারতে" অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে প্রায় অর্দ্ধশত পৃষ্ঠাব্যাপী লেখা ও 'গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ' প্রভৃতি তাহার প্রমাণ। মিঃ ফজলে আলীর রাজনীতি জ্ঞানের গভীরতা কিন্তু আমাদের অজ্ঞাত।

২। মিঃ ফজলে আলীর একটি বাক্য—"মানুষের মনটিকে কতকগুলি আলাদা আলাদা কুঠরীতে ভাগ করা চলে না।" Psychology-র একটা বইয়ের একটি লাইন—The indivisible mind of the greek gradually became a mind divided into faculty.

(প্রাচীন গ্রীকদের ধারণা ছিল Mind indivisible পরে প্রমাণিত হইয়াছে যে তাঁহাদের ধারণা ভ্রান্ত।) মনোবিজ্ঞানের প্রত্যেক বই এই কথা বলিবে।

৩। মিঃ নূরী শব্দ যোজনা করিয়াছেন "পাণ্ডিত্য পাগলামী" তার প্রতিশব্দ করিলে হয় মুর্খতা-সুবুদ্ধি।

৪। মিঃ আজীজর রহমান কাজী আবদুল ওদুদের পাণ্ডিত্যকে ব্যঙ্গ করিয়া তাঁহার ব্যবহৃত অপরিচ্ছন্ন শব্দের অর্থ করিয়াছেন নোঙরা। ঐখানে অপরিচ্ছন্ন শব্দের অর্থ অস্পষ্ট, নোঙরা নয়।

৫। মিঃ ফজলে আলী কাজী আবদুল ওদুদের নবীন প্রবীণের মিলন প্রয়াসকে ঠাট্টা করিয়া একটি উপমা দিয়াছেন—"মিলন বলা যায় শুধু সেই অর্থে যে অর্থে দু'খানা পাথরের পাশাপাশি থাকাটাও মিলন।" মনে হয় এ এক aphatic মানুষের কথা। ঐ মিলনও ব্যর্থ নয়। পাথর দু'খানি পাশাপাশি না থাকিয়া যদি সংঘর্ষ ও 'বিপ্লব' বাধায় আরও সোজা কথায় যদি 'ওলট পালট' আরম্ভ করে তবে 'সওগাত' অফিসের অস্তিত্ব আর থাকে না—মিঃ ফজলে আলীও যদি পাকা ঘরে বাস করেন তবে তাঁহার দশাও অত্যন্ত শোচণীয় হইয়া উঠে।

ঢাকাই প্রশ্ন

(সে যুগের ঢাকা মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের এক বাংলা প্রশ্নপত্রে কিছু মুসলমানী শব্দ স্থান পেয়েছিল। তা দেখে 'প্রবাসী' সম্পাদক তার খুব তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। সে সমালোচনার উত্তর দিয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের তখনকার অধ্যাপক বিখ্যাত সাহিত্যিক চারু বন্দ্যোপাধ্যায়। খুব সম্ভব প্রশ্নপত্রটি স্বয়ং চারু বাবুই করেছিলেন। এ বাদানুবাদের সূত্রপাত হয়েছিল 'ঢাকাই প্রশ্ন' এ শিরোনামায়। এ কারণে আমিও আমার প্রতিবাদে ঐ নামই ব্যবহার করেছি। আমার প্রতিবাদটি ছাপা হয়েছিল ১৩৪৩ বাংলার ভাদ্র সংখ্যা মাসিক 'বুলবুলে'। এ লেখাটিতে আমি 'আবুল আদব' এ ছদ্ম নাম ব্যবহার করেছিলাম। কেন করেছিলাম তা আর এখন মনে নেই। 'মাসিক সঞ্চয়ে' প্রকাশিত কোন কোন টিপ্পনি ধরণের লেখায় শমশেরুল আজাদ এ ছদ্ম নামটিও আমি ব্যবহার করেছি। কিন্তু আবুল আদব নামটির অন্যত্র ব্যবহার এখন আর স্মরণ করতে পারছি না।)

শ্রাবণের প্রবাসীতে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'ঢাকাই প্রশ্ন' শীর্ষক আলোচনার উত্তরে প্রবাসীর প্রবীণ সম্পাদক লিখিয়াছেন, "কেবল মাত্র বাদশাহের স্ত্রী রূপ বেগম হইলে বেগমের পুংরূপ বাদশাহ হওয়া উচিত। কিন্তু বাংলায় যাঁহারা নিজেদের নামের সঙ্গে বেগম লেখেন, তাঁহাদের স্বামীরা বাদশাহ্ নহেন এবং নিজেদের নামের সহিত বাদশাহ্ সংযুক্ত করেন না।" এই বিশ্ববিখ্যাত সম্পাদক মহাশয়ের এই যুক্তিটি যে কত হাস্যাস্পদ, এই ধরণের আরও কয়েকটি শব্দের অর্থ ও ব্যবহার পর্যালোচনা করিলেই তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

লর্ড শব্দের স্ত্রীরূপ কেবলমাত্র লেডী এবং লেডী শব্দের পুংরূপ কেবলমাত্র লর্ড, তবুও প্রবাসী, Modern Review প্রভৃতি পত্রিকায় লেডী জগদীশ বোস, লেডী প্রতিমা মিত্র, লেডী এস. আর. দাস ইত্যাদি লিখিত হইতে দেখা যায়, অথচ এই সমস্ত মহিলার স্বামীরা কেহই লর্ড নহেন

বা নিজেদের নামের সঙ্গে লর্ড সংযুক্ত করেন না। রবীন্দ্রনাথের কোন কোন প্রকাশিত পত্রে, কোন এক মহিলাকে রাণী সম্বোধন করিতে দেখিয়াছি সেই মহিলাটির স্বামী যে রাজা নহেন এই কথা বলাই বাহুল্য। অথচ রাণী শব্দের পুংরূপ কেবলমাত্র রাজা। বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতে রাজ রাণী হওয়ার কোনরূপ সম্ভাবনা নাই, এমন অনেক ছেলে মেয়ের ডাক নাম রাজা বা রাণী হইতে দেখা যায় (মুসলমান সমাজেও অনুরূপ বাদশাহ্ বা বেগম ডাকা হয়), তবুও স্কুলের কোন তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রকেও যদি রাজা শব্দের স্ত্রীরূপ বা রাণী শব্দের পুংরূপ জিজ্ঞাসা করা হয় সে অসঙ্কোচে পর্যায়ক্রমে রাণী বা রাজা উত্তরই দিবে, এবং এই উত্তর দিলে সে যে পূর্ণ নম্বর পাইবে তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই।

রাজশেখর বাবুর চলন্তিকায় দেব শব্দের অর্থ দেওয়া হইয়াছে দেবতা এবং তার স্ত্রীরূপ দেওয়া হইয়াছে দেবী। অথচ বাংলার অসংখ্য হিন্দু নারী, নিজেরা দেবী এবং নিজেদের স্বামীরা দেবতা নয় জানিয়াও, নিজেদের নামের সঙ্গে দেবী সংযুক্ত করিয়া থাকেন। নিজের কন্যা জামাতা সম্বন্ধে যত দুর্বলতাই থাকুক না কেন, রামানন্দ বাবু নিশ্চয়ই তাঁর কন্যাদ্বয়কে দেবী এবং তাঁহাদের স্বামীদ্বয়কে দেবতা মনে করেন না। বলা বাহুল্য প্রত্যেক মুসলমান মেয়ে যেমন তাঁদের নামের সঙ্গে বেগম যুক্ত করেন না, তেমনি প্রত্যেক হিন্দু মেয়েও তাঁদের নামের সঙ্গে দেবী যুক্ত করেন না। যে সব হিন্দু মেয়ে নিজেদের নামের সঙ্গে দেবী বা লেডী যুক্ত করেন তাহাদের স্বামীদের যেমন দেবতা বা লর্ড হওয়া অনিবার্য নহে, তেমনি যে সব মুসলমান মেয়ে নিজেদের নামের সঙ্গে বেগম যুক্ত করেন তাদের স্বামীদেরও বাদশাহ্ হওয়া অনিবার্য নহে—এই কথাটা বোধ করি যে কোন মোটা বুদ্ধিসম্পন্ন লোকও বুঝিতে পারেন।

ঢাকার প্রশ্ন পত্রের যে কয়টি শব্দ লইয়া বাংলার কোন কোন নেতৃস্থানীয় হিন্দু চায়ের পেয়ালায় তুফান সৃষ্টি করিতেছেন, সেই সব কয়টা শব্দই শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু সম্পাদিত চলন্তিকা অভিধানে আছে যথাঃ বাদশাহ ৩৮৬ পৃঃ, গোলাম ১৫৭ পৃঃ, আক্কেল সেলামী ৪১ পৃঃ, বিস্‌মিল্লায় গলদ—৪০৬ পৃঃ। যে শব্দগুলি আপন ইতিহাসের

়ওয়া হইয়াছে এবং এই সকল শব্দের যথোচিত বিবৃতির স্থান করিবার
ন্য অল্প প্রচলিত শব্দ যথাসম্ভব বাদ দেওয়া হইয়াছে। কাজেই, শুধু
কাই প্রশ্নকর্তা নহেন, রাজশেখর বাবুও উক্ত শব্দগুলিকে বাংলা সাহিত্যে
প্রচলিত বলিয়াই মনে করেন বুঝা যায়। তবুও প্রবাসী সম্পাদকের
দশাহ্ ও বেগম শব্দের প্রতি এই বিতৃষ্ণা কেন? ইহাদের গায়ে
রসী গন্ধ আছে—ইহাই যদি এই বিতৃষ্ণার কারণ হইয়া থাকে,
ে প্রবাসীর ভূতপূর্ব সহকারী সম্পাদক মহাশয়ের সঙ্গে প্রত্যেক
রপেক্ষ বাঙ্গালী, যাঁর স্বদেশের ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি কিছুমাত্র
ত্ববোধ আছে এবং যিনি বাঙ্গালী অর্থে শুধু হিন্দু সমাজকেই মনে না
রিয়া থাকেন তিনিই, ইহাকে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা নামে অভিহিত
করিয়া পারিবেন না।

মনে হয়, কালের ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাগ্যে যেমন প্রতিভাবান
প্রদায়িক সাহিত্যিক পরিচয় লাভই ঘটিয়াছে, তেম্‌নি এই দেশের
িষ্যত ঐতিহাসিকের বিচারে রামানন্দ বাবুর ভাগ্যেও প্রতিভাবান
প্রদায়িক সম্পাদক উপাধি লাভই ঘটিবে। দেশের বৃহত্তর স্বার্থের
ঃ হইতে ইহা কি চরম দুর্ভাগ্যের কথা নয়?

○ চারুবাবু এক সময় 'প্রবাসীর' সহ-সম্পাদক ছিলেন।

(কলকাতা থেকে 'বাঙালী' নামে একটি সাপ্তাহিক বের হতো। তার সঙ্গে, লেখক হিসেবেই বোধ করি কবি আবদুল কাদিরও যুক্ত ছিলেন। এ সংক্ষিপ্ত লেখাটি তাঁকে লেখা আমার একটি ব্যক্তিগত পত্রেরই অংশ এবং তাঁরই উদ্যোগে ১৯৪৪ ইংরেজির ২৪শে জানুয়ারীর 'বাঙালী'তে প্রকাশিত হয়। এটি ঠিক প্রতিবাদী লেখা না হলেও স্থানে স্থানে প্রতিবাদের সুর একেবারে অনুপস্থিত নয়।

এবার কয়েকজন আধুনিক কবির আধুনিক কবিতা পড়্‌লাম। বুদ্ধদেব বসুর সদ্য প্রকাশিত 'দময়ন্তী' কাব্যের প্রথম কবিতাটি বড় ভালো লেগেছে। নিছক জৈব ব্যাপার নিয়ে যে এত সুন্দর রস-ঘন কবিতার জন্ম হ'তে পারে, এ আমার ধারণাই ছিল না। অজিত দত্তের 'পাতাল কন্যা'ও ভালো লেগেছে। অমিয় চক্রবর্ত্তীর 'অভিজ্ঞান বসন্তের' সব কবিতা বুঝ্‌তে পারিনি। বিষ্ণু দে'র 'পূর্ব্বলেখে' তো দন্তস্ফুটই করতে পারলাম না। সমর সেনের 'গ্রহণের' কাব্যরসও আমার মনের বাইরেই থেকে গেছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিকের' কোনো কোনো কবিতা ভালো লেগেছে; তবুও মনে হয়েছে কবিতা গুলি খুব বলিষ্ঠ ও সাবলীল নয়।

গদ্য-রচনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসুর 'সব পেয়েছির দেশে' আনন্দ দিয়েছে। পাঠকের মনে একটা অনুরণন সৃষ্টি কর্‌বার অদ্ভুত যাদু ও আশ্চর্য্য শক্তি বুদ্ধদেবের কোনো কোনো গদ্য-রচনার। এই রচনাটিও তার অন্তর্গত।—'মংপুতে রবীন্দ্র-নাথ' এ-লেখিকার আশ্চর্য্য লিপিদক্ষতা ও সজীব-চিত্রের পরিচয় আছে। তার চেয়েও বেশী আছে রবীন্দ্রনাথের অন্তিম ব্যক্তি-জীবনের পরিচয়। সে-জীবন যে কত সজীব, সতেজ, সক্রিয় ও রসবিদগ্ধ ছিল তার পরিচয়

এমন ক'রে আর কেউ ধ'রে রেখেছেন কিনা জানি না। কবির ভাগ্য দেখে ঈর্ষা হয়ঃ কবির মৃত্যুর পরে কবির ব্যক্তি-জীবন নিয়ে যাঁরা গ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁরা সবাই—যাকে বলে, Fair Sex। 'মংপুত রবীন্দ্রনাথ'---'মৈত্রেয়ী দেবী, 'পুণ্যস্মৃতি'—শান্তা দেবী,' নির্ব্বাণ'—প্রতিমা দেবী, 'আলাপ চারী রবীন্দ্রনাথ'—রাণী চন্দ, ইত্যাদি। বেঁচে থাক্‌তেও লোকটি ভাগ্যের শাহান্‌শাহ্‌ ছিলেন, মৃত্যুর পরেও দেখ্‌ছি ভাগ্য তাঁর প্রতি কিছুমাত্র কার্পণ্য করছেন না। তোমরা সব পরমহংস কিনা জানি না, আমার কিন্তু রীতিমতো হিংসা হয়।

হুমায়ুন কবিরের 'বাঙলার কাব্য' পড়েও মুগ্ধ হয়েছি। কল্পনার তীক্ষ্নতা ও প্রসারের সঙ্গে ভাষার বলিষ্ঠ ও অর্থপূর্ণ প্রয়োগ এই বইটিকে উপভোগ্য করেছে। তবে বড় সংক্ষিপ্ত। শুধু ইংগীত শুধু outline ইহাকে বলা যায়। এ-পর্য্যন্ত এই বহু-প্রসারিত খ্যাতির মাতৃভাষায় এইটিই হয়ত শ্রেষ্ঠ রচনা। তবে ঠিক জানি না,—ওঁর সব রচনার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই।

উপন্যাসের মধ্যে তারাশঙ্করের 'ধাত্রী দেবতা' এবং গোপাল হালদারের 'একদা' পড়লাম। 'একদার' মত এমন বই বহুদিন আমি পড়ি নি। অথচ বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ হয়েছে। হৃদয়াবেগের সঙ্গে মননশীলতার এমন রসোত্তীর্ণ সমন্বয় আর কোন্ দ্বিতীয় বাঙলা গ্রন্থে হয়েছে তার খবরের জন্য আমি প্রতীক্ষা করে রইলাম। Pen is mightier than Sword. এই বইটি পড়ার পর মন আপনা-আপনি বলে ওঠেঃ এই সে Pen, বুদ্ধির ঔদার্য্য, মনের প্রসারতা, পাণ্ডিত্যের আদিগন্ত বিস্তার সবই এই লেখকের আছে। কিন্তু তার বাড়াবাড়ি কিম্বা অশোভন বিজ্ঞপ্তি কোথাও নেই। সবই হজম হয়ে, সাহিত্যের স্বাস্থ্য ও লাবণ্য নিয়েই ফুটে ওঠেছে। অথচ তাঁর বিশ্লেষণী চিত্তের ঋজুতা ও বলিষ্ঠতা কোথাও এতটুকু অবনমিত হয় নি। তোমার সঙ্গে যদি এই গ্রন্থকারের আলাপ থাকে, আমার পক্ষ থেকে তাঁকে তুমি একটি নমস্কার নিবেদন ক'রে রাখ্‌বে। বলবেঃ পাঠকের দক্ষিণা।

'ধাত্রী-দেবতা' খুব ভালো লাগে নি। নামটি মাটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, কিন্তু বইটিতে মাটির গন্ধ বেশী পাইনি, তার চেয়ে আকাশ

আর হাওয়ার আমেজ যেন অনেক বেশী। তাই মন ভরে নি। প্রাচীন ধ্বংসমুখী অভিজাত জমিদার-বাড়ীর বর্ণনা তারাশঙ্করবাবু বেশ দিতে পারেন। বাঙালী-জীবনের এই দিক্‌টার সঙ্গে তাঁর পরিচয় বেশ নিবিড় বলে মনে হয়। কিন্তু আধুনিক যুগের রূপ তাঁর রচনায় বড় কেতাবী-কেতাবী ঠেকেছে। প্রগতিশীল নবীন বাঙলা, শুধু মুখর নয়, জ্যোতির্ম্ময় হ'য়ে ফুটে উঠেছে গোপালবাবুর 'একদা'য়।

আমাদের বন্ধু নাজিরুল ইস্‌লামের 'জীবনের জয়যাত্রা'ও পড়লাম। কিন্তু আমার কাছে বড় dull মনে হ'ল। চিন্তার কথা আছে, এবং দীর্ঘ ভূমিকায় তার সাফাইও গাওয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও কোথায় কিসের যেন অভাব রয়েছে। পড়্‌তে পড়তে মন সাড়া দেয় না। মনের উপর জবরদস্তি করেই বইটি আমাকে শেষ করতে হয়েছে। অথচ নাজিরুল ইস্‌লামের ভাষা ও বর্ণনাশক্তি—মন্দ নয়, ভালোই বলা যায়। কিন্তু পড়তে পড়তে মনে কোনো তড়িৎ-রেখা খেলে না (বলা যায় আমার এখনকার রচনার মতোই)। যদি বলো: Intellectualism তোমার মনের বিধর্ম্ম তাই তোমার ভালো লাগে না; তা হ'লে বল্‌বো: তা যদি সত্য হতো তবে 'গোরা' 'ঘরে-বাইরে' আমার ভালো লাগ্‌তো না। যেই 'একদা' পড়ে আমি উচ্ছ্বসিত হয়েছি সেই 'একদা'ও ভালো লাগ্‌তো না। দীলিপকুমার ও অন্নদাশঙ্করের উপন্যাস, ধূর্জ্জটি প্রসাদের গল্প-উপন্যাস তো রীতিমতো বয়কটই করতাম। কিন্তু তা তো করি না। আসলে, আমার মনে হয়, নাজিরুল ইস্‌লামের যে intellectualism তা অত্যন্ত 'এনিমিক্' ও 'রিকেটি' মনের intellectualism, তাই প্রাণধর্ম্মের এত অভাব তাতে। ফলে প্রাণ থেকে প্রাণে তা সঞ্চারিত হয়ে ফেরে না।

[illegible] লিখিত পত্রাংশ।

পরিশিষ্ট

গ্রন্থ-পরিচয়

চৌচির ১৯৩৪ সালের জানুয়ারী মাসে প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক---বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ২৩ ক্রিমেটোরিয়াম ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চৌচির রচিত হয় ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে, এটি লেখকের প্রথম উপন্যাস। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় আবুল ফজল লিখেছিলেন যে, ১৯২৪--২৫ এর দিকে এই গল্পটি লেখা হয়। 'সাহিত্যশিল্পী আবুল ফজল'-এর লেখক আনোয়ার পাশাকে লেখা ১.৬.৬৫ তারিখের ব্যক্তিগত চিঠিতে আবুল ফজল জানিয়েছেন যে, যতদূর মনে পড়ে ১৯২৭--২৮-এ চৌচির লেখা হয়েছে।১

ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'শান্তি' (১৯২৮) পত্রিকায় এই উপন্যাসের আংশিক ছাপা হয়েছিল। ১৯২৯ সালে সওগাত পত্রিকায় সম্পূর্ণ ছাপা হয়।২

প্রথম সংস্করণ আবুল ফজল নিজ ব্যয়ে মুদ্রণ শুরু করেন।৩ কিন্তু 'ছাপা শেষ হওয়ার আগেই হাবীবুল্লাহ বাহার প্রস্তাব দিলেনঃ আমরা 'বুলবুল পাবলিশিং হাউস' নামে একটি প্রকাশনী সংস্থা করেছি, 'চৌচির' প্রকাশের দায়িত্ব আমাদের হাতে ছেড়ে দিন। এ যাবৎ প্রেসকে ছাপা আর কাগজ বাবত আপনি যা টাকা দিয়েছেন তা আমরা আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি, বাকি খরচ আমাদের। আমি সানন্দে রাজী হয়ে সব ভার বাহারের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম।৪

গ্রন্থের নামকরণে মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন ও নায়কের নামকরণে কামাল উদ্দীন খান পরামর্শ দেন।৫ 'খুব সম্ভব লেখক যখন কলকাতায় ল' পড়তে গিয়েছিলেন তখনই মনসুর উদ্দীনকে পাণ্ডুলিপিটি দেখিয়েছিলেন। পাণ্ডুলিপিটি পড়ার পর তিনি লেখাটার নাম 'চৌচির' দিতে লেখককে পরামর্শ দিয়েছিলেন। নামটি লেখকের মনঃপূত হওয়ায় তা সানন্দে গ্রহণ করেন লেখক। নায়কের নাম প্রথমে ছিল সলীম। পাণ্ডুলিপিটি পড়ার অথবা শোনার পর কামাল উদ্দীন খান বলেছিলেন: সলীম বড় মামুলি, আগে একটা ত বসিয়ে তসলীম করে নিন, নামটা সুন্দর হবে। মুহূর্তে নামটা আমি লুফে নিলাম।৬

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'চৌচির' পাঠের প্রতিক্রিয়া জানান ৬।৯।৪০ তারিখের এক ব্যক্তিগত চিঠিতেঃ

> "আপনার 'চৌচির' গল্পটি আমার দৃষ্টিকে ক্লিষ্ট করেও পড়েছি। আমার পক্ষে এ গল্প বিশেষ ঔৎসুক্যজনক। আধুনিক মুসলমান সমাজের সমস্যা ঐ সমাজের অন্তরের দিক থেকে জানতে হলে সাহিত্যের পথ দিয়েই জানতে হবে---এই

প্রয়োজন আমি বিশেষ করেই অনুভব করি। আপনাদের মতো লেখকদের হাত থেকে এই অভাব যথেষ্টভাবে পূর্ণ হতে থাকবে এই আশা ক'রে রইলুম।"৭

ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক এই গ্রন্থ-সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন---

'চৌচির' তরুণ লেখক আবুল ফজল সাহেবের লেখা একখানি সামাজিক উপন্যাস। বইখানি আমাকে শুধু পাঠের আনন্দ দান করিয়াছে তা নয়; বরং আমাকে ভাবিতে বাধ্য করিয়াছে---চিন্তা করিয়া দেখিতে অবসর দিয়াছে---নগরীর কর্ম্মকোলাহল পূর্ণ জনতার মধ্য হইতে শান্তস্নিগ্ধ পল্লীর ছায়াতলে টানিয়া নিয়া বাঙলার যাদুকরী প্রাণের স্পর্শ দান করিয়াছে। এই উপন্যাস-স্বষ্ট পল্লী নরনারীর মধ্যে দাঁড়াইয়া আমি যে পরম আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করিয়াছি, তাহা অন্যত্র বড় বেশী লাভ করি নাই। পরিশেষে ইহার বিয়োগান্ত পরিসমাপ্তিতে যে বুক ভাঙা বেদনায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছি, তাহা পুস্তকখানির 'চৌচির' নাম স্বার্থক করিয়াছে।

মুসলমান সমাজের একটি স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিবারের ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যেই বেশ ভদ্রোচিত প্রেমকে কেন্দ্র করিয়া উপন্যাসখানি গড়িয়া উঠিয়াছে। এত ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে লেখক যে অপূর্ব্ব কৌশলে ঘটনার পর ঘটনার জাল বুনিয়াছেন, তাহা তাঁহার ন্যায় তরুণ লেখকের পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নয়। এই জন্য আমরা গ্রন্থকারকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

এই উপন্যাসখানিতে অনেকগুলি সামাজিক সমস্যার অবতারণা করা হইয়াছে। সাধারণতঃ দেখা যায়, সমস্যামূলক উপন্যাসগুলিতে রসস্থষ্টি কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। সুখের বিষয় 'চৌচির' এই শ্রেণীর উপন্যাস নহে। উপন্যাস সম্বন্ধীয় কলা-কৌশলের মর্যাদাহানী না করিয়া গ্রন্থকার ইহাতে যে সমস্যার সমাবেশ করিয়াছেন, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রকেই আধুনিক মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিবে---সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে ঔপন্যাসিকের চেয়ে সমাজ সংস্কারকের মর্যাদাই লেখকের অধিক প্রাপ্য। কিন্তু তিনি সংস্কারক নহেন, কোন সমস্যার সমাধান করা তাঁহার কাজ নহে; কেন না তিনি প্রধানতঃ ঔপন্যাসিক। উপন্যাসখানি তাঁহার প্রথম রচনা হইলেও ইহাতে তিনি যে প্রতিভার পরিচয় দান-- যে রসস্থষ্টির আয়োজন করিয়াছেন; তাহা বাস্তবিকই পাঠককে মোহিত করিবে। ইহা লেখকের পক্ষে যেমন শ্লাঘার বিষয়, মুসলমান সমাজের পক্ষেও তেমনি আশার কথা।

এই উপন্যাসখানিতে যে ছবি চিত্রিত করা হইয়াছে, তাহাতে কোন প্রকার রঙ ফলান হয় নাই। বাস্তবতাপন্থী লেখক তাঁহার চতুপার্শ্ববর্ত্তী নর-নারীকে যেভাবে দেখিয়াছেন, অবিকল সেইভাবেই চিত্রিত করিয়াছেন। মুসলমান সমাজের ধর্ম্ম-বিশ্বাস, আচার, অনুষ্ঠান, সংস্কার প্রভৃতির কৌশলপূর্ণ সমাবেশে উপন্যাসখানি খুবই প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাই দেখিতে পাই, ইহার চরিত্রগুলি গ্রাম্য মুসলমানেরই চরিত্র--লেখকের স্থষ্ট মানস-পুত্র নহে। লেখকের ন্যায় সংস্কার-

মুক্ত ভাবাপন্ন ঔপন্যাসিকের পক্ষে মনগড়া চরিত্র সৃষ্টির লোভ সামলাইয়া বাস্তব চিত্র অঙ্কণ করা কম কথা নহে।

এই উপন্যাসখানি মুসলিম সমাজকে হিন্দু প্রতিবেশীদের নিকট পূর্ণভাবে পরিচয় করিয়া দিবে। আমাদের হিন্দু প্রতিবেশীরা একমাত্র উপযুক্ত সাহিত্যের অভাবেই মুসলিম সমাজকে ভালরূপে চিনিতে পারিতেছে না। এইবার আমরা এই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের হাতে এই উপন্যাসখানি নিঃসঙ্কোচে তুলিয়া দিতে পারিব। স্বীকার করি, ইহাতে যেরূপ মুসলমানী ভাব, চিন্তা, সমস্যা ও শব্দ প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে, হিন্দু পাঠকদের বুঝিতে কষ্ট হইবে। কিন্তু মুসলমানের ন্যায় এত বড় একটি সমাজকে বুঝিতে হইলে বিনা কষ্টে তাহা কি সম্ভবপর? পাঠক সমাজে বইখানির যথোচিত আদর হইলে সুখের বিষয় হইবে।৮

১৯৫৭ সালে রেডিও পাকিস্তান ঢাকা থেকে প্রচারিত "যদি আবার লিখতাম: চৌচির।" কথিকায় আবুল ফজল বলেন, "চৌচির লিখেছিলাম প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে। তখন আমার বয়স ও মন দুই-ই ছিল কাঁচা। বিচারশক্তি যা লেখকের জন্য অপরিহার্য তার বিকাশ ঘটেনি তখনো। কিন্তু আবেগ ছিল দুর্দমনীয়। সাহিত্য ও শিল্পের পেছনে আবেগ যে বেশ বড় স্থান জুড়ে আছে তাতে সন্দেহ নেই, তবে তা রচনার দুর্বলতার কারণ হয়েও দাঁড়ায়। অনেক সময় মাত্রাধিক আবেগ সব রকম বিচার বুদ্ধি ও পরিমিতবোধকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ফলে আবেগের আতিশয্যে লেখকের মন যদি ভারসাম্য হারিয়ে বসে রচনাও ভারসাম্য হারাতে বাধ্য। চৌচিরও অনেকখানি আবেগ-প্রধান রচনা। তবে আমার বাল্য ও কৈশোর যে সমাজে কেটেছে, সে সমাজের বুকে ব'সে লেখা ব'লে তার প্রতিচ্ছবি কিছুটা যে এই বইতে ফুটে উঠেছে তাতে সন্দেহ নেই। সে সঙ্গে ফুটে উঠেছে দুই আবেগ বিগলিত তরুণ হৃদয়ের বাল্য প্রেম-বেদনার রোমান্টিক ছবিও। ⋯ বি.এ. পরীক্ষা ও তার ফল-প্রকাশের মাঝখানে যে সুদীর্ঘ বিরতি---তারই সাহিত্যিক ফসল চৌচির। তখন বয়সটা ছিল যেমন রোমান্টিক, যুগটাও ছিল রোমান্টিসিজমের। বেপরোয়া রিয়ালিজম তখনো বাংলা সাহিত্যে ব্যাপকভাবে দেখা দেয় নি। চৌচিরে রিয়ালিজমের অভাব নেই সত্য কিন্তু নায়ক-নায়িকা উভয়ে রোমান্টিক ব'লে বইটির মূল সুর রোমান্টিসিজম না হয়ে পারেনি। ⋯চৌচিরে কিছুটা অলৌকিকতার আমদানিও করা হয়েছে, তাও রোমান্সেরই ফল। অলৌকিকতার উপর আমাদের আজ আর কোন বিশ্বাস নেই, নেই আস্থা। মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে বা কোরাণ শরিফ হাতে নিয়ে শপথ গ্রহণ ইত্যাদির আবেদনও আজ আমাদের মন থেকে নিশ্চিহ্ন। আজকের যুবক-যুবতীদের মনে এ-সবের কোন স্থান নেই। বিজ্ঞান এবং ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা এ যুগের নর-নারীর মনকে অলৌকিকতা ও নানা সংস্কারের বন্ধন থেকে দিয়েছে মুক্তি। ⋯নায়িকা রওশনের মৃত্যুর পর নায়ক তসলীম বলছে, 'মানুষের দেহ মাত্র নশ্বর, আত্মা অবিনশ্বর, অমর---তাহার এ জীবন শেষ নহে, আরও জীবন আছে; তাহার দেহ গিয়াছে, আমার ভালোবাসা ত দেহাতীত ছিল; কাজেই কিসের দুঃখ? প্রতীক্ষা কর, জীবন হইতে জীবনান্তরে প্রতীক্ষা কর,

খোঁজ---তোমার প্রতীক্ষার এ আনন্দাভিযান যেন কোথাও শেষ না হয়; শেষ হইলেই কিন্তু তোমার মরণ, তোমার প্রেমের সমাধি।' আজ এ সব উক্তি মনে হচ্ছে Sentimental ভাবালুতার চরম ক্লাইমেক্স ছাড়া আর কিছুই নয়।·····হজ্জ্ শেষে মক্কার জ্যোৎস্নাপ্লাবিত আকাশের দিকে তাকিয়ে তসলীম ভাবছে---'মৃত্যুর পর মানষের আত্মা নাকি পরমাত্মার সঙ্গে মিশিয়া যায়, পরমাত্মার ত কোন নির্দ্দিষ্ট সিংহাসন নেই, সে ত এ বিপুল সৃষ্টির মধ্যে মিশিয়া আছে,---তবে তাহার প্রিয়াও ত এ-আলোর সঙ্গে মিশিয়া আছে, সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে ছড়াইয়া আছে। তবে ত শুধু এ তীর্থভূমি তার তীর্থস্থান নহে, সারা বিশ্বই তার তীর্থভূমি। অনন্ত সন্ধানী, অনন্ত পথের পথিক মানুষ, তাহা হইলে ত বাহির হইয়া পড়িতে হয়।'---বাস্তব জগতের সীমা ছাড়িয়ে রোমান্টিসিজম যে কতখানি আসমানী হ'তে পারে এ তারই নজির। ছেলে মানুষী ছাড়া এ সব উক্তির আজ আর কোনো মূল্য নেই। তবে ছেলেমানুষীর মধ্যে কি কোন সৌন্দর্য নেই, নেই কোনো আবেদন। আছে ব'লেই চৌচিরের জনপ্রিয়তা এখনো তেমন হ্রাস পায়নি। বহু দুর্বলতা সত্ত্বেও এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, চৌচির লেখকের তরুণ মনেরই নানা সাধ স্বপ্নের প্রতীক। সামাজিক ইতিহাস হিসেবে চৌচিরের মূল্য অনস্বীকার্য। সমাজ-বিজ্ঞানীর কাছে অর্থাৎ যাঁরা আমাদের সমাজের অগ্রগতি ও যুগান্তরের হাল-হকিকতের খবর নিতে চান তাঁদের কাছে এ বই অনেককাল কৌতূহলের বিষয় হয়ে থাকবে।"৯

চৌচির উৎসর্গ করা হয় পরলোকগত বন্ধু দিদারুল আলমকে।

১. আনোয়ার পাশা, সাহিত্যশিল্পী আবুল ফজল, চট্টগ্রাম ১৯৬৭, পৃ. ৬৬

২. ঐ পৃ.৩০৯

৩. ঐ পৃ.৩০৯

৪. আবুল ফজল, রেখাচিত্র, প্রথম সংস্করণ, চট্টগ্রাম ১৯৬৬ পৃ. ২৩১

৫. আনোয়ার পাশা, সাহিত্য শিল্পী আবুল ফজল, পৃ. ৩১০

৬. আবুল ফজল, রেখাচিত্র, পৃ. ২৩১

৭. আনোয়ার পাশা, সাহিত্যশিল্পী আবুল ফজল পৃ. ৩১০-এ উদ্ধৃত

৮. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, বুলবুল (সম্পাদক হাবীবুল্লাহ বাহার ও বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ) ২য় বর্ষ শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৪১

৯. আবুল ফজল, "যদি আবার লিখতাম: চৌচির', কাফেলা, চট্টগ্রাম, অক্টোবর ১৯৬৪

(আনোয়ার পাশা কর্তৃক উদ্ধৃত, 'সাহিত্য-শিল্পী আবুল ফজল,' পৃ. ৬৫---৭৩।)

প্রদীপ ও পতঙ্গ উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে (১৯৪০--৪১ খৃষ্টাব্দে)

প্রদীপ ও পতঙ্গের 'লেখকের কথা' অধ্যায়ের "বিপত্নীক জীবনে আমার সম্বন্ধে এ-রকম একটা ধারণা প্রচার হইতে দেওয়া কিছু মাত্র বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না।" ---বাক্যটিকে জীবনীকার আবুল ফজলের 'ব্যক্তি জীবনের ছায়াপাত' বলে মনে করেন। আবুল ফজল প্রথম বিপত্নীক হন ১৯৩২-এর শেষ দিকে। ১৯৩৩-এর প্রথম দিকে তিনি চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড হাই মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। জীবনীকারের ধারণা, ১৯৩২-এর শেষ দিকে আবুল ফজল প্রদীপ ও পতঙ্গ রচনা শুরু করেন, অসমাপ্ত রেখে 'জীবন পথের যাত্রী' রচনায় মনোযোগ দেন। পরে সম্ভবত অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপিতে শেষ অধ্যায় যোগ করে ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে মুদ্রণ করেন। (আনোয়ার পাশা, সাহিত্য শিল্পী পৃ. ৩১১ "প্রদীপ ও পতঙ্গ" এবং 'সাহসিকা' উপন্যাস "চৌচির" আর "জীবন পথের যাত্রীর" মাঝখানে রচিত হয়।১ সাহসিকার প্রকাশকাল ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ (১৯৪৬ ইং)। সাহসিকা উপন্যাসের নাট্যরূপ 'প্রগতি'।

আবুল ফজলের আত্মকথা রেখাচিত্রে সাহসিকা উপন্যাস রচনা ও প্রকাশ প্রসঙ্গে কোন তথ্য নেই।

(১. আনোয়ার পাশাকে ১.৬.৬৫ তারিখে লেখা চিঠি। সাহিত্যশিল্পী আবুল ফজল, পৃ. ৩১০।)

লেখকের সাহিত্য-জীবনের প্রায় সূচনায় রচিত এ তিনটি উপন্যাসিকা---চৌচির, সাহসিকা, প্রদীপ ও পতঙ্গ, তিনটি পৃথক মেজাজেরই প্রতিনিধি। স্মর্তব্য--উপন্যাসত্রয় পর্যায়ক্রমে রচিত---প্রথমটি এই শতকের দ্বিতীয় ও শেষ দু'টি তৃতীয় দশকে। যদিও প্রকাশিত হয়েছে পরে।

শুধু লেখকের মন-মেজাজ-দৃষ্টিভঙ্গি নয়, কালের বিবর্তনের ছাপও গ্রন্থত্রয়ে লক্ষ্য-গোচর হবে পাঠকদের। তিন উপন্যাসের তিন নায়িকা কাল-স্রোতস্বিনীর তিন মোড়েরই যেন প্রতিনিধি।

চৌচিরের রৌশন অসূর্যস্পর্শা অ-বলা, পর্দানশীন কিন্তু স্রোতের খড়-কুটো নয়।

সাহসিকার তাহেরা মুসলিম নারীর প্রথম সাহসী কণ্ঠস্বর, স্বাধীকারের এক নির্দ্বন্দ্ব পদক্ষেপ।

প্রদীপ ও পতঙ্গের জোহরা সোচচার, প্রদীপ্তা, বেপরওয়া, পুরোপুরি এক ব্যক্তিসত্ত্বা ও আধুনিকা।---এই তিন নায়িকা-চরিত্র স্বতন্ত্র কিন্তু কমণীয়তায় অভিন্ন। এরা মুসলিম নারীর অভিযাত্রার অগ্রগতির পথে তিন ধাপ উত্তরণেরই যেন অভিজ্ঞান, তারই প্রতীক ও তারই স্বাক্ষর।

উপন্যাসত্রয়ে বাঙালী মুসলমান মেয়ের আশ্চর্য বিবর্তন লক্ষ্য করবার মতো। ব্যক্তিসত্তার স্বাধীকারে-বিশ্বাসী লেখকের উত্তরণের পরিচয় এই তিন উপন্যাসের মেজাজ ও ভাষায় কিছুটা প্রতিফলিত হয়েছে বলা যায়।

গল্প

(বাঁ দিকে গল্পের শিরোনাম ও ডান দিকে প্রথম প্রকাশ-কাল)

মাটির পৃথিবী---	সওগাত ১৩৪৩
মা--	'অনুক্ত কাহিনী' শিরোনামে বৈশাখ ১৩৩৬-এর সওগাতে প্রথম প্রকাশিত। 'মাটির পৃথিবী' ও 'আয়ষা' গ্রন্থে "আয়ষা" নামে মুদ্রিত। "শ্রেষ্ঠ গল্প" সঙ্কলনে 'মা' শিরোনামে প্রকাশিত।
একখানি হাসি---	মোহাম্মদী, ফাল্গুন, ১৩৩৯
হাকিম---	ছায়াবীথি, কার্তিক ১৩৪০
পরদেশীয়া---	জয়তী, পৌষ ১৩৩৭
জয়---	সওগাত ১৩৩৪ ('ইসলাম কী জয়' শিরোনামে মুদ্রিত)
জনক---	সওগাত, মাঘ ১৩৩৪
সংস্কারক---	সওগাত, ১৩৩৪
লাঠ্যৌষধ---	সবুজ পল্লী, মাঘ ১৩৩৪ (পুনর্মুদ্রণ-সওগাত, ফাল্গুন ১৩৩৬)
নিজের মা ও পরের বাপ--	সওগাত ১৩৫০
কবিতার অপমৃত্যু--	জয়তী, বৈশাখ ১৩৩৯
আলোছায়া--	সওগাত, ১৩৩৬ (১৯২৯-এর মুসলিম হল বার্ষিকীতে পুনর্মুদ্রিত)
শরীফ--	সওগাত, আষাঢ়, ১৩৩৬
আহমদ--	সওগাত, মাঘ ১৩৩৭ ('ইসলাম দর্শন' পত্রিকায় "কয়েদী" শিরোনামে প্রথম প্রকাশিত)
রহস্যময়ী প্রকৃতি--	সওগাত, ১৩৪৫

বাদশা নবাব আমির, একখানি হাসি, হাকিম, পরদেশীয়া, জয়, জনক, সংস্কারক, লাঠ্যৌষধ, শরীফ, নিজের মা ও পরের বাপ, রহস্যময়ী প্রকৃতি--এই গল্প ১৩৪৭-এ প্রকাশিত "মাটির পৃথিবী" গল্প সঙ্কলনের প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত হয়। ১৩৫৮ সালে চট্টগ্রামের তাজ লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত "আয়ষা" গল্প-সঙ্কলনেও এই গ্রন্থের এগারোটি গল্প পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল।

'একখানি হাসি' গল্পটি সম্পর্কে লীলা রায়ের মতামত--- With a genuine sense

of humour Abul Fazal tells us in 'The Smile' how the persistent and knowing smile of a small pupil upset his school teacher to the point of resignation and departure. ১

'আয়ষা' সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য

In the 'Aycsha' we see a truely beautiful woman. Poor semi-literate, living among people as mean and quarrelsome as they well could be, she is untainted, and so her daughter. ২

১. Lila Roy, A Challenging Decade-Bengali literature in the Forties. p. 29

২. ঐ

নাটিকা

কবির বিড়ম্বনা

নেতা

ভাই ভাই

তা ত হবেই

বোরকা

এই পাঁচটি একাঙ্কিকা "আলোক লতা" গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে (কলিকাতা ১৯৩৫) অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রগতি শীর্ষক নাটিকাটি তৃতীয় সংস্করণে (১৩৬৭) অন্তর্ভুক্ত হয়।

নাটিকাগুলির সঙ্কলন আলোকলতা উৎসর্গ করা হয়েছিল এ. এফ. এম. আবদুল হককে।

বিদ্রোহী কবি নজরুল

১৯৪৭—এ 'বিদ্রোহী কবি নজরুল' নামে একটি ছোট বই লিখেছিলাম--খুব গভীর আর নজরুল সাহিত্যের বিশ্লেষণমূলক আলোচনায় না গিয়ে মোটামুটি সহজপাঠ্য করেই বইটা লেখা।'

(আবুল ফজল, রেখাচিত্র, পৃ. ৩৪২)

প্রথম প্রকাশ চৈত্র ১৩৫৪। প্রকাশক সুধীর সিংহ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

'বিচিত্র কথা' প্রথম প্রবন্ধ-সঙ্কলন। চট্টগ্রাম ন্যাশনাল লাইব্রেরী থেকে ১৩৪৭-এর বৈশাখে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

আবুল ফজলের এম. এ. পরীক্ষার (১৯৪০) আগে প্রকাশিত হয় নিজের খরচে। চট্টগ্রাম সেভয় প্রেসে ডাবল ক্রাউনে ছাপা।

সঙ্কলিত ২৭টি প্রবন্ধের শিরোনাম প্রথম পত্রিকায় প্রকাশ কাল :
আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যের ধারা। সঞ্চয়, কার্তিক ১৩৪১ মুসলিম কথা সাহিত্যের গতি ও পরিণতি। নওরোজ, আশ্বিন, ১৩৩৪

(১৯২৭ সালে মুসলিম হলে 'পর্দা প্রথার সাহিত্যিক অসুবিধা' নামে পঠিত)

রবীন্দ্রজীবন ও সাহিত্য প্রসঙ্গ। সওগাত ১৩৪০
('দু' পাতা' পত্রিকায় 'বিয়োগান্ত' শিরোনামে গল্পে রূপ দান করা হয়)

বাহাই ধর্ম। ভারত বর্ষ, মাঘ, ১৩৩৩ (১৯২৬ সালে মুসলিম সাহিত্য সমাজে পঠিত

চিত্রকলা। সওগাত

যৌন-জ্ঞান। মাসিক মোহাম্মদী

ওবেদি বিয়োগ। এই নামের একটি গ্রন্থের ভূমিকা

নিয়ন্ত্রিতা। সওগাত, চৈত্র ১৩৩৫ (পুস্তক-সমালোচনা)

উর্দু কবি হালী। সওগাত

নারী জাগরন। সওগাত, পৌষ ১৩৩৬

বিদায় ভাষণ। (১৯৩৭-এর আগষ্টে খুলনা জেলা স্কুল থেকে বিদায় নেবার সময় ছাত্রদের উদ্দেশ্যে ভাষণ)

শেষ প্রশ্ন। পূরবী

একখানি কাব্যগ্রন্থ। সঞ্চয় (ঢাকা) কার্তিক ১৩৩৬ (জসীম উদ্দীনের 'নক্সী কাঁথার মাঠ' কাব্যের সমালোচনা)

দিলরুবা। সঞ্চয়, শ্রাবণ ১৩৪২ (পুস্তক-সমালোচনা)

সাঁঝের মায়া। সঞ্চয় (পুস্তক-সমালোচনা)

ইকবাল। পূরবী (সম্পাদকীয়)

শরৎচন্দ্র। পূরবী (সম্পাদকীয়)

বঙ্কিমচন্দ্র। পূরবী (সম্পাদকীয়)

মরহুম আবুল হোসেন স্মরণে। সওগাত (পরে 'বুদ্ধির মুক্তিবাদ ও আবুল হোসেন' শিরোনামে পুনর্মুদ্রিত)

মিসেস আর. এস. হোসেন। সাপ্তাহিক সওগাত আশ্বিন, ১৩৩৫, জানুয়ারী, ১৯২৯
রোকেয়া। সওগাত

আজিমুন্নেসা সাহেবা। পূরবী (চট্টগ্রাম) (মাহবুব-উল-আলমকে লেখা চিঠি)

শশাঙ্কমোহন। পূরবী (চট্টগ্রাম)

শামসুল আলম স্মরণে। পূরবী

প্রথা। মুসলিম হল বার্ষিকী, ১৯২৭

মানুষ। মোহাম্মদী, মাঘ ১৩৩৮ (চট্টগ্রামের কাজেম আলী হাই স্কুলের ছাত্রদের হাতে-লেখা পত্রিকার জন্য প্রথম রচিত)

উৎসর্গ---'ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজের বন্ধুগণকে'।

১. আনোয়ার পাশা---সাহিত্য শিল্পী আবুল ফজল, পৃ. ৩১৪

কোরাণের বাণী---প্রথম সংস্করণ ১৯৪৯। উৎসর্গ--পিতা মরহুম মওলানা ফজলুর রহমান।

১৯৪৭-এর আগে 'মোসলেম জীবনী, শিরোনামে দু'বছর ধরে মাসিক সওগাতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত। (রেখাচিত্র)